নামাযের হাকীকত

দালায়েল ও মাসায়েল

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্-মদীনাতুল মুনাওয়ারা প্রকাশনী

নামাযের হাকীকত

দালায়েল ও মাসায়েল

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সুলায়মান আল-হাছানী
মুহাদ্দেস, চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্-মদীনাতুল মুনাওয়ারা প্রকাশনী
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ .

মহান আল্লাহ রহমান রাহীমের অসীম মেহেরবাণীতে আমাদের প্রাণপ্রিয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ ওস্তাদ কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে জ্ঞান গভীর ব্যক্তিত্ব উস্তাজুল আছাতেজা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব শরীফ মুহাম্মদ সোলায়মান আলহাছানী (মাঃ জিঃ আঃ) এর দীর্ঘ ১৭/১৮ বছরের সাধণা, গবেষণা ও প্রচেষ্টার সুফল নামাজের হাকিকত, দালায়েল ও মাসায়েল" শীর্ষক গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান স্তম্ভ ছালাত বা নামায বিষয়ক এধরণের দলিল প্রমাণ ও তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নাই। আমরা মনে করি নামায সম্পন্ধে এ গ্রন্থখানা লেখকের একটি অনন্য সাধারণ উপহার। সুপ্রিয় পাঠক সমাজ! আলোচ্য গ্রন্থখানা পাঠে জানতে পারবেন নামাজের হাক্বিকত তথা নিগুঢ় রহস্য, মাহাত্ম্য নামাযের ফজিলত– তাৎপর্য, তাহারাত বা পাক-নাপাকের জটিল-কঠিন মাসায়েলের দলিল ভিত্তিক সমাধান।

গ্রন্থাকারে প্রকাশনা জগতে এটা আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। অভিজ্ঞতায় আমরা আনাড়ী। তাই এ অমূল্য গ্রন্থকানা প্রকাশ করতে ভাষাগত ক্রুটি বিন্যাস মূলক প্রমাদ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। অধিকন্তু প্রিন্টিং মিস্টেক হওয়াও স্বাভাবিক। দালিলাদির এ'রাব তাশকিলে ভুল থাকতে পারে। তাই সচেতন পাঠকের যদি তেমন কিছু নজরে পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে প্রকাশ করব।

পরিশেষে শ্রদ্ধাভাজন লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রমের উত্তম প্রতিদিন, সুদীর্ঘ হায়াত ও আমাদের সার্বিক প্রয়াস কবুলের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা পেশ করছি। আমীন।

নিবেদক–

(মাওলানা) মোহাম্মদ দীদারুল হাছান রিজভী মিঞা।

(মাওলানা) আলহাজ্জ এনামুল হক শিকদার।

গ্রন্থকারের আরজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহীয়ান গরীয়ান পরম করুণাময় প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্যই সব প্রশংসা ও গুণগাণ।

নিখিলের নবী শাফীউল মুজনেবীন, রাহ্‌মাতুল্‌লিল আলামীন, মহামহিম প্রভু আল্লাহ তায়ালার মহান হাবীব (স)এর নূরানী চরণে অসংখ্য সশ্রদ্ধ ছালাত ও ছালাম নিবেদনের পর–

এটা আমরা সকলের জানা বিষয় যে, ছালাত বা নামায রূপ এবাদতই হচ্ছে ঈমানের পরে ইসলাম সৌধের প্রধানতম স্তম্ভ।

আলোচ্য নামাযের হাকীকত, দালায়েল ও মাসায়েল কিতাবখানা নামাযের যাবতীয় বিধানাবলীর তত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং নামায আদায়ের বিশুদ্ধ শরয়ী নিয়ম-পদ্ধতির বর্ণনা সম্বলিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ।

যুগে যুগে কালের বিভিন্ন অধ্যায়ে ছালাত (নামায) বিষয়ের উপর অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে। তবে ঐ সব গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই আরবী, ফার্সী কিংবা উর্দু ভাষাতেই রচিত।

বাংলা ভাষায় ও নামাযের মাসায়েল সংক্রান্ত অনেক পুস্তক, পুস্তিকা রচিত হয়েছে এবং এর দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম নর-নারীগণ বিশেষভাবে উপকৃত ও হয়েছেন।

কিন্তু বাংলা ভাষার ঐ সব পুস্তিকায় নামায আদায়ের মাসায়েলের বর্ণনা থাকলেও নামাযের রূহ-প্রাণ তথা নামাযের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, তত্ত্ব ও তাৎপর্যাবলী সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক আলোচনা যৎসামান্যই করা হয়েছে।

তাই আমার ছাত্র জীবনের সমাপ্তি লগ্ন থেকেই অন্তরে নামায বিষয়ে এ জাতীয় একখানা গ্রন্থের সংকলণ ও রচনা করার প্রবল আকাঙ্খা জাগে– যাতে একাধারে নামায আদায়ের সঠিক বিধান ও নিয়ম পদ্ধতি সমূহ বর্ণনার পাশাপাশি নামাযের প্রাণ তথা নামাযের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য, নামাযের নিয়ম-কানুন সমূহের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্যাবলী সম্পর্কে ও বর্ণনা থাকবে।

তদুপরি আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জমাতের আমল-নীতির আলোকে নামায বিষয়ের বিভিন্ন মাসায়েল সমূহের নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণ সহ বর্ণনা থাকবে।

যা-পাঠের দ্বারা একজন সাধারণ মুসলমান নামাযের গুরুত্ব-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতঃ নামাযের সুনির্ধারিত পন্থায় দাড়ান, উঠা-বসা- রুকু-ছজদা, তেলাওয়াত ও দোয়া-দরূদ ইত্যাদির গুরুত্ব ও তাৎপর্যাবলী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভে সঠিক ভাবে নামায আদায়ে সক্ষম হয়।

কোরআন হাদীস ও ফেকাহ্ সমর্থিত অনেক উত্তম আমল কে শুধুমাত্র জিদের বশবর্তি হয়ে চিন্তা-ফিকির না করে কিংবা স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ নাজায়েজ, মাকরূহ্ কিংবা বেদ্য়াত শিরিক রূপে আখ্যায়িত করতঃ সরলমনা মুসলমানদের আমল করার ক্ষেত্রে কেউ যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে তজ্জন্য আহলে ছুন্নাত ওয়াল জমাত সমর্থিত আমল সমূহের সপক্ষে সঠিক তথ্য ও দলীলাদির উপস্থাপনাও থাকবে।

মহান করুণাময় প্রভূ আল্লাহ্ তাআলার অফুরন্ত রহমতের বদৌলতে ১৯৭৬ইং সাল থেকে ঐ জাতীয় একটি পুস্তকের পান্ডুলিপি তৈরির কাজে আমি নিজেকে নিয়োজিত করি এবং মহান আল্লাহর অপার কৃপায় ১৯৭৮ইং সালে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পরই "নামাযের হাকীকাত ও মাসায়েল" নামে পুস্তক খানা প্রথম প্রকাশিত হয়।

কিন্তু একদিকে গ্রন্থখানা ছিল ক্ষুদ্র আকারের। তদুপরি দলিল প্রমাণের উল্লেখ ছিল অতি নগণ্য।

তাই ১৯৭৮ইং সালের পর থেকে ঐ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আরো বৃহদাকারে রূপ দেওয়ার এবং পুস্তক খানাকে তথ্য ও দলীল সমৃদ্ধ করার মহৎ মানসে এ অধম-গুনাহ্গারের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। সুদীর্ঘ প্রায় ১৮/১৯ বৎসরের অবিরাম সাধনার পর বিগত ১৯৯৭ইং সালের শেষ নাগাদ মহান দয়াময় প্রভূ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অপরিসীম মেহেরবাণীতে গ্রন্থখানার পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়।

মূলতঃ এজাতীয় গ্রন্থের সংকলণ ও সম্পাদনা করার মত এল্মী যোগ্যতা আমার নাই, ,সর্বোপরি বাংলা ভাষাজ্ঞানে আমি সম্পূর্ণই অপরিপক্ক।

তাই আমার অযোগ্যতার বিষয়টি আমি সকলের নিকট অকপটে স্বীকার করে যাচ্ছি।

পরম দয়াবান মেহেরবান প্রভূ আল্লাহ্ তাআলার অপার অপরিসীম করুনা,-

গুনাহ্গার উম্মাতের শাফায়াতকারী মহান নবী, হাবীবে খোদা, রাহমাতুললিল আলামীন ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াছাল্লামের নজরে রহমত,

আমার প্রাণ প্রিয় মুর্শিদ,বেলায়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র, যুগশ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামিল,রাহ্নুমায়ে শরীয়াত ও তরীকাত হযরতুল আল্লামা হাফেজক্বারী ছৈয়্যদ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ ছাহেব কেবলা (রঃ) এর অনুপম রূহানী ফয়জ বরকত, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতা ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় যার অবদান সকলের শীর্ষে, ঐ অনন্য সাধারণ অলিয়ে কামেল শর্ষীনার পীর সাহেব হযরতুল আল্লামা আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ্ (রঃ) সহ বিশ্বের অন্যান্য কামেল আউলিয়ায়ে কেরাম গণের রূহানী ফয়জ ও দোয়া, বিশেষতঃ আমার পরম শ্রদ্ধা ভাজন শিররত্ন উস্তাদ,বাংলাদেশের হক্কানী রাব্বানী ওলামা, ফোকাহা, মুহাদ্দিছ ও মুফাচ্ছির কুল শিরমণি, ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল, হযরতুল আল্লামা মুফ্তী মুজাফফর আহমদ ছাহেব কেবলা (রঃ) এবং আমার অন্যান্য শিরতাজ আছাতেজায়ে কেরাম গণের ইল্মী ফুয়ূজাত ও রূহানী দোয়া, আর আমার স্নেহময়ী মরহুমা আম্মাজান ও মরহুম আব্বাজানের দোয়াই-আমার একমাত্র যোগ্যতা এবং আমার এ মহতী প্রত্যাশা পুরণের একমাত্র ওয়াছীলা (মহান আল্লাহ তাআলা নিজ করুণা গুণে আমার পরম সম্মানিত উস্তাদগণ ও আমার স্নেহময়ী আম্মাজান ও আব্বাজানের সকল পাপ-গুণাকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দানে সম্মানিত করুন।)

বিশেষ কারণ বশতঃ পূর্বের "নামাযের হাকীকাত ও মাসায়েল" নামের সাথে "দালায়েল" শব্দটি সংযোজন করতঃ "নামাযের হাকীকত, দালায়েল ও মাসায়েল" নামে গ্রন্থখানার পুনঃ নামকরণ করা হল।

সম্মানিত পাঠকমন্ডলীর সুঅবগতির জন্য বলা হচ্ছে যে-অত্র গ্রন্থে মাসআলা বর্ণনা করার বেলায় যতদূর সম্ভব ইসলামী শরীয়ার নির্ভরযোগ্য ফতোওয়া ও মাসায়েলের মূলগ্রন্থ সমূহের সাথে মিলিয়ে বিশুদ্ধতা যাচাই কবতঃ গ্রন্থস্থ করা হয়েছে।

বিশেষ জরুরী ও মতভেদ জনিত মাসআলা সমূহ নির্ভর যোগ্য ফতোওয়া-মাসায়েল গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে,

আর সাধারণ মাসআলা সমূহ মূল ফতোওয়া-মাসায়েল গ্রন্থ সমূহের শুধু রেফারেন্স দিয়েই বর্ণনা করা হয়েছে।

কোন কোন বিষয় ও মাসআলা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় একাধিক দলীল রেফারেন্সের উল্লেখ দেওয়া হয়েছে-যার ফলে গ্রন্থখানার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ আধিক্য অনেক পাঠক মহোদয়ের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হতে পারে। সত্য সন্ধানী, সুধী ও জ্ঞান পিপাসু সম্মানিত পাঠক সমাজ নেক নিয়্যতে একটু সহিষ্ণু মনে গ্রন্থখানা পাঠ করে নিলে অধম কৃতার্থ হব।

মুজ্তাহিদ হযরাত ফোকাহায়ে কেরাম(রঃ) গণের বর্ণিত পাঁচ/দশাধিক মাসআলা সমুহ থেকে যথা সম্ভব সকলের ঐকমত্যীয় মাসআলা সমুহই অত্র গ্রন্থে আনার চেষ্ঠা করা হয়েছে।

তথাপি অত্র গ্রন্থে উল্লেখিত মুস্তাহাব ও মাক্রূহ (তান্জীহ) স্তরের কোন মাসআলার সাথে কোন বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়ের মতের মিল না হলে-সমালোচনায় লিপ্ত না হয়ে উনাদের স্ব স্ব তাহকীক্ ও সমঝ-বিবেচনা অনুযায়ী আমল করাটাই হবে বাঞ্চনীয়।

মূখ্যতঃ সাধারণ মুসলমান নর-নারীগণের হেদায়ত তথা সৎ পথ প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই অত্র গ্রন্থখানার সংকলন ও প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই অত্র গ্রন্থ খানা পাঠে তদনুযায়ী আমল করতঃ সাধারণ মুসলমান নর-নারী গণ উপকৃত হলে এবং মহান আল্লাহর দরবারে আমার এ সাধনা গৃহীত হলেই আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে মনে করব।

উপরন্ত এ গ্রন্থখানা ছুন্নী হযরাত ওলামায়ে কেরাম এবং বিজ্ঞজনদের ও অনেক উপকারে আসবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদি,

ভুল-ভ্রান্তি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়, তাই এ অধম ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে মোটেই মুক্ত নই।

সুতরাং ভাষাগত ক্রুটি, মাসআলা বর্ণনা ও উদ্ধৃতি সংকলনে অত্যাধিক সর্তকতা অবলম্বন সত্ত্বেও গ্রন্থখানায় ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান। তদুপরি প্রিন্টিং জনিত ভুল-ক্রুটিতো আছেই।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী অধমের ভুল-ভ্রান্তিসমূহকে ক্ষমা সহিষ্ণু দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন এ আমার একান্ত অনুরোধ। ভুল-ক্রুটি সম্পর্কে একটু কষ্ট স্বীকার করত ঃ অবহিত করলে উপকৃত হব, এবং আগামী সংস্করণে ইনশা আল্লাহ্ তায়ালা তা সংশোধন করে নেওয়া হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যশ, খ্যাতী ও লোকের প্রশংসা অর্জন ইত্যাদি মোটেই উদ্দেশ্য নয়– বরং গ্রন্থখানা পাঠে সরলমনা মুসলমান ভাই বোনেরা মহান আল্লাহ ও রাসূল (স) অভিপ্রেত পন্থায়- তরিকায় মহাপ্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শ্রেষ্ঠ এবাদত-নামায ও আনুষাঙ্গিক কিছু দ্বীনী বিধান আদায়ের সঠিক ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করত ঃ আমলের দ্বারা নিজেরা ধন্য হবেন এবং ইহকাল-পরকালে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পরম রোজমন্দি-সন্তুষ্টি পাওয়ার মহান লক্ষ্যেই আমার এ নগন্য সাধনা ও প্রয়াস।

সম্মানিত পাঠক মণ্ডলীর খেদমতে আরজ,

গ্রন্থখানা পাঠে উপকৃত হলে– এ অধম গুনাহগার বান্দার সর্ব প্রকারের পাপ ও ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমার জন্য, আমার শ্রদ্ধাভাজন মরহুম আব্বা ও মরহুমা আম্মাজানের মাগফেরাত কামনায়, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ মুরব্বী আলহাজ্ব মরহুম নুরুল আমিন মিঞা এবং এ দ্বীনী ছদকায়ে জারীয়ার মহৎ প্রয়াস-সাধনাকে বাস্তবায়িত করার প্রথম উদ্যোক্তা আমার শ্রদ্ধাভাজন দ্বীনী ভাই আলহাজ্ব নুরুল হাছান মিঞা, ও স্নেহাসপদ দ্বীনী ভাই মাওলানা দীদারুল হাছান রিজভী মিঞার জন্য এবং যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য -সহযোগিতা দানে ছদকায়ে জারীয়ার এ মহতী কাজে শরীক-শামিল রয়েছেন– উনারা সকলের ইহকালীন-পরকালীন সার্বিক শান্তি, কল্যাণ, মুক্তি ও পাপ মার্জনার জন্য রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া-ফরিয়াদ করে যাবেন– এ আমার বিনীত অনুরোধ।

হে আমার পরম করুণাময় প্রভু আল্লাহ!

আপনার মহান দয়া ও মেহেরবাণী গুনে একমাত্র আপনার দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে এবং আপনারই সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কৃত এ শ্রম-সাধনা ও প্রয়াসকে কবুল করুন।

হে আমার মহান দয়াময় প্রভু আল্লাহ !

আমি আমার সীমিত সাধ্যানুযায়ী কুরআন ও হাদীসের আলোকে আপনার বান্দাদেরকে আপনার অনুপম শ্রেষ্ঠ এবাদত -নামায আদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার এবং আপনার দরবারে বাধ্য গোলামরূপে সকলকে এগিয়ে আনার চেষ্টা করেছি।

(اَلسَّعْىُ مِنِّىْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى) (আমার সীমিত সাধ্যানুপাতে চেষ্টা সাধনা করা হয়েছে।– একে আপনিই একমাত্র পূর্ণতা দানকারী কাদেরে মুতলাক সত্ত্বা।

হে মেহেরবান মাওলা!

এ গ্রন্থখানাকে সর্ব-সাধারণ-মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তুলুন এবং পুনঃপুনঃ ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে এ গ্রন্থখানাকে কেয়ামত অবধি চালু রাখার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা দান করুন।

হে রহমানুর রাহিম আল্লাহ!

এ অধম বান্দাকে এবং এ মহতী কাজে সহায়তা সহযোগিতা প্রদানকারী সকলকে এ দুনিয়ায় ঈমান আমল ঠিক রেখে, দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দানের কাজে নিয়োজিত রেখে, সু-স্বাস্থ্যপুর্ণ শান্তি ও ইজ্জতের সুদীর্ঘ ঈমানী জীবন দান করুন।

আর এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে ঈমান হরণের শয়তানী হামলা থেকে রক্ষা করত ঃ ঈমানের উপর স্থির রাখুন।

পরকাল জীবনে আপনার মাকবুল-প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিয়ে প্রভু আপনার করুণা ছায়ায় আশ্রয়দান করুন। সাথে সাথে আপনার প্রিয় হাবীব আকাও মওলা রাসূল আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র নূরানী চরণ তলে গোলামরূপে ছাহারা দান করুন– জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত রেখে আপনার রেজামন্দি ও দীদারসহ জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

প্রভু আল্লাহ! আপনার মহান দরবারে চরম সীমার কাকুতি মিনতীপূর্ণ এ আমার শেষ নিবেদন– আমীন !

ইয়া আরহামার রাহেমীন

বিহুরমাতি জ্বাতিকাল আজীম ওয়া বিহুরমাতি রাহমাতিল লিল আলামীন শাফীয়িল মুজনেবীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয় আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া ছাল্লামা।

জুমাবার, ২১ শে রামাদানুল মুবারক — বিনীত
১৪২২ হিজরী — শরীফ মুহাম্মদ সোলায়মান আল হাছানী
৭ই ডিসেম্বর ২০০১ ইং সাল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গ্রন্থকার যাদের প্রতি কৃতজ্ঞ—

১৯৭৮ইং সাল থেকে ১৯৯৭ইং সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে আলোচ্যমান 'নামাজের হাকীকত, দালায়েল ও মাসায়েল" গ্রন্থখানার পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত এ নূতন সংস্করণের ক্ষেত্রে উলুমে নববী (স) এর অনন্য প্রস্রবণ, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিরতাজ উস্তাদ, হযরতুল আল্লামা মুফতী মুজাফফর আহমদ সাহেব কেবলা (র) এর যে মহান অবদান রয়েছে তা অনস্বীকার্য ও অবিস্মরণীয়। তাই অধম ঐ অনন্য সাধারন জ্ঞান সাধক উস্তাদ মুহাতারাম (র) এর পবিত্র চরণে চির কৃতজ্ঞ ও চির ঋণী।

এছাড়া চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসার বর্তমান সুযোগ্য শ্রদ্ধাভাজন প্রিন্সিপ্যাল, দেশের প্রখ্যাত হক্কানী বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব ছাখাওয়ত হোছাইন সাহেব (মঃ জিঃ আঃ) গ্রন্থ খানার (১৯৭৮ ইং সালের) প্রথম ও বর্তমান উভয় সংস্করণের ক্ষেত্রে যে মূল্যবান পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা দান করেছেন তা অতুলনীয়– উনার এ অবদানের জন্য আমি উনার প্রতি বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা পেশ করছি।

তাছাড়া চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসার সুযোগ্য প্রথম মোহাদ্দেস, খ্যাতনামা মুহাক্কিক আলেমে দ্বীন, সুযোগ্য মুনাজেরে আহলে ছুন্নাত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব রফিক উদ্দিন সাহেব (মাঃ জিঃ আঃ), প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও ইসলামী চিন্তাবিদ, ছুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক, চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া মাদরাসার সুযোগ্য মুহাদ্দিছ হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব জয়নুল আবেদীন যোবাইর সাহেব (মাঃ জিঃ আঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসায়েলের বিজ্ঞজনোচিৎ সমাধান ও সৎ পরামর্শ দান করত ঃ যে বিশেষ আন্তরিকতা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন তা অনস্বীকার্য। আমি এ মহতী অবদানের জন্য উনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ পেশ করছি।

নেছারিয়া আলিয়া মাদরাসার সুযোগ্য মুহাদ্দিছ খ্যাত নামা ইসলামী চিন্তাবিদ, আহলে ছুন্নাত ওয়াল-জমাতের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, জনাব আল্লামা আলহাজ্ব এনামুল হক শিকদার সাহেব (জীঃ উঃ) অতীশয় কষ্ট স্বীকার করতঃ গ্রন্থখানার প্রুফ দেখার মত দুরূহ কাজে মূল্যবাণ সময় ব্যয় করে যে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়েছেন– তা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চট্টগ্রাম নাজিরহাট জামেয়া আহমদিয়া মিল্লিয়ার সুযোগ্য প্রথম মুহাদ্দিছ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আমার প্রাণ প্রিয় স্নেহের ছাত্র জনাব আল্লামা আবদুচ্ছালাম শরীফী সাহেব এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে যে আন্তরিক সহযোগিতা দান করেছেন তা অতুলনীয়।

চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া মাদরাসার সাবেক মুহাদ্দিছ সকলের মান্যবর মুরব্বী হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মিশকাত উদ্দিন সাহেব (মঃ জিঃ আ) ও চট্টগ্রাম নেছারিয়া আলিয়া মাদরাসার সুযোগ্য সম্মানিত আছাতেজায়ে কেরামসহ দেশের অনেক বিজ্ঞ খ্যাতনামা ছুন্নী ওলামায়ে ইজাম, বিভিন্ন মাসজিদের সম্মানিত খতীব ও ইমাম সাহেবগণ গ্রন্থখানাকে সুন্দর ও তথ্য সমৃদ্ধ করার জন্য সময়ে সময়ে আন্তরিকতার সাথে সৎপরামর্শাবলী দানে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এর জন্য অধম উনারা সকলের প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৯৭ ইং সালে গ্রন্থখানার এ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নুতন সংস্করণের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে পৌছলে তখন গ্রন্থখানা ছাপানোর বিষয়টি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়– কারণ এ নগন্যের অর্থ ও ধন-সম্পদের সঞ্চয়ের পরিমাণ হচ্ছে শূন্যের কোঠায়, যেকারণে এর ব্যয় ভার বহন করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

তাই আমি আমার সুপরিচিত অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী ধনাঢ্য বন্ধু মহল, প্রকাশনা সংস্থার মালিক ও সুপরিচিত ধনবান লোকদের দুয়ারে দুয়ারে গ্রন্থখানা ছাপানোর ব্যাপারে সহায়তা পাওয়ার আশায় ধরনা দিতে থাকি।

কিন্তু কারো পক্ষ থেকে তেমন কোন সাড়া না পাওয়াতে মাঝ পথে এক/দেড় বৎসর ঝিমিয়ে পড়ি, উৎসাহ হারিয়ে ফেলি, আর মহান করুনাময় মাওলা মুগনীর পবিত্র দরবারে এ নিয়ে অহরহ কাঁদতে থাকি।

করুনাময় প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অতুলনীয় কৃপায় আমার এ চরম হতাশা ও নৈরাশ্যতার মুহূর্তে একমাত্র মহান আল্লাহ-রাছুলের রেজামন্দি অর্জন উদ্দেশ্যে ও তাদের শ্রদ্ধাস্পদ আব্বাজান মরহুমের মাগফেরাত কামনায়– যে মহৎ প্রাণ ভ্রাতৃদ্বয় গ্রন্থখানা ছাপানোর ব্যাপারে সর্বাগ্রে পুন্যময় আর্থিক উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন তারা হচ্ছেন— পাহাড়তলী এলাকাস্থ চট্টগ্রামের স্বনামধন্য ধর্মপ্রাণ ও দানবীর জমিদার আলহাজ্ব আবদুল আলি মরহুমের সুযোগ্য পৌত্র, নিবেদিত প্রাণ সমাজ সেবী, রাসূল প্রেমিক, ধর্মপরায়ন ব্যক্তিত্ব মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল আমিন মিঞার সুযোগ্য আমেরিকা প্রবাসী ছেলে, বিশেষ ধর্মানুরাগী বাংলাদেশের কৃতি সন্তান আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল হাছান মিঞা এবং তারই ছোট ভাই আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশের কৃতি সন্তান আমার প্রাণপ্রিয় স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ দীদারুল হাছান রিজভী মিঞা।

এঁদের সাথে জনাব মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুল আমিন মিঞার সুযোগ্য কৃতি সন্তান জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুল বশর মিঞা, জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ নূরুল আবছার মিঞা, জনাব মুহাম্মদ নূর সেলিম মিঞা, জনাব আলহাজ মুহাম্মদ নূরুল আজিম মিঞা, জনাব মুহাম্মদ মুস্তফা হারুণ মিঞা সহ আমার সুদীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ দ্বীনী প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ছদকায়ে জারীয়া মুলক এ মহাপূন্য কর্মে আন্তরিক সার্বিক সহায়তা-সহযোগিতায় এগিয়ে না আসলে আমার এ মহতী দ্বীনি সাধনা ও প্রয়াস বাস্তবায়িত হত কিনা মহান আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। স্নেহাস্পদ নুরুল হাছান মিঞা ও দীদারুল হাছান রিজভী মিঞাসহ তারা সকলের এ অবদানের কথা চির স্মরণীয় ও চির ভাস্বর হয়ে থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ তায়ালা।

ছদকায়ে জারীয়ার এ পূণ্যকীর্তি মূলক অবদানের জন্য আমি উনাদের সকলের নিকট চির কৃতজ্ঞ ও চির ঋনী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এছাড়া জনাব আবদুল আলি মরহুমের পৌত্র জনাব মুহাম্মদ রাজ্জাক আলি মিঞা, আমার স্নেহভাজন ছাত্র, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মুছা মিঞা এবং আমার সম্মানিত ভায়রাভাই বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব ও অত্র এলাকার কৃতি সন্তান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমার বিশেষ স্নেহভাজন জনাব নুরুল আলম (নুরু) কন্ট্রাক্টর সাহেব প্রমুখ ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণের এ গ্রন্থখানা প্রকাশের ব্যাপারে আন্তরিক ও আর্থিক সহযোগিতা অনস্বীকার্য, এরজন্য আমি উনাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

এবং অত্র পাহাড়তলী এলাকার কৃতি সন্তান বিজয় স্মরণী ডিগ্রী কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, ঢাকার খ্যাতীমান মিল্লাত প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক সুসাহিত্যিক জনাব আলী হায়দার খান ও মিল্লাত ডিজাইন এর পরিচালক অনন্য গ্রাফিক্স ডিজাইনার অলিউর রহমান, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র অধ্যাপক আবদুল মালেক প্রমুখ অত্যন্ত আন্তরিকতা, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে গ্রন্থখানার কম্পিউটার কম্পোজ ও ছাপানোর অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সব বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করতঃ গ্রন্থখানা প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তা ভুলা যাবে না।

উল্লেখিত সহায়তাকারী সকল গুণীজনদের সর্বপ্রকারের আর্থিক-কায়িক-আন্তরিক সহায়তা-সহযোগিতা মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু নিজ করুনা গুণে কবুল করে নিন এবং প্রত্যেককে দুনিয়াবী জীবনের সর্বপ্রকারের কল্যাণ-শান্তি, সমৃদ্ধি-উন্নতি ও সুস্থতাপুর্ণ মর্যাদাশীল সুদীর্ঘ ঈমানী জীবন দান করুন এবং আখেরাত জীবনে রব্বুল আলামীন ইনাদেরকে স্বীয় প্রিয় বান্দা হিসাবে ও প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ও য়াছাল্লামের প্রিয় উম্মাতরূপে কবুল করতঃ জাহান্নামের গজব-আজাব থেকে নাজাত দিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউস দানে কামিয়াব করুণ–

রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ আমার সবিনয় সার্বক্ষণিক আকুল প্রার্থনা।

বিনীত

গ্রন্থকার

নামাযের হাকীকত, দালায়েল ও মাসায়েল

বিষয় — পৃ. নং

প্রথম খন্ড

বিষয়	পৃ. নং
ক. ফেকাহ্ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।	১
খ. ফেকাহ্ শাস্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা।	২
গ. মায্‌যাব কি ও কেন ?	৩
ঘ. আমরা কেন হানফী মায্‌হাবের অনুসরণ করি।	৮
ঙ. আহ্‌কামে শরীয়ার প্রকারভেদ ও পরিচিতি।	১০

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ :	নামায শব্দের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ।	১৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	নামায সম্পর্কে ইসলামের বিধান।	২৪
	নামাযের ফাজায়েল।	৩১
	নামায আদায় না করার পরিণতি	৩৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	হাশর দিবসে বিচারের সময় মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে বেনামাযির কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।	৪৩
	পাপ-গুণাহ মোচনের ক্ষেত্রে নামাযের ভূমিকা।	৪৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার তাৎপর্য।	৫১
	দৈনিক ফরয নামায আদায়ের জন্য (১) ফজর (২) যোহর (৩) আছর (৪) মাগরিব ও (৫) এশা –এ পাঁচ ওয়াক্তকে সুনির্দিষ্ট করার তাৎপর্য।	৫৫
	নামাযের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সমুদয় নিয়ম বিধানাবলীর তাৎপর্য।	৬৬
	নামাযের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য।	৭৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	নামাযই আত্মার প্রশান্তি আনে।	৮২
	নামায আদায় করাটাই হচ্ছে আল্লাহ-রাছুল প্রেমিক হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।	৮৫
	জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জাগতিক উপকারিতা।	৯৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	নামায ও বিশ্ব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শান ও মান।	৯৮

দ্বিতীয় খন্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ :	তাহারত-পাক-পবিত্রতার বিবরণ এবং নাজাসাতের প্রকারভেদ, হুকুম ও পাক-পরিষ্কারের নিয়ম।	১১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	গোছল ও ওযুর আলোচনা।	১২৮
	গোছলের নিয়ম	১৩১
	মিছ্‌ওয়াকের মাছায়েল।	১৩৩
	ওযুর বর্ণনা, ওযু করার নিয়ম, ওযু ভঙ্গের কারণ।	১৩৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়		পৃ. নং

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	তায়াম্মুমের মাছায়েল।	১৪৯
	তায়াম্মুম করার নিয়ম তায়াম্মুত ভঙ্গের কারণ,	১৫৩
	ওযু, তায়াম্মুমের জন্য পানি ও পাক মাটি না পাওয়া অবস্থার হুকুম।	১৫৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	জানাবত (যৌন সম্পর্কিত নাপাকী), হায়েজ নেফাছ সম্পর্কিত নাপাকী এবং ওযু না থাকা অবস্থায় যে যে কাজ করা হারাম ও যা যা করা জায়েয-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।	১৫৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	মল-মূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে পালনীয় বিধানাবলী।	১৬২
	ইস্তিঞ্জা (শৌচকাজ)-এর নিয়মাবলী।	১৬৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	হায়েজ ও নেফাছের মাছায়েল	১৬৮
	ইস্তেহাজার মাছায়েল।	১৭২
সপ্তম পরিচ্ছেদ :	পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ সমূহের বর্ণনা।	১৭২

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ :	নামাযের প্রকারভেদ।	১৭৭
	নামাযের ওয়াক্তের বিবরণ।	১৮১
	নামায আদায়ের হারাম ও মাকরূহ সময়ের বর্ণনা।	১৯০
	মেরু অঞ্চলের নামাযের হুকুম।	১৯৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	আযান ও একামতের মাছায়েল,	১৯৮
	আযানের ফাযায়েল	১৯৯
	আযান দেওয়ার নিয়ম।	২০৩
	আযান শেষের দোয়া ও দরূদ শরীফ	২০৬
	আযানের জবাব দান প্রসঙ্গ।	২০৯
	আযানের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করার প্রসঙ্গ	২১২
	জুমআর আযানের জবাব দান প্রসঙ্গ।	২১৫
	আযানে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নাম মোবারক শ্রবণকালে চুমু দেওয়ার মাছায়েল।	২২০
	একামতের মাছায়েল।	২৩১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	নামাযের ফরয সম্পর্কীয় আলোচনা।	২৩৩
	নামাযের শর্ত সমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা।	২৩৭
	নামাযের রুকন (ভিতরের ফরয কাজ) সমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা।	২৫২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	নামাযের ওয়াজিব কাজ সমূহের বিবরণ।	২৬২
	ছাহু সিজদার মাছায়েল।	২৬৭
	তিলাওয়তে সিজদার মাছায়েল।	২৭৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	নামাযের ছুন্নাত কাজ সমূহের বিবরণ।	২৭৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	দরূদ-ছালামের ফজায়েল ও মাছায়েল।	২৮১

বিষয়		পৃ. নং

	আযানের পূর্বে ছালাত-ছালাম পাঠের আলোচনা।	২৯৫
	বড় আওয়াজে ও সম্মিলিতভাবে দরূদ-ছালাম পাঠ করা প্রসঙ্গ।	৩০৭
	দরূদ-ছালাম পাঠের আদাব (নিয়মাবলী)।	৩০৮
	প্রিয় নবী (দঃ)-এর পূর্বে "ছৈয়্যিদুনা" "মাওলানা" ইত্যাদি শব্দাবলী যোগ করা এবং ছালাত এর সাথে ছালামকেও যোগ করে পাঠ করা প্রসঙ্গ।	৩০৯
	হাদীছ শরীফের আলোকে দরূদ-ছালাম পাঠের ফজিলত।	৩১৫
	কয়েকটি মু'তাবার দরূদ শরীফের বর্ণনা।	৩২৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ :	নামাযের মুস্তাহাব কাজ সমূহ।	৩৩৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ :	নামায আদায়ের সাধারণ নিয়ম	৩৩৪
নবম পরিচ্ছেদ :	ছালাম ফিরানোর পরক্ষণে মাছনুন দোয়া ও জিকির।	৩৪৫
	নামায শেষে দোয়া-মুনাজাতের মাছায়েল।	৩৪৮
	দোয়া-মুনাজাতের নিয়মাবলী ও কোরআন হাদীসের কিছু দোয়া-মুনাজাত।	৩৬০
দশম পরিচ্ছেদ :	নামায ভঙ্গের কারণসমূহের বর্ণনা।	৩৬৯
	নামাযে মাকরূহ কাজ সমূহ।	৩৭৮

তৃতীয় অধ্যায়

দশম পরিচ্ছেদ :	জামা'ত সকারে নামায আদায়ের ফাজায়েল ও মাছায়েল।	৩৮১
	জামা'তের নামাযে মুক্তাদির প্রকারভেদ।	৩৯১
	নামাযরত অবস্থায় হাদ্‌স (ওযু ভঙ্গ) হওয়া ও "বেনা" করার আহ্‌কাম।	৩৯৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	মহিলাদের মাসজিদে গমন ও জামা'তের সাথে নামায আদায় প্রসঙ্গ।	৩৯৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	কাযা নামায আদায়ের মাছায়েল।	৪১৩

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ :	জুমআর নামাযের ফাজায়েল ও মাছায়েল।	৪১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	মাছজিদের আহ্‌কাম (বিধি-বিধান)।	৪৩১

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যু সম্পর্কিত বিধানাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ :	মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তির আহকাম।	৪৫১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	গোছল দান ও কাফন পরানোর নিয়মাবলী।	৪৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	জানাযার নামায আদায়ের মাছায়েল।	৪৬৫
	বার বার জানাযার নামায আদায় প্রসঙ্গ	৪৮৭
	গায়েবানা জানাযার নামায আদায় প্রসঙ্গ	৪৯০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	কবর খননের নিয়ম, দাফনের নিয়ম।	৪৯৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	তালকিনের মাছায়েল, তালকিন করার নিয়ম।	৫০০

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়		পৃ. নং
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ	মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফেরাতের উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত ও মুনাজাত করার মাছায়েল।	৫০৫
	মৃত্যু প্রাপ্ত লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।	৫০৮
	কবর যেয়ারত, কবর যেয়ারতের নিয়ম।	৫১০
	ঈছালে ছাওয়াব অর্থাৎ ছাওয়াব পূন্য পৌছানোর ব্যবস্থা প্রসঙ্গ....	৫২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	মুছাফিরের নামায আদায়ের মাছায়েল।	৫২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	অসুস্থ লোকের নামায আদায়ের মাছায়েল।	৫৩২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	যানবাহনে নামায আদায়ের মাছায়েল।	৫৩৫

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	বিতিরের নামায আদায়ের মাছায়েল।	৫৩৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	দু'ঈদের ফাজায়েল ও মাছায়েল।	৫৪১
	ঈদের নামায আদায়ের নিয়ম।	৫৪৬
	ঈদের নামায সম্পর্কিত বিবিধ মাসয়ালা	৫৪৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	তাকবীরে তাশরীক্ এর আহ্‌কাম।	৫৫০

অষ্টম অধ্যায়

বিভিন্ন ছুন্নত-নফল নামায সমূহের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ	নফল নামাযের ফাজায়েল	৫৫২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	সুন্নাত-নফল নামাযসমূহ আদায়ের স্থান।	৫৫৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ	জমাত সহকারে নফল নামায আদায় প্রসঙ্গ।	৫৫৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ	তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহিয়্যাতুল মাছজিদের নামায।	৫৬২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ	তারাবীর নামাযের মাছায়েল।	৫৬৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ	তাহাজ্জুদের নামায।	৫৬৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ	এশরাক ও দোহা (চাশত্) এর নামায।	৫৭৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ	ছালাতুল্ আউওয়াবীন।	৫৮১
নবম পরিচ্ছেদ ঃ	ছালাতুত্ তাছ্‌বীহ্-এর মাছায়েল।	৫৮৩
দশম পরিচ্ছেদ ঃ	ছালাতুত তাওবা (তাওবা এর নামায)	৫৮৬
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ	কাযায়ে হাজত (মাক্‌ছুদ পূর্ণ হওয়ার)-এর নামায।	৫৮৮
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ	ইস্তেখারার নামায	৫৯২
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ	লাইলাতুল্ বারাআত ও লাইলাতুল কাদারের ফাজায়েল ও মাছায়েল।	৫৯৫
	লাইলাতুল্ বারাআত ও লাইলাতুল্ কাদারে করণীয় ও পালনীয় আমলসমূহ।	৬০২

ফেকাহ্ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

যেহেতু ইহা একখানা ফেকাহ বিষয়ক গ্রন্থ, তাই সর্বাগ্রে ফেকাহ বিষয়ে কিছু অবগতি লাভ করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য একান্ত কল্যাণকর।

✪ ফেকাহ (فقه) একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– জানা, অবহিত ও জ্ঞাত হওয়া ইত্যাদি।

শরীয়াতের পরিভাষায়–

اَلْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ (اَلْعَمَلِيَّةِ) اَلْمُكْتَسَبُ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ (دُرَّالْمُخْتَارِ - اَلتَّعْرِيْفَاتُ لِلْجُرْجَانِيْ)

অর্থঃ শরীয়াতের বিস্তারিত প্রমাণাদি (কোরআন, হাদীস, ইজ্‌মা ও কেয়াস তথা দলীল চতুষ্ঠয়) থেকে আমলী শরীয়াতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ইলমে ফেকাহ বলা হয়।

বিশ্বখ্যাত ইমাম কামাল উদ্দীন ইব্‌নুল হুমাম (রঃ) বলেন–

هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ -

অর্থঃ শরীয়াতের অকাট্য বিধি-বিধানের নিশ্চিৎ জ্ঞাত হওয়াকে শরীয়াতের পরিভাষায় কেফাহ্ বলা হয়।

সারকথা ঃ সুবিন্যস্ত ইসলামী বিধি–বিধান ও আইন-কানুনকে শরীয়াতের পরিভাষায় ফেকাহ বলা হয়।

◆ **বিষয় বস্তু/আলোচ্য বিষয় ঃ**

একজন মুকাল্লাফ তথা বালেগ ও হুশজ্ঞান সম্পন্ন লোকের আমল (কর্মই) হল এলমে ফেকাহ এর আলোচ্য বিষয় তথা বিষয় বস্তু, অর্থাৎ আমল-কর্মটি কোন্ পর্যায়ের–ফরয কি ওয়াজিব, ছুন্নাত কি-নফল, হালাল–কি হারাম ও মুবাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে ফেকাহ্ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

◆ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ এলমে ফেকাহ্‌র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল ঃ

اَلْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ

অর্থাৎ ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের কামিয়াবী ও সফলতা অর্জন করা। দুনিয়াবী জীবনের কামিয়াবী হল হুকূকুল্লাহ ও হুকুকুল এবাদ (আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের হক) সম্পর্কে অবগতি লাভ করতঃ তদানুযায়ী আমল করা। আর আখেরাত জীবনের কামিয়াবী হল, মহান আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় রাসূল (দঃ)-এর সন্তুষ্টি ও দীদার সহ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করাই হচ্ছে এলমে ফেকাহ্‌র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

✿ ফেকাহ্ শাস্ত্রের সর্ববাদী মূল উৎস হচ্ছে– (১) কোরআন করিম, (২) হাদীস শরীফ, (৩) ইজমায়ে উম্মত ও (৪) কেয়াস।

✿ একজন মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক। যেমন–১. আকায়েদী (বিশ্বাস্য কর্মকান্ড) ২. এবাদত– (উপাসনা মূলক যাবতীয় কার্যক্রম) ৩.মু'আমালাত (বৈষয়িক লেনদেন তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড) ৪. মু'আশারাত (পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলী) ৫. উকূবাত (অপরাধের শাস্তি বিধানমূলক বিধানাবলী) ও ৬. আদাব-আখলাক ইত্যাদি বিষয়সমূহ ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

◆ **ফেকাহ্ (দ্বীনিয়াত) শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ**

প্রত্যেক মুসলমানের নিকট সাধারণভাবে জীবন যাপনের প্রয়োজন মাফিক ইসলামী শরীয়াত-ফেকাহ্‌র প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

একারণে ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে ফেকাহ্ (দ্বীনিয়াত)-এর শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মুসলিম উম্মাহর মহান মুজতাহিদ ইমামগণ এ বিষয়ের উপর ঐকমত্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মাফিক এলমে ফিকাহ্ (দ্বীনিয়াত জ্ঞান) শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং এ ফিকাহ্ বিষয়ে বুৎপত্তি ও পান্ডিত্য অর্জন করাটা হল ফরযে কেফায়া।

◆ **'ফেকাহ্ শাস্ত্রের' পর্যায়ক্রমিক বিকাশ ও সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিকথা ঃ**

শ্রদ্ধেয় পাঠক,

ইহা সকলেরই জানা বিষয় যে, আমরা বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই হানাফী মাযহাবের অনুসরণে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-বিধান পালন করে থাকি।

কিন্তু আমাদের এমন অনেক ভায়েরা রয়েছেন-যাদের কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলতে পারেন না যে, তিনি হানফী মাযহাবের অনুসারী। অথচ নিজেদের অনুসৃত ধর্ম ও মাযহাব ইত্যাদি সম্পর্কে নিজেদের জানা থাকা ফরয।

তাই প্রত্যেকের অনুসরণীয় মাযহাব ইত্যাদি সম্পর্কে অন্ততঃ যৎ সামান্য অবগত হওয়া যাবে, এ লক্ষ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে,

✿ মহা-মহিম স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পবিত্র কোরআন এবং নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ সমূহে বর্ণিত আদেশ-নিষেধাবলীর নামই হল "ইসলামী শরীয়াত।"

আর কোরআান-হাদীছে বর্ণিত ঐসব আদেশ-নিষেধাবলীর মূল সূত্র সমূহের বিন্যাস ও ব্যাখ্যার নামই হচ্ছে "ফেকাহ" এবং সে ফেকাহ্ নীতি ও বিধান অনুসারে মুসলিম মিল্লাতের দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত হয়ে থাকে।

সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত্ব ও রাছুলে আকরাম (স) প্রদর্শিত ঐ নীতিসমূহকে বিশ্বাস করতঃ পালন করার নামই হচ্ছে 'ইবাদত"।

✿ রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্র বর্তমানের প্রচলিত ধারায় লিপিবদ্ধ ছিল না। যেহেতু এলাকা ও লোক সংখ্যা ছিল সীমিত এবং সে আমলের সামাজিক জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে ও সহজ-সরল।

ছাহাবায়ে কেরাম (রা) প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সরাসরি অনুসরণ করেই জীবন পরিচালনা করতেন। এভাবে দশম হিজরী পর্যন্ত জীবন পরিচালনার যাবতীয় ব্যাপারে সরাসরি নবী আকরাম (স)-এর সাথেই সম্পৃক্ততা ছিল। নতুন কোন সমস্যা দেখা দিলে আল্লাহর নবী (স) তা সমাধা করে দিতেন কিংবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআনী বিধান নাযিলের মাধ্যমে তা নিরসণ করে দিতেন। তাই ঐ সময় স্বতন্ত্রভাবে ফেকাহ শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

পরবর্তীতে ছাহাবায়ে কেরাম (রা) ও তাবেয়ীন (রঃ)-এর যুগে ইসলামের বিজয় অভিযান দিকে দিকে পরিচালিত হতে থাকলে নতুন নতুন দেশ ও জনপদ ইসলামী শাসনের আওতাভুক্ত হতে থাকে। এতে করে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ইসলামের আলোক-রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলামের এ ব্যাপক প্রসার এবং দুনিয়ার বিভিন্ন সভ্যতা-সাংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে নিত্য-নতুন সমস্যাবলী দেখা দেওয়া শুরু করে। ইসলামের সহজ-সরল তাহজীব-তামাদ্দুনের মোকাবেলায় পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা-সাংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে নতুন পরিস্থিতি ও সংকট সৃষ্টি করতেই থাকে।

এধরনের পরিস্থিতিতে ঐ বিশাল জনগোষ্ঠির দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হওয়াটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যার সমাধান একটি সুবিন্যস্থ, সুচিন্তিত, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগি আইন-বিধি ব্যতীত মোটেই সম্ভবপর ছিল না।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রথম দু'রাষ্ট্র প্রধান-রাছুল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শ্রেষ্ঠতম ছাহাবী হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা) ও হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর শাসনামলে মুসলিম উম্মাহ ছিল সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ একটি জাতি। পরস্পরের মধ্যে ছিল না বিশেষ কোন বিভেদ ও মতপার্থক্য। নগন্য ধরণের মতপার্থক্য কোথাও থাকলেও তা ছিল নিতান্ত ব্যক্তি পর্যায়ের, বুনিয়াদী বিষয়ে উনাদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না বললেই চলে।

তৃতীয় রাষ্ট্র প্রধান হযরত ওছমান যিন্নুরাইন (রা) এর শাসনামলে রাজনৈতিক ও গোষ্ঠিগত কোন্দলের সূত্রপাত হয়ে ক্রমান্বয়ে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। হযরত শেরে খোদা আলী মুরতাজা (রা) এর শাসনকালে তা রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে রূপান্তর লাভ করে।

ঐ সুযোগেই ইসলামের কুখ্যাত বাতেল পন্থী "খারেজীদলের" উদ্ভব হয়-যাদের হাতে স্বয়ং শেরে খোদা হযরত আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন। পরিণতিতে খেলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই মুসলিম উম্মার মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভক্তির সাথে সাথে নতুন নতুন ধর্মীয় বাতেল দল-উপদলের সৃষ্টি প্রক্রিয়াও দ্রুত গতিতে চলতে থাকে।

খারেজী, শীআ, রাফেজী, কাদরীয়া, জবরীয়া, মু'তাজিলা ইত্যাদি পৃথক পৃথক বাতেল মতবাদে বিশ্বাসী অসংখ্য দল উপদলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সে নাজুক মুহূর্তে আহলে ছুন্নাত ওয়াল্ জামাতের অনুসারী তাবেয়ীনে ইজাম (রঃ) মুজতাহিদ ইমাম ও তৎকালীন হক্কানী ওলামায়ে কেরামগণের পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত বাতেলদের মোকাবিলায় কোরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ছাহাবায়ে কেরাম (রঃ)-এর অনুসৃত আক্বায়েদী নীতিমালাসমূহকে সুবিন্যস্ত করতঃ প্রচার-প্রসার করার ভীষণ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট তাবেয়ী ইসলামী বিশ্বের মহান ইমাম হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবেত (র) ইসলামী শরীয়াত- ফেকাহ্ বিষয়কে সুবিন্যস্ত ও বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন।

তাই তিনি বনি উমাইয়া শাসনের পতনের পর পরই ইসলামের তৎকালীন বিশিষ্ট ফকীহগণের সমন্বয়ে একটি বিশেষ "মাজলিস" গঠন করেন।

এভাবে তিনি বিশিষ্ট ফকীহগণের সহায়তায় সর্বপ্রথম ইসলামী আইন বিধি-বিধানাবলীর সংকলণ ও সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন।

এখান থেকেই শুরু হয় ইসলামী ফিকাহ তথা আইন ও বিধি-বিধানাবলীর সংকলন এবং সম্পাদনা প্রক্রিয়া।

এর পরপরই হযরত ইমাম মালেক (র), হযরত ইমাম শাফেয়ী (র), হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র), প্রমূখ মহা মনীষীগণ ইসলামী ফেকাহ্‌র বিন্যাস ও সংকলন কাজে আত্মনিয়োগ করতঃ ইসলামী আইন ও বিধি-বিধানাবলীর সংকলনকে পুর্ণাঙ্গতা দান করেন।

◆ মাযহাব কি ও কেন?

মাযহাব অর্থ চলার পথ-রাস্তা। ইসলামী শরীয়াত-ফেকাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার পথ-পদ্ধতিকে 'মাযহাব' বলা হয়।

ইসলামী শরীয়াতের মূল উৎস হল কোরআন ও ছুন্নাহ। প্রয়োজনীয়তার কারণে কোরআন ও হাদীসের পাশাপাশি ইসলামী শরীয়াতের অপর দু'টি উৎস-ইজমা ও কেয়াস -এর সাথে সংযোজিত হয়।

নির্ভেজাল ইসলামের মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী মুজতাহিদ ইমামগণ উল্লিখিত চারটি মূল-উৎসের উপর ভিত্তি করে কোরআন-হাদীছের বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্থ বিধানাবলীকে পদ্ধতিগতভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে সাজিয়েছেন মাত্র। শরীয়াতকে সাজানোর ক্ষেত্রে মহান মুজতাহিদ ইমামগণ নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়া কোন বিষয় যোগ কিংবা সংযোজন করেননি।

এ ভিত্তিতে মাযহাব তথা ফেকাহ পবিত্র কোরআন ছুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন কিছুই নয় বরং এ হল কুরআন ও ছুন্নাহর সার নির্যাস।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী,

ইসলামের গন্তব্যস্থল একটাই, তবে মানুষের রুচির ভিন্নতা বিবেচনায় আল্লাহ তাআলা মৌলিক বিষয়কে ঠিক রেখে ইসলামের গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য বিভিন্ন পথ-রাস্তা দান করেছেন। যাতে প্রত্যেকে স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী যে কোন একটি পথ-রাস্তা বেয়ে মূল গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে।

যেমনি ভাবে আমাদের পার্থিব জীবনের কোন গন্তব্যস্থলে গমন করার বেলায় বিভিন্ন রাস্তা রয়েছে। যেমন– স্থলপথ, নৌকা-স্টীমারের পথ, রেলপথ ও বিমান পথ ইত্যাদি, আমরা আমাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী এবং পারিপার্শ্বিক সুবিধা বিবেচনায় নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌছার ব্যাপারে এক একজন এক একপথে গমন করে থাকি।

এক্ষেত্রে আমরা কেউ তো এ প্রশ্ন উঠাইনা যে, এপথে না গিয়ে ঐ পথে যাওয়া হচ্ছে কেন? কিন্তু ইসলামী মাযহাবের ব্যাপারে আধুনিক পন্থী ভাইদেরকে এরূপ প্রশ্ন উত্তাপন করতে দেখা যায় যে, ইসলামে এত মাযহাব-এত মত কেন?

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরআন ও হাদীছের উদ্দেশ্য লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফলে আইম্মায়ে মুজতাহেদীন (রঃ)-এর পক্ষ থেকে কোরআন ও ছুন্নাহতে প্রদর্শিত বিধি-বিধানের বিন্যাস ও যাচায়ের ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্তের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।

এ রুচি ও দৃষ্টি ভঙ্গির ভিন্নতার ফলে ইসলামী মাযহাব একটি না হয়ে অনেক মাযহাবের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু সৃষ্ট এ মাযহাব সমূহের মধ্যে আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাত ভিত্তিক চারটি মাযহাবের উপরই সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের এজমা (ঐক্যমত) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এ চার মাযহাব হল- (১) হানাফী (২) মালেকী (৩) শাফেয়ী ও (৪) হাম্বলী।

✿ আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রথম মাযহাব হচ্ছে হানফী মাযহাব। ইসলামী বিশ্বের ইমামকুল শিরমণি বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা নু'মান বিন ছাবেত (রঃ)-এর প্রবর্তক।

জন্ম ঃ এক মতানুসারে কুফা নগরীতে ৭০ হিজরীতে কারো কারো মতে ৮০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্তেকাল ঃ ১৫০ হিজরীতে বাগদাদের কারাগারে তিনি ইন্তেকাল করেন।

✿ আহলে ছুন্নাত ওয়াল জমাতের দ্বিতীয় মাযহাব হচ্ছে মালেকী মাযহাব। হযরত ইমাম মালেক বিন আনাছ (রা) এ মাযহাবের প্রবর্তক।

জন্ম ঃ ৯৩ হিজরী।

ইন্তেকাল ঃ ১৭৯ হিজরী মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

✿ আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের তৃতীয় মাযহাব হচ্ছে শাফেয়ী মাযহাব। হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী (র) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক।

জন্ম ঃ ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাজা এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্তেকাল ঃ ২০৪ হিজরীতে মিসরে ইন্তেকাল করেন।

✿ আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের চতুর্থ মাযহাব হচ্ছে- হাম্বলী মাযহাব। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (র) এ মাযহাবের প্রবর্তক।

জন্ম ঃ ১১৬ হিঃ জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্তেকাল ঃ ২৪১ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

উল্লিখিত এ চার মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ করলে মূলতঃ কুরআন ও হাদীছেরই অনুসরণ করা প্রমাণিত হয়।

তাই উম্মাতে মুসলিমিনের জন্য উপরোক্ত চার মাযহাবের বাইরে পঞ্চম কোন মাযহাবের অনুসরণ করার অবকাশ নাই।

সম্মানিত বেরাদরানে ইসলাম!

আমাদেরকে সুনিশ্চিত ভাবে জেনে রাখতে হবে যে, কুরআন করিম ও হাদীছ শরীফ থেকে সরাসরি এর সঠিক মর্মার্থ উদ্ধার করতঃ তদানুযায়ী আমল তথা জীবন পরিচালনা করা সকল স্তরের মুসলমানের পক্ষে কখনো সম্ভবপর নয়।

আমাদের বর্তমানকালের আধুনিক পন্থী ধর্ম সম্পর্কে কিছু লেখা-পড়া জানা কতেক লোক বলে থাকে যে, মাযহাব ইত্যাদি মানা বা অনুসরণের প্রয়োজন কি? সরাসরি কোরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল করার মধ্যে অসুবিধা কি? এরা কথায় কথায় কোরআন পাক ও হাদীছ শরীফের কিছু মুখস্থ অংশ উচ্চারণের মাধ্যমে সর্বদা এ জাতীয় মনোভাবই জাহির করে থাকে।

আসলে ব্যাপারটাকে যত সহজ মনে করা হয়ে থাকে- তা ততটা সহজ নয়। বরং আমাদের পূর্ববর্তী মুজতাহিদ মহান ইমামগণ স্ব-স্ব গবেষণালব্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা ধর্মের যাবতীয় বিধনাবলীকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সহজ করে দিয়েছেন বলেই আমাদের নিকট শরীয়াতকে এতটা সহজ মনে হচ্ছে।

কারণ পবিত্র কোরআন-হাদীছের উদ্দেশ্য-মূলক সঠিক মর্মার্থ বের করতে হলে একজন লোককে আরবী ভাষায় বুৎপত্তি ও প্রগাঢ় পান্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি কোরআন পাকে উল্লিখিত শব্দমালার বিশ্লেষণ মূলক সঠিক অর্থ কোরআনী আয়াতের শানে নুযূল, অনুরূপ হাদীছ শরীফে বর্ণিত শব্দমালার বিশ্লেষণমূলক সঠিক অর্থ ও হাদীছ শরীফের শানে ওরূদ জানতে হবে।

উসূলে ফেকাহ্ তথা কোন্‌টি খাস, কোন্‌টি আম, কোন্‌টি মুজমাল, কোন্‌টি মুফাস্‌সার, কোন্‌টি মুহ্‌কাম, কোন্‌টি মুতাশাবিহ, কোন্‌টি নাছেখ এবং কোন্‌টি মানছুখ ইত্যাদি বিষয়ের প্রগাঢ় জ্ঞান থাকতে হবে।

অর্থাৎ যার নিকট থাকবে পুরা কোরআন পাকের উপরোল্লিখিত বিশেষ জ্ঞান এবং সাথে সাথে আরো জানা থাকতে হবে কোরআন করিমের তাফ্‌ছীর তথা সুক্ষাতিসুক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যাদানের যাবতীয় নীতিমালা, সবধরনের হাদীছ শরীফ সমূহের সনদগত বিশেষ জ্ঞান, মতন ও এর সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। তদুপরি তার নিকট থাকতে হবে "কিয়াস" তথা কোরআন হাদীসের মূল হুকুমের ইল্লাত (কারণ) উদ্ভূত বিষয়ে বিদ্যমান থাকলে এতেও উক্ত রকমের হুকুম (সিদ্ধান্ত) দানের বিশেষ যোগ্যতা।

সমাজের "ওরফ" তথা প্রচলিত রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে তাকে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে হবে। এছাড়া তাকে হতে হবে উন্নত মেধা ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী সিদ্ধান্ত প্রদান ও আইন-প্রণয়ন প্রতিভার স্ব-ভাবজাত গুণের অধিকারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লিখিত মানের জ্ঞানী-গুণী মুজ্তাহিদ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলেমই একমাত্র কোরআন-হাদীছ থেকে সরাসরি বিধি-বিধান ও মাছআলা উদ্ভাবন করতঃ নিজে নিজে আমল করতে পারেন। আর এরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে তার জন্য সরাসরি কোরআন-হাদীস থেকে মাছআলা বের করার কোন সুযোগ নেই। এধরনের-এ মানের জ্ঞানী-গুণী মনীষী-সাধারণ মুসলমানের মধ্যে তো দূরের কথা বরং লক্ষ লক্ষ আলেমের মাঝে একজনও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

তাই ছাহাবায়ে কেরাম (রা), তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন ও পরবর্তী শতকে এ জাতীয় জ্ঞানে গুণী মহা মনীষীদের যারা ইসলামী শরীয়াতকে সাজিয়ে আমরা সাধারণ মুসলমানদের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন তাদের উদ্ভাবিত ঐ মায্হাব সমূহের "তাক্লীদ" করা অর্থাৎ নিজেরা দলীল প্রমাণের অধিক খোজাখুজি না করে ঐ সমস্ত মহান মুজ্তাহিদ ইমামগণ কর্তৃক প্রদত্ত কোরআন-হাদীছের গবেষণা লব্ধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অভিমত সিদ্ধান্তসমূহকে বিশ্বাস করতঃ অনুসরণ করে যেতে মূলতঃ আমরা বাধ্য।

মুজ্তাহিদ আইম্মায়ে কেরামের মাযহাবসমূহকে উপেক্ষা করতঃ আমাদের ন্যায় স্বল্প জ্ঞানী লোকেরা যদি কোরআন-হাদীছের মনগড়া নিজেদের বুঝমত অর্থের উপর আমল করতে যাই-তাহলে গোমরাহীতে নিপতিত হওয়ার আশংকা সুনিশ্চিৎ।

গোমরাহী থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই মাযহাব চতুষ্ঠয়ের যে কোন একটি অনুসরণ করা আমাদের জন্য দ্বীনী ঈমানী কর্তব্য।

◆ আমরা কেন হানফী মাযহাবের অনুসরণ করি?

কারণ ইসলামী শরীয়াতের মাযহাব চতুষ্ঠয়ের মধ্যে হানফী মাযহাবই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু এর প্রবর্তক হযরত ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন ছাবেত (রঃ) হচ্ছেন-ইসলামের মুজ্তাহিদ ইমামকুল শিরমণি খাইরুল কুরুন তথা নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রশংসিত উৎকৃষ্ট যুগ অর্থাৎ৭০ কিংবা ৮০ হিজরীর ইসলামের ঐ সোনালী যুগেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এ ভিত্তিতে তিনি তাবেয়ীন কেরামের ঐ প্রশংসিত যুগের কোরআন-হাদীছ ও ইসলামী ফেকাহ্ বিষয়ের সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী যুগশ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ছিলেন। তাঁর ইজতেহাদী জীবনের সময়কাল ও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোবারক যমানা অধিক কাছাকাছি হওয়ার ফলে হাদীছ-ফেকাহ্র অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামগণের তুলনায় তাঁর বর্ণিত হাদীছ এবং ফেক্হী সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত, অধিক সহীহ, কল্যাণকর, নির্মল-নিখূত ও স্বচ্ছ হওয়াটাই ঈমানী বিবেকের সঠিক দাবি। এই গুণ বিশেষের কারনে তিনি ইসলামী বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীজনের সর্বজন স্বীকৃত মহান ইমামরূপে বিবেচিত, তিনি "ইমামে আযম" (মহান ইমাম) রূপে সারা বিশ্বে সুপরিচিতি লাভ করেছেন।

তিনি হচ্ছেন ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রথম মূলনীতি নির্ধারণকারী ফেকাহ্ শাস্ত্র সুবিন্যস্তকারী, প্রণয়ন ও সংকলণকারী মহান ব্যক্তিত্ব।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত তীক্ষ্ম মেধা ও বুদ্ধিমত্তা এবং স্বচ্ছ বিবেক শক্তি দ্বারা প্রতিটি কোরআনী আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীছে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তর্নিহিত মহান আল্লাহ, রাসূল অভিপ্রেত প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটন করতঃ তৎপরবর্তী ঈমানদার মুসলিমের জীবন পরিচালনার সঠিক ও নির্ভুল, সহজ-সরল পথ-পদ্ধতি সুবিন্যস্ত করে দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

এবং তার সম-সাময়িক ও পরবর্তীকালের মুহাদ্দেছীন ইজাম এবং মুজতাহিদ আইম্মায়ে কেরামের দু-একজন বাদে অন্যান্য সবাই তাঁর জ্ঞানের বিশালতা ও সিদ্ধান্তের সঠিকতার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। এমনকি তাঁর প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণকারী ও তাঁর মহা গুণ-জ্ঞানের বিষয়টি স্বীকার না করে পারেন নি।

তদুপরি এ মাযহাবের মাছআলা-মাছায়েলসমূহকে এভাবে সহজ ও সরল রূপে সুবিন্যস্থ করা হয়, যা পালন করার ব্যাপারটা সকল স্তরের লোকদের সাধ্য সামর্থের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ মাযহাবের উসূল তথা মৌলিক নীতিমালাসমূহ অত্যধিক ব্যাপক ও সব বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্ণ। ইহা পবিত্র কোরআন-হাদীছ নির্ভর, যুক্তি-বিবেক ও বিজ্ঞান সম্মত মায্হাব। এ কারণে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মুসলিম জনগণের নিকট এ মাযহাবই সর্বাধিক সমাদৃত।

এ আলোকে অত্র মাযহাবের অনুসরণের মধ্যেই আমাদের ইহকালীন- পরকালীন কল্যাণ-কামিয়াবী এবং আল্লাহ-রাছুলের অধিক সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহ্কামে শরীয়ার প্রকারভেদ ও পরিচিতি

ইসলামী শরীয়াতের বিধি-বিধানসমূহ প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–
১. مَامُوْرَاتٌ তথা আদেশ সূচক বিধি-বিধানসমূহ এবং
২. مَنْهِيَاتٌ তথা নিষেধমূলক বিধি-বিধানসমূহ।

✿ আদেশ সূচক বিধি-বিধানসমূহ আবার ৬ (ছয়) ভাগে বিভক্ত– (১) ফরয (২) ওয়াজিব (৩) ছুন্নাত (৪) মুস্তাহাব (মানদুব -নফল) (৫) মুস্তাহ্ছান ও (৬) খেলাফে আওলা।

✿ নিষেধমূলক বিধানাবলী– দু'প্রকার ঃ (১) হারাম ও (২) মাকরূহ। পুনঃ মাকরূহ দু'প্রকার– (ক) মাকরূহে তাহ্রীমী ও (খ) মাক্রূহে তান্জীহ।

আরেক দিক বিবেচনায় শরীয়াতের বিধানসমূহ দু'প্রকারঃ (ক) হালাল (বৈধ) ও (খ) হারাম (অবৈধ) এবং (৩) মোবাহ।

◆ **আদেশমূলক বিধানসমূহ ঃ**

✿ **ফরয ঃ** যে আদেশ (পালনীয় বিষয়) টি কোরআন করিমের মুহ্কাম (স্পষ্ট অর্থ সম্বলিত) আয়াত, হাদীসে মুতাওয়াতের এবং ইজমায়ে মুতাওয়াতেরের ন্যায় সন্দেহাতীত দলিলাদি দ্বারা সুপ্রমাণিত একে ফরয বলা হয়।[১]

টীকা ঃ (১) اَلْفَرْضُ مَا اَوْجَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى عِبَادِهِ وَعِنْدَ الْاُصُوْلِيِّيْنَ مَايَثْبُتُ بِدَلِيْلٍ قَطْعِيِّ الثُّبُوْتِ قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ حَيْثُ لَاشُبْهَةَ فِيْهِ / اَلْفَرِيْضَةُ فِى الشَّرْعِ مَاثَبَتَ بِدَلِيْلٍ مَقْطُوْعٍ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ (تَعْرِيْفَاتُ لِلْجُرْجَانِىْ) ـ اَنَّ الْاَدِلَّةَ السَّمْعِيَّةَ اَرْبَعَةٌ (١) اَلْاَوَّلُ قَطْعِىُّ الثُّبُوْتِ وَالدَّلَالَةِ كَنُصُوْصِ الْقُرْاٰنِ الْمُفَسَّرَةِ اَوِ الْمُحْكَمَةِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِىْ مَفْهُوْمُهَا قَطْعِىٌّ (٢) قَطْعِىُّ الثُّبُوْتِ ظَنِّىُّ الدَّلَالَةِ كَالْاٰيَاتِ الْمُؤَوَّلَةِ اَلثَّالِثُ عَكْسُهُ كَاَخْبَارِ الْاٰحَادِ الَّتِىْ مَفْهُوْمُهَا قَطْعِىٌّ (٤) ظَنِّيُّهُمَا كَاَخْبَارِ الْاٰحَادِ الَّتِىْ مَفْهُوْمُهَا ظَنِّىٌّ / فَبِالْاَوَّلِ يَثْبُتُ الْفَرْضُ وَالْحَرَامُ وَبِالثَّانِىْ وَالثَّالِثِ الْوَاجِبُ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيْمِ وَبِالرَّابِعِ السُّنَّةُ وَالْمُسْتَحَبُّ (شامى/طحطاوى)

এ ফরয দু'প্রকার ঃ ১. ফরযে আইন ও ২. ফরযে কেফায়া।

১। **ফরযে আইন ঃ** যে কাজটি বালেগ ও হুশজ্ঞান সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম (পাগল, মাতাল ও অচেতন ব্যতীত) নারী-পুরুষকে অপরিহার্য্যভাবে পালন করে যেতে হয় এবং যা সকলের পক্ষ থেকে কোন একজন বা কয়েকজন মিলে আদায় করে দিলে সকলের উপর অর্পিত দায়িত্বটি আদায় হয়ে যায় না বরং প্রত্যেকের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিজেকেই আদায় করে যেতে হয়। এরূপ বিধানকে ফরযে আইন বলা হয়। (২) এ জাতীয় ফরযের জন্য প্রত্যেক নারী-পুরুষ নিজের দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে নিজেই এককভাবে দায়ী থাকে। যেমন, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায, রমজান মাসের রোযা রাখা ইত্যাদি।

২। **ফরযে কেফায়া ঃ** যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আদায় করে যাওয়া অপরিহার্য্য বটে কিন্তু সকলের পক্ষ থেকে একজন বা কয়েকজন মিলে আদায় করে নিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় এরূপ আদেশ সূচক বিধানকে ফরযে কেফায়া বলা হয়।[১]

কেউ কেউ আদায় করে দিলে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়; কিন্তু কেউ যদি এ জাতীয় ফরয কাজ আদায় করে না দেয়–তাহলে দায়ীত্ববান হিসেবে সবাই এ ফরয তরকের জন্য অবশ্যই গুণাহগার হয়ে থাকে। যেমন– জানাযার নামায, ইসলামের দাওয়াত ও প্রচার কাজ এবং জেহাদ (ধর্মের জন্য যুদ্ধ) ইত্যাদি।

হুকুম ঃ বিনা ওজরে আলস্য ও অবহেলা বশতঃ ফরজ কাজ আদায় না করলে ফাসেক তথা শাস্তির যোগ্য অপরাধী হয়ে পড়ে। আর এর ফরয তথা অপরিহার্য্য– অলঙ্গনীয়– পালনীয় কর্তব্য হওয়া বিষয়কে ইন্কার তথা অস্বীকার করলে কিংবা একে হাল্কা-তুচ্ছ মনে করলে কাফের হয়ে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে না পারলে পরে কাযা হিসেবে আদায় করে দিতে বাধ্য থাকে।[২]

টীকা ঃ (১) فَفَرْضُ الْعَيْنِ مَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ اِقَامَتُهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنِ الْبَعْضِ بِاِقَامَةِ الْبَعْضِ كَالْاِيْمَانِ وَالصَّلٰوةِ الْخَمْسَةِ وَغَيْرِهِمَا وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ مَا يَلْزَمُ جَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ اِقَامَتُهُ وَيَسْقُطُ بِاِقَامَةِ الْبَعْضِ عَنِ الْبَاقِيْنَ كَالْجِهَادِ وَصَلٰوةِ الْجَنَازَةِ ـ (التعريفا ت للجرجانى)

টীকা ঃ (২) وَحُكْمُهُ اِسْتِحْقَاقُ تَارِكِهِ بِلَا عُذْرٍ الْعِقَابَ وَاِكْفَارُ جَاحِدِهِ ـ (حاشيه هداية) اَلْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهُ وَيُعَذَّبُ تَارِكُهُ ـ (التعريفات للجرجانى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফরয পুনঃ দুভাগে বিভক্ত ঃ ১. ফরযে কাত্‌য়ী তথা এ'তেকাদী ও
২. ফরযে আমলী।

✿ ফরযে এ'তেকাদী ঃ কোন ফরয কাজ যদি এ পর্য্যায়ের হয়ে থাকে যে, যা আদায় করা যেমন ফরয-অনুরূপ একে ফরয তথা অপরিহার্য্য অলঙ্গনীয় আদায় যোগ্য কর্তব্য রূপে বিশ্বাস ও মান্য করে নেওয়াও ফরয। এ জাতীয় ফরযকে ফরযে কাত্‌য়ী তথা ফরযে এ'তেকাদী বলা হয়।

যেমন- ওযুর মধ্যে মাথা মাছেহ করা-একটি ফরজ কাজ, এর আমল যেরূপ ফরয, একে ফরয রূপে বিশ্বাস করাও ফরয। কেউ যদি মাথা মাছেহ ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপ যে সব ফরয কাজ কে অস্বীকার করলে কুফরী লাজেম হয়ে পড়ে ঐ সব কাজকে "ফরযে এ'তেকাদী" বলা হয়।

✿ ফরযে আমলী ঃ যে সব ফরয কাজের শুধু আমল তথা আদায়টাই ফরয, এর সাথে একে ফরয রূপে এ'তেকাদ-বিশ্বাস করে যাওয়ার ব্যাপারটি জড়িত নয়, এরূপ কাজকে "ফরযে আমলী" বলা হয়।

যেমন, মাথার কত "পরিমাণ" অংশ মাছেহ করা ফরয? এ সম্পর্কে এক এক ইমাম এক এক রকমের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাছেহ করা ফরয বলেছেন। "চার অংশের এক অংশ মাছেহ করা যে ফরয, এ বিষয়ের সাথে বিশ্বাসের ব্যাপারটি জড়িত নয়।

✿ ওয়াজিব ঃ যে আদেশমূলক বিধানটি "জন্নী দলীল" দ্বারা অপরিহার্য রূপে সুপ্রমাণিত একে ওয়াজিব বলা হয়।[১]

টীকা ঃ (১) وفى عرف الفقهاء (الواجب) عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد (تعريفات للجرجانى) ان الواجب لا يلزم اعتقاد حقيقته لثبوته بدليل ظنى ومبنى الاعتقاد على اليقين لكن يلزم العمل بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن ـ فجاحده لايكفر وتارك العمل به ان كان مؤولا لايفسق ولايضلل لان التاويل فى مظانه من سيرة السلف والا فان كان مستخفا يضلل لانه رد خبر الواحد والقياس بدعة وان لم يكن مؤولا ولا مستخفا يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه (شامى)

وهو ما يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لو لا العذر حتى يضلل جاحده ولا يكفر به (تعريفات للجرجانى)

হুকুম ঃ ওয়াজিব পর্যায়ের আদেশ সূচক বিধানাবলী কে আদায় করে যাওয়া জরুরীই বটে। তবে গুরুত্বের দিক থেকে ফরযের পরেই ওয়াজিবের স্থান।

আদায়কারী ছাওয়াবের ভাগী হয়। বিনা কারণে ওয়াজিব আদায় না করলে গুনাহগার হয়। এবং একে অস্বীকারকারী ফাসেক হয়ে পড়ে। পরে কাজা হিসাবে আদায় করে দিতে বাধ্য থাকে। (১) নামাযে ওয়াজিব তরক হলে ছাহু সিজদা দ্বারা তার ক্ষতি পূরণ করা হয় এবং এতে নামায আদায় হয়ে যায়।

✿ ছুন্নাত ঃ ঐসব আদেশমূলক বিধান যা নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরাম (রা) বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীন (রা) নিজেরাও আদায় করেছেন, অন্যদেরকেও আদায় করার জন্য উৎসাহ মূলক নির্দেশ দান করেছেন কিংবা আল্লাহর রাসূল (দঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামগণ যে কাজের অনুমোদন দান করেছেন, ঐসবকে ছুন্নাত বলা হয়।[১]

ছুন্নাত দু'প্রকার- ১. ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও
২. ছুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা তথা জায়েদা।

✿ ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা ঃ যে কাজ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরাম (রা) সর্বদা আদায় করেছেন ওজর ছাড়া কখনো ছাড়েননি। এবং যে কাজ করার মধ্যে বিপুল ছাওয়াব রয়েছে না করার মধ্যে তিরিস্কার ও এক প্রকারের গুণাহ রয়েছে। এরূপ বিধানকে ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা বলা হয়। আমলের দিক থেকে ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবের কাছাকাছি, বিনা ওজরে তা আদায় না করা অনুচিৎ।[২]

✿ ছুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা তথা জায়েদা ঃ যা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং ছাহাবা (রা)গণ অধিকাংশ সময় আদায় করেছেন, আবার কোন কোন সময় ওজর ছাড়াও আদায় করেননি। এরূপ বিধানকে ছুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা বা

টীকা ঃ (১)
السنة ما فعله عليه السلام على سبيل المواظبة ويوجر باتيانها ويلام على تركها ـ (خواهر زاده ـ غاية الاوطار)

টীকা ঃ (২)
لكن فى التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام ـ يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلاة والسلام : من ترك سنتى لم ينل شفاعتى اهـ ـ وفى التحرير ان تاركها يستوجب التضليل واللوم اهـ والمراد الترك بلاعذر على سبيل الاصرار ـ فالاثم لتارك السنة المؤكدة اخف من الاثم لتارك الواجب ـ (شامى)

জায়েদা বলা হয়। এ জাতীয় ছুন্নত যারা আদায় করবে তারা বিপুল ছাওয়াব পাবে। ছেড়ে দিলে গুনাহ হবে না। তবে সর্বদা আদায় না করাটা অনুচিৎ।[১]

◆ **মুস্তাহাব (মানদূব, নফল) ঃ**

যে কাজ নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং ছাহাবায়ে কেরাম (রা) কোন কোন সময় করেছেন। আর উহা আদায় করার জন্য তেমন কোন কঠোরতা অবলম্বন করেননি। ঐসব কাজকে মুস্তাহাব-মানদূব কিংবা নফল বলা হয়।

ইহা পালন করলে ফযিলত তথা ছাওয়াব পাওয়া যায়, না করলে ছাওয়াব ও ফযিলত পাওয়া যায় না। তবে না করলে কোন প্রকারের তিরস্কারও নাই।[২]

পবিত্র হাদীস ফেকাহর পরিভাষায় মুস্তাহাব কাজকে মান্দূব, নফল এবং তাতাওউ (تطوع)ও বলা হয়।

✿ **মুস্তাহ্ছান ঃ** শরীয়াতের যে সকল কাজকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুজতাহিদ মহান ইমামগণ পবিত্র কোরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তম ও ভাল রূপে গ্রহণ করেছেন, এসবকে শরীয়াতের পরিভাষায় মুস্তাহ্ছান বলা হয়। এ জাতীয় কাজ পালনে ছাওয়াব পাওয়া যায়, না করলে কোন প্রকারের গুণাহ হয় না।

✿ **খেলাফে আওলা ঃ** যে কাজ না করা উত্তম কিন্তু করে বসলে কোন প্রকারের পাপ-গুনাহ হয় না।

◆ **নিষেধমূলক বিধানসমূহ ঃ**

✿ **হারাম ঃ** যে সমস্ত কাজ-বিধান নিষিদ্ধ হওয়াটা অকাট্য দলিল তথা কোরআন করিমের মুফাচ্ছর ও মুহ্কাম আয়াত, হাদীছে মুতাওয়াতের এবং ইজ্মায়ে মুতাওয়াতের দ্বারা সুপ্রমাণিত ঐ সবকেই হারাম বিধান বলা হয়।

টীকা ঃ (১)

إِنَّ السُّنَّةَ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَا مَعَ التَّرْكِ هِيَ دَلِيْلُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَعَ التَّرْكِ أَحْيَانًا فَهِيَ دَلِيْلُ غَيْرِ الْمُؤَكَّدَةِ ـ

টীকা ঃ (২)

إِنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا يُثَابُ عَلٰى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ وَلَا يُلَامُ عَلٰى تَرْكِهِ (حاشيه هداية)
اَلْمُسْتَحَبُّ وَهُوَ فِيْ اللُّغَةِ الشَّيْئُ الْمَحْبُوْبُ ضِدُّ الْمَكْرُوْهِ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرٰى (بحرالرائق)
وَحُكْمُهُ الثَّوَابُ عَلٰى الْفِعْلِ وَعَدَمُ اللَّوْمِ عَلٰى التَّرْكِ ـ (بحرالرائق)

বিনা ওযরে যে লোক এ জাতীয় কাজ করে সে ফাসিক হয়ে যায়। হারাম বিধানের–হারাম (নিষিদ্ধ) হওয়াটাকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়। ফরয এবং হারাম সাবস্তা করার দলীল মানের দিক থেকে একই পর্যায়ের, ফরয কাজ আদায় করা যেরূপ ফরয অনুরূপ হারাম কাজ বর্জন করা ও ফরয।[১]

◆ **মাকরূহ (অপছন্দ মূলক) বিধান ঃ** এ পর্যায়ের বিধান দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– (১) মাকরূহে তাহ্রীমী ও (২) মাক্রূহে তান্যীহ্।

✿ **মাকরূহে তাহ্রীমী ঃ** যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়াটা জন্নী দলীল দ্বারা প্রমাণিত ঐসব বিধানাবলীকে মাকরূহে তাহরীমা বলা হয়। বিনা ওযরে এসব করা গুণাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

✿ **মাকরূহে তান্যীহ্ ঃ** যে সকল কাজ অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ইজমা-কেয়াসের দলিল মওজুদ নাই বরং পরোক্ষভাবে মাকরূহ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐসব কাজকে মাকরূহে তানযীহ্ বলা হয়। এ জাতীয় বিধান তরক- করাতে ছাওয়াব পাওয়া যায় এবং করলে প্রত্যক্ষভাবে পাপ-গুণাহতো হয় না তবে এতে এক রকমের মন্দত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

◆ **হালাল-হারাম ঃ**

(ক) হালাল ঃ পবিত্র কোরআন ও হাদীছ শরীফে যে সকল কাজ বিষয় ও খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বৈধ হওয়ার বর্ণনাদি রয়েছে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবৈধ হওয়ার কোন প্রমাণ নাই, এসবকে শরীয়াতে হালাল বলা হয়।

(খ) হারাম ঃ যে সকল কাজ, বিষয় ও দ্রব্যাদি কোরআন-হাদীস এবং ইজমা ইত্যাদি দলীল মতে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এসবকে হারাম বলা হয়। হারামকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিৎ।

(গ) মোবাহ্ ঃ সে সকল কাজ করা বা না করার পক্ষে শরীয়াতের কোন আদেশ কিংবা নিষেধ নাই, অর্থাৎ যে কাজ করাতে কোন ছাওয়াব নাই, আর না করাতে কোন গুণাহ নাই বরং করা –না করা বরাবরই বটে এরূপ কাজকে মুবাহ বলা হয়।

টীকা ঃ (১)

إِذِالنَّهِيُ الظَّنِّيُّ الثُّبُوْتِ مَا لَمْ يُصْرَفْ عَنْ ظَاهِرِهِ يَقْتَضِيْ كَرَاهَةَ التَّحْرِيْمِ ـ وَالْقَطْعِيُّ الثُّبُوْتِ يَقْتَضِيْ التَّحْرِيْمَ / فَالتَّحْرِيْمُ مُقَابِلٌ لِلْفَرْضِ وَكَرَاهَةُ التَّحْرِيْمِ مُقَابِلٌ لِلْوُجُوْبِ وَالتَّنْزِيْهُ مُقَابِلٌ لِلْمَنْدُوْبِ ـ (شرح منية صـ٢٧٥)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله الذي جعل الصلوة عماد الدين ومعراج المؤمنين والصلوة والسلام على سيد العالمين محمد ن الذي خلقه الله تعالى من نوره المبين واتخذه حبيبا وخليلا وجعله شفيعا للمجرمين وجعله رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين لاسيما الائمة المجتهدين والمحدثين وفقهاء امته اجمعين . اما بعد

حقيقة الصلوة ودلائلها و مسائلها

নামাযায়ের হাকীকত, দালায়েল ও মাসায়েল

[প্রথম খণ্ড]

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামায শব্দের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

নামায (نماز) বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা-পর্যালোচনার পূর্বে "নামায" শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা অবগতি লাভ করা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একান্ত কল্যাণকর। তাই শুরুতেই এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বর্ণনা-বিশ্লেষণ পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী!

✪ "নামায" শব্দটি মূলতঃ একটি ফার্সী শব্দ। আরবী ভাষায় নামাযকে "ছালাত" (صَلٰوة) বলা হয়।

বাস্তবতার নিরিখে জীবন ও জগতের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল কল্যাণকর সত্যধর্ম ইসলাম যখন আরব এলাকা অতিক্রম করে পারশ্য, রোম ও তৎপার্শ্ববর্তী অন্যান্য সম্রাজ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগল এবং ইসলামী "ধর্মজ্ঞান ও বিধানাবলী" আরবী ভাষা হতে ঐসব বিজিত অঞ্চলের স্বদেশী ভাষায় ব্যাপকহারে ভাষান্তর হয়ে আসছিল, তখন থেকেই আরবী "ছালাত" শব্দটি ফার্সির "নামায ও দরূদ" এ দু'শব্দে ভাষান্তরিত হয়ে ইসলামের সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখ্য যে, মূলতঃ ছালাত একটি ব্যাপক অর্থ সম্বলিত শব্দ। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরূপ ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ নাই যদ্দারা "ছালাত" শব্দের পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করা যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেহেতু আজকের ইরানদেশের ন্যায় এককালে এ বাংলাদেশেও ফার্সীই রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ তখন থেকেই "নামায ও দরূদ" এ শব্দ দু'টো আরবী "ছালাত" শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে বাংলা ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ সূত্রে আমরা এখন "নামায" ও "দরূদ" বলতে আরবী "ছালাতকে"ই বুঝে থাকি।

নামায শব্দটি যেহেতু "ছালাত" অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেদিক লক্ষ্য করে আলোচনার ক্ষেত্রেও তাই প্রথমে "ছালাত" শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপরই আলোকপাত করা হচ্ছে ঃ

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

✪ সংক্ষেপে বলতে গেলে মূল (مَادَّةٌ)-এর দিক থেকে صَلٰوةٌ (ছালাত) শব্দটি صَلْىٌ (ছাল্ইউন্) বা صَلْوٌ (ছাল্ভুন্) থেকে নির্গত। ইহা আরবদের উক্তি– صليت اَلْعُوْدَ عَلَى النَّارِ (اذا قومته اولينته) (কাঠ বা কোন বাঁকা বস্তুকে আগুনে ছেঁকে সোজা করা বা নরম করা) মূল থেকে অথবা حَرَكُ الصَّلْوَيْنِ (নিতম্বের দু'দিককে নাড়া) মূল থেকে গৃহীত।

যেহেতু "ছালাত" (নামায) মুছাল্লির কুপ্রবৃত্তির বক্রতাকে ক্রমশঃ সোজা ও নরম করে দেয়– তাই ঐ সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার এবাদতের নামকরণ করা হয়েছে ছালাত (নামায)।

অথবা ছালাত আদায় করার সময় মুছাল্লীকে রুকু-ছজদা ও উঠা-বসাকালে তার নিতম্বের দু'দিক নড়াচড়া করা লাগে সে হিসাবে এর নাম হয়েছে ছালাত (নামায)।

কারো কারো মতে ছালাত শব্দটি وَصْلٌ মূল থেকে নির্গত। এর অর্থ মিলন ঘটানো, একত্রিত করা, সেহেতু মহা-মহীয়ান প্রভু আল্লাহ তাআলা ও তাঁর উপাসক-বান্দার মধ্যে ছালাত (নামায)-ই হচ্ছে মিলন ঘটানোর প্রধানতম উপকরণ তথা "মিলন সেতু"। সেকারণে একে ছালাত বলা হয়।

এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, ইছলামের আভিধানিক, ভাষাবিদ, তাফছীর, হাদীছ ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের সম্মানিত ইমামগণ ছালাত শব্দটির বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ ও বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

✪ কোরআন করিমের বিখ্যাত অভিধানবিদ আল্লামা ইমাম রাগিব (র) বলেছেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ فِى اللُّغَةِ اَلدُّعَاءُ وَالتَّبْرِيْكُ وَالتَّحْمِيْدُ وَمِنَ اللّٰهِ التَّزْكِيَّةُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اَلْاِسْتِغْفَارُ وَمِنَ النَّاسِ اَلدُّعَاءُ ـ

অর্থঃ আভিধানিক দিক থেকে "ছালাত" শব্দের অর্থ হচ্ছে– দোয়া করা

বরকত-সমৃদ্ধি প্রার্থনা করা, প্রশংসা করা, আল্লাহর পক্ষ হতে পরিশুদ্ধিকরণ, ফেরেশ্তাদের পক্ষ থেকে এস্তেগফার, আর মানুষের পক্ষ থেকে দোয়া করার বেলায় এর প্রয়োগ-ব্যবহার হয়ে থাকে।

✪ হাদীছ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অভিধান "নেহায়া লি ইব্নিল আছীর" গ্রন্থের صاد অধ্যায়ের صلا শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে ঃ

وَهِىَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ وَاَصْلُهَا فِى اللُّغَةِ الدُّعَاءُ .... وَقِيْلَ اِنَّ اَصْلَهَا فِى اللُّغَةِ التَّعْظِيْمُ وَسُمِّيَتِ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ صَلَاةً لِمَا فِيْهَا مِنْ تَعْظِيْمِ الرَّبِّ تَعَالٰى .... وَاَمَّا قَوْلُنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فَمَعْنَاهُ عَظِّمْهُ فِى الدُّنْيَا بِاِعْلَاءِ ذِكْرِهٖ وَاِظْهَارِ دَعْوَتِهٖ وَاِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهٖ وَفِى الْاٰخِرَةِ بِتَشْفِيْعِهٖ فِىْ اُمَّتِهٖ وَتَضْعِيْفِ اَجْرِهٖ وَمَثُوْبَتِهٖ ـ

অর্থঃ "ছালাত" বলতে এক সুনির্দিষ্ট এবাদতকেই বুঝায়। আর অভিধান অনুসারে ছালাত শব্দের মূল অর্থ দোয়া করা...... তবে অনেকের মতে এর আসল অর্থ হচ্ছে তাযীম করা, সম্মান দেখানো— এ হিসাবে ঐ নির্ধারিত এবাদতের নাম "ছালাত" হওয়ার কারণ হচ্ছে– যেহেতু ঐ এবাদতের মধ্যে মহা মহীয়ান-গরীয়ান প্রভু আল্লাহ তাআলার প্রতি চরম তাযীম ও পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের ব্যবস্থা রয়েছে।

আর আমরা যে আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) এর উদ্দেশ্যে বলে থাকি– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ এ দরূদের মমার্থ হচ্ছে– হে মহান আল্লাহ! দুনিয়ার মাঝে আপনার প্রিয় নবী (দঃ) এর স্মরণকে উচ্চতার শীর্ষে পৌছিয়ে দিয়ে, প্রিয় নবী (দঃ) এর দ্বীনী দাওয়াত– পয়গামের ব্যাপক প্রকাশ-প্রসার সাধন করে, তাঁর শরীয়াতকে পৃথিবীর মাঝে চিরন্তনতা দান করে এবং পরজগতে প্রিয় নবী (দঃ) এর গুনাহগার উম্মাতের নাজাতির ব্যাপারে অধিকহারে তাঁর সুপারিশ কবুল করে, সর্বোপরি তাঁর ছওয়াব-পুণ্যকে অত্যাধিকহারে বৃদ্ধি করতঃ হে প্রভু! আপনি প্রিয় নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সম্মান-মর্যাদাকে উত্তরোত্তর মহিমান্বিত করতে থাকুন।

✪ হাদীছ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ইমাম হযরত ইমাম ছাখাভী (রঃ) القول البديع فى الصلوة على الحبيب الشفيع নামক গ্রন্থে ছালাত শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনীষীবৃন্দের মতামত সমূহ উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ لِلّٰهِ اَىِ الْاَذْكَارُ الَّتِىْ يُرَادُ بِهَا التَّعْظِيْمُ الْمَذْكُوْرُ وَالْاِعْتِرَافُ لَهٗ بِجَلَالَةِ الْقَدْرِ وَعُلُوِّ الرُّتْبَةِ وَكُلُّهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى اَىْ هُوَ مُسْتَحِقُّهَا لَا يَلِيْقُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِاَحَدٍ سِوَاهُ - فَاِذَا قُلْنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فَاِنَّمَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ
مُحَمَّدًا فِى الدُّنْيَا بِاِعْلَاءِ ذِكْرِهٖ وَاِظْهَارِ دِيْنِهٖ وَاِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهٖ وَفِى الْاٰخِرَةِ
بِتَشْفِيْعِهٖ فِىْ اُمَّتِهٖ وَاِجْزَالِ اَجْرِهٖ وَمَثُوْبَتِهٖ وَاِبْدَاءِ فَضْلِهٖ لِلْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ
بِالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَتَقْدِيْمِهٖ عَلٰى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالشُّهُوْدِ -

অর্থঃ "আল্লাহ পাকের জন্যই ছালাত"— এর অর্থ হচ্ছে নামাযে পঠিত জিকির সমূহ দ্বারা মহান আল্লাহর প্রতি উপরোল্লেখিত চরম তা'জীম ও ভক্তি- শ্রদ্ধার বিকাশ দান করা এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের তাযীমের সুমহানতা ও মর্যাদার সর্বোচ্চতার স্বীকৃতি প্রকাশ করাটাই হচ্ছে "আচ্ছালাতু লিল্লাহি" এর আসল লক্ষ্য, অর্থাৎ উক্ত তা'জীম শ্রদ্ধার তিনি আল্লাহ তাআলাই একমাত্র প্রাপক। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা এরূপ নিরংকুশ ও সর্বোচ্চ তাযীম তথা ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।

তবে আমরা যে বলি اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ এতে আমাদের এটাই উদ্দেশ্য যে, "হে প্রভু আল্লাহ! আপনি আপনার রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর পবিত্র স্মরণকে দুনিয়াতে উচ্চতার শীর্ষে পৌছিয়ে দিয়ে,তাঁর শরীয়তকে পৃথিবীর মাঝে চিরন্তনতা দানে এবং আখেরাতে তাঁর পাপী উম্মতদের মুক্তি প্রাপ্তির ব্যাপারে বেশী বেশী তাঁর সুপারিশ কবুল করার মাধ্যমে, প্রিয় নবী (দঃ) এর ছওয়াব-পূণ্য সমূহকে সীমাহীনভাবে বর্ধিত করে, হাশর দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তথা সমবেত সকল সৃষ্টির সামনে "মাকামে মাহমুদ" অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রশংসিত আসনে তাঁকে সমাসীন করে এবং আপনার নৈকট্য প্রাপ্ত সকল বান্দাদের মধ্যে তাকে সর্বোত্তমতা প্রদান করে আপনি আপনার প্রিয় রাছুল (দঃ) এর সম্মান-মর্যাদাকে সুমহান করে তুলুন।

✪ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ওম্‌দাতুলকারী" চতুর্থ খণ্ড "কিতাবুছ্-ছালাত" -এর প্রারম্ভে আল্লামা আইনী (র) লিখেছেন ঃ

ثُمَّ مَعْنَى الصَّلٰوةِ فِى اللُّغَةِ الْغَالِبَةِ اَلدُّعَاءُ -

অর্থঃ ছালাত শব্দটি অধিকতর দোয়া করার অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এর কিছু পরে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

وَقِيْلَ اَصْلُهَا مِنَ التَّعْظِيْمِ سُمِّيَتِ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ صَلَاةً لِمَا
فِيْهَا مِنْ تَعْظِيْمِ الرَّبِّ تَعَالٰى وَقِيْلَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقِيْلَ مِنَ التَّقَرُّبِ -

অর্থঃ অনেকের মতে মূলতঃ ছালাতের অর্থ হচ্ছে- তা'যীম-সম্মান করা, এ হিসাবে আল্লাহ তাআলার সুনির্দিষ্ট এবাদতের নাম ছালাত রূপে রাখার কারণ হল- যেহেতু

ছালাত (নামায) নামের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার এবাদতের মধ্যে মহা-মহীয়ান প্রভু আল্লাহ তাআলার প্রতি চরম সীমায় তা'যীম ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। অনেকের মতে ছালাত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ পাকের করুণা কামনা করা ও প্রভুর নৈকট্য তলব করা।

✪ এমনিভাবে ইসলামী বিশ্বে বহুল পরিচিত আকীদাহ বিষয়ক পুস্তিকা "শরহে আকায়েদে নাছাফির" ব্যাখ্যা গ্রন্থ "নিব্‌রাছে" উপরের উদ্ধৃতি সমূহের ন্যায় ছালাত শব্দের কয়েক প্রকারের অর্থের উল্লেখ রয়েছে —

اَلْاَوَّلُ اَنَّ اَصْلَهَا الدُّعَاءُ اَلْخَيْرُ ....اَلثَّانِىْ اَنَّهَا مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ
الدُّعَاءِ وَالرَّحْمَةِ اَلثَّالِثُ اَنَّ اَصْلَهَا الثَّنَاءُ اَلْكَامِلُ .... اَلرَّابِعُ اَنَّهَا
التَّعْظِيْمُ اَلخ -

এর কিছু পরে উক্ত পুস্তিকায় উল্লেখ আছে—

ثُمَّ لَايَخْفٰى وَجْهُ تَسْمِيَةِ ذَاتِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ صَلٰوةً عَلٰى هٰذِهِ الْوُجُوْهِ
الْخَمْسَةِ لِاِشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ وَثَنَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَتَعْظِيْمِهٖ -

অর্থ ঃ এ বিষয়টি মোটেই অস্পষ্ট নয় যে, ছালাত শব্দের উপরোক্ত অর্থ সমূহের আলোকে রুকু-ছিজদা সম্বলিত আল্লাহর এবাদতকে ছালাত নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে- যেহেতু এ ছালাত নামের এবাদতে একাধারে বিভিন্ন প্রকারের দোয়া (পাঠ), আল্লাহ তাআলার চরম প্রশংসা-গুণ-কির্তণ, এবং প্রভু আল্লাহ তাআলার প্রতি চরম তাযীম তথা ভক্তি-সম্মান প্রর্দশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিশ্বখ্যাত সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ "বোখারী শরীফ·২য় খন্ডের" কিতাবুত্ তাফছীরের—

بَابُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

আয়াতের তাফছীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

قَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ رض - صَلٰوةُ اللّٰهِ ثَنَاءُهٗ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلٰئِكَةِ وَصَلٰوةُ
الْمَلٰئِكَةِ الدُّعَاءُ - قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رض يُصَلُّوْنَ يُبَرِّكُوْنَ -

অর্থঃ বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবুল আলীয়া (রঃ) বলেন- অত্র আয়াতে করীমায় "ছালাতুল্লাহ" এর মর্ম হচ্ছে- ফেরেশ্‌তাদের নিকট আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রশংসা ও গুণগান করে থাকেন এবং "ছালাতুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

মালায়িকাহ"-এর মর্ম হচ্ছে- ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর নবী (দঃ)-এর (মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য) দোয়া-প্রার্থনা করে থাকেন।

হযরত ইবনে আব্বাছ (রা) يُصَلُّوْنَ -এর অর্থ يُبَرِّكُوْنَ শব্দ দ্বারা (আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর বরকত নাযেল করেন ও ফেরেশ্‌তারা আল্লাহর নবীর জন্য বরকত কামনা করে থাকেন) করেছেন।

উক্ত এলোমেলো ও অগোছানো অথচ তথ্যবহুল বর্ণনার আলোকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, ছালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে, দোয়া-ফরিয়াদ করা, পরিপূর্ণ প্রশংসা ও গুণগান করা, চরমভাবে তা'যীম-সম্মান করা, রহমত বর্ষণ করা, মহান আল্লাহর রহমতে কামেলা তথা পরিপূর্ণ করুণা কামনা করা, তাঁর নৈকট্য তলব করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

উক্ত অর্থ সমূহ থেকে ছালাত আদায়কারী এবং যার জন্য কিংবা যার উপর ছালাত আদায় বা পাঠ করা হবে, তার মান-মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল অর্থটাই গ্রহণ করা হবে।

ইমাম ছাখাভী (র) বলেন—

فَلْيُعْلَمْ اَنَّ الصَّلٰوةَ يَخْتَلِفُ حَالُهَا بِحَسْبِ حَالِ الْمُصَلِّىْ وَالْمُصَلّٰى لَهٗ وَالْمُصَلّٰى عَلَيْهِ . (قول بديع)

অর্থাৎঃ উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বুঝা গেল যে, অত্র ছালাত শব্দটির প্রয়োগকারী কিংবা ছালাত আদায়কারী, ছালাত যার জন্যে আদায় করা হচ্ছে- এসবের তারতম্য বিবেচনায় এর অর্থ- উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

যেমন- মহা প্রভু আল্লাহর জন্য যখন ছালাত আদায় উদ্দেশ্য হবে তখন ছালাতের যে অর্থ ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে ঐ অর্থ ও পদ্ধতি অন্য কারো জন্য গ্রহণ করা যাবেনা, কেননা, মহান আল্লাহ হচ্ছেন সবকিছুর স্রষ্টা, মনিব ও উপাস্য-প্রভু আর বাকী সব তাঁর সৃষ্টি ও বান্দা। উপাস্য-উপাসক এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্য বুঝিয়ে বলার অপেক্ষাই রাখে না। এমনিভাবে নবীয়ে আকরম (দঃ)-এর প্রতি যখন ছালাত পাঠ করা হয় তখন ছালাতের যে অর্থ গ্রহণ করা হয় উহা অন্য কারও জন্য গ্রহণ করা যাবে না। কারণ নবী করিম (দঃ) ও অন্যান্যদের মাঝে মর্যাদার দিক থেকে যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য রয়েছে তা সর্বজনবিদিত।

যেমন হযরত ইমাম ছাখাভী (র) قول بديع নামক গ্রন্থে এ প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর বলেন,

وَبِهٰذَا التَّقْرِيْرِ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .... وَمِنَ الْمَعْلُوْمِ اَنَّ الْقَدْرَ الَّذِىْ يَلِيْقُ بِالنَّبِىِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذٰلِكَ اَرْفَعُ مِمَّا يَلِيْقُ بِغَيْرِهٖ - وَالْاِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلٰى اَنَّ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ مِنْ تَعْظِيْمِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّنْوِيْهِ بِهٖ مَالَيْسَ فِىْ غَيْرِهَا .

এখন জানার বিষয় হল "আরবী ছালাত" শব্দের অর্থ ফার্সীতে "নামায" এবং দরূদ এ শব্দ দু'টো দ্বারা কেন করা হল?

এর উত্তরে কারণ স্বরূপ বলা যায়, যেহেতু আরবী ছালাত শব্দ এবং ফার্সীর "নামায" ও "দরূদ" শব্দের মধ্যে অর্থের দিক থেকে ব্যাপক মিল রয়েছে।

অর্থ— যেমন, ফার্সী অভিধান অনুসারে ছালাত শব্দের অনুরূপ নামায (نَمَازْ) শব্দের অর্থ হচ্ছে, দোয়া-ফরিয়াদ করা, নম্রতা ও কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা, প্রশংসাও ভক্তি শ্রদ্ধা করা, এবাদত উপাসনা করা এবং হাদিয়া পেশ করা ইত্যাদি।

আর ফার্সীতে "দরূদ" (دُرُوْدْ) শব্দের অর্থ হচ্ছে- ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করা, দোয়াকরা, আল্লাহর পরিপূর্ণ করুণা কামনা করা এবং হাদিয়া পেশ করা ইত্যাদি।

অতএব ইসলামের মহা মনীষীদের ভাষ্য অনুযায়ী পরিভাষাগত দিক থেকে "ছালাত বনাম-নামায বলতে,

"মহা-মহিম আল্লাহ তাআলাকেই আমরা প্রত্যেকের একমাত্র লা-শরীক স্রষ্টা, প্রভু ও একক উপাস্য জ্ঞানে- একমাত্র তাঁরই প্রশংসা-স্মরণ, তদুপরি শেষ সীমার দীনতা-হীনতা সহকারে চরম সীমায় তাঁর প্রতি তা'যীম ও ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে কোরআন তেলাওয়াত, নির্ধারিত তাছবীহ ও দোয়া-দরূদ পাঠ এবং কেয়াম, রুকু, ছিজ্‌দা ও বৈঠক প্রভৃতি নমনীয় অঙ্গ-ভঙ্গি সম্বলিত মহান আল্লাহর সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার এবাদত-উপাসনাকেই বুঝায়।

✪ অনুরূপভাবে ছালাত বনাম "দরূদ" বলতে, "আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রথম নূরানী বিন্দু, রাব্বুল আলামীনের পবিত্র নূরের সর্ব আদি ও প্রিয়তম সৃষ্টি, রাহমাতুল্লিল্ আলামীন নবীয়ে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের স্মরণ, প্রশংসা ও গুণগান করণ, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রিয় হাবীব (দঃ) এর মর্যাদা-মহানত্বের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং তার জন্য আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ রহমত-করুণা কামনা করা- অর্থাৎ নবীয়ে পাক (দঃ)-এর প্রতি আন্তরিক-মৌখিক তা'যীম ও ভক্তি-ভালবাসার হাদীয়া নিবেদনমূলক আমল- প্রক্রিয়াকেই বুঝায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায সম্পর্কে ইসলামের বিধান

শ্রদ্ধেয় পাঠক মন্ডলী!

✪ নামায ইসলামের দ্বিতীয় রুক্‌ন (মূল ভিত্তি)। ঈমানের পরেই নামাযের স্থান।

✪ সাধারণতঃ প্রত্যেক বালেগ, বিবেকবান, হুঁশজ্ঞান সম্পন্ন মুসলিম নারী-পুরুষের উপর দৈনিক নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং নির্ধারিত শর্তাবলী পাওয়া গেলে জুম্‌আবারে যোহরের নামাযের পরিবর্তে জুম্‌আর নামায আদায় করা "ফরযে আইন" তথা অবশ্য পালনীয় অলংঘনীয় অপরিহার্য কর্তব্য।

✪ প্রত্যেক বিবেকবান হুঁশ-জ্ঞান সম্পন্ন মুসলিম ছেলে-মেয়ে যে মুহূর্তে নিজের মধ্যে ইসলামী শরীয়াতের নির্ধারিত বুলুগিয়াতের (বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার) নিদর্শন দেখতে পায় সেই মুহূর্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে যাওয়া তার জন্য ফরয হয়ে পড়ে।

✪ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ছেলে-মেয়েদের বয়স বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে এসে তাদের শরীরে কতক গুলো লক্ষণ-চিহ্ন প্রকাশ পায়। ঐ লক্ষণ-চিহ্ন গুলো প্রকাশ পেলেই তখন তারা বালেগ-বালেগা (বয়ঃপ্রাপ্ত) রূপে বিবেচিত হয়।

✪ ইছলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে পুরুষ ছেলেদের বালেগ হওয়ার লক্ষণ-চিহ্ন হচ্ছে বীর্যপাত হওয়া। ইহা সাধারণতঃ সর্ব প্রথম স্বপ্নদোষের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। স্বপ্নদোষ কিংবা অন্য যে কোন ভাবে কোন ছেলের প্রথম যেদিন থেকে বীর্যপাত হবে, সেদিন থেকে শরীয়াতের দৃষ্টিতে তাকে বালেগ রূপেই গণ্য করা হবে।

✪ বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া বিভিন্ন রকমের। এজন্য বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন বয়সে বালেগ-বালেগা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের ছেলেরা সাধারণতঃ ১২ বছর বয়সেই বালেগ হয়ে থাকে।

তবে শরীরের গঠন-প্রকৃতির তারতম্যের কারণে ১২ বছর হতে ১৮ কিংবা ১৯ বছর বয়সই হল হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও অন্যান্য কতেক ফোকাহায়ে ইযাম (রঃ) এর মতে ছেলেদের বালেগ হওয়ার শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত সময়-সীমা। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ছেলেদের বালেগ হওয়ার শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত সময়-সীমা হল ১২ হতে ১৫ বছর পর্যন্ত। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে ১৮ কিংবা ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলে আর ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে ১৫ বছর অতিক্রান্ত হলে উক্ত ছেলের বীর্যপাত না হলেও তাকে বালেগ রূপে গণ্য করা হবে।

✪ মেয়েলোকদের বালেগা (বয়ঃপ্রাপ্ত) হওয়ার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য লক্ষণ-পরিচয় হচ্ছে— তাদের হায়েয তথা ঋতুস্রাব হওয়া।

আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশের মেয়েরা বিভিন্ন বয়সে বালেগা হয়ে থাকে। কোন দেশে ৯ বছর বয়সে, কোন দেশে দশ, কোন দেশে ১১/১২ বছর বয়সেই বালেগা (বয়ঃপ্রাপ্তা) হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ১১ বৎসর বয়স থেকে ঋতুবতী হয়ে থাকে।

ঋতুবতী হওয়ার এ তারতম্যের কারণে ইসলামী শরীয়ত পুরুষ ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের ব্যাপারেও একটা বয়স-সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

তা হচ্ছে সর্বসম্মত মতানুসারে ৯ বছর বয়সের আগে কোন দেশের মেয়েরা ঋতুবতী বলে গণ্য হবে না এবং এ ভিত্তিতে ৯ বছর বয়সের পূর্বে কোন মেয়েকে বালেগা বলে শরীয়াত কর্তৃক গণ্য করা যাবে না।

আর ইমাম আযম (র) এর মতে, মেয়েদেরকে বালেগা রূপে গণ্য করার সর্বোচ্ছ বয়স সীমা হচ্ছে ১৭ বছর, আর ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এবং ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে বালেগা রূপে গণ্য হওয়ার সর্বোচ্ছ বয়স-সীমা ১৫ বছর হওয়ার মতটাই বেশী যুক্তিযুক্ত ও অধিক গ্রহণযোগ্য– অর্থাৎ কোন ছেলে ও মেয়ের বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরও যদি হায়য (ঋতুস্রাব) কিংবা বীর্যপাত তথা বালেগ-বালেগা হওয়ার কোন চিহ্ন প্রকাশ না পায়, তবুও তাকে সে সময় বালেগ-বালেগা রূপেই গণ্য করা হবে।[১]

টীকা ঃ (১) بَابُ بُلُوْغِ الصِّبْيَانِ : قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلٰى اَنَّ الْاِحْتِلَامَ فِي الرِّجَالِ وَالْحَيْضَ فِي النِّسَاءِ - هُوَ الْبُلُوْغُ الَّذِي يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتِ وَالْحُدُوْدَ وَالْاِسْتِيْذَانَ وَغَيْرَهُ وَاخْتَلَفُوْا - فِيْمَنْ تَاخَرَ اِحْتِلَامُهُ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ حَيْضَةً مِنَ النِّسَاءِ - فَقَالَ اللَّيْثُ وَاَحْمَدُ وَاِسْحَاقُ وَمَالِكٌ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْاِنْبَاتُ اَوْ اَنْ يَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَعْلَمُ اَنَّ مِثْلَهُ قَدْ بَلَغَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَذٰلِكَ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً اَوْ ثَمَانَ عَشَرَةَ سَنَةً .... اَمَّا اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح فَلَمْ يَعْتَبِرِ الْاِنْبَاتَ وَقَالَ حَدَّ الْبُلُوْغِ فِي الْجَارِيَةِ سَبْعَ عَشَرَةَ وَفِي الْغُلَامِ تِسْعَ عَشَرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ ثَمَانِي عَشَرَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِي وَمَذْهَبُ الشَّافِعِي اَنَّ الْاِنْبَاتَ عَلَامَةُ بُلُوْغِ الْكَافِرِ لَا الْمُسْلِمِ وَاعْتَبَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً فِي الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ وَمَذْهَبُ اَبِي يُوْسُفَ رح وَمُحَمَّدٍ رح كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَ الْاَوْزَاعِيُّ وَابْنُ وَهَبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُوْنَ .... ؟ (عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ بُخَارِي ج۱۳ صفحه ۲۳۹)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ কোন ছেলে বা মেয়ে থেকে বালেগ-বালেগা হওয়ার নির্ধারিত চিহ্ন প্রকাশ পেলে অথবা ১৫ (পনর) বছরের (মতান্তরে ১৭/১৮/১৯ বৎসরের) বয়স-সীমা অতিক্রান্ত হলে সে মুহূর্ত থেকেই শরীয়তের বিধি-নিষেধ সমূহ তাদের উপর বর্তাবে এবং সে অনুসারে তখন থেকেই তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করে যাওয়া ফরয হয়ে পড়বে।

✪ ইসলামী ঈমান-প্রত্যয়ের দাবীদার প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা যে, মহান স্রষ্টা ও মাবুদ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরয-তথা অবশ্য পালনীয় অলংঘনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য– এ বিষয়টিকে তার ঈমান-আকীদার বিশেষ একটি বিশ্বাস্য অঙ্গ হিসাবে মেনে যেতে হবে। এ প্রগাঢ় ধারণা-বিশ্বাসকে কোন অবস্থাতেই কোন মুসলিম বলে দাবীকারী লোকের পরিত্যাগ করা চলবে না।

কোন মুসলিম যদি "নামায ফরয হওয়ার বিষয়টিকে মুখে কিংবা অন্তঃকরণের দিক থেকে অস্বীকার করে বা নামায সম্পর্কে হটকারিতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে– তখন ইসলামের সর্ববাদী মতানুসারে সে লোক আর মুসলিম থাকে না বরং সে কাফের হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন–

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔

অর্থঃ নামায কায়েম করে যাও এবং (অস্বীকৃতিমূলক মনোভাব নিয়ে নামায তরক করতঃ) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড় না।

✪ একটি ছহী হাদীছ শরীফে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ ۔

অর্থঃ যে মুসলিম ইচ্ছাকৃত ভাবে তথা নামায যে ফরয-এ বিষয়টিকে অস্বীকার করতঃ নামায তরক করে সে কাফের হয়ে যায়। তবে হাঁ, কোন মুসলিম যদি নামায আদায় করাটা যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুনির্ধারিত "ফরয" তথা "অবশ্য পালনীয় কর্তব্য" এ বিষয়টিকে মুখেও স্বীকার করে এবং সাথে সাথে মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করে থাকে। অধিকন্তু, ঐ লোক যে বর্তমানে নামায আদায় করছে না এর জন্য নিজেকে মহান আল্লাহর নিকট একজন বড় অপরাধী-দোষী রূপে স্বীকার করে এবং তা প্রকাশও করে থাকে, শুধুমাত্র কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় অলসতা বশতঃ মহান আল্লাহর গজব-শাস্তির ব্যাপারে সচেতন না হওয়ার কারণে বর্তমানে সে লোক যে নামায আদায় করে যাচ্ছে না; এটা তার আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় প্রমাণিত হয়। ইসলামের অধিকাংশ মাযহাবী ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এজাতীয় লোকদের নামায তরক করার কারণে কাফের বলা যাবে না বরং সে ফাছেক হলেও একজন মুসলিমই বটে।

✪ কিন্তু সর্বদা নামায তরক করে যাওয়ার পরিণতি সম্পর্কেও একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

যেহেতু পবিত্র হাদীছে হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ (مسلم)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ (ترمذى)

অর্থঃ রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন নামায তরক করাটাই হচ্ছে ঈমান ও কুফর কিংবা মুসলিম ও কাফের হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য নির্ণয়কারী একটি প্রধানতম নিদর্শন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

✪ হযরত ওমর ফারুক (রা) থেকে বর্ণিত—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ فَلَا دِيْنَ لَهٗ، وَالصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ ۔ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অর্থঃ হুযুর আকরম (দঃ) এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি নামায তরক করতে থাকে মূলতঃ তখন তার ধর্মই থাকে না; যেহেতু নামায হচ্ছে ধর্মের স্তম্ভ বিশেষ।(বায়হাকী)

✪ ইসলামের একমাত্র সত্যপন্থী দল "আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাআত" উপরে উদ্ধৃত পবিত্র হাদীছ শরীফ সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সাধারণতঃ নামায তরককারীকে সরাসরি "কাফের" আখ্যায়িত করার দিকটি পরিহার করতঃ বে নামাযী লোককে ফাছেক মুসলিম রূপে স্বীকৃতি দিলেও যে সমস্ত মুসলমান মোটেই নামায আদায় করে না, কিংবা এ অহরহ-নিয়মিত নামায অনাদায়ের জন্য নিজেকে কোনরূপ দোষী অপরাধী রূপেও স্বীকার করে না বরং নামায আদায় করাটাকে একটা ঐচ্ছিক বিষয়রূপে মনে করতঃ বলে থাকে যে, ধর্ম-কর্ম পালন আমার ব্যক্তিগত একটা ঐচ্ছিক ব্যাপার; আমার মন চাইলে আদায় করব, মন না চাইলে নামায-রোযা আদায় করব না, এ ধরণের মনোভাব সম্পন্ন মুসলিম যে, ক্রমশঃ কুফরির কাছাকাছি অবস্থানে গিয়ে পৌছে যায়– উহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ উল্লিখিত হাদীছ শরীফ সমূহের ভাষ্য অনুযায়ী কে মুসলিম কে হিন্দু! বৌদ্ধ বা ইয়াহুদী-খ্রিস্টান এ বিষয়ে পার্থক্য নির্ণয় করার বড় নিদর্শনই হচ্ছে নামায।

প্রকৃতপক্ষে নামায দ্বারা মুছলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। কেননা, দৈহিক দিক থেকে বিশেষ পদ্ধতির (গোছল-ওযুর দ্বারা) পবিত্রতা হাছেল করতঃ ইছলামের "নামায রূপ এত উত্তম, অর্থবহ, স্বাস্থ্য রক্ষাকারী, মানসিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

টেনশন-উদ্বিগ্নতা নিবারণকারী ও সুন্দর পদ্ধতি সম্বলিত নিয়মতান্ত্রিক স্রষ্টা পূজার দৈনিক পাঁচবারের এ অনুষ্ঠান পালন অন্য কোন ধর্মে নাই।

✪ আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে শরীয়াত কর্তৃক গ্রহণযোগ্য ওযর-অপারগতা ব্যতীত ইচ্ছাকৃত ভাবে সর্বদা নামায তরককারী মুসলিমকে কারাগারে আটক রাখতে হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত বেনামাযী আল্লাহ তাআলার দরবারে অতীত অপরাধের জন্য তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ নামায পড়তে শুরু করে দেয়।

শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে ইচ্ছাকৃত ভাবে নামায তরককারীকে (রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে) মৃত্যুদণ্ড দেয়ার মত মারাত্মক শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে (শামী)। যাতে বাকী বেনামাযীরা এর দ্বারা সতর্ক হয়ে নামায আদায়ের প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী হয়ে উঠে।

✪ ইসলামের মৌলিক এবাদত সমূহ তথা নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের মধ্যে যাকাত ও হজ্জ শুধুমাত্র বিত্তবান লোকদের উপরই ফরয করা হয়েছে। এমনিভাবে রোযা ও অবস্থাভেদে রুগ্ন-মোসাফির ইত্যাদি মুসলিমের জন্য রমযান মাসে না রেখে অন্য সময়ে আদায় করে দেওয়ারও সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু নামায এ পর্যায়ের একটি এবাদত-যা ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, রুগ্ন-মোসাফির ও নারী-পুরুষ সকলের উপর আদায়ের পদ্ধতির মধ্যে কিছু তারতম্য সাপেক্ষে একইভাবে ফরয করা হয়েছে।

ওযু-গোসল করতে অপারগ হলে তায়াম্মুম করেই নামায আদায় করতে হয়।

কোন মুসলিম যদি রোগ-পীড়া বশতঃ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে না পারে, তাহলে বসে বসে রুকু-সিজদা দিয়ে তাকে নামায আদায় করে যেতে হয়। যদি বসতেও অক্ষম হয়, তাহলে শায়িত অবস্থায় মাথার ইশারায় রুকু-সিজদা করে হলেও নামায আদায় করতে হবে।

তবে হাঁ, যখন শুয়ে মাথার ইশারায়ও নামায আদায় করতে না পারে এবং মা-বোনদের হায়য (মাসিক ঋতু) কালের নির্দিষ্ট সময়ে এবং নেফাছ তথা সন্তান প্রসবের পরবর্তী নির্ধারিত দিন সমূহে, এমনিভাবে হুঁশ-জ্ঞানহারা লোকদের জন্যই শুধু নামায তরক করার অনুমতি রয়েছে।

এছাড়া কোন হুশ-জ্ঞান সম্পন্ন নারী-পুরুষের উপর কোন অবস্থাতেই নামায মাফ নাই।

✪ শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট ওয়াক্তে নামায আদায় করা ফরয। ঘটনাক্রমে নির্ধারিত সময়ের ভিতর আদায় করতে না পারলে অতি সহসা "কাযা" হিসাবেই তা আদায় করে দিতে হয় এবং রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তাআলার নিকটে মিনতিভরে ক্ষমা চেয়ে যেতে হয়।

ছুটে যাওয়া নামায জীবিত থাকা অবস্থায় কাযা হিসাবেও আদায় করে যেতে না পারলে, মৃত্যুকালে স্বীয় ওয়ারিশগণকে উক্ত নামায সমূহের কাফ্ফারা আদায় করে দেওয়ার জন্য অছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব (হেদায়া)।

মৃতব্যক্তি অছিয়ত করে গেলে ওয়ারিশগণ তার কর্জ-ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ করার পর বাকী সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দ্বারা নামায-রোযার কাফফারা আদায় করে দিবে।

বিনা অছিয়তে মৃতলোকের পক্ষ হতে কাফ্ফারা আদায় করা উত্তম, এতে মৃতব্যক্তির ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ও বেতের নামাযকে মিলিয়ে মোট ছয় ওয়াক্ত ধরেই কাফ্ফারা দিতে হয়।

প্রতি ওয়াক্ত ফরয-ওয়াজিব নামাযের জন্য একজন লোকের রোযার ফিৎরা পরিমাণ গম, আটা, চাউল কিংবা তার সমান মূল্যের নগদ টাকা কাফফারা স্বরূপ মিছকিন-গরীবদেরকে দিয়ে দিতে হয়।

অথবা এক এক ওয়াক্ত নামাযের জন্য একজন মিছকিনকে কাফ্ফারা স্বরূপ দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে আহার করাতে হয়। পৃথকভাবে দু'জন মিছকিনকে এক এক বেলা আহার করালে কাফ্ফারা আদায় হবে না।

জীবিত থাকতে নামাযের কাফ্ফারা দেওয়া যায় না।

✪ সন্তান-সন্ততির বয়স যখন সাত বছরে পৌঁছে, তখন থেকে নামায আদায়ে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য তাদেরকে প্রত্যহ আদেশ-নির্দেশ দিয়ে যেতে হয়। আর যখন তাদের বয়স দশ বছরে গিয়ে পৌঁছে, তখন থেকে নামায আদায়ের জন্য তাদেরকে (প্রয়োজনে হাত দ্বারা হালকা ভাবে) শাস্তি দিয়ে যেতে হয়।

যেহেতু আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন মজিদে এরশাদ করেন,

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ـ

অর্থঃ হে মো'মিনগণ! তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গ তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য অধীনস্থ লোকদেরকে নামায আদায় করে যাওয়ার জন্য আদেশ দিয়ে যেতে থাক এবং নিজেও নামায আদায়ের উপর স্থির থাক।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আল্লাহর নবী (দঃ) এরশাদ করেন,

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ (ابو داؤد)

অর্থঃ তোমরা তোমাদের সাত বৎসর বয়সী ছেলে-মেয়েদেরকে নামায আদায়ের জন্য আদেশ-নির্দেশ দিয়ে যাও, আর তোমাদের দশ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদেরকে নামায আদায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে যাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজের স্ত্রী-পরিজন ও ছেলে-মেয়েদেরকে নামায ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে তা'লীম বা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং নামায আদায় ও অপরাপর যাবতীয় ধর্মীয় অনুশাসন পালনে অভ্যস্থ করে তোলার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামী, পিতা-মাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকগণের উপরই ন্যস্ত। অভিভাবকগণ যদি এ দায়-দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করেন, তা-হলে স্বীয় স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ও অন্যান্য অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে হাশরের বিচার দিবসে সর্বপ্রথম অভিভাবকগণকেই জিজ্ঞাসাবাদ ও পাকড়াও করা হবে। সঠিক উত্তর দেয়া না গেলে পরিণামে অভিভাবকদেরকে শাস্তি ভোগ করা লাগবে।

এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন,

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا........

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের স্বীয় পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে ও অপরাপর পরিবার ভুক্ত লোকদেরকে জাহান্নামের অগ্নি-শাস্তি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর।

সুতরাং পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকদের জন্য নিজেদের ছেলে-মেয়ে ও অপরাপরদেরকে নামায শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা, তদুপরি তাদেরকে নামায-রোযা আদায়ে অভ্যস্থ করে তোলার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য।

✪ এ দুনিয়াবী জীবনে নামাযী মুসলিম বান্দার জন্য বিশেষ আত্মিক শান্তি এবং পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিশেষ সন্তোষ, বিভিন্ন পুরস্কার, বিশেষতঃ জান্নাত ও আল্লাহ পাকের মহা-মূল্যবান পবিত্র দীদার-দর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ -

অর্থঃ যারা নামায আদায়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্ন নেয় তাঁরা বেহেশ্‌তের মধ্যে খুবই সম্মানী হবে।

অপরদিকে বেনামাযী মুসলিমের জন্য দুনিয়াতে আত্মিক অশান্তি, আল্লাহ পাকের অসন্তোষ এবং আখেরাত জীবনে আল্লাহ তাআলার ভীষণ গযব-ক্রোধ, জাহান্নামের বিভিন্ন পদ্ধতির ভয়ানক আযাব-শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে ; যা পবিত্র কোরআন ও হাদীছ শরীফে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযের ফাযায়েল

সম্মানিত পাঠক!

✪ পবিত্র কোরআন মজিদের মধ্যে একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় যে, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কোরআন পাকের প্রায় শতেকের কাছাকাছি আয়াতে নামায প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন। নামাযের গুরুত্ব কত অধিক এতে তা সহজেই অনুমেয়।

✪ অনুরূপভাবে নবীয়ে আকরম হুযুর পুরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নামাযকে দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ (Piller) অর্থাৎ ধর্মের মূল ভিত্তিরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আল্লাহর নবী এরশাদ করেছেন,

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ (منية المصلى، منبهات ابن حجر رح)

অর্থঃ নামায দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ বিশেষ। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায আদায় করল, সে নিশ্চয় মূলতঃ ধর্মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করল। আর যে ব্যক্তি নামায তরক করল, সে নিঃসন্দেহে ধর্মকেই ধ্বংস করল।

✪ দ্বীন ইসলামের যাবতীয় এবাদত ফরয হওয়ার খোদায়ী নির্দেশ আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এ পৃথিবীতে অবস্থান কালেই পেয়েছেন।

আর আল্লাহর হাবীব, নূরের নবী রাহমাতুল্লিল্ আলামীন হুযুর পুরনূর (দঃ) যখন পবিত্র মেরাজের রাতে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিশেষ আমন্ত্রণে আরশে মুআল্লায় মহা মহীয়ান প্রভুর একেবারে নৈকট্যে-সান্নিধ্যে গিয়ে পৌছেছিলেন এবং যখন নবীয়ে পাক (দঃ) চির আকর্ষিত, চিরসুন্দর মহা-মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহর নূরী জাত-সত্তাকে অবলোকনের মাধ্যমে রব্বুল আলামীনের নূরানী দর্শন-স্বাদ উপভোগ করছিলেন- ঠিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই আনন্দপূর্ণ-মুবারক মুহূর্তেই প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি (দঃ) সরাসরি নামায ফরয হওয়ার আদেশটি লাভ করেন।

✪ এ সূত্রেই নামাযকে হুযুর আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মো'মিনদের জন্য মেরাজ রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

কেননা মহান আল্লাহর পবিত্র নূরের আদি সৃষ্টি, খোদার একমাত্র প্রেমাস্পদ নবী (দঃ) ছাড়া সৃষ্টির অপর কারো জন্য এ পৃথিবীতে অবস্থান কালে মানবীয় চর্মচক্ষু দ্বারা আল্লাহর অপরূপ সুন্দর নূরানী সত্তার দর্শন লাভ সম্ভব না হলেও প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু-আলাইহি ওয়াছাল্লাম দুর্বল ও পাপী উম্মাতের জন্য প্রভু আল্লাহর দর্শন স্বাদ উপভোগের একটি উত্তম সুযোগ নিয়ে আসলেন যে, মো'মিন, খোদাপ্রেমিক বান্দাগণ এর মাধ্যমে আত্মার চক্ষু দিয়ে খোদার দর্শন-স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।

আর ঐ সুযোগের নামই হচ্ছে ছালাত বনাম-নামায। নামায আদায়ে মনোনিবেশ করলেই তারা এর মাঝে আত্মার চক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখতে পাবেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) এরশাদ করেন–

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ নামাযই হচ্ছে মো'মিন-বিশ্বাসী প্রেমিক বান্দাদের জন্য মেরাজ তথা আল্লাহর নূর অবলোকন করার দর্পন স্বরূপ (আল্লাহকে রূহানীভাবে দীদার-দর্শনের প্রধান সোপান)।

মহা-মহীয়ান প্রভু আল্লাহর চরম তা'যীম ও প্রেম-ভক্তিভরা অন্তর-মন নিয়ে যখন বান্দা নামায আদায়ে মনোনিবেশ করে তখন সত্যিই সে রূহানীভাবে আল্লাহর অপরূপ নূরানী দর্শন-স্বাদ উপভোগ করতে থাকে।

এদিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) পবিত্র হাদীছে এরশাদ করেন–

اِنَّ السَّاجِدَ يَسْجُدُ فِىْ قَدَمَىِ الرَّحْمٰنِ ۔ (جامع الصغير للسيوطى)

অর্থঃ খাটি প্রেমিক নামাযী বান্দা মূলতঃ মহীয়ান-গরিয়ান প্রভু আল্লাহর কুদরতী নূরানী পা মোবারকেই ছজ্‌দা করে থাকেন।

সুতরাং সম্মানিত পাঠক! এতে বুঝে নিতে পারেন যে, নামায মো'মিন বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার কত বড় মহান দান।

✪ হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযুর পুরনূর (দঃ) এরশাদ করেন,

اَلْعَبْدُ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَكُشِفَتْ لَهُ الْحُجُبُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ رَبِّهٖ تَعَالٰى ۔

অর্থঃ বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন তাঁর জন্যে আছমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং আল্লাহ ও উক্ত নামাযী বান্দার মধ্যকার পর্দা তথা আড়ালকে সরিয়ে নেওয়া হয়। (তখন বান্দা অনায়াসে আত্মার চক্ষু দিয়ে আল্লাহর নূরানী দর্শনে বিভোর হয়ে পড়ে।)

হযরত আবু হোরাইরা (রা) হতে বর্ণিত অপর একটি হাদীছে নবীপাক (দঃ) এরশাদ করেন–

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَىِ الرَّحْمٰنِ فَاِذَا الْتَفَتَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلٰى مَنْ تَلْتَفِتُ ۔ اِلٰى خَيْرٍ مِّنِّىْ ۔ اَقْبِلْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِلَىَّ فَاَنَا خَيْرٌ مِّمَّنْ تَلْتَفِتُ اِلَيْهِ ۔

অর্থঃ মো'মিন বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে মূলতঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর একেবারে সামনেই দাঁড়ায়, তাই মুছাল্লী যখন তার নামাযের মধ্যে আল্লাহর ধ্যান বাদ দিয়ে অন্য কোন পার্থিব বিষয়ের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে তখনই প্রভু আল্লাহ তাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন–

(হে বোকা!) আমি প্রভু আল্লাহ তোমার সম্মুখেই আছি। আর এ অবস্থায় তুমি কিসের দিকে তোমার ধ্যান-মনোযোগকে ফিরালে! আমি প্রভু আল্লাহর চেয়ে অন্য কোন উত্তম কিছুর দিকে মুখ ফিরালে কি? বান্দা! আমার দিকেই ফির, আমার দিকেই মনোযোগী, ধ্যানী হও। বান্দা! তুমি যেদিকে মনোযোগী হচ্ছ, আমি তার চেয়ে অনেক অনেক গুণে উত্তম।

✪ অপর একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى الْعَبْدُ الصَّلٰوةَ فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ صَعِدَتْ اِلَى السَّمَاءِ وَلَهَا نُوْرٌ حَتّٰى تَنْتَهِىَ اِلَى الْعَرْشِ فَتَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَتَقُوْلُ لَهٗ حَفِظَكَ اللّٰهُ كَمَا حَفِظْتَنِىْ ۔

(زواجر مكى)

অর্থঃ আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, কোন মো'মিন বান্দা যখন মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় করে নেয়, তখন উক্ত নামায নূর-জ্যোতির রূপ ধারণ করতঃ উর্ধ্ব আকাশে যেতে যেতে আরশে আযীমে গিয়ে পৌছে এবং কেয়ামত অবধি উক্ত মুছাল্লির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে এমনিভাবে সে বলতে থাকে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

হে নামাযী বান্দা! তুমি যেভাবে আমি নামাযকে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে আদায় করতঃ আমার রক্ষণাবেক্ষণ করেছ তেমনিভাবে মহান আল্লাহ তোমাকেও (দোজখের শাস্তি থেকে) রক্ষা করুন।

✪ "নুজহাতুল মাজালিছ" নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে– পরকালে বিচার দিবসে বিভিন্ন স্তরের নামাযী বান্দাদেরকে যখন জান্নাতে গমনের অনুমতি দেওয়া হবে।

فَتَاتِىْ اَوَّلُ زُمْرَةٍ كَالشَّمْسِ فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ مَنْ اَنْتُمْ ؟ قَالُوْا نَحْنُ الْمُحَافِظُوْنَ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ قَالُوْا كَيْفَ كَانَ مُحَافَظَتُكُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالُوْا كُنَّا نَسْمَعُ الْاَذَانَ وَنَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ تَاتِىْ زُمْرَةٌ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ مَنْ اَنْتُمْ؟ قَالُوْا نَحْنُ الْمُحَافِظُوْنَ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالُوْا كَيْفَ كَانَتْ مُحَافَظَتُكُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالُوْا كُنَّا نَتَوَضَّأُ قَبْلَ الْوَقْتِ ثُمَّ مَعَ سِمَاعِ الْاَذَانِ ثُمَّ تَاتِىْ زُمْرَةٌ اُخْرٰى كَالْكَوَاكِبِ فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ مَنْ اَنْتُمْ؟ قَالُوْا نَحْنُ الْمُحَافِظُوْنَ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالُوْا كَيْفَ كَانَ مُحَافَظَتُكُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالُوْا كُنَّا نَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْاَذَانِ ـ

অর্থঃ তখন সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল-ঝলমলে চেহারা বিশিষ্ট নামাযী বান্দাদের প্রথম দলটি জান্নাতে গমন করবেন– তাঁদেরকে দেখে ফেরেশ্‌তারা জিজ্ঞাসা করবেন– তোমরা কারা? তোমাদের কোন আমলের বদৌলতে তোমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে? উত্তরে মুছাল্লীরা বলবেন, আমরা নামাযী মুসলমান। তখন পুনঃ ফেরেশ্‌তারা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা কি রূপে নামায আদায় করতে?

উত্তরে তারা বলবেন, আমরা আযান হওয়ার আগেই মসজিদে গমন করতঃ নামায আদায়ের জন্য অপেক্ষমান থাকতাম।

অতঃপর পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সমুজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট নামাযীদের অপর একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করলে ফেরেশ্‌তারা পূর্বের ন্যায় তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করবেন। তারা উত্তরে বলবেন, আমরা আযান শুনার সাথে সাথেই অজু করে নামায আদায়ের জন্য মছজিদে আসতাম।

এমনিভাবে তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট অপর একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখে ফেরেশ্‌তারা বলবেন, তোমরা কারা? উত্তরে তাঁরা বলবেন, আমরা ঐ সমস্ত নামাযী বান্দা–যারা আযানের পরেই অজু করতঃ মছজিদে এসে ইমামের ১ম তাকবীরে তাহরীমার সাথে জামাতে নামায আদায় করতাম।

✪ অন্য একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ حَالَتِهِ يَكُوْنَ الْعَبْدَ عَلَيْهَا اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اَنْ يَرَاهُ سَاجِدًا وَيُعَفِّرَ وَجْهَهُ فِى التُّرَابِ ـ (كنز العمال)

অর্থঃ হযরত হোজাইফা (রা) বলেন যে, আল্লাহর প্রিয় রাছূল (দঃ) এরশাদ করেছেন– মহান আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার অবস্থা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় অবস্থা হচ্ছে (নামাযে) তার ছিজদারত অবস্থা। সে যখন নামাযের ছজ্‌দা দিতে গিয়ে তাঁর কপাল– চেহারাকে মাটিযুক্ত করে, তার সে দৃশ্যখানা মহান আল্লাহর কাছে অত্যধিক প্রিয়রূপে বিবেচিত হয়।

✪ অপর একটি হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে ঃ

اِذَا صَلَّى الْمُؤْمِنُ وَتَقَبَّلَهَا اللّٰهُ مِنْهُ خَلَقَ مِنْ صَلٰوتِهِ صُوْرَةَ الْمَلَكِ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَكُوْنُ ثَوَابُ ذٰلِكَ لِمَنْ يُصَلِّىْ ـ

(لَطَائِفُ الْمِنَنِ لِلشَّعْرَانِىْ رح)

অর্থঃ যখন কোন নামাযী বান্দা নামায আদায় করে থাকে এবং প্রকৃতই যদি আল্লাহ পাক ঐ আদায়কৃত নামাযকে কবুল করে থাকেন– তখন ঐ কবুলকৃত নামাযের অছিলায় একজন ফেরেশ্‌তা সৃষ্টিকরা হয় এবং কেয়ামত পর্যন্ত উক্ত ফেরেশ্‌তা নামায আদায় করতে থাকবেন আর এর ছওয়াব সমূহ ঐ মুছাল্লীই পেতে থাকবেন।

✪ আর একটি পবিত্র হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে,

اِذَا سَجَدَ اِبْنُ اٰدَمَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ وَهُوَ يَبْكِىْ يَقُوْلُ اُمِرَ اِبْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ـ

(كَنْزُ الْعُمَّالِ)

অর্থঃ যখন নামাযী বান্দা নামাযের জন্য ছিজদা দেয় তখন শয়তান কেঁদে কেঁদে সরে যেতে থাকে এবং বলে থাকে, (অনুশোচনা! অনুতাপ)! আদম সন্তানের প্রতি ছিজ্‌দা করার আদেশ হলে এতে তারা (মুসলিমেরা) আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আদেশকে মর্যাদা দিতে গিয়ে ছিজদা করার ফলে তারা জান্নাতী হয়ে গেল, আর আমি শয়তানকে ছিজদা করার জন্য বলা হলে আমি আদেশ অমান্য করায় অর্থাৎ ঐ ছিজদা না করার দরুন চিরজাহান্নামী হয়ে পড়ি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্মানিত পাঠক!

উপরোক্ত মূল্যবান বাণীসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেলেন যে, এই নামাযই মুমিন বান্দার প্রকৃত মে'রাজ, নামাযী নামাযরত অবস্থায় মূলতঃ আল্লাহর অতি নিকটে, একান্ত সান্নিধ্যে, আল্লাহর দর্শনে প্রভু আল্লাহর সাথে কথোপকথনেই মশগুল থাকে, এমনিভাবে নামায আদায়ের ভিতর দিয়েই মূলতঃ প্রভুর সাথে বান্দার রূহানী দর্শন অর্জিত হয়।

✪ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, হুযুর পুরনূর (দঃ) এরশাদ করেছেন– مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ (مسند احمد)

অর্থঃ নামাযই হচ্ছে বেহেশতের চাবিকাঠি অর্থাৎ নামায আদায়ের দ্বারা মো'মেন বান্দা বেহেশতে প্রবেশের ও বেহেশত পাওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করে। অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়।

প্রিয় পাঠক!

মনে করুন! যদি বাস্তবে এমনিই ঘটে যে, কোন মো'মেন বান্দা পরকালে ঈমান ও অপরাপর নেক আমলের বিনিময়ে বেহেস্তের অধিকারী হলেন, আর সেইসূত্রে তিনি তার জন্য নির্ধারিত বেহেশতের দরজায় পৌছেও গেলেন, কিন্তু গিয়ে দেখতে পেলেন–দরজায় তালা ঝুলানো রয়েছে, আর একজন ফেরেশ্‌তা দরজায় পাহারারত আছেন। তখন ঐ মো'মেন বান্দা ফেরেশ্‌তাকে বললেন– ভাই! এটা আমারই বেহেশত-বাড়ী। আল্লাহর তরফ থেকে ইহা আমার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি আমার এ বেহেশতে প্রবেশ করতে চাই। তখন পাহারারত ফেরেশ্‌তার পক্ষ হতে বলা হবে– ভাই! আপনি তো দেখছেন যে, এটা তালাবদ্ধ, এর চাবি হচ্ছে মো'মেন বান্দার নামায, আপনি এর চাবি নিয়ে আসুন, আমি পাহারাদার মাত্র ; আমার কাছে এর কোন চাবি নাই।

যাই হউক, যদি ঐ লোক সত্যিই "নামাযী হন তাহলেতো নিশ্চয় নামাযের বদৌলতে তার জন্য বেহেশতের তালা খুলে যাবে এবং তিনি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন।

আর যদি সে লোক বেনামাযী হয়, তাহলে বেহেশতের মালিকানা লাভ করে ও বেহেশতে প্রবেশ মুহূর্তে বাঁধা প্রাপ্ত হল, আর ঐ মুহূর্তে সেইলোক কতই যে ভীষণ অনুতাপ-অনুশোচনার সম্মুখীন হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পেয়েও ভোগ করতে না পারাটা কতটুকু মর্মবেদনার ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়।

সুতরাং নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পরকালের যাত্রালগ্নে বেহেশতের চাবি সাথে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা হুযুর করিম (দঃ) নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনারত ছিলেন এবং ঐ প্রসঙ্গে এরশাদ করলেন–

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۔

(مسند احمد، دارمی)

অর্থঃ যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করবে উহা তার জন্য (কবর, হাশর ও পুলছেরাতের অন্ধকারে) নূর-জ্যোতি হিসাবে হবে (হিসাব-কিতাবের সময়) নামায তার সপক্ষে দলিল-প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে। সর্বোপরি বিচার দিবসে নামায তার সার্বিক মুক্তির সনদ রূপে পরিগণিত হবে।

✪ নবী করিম (দঃ) আরও এরশাদ করেন–

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ (ترمذی، نسائی)

অর্থঃ কিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে বিচারের সময় ঈমানের পরেই সর্ব প্রথম নামায সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। যদি সেইক্ষেত্রে বান্দার নামাযী জিন্দেগী সঠিকরূপে বিবেচিত হয়, তা হলে সে মূলতঃ সফলকামই হল ও মুক্তি পেয়ে গেল। আর যদি তার নামাযী জীবন সঠিকরূপে বিবেচিত না হয় বরং তার মধ্যে গড়মিল পাওয়া যায়, তাহলে তার সর্বনাশ অবধারিত।

✪ পরিশেষে শুধুমাত্র নবী পরিবারের সূত্রে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ সহীহ হাদীছ উদ্ধৃত করে নামাযের ফাযায়েল বিষয়ের আলোচনার ইতি টানছি।

হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রা) তদীয় পিতা হযরত ইমাম বাকের (রা) থেকে– তিনি তদীয় পিতা হযরত জায়নুল আবেদীন (রাঃ) থেকে– তিনি তদীয় পিতা হযরত সাইয়েদুশ শুহাদা ইমাম হোছাইন (রাঃ) থেকে– তিনি তদীয় পিতা হযরত শেরে খোদা আলী মুরতাজা (রা) থেকে, তিনি নবীয়ে পাক (দঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হুযুর পুরনুর (দঃ) এরশাদ করেন,

اَلصَّلٰوةُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَحُبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَسُنَّةُ الْاَنْبِيَاءِ وَنُوْرُ الْمَعْرِفَةِ وَاَصْلُ الْاِيْمَانِ وَاِجَابَةُ الدُّعَاءِ وَقَبُوْلُ الْاَعْمَالِ وَبَرَكَةٌ فِى الرِّزْقِ وَسِلَاحٌ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَلِلشَّيْطَانِ وَشَفِيْعٌ بَيْنَ صَاحِبِهَا وَبَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَنُوْرٌ فِىْ قَلْبِهِ وَفِرَاشٌ تَحْتَ جَنْبِهِ وَجَوَابُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَمُؤْنِسٌ فِىْ قَبْرِهِ،

pdf By Syed Mostafa Sakib

إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ - فَإِذَا كَانَتِ الْقِيَامَةُ كَانَتِ الصَّلٰوةُ ظِلًّا فَوْقَهُ وَتَاجًا عَلٰى رَأْسِهِ وَلِبَاسًا عَلٰى بَدَنِهِ وَنُوْرًا يَسْعٰى بَيْنَ يَدَيْهِ وَسِتْرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ وَحُجَّةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ بَيْنَ يَدَىْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَثِقْلًا فِى الْمِيْزَانِ وَجَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ وَمِفْتَاحًا لِلْجَنَّةِ لِاَنَّ الصَّلٰوةَ تَحْمِيْدٌ وَتَسْبِيْحٌ وَتَقْدِيْسٌ وَتَعْظِيْمٌ وَقِرَاءَةٌ وَدُعَاءٌ وَتَمْجِيْدٌ -

অর্থঃ নামায (১) মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহর রেযামন্দি-সন্তোষ লাভের সর্বাপেক্ষা বড় উপকরণ (২) ফেরেশ্‌তাদের ভালোবাসা পাবার মাধ্যম (৩) পূর্ববর্তী নবী-রছূল (আঃ) গণের ছুন্নাত (৪) মহা-মহীয়ান প্রভু আল্লাহর মারেফত– পরিচিতি লাভের মশাল (৫) নামায ঈমানের স্তম্ভ (মূল খুটি) (৬) দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম (৭) নামায দ্বারা রুজি রোজগার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, (৮) নামায শত্রু তথা নিজের কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, (৯) মৃত্যুর সময় নামায মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার নিকট নামাযীর প্রাণ-সহজভাবে বের করার জন্য সুপারিশ করবে, (১০) নামায অন্ধকার কবরের আলো হবে, (১১) নামায মুছাল্লির জন্য কবরের বিছানা স্বরূপ হবে, (১২) নামায কবরে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে মুনকের-নাকীর ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাব স্বরূপ হবে। (১৩) নামায মরণকাল হতে হাশর পর্যন্ত মৃত মুছাল্লির জন্য বিপদের বন্ধু ও সাথীরূপে থাকবে। (১৪) হাশরের ময়দানে নামায মুছাল্লীবান্দার মাথার উপর (করুণা ও শান্তির) ছায়াস্বরূপ থাকবে (১৫) হাশরে নামায নামাযী বান্দার মাথার তাজ (মুকুট) ও শরীরের পোশাক স্বরূপ হবে (১৬) বিচারের পর (পুলছিরাতের অন্ধকারে) নামায আলোর মশাল স্বরূপ মুছাল্লী বান্দার আগে আগে চলতে থাকবে (১৭) (হিসাব নিকাশের পর) নামায নামাযী ও দোজখের মাঝখানে আড়াল হবে, (১৮) আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে নামাযীকে মুক্ত করানোর জন্য নামায দলিল রূপে উপস্থিত হবে। (১৯) পুলছেরাত পার, হওয়ার জন্য নামায বাহন হবে, (২০) সব শেষে নামায নামাযীকে বেহেশত প্রবেশ করানোর জন্য বেহেশতের চাবি স্বরূপ হবে। কেননা নামায প্রশংসা করা, তাছবিহ পড়া, পবিত্রতা বর্ণনা করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং কেরাত, দোয়া ও মাহাত্ম প্রকাশের বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায আদায় না করার পরিণতি

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

যে কাজের গুরুত্ব যত বেশী ঐ অনুপাতে তা অমান্য করা কিংবা আদায় না করা এবং উহা পালনে অবহেলা-গড়িমসি করার অপরাধও তত মারাত্মক রূপে ধর্তব্য হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ তাআলার এবাদত-উপাসনা সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হল নামায, ইসলামে এর গুরুত্ব ঈমানের পরে সর্বাধিক রূপেই বিবেচিত। সুতরাং নামায তরককারীকে পরিণামে ইহকালে পরকালে মারাত্মক ক্ষতির সম্মূখীন হতে হবে ও ভীষণ শাস্তি ভোগ করে যেতে হবে।

পবিত্র কোরআন করিমে এরশাদ হচ্ছে–

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

অর্থঃ যারা নামায আদায়ের ব্যাপারে আলস্য করে তাদের জন্য ভীষণ ক্ষতি (কিংবা "ওয়াইল" নামক দোজখ) অবধারিত।

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا -

অর্থঃ হযরত নবী রাসূল (দঃ)-এর পরে এমন সব লোকদের আবির্ভাব ঘটে-যারা নামাযকে বরবাদ করেছে (আদায় করেনি) এবং কু-প্রবৃত্তির পেছনে লেগে পড়েছে। তারা অদূর ভবিষ্যতে পরকালের ধ্বংস দেখতে পাবে (ভীষণ শাস্তির সম্মূখীন হবে)।

✪ আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مَضٰى وَقْتُهَا ثُمَّ قَضٰى عُذِّبَ فِى النَّارِ حُقْبًا وَالْحُقْبُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً وَالسَّنَةُ ثَلٰثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থঃ যে ব্যক্তি নামাযকে এমনিভাবে তরক করে বসে যে, শেষ পর্যন্ত ওয়াক্ত চলে যায় অতঃপর সে উহা কাযা আদায় করে থাকে। এভাবে অবহেলা ও গড়িমসি করে নামায আদায় করার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাকে দোজখে এক "হুকবা" পরিমাণ সময় আজাব দেওয়া হবে। এক হুকবা সময়ের পরিমাণ হবে (পরকালের হিসাবে) আশি বছরের সমান, আর প্রত্যেক বছর হবে ৩৬০ দিনের সমান, প্রতিটি দিন হবে (দুনিয়ার) এক হাজার বছরের সমান।

এ হিসাবে দুনিয়ার তিন লক্ষ ষাট হাজার বছরের সমান হবে পরকালের এক বছর। এ অনুপাতে পরকালের আশি বছর হবে দুনিয়ার দু'কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছরের সমান– অর্থাৎ আল্লাহ পাক দয়া করে নামায কাযা করার পাপ যদি ক্ষমা না করেন তা হলে এক ওয়াক্ত নামায তরককারিকে দু'কোটি অষ্টাশি লক্ষ বছর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সম্মানিত পাঠক!

চিন্তা করে দেখুন কাযা করে নামায আদায় করলেও এক রকমের আদায় রূপে বিবেচিত হয়, কিন্তু শুধু অলসতা এবং গড়িমসি করতঃ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় না করার দরুনই যদি এরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয় তাহলে আমাদের মধ্যে যারা সারা জীবন অথবা জীবনের অধিকাংশ সময়ে নামায রোজার তোয়াক্কা না করে অবহেলায় জীবন শেষ করে চলেছে, নামায আদায় করা সম্পর্কে মোটেই যত্নবান নয়, তাদের অবস্থা কিরূপ মারাত্মক হবে তা অতি সহজেই অনুমেয়।

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, বৃদ্ধবয়সে আমি যখন অন্ধ হয়ে পড়ি তখন লোকেরা আমাকে বলল যে, আপনার চোখের চিকিৎসা করিয়ে চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে আনা হবে। তবে শর্ত হচ্ছে কিছুদিন আপনাকে নামায তরক করতে হবে। কারণ নামাযের জন্য নড়াচড়া করতে গেলে আপনার ভীষণ ক্ষতি হবে, তিনি উত্তরে বললেন, নামায তরক করাটা আমার দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। কেননা নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন,

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

অর্থঃ হাশরের বিচার দিবসে নামায তরককারীর সাথে আল্লাহ তাআলা ভয়ানক ক্রোধান্বিত অবস্থায় সাক্ষাৎ (আচরণ) করবেন।

ভায়েরা! আমি অন্ধ থাকতে রাজী আছি, কিন্তু মহান আল্লাহর গযব সহ্য করার শক্তি আমার নাই। তিনি ঐভাবে অন্ধই রয়ে গেলেন। অল্প কিছুদিনের জন্যও নিয়ম মাফিক নামায আদায় কে তরক করেন নি।

✪ হযরত মূছা (আ) এর যুগে এক মহিলা তাঁর নিকট এসে এভাবে আরজী পেশ করলেন–

يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا وَقَدْ تُبْتُ اِلَى اللّٰهِ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَغْفِرَلِىْ ذَنْبِىْ وَيَتُوْبَ عَلَىَّ فَقَالَ لَهَا مُوْسٰى وَمَا ذَنْبُكِ قَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ زَنَيْتُ فَوَلَدْتُ وَلَدًا ثُمَّ قَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهَا مُوْسٰى ع اُخْرُجِىْ يَا فَاجِرَةُ لَاتَنْزِلَ نَارٌمِنَ السَّمَاءِ ـ فَتُحَرِّقَنَا بِشُوْمِكِ فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهٖ مُنْكَسِرَةَ الْقَلْبِ فَنَزَلَ جِبْرَائِيْلُ وَقَالَ يَا مُوْسٰى يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لَكَ بِمَا رَدَدْتَ التَّائِبَةَ اَمَا وَجَدْتَ شَرًّامِنْهَا قَالَ مُوْسٰى يَاجِبْرَائِيْلُ وَمَنْ شَرٌّ مِنْهَا قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ عَامِدًا۔ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ شَرٌّ مِنْ ذٰلِكَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহর নবী (মূছা আ)! আমার দ্বারা এক মহাপাপ হয়ে গেছে কিন্তু এর জন্য তওবা করে নিয়েছি– আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন। এতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি কি পাপ করেছ? মহিলা উত্তরে বলল– প্রথমে আমি জেনা করেছি, এতে একটি পুত্র সন্তান জন্মনিলে আমি সে ছেলেটিকে হত্যা করে ফেলি।

একথা শুনে হযরত মূছা (আ) বললেন– তুমি আমার কাছ থেকে বের হয়ে যাও। কারণ যেন তোমার কৃত এ মহাপাপের দরুন আল্লাহর গযবের আগুনে আমাদেরকেও জ্বালিয়ে না ফেলে।

এভাবে তিরস্কার শুনে মহিলাটি ভগ্ন ও নিরাশ মনে ফিরে গেল। এদিকে সাথে সাথে হযরত জিব্রাইল (আ) ওহি নিয়ে হাজির হলেন এবং বললেন হে মূছা (আ)! মহান আল্লাহ আপনার নিকট জানতে চান যে, এই তওবাকারীণী মহিলাটিকে কেন আপনি তাড়িয়ে দিলেন? আপনার দৃষ্টিতে এর চেয়ে বড় পাপী কি আর কেও নাই? উত্তরে হযরত মূছা (আ) বললেন, এর চাইতে বড়-মন্দ পাপী আর কে হতে পারে! প্রতি উত্তরে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিব্রাইল (আ) বললেন– হে আল্লাহর নবী মূছা– যে ব্যক্তি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে নামায তরক করে বসে– সে ঐ ব্যভিচারীণী ও শিশু হত্যাকারী মহিলা হতেও আল্লাহর কাছে বেশী মন্দ ও বড় পাপী।

✪ হযরত ছামূরা ইবনে জুন্দুব (রা) বলেন যে, আল্লাহর প্রিয় রাছুল (দঃ) প্রত্যহিক নিয়মানুযায়ী একদা ফজরের নামাযের পর (স্বপ্ন ইত্যাদির) বর্ণনা দান প্রসঙ্গে এরশাদ করেন ঃ

ওহে আমার আছহাবগণ শোন!

لَنَا ذَاتُ غَدَاةٍ اَنَّهُ اَتَانِىَ اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاَنَّهُمَا ابْتَعَثَانِىْ وَاِنَّهُمَا قَالَا لِىْ اِنْطَلِقْ وَاِنِّىْ اِنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَاِذَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

أَخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِى بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هٰهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْأُوْلٰى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ ! قَالَ قَالَا لِىْ.......... اِنَّهُ رَجُلٌ يَنَامُ عَنِ الْمَكْتُوْبَةِ ٠ (بخارى)

অর্থঃ বিগত রাতে আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, আল্লাহ জাল্লাশানুহুর তরফ থেকে প্রেরিত দু'জন ফেরেশ্‌তা আমার নিকট এসে বললেন, চলুন। আমি তাদের সাথে যেতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত এমনি একস্থানে আমরা গিয়ে পৌছলাম যেখানে এক লোক শোয়া অবস্থায় রয়েছে, অপর এক ব্যক্তি একটি পাথর হাতে নিয়ে তার পাশে দাড়িয়ে আছে ঐ মুহূর্তেই দেখলাম দাড়ানো লোকটি তার হাতের পাথর খানা শায়িত লোকটির মাথায় সজোরে নিক্ষেপ করল, এতে শায়িত লোকটির মাথাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল।

অতঃপর নিক্ষেপকারী পাথরখানা পুনঃ উঠিয়ে আনার জন্য গেল আর এরই মাঝে আঘাতপ্রাপ্ত লোকটির মাথা পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। নিক্ষেপকারী ফিরে এসে শায়িত লোকটিকে পুনঃ আঘাত করল এবং ক্ষণিকের মধ্যে পূর্ব নিয়মে সুস্থ হয়ে গেল– অর্থাৎ এভাবে পাথর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিল ও সুস্থ হয়ে যেতেছিল।

এ অবস্থা দৃষ্টে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ফেরেশ্‌তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, ছুব্‌হানাল্লাহ! এরা কারা? উত্তরে তারা বললেনঃ নিক্ষেপকারী হচ্ছেন একজন ফেরেশ্‌তা আর যার মাথায় নিক্ষেপ করা হচ্ছে সে হচ্ছে একজন বেনামাযী। ছুন্নাত নফলতো দূরের কথা, সে ফরয নামাযও আদায় করত না। বরং ঘুমিয়ে তথা অলসতায় দিন কাটাত। পরিণামে একে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

✪ "কোররাতুল উয়ুন" নামক কিতাবে হযরত আবু ছাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ফরয নামায বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃত ভাবে তরক করে থাকে, তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেওয়া হয় (আবু নাঈম)।

✪ উক্ত গ্রন্থে আল্লামা আবুল লাইছ ছমরকন্দি (র) কতৃক বর্ণিত অপর একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে ঃ

বিশেষভাবে যে দশ প্রকারের অপরাধী লোকদের শাস্তি দেওয়া হবে তন্মধ্যে নামায তরককারীরাই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য, জাহান্নামে তাদের হাত বাঁধা থাকবে আর ফেরেশ্‌তারা তাদের মুখমন্ডল ও পিঠে ভীষণভাবে আঘাত করতে থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাশর দিবসে বিচারের সময় মহান আল্লাহর দরবারে বেনামাযির কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না

✪ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব দান এবং রাষ্ট্র পরিচালনার কর্ম ব্যস্থতার দরুন নামায আদায়ে গড়িমসি করে থাকে– হাশরের বিচার দিবসে যখন তাকে নামায তরক করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে,

তখন সেলোক মহাপ্রভু আল্লাহ পাকের দরবারে নামায পরিত্যাগের ওজর এরূপে পেশ করবে যে,

✪ হে প্রভু! আপনি আমাকে সামাজিক, প্রশাসনিক দায়িত্বভার ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এর কর্মব্যস্ততা এত বেশী ছিল যে, মাথা চুলকানোর সময়-সুযোগও আমার ছিল না। সে কারণে আমি নামায আদায় করার সময় পাইনি–

আল্লাহ পাক তখন নির্দেশ দেবেন, আল্লাহর নবী হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আ)-কে সে স্থলে উপস্থিত হতে। আল্লাহর এ সম্মানিত নবীদ্বয় যখন উপস্থিত হবেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা কুদরতী যবানে বলবেন! দেখ! আমার এ দু'জন সম্মানিত নবীকে আমি সামান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব দিইনি বরং বিশাল সম্রাজ্যের অধিপতি-সম্রাটই বানিয়েছিলাম, সাথে সাথে এঁরা নুবুওয়াতের মহান গুরুদায়িত্বও পালন করে গিয়েছিলেন। এত বড় বিশাল রাজত্বের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব-পরিচালনায় সীমাহীন কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও এঁরা কোন দিন নামায তরক করেন নি।

তুমি মিথ্যা অজুহাত পেশ করছ, প্রশাসনিক দায়িত্ব ও রাজ্য পরিচালনার কর্মব্যস্ততা যদি নামায থেকে বিরত রাখত, তাহলে নিশ্চয় আমার এ নবীদ্বয়কেও বিরত রাখত, কর্মব্যস্ততার জন্য নয় বরং তুমি অলসতা-অমনোযোগিতাবশতঃ নামায আদায় করনি। তখন আল্লাহ পাক নির্দেশ দেবেন, হে ফেরেশ্‌তারা! তাকে দোজখে নিক্ষেপ কর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ এভাবে এক ব্যক্তি নিজের অসুস্থতার ওযর দেখিয়ে বলবে হে প্রভু! আমি অসুস্থ ছিলাম; রোগ-যন্ত্রণার কারণে আমি নামায আদায় করতে পারিনি–

সে মুহূর্তে আল্লাহর নবী হযরত আইয়ূব (আঃ) কে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলা হবে। হযরত আইয়ুব (আঃ) উপস্থিত হলে আল্লাহ পাক বলবেন,

হে অসুস্থতার ওযর পেশকারী বান্দা!

তুমিকি আমার প্রিয় নবী আইয়ূব (আঃ) থেকেও বেশী অসুস্থ ছিলে? তিনি তো দীর্ঘ আঠার বৎসর যাবৎ মারাত্মক ব্যাধীতে ভুগছিলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তো তিনি আমার (স্মরণ) নামায ছাড়েননি।

রোগ যদি আল্লাহর স্মরণ-নামায থেকে বিরত রাখত, তাহলে তো হযরত আইয়ুব (আঃ) কেও বিরত রাখত।

হে বান্দা! তুমি মিথ্যাবাদী! অসুস্থতার কারণে তুমি নামায তরক করনি বরং অলসতাবশতঃ ইচ্ছা করেই নামায পরিত্যাগ করেছ।

ফেরেশ্‌তারা! একেও জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

✪ মহান আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আর একজন বেনামাযীকে হাজির করা হলে আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কেন নামায আদায় করনি? সে বলবে হে প্রভু আল্লাহ! আমি অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিলাম। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার পালনে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, সময় মত নামায আদায় করার মোটেই সুযোগ পাইনি।

তখন সে মুহূর্তে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ হযরত ইয়াকুব (আঃ) কে তথায় উপস্থিত হতে বলবেন–

হযরত ইয়াকুব (আঃ) হাজির হলে আল্লাহ পাক তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বেনামাযীকে বলবেন ঃ

দেখ! তোমার ছেলে সন্তান বেশী ছিল– না আমার নবী এয়াকুব (আঃ) এর সন্তানাদি বেশী ছিল? এবং তুমি কি তাঁর চেয়েও বেশী ছেলে সন্তানের চিন্তায় বিভোর ছিলে?

আল্লাহ পাক বলবেন, আমার নবী এয়াকুব (আঃ) দীর্ঘদিন ধরে প্রিয় সন্তান হযরত ইউছুফ (আঃ)-এর বিচ্ছেদ ব্যাথায় কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কোমর বাঁকা হয়ে অল্প বয়সে বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু এতদসত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আমার স্মরণ, নামায ছাড়েননি,

মহান আল্লাহ হুকুম করবেন ফেরেশ্‌তারা! একেও দোজখে নিক্ষেপ কর।

এমনিভাবে অন্য একজন বেনামাযী স্ত্রীলোককে মহান আল্লাহর আদালতে হাজির করা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি কেন নামায আদায় করনি?

উত্তরে সে স্ত্রীলোক বলবে, স্বামীর বিবিধ কাজের অত্যাধিক চাপে আমি নামায আদায় করার সময় পাইনি। কারণ আমার সব সময় ভয় হত যে, যদি নামায পড়তে গিয়ে ঘরের কোন কাজ-কর্ম থেকে যায়, তাহলে স্বামী আমাকে মারধর করবে। ঐ কারণে আমি নামায আদায় করতে পারিনি।

অতঃপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হবে, ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আছিয়াকে হাজির কর। যখন তিনি হাজির হবেন তখন আল্লাহ তাআলা বেনামাযী স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করে বলবেন,

হে বান্দী! তোমার স্বামী অধিক যালেম ছিল না আছিয়ার স্বামী ফেরাউন অধিক যালেম ছিল? বেনামাযী স্ত্রীলোকটি উত্তরে বলবে, হে প্রভু! ফেরাউনই অধিক যালেম ছিল। তখন মহান আল্লাহ বলবেন,

দেখ! যালেমের স্ত্রী হয়েও আছিয়া (আঃ) এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করেনি।

স্বামীর যুলম যদি কাউকে নামায থেকে বিরত রাখতো, তাহলে নিশ্চয় আছিয়াকেও বিরত রাখত।

হে বান্দী! তুমি স্বামীর যুলমের মিথ্যা ওযর পেশ করছ, তুমি ইচ্ছা করেই অলসতা বশতঃ নামায তরক করেছো। ফেরেশ্‌তারা! তাকেও দোজখে নিক্ষেপ কর।

এভাবে আরো বিভিন্ন পেশার বেনামাযী লোকদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হলে সকলেই এক একটি মিথ্যা অজুহাত পেশ করে রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, কিন্তু সে মহা বিচারের দিন কারো কোন ওযর-আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। [তাফছীর রুহুল বয়ান]

অতএব, দুনিয়া– আখেরাতের অনন্ত শান্তি লাভ এবং পরকালীন ঐ ভীষণ আযাব-শাস্তি হতে নিজেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সর্বোপরি একমাত্র মহান আল্লাহর পরম সন্তুষ্টি অর্জন-উদ্দেশ্যে প্রত্যহ ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেককে সচেতন ও যত্নবান হওয়া উচিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাপ-গুনাহ মোচনের ক্ষেত্রে নামাযের ভূমিকা

সম্মানিত পাঠক!

এ পার্থিব জীবনে আমাদের চলার প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা অহরহ করুণাময় আল্লাহর যে অসংখ্য নাফরমানী করে চলেছি, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের উক্ত কৃত পাপ সমূহকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়। এ সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে ঃ

আল্লাহ জাল্লা শানুহু পবিত্র কালামে মজিদে এরশাদ করেন–

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থঃ নামায মানুষকে (ক্রমশঃ) যাবতীয় অশ্লীলতা ও পাপ– অন্যায় হতে ফিরিয়ে রাখে।

✪ আল্লাহর পেয়ারা নবী (স)-এর বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আবু যর গেফারী (রা) বর্ণনা করেন যে, শীতের মওসুমে একদা আল্লাহর নবী (স) ভ্রমণে বের হলে দেখতে পান যে, শীতের প্রভাবে গাছের পাতাসমূহ ঝরে যাচ্ছে তখন প্রিয় নবী (স) গাছের একটি ডাল হাতে নিলে পাতা আরও বেশী ঝরা শুরু করে দিল, তখন প্রিয় নবী (স) আমাকে সম্বোধন করে বললেন,

হে আবু যর! আমি আরজ করলাম, ইয়া-রাছুলাল্লাহ অধম খেদমতে হাযির। হুজুর-পুরনূর (স) তখন এরশাদ করেন,

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَتَهَافَتَ مِنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَتَ هٰذَا الْوَرَقُ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ ـ (مسند احمد)

অর্থঃ মুসলিম বান্দা যখন আল্লাহর রেযামন্দি ও সন্তোষ অর্জনের আশায় নামায আদায়ে রত হয়, তখন তার পাপ-গুনাহসমূহ এমনিভাবে ঝরে যায় যেমনি করে এ বৃক্ষের পাতা গুলো অবিরত শীতের প্রভাবে ঝরে পড়ছে।

নামায আদায়ের ফলে আল্লাহর বান্দাগণ পাপ-পংকিলতা থেকে মুক্ত হয়ে কি ধরনের পূত-পবিত্র হয়ে পড়ে খোদায়ী জ্ঞানে মহাজ্ঞানী নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের লক্ষ্য করে এর একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এরশাদ করছেন ঃ

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ـ قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ (بخارى ومسلم)

অর্থঃ তোমরা বলতো দেখি! তোমাদের কোন লোকের ঘরের দরজার সামনে যদি একটি ঝর্ণা কিংবা পুকুর থাকে; আর উহাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে থাকে, এমতবস্থায় তার শরীরে কি কোন প্রকারের ময়লা-আবর্জনা বাকী থাকতে পারে? ছাহাবায়ে কেরামগণ উত্তরে বললেন, ইয়া-রাসূলাল্লাহ! এমন অবস্থায় মোটেই ময়লা-আবর্জনা থাকতে পারে না। আল্লাহর নবী (দঃ) ঐ মুহূর্তে বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের ফলাফলও তদরূপ। অর্থাৎ মুমিনদের যে কেউ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করবে তার কোনরূপ ময়লা তথা পাপ-গুনাহ থাকতে পারে না বরং তার প্রতিদিনের কৃত ছগীরা গুনাহসমূহ প্রতি ওয়াক্তের নামায আদায়ান্তে আল্লাহ পাক নিজেই ক্ষমা করে তাকে গুনাহমুক্ত ও পূত-পবিত্র করে দেন, আর কবীরা গুনাহ সমূহ ও নামায আদায়ের সাথে সাথে কৃত তওবা–ইস্তেগ্‌ফারের দ্বারা মাফ হয়ে যাওয়ার আশা থাকে।

✪ আল্লাহর প্রিয় নবী (স)-এর অপর একটি হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে ঃ

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ـ

অর্থঃ বান্দা যখন নামাযে দাঁড়িয়ে "আল্লাহু আকবর" বলে নিয়ত বাঁধে তখন এর বিনিময়ে সে নামাযী বান্দা তার কৃত পাপ সমূহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে পড়ে, যেন তার মা তাকে আজই জন্ম দিলেন। মা কর্তৃক সদ্য প্রসূত নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় নামাযীও নিষ্পাপ হয়ে যায়।

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ فَإِذَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

...ﻠَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَنَامُوْنَ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتّٰى تَسْتَيْقِظُوْا

(ترغيب امام منذرى رح)

অর্থাৎঃ হে আমার উম্মতেরা! তোমরা (তোমাদের কৃত পাপ-গুনাহের কারণে যেন দোজখের আগুনে) জ্বলতেই আছ। হাঁ তুমি (নামাযী বান্দা হিসাবে) যেইমাত্র ফজরের নামায আদায় করে নিলে এর বরকতে তুমি তোমার পাপ-গুনাহের প্রজ্বলিত আগুনে পানি ঢেলে ধুয়ে অর্থাৎ মাফ করিয়ে নিলে।

এভাবে ফজর হতে যোহরের অর্থাৎ উভয় ওয়াক্তের মাঝখানের সময়ের ভিতর বিবিধ প্রকারের পাপ-গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে পুনঃ (দোজখের আগুনে) জ্বলতেই আছ। হাঁ তুমি যেইমাত্র যোহরের নামায আদায় করে নিলে, সেমাত্র তুমি (তোমার এ নামায দ্বারা স্বীয় পাপ-গুনাহের জলন্ত আগুনে পানি ঢেলে) ধুয়ে অর্থাৎ মাফ করিয়ে নিলে। অতঃপর জোহর হতে আছর তথা উভয় ওয়াক্তের মাঝখানের সময়ে পুনঃ বিবিধ প্রকারের পাপ-গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার কারণে (দোজখের আগুনে) জ্বলতেই রয়েছ। কিন্তু যেই মাত্র তুমি আছরের নামায আদায় করে নিলে সেইমাত্র যেন (তুমি তোমার পাপ-গুনাহে জ্বলন্ত আগুনে নামাযের পানি ঢেলে) ধুয়ে অর্থাৎ মাফ করিয়ে নিলে।

এমনিভাবে আছর ও মাগরিবের ওয়াক্তের মাঝখানে কৃত পাপ-গুনাহ সমূহ মাগরিবের নামায আদায়ের দ্বারা এবং মাগরিব হতে এশা ওয়াক্তের মাঝখানে কৃত পাপ- অপরাধসমূহ এশার নামায আদায়ের দ্বারা মাফ হয়ে যায়- অতঃপর তোমরা ঘুমিয়ে পড়- এ ঘুমিয়ে পড়ার পর থেকে পুনঃ জাগরিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তোমাদের নামে আর কোন গুনাহ লিখা হয় না (যদি এ রাত্রিকালীন সময়ের মধ্যে কোন গুনার কাজ করা না হয়)।

অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী নামাযী বান্দার দৈনন্দিন কৃত ছগীরা গুনাহসমূহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের দ্বারা এমনকি নামায আদায়ের ফাঁকে ফাঁকে তওবা করার দ্বারা নামাযী বান্দার কবীরা গুনাহসমূহও মাফ হয়ে গোছল কারীর ন্যায় পাক-পরিষ্কার হয়ে যায়।

✪ مجالس سنيه شرح اربعين نوويه নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ

مَرَّ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى شَاطِئِ الْبَحْرِ فَرَاٰى طَيْرًا مِنْ نُوْرٍ انْغَمَسَ فِى الطِّيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ فَعَادَ اِلٰى حُسْنِهٖ ثُمَّ انْغَمَسَ فِى

الطِّيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ فَصَارَ عَلٰى حُسْنِهٖ هٰكَذَا اِلٰى خَمْسِ مَرَّاتٍ فَتَعَجَّبَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عِيْسٰى اِنَّ الطَّيْرَ جَعَلَهُ اللّٰهُ مَثَلًا مَنْ يُّصَلِّى صَلٰوةَ الْخَمْسِ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالطِّيْنُ كَالذُّنُوْبِ وَالْاِغْتِسَالُ فِى الْبَحْرِ كَفِعْلِ الصَّلٰوةِ ـ

অর্থঃ একদা হযরত ঈসা (আ) সমুদ্র তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি সেখানে এমন ধরনের উজ্জ্বল-নূরানী বর্ণের একটি পাখী দেখতে পান, যে পাখিটি একবার কাঁদামাটির মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে এর সুন্দর-শুভ্র-উজ্জ্বল বর্ণকে কাদা-ময়লায় মলিন করে ফেলছিল। অতঃপর সে ওখান থেকে উঠে গিয়ে গোছলের মাধ্যমে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়াতে তার ঔজ্জ্বল্য ও শুভ্রতা-সৌন্দর্য ফিরে আসছিল। এভাবে উক্ত পাখীটি পাঁচবার এর শরীরে কাঁদা-ময়লা মেখে পুনঃ পাঁচবার গোছলের মাধ্যমে নিজের শুভ্রতা সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনছিল।

হযরত ঈসা (আ) এ পাখীটির এরূপ ক্রিয়া-কলাপ দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন। তাঁর এ আশ্চর্য হতে দেখে হযরত জিবরাইল (আ) তাকে বললেন, হে আল্লাহর নবী ঈসা! আপনাকে পাখীর আকৃতিতে যা দেখান হল, তা হচ্ছে শেষ নবী আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের দৃষ্টান্ত।

আর কাঁদা-ময়লায় গড়াগড়ি দিয়ে নিজের নূরানী দেহকে মলিন করাটা হচ্ছে, তাঁদের গুনাহ-পাপে দৈনন্দিন জড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত এবং গোসল করে পরিষ্কার হওয়ার দৃশ্যখানা হচ্ছে- তাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণ দৈনন্দিন পাপ-গুনাহে লিপ্ত হয়ে যখনই ময়লাযুক্ত হবে তখনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের দ্বারা ধুঁয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

✪ পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ اللّٰهُ مُنَادٍ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ! قُوْمُوْا فَاطْفُوْا عَنْكُمْ مَا اَوْقَدْتُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَطَّهَّرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا ـ

অর্থঃ হযরত ইবনে মাছঊদ (রা) বলেন যে, আল্লাহর প্রিয় নবী (স) এরশাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছেন —

যখন নামাযের সময় হয়, তখন আল্লাহ পাক একজন আহবানকারী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, ঐ ফেরেশতা এসে লোকদের ডাকতে থাকেন।

হে আদম সন্তান! উঠো, এতক্ষণ যাবৎ পাপ-গুনাহ করে জাহান্নামের যে আগুন তোমরা তোমাদের জন্য জ্বালিয়েছ, তাকে (নামায আদায়ের দ্বারা) নিভিয়ে দাও। অতপর যখন আল্লাহওয়ালা নামাযী বান্দারা নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং ওযু ইত্যাদি করত নামায আদায় করে থাকে, আর এ নামায আদায়ের বদৌলতে দু'নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ঐ লোক থেকে যে সব পাপ-গুনাহ হয়ে থাকে, তা ক্ষমা করে দেয়া হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার তাৎপর্য

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

নামাযের জন্য ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করণ, নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ওযু (প্রয়োজনে গোছল) তথা দৈহিক পবিত্রতা অর্জন ফরয হওয়া, নামায আদায়ের সময়ে হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, নিয়ত করার সময় "আল্লাহু আকবর" বলে কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠান, "রুকূ" তথা হাটুর উপর হাত রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়া, মাটিতে কপাল নাক রেখে ছিজদা করা এবং নামাযের মধ্যে কুরআন পাকের ছূরা-আয়াত পাঠ করা ও হাদীছ শরীফের নির্দিষ্ট দোয়া-দরূদ সমূহ পাঠ করা, কোন অনর্থক ও অহেতুক কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান নয় বরং উল্লিখিত পন্থায় মুছল্লির অঙ্গ-ভঙ্গিকরণ ও তেলাওয়াত-পাঠের মধ্যে নিঃসন্দেহে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্য ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে, যা দূরদর্শিতা, গভীর দৃষ্টি ও চিন্তা-শক্তির দুর্বলতার কারণে হয়ত অনেক সময় সহজভাবে বুঝে এবং উপলব্ধি করে নিতে আমাদের জন্য সম্ভব হয়না।

ঐসব কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যাবলী বুঝতে না পারায় সমাজের অনেক আধুনিক পন্থী ভায়েরা নামাযকে শুধু শারীরিক ব্যায়ামের পর্যায়ভুক্ত বলে ভুল মত ব্যক্ত করে নামায রূপ শ্রেষ্ঠ ইবাদত থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে।

ওদের ঐ ভুল ধারণাগুলোর নিরসন কল্পে নামাযের কার্যক্রম সমূহের অন্তর্নিহিত কারণ ও তাৎপর্যাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। যাতে করে ঐসব ভাইদের ভুল ধারণা সমূহের মূলোৎপাটিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তরে সঠিক বুঝ ও সঠিক জ্ঞান শক্তির উদয় হয়।

প্রিয় পাঠক!

মুসলিম মাত্রেরই জানার কথা যে, নূরানী নবী রহমাতুল্লিল আলামীন (স) নামায ব্যতীত ইসলামের অন্যান্য মৌলিক ইবাদত সমূহ ফরয হওয়ার "খোদায়ী নির্দেশনামা" এ পৃথিবীতে অবস্থান কালেই পেয়েছিলেন। আর "নামায" ফরয হওয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নির্দেশনামা আল্লাহর প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশে মুয়াল্লায় মহান আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তাআলার বিশেষ সাক্ষাৎ-দর্শন ও নৈকট্যের অতি বরকতময় শুভ মুহূর্তেই লাভ করেছেন।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মে'রাজের রাতে নবীয়ে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নূরানী দীদার-দর্শন সরাসরিই লাভ করেন এবং ঐ পরম আনন্দ ঘন মুহূর্তে প্রভূ আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর মাহবুব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মধ্যে এক বর্ণনা মতে নব্বই হাজারের মত কালাম তথা বাক্যালাপ চলে। এরই মাঝে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ)-এর উম্মতের জন্য এ পৃথিবীতে থাকাকালে সরাসরি "আল্লাহর দীদার" লাভ করা অসম্ভব হলেও রূহানীভাবে যেন উম্মতগণ রব্বুল আলামীনের দীদার দর্শনের সুযোগ পায়, সে উদ্দেশ্যে প্রথমে আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মাদী (দঃ)-এর উপর ৫০ (পঞ্চাশ) ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয করে দেন, উম্মাতের পরম হিতৈষী ও দরদী নবী রাহমাতুল লিল্ আলামীন (দঃ) মেরাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে হযরত মূছা (আ) এর পরামর্শে উম্মতের দুর্বলতা ও অপারগতার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে উক্ত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের পরিমাণ হ্রাস করার নিমিত্তে পুনঃ একে একে পাঁচ বার রব্বুল ইজ্জতের দরবারে গমন করতঃ আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানিয়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত হতে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে নেন। তবে নামাযের পরিমাণ ওয়াক্তের দিক থেকে কমিয়ে পঞ্চাশ থেকে পাঁচে আনা হলেও ছাওয়াব- পুণ্যের দিক থেকে ঠিক পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমানই রয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহর পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

অর্থঃ যে কেউ একটি পূণ্যের কাজ করে থাকে এর বিনিময়ে সে এর দশগুণ পূণ্য পেয়ে থাকে।

পবিত্র কোরআনের উক্ত বর্ণনার আলোকে এক ওয়াক্ত নামায সমান ১০ ওয়াক্ত হয়। এ হিসাবে ৫×১০=৫০ অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের দ্বারা পঞ্চাশ ওয়াক্তের ছওয়াব বরাবরই পাওয়া যাবে।

✪ মে'রাজের রাতে আল্লাহর মাহবুব নবী (সঃ) আল্লাহ পাক থেকে বিদায় নেয়ার পর পুনঃ পাঁচ বার রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজির হয়ে পুনরায় পাঁচ বার আল্লাহর সরাসরি দর্শন লাভে ধন্য হন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে রূহানীভাবে বান্দাদেরকে দৈনিক পাঁচবার মাওলা ও মনিব আল্লাহ পাকের দর্শন লাভের সুযোগ প্রদাণার্থেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করে দেওয়া হয়েছে।

সম্মানিত পাঠক!

মানুষের দৈনন্দিন জীবন পাঁচ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় ঃ (১) দাঁড়ানো অবস্থা (২) বসা অবস্থা (৩) শয়ন ও (৪) জাগরণ অবস্থা এবং (৫) নিদ্রা অবস্থা।

উক্ত পাঁচটি অবস্থায় বান্দার উপর মহান আল্লাহর যে অহরহ অফুরন্ত রহমত ও করুণাবারি বর্ষিত হচ্ছে, এর শোকরিয়া কি উপায়ে আদায় করা যায় তা মানুষ জানত না। তাই দয়াময় আল্লাহ জাল্লা শানুহু নিজ দয়াগুণে ঐ পাঁচটি নেয়ামতের বিনিময়ে সহজ পন্থায় শোকরিয়া আদায়ের জন্য বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং যে কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করল, সে যেন নিজের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের প্রত্যেক নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করল।

✪ মানুষের দুনিয়াবী জিন্দেগীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপর পাঁচটি কঠিন বিপদ উপস্থিত হয় ঃ

প্রথমতঃ মৃত্যুবরণের কষ্ট,

দ্বিতীয়তঃ কবরের বিপদ,

তৃতীয়তঃ হাশরের সংকট,

চতুর্থতঃ দোজখের উপর অবস্থিত পুলছেরাত পার হওয়ার সমস্যা,

পঞ্চমতঃ বেহেস্তের বন্ধ দরজা খোলার সংকট।

দয়াময় প্রভু আল্লাহ তাআলা মুসলিম বান্দাদেরকে আখেরাতের ঐ পাঁচ প্রকারের সংকট হতে মুক্তি লাভের উপায়- অছিলা ও উপকরণ স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন।

✪ "মুনাব্বিহাতে ইবনে হাজার (রঃ)" নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلٰوةِ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ بِخَمْسِ خِصَالٍ ـ يَرْفَعُ عَنْهُ ضَيْقَ الْمَوْتِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَيُعْطِيْهِ بِيَمِيْنِهِ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

অর্থঃ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে যত্নবান হন, আল্লাহ তাআলা তাকে পাঁচটি নেয়ামত প্রদান করেন। প্রথমতঃ নামাযী বান্দার উপর মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণাকে লাঘব করা হয়, দ্বিতীয়তঃ কবর আযাব হতে নিষ্কৃতি প্রদান করা হয়, তৃতীয়তঃ হাশরের বিচার দিবসে তার ডান হাতে আমল নামা প্রদান করা হবে (যা নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ)। চতুর্থতঃ পুলছেরাত বিদ্যুৎগতিতে দ্রুত পার হতে পারবে, পঞ্চমতঃ বিনা বিচারে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

মোট সতের রাকা'ত নামায ফরয হওয়ার কারণ ঃ

পাঁচ ওয়াক্তে মোট সতর রাকাত নামায ফরয হওয়ার কারণ হল, পবিত্র মেরাজ রজনীতে আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাত আছমান আট বেহেশত এবং আরশ ও কুরছী সহ মোট সতরটি বিশেষ বিশেষ বরকতময় স্থান ভ্রমণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছেন। যেহেতু নামায হচ্ছে প্রিয় নবী (সঃ)-এর ঐ মেরাজের শ্রেষ্ঠ খোদায়ী উপহার, তাই আল্লাহর নবী (দঃ) এর উম্মতগণের ঈমানদার নামাযী বান্দাগণও যেন প্রত্যহ সতর রাকাত ফরয নামায আদায়ের দ্বারা ঐ সতরটি বরকতময় স্থানে ভ্রমণের ফযিলত অর্জন করে নিতে সুযোগ পায়, সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ) এর উপর দৈনিক সতর রাকাত নামায ফরয করে দিয়েছেন।

✪ নামাযের ভিতর সাতটি কাজকে ফরয করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষের বাহ্যিক দেহখানা, রক্ত, মাংস, হাড়, রগ্‌ (শিরা), গিরা, মজ্জা ও চামড়া সমূহ নিয়ে গঠিত। মানব দেহের এ সপ্ত অংশের স্রষ্টা আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায়ার্থে এবং সাতটি দোজখের আগুন হতে নিজেদের রক্ষা করে নেওয়ার সুযোগ অর্জনার্থে আল্লাহ পাক প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মাতের নামাযের মধ্যে সাতটি কাজকে ফরয করে দিয়েছেন।

✪ নামায হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টকুল ফেরেশতা সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত সমূহের একটি সম্মিলিত রূপ। যেমন- (১) ফেরেশতাদের একদল দিবারাত্রি আল্লাহ জাল্লা শানুহূর তাক্‌বীর ও তাহ্‌লীল পাঠে মাশগুল রয়েছেন, (২) ফেরেশতামণ্ডলীর আর একদল আল্লাহর পবিত্র কালাম- কোরআন করিমের তেলাওয়াতে রত আছেন, (৩) একদল ফেরেশতা সর্বদা দু'হাত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর ছানা-প্রশংসা ও গুণগান করে যাচ্ছেন, (৪) অপর একদল ফেরেস্তা রুকু অবস্থায় মাথা ঝুকিয়ে আল্লাহ পাকের তাছবীহ পাঠে রত আছেন, (৫) ফেরেশতাদের আর একটি দল ছিজদার মধ্যে পড়ে অহরহ মহান আল্লাহর তাছবীহ পাঠ করে যাচ্ছেন। (৬) অপর একদল ফেরেশতা আত্তাহিয়্যাতু পাঠের অবস্থায় বসে বসে আল্লাহর মহানত্ব, গুণগান ও ফরিয়াদ-প্রার্থনা করে যাচ্ছেন, (৭) এ সকল ইবাদতরত ফেরেশতাগণ থেকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু যখন যাকে যে হুকুম-আদেশ করেন তিনি তড়িৎ গতিতে গিয়ে উক্ত হুকুম পালন করে পুনরায় এসে স্ব-স্ব এবাদতে মশগুল হয়ে পড়েন। মহান আল্লাহ তাআলা ফেরেশতামণ্ডলীর এসব এবাদতকে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মতের এবাদতের জন্য নামাযের মধ্যে একত্রিত করে দিয়েছেন- যাতে প্রিয় নবী (সঃ)-এর উম্মতের পুরুষ-নারী সকলে নামায নামের এবাদত আদায়ের দ্বারা কুল ফেরেশতামন্ডলীর সম্মিলিত এবাদতের সম পরিমাণের ছওয়াব পুণ্য অর্জন করে নিতে পারে।

✪ রাত দিন মিলে পূর্ণ একদিন হয়। এ একদিনকে ২৪ ঘন্টায় বিভক্ত করা হয়েছে। এ ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকারের গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মাতের উপর দৈনিক মোট পাঁচ ওয়াক্তে সতর রাকাত নামায ও এর প্রতিটি রাকাতে সাতটি কাজ আদায় করা ফরয করে দিয়ে ২৪ ঘন্টার কৃত পাপ-গুনাহ (১৭ +৭) ২৪টি নেক আমলের দ্বারা মাফ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দৈনন্দিন ফরয নামায আদায়ের জন্য (১) ফজর (২) যোহর (৩) আছর (৪) মাগরিব ও (৫) এশা এ পাঁচটি ওয়াক্তকে সুনির্দিষ্ট করার তাৎপর্য।

১. ফজরের ওয়াক্ত

(ক) পবিত্র হাদীছ শরীফের মাধ্যমে জানা যায় যে, ফজরের ওয়াক্ত রাতের প্রহরী কেরামান-কাতেবীন ফেরেশতাগণের বিদায় নেওয়ার এবং দিবসের প্রহরী ফেরেশতাগণের আগমনের সময়।

সে হিসাবে বান্দার দৈনিক ক্রিয়া কর্মের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি এ উভয়টা যেন মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আদায়ের ম ধ্য দিয়েই হয়ে থাকে এবং ফেরেশতারা ও যেন আল্লাহর মহান দরবারে গিয়ে এ স্বাক্ষী প্রদান করতে পারেন যে, হে প্রভু! আমরা আপনার বান্দাকে ছিজদারত অবস্থায় দেখে এসেছি।

এ পবিত্র রহস্যটিকে সামনে রেখে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাগণের দিবসের প্রারম্ভিক আমল রূপে ফজরের নামায ফরয করে দিয়েছেন।

(খ) এটা সকলেরই জানা বিষয় যে, ভোরবেলার স্বচ্ছ আলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও স্বাস্থ্যকরই বটে। এতে জান্নাতের স্নিগ্ধ আলোর কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ধরনের নূরানী ও পবিত্র পরিবেশেই মোমিন বান্দাগণ জান্নাতে মহাপ্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুরপবিত্র দর্শন লাভ করবেন। এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহর হাবীব রহ্‌মাতুল্‌লিল আলামীন (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

হে আল্লাহর বান্দারা! আখেরাত-পরকালে তোমরা (মুমিনগণ) তোমাদের প্রভু আল্লাহ জাল্লাশানুহুকে প্রকাশ্যে দেখতে পাবে। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নূরানী দীদার-দর্শন যদি পেতে চাও, তাহলে তোমরা ফজরের নামায আদায় করে যাও। কারণ আল্লাহর পবিত্র দর্শন-স্বাক্ষাৎ লাভের উৎকৃষ্ট আমলই হচ্ছে ফজরের নামায।

(গ) মানবকুলের আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে বেহেশত হতে পৃথিবীতে রাতের অন্ধকারের মাঝেই পাঠান হয়েছিল। এরূপ অন্ধকার দর্শনে তিনি অতিশয় ভয়-ভীতি, আতংক এবং কান্নাকাটির মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর ছোবহে ছাদেকের মুহূর্তে সংকট থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলেন। এতে তিনি ভীতিমুক্ত হয়ে প্রভু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর শোকরিয়া আদায় স্বরূপ সে মুহূর্তে দু'রাকাত নামায আদায় করেছিলেন।[১]

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এ দু'রাকাত নামায উম্মতে মুছলেমীনের উপর ফরয করে দেন যেন তারাও এর বদৌলতে আখেরাত-পরকালের অন্ধকার সমূহ হতে নাজাতী লাভ করতে সক্ষম হন। (عِنَايَةُ/حَلْيَةُ النَّاجِى شرح منية المصلى)

(ঘ) প্রাতঃকালীন সময়টা হচ্ছে দুনিয়াদার লোকদের বিশ্রামের সময়। বিশেষতঃ যারা দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে নিজের স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাকে ভুলে বসেছে, অধিক রাত পর্যন্ত তারা বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদ মূলক ক্রিয়া-কর্মে ও রঙ-তামাশায় লিপ্ত থাকে। অধিকন্তু তারা রাতের শেষ ভাগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

অপর দিকে আল্লাহ-রাছূল প্রেমিক লোকেরা আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসার তাগিদে রাতের শেষভাগে আরামের নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ প্রভু আল্লাহ তাআলার স্বরণে রব্বুল আলামীনের দরবারে অতিশয় দীনতা-হীনতা ও কাকুতি-মিনতি সহকারে নিজের প্রেম-আরাধনা নিবেদন করে যায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেমিক ও অপ্রেমিক বান্দা কারা? তা পার্থক্য করে দেখাবার উদ্দেশ্যে, বিশেষতঃ খোদা-রাছূল প্রেমিক নেককার বান্দারা বেনামাযী বান্দাদের নিদ্রাবস্থায় রেখে নামায আদায় করতঃ করুণাময় আল্লাহ পাকের বিশেষ কৃপা ও দয়া লাভ করতে সক্ষম হয়।

এমনিভাবে হাশরের বিচার দিবসে নামাযীগণ যেন বেনামাযী বান্দাদেরকে কান্নারত অবস্থায় রেখে বেহেশতে প্রবেশ করতঃ মহা প্রভু আল্লাহ তাআলার পবিত্র দর্শন লাভে সম্মানিত হতে ও পরম স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয় এতোদ্দেশ্যেই ফজরের নামায ফরয করা হয়।

টীকা ঃ (১)

وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ اُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَظْلَمَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَجَنَّ اللَّيْلُ وَلَمْ يَكُنْ يَرٰى قَبْلَ ذٰلِكَ فَخَافَ خَوْفًا شَدِيْدًا فَلَمَّا انْشَقَّ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى الرَّكْعَةُ الْاُوْلٰى لِلنَّجَاةِ مِنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَالثَّانِيَةُ لِرُجُوْعِ ضَوْءِ النَّهَارِ. فَكَانَ ذٰلِكَ سَبَبَ كَوْنِهَا رَكْعَتَيْنِ فُرِضَتْ عَلَيْنَا ـ (عنايه شرح هدايه)

২. যোহরের ওয়াক্ত

(ক) পবিত্র হাদীছ শরীফের দ্বারা জানা যায়, প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় দোজখের আগুন দ্বিগুণ বেগে জ্বালানো হয় এবং যখন আগুন অতিশয় উত্তেজিত হয়ে উঠে তখন জাহান্নাম হতে আওয়াজ আসে–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

অর্থাৎ ঐ সমস্ত মুমিন বান্দারাই সাফল্য অর্জন করল তথা আমি জাহান্নামের অগ্নি-শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পেল, যারা কাকুতি মিনতি ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করল।

তাই এ যোহরের সময় বান্দাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কোন একটি এবাদত আদায় হওয়াটা একান্ত অপরিহার্য ছিল। [এ সুযোগ প্রদানার্থে] প্রভু আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি তাঁর মহানতম নে'য়ামত রূপে দোজখের অগ্নি শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার উপকরণ সরূপ যোহরের নামায ফরয করে দেন।

আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এদিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ صَلَّاهَا حَرَّمَ اللّٰهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (যোহরের) নামায আদায় করে আল্লাহ পাক তার দেহের জন্য দোজখের আগুন হারাম করে দেন।

(খ) আল্লাহর সৃষ্টি সমূহের মাঝে সূর্য একটি অতি উজ্জ্বল, উত্তপ্ত ও আলোকময় সৃষ্টি। এরই মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবী তাপ ও আলোক রশ্মি গ্রহণ করে থাকে।

এ অবস্থা দেখে পৃথিবীর কাফিরও মুশরিকগণ সূর্যকে পূজনীয় দেবতা হিসাবে বিশ্বাস করে প্রত্যহ সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে তারা সূর্যের পূজা-অর্চনা শুরু করে দেয়।

এমনিভাবে সকালবেলা থেকে সূর্যের জ্যোতি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হতে থাকে এবং ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এর উজ্জ্বলতা চরমে পৌছে যায়।

ঐ সময় তাই মুশরিক-কাফির সম্প্রদায় সূর্যের পুজা-অর্চনা বেশী ভাবে আদায় করতে থাকে।

দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার সাথে সাথে তার উজ্জ্বলতা হ্রাস পায়। ক্রমশঃ তার কিরণ ক্ষীণ হতে থাকে। এতে সূর্যও যে সম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী এবং মহা ক্ষমতাধর চিরস্থায়ী সত্তা আল্লাহ তাআলার একটি নগণ্য সৃষ্টি মাত্র একথা প্রমাণিত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এভাবে সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা উজ্জল বস্তু সূর্যও যখন ক্ষণস্থায়ী নগণ্য সৃষ্টিরূপে প্রমাণিত হল– তখন মহা মহীয়ান-গরীয়ান স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তাআলাই যে একমাত্র পরম পূজনীয় ও এবাদত–উপাসনা এবং অর্চনা পাওয়ার চিরস্থায়ী যোগ্য সত্তা– তাঁর উপাসক বান্দাগণের দ্বারা এ বিষয়ের স্বীকৃতি পাওয়াটাও একান্ত অপরিহার্য ছিল।

এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাদের বন্দেগীর স্বীকৃতি প্রদানের উপকরণ স্বরূপ যোহরের নামায ফরয করে দিয়ে বলেন, হে আমার বান্দারা! এতক্ষণ ধরে আমার একটি নগণ্য সৃষ্টি সূর্যের পূজা-উপাসনা করে কাফির-মুশরিকগণ আমার আযাব ও গযবের যোগ্য হয়েছে। এখন তোমরা আমি আল্লাহর এবাদত– উপাসনায় রত হয়ে আমার রহমত-করুণা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে থাক। এ মহান উদ্দেশ্যেই পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুসলেমীনের উপর যোহরের নামায ফরয করে দেন।

(গ) আল্লাহর খলিল (পরম বন্ধু) হযরত ইব্রাহিম (আ)-কে মহান আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর নিজের সবচেয়ে প্রিয়বস্তু তথা প্রাণপ্রিয় সন্তানকে আল্লাহর প্রেমে কোরবানী দেওয়ার ব্যাপারে পরীক্ষামূলক নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনিও আল্লাহ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নির্দ্বিধায় নিজের প্রিয় বৎস হযরত ইসমাঈল (আ)-কে শোয়ায়ে গলায় ছুরি চালাতে আরম্ভ করে দিলেন। পরিণামে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের প্রতি পিতা-পুত্রের এ নজীরবিহীন অকৃত্রিম ভক্তি-প্রেম ও উৎসর্গীকরণের মনোভাব দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে নিজের পক্ষ থেকে পুত্রের পরিবর্তে দুম্বা তথা পশু কোরবানী দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং ঐ মুহূর্তেই সাথে সাথে আল্লাহর আদেশে হযরত জিব্রাঈল (আ) একটি বেহেশতী দুম্বা নিয়ে হাজির হয়ে পড়লেন।

মহা প্রভু আল্লাহ পাকের এ পরীক্ষায় নিজেকে কামিয়াব করতে পারায় এবং প্রভূর অশেষ করুণা ও সন্তুষ্টি প্রাপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ) তৎক্ষণাৎ শোকরিয়া স্বরূপ ছিজদায় পড়ে আল্লাহ পাকের জন্য চার রাকাত নামায আদায় করেছিলেন।

প্রথম রাকাত অন্তরকে পুত্রস্নেহ থেকে মুক্তকরতঃ আল্লাহ প্রেমে উৎসর্গ করতে সক্ষম হওয়ার শুকরিয়াস্বরূপ, দ্বিতীয় রাকাত আল্লাহ কর্তৃক ছেলে তথা মানুষ কোরবানী দেওয়া থেকে মুক্তি দিয়ে পশু কোরবানী দেওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ, তৃতীয় রাকাত এ কোরবানী উৎসর্গীকরণের মাধ্যমে স্বীয় প্রভু-মনিব আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে রাজী করতে পারার শুকরীয়া স্বরূপ এবং ৪র্থ রাকাত-পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজেকে বিনা দ্বিধায় কোরবানী করে দিয়ে প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে পারার শুকরিয়া স্বরূপ মোট চার রাকাত নামায আদায় করেছিলেন।

উম্মাতে মুসলেমীন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর একনিষ্ঠ উত্তর সূরি হিসাবে তাদেরকেও এমনি ভাবে মহান আল্লাহর প্রেম-প্রীতি অর্জনের সুযোগ প্রদানার্থে রব্বুল আলামীন যোহরের চার রাকাত নামায ফরয করে দেন।[১]

৩. আছরের ওয়াক্ত

(ক) আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর কবরে হউক কিংবা অন্য অবস্থায় হউক ছওয়াল-জওয়াবের বিধান করে দিয়েছেন।

মৃত মানুষের লাশকে কবরস্থ করা হউক বা সংরক্ষণ করতঃ দুনিয়ার যে কোন স্থানে যে কোনভাবে রেখে দেওয়া হউক কিংবা আগুনে পুড়ে ছাই করে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া হউক, এমনিভাবে বিমান-ষ্টীমার ইত্যাদির একসিডেন্টের কারণে লাশ পাওয়া যাক বা না যাক, এ ছওয়াল-জওয়াব থেকে কোন মানুষের রেহাই নেই। পরকাল জীবনের এটাই হচ্ছে প্রথম স্তর ও প্রথম ঘাঁটি এবং সহায়-সম্বলহীন একাকিত্বের সর্বপ্রথম সংকটময় মুহূর্ত।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, জীবিত কালেই জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্ত বিশিষ্ট ছাহাবী, খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম, প্রিয়নবী (স)-এর স্নেহের জামাতা হযরত ওছমান যিন্ নূরাইন (রা) যখন কোন কবরের পাশ দিয়ে যেতেন কিংবা কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন এত অধিক কান্নাকাটি করতেন যে, যদ্দরুণ অশ্রুতে তাঁর দাড়ি মোবারক পর্যন্ত ভেসে যেত। একদা তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আমীরুল মুমিনীন!

বেহেশত-দোজখ সম্পর্কে কত দীর্ঘ আলোচনা আপনার সামনে করা হয় কিন্তু আপনি তা শুনে এত অধিক কান্নাকাটি কখনও করেন না অথচ কবর দেখলে, কবরের কথা শুনলে এত অধিক রোদন করেন কেন?

টীকা ঃ (১)

قِيْلَ اَوَّلُ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الزَّوَالِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ اُمِرَ بِذَبْحِ الْوَلَدِ صَلّٰى اَرْبَعًا اَلْاُوْلٰى شُكْرًا لِذِهَابِ غَمِّ الْوَلَدِ وَالثَّانِيَةَ شُكْرًا لِنُزُوْلِ الْفِدَاءِ وَالثَّالِثَةَ لِرِضَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى حِيْنَ نُوْدِىَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا وَالرَّابِعَةَ لِصَبْرِ وَلَدِهٖ عَلٰى مَضَرَّةِ الذَّبْحِ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْهُ تَطَوُّعًا وَقَدْ فُرِضَ عَلَيْنَا . (عناية)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তরে তিনি বললেন ঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ ـ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ـ

অর্থঃ আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন– কবর হচ্ছে পরকাল জীবনের প্রথম ঘাট (চেক পোষ্ট), যে লোক (ঈমান ও আল্লাহর রহমতের বদৌলতে) এ ঘাট থেকে মুক্তি পাবে এর জন্য পরবর্তী সংকটের ঘাটসমূহ পার হওয়া সহজ হয়ে যাবে। আর যে লোক কবরের এ প্রথম ঘাটে আটকা পড়ে যাবে। পরবর্তী ঘাটসমূহ পার হওয়া তার জন্য আরো বেশী কঠিন হয়ে পড়বে। প্রিয় নবী (স) আরো এরশাদ করেন, আমি নবী পরকালের যতসব ভয়ানকদৃশ্যাবলী দেখেছি, কবরের ন্যায় অধিকতর ভয়ানক দৃশ্য আর কোনটাকে দেখি নাই।

দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম করুণাগুণে তার গুনাহগার বান্দাদেরকে এ কবরের ভীষণ বিপদ থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে আছরের নামায ফরয করেছেন।

কারণ মৃত্যুর পর "আলমে বরযখ" তথা কবরের জীবনের শুরুতেই দুনিয়াবী জীবনে সে কোন অবস্থায় ছিল, কোন ধর্মের অনুসারী ছিল, এসব ব্যাপারে ছওয়াল-জওয়াব (জিজ্ঞাসাবাদ) এর জন্য তাকে যখন কবরে জীবিত করা হবে। তখন প্রত্যেক মৃতলোকের নিকট সে মূহুর্তটিকে আছরের শেষ সময় রূপেই মনে হবে। মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে আছরের শেষ সময় দেখতে পাবে।

যেমন– হাদীছে পাকে বর্ণিত আছে ঃ

وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُوْنِيْ أُصَلِّيْ ـ

(كشف الغمة)

সে দেখবে সূর্য অস্তগামী প্রায়। ঠিক সে মুহূর্তে মুন্‌কির নাকীর ফেরেশতাদ্বয় অতি ভয়ংকর আকৃতিতে এসে মৃত লোককে শোয়া অবস্থা থেকে তুলে বসাবে এবং সাথে সাথে প্রশ্ন করা শুরু করে দিয়ে বলবেন ঃ

مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ ....

অর্থাৎ হে কবরবাসী! তোমার রব্ (প্রভু) কে? তোমার ধর্ম কি? তোমার নবী কে? মৃত ব্যক্তি যদি দুনিয়াবী জীবনে নামায প্রেমিক তথা নামায আদায়ে অভ্যস্থ হয়ে থাকে তাহলে ঐ মুহূর্তে সে আছর নামাযের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে দেখে এরূপ একাগ্রতার সাথে

নামায আদায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, মুন্‌কির নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের তর্জন-গর্জনের ভয়-ভীতি তাঁর মনে মোটেই প্রাভাব ফেলতে পারবে না।

সে ফেরেস্তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকবে—

ভাই! আছরের নামাযের সময় চলে যাচ্ছে, আমি আগে নামাযটা আদায় করে নিই, আমার সময় নষ্ট করবেন না। ফেরেশতাদ্বয় তাকে বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে,

ভাই! এটা দুনিয়া নয় ; বরং এটা হচ্ছে পরজগত, সুতরাং এখানে নামায আদায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া লাগবে না। কিন্তু নামাযী ব্যক্তি এটা কিছুতেই মেনে নিতে চাইবে না। এরূপ বাড়াবাড়ি ও নামায আদায়ের ব্যতিব্যস্ততার ফাঁকে নামাযী বান্দা বিনা ভয়ে অতি দ্রুত ও সহজভাবেই মুনকির-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে তার নিকট কোন অসুবিধাই মনে হবে না।

কবরে নির্ভয়ে অত্যন্ত সহজভাবে মুন্‌কির-নাকীর ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হওয়ার জন্য আল্লাহ জল্লাশানুহু অত্যন্ত মেহেরবানী বশতঃ উম্মাতে মুছলেমীনের উপর আছরের চার রাকাত নামায ফরয করে দিয়েছেন।

(খ) ছহীশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মতানুসারে বলা যায়, সর্বপ্রথম হযরত ছুলায়মান (আ) ই আছরের নামায আদায় করেছিলেন।

অপর এক বর্ণনা মতে হযরত ইউনুছ (আ) পূর্ণ চল্লিশ দিন মাছের পেটে ছিলেন এবং ঐ অবস্থায় তার উপর চারটি অন্ধকার বিরাজমান ছিল। যথা– (১) গভীর সাগরের তলে পানির নীচের অন্ধকার, (২) মাছের পেটের অন্ধকার, (৩) ঐ মাছটিকে অপর একটি মাছ যে গিলে ফেলেছিল, সে অন্ধকার ও (৪) রাতের অন্ধকার। চল্লিশ দিন পর যখন আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি মাছের পেট থেকে বের হয়ে পড়লেন তখন সময় ছিল আছরের। তিনি একাধারে উল্লিখিত চারটি অন্ধকার হতে মুক্তি পাওয়ার শুকরিয়াতে আল্লাহর ওয়াস্তে চার রাকাত নামায আদায় করেছিলেন।

ঐ চার রাকাত নামায মহান আল্লাহর নিকট অতিশয় পছন্দনীয় হওয়ায় তিনি একে উম্মাতে মুছলেমীনের উপরও ফরয করে দিলেন যাতে এ আছরের নামায আদায়ের বদৌলতে তারা যেন (১) লাঞ্ছনাপূর্ণ মৃত্যু (২) বে ঈমান হয়ে মরা (৩) কবরের অন্ধকার ও (৪) পুল ছেরাতের অন্ধকার এবং দোজখের অন্ধকার হতে নিষ্কৃতি লাভে সক্ষম হন। ১

টীকা ঃ (১)

قِيْلَ وَأَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ أَنْجَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ أَرْبَعِ ظُلُمَاتٍ وَقْتَ الْعَصْرِ ـ ظُلْمَةِ الزَّلَّةِ وَظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَظُلْمَةِ الْمَاءِ وَظُلْمَةِ بَطْنِ الْحُوْتِ فَصَلَّاهَا شُكْرًا تَطَوُّعًا وَأُمِرْنَا بِهَا ـ (عناية شرح هداية)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. মাগরিবের ওয়াক্ত

(ক) বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আ) তিনশত বছরের অধিক সময় কাঁদার পর মাগরিবের সময় তাঁর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল। তিনি এর শুকরিয়া স্বরূপ তিন রাকাত নামায আদায় করেছিলেন।

যেহেতু হযরত আদম (আ)-এর দোয়া কবুল হওয়াটা তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর পরবর্তী সন্তানদের জন্য আল্লাহর বিরাট এহছান ছিল। এর জন্য হযরত আদম (আ) এর ন্যায় আল্লাহর দরবারে তাঁর আওলাদগণের ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল। এলক্ষ্যেই উম্মাতে মুছলেমীনের উপর মাগরিবের নামায ফরয করে দেওয়া হয়। যেন তারাও মাগরিবের এ নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়কারীদের দলভুক্ত হতে পারেন।

(খ) হযরত এয়াকুব (আ) চল্লিশ বছর মতান্তরে আশি বছর পর্যন্ত হযরত ইউছুফ (আ)-এর বিচ্ছেদ ব্যথা ও চিন্তায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন পর যখন করুণাময় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ হল এবং হযরত ইউছুফ (আ) এর পরিধেয় জামা হযরত এয়াকুব (আ) কে এনে দেওয়া হল, তিনি এ জামা মুবারককে নিজের চোখে লাগালেন এবং এর অছিলায় সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা হযরত এয়াকুব (আ) এর চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিলেন এবং হযরত ইউছুফ (আ) এর সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন ঘটল। যার ফলে হযরত এয়াকুব (আ) এর সমস্ত ব্যথা ও চিন্তা দূরিভূত হয়ে গেল।

মহান আল্লাহর এরূপ মেহেরবানী প্রদর্শনের শুকরিয়া স্বরূপ হযরত এয়াকুব (আ) মাগরিবের তিন রাকাত নামায আদায় করেছিলেন। এক রাকাত চোখের জ্যোতি ফেরত পাওয়ার শুকরিয়ায়, দ্বিতীয় রাকাত হযরত ইউছুফ (আ)-কে জীবিত অবস্থায় ফেরত পাওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ এবং তৃতীয় রাকাত ইউছুফ (আ) যে আল্লাহর দ্বীনের উপর কায়েম ছিলেন তজ্জন্য।

হযরত এয়াকুব (আ) এর ন্যায় উম্মাতে মুছলেমীনও যেন পরকালের বিভিন্ন সংকট থেকে মুক্তি লাভ করতঃ চিন্তামুক্ত হতে পারেন তজ্জন্য মাগরিবের তিন রাকাত নামায ফরয করে দেওয়া হয়।

(গ) অজ্ঞলোকেরা হযরত ঈসা (আ) কে পিতাবিহীন জন্ম হতে দেখে এবং তার অলৌকিক ঘটনাবলী দেখে তাঁকে [নাঊজুবিল্লাহ] ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরের পুত্র বলা আরম্ভ করে দিল। হযরত মরিয়ম (আ) কে [নাঊজুবিল্লাহ] আল্লাহর স্ত্রীরূপে প্রচার শুরু করে দিল।

যখন হযরত ঈসা (আ) এ বিষয়ে জানতে পারলেন, তখন আল্লাহর দরবারে ওজর হিসাবে আরজী পেশ করলেন ঃ হে আমার স্রাষ্টা ও প্রভু আল্লাহ!

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনি জানেন! আমি আমার সম্প্রদায়ের নিকট বলেছি যে;

اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا وَّجَعَلَنِىْ مُبَارَكًا ـ

অর্থঃ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ–সংশয়ের অবকাশ নাই যে [আমি ঈশ্বর নই এবং ঈশ্বরের সন্তানও নই বরং] আমি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা উপাসক মাত্র। তিনি আমাকে তাঁর মহা গ্রন্থ ইঞ্জিল দান করেছেন এবং আমাকে একজন নবী ও সম্মানিত বানিয়েছেন।

অথচ এগণ্ড মুর্খ লোকেরা নিজেদের তরফ থেকে আমাকে আপনার পুত্র সন্তান বলা শুরু করে দিয়েছে। এতে বিন্দু মাত্রও আমার সম্মতি নাই।

প্রতি উত্তরে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিলেন ঃ

হে আমার নবী ঈসা!

তুমি এ দোষে মোটেই দোষী নও। হযরত ঈসা (আ) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা শুনে শুকরিয়া স্বরূপ মাগরিবের সময় দু'রাকাত নামায আদায় করেছিলেন, অপর দিকে হযরত মরিয়ম (আ) ও এক রাকাত নামায শুকরিয়া স্বরূপ আদায় করেছিলেন। আল্লাহ রাববুল ইজ্জত এ তিন রাকাত নামায উম্মতে মুছলেমীনের উপর ফরয করে দিয়েছেন।[১]

৪. এশার ওয়াক্ত

এশা'র সময়ের অন্ধকার যেন কবর ও দোজখের অন্ধকারের সমতুল্য। যেহেতু হাদীছ পাকের মাধ্যমে নামাযকে "নূর" বলা হয়েছে। সে সূত্রে কবর ও দোজখের অন্ধকারে বান্দাদেরকে "নূর" (আলো) দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুহাম্মদী (সঃ) এর উপর এশার নামায ফরয করে দিয়েছেন। যাতে বান্দারা এশার নামায আদায়ের বদৌলতে আখেরাতের অন্ধকারে নূর লাভ করতে সমর্থ হন।

সুতরাং যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে কষ্ট স্বীকার করতঃ এশার নামায আদায় করে থাকেন– رَزَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى نُوْرًا فِى الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে কবরে-হাশরে পরিপূর্ণ নূর (জ্যোতি) দান করবেন।

টীকা ঃ (১)

قِيْلَ وَاَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ شُكْرًا تَطَوُّعًا عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ خَاطَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَوْلِهٖ اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ الايه ـ وَكَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَالاُوْلٰى لِنَفْىِ الْاُلُوْهِيَّةِ عَنْ نَفْسِهٖ وَالثَّانِيَةُ لِنَفْيِهَا عَنْ وَالِدَتِهٖ وَالثَّالِثَةُ لِاِثْبَاتِهَا الْاُلُوْهِيَّةَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ (عنايه)

প্রিয় নবী (স)-এর পবিত্র হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِىْ الظُّلُمَاتِ اِلَى الْمَسْجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(ابوداؤد)

অর্থঃ ঐ সমস্ত লোকদেরকে এ শুভ সংবাদখানা পৌছিয়ে দেওয়া হউক যারা অন্ধকারের মধ্যে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মছজিদে গমন করে থাকেন, কিয়ামতের বিচার দিবসে তাদেরকে পূর্ণ নূর (আলো) প্রদান করা হবে।

(খ) মহান আল্লাহর সাথে দীদার দর্শনের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে মাহবুবে খোদা (স) এর মে'রাজ নছীব হয়েছিল। প্রিয় নবী (স) বোরাক নামক বাহনে আরোহণ করে সমস্ত ঊর্ধ্ব জগত পরিভ্রমণ করতঃ মহান আল্লাহর একেবারে নৈকট্যে ও সান্নিধ্যে পৌছতে সক্ষম হন এবং মহা প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পবিত্র নূরানী দর্শন সাক্ষাৎ নছীব হয়।

প্রিয়নবী (স) এর উম্মাতদেরকে আকাশের পরিবর্তে এ পৃথিবীতে নামাযে রত করে প্রভু আল্লাহর রূহানী (আত্মিক) দর্শন লাভের সুযোগ প্রদানার্থে রাতের বেলায় এশার নামায ফরয করে দেওয়া হয়।

(গ) কারো কারো মতে হযরত মুছা (আ) যখন মাদায়েন নগর থেকে বের হওয়ার রাস্তা ভুলে গিয়েছিলেন, তখন তিনি চারটি ভীষণ চিন্তায় পতিত হয়েছিলেন, প্রথমতঃ নিজ স্ত্রীর চিন্তা, দ্বিতীয়তঃ সন্তানদের চিন্তা, তৃতীয়তঃ ভাই হারুণ (আ) সম্পর্কে সন্দেহ, চতুর্থতঃ ফেরাউনের অত্যাচারের চিন্তা।

এরই মধ্যে যখন তিনি রাতের অন্ধকারে "আইমন" উপত্যকায় গিয়ে পৌছলেন তখন মহান আল্লাহ তাআলা গায়েবী আওয়াজ দানে তাকে আশ্বস্ত করলেন,

হে মূছা! তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই, এতে যখন তিনি চিন্তামুক্ত হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শুকরিয়া স্বরূপ তিনি এশার চার রাকাত নামায আদায় করেছিলেন।[১]

আখেরাতের যাবতীয় চিন্তা মুক্তির অছিলা স্বরূপ আমাদের উপরও সে এশার চার রাকাত নামায ফরয করে দেওয়া হয়।

টীকা ঃ (১)

وَقِيْلَ اَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ خَرَجَ مِنْ مَدْيَنَ وَضَلَّ الطَّرِيْقَ وَكَانَ فِىْ غَمِّ الْمَرْأَةِ وَغَمِّ اَخِيْهِ هَارُوْنَ وَغَمِّ عَدُوِّهِ فِرْعَوْنَ وَغَمِّ اَوْلَادِهٖ فَلَمَّا نَجَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ وَنُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِىْ صَلَّى اَرْبَعًا تَطَوُّعًا فَاُمِرْنَا بِذٰلِكَ ـ (عنايه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেতরের নামায তিন রাকা'ত হওয়ার কারণ

তানভীরুল কুলূব নামক গ্রন্থে বেতরের নামায প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, মে'রাজের রাতে হযরত নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যাওয়ার পথে বায়তুল মুকাদ্দাছ গিয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামগণের সাথে সাক্ষাৎকালে হযরত মূছা (আ) এর সাথে দেখা হলে হযরত মূছা (আ) প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আপনি যখন ছিদ্‌রাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌছবেন, তখন আমার পক্ষ থেকে এক রাকা'ত নামায আদায় করবেন।

আল্লাহর মহান হাবীব নবীয়ে পাক (দ) মূছা (আ) এর সে ওয়াদা অনুসারে যখন ছিদ্‌রাতুল মনতাহায় গিয়ে পৌছলেন তখন মূছা (আ) এর পক্ষ থেকে এক রাকাত নামায আদায় করলেন এবং ঐ সঙ্গে নিজের পক্ষ থেকেও আর একরাকাত নামায আদায় করে নিলেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসাতে আরও এক রাকা'ত নামায আদায় করতেছিলেন। এ শেষ রাকা'তে অকস্মাৎ নবীয়ে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এর নিয়ত বাঁধা হাত খুলে গিয়েছিল। অতঃপর পুনঃ হাত উঠিয়ে তাকবীর বলে হাত বেঁধে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করে নামায শেষ করেছিলেন।

প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অনুসরণ উদ্দেশ্যে আমাদেরকেও এখন ঐভাবে বেতরের নামায আদায় করা লাগে।

মোট এতিন রাকাত নামায পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করা হয়েছিল বলে- এ নামাযের নাম হয়েছে বেতর তথা বেজোড়।

✪ حِلْيَةُ النَّاجِىْ شَرْحُ مُنْيَةُ الْمُصَلِّىْ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহর পবিত্র দর্শনার্থে গমনকালে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা) নবীয়ে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নিকট আরজি পেশ করেছিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ (দঃ)! যখন আপনি আপনার প্রভুর আরশের দর্শন পাবেন তখন আমার পক্ষে এক রাকাত নামায আদায় করার অনুরোধ রইল।

সে ওয়াদা অনুসারে যখন হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আরশে মুআল্লার দিকে গমন করছিলেন, তখন প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে এক রাকাত নামায আদায় করে নিলেন, সে মুহূর্তে হযরত জিব্রাইল (আ) আল্লাহর রাছুল (দঃ) কে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে,

হে আল্লাহর রাছুল (দঃ)! আপনার বন্ধু আবু বকরের ওয়াদা পুরণ করুন, তখন প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আবু বকর ছিদ্দিকের পক্ষে আর এক রাকাত নামায আদায় করতঃ যখন ছালাম ফিরানোর এরাদা করলেন তখন হযরত জিব্রাইল (আ) বললেন, হে আল্লাহর রাছুল (দঃ)!

আপনার প্রভূ আল্লাহ জাল্লাশানুহু আর এক রাকাত নামায আদায় করার জন্য আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। এতে হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আর এক রাকাত নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যখন ছূরা ফাতেহা ও অন্য ছূরা পাঠ সমাপ্ত করতঃ রুকু'তে যাওয়ার এরাদা করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে জাহান্নাম ও তার শাস্তি সমূহ প্রিয় নবী (দঃ) এর সামনে প্রকাশ করে দেওয়া হলে, ভীষণ আজাব-শাস্তির ভয়াবহতা দেখে দয়ালু নবী (দঃ) গুনাহগার উম্মতদের অবস্থা চিন্তা করতে করতে আত্মভোলা হয়ে পড়লেন এবং নামাযের জন্য বাঁধা হাত খুলে গেল। অতঃপর জিব্রাইল (আ) এসে হাউযে কাউছারের পানি ছিটিয়ে দিলে আল্লাহর প্রিয় রাছুলের স্বাভাবিকতা ফিরে আসল।

তিনি পুনঃ হাত উঠিয়ে "আল্লাহু আকবর" বলে হাত বাঁধলেন ও দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করতঃ জাহান্নামের শাস্তি থেকে (উম্মতের) নিষ্কৃতির ফরিয়াদ জানালেন। আল্লাহর প্রিয় রাছুল-ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে পদ্ধতিতে বেতেরের নামায আদায় করেছিলেন, আমাদেরকে তাই সেভাবে আদায় করতে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সমুদয় নিয়ম ও বিধানাবলীর তাৎপর্য

এতক্ষণ ধরে নামাযের ওয়াক্ত নির্দিষ্টকরণের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন নামাযের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় আরকান-আহকাম তথা আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কর্ম সমূহের তাৎপর্য ইত্যাদির প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে ঃ

সম্পানিত পাঠক!

ইহা সকলেরই জানা ব্যাপার যে, দুনিয়ার যে কোন রাজা-বাদশাহ, সম্রাট কিংবা রাষ্ট্র প্রধানগণের দরবারে হাজিরা উপস্থিতির বেলায় বিভিন্ন শর্তাবলী ও নিয়ম-প্রথা নির্ধারিত আছে; যেমন, দরবারে প্রবেশকারীর শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাক পরিষ্কার ও গোছানো হওয়া, দরবারে প্রবেশের জন্য সময় নির্ধারিত থাকা, অতি ভদ্রতা-নম্রতার সাথে দরবারে প্রবেশ করা, প্রবেশের সাথে সাথে প্রথানুযায়ী ছালাম-অভিবাদন ও সম্মান নিবেদন করা। রাজা, প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সামনে হাত বেঁধে ভদ্রতা শিষ্টাচারের সাথে দাঁড়িয়ে এভাবে প্রশংসা ও গুণগান প্রকাশ করতে থাকা ঃ

হে মহামান্য সম্রাট/রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী!

আপনি অত্যন্ত দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাবৎসল, জনদরদী, নিঃস্বার্থ, গরীব জনগণের পরমবন্ধু, হিতৈষী মহান নেতা ইত্যাদি।

অতঃপর মহামান্যের দরবারে শোকরিয়া কৃজ্ঞতার প্রকাশ দিয়ে নিজের উপস্থিতির উদ্দেশ্য ও হাজত-মাকছুদ সমূহ পেশ করা হয় এবং সবশেষে উপঢৌকন-হাদীয়া ইত্যাদি দিয়ে দরবার থেকে বিদায় নেওয়া হয়।

সম্মানিত পাঠক!

এইতো গেল দুনিয়ার রাজা-বাদশাহগণের দরবারে হাজির হওয়ার রীতি ও নীতি। আর যিনি গোটা সৃষ্টিকুলের একক স্রষ্টা, সারাজাহানের প্রতিপালক, পরিচালক, মহান শাহানশাহ, রাজাধিরাজ, যিনি মূলতঃ রাজাকে রাজত্ব দান করেন, বাদশাহকে ব্যদশাহী দেন, যিনি স্বয়ং রাজা-বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীদের জীবন-মৃত্যুর মালিক, যিনি রাজা, বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীদের ক্ষমতা যে কোন মুহূর্তে কেড়ে নিতে পারেন, হাজার কোটি টাকার মালিক, অফুরন্ত ধন-সম্পদের অধিপতিদের থেকে মুহূর্তের মাঝে সব কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারী ও অসহায় বানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

তিনিইতো সৃষ্টিকুলের সবচাইতে বেশী তা'জীম ও চরম সম্মান এবং প্রশংসা তথা সর্বপ্রকারের এবাদত-আরাধনা ও বন্দেগী-উপাসনা সমূহ পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্ত্বা। সেই মহানের দরবারে উপস্থিতির বেলায়ও নিশ্চয় কিছু নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে।

এদিকে লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি চরম সীমায় তা'জীম প্রদর্শন করার, সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করার, সর্বোপরি তাঁর প্রতি চরম ভাবে দীনতা-হীনতা ও আনুগত্য সহকারে সবচাইতে বেশি ভক্তি-সম্মান প্রকাশের প্রধানতম উপায়-উপকরণ স্বরূপ তার শ্রেষ্ঠতম এবাদত নামায আদায় করাটাকে তিনি নিজেই আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন।

সম্মানিত পাঠক!

সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লক্ষ্য করুন! একজন মুছাল্লী বান্দা যখন নামায আদায় তথা মহা প্রভু আল্লাহ জাল্লাশানুহুর দরবারে হাজির হতে চায় তখন প্রথমে তাকে প্রয়োজনে গোছল করে নতুবা শুধু ওযু করত, পাক-পরিষ্কার হয়ে, পাক-পরিষ্কার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের মাধ্যমে মুছাল্লির বহিরাঙ্গিক পরিচ্ছন্নতা সাধনে। আর অন্তর-মনকে পাপ-কলুষের ধ্যান-ধারণা হতে মুক্ত ও স্বচ্ছ করতঃ তার আত্মিক পরিচ্ছন্নতা সাধনে একাধারে তার শরীর ও আত্মাকে পবিত্র করে নিতে হয়। এরপর মছজিদ কিংবা নামায আদায়ের জায়গা তথা মহা প্রভু আল্লাহর শাহী দরবারে অতিশয় তাজীম সহকারে এবং অত্যাধিক বিনয় ও নম্রভাবে মুছাল্লীকে হাজির হতে হয়।

এভাবে মুছাল্লী মহান পরওয়ার দিগারে আলমের দরবারে হাজির হয়ে তার খেয়াল-ধ্যান ও চিন্তার মোড়কে সর্বদিক থেকে ফিরিয়ে একক উপাস্য মহান আল্লাহর নিরংকুশ প্রভুত্বের স্বীকৃতিকে প্রতিভাত করার লক্ষ্যে, নিজের জীবনের বহুমুখী গতিকে এক আল্লাহর দিকে ধাবিত করার উদ্দেশ্যে, মহা প্রভু আল্লাহর উপাসনার প্রথম ঘর

pdf By Syed Mostafa Sakib

হেদায়াতে ইলাহিয়ার একক ও সুনির্দিষ্ট প্রধানতম কেন্দ্রস্থল। পবিত্র কা'বা শরীফের দিকে একাগ্রতার সাথে মুখ করে দাঁড়াতে হয়।

অতঃপর নিজের হৃদয়-মনকে এক আল্লাহর নিবিষ্ট স্মরণে নিয়োগ করতঃ স্বীকার করে যেতে হয়–

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَاشَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ـ

অর্থঃ আমি আসমান-জমিনের মহান স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পাক -জাতের প্রতি একনিষ্ঠ অন্তরে মনোযোগী হলাম, আর আমি আমার আল্লাহর এবাদতে অন্য কাকেও শরিককারী নই। আমার নামায, আমার হজ্-কোরবানী আমার জীবন, আমার মরণ, তথা আমার সব কিছুই মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত। যার কোন শরীক নাই। এরূপ অঙ্গীকারের জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমার প্রভুর আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণকারীদের অন্যতম।

মনে-মুখে এরূপ অঙ্গীকার বাক্য উচ্চারণ করতঃ আল্লাহর মাহাত্ম এবং নিজের দীনতা-হীনতার বহিঃপ্রকাশ মূলক বাক্য "আল্লাহু আকবর" (আল্লাহই সর্বমহান) বলে দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্ম ও সম্পর্ক হতে অসন্তুষ্টি প্রকাশের বাস্তব নিদর্শন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সব বিষয় হতে সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রতীক হিসাবে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে অতিশয় নম্রতা, দীনতা-হীনতা এবং অপরাধী ও আসামীর বেশে নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে করুণাময়-মার্জনাকারী প্রভু মহারাজাধিরাজ আল্লাহর সামনে দু'হাত বেঁধে নিয়ে দাঁড়ায়। যাতে করে বান্দার দীনতা-হীনতা, তার ব্যাকুলতা ও পাপ-অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক এই অবস্থাকে দেখে মহা-মহিমান্বিত প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর করুণার উদ্রেক হয় এবং অপরিসীম করুণা বিতরণে তিনি নামাযীর সমস্ত পাপ-মার্জনা পূর্বক ইহ-পরকালীন অনুগ্রহ দানে বান্দাকে ধন্য করে তোলেন।

সম্মানিত পাঠক!

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্ তথা রাষ্ট্র প্রধানদের দরবারে প্রবেশ করার পর ছালাম কুর্নিশ বা অভিবাদন পেশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মহারাজাধিরাজ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর গুণবাচক নামই হল "ছালামুন" (শান্তিদাতা), এ গুণ শক্তিতে তিনিই সমস্ত সৃষ্টির উপর ছালামতী (শান্তি) বর্ষণ করেন।

সুতরাং প্রভু আল্লাহকে ছালামাতী (শান্তি) এর দোয়া দেওয়া যায় না, কারণ তিনি কারো দোয়া প্রাপ্তির মুখাপেক্ষী নন, এজন্য হাত বেঁধে ছালাম পেশ করার পরিবর্তে নামাযী বান্দা আরজ করতে থাকে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অর্থঃ হে প্রভু আল্লাহ! আপনি অতি পবিত্র এবং (দীনহীন বান্দা, আপনাকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করছি। আপনার পবিত্র নাম অত্যন্ত বরকতময়, আপনার গৌরব-সম্মান সর্বোচ্চ। আপনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ-উপাস্য নাই।

এভাবে মহান শাহানশাহ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা-গুণগান ও পবিত্রতার স্বীকারোক্তির পর নামাযী বান্দা ভাবতে থাকে ঃ

এ দীনহীন কতইনা সৌভাগ্যবান। মহিমান্বিত মালিক ও মনিবের দরবারে যার নৈকট্য লাভ হয়েছে– [এতে ঈর্ষা পরায়ন হয়ে আমার অসতর্কতার সুযোগে] মানবের চির শত্রু শয়তান-নরাধম আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আ)-কে ভূয়া প্ররোচনা–প্রলোভন দিয়ে চিরশান্তি নিকেতন "বেহেশত" এবং মহা প্রভূ আল্লাহর নৈকট্য হতে যেভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। ঐভাবে আমার অন্তরেও প্ররোচনা দিয়ে সে যেন আমাকেও আল্লাহর এ পবিত্র নৈকট্য হতে দূরে সরিয়ে দিতে না পারে, তজ্জন্য নামাযী বান্দা শয়তান-মালউনের অনিষ্ট হতে আল্লাহর দরবারে নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করতঃ বলে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থঃ মহান আল্লাহর ক্রোধে পতিত (নৈকট্য হতে) বিতাড়িত শয়তান হতে আমি প্রভূ আল্লাহর নিকট নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর সে বলে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থঃ দয়াময়-মেহেরবান মহান আল্লাহর পবিত্র নামেই আরম্ভ করছি।

এরপর নামাযী বান্দা সর্বোত্তম পন্থায় মহান শহিন্শাহ, রাজাধিরাজ প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও গুণগান করতে গিয়ে রাব্বুল আলামীনের নিজেরই নাযিলকৃত তাঁর সর্বোচ্চ শান-মানের উপযোগী প্রশংসা ও গুণ-মহত্ব প্রকাশক এবং তাঁর মহান দরবারে বান্দার আরজী ও আবেদন-নিবেদন পেশ করার নিখুঁত-সুন্দর মুসাবিদামূলক ছূরা "আল্হামদু" শরীফ পাঠ আরম্ভ করে দেয় এবং বলতে থাকে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থঃ সমস্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-গুণগান ঐ মহীয়ান গরীয়ান সত্ত্বারই একমাত্র প্রাপ্য যে মহানের পবিত্র নাম হচ্ছে "আল্লাহ", যিনি নিখিল সৃষ্টির মহান "রব্" তথা লালন-পালনকর্তা, রিযিকদাতা-পরিচালন কর্তা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থঃ যিনি রহমান-রহীম তথা অপরিসীম করুণা ও দয়া বিতরণকারী সত্ত্বা।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

অর্থঃ তিনি যে শুধু এ জগত তথা পার্থিব জগতের ক্ষমতাধর রাজাধিরাজ ; তা নয় বরং এই জগত ফানা-নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর আগত আলমে আখেরাত (পরজগত) বিশেষতঃ হাশরের মহা বিচার দিবসেরও একমাত্র তিনিই মালিক, নিয়ামক ও মহা অধিপতি।

অতএব এ মহা রাজাধিরাজ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রভু আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁরই সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী সূর্য, আগুন, পাথর, মূর্তি ও দেব-দেবতা বা অন্য কোন শক্তি ইত্যাদিকে কোনভাবেই প্রভু, মাবুদ-উপাস্য কিংবা পরম ও চরম পূজনীয় সত্ত্বারূপে মেনে নেওয়া যায়না বরং তিনি আল্লাহ তাআলাকেই একমাত্র যোগ্য পূজনীয় উপাস্য প্রভুরূপে মেনে নিয়ে নামাযী বান্দা তাঁরই প্রভুত্ব এবং উপাসনার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করতঃ বলতে থাকে- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

অর্থঃ হে নিখিলের একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু। আপনাকেই একমাত্র মাবুদ তথা উপাসনা পাওয়ার উপযোগী মনিব রূপে স্বীকার করতঃ একমাত্র আপনারই এবাদত-বন্দেগী করে যাচ্ছি এবং একমাত্র আপনার দরবারেই (মূল) শক্তি-সহায় প্রর্থনা করে যাচ্ছি। হে মালিক, মনিব ও রাজাধিরাজ প্রভু!

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থ ঃ আপনি আমাদেরকে সোজা-সরল-সত্য (কল্যাণকর) পথে পরিচালিত করুন, (যাতে করে আমরা ইহকাল-পরকালের শান্তি ও সফলতা লাভে সমর্থ হই) প্রভু! ঐ সকল লোকদেরই পথে আমাদেরকে পরিচালিত করুন, যাদেরকে আপনি চিরস্থায়ী নেয়ামত (তথা সঠিক ঈমাল ও আমল) দানে কৃতকার্য করেছেন।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

অর্থঃ যারা আপনার ক্রোধ-গজবে পতিত হয়েছে (যেমন ইয়াহুদীগণ) কিংবা যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে-(যেমন খৃষ্টানগণ) অর্থাৎ ইয়াহুদী-খৃষ্টান, নাস্তিক ও কাফির-মুশরিকদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করবেন না।

اٰمِيْن

খোদা! সকলের এ ফরিয়াদ কবুল করে নিন।

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

পবিত্র হাদীছ শরীফের মর্মানুযায়ী "ছূরা ফাতেহা" শরীফ পাঠের পর প্রতিউত্তরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু নামাযী বান্দাকে লক্ষ্য করে বলেন! হে বান্দা! তুমি ছূরা ফাতেহা পাঠের মাধ্যমে যা কিছু পেশ করেছ, আমি তা কবুল করে নিলাম এবং যা তুমি প্রার্থনা করেছ তা নিশ্চয় তোমাকে দেওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ বলেন,

فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থঃ হে আমার প্রিয় বান্দা!

এখন (পুনঃ) তুমি আমার কালাম (কোরআন করিম) হতে যা তোমার সহজ মনে হয় তা পাঠ করে যাও।

এরূপ আশ্বাস-বাণী শ্রবণে নামাযী বান্দা ছূরা ফাতেহা পাঠের পর আল্লাহর পবিত্র অমীয়বাণী আল-কুরআন হতে কোন একটি ছূরা-আয়াত পাঠ করতে শুরু করে দেয়।

প্রিয় পাঠক!

অতঃপর মুছাল্লির মনে এরূপ ভাব ও অনুভূতির উদ্রেক হয় যে, এ পাপী-দীনহীন বান্দা কতইনা সৌভাগ্যবান। একেতঃ মহা-মহীয়ান প্রভুর দরবারে যার নৈকট্য লাভ হয়েছে, অপর দিকে মওলার দরবারে অধমের দরখাস্ত-আরজী এবং আবেদন-নিবেদনও পেশ করা হয়েছে-সর্বোপরি আরও আনন্দের বিষয় যে, প্রভু আল্লাহর দরবার হতে তা কবুল-মঞ্জুর হওয়ার আশ্বাসও পাওয়া গিয়েছে। আহা! এ মহা অনুগ্রহ-দানের শোকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতা কোন্ উপায়ে কোন পন্থায় আদায় করতে পারি! এভাবে ধ্যান করতে করতে মুছাল্লী বান্দা মহান আল্লাহর মহত্ব প্রকাশক বাক্য "আল্লাহু আকবার" বলে বিনাদ্বিধায় রুকু তথা নিজের শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ মস্তক ঝুকিয়ে ও কোমর নত করে দিয়ে বলতে থাকে ঃ

হে আমার মালিক ও মুনিব! বান্দার অনুপযুক্ত, মস্তক তথা আমার জীবনের সর্বস্ব আপনার সামনে হাজির। আমি কেমন করে আপনার অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহের শুকরীয়া আদায় করতে পারি! প্রভু! বান্দা একাজে সম্পূর্ণ অপারগ, তাই বান্দা নতশীরে আপনার সামনে হাজির এই বলে নামাযী বারংবার উচ্চারণ করতে থাকে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থঃ আমি আমার মহা-মহীয়ান প্রভুর [সত্তাগত] পবিত্রতার স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছি।

এরপর মুছাল্লীবান্দা চিন্তা করে থাকে যে, নিশ্চয় আমার দয়াবান-মেহেরবান প্রভু! আমার প্রশংসাগীতি শুনেছেন, কাকুতি-মিনতি দেখেছেন- তাই মুছাল্লী রুকু হতে মাথা উত্তোলনের সময় বলতে থাকে ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

অর্থ ঃ (আমি দীনহীনের প্রশংসা ও গুণগানকারীর গুণগান মহান আল্লাহ শ্রবণ (কবুল) করে নিয়েছেন। তাই মুছাল্লী তৎক্ষণাৎ পুনর্বার বলে উঠে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ـ

অর্থঃ হে আমার মহান প্রতিপালক, অধিপতি রব, আল্লাহ! মূলতঃ আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, যাবতীয় গুণগান সুর্নিধারিত।

শাহী দরবারে মাথা ঝুকিয়ে দিয়ে মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা করণের দরুন বান্দা এত অধিক পবিত্র, ভাগ্যবান ও ধন্য হওয়ার ফলশ্রুতিতে তার হৃদয় ও মনের মাঝে নূতন এক বিশেষ ভাবের উদ্রেক হয় এবং সাথে সাথে মহান আল্লাহর নৈকট্যের নূর সমূহের প্রভাবে তার অন্তর রাজ্য নূর-জ্যোতিতে ভরে যায়, তাই এরই মাঝে সে পুনঃ ধ্যান করতে থাকে যে,

এ মহামান্য প্রভুর সামনে শুধু এ মাথা ঝুকিয়ে দিয়ে কিছু মৌখিক প্রশংসা দ্বারা কি প্রকৃতই তাঁর ঐ অপরিসীম মেহেরবাণীর শুকরীয়া-কৃতজ্ঞা আদায় হতে পারে?

এভাবে মুছাল্লী বান্দা পুনঃ পুনঃ ভাবতে থাকে যে, রুকু তথা দূর থেকে প্রভুর দরবারে হাজিরা দেওয়ার ফলে যদি প্রভুর এত অধিক দয়া-মেহেরবাণী পাওয়া যেতে পারে এবং এত বেশী নৈকট্যে পৌছা যেতে পারে, তাহলে প্রভুর সামনে শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গ মাথাকে সম্পূর্ণ ভাবে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়ে ছিজ্‌দা তথা রাব্বুল ইজ্জতের একেবারে নিকটে এসে যদি হাজিরা দেওয়া যায় তাহলে নূরে ইলাহির তাজাল্লী ও ঝলকের প্রভাব এবং করুণাময়ের করুণা-কৃপা আরো কতইনা বেশী করে পাওয়া যাবে।

এরূপ ধ্যানমাঝে স্বাভাবিক ভাবে তার দিল-মন তাকে ব্যাকুল অস্থির করে তোলে যে, এখনই বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর অতি নিকটে এসে হাজিরা দেওয়ার সুর্বণ সময় ও সুযোগ।

মুছাল্লীর অন্তর তাকে বাধ্য করে যে, এ মুহূর্তেই শরীরের শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত অঙ্গ মাথাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেয়া অর্থাৎ ছজদায় লুটিয়ে পড়া একান্ত দরকার।

পবিত্র হাদীছ শরীফের মর্মানুযায়ী এ দুনিয়াতে বিশ্ব প্রভু আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহুর নৈকট্য লাভের জন্য ছিজ্‌দাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। প্রভুর অতি নিকটে আসার ব্যাপারে তাঁকে ছিজদা করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পন্থা নাই।

এরূপে ধ্যান করতে করতে নামাযী বান্দা অনায়াসে রব্বুল ইজ্জতের মহত্ত্ব প্রকাশমূলক বাক্য "আল্লাহু আকবর" বলে স্বীয় মাথা-কপালকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে ছিজদায় চলে যায় এবং নিজের সর্বশেষ ও চরম দীনতা-হীনতার প্রকাশ দিয়ে প্রভুর

চির গোলামীর অঙ্গীকার করতঃ বিশ্ব নিয়ন্তার পাক-পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করার লক্ষ্যে বারংবার বলতে থাকে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

অর্থঃ আমার মহা-মহীয়ান প্রভু আল্লাহ তাআলাই-সর্বাপেক্ষা চির পবিত্র।

এ ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় নামাযী চিন্তা করতে থাকে যে, এ অধম বন্দা যদি মহা প্রভূ আল্লাহর অপরিসীম দান ও কৃপা-অনুগ্রহের শুকরীয়া-কৃতজ্ঞতা সমস্ত জীবন ভরও করতে থাকি তবুও এ নগণ্য দীন-হীনের দ্বারা তা পুরাপুরিভাবে কখনো আদায় হওয়ার নয়।

এরূপ বলে সে ছিজদা হতে মাথা উত্তোলন করতঃ উঠে বসে পড়ে এবং চিন্তা করতে থাকে যে, আহা! আমার প্রভু অনুগ্রহ-মেহেরবাণী করেছেন বলেইতো আমি এ নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পেরেছি। শয়তান-মালউন একটি মাত্র ছিজদা আদায় না করার কারণে অভিশপ্ত ও আল্লাহর পবিত্র নৈকট্য হতে বিতাড়িত হয়েছে। আমিও যদি অহংকারের ধোঁকায় পড়ে সিজদা না করার অপরাধে অভিশপ্ত হয়ে পড়ি– তাহলে আমার তো রক্ষার আর কোন উপায় নেই, এ ভয়ে নামাযী বান্দা তৎক্ষণাৎ পুনর্বার ছজদায় লুটিয়ে পড়ে।

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

দ্বিতীয় ছিজদা আদায়ের পর সুযোগ বুঝে নামাযী বান্দা আরও বেশী নৈকট্য লাভ এবং পবিত্র হওয়ার আশায় দ্বিতীয় রাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সহসা দাঁড়িয়ে যায় এবং প্রথম রাকাতের অনুরূপ ভাব ভঙ্গিমা ও ক্রিয়া-কলাপ সমূহ আদায় করতঃ অতিশয় আদব ও নম্রতার সাথে বসে পড়ে এবং মনে মনে চিন্তা করতে থাকে (দু'রাকাতী নামায হলে) এখন আমার সব কিছুর একমাত্র মালিকও নিয়ামক রাজাধিরাজ আল্লাহর দরবার হতে বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে। সুতরাং প্রভুর দরবারে এখন নিয়ম মাফিক হাদীয়া-তোহফা পেশ করাই বাঞ্ছনীয়। তাই মুছাল্লি স্বীয় মালিক ও মনীব আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে নিজের একেবারে সম্মুখে হাজির জেনে বলতে থাকে ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ ......

অর্থঃ সমস্ত মৌখিক প্রশংসা-গুণগান তথা আমার মৌখিক– শারীরিক ও আর্থিক এবাদত-উপাসনার যাবতীয় হাদীয়া সমূহ আমার একমাত্র (মালিক ও প্রতিপালক) আল্লাহ পাকের দরবারেই নিবেদিত হউক।

প্রিয় পাঠক!

নামাযী বান্দা কর্তৃক যখন মহিমাময় প্রভূ মহারাজের দরবারে উক্ত তিনটি হাদিয়া পেশ করা সমাপ্ত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখন নামাযী ভাবে, যে মহান সত্তার অছীলা ও প্রেমের খাতিরে আমরা তথা নিখিল সৃষ্টির বিকাশ দেওয়া হয়েছে এবং যে নূরানী জ্বাতে পাকের ওছীলা– মাধ্যমে মালিক ও মনিব আল্লাহর দরবারে পৌছা ও হাজির হওয়া সম্ভব হয়েছে, নিখিলের সে চির সুন্দর সৃষ্টি রহমাতুল্লিল্ আলামীন, শাফীউল মুজনেবীন আহমদ মুজ্তাবা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) কে কিরূপে এ মুহূর্তে স্মরণ না করে পারা যায় ঃ

এ মহা কল্যাণকামী নবী (সঃ)-কে ভুলে বসা, স্মরণ না করা তাঁর প্রতি তাজীম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা বড়ই অন্যায় হবে। এরূপ ভাবতে ভাবতে নামাযী প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এর নূরানী সত্ত্বাকে নিজের সম্মুখে হাজির জেনে অতি আদব-ভক্তি ও নম্রতাভরে নবী (সঃ)-এর পবিত্র খেদমতেও তিনটি হাদীয়া পেশ করতে গিয়ে বলে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থঃ ওহে প্রিয় নবী! আপনার পাক-পবিত্র চরণে এ পাপী গুনাহগার নগণ্য উম্মতের সশ্রদ্ধ ছালাম নিবেদিত হউক এবং আপনার উপর মহামহীম প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অপরিসীম রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক।

অতঃপর সে ঐ পবিত্র মুহূর্তখানাকে সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের এবং দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে অতীব উপযোগী মনে করে নিজের জন্য এবং সকল মো'মেন ভাইদের জন্য ছালামতী ও শান্তির প্রার্থনা করতঃ বলে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

অর্থঃ আমরা অধম পাপীতাপী উম্মতগণের উপর এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। এরপর নামাযী মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা ও আল্লাহর মহান রাছুলের অনন্য রেছালতের স্বীকৃতি প্রদান করতঃ বলে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

অর্থঃ আমি স্বাক্ষ্য প্রদান করছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের যোগ্য অন্য কোন ইলাহ-মাবুদ নেই এবং আরও স্বীকৃতি দিচ্ছি যে আকা ও মাওলা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) আল্লাহর (সর্বশ্রেষ্ঠ) প্রিয় বান্দা ও মহান রাছুল।

অতঃপর নামাযী নিজেকে আল্লাহর অনন্ত রহমত করুণা পাওয়ার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী (সঃ)-কে আল্লাহর মহান দরবারে অছিলারূপে পেশ করতঃ দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে এবং বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

পরিশেষে নামাযী বান্দা আল্লাহ-রাছুলের ঐ নৈকট্যময় অবস্থাকে দোয়া -ফরিয়াদ কবুল করানোর বেলায় অতিশয় উপযুক্ত মুহূর্ত মনে করতঃ নিজের এবং স্বীয় পিতা-মাতার, নিজেকে জ্ঞান শিক্ষা প্রদানকারী উস্তাদ, নিজের পীর-মশায়েখ তথা বিশ্ব মুসলিমের পাপ-অপরাধ মার্জনা করিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং মহাপ্রভু আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা স্বরূপ বলে থাকে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِاُسْتَاذِىْ وَلِشَيْخِىْ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

কিংবা অন্য কোন দোয়া পাঠ করে থাকে।

✪ সবশেষে সে তার ডান ও বামের সম্মানিত ফেরেশতা ও মুছাল্লি ভাইদের প্রতি ধন্যবাদ-শান্তির দোয়া দানে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে নামায সমাপ্ত করে।

অতঃপর নামাযী বান্দা মহামহীয়ান রব্বুল আলামীনের দরবারে অতি নম্রতার সাথে দু'হাত উঠিয়ে কাকুতি-মিনতি ভরে নিজের আদায়কৃত নামায ও অন্যান্য নেক এবাদত সমূহ কবুল করে নেওয়ার ব্যাপারে তদুপরি বিশ্ব মুসলিমের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে দোয়া-মুনাজাত করে থাকে।

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার আলোকে বুঝে নিতে পারেন যে, নামাযের মধ্যে কোরআন-করিম ও দোয়া-দরূদ, কেয়াম-উঠা-বসা-রুকু ছিজদা ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যে কি নিগুঢ় তত্ত্ব এবং কি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে!

অতএব নামাযকে শুধু শারীরিক ব্যায়াম-চর্চা রূপে আখ্যায়িত করার কোন কারণ নেই।

এছাড়া ঐসব ক্রিয়াকলাপের আরও অনেক তাৎপর্যাবলী এবং হেতু রয়েছে– এরূপ ক্ষুদ্র গ্রন্থে এর চেয়ে বেশী কিছু বর্ণনার অবকাশ রাখে না। সৎজ্ঞানীদের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নামাযের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

উপরোল্লেখিত আলোচনার আলোকে এ বিষয়টি আমাদেরকে মেনে নিতেই হয় যে, মহান আল্লাহ পাকই হচ্ছেন সারা জাহানের একক মহীয়ান-গরীয়ান সর্ব শক্তিমান স্রষ্টা, মালিক-মনিব, লালন-পালন কর্তা অধিপতি এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী প্রভূ।

তিনি আমাদের প্রভূ, আমরা সবাই তাঁর ভৃত্য-গোলাম ও বান্দা। তাই তিনিই আমাদের একমাত্র মাবুদ-উপাস্য আমরা তাঁর উপাসক।

তাঁর সঠিক পরিচয় লাভ করতঃ পূর্ণ আনুগত্য স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিজনক এবাদত-বন্দেগী, প্রশংসা ও গুণগান করতঃ প্রভূর খোশনূদী- রেজামন্দি লাভ করাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

এবং এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের কে "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা জাতিরূপে পয়দা করেছেন।

এদিকে লক্ষ্য রেখে পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

অর্থঃ আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র আমার এবাদত-উপাসনা করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।

শ্রদ্ধেয় পাঠক! একটু চিন্তা করে দেখুন, সাধারণভাবে যখন কেউ আমাদের প্রতি সামান্যতম করুণা-দয়া প্রকাশ করে থাকেন, আমাদের সামান্য তম উপকার- কল্যাণই যদি করে থাকেন, তখন স্বাভাবিক ভাবে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তার প্রশংসা মুখর হয়ে পড়ি, অহরহ তার গুণ গান গাইতে থাকি, সর্বোপরি তার প্রতি শ্রদ্ধাবনত ও তার অনুগত হয়ে পড়ি।

এখন ভেবে দেখুন যে মহা-মহীয়ান-গরীয়াণ স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর অপরিসীম দয়া ও রহমত গুণে আমাদের অস্তিত্বের বিকাশ দিয়েছেন। সাধারণ বিকাশ নয় বরং "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা জাত রূপে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মাঝে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন, অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু সমূহের উপর আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। নিখিল সৃষ্টির মাঝে আমাদেরকে সবচেয়ে সুন্দর-সুদৃশ্য আকৃতি, গঠন- প্রকৃতি, শক্তিশালী আত্মা ও বিবেক বুদ্ধি দিয়েই পয়দা করেছেন।

এর সমর্থনে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

অর্থঃ নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) মানুষকে সুন্দরতম গঠন প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছি।

আরও ঘোষিত হয়েছে, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ

অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) বনি আদমকে অত্যন্ত সম্মানী করেছি,

সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর অপরাপর সকল সৃষ্ট বস্তুকে আমাদের সেবায় নিয়োগ-নিয়োজিত করে দিয়েছেন। অপরিসীম ভাবে আমাদের প্রতি অহরহ রহমত-দয়া বিতরণ করে আসছেন এবং এ পার্থিব জগতে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারার মত যাবতীয় উপকরণ সমূহ বিনা চাওয়ায়-বিনা প্রার্থনায় প্রদান করতঃ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন, সর্বোপরি আমাদেরকে তার সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত তথা ঈমান-হেদায়াতের আলো প্রদানে মুসলমান হিসাবে টিকিয়ে রেখেছেন।

সে মহা কুদরতময় খালেক ও মালিক রহমান-রহিম প্রভূর প্রতি আমাদেরকে কিরূপ কৃতজ্ঞ হওয়া, কত অধিক পরিমানে তার প্রশংসা ও গুণগান করা– সর্বোপরি তাঁর প্রতি কতটুকু আনুগত্য স্বীকার করা উচিৎ! তা কি লক্ষ্য করার বিষয় নয় ?

এসব রিবেচনা করে আমাদেরকে বিনা দ্বীধায় একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হয় যে, মানব জীবনের প্রধানতম কর্তব্য এবং মূল করনীয় বিষয় হল, মহা-মহীয়ান প্রভূ আল্লাহ তাআলাকে নিজের একমাত্র "স্রষ্টা ও ইলাহ" (মাবুদ) জ্ঞানে চরম সীমায় তাঁর প্রতি তা'জীম ও আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রর্দশন করা, তাঁরই কাছে নিজের চরম ও পরম দীনতা-হীনতা এবং কাকুতি-মিনতির প্রকাশ দেওয়া, প্রভূর সঠিক মারফৎ-পরিচয় লাভান্তে একান্তভাবে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং সর্বদা তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করে যাওয়াটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বমূহূর্তের জন্য আল্লাহ তাআলাকেই নিজের মাবুদ, মনিব, ও প্রভূ রূপে মেনে নেওয়া, বান্দার জাগরণ-শয়নে, পান-আহারে চলা-ফেরায়, আচার-ব্যবহারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুখে-দুঃখে, শান্তিতে-অশান্তিতে, সুস্থতায়-অসুস্থতায়, ভ্রমণে-বাসস্থানে, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথা জীবনের সর্বক্ষণে-সর্বাবস্থায় কথায় ও কাজের ভিতর দিয়ে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের সঠিক পরিচয় দেওয়া। এ হল এবাদতের সঠিক অর্থ, তাৎপর্য এবং এবাদতের সঠিক রূপ ও মূল্যায়ন। উপরোল্লিখিত প্রশংসা ও এবাদত বন্দেগী আদায়ের উপায়-উপকরণের জন্য প্রয়োজন ছিল এমনি একটি "সম্মিলিত রূপের" যা ঐ সবের সমন্বয় সাধন করতে পারে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরওয়ারদিগারে আলম আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর পেয়ারা হাবীব, রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মাধ্যমে "ছালাত বনাম নামায" রূপ এবাদতকে ফরয করে দিয়ে উল্লেখিত অসমাপ্ত বিষয়ের সমাধান দিলেন এবং সাথে সাথে বান্দাদেরকে এ সুযোগটি ও প্রদান করলেন, যাতে করে তারা "নামায" আদায়ের মাধ্যমে বন্দেগীর সার্বিক পরিচিতি দিতে সক্ষম হয়।

বাস্তবিক পক্ষে মহা-মহীয়ান প্রভূ আল্লাহ তাআলার সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করার এবং প্রকৃত গোলামীর পরিচয় দানের জন্য "নামাযই" হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব উৎকৃষ্ট উপকরণ।

বস্তুতঃ নামায আদায়ের দ্বারা বান্দা তার প্রভূ ও মালিকের প্রশংসা, গুণ-গান এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়, "দোয়ায়ে ছানা" তথা প্রশংসা লহরী গেয়ে তার বন্দেগী আদায়ের সূচনা করে থাকে।

অতঃপর "সূরাতুল হাম্‌দ" তথা প্রভূ আল্লাহর গুণ কীর্তন সূচক সূরা পাঠের দ্বারা বন্দনা-গীতি গেয়ে "প্রকৃত প্রশংসা" যে একমাত্র মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুরই প্রাপ্য, সমস্ত গুণগানের একমাত্র তিনিই যে মালিক-প্রাপক, এবিষয়ের ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং বন্দেগী জীবনের প্রত্যেক শুভ কাজের প্রারম্ভে মহান জ্বাতপাক আল্লাহ রহমানুর-রহিমেরই প্রশংসা-গুণগান দ্বারা শুরু করতে হয়। প্রত্যহ বান্দা নামায আদায়ের ভিতর দিয়ে এ অনুশীলন, শিক্ষা ও ট্রেনিং পেয়ে থাকে।

এমনিভাবে নামায আদায়ের দ্বারা বান্দা তাঁর ধন দৌলতের অহংকার, পদ-মর্যাদার গর্ব, প্রতাপ-প্রতিপত্তির দাপট তথা সব কিছুর মোহ বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ দীনতা-হীনতা, কাকুতি-মিনতি ও পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের সাথে তার দেহ এবং হৃদয়-মনকে আল্লাহর কাছে সপে দেয়। আমিত্ব বলতে তার মধ্যে কিছুই থাকে না।

নিখিল জাহানের মহান প্রভূর দরবারে শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গ মাথাকে নোয়ায়ে ছেজদায় পড়ে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় সে যখন প্রভূর গুণগান গাইতে থাকে, তখনিই বন্দেগীর এক অপূর্ব ও অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযই হল এমনি ধরণের একটি এবাদত, যা একাধারে শরীর, মন-আত্মা ও চরিত্রের উপর ক্রিয়াশীল এবং এ নামাযই এক সঙ্গে মানুষের দেহ-মন ও স্বভাব চরিত্রকে সতেজ, সরস ও মাধুর্য মন্ডিত করে তোলে।

প্রিয় পাঠক!

কিভাবে "নামায" আদায়ের দ্বারা মানুষের চারিত্রিক সংশোধনী সাধিত হয় তা একটু লক্ষ্য করুন।

বান্দা প্রত্যহ নামায আদায় করতে গিয়ে তার প্রভূ প্রতি-পালকের দরবারে হাজিরা দিয়ে থাকে। এরূপ ভাবে দৈনিক পাঁচবার যাকে বাধ্যতামূলকভাবে মনিবের দরবারে হাজিরা দিতে হয়, সে কোন সাহসে নিজের মালিক ও মনিবের মর্জির খেলাফ, তাঁরই আদেশ-নিষেধের বিপরিত কাজ-কর্ম ইত্যাদি করতে পারে?

যখন বান্দা নামাযের বাইরে জীবনের অন্যান্য কর্ম ক্ষেত্রে "নফছ শয়তানের" বশিভূত হয়ে মালিকের নাফরমানী করতে থাকে এবং নামাযে তথা মাওলার দরবারে বারংবারের কৃত নাফরমানী সমূহের জন্যে একবার, দু'বার, তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

এভাবে করতে করতে একদিন পুনঃকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে তার লজ্জা অনুভূত হয় এবং তার মনে অনুতাপ-অনুশোচনা দোলাদেয় ও ঢেউ খেলতে থাকে। সে নিজে নিজে ভাবে হায়! একবার মনিবের অপরাধ করে মুখ দেখিয়েছি দ্বিতীয়বারও দেখিয়েছি তৃতীয় বারও দেখিয়েছি-আর কতবার এরূপ অপরাধ করে করে মুখ দেখাতে পারি!

এমনিভাবে নামায অনুশীলনের দ্বারা নামাযির অন্তর মাঝে ধীরে ধীরে লজ্জা ও অনুশোচনা বোধের সৃষ্টি হতে থাকে এবং ক্রমঃ সে পাপকার্য পরিহারের অনুশীলন পায় এবং নিষকলুষ আত্মা ও নির্মল নিষপাপ প্রত্যহিক জীবনের স্বীয় কার্যলিপি সহকারে মহা-মহীয়ান প্রভূ আল্লাহর দরবারে হাজির হতে সচেষ্ট হয়। এমনিভাবে নামায আদায়ের দ্বারা মানব-স্বভাবের ছোট-বড় যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কলুষতা দূর হয়ে নামাযী একজন আদর্শ, চরিত্রবান, সুসভ্য, ভদ্র ও নীতিবান মানুষে পরিণত হতে সক্ষম হয়।

জামাতের সাথে নামায আদায়ের তাৎপর্য

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

মানব সমাজকে জুলুম-অত্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পারস্পরিক ভেদাভেদ ও বর্ণ-বৈষম্য ইত্যাদি হতে মুক্ত করতঃ সুসভ্য, সুশৃঙ্খল, সহনশীল ও সুখী সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলার জন্য "জামাতের নামাযই" হল সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

জামাত সহকারে আদায়কৃত নামায পরস্পরের মধ্যে সাম্য, সহানুভূতি, প্রেম-প্রীতি ও সহনশীলতার সৃষ্টি করে প্রভূ-ভৃত্য, রাজা-প্রজা, ও ধনী-গরীবের ভেদাভেদ মিটিয়ে দেয়।

সম্মানিত পাঠক একটু লক্ষ্য করুণ!

নামাযে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে পবিত্র দ্বীন-ইসলাম ধনী-গরীব কিংবা রাজা-প্রজার কোন প্রভেদকে স্থান দেয়নি। মহান শাহনশাহ-রাজাধিরাজ আল্লাহ পাকের সামনে হাজিরা দেবার বেলায় বাদশাহ-ফকীর ও ধনী-দরিদ্র সবাই এক সমান। সবারই প্রভূ-মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যেমনিভাবে গরীব-ভিখারী অসহায়-দুর্বল বান্দাদেরকে যেকোন প্রকারের শাস্তি-দন্ড দেওয়ার পূর্ণক্ষমতা সর্বশক্তিমান মালিক আল্লাহ তাআলার রয়েছে, ঠিক তদরূপ বিশাল সম্রাজ্যের

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধিপতি সম্রাটকে, কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পদের মালিক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি শালী-লোকদেরকে সর্ব প্রকারের শাস্তি দানের বা মুহূর্তের মধ্যে ক্ষমতাহীন, সম্পদহীন ভিখারী বানানোর পূর্ণ ক্ষমতা তার রয়েছে।

নামাযের একই সারিতে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে যখন-ধনী-দরীদ্র, রাজা-প্রজা সকলে একসাথে নামায আদায় করতে থাকে, তখন বান্দাদের পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্যের অনুভূতি জাগরিত হয় এবং সবাই গর্ব অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করার অনুশীলন পায়। নামাযের এক সারিতে দাঁড়িয়ে মুসলিম ভায়েরা সবাই কৃত্রিম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একাকার হয়ে যায়।

সম্মানিত বন্ধুগণ!

উক্ত বিষয়টি আরো একটু সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য লক্ষ্য করুণ!

কোন একটি দেশের রাজা-প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন ধনাঢ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যখন জামাত সহকারে নামায আদায়ের জন্য হাজির হয়ে অন্য কোন প্রজা-সাধারণ কিংবা ছেড়া-ফাটা কাপড় পরিহিত, রুগ্ন, জীর্নশীর্ণ ভিখারী, অসহায় গরীব মুছাল্লী ভায়ের পাশে দাঁড়ায় এবং "আল্লাহু আকবর" [আল্লাহই সর্বমহান] বলে হাত বেঁধে মনে মনে স্বীকার করতে থাকে যে,

হে মহা-মহীয়ান-গরীয়ান প্রভূ!

আপনার মহান দরবারে নিজেই নিজের হাতে বন্দীকড়া দিয়ে এ দ্বীনহীন মহা অপরাধীর বেশে, পাপী হতভাগ্য, নগণ্য বান্দা অনুতপ্ত মনে-প্রাণে হাজির হয়েছি। নিজেকে এবং নিজের সর্বস্বকে আপনার মহানত্বের সামনে সপে দিয়েছি, আমার সমস্ত অহংকার, গর্ব ও অস্তিত্বকে হে প্রভূ! আপনার মহান চিরস্থায়ী পবিত্র জ্বাত-সত্ত্বার সমীপে লীন করে দিয়েছি।

ওহে প্রভূ!

আপনি আমার সব কিছুর মালিক, প্রাণের মালিক, হায়াত মওত, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, ইজ্জত-বেইজ্জত, শক্তি-বল, সুস্থতা-অসুস্থতা ও ধন-সম্পদের একচ্ছত্র মালিক, সুতরাং প্রভূ! এখন আপনার যা-ইচ্ছা তাই করতে পারেন। পাশের এ অসহায়-দুর্বল জীর্নশীর্ন ছেড়া-পোষাক পরিহিত আমার মুছলিম ভায়ের উপর যেমনিভাবে আপনার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে প্রভূ! আমার উপর ও তদরূপ আপনার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

প্রভূ! আপনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে আমার গর্ব-অহংকার ও দাপটের সব উপকরণ ক্ষমতা-খ্যাতি, জশ, পদ মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি সবকিছু কেড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ অসহায়-দুর্বল ও পথের ভিখারী বানিয়ে দিতে পারেন।

নামাযে দাঁড়িয়ে এরূপ "ভাবের" অনুশীলনকারী কোন নামাযী বান্দা-সে কোন দেশের রাজা-রাষ্ট্রপ্রধান তথা প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীই হউক কিংবা কোন ধনীক শ্রেণীর লোকই হউক, যখন নামায শেষ করে সাংসারিক-রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কাজ কর্মে সে নেমে পড়ে, তখন সে আর পদের অহংকার ধনের গর্ব, শক্তি-বল ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির গৌরব এবং অপর মানুষকে হিংসা-তুচ্ছ ইত্যাদি করার মত অপরাধের বশবর্তি হয়ে অপরের জান-মালের, আবরু-ইজ্জতের ক্ষতি সাধন করতে কখনও সাহস পায়না, সে কাকেও শোষণ-নির্যাতন করতে পারে না, পারে না কোন মানুষের সাথে প্রতারণা, ধোঁকাবাজী করতে। শ্রেণী বিভেদ তার কাছে আর থাকেনা এবং এভাবে সমাজে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হয় সাম্য সম্প্রীতি, ন্যায়নীতি, ন্যায় বিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধের সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বক্ষেত্রে স্বস্তি এবং দন্দ্ব-দ্বিধা মুক্ত মহা শান্তি এবং সমৃদ্ধময়, নিরাপদ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো।

শুধু তাই নয় ; বরং নামায আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত হওয়ার সাথে সাথে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে কিভাবে প্রভূ আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য ও বন্দেগী ভাবধারা সৃষ্টি করা যায়, জামাত সহকারে আদায়কৃত নামাযেই এর অনুশীলন পায়।

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বন্দেগী করার মন-মানসিকতা সৃষ্টির জন্য যতগুণ ও যোগ্যতার প্রয়োজন-জামাত সহকারে নামায তার সবটাই মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ সৃষ্টি করে থাকে।

বান্দা যে সর্ব অবস্থায় মালিক আল্লাহ পাকের অধীন এবং তার সবকিছুই যে, খোদার কুদরতের আওতাভূক্ত-নামায সে অনুভূতি মানুষের মধ্যে জাগরিত করে ও প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে সর্বক্ষণে নিজের একেবারেই কাছে-অনুভব করার অনুপ্রেরণা যোগায়।

সার কথা নামায প্রভূ আল্লাহর যাবতীয় এবাদত-উপাসনা সমূহের মধ্যে সর্ব প্রধান ও সর্ব উৎকৃষ্ট এবাদত এবং মানব সমাজকে মহা-মহীয়ান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অনুগত খালেছ-খাটি বান্দারূপে তৈয়ার করার জন্য জামাতের নামাযই হল খোদায়ী "ট্রেনিংকোর্স স্বরূপ।

এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দিতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র কোরআন কারিমে ঘোষণা করেছেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

অর্থঃ নিশ্চয় নামায নির্লজ্জ-পাপকর্ম ও অপ্রীতিকর কার্যকলাপ থেকে [নামাযী বান্দাকে] ফিরিয়ে রাখে এবং নিঃসন্দেহে নামায আল্লাহ তা'আলার সর্ব শ্রেষ্ঠ জিকির-স্মরণই বটে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"নামাযই আত্মার প্রশান্তি আনে"

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

ঈমানী জিন্দেগীর অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হল-নিজের এককস্রষ্টা, মালিক, মনিব ও মহিমান্বিত প্রভূ আল্লাহ পাকের পরম সন্তুষ্টি, সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ এবং এরই মাধ্যমে রূহানী শান্তি অর্জন।

আর এ শান্তি অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা সম্পর্কে স্বয়ং প্রভূ আল্লাহ তাআ'লাই পবিত্র কালামে মজিদে এরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

অর্থঃ আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরাত্মা সমূহ শান্ত হয়।

আর আল্লাহর জিকিরের যত পন্থা-পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে নামাযই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা।

এব্যাপারে প্রভূ আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ .... وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ

অর্থঃ এবং নামাযই হচ্ছে আল্লাহর সর্বোত্তম-সর্বোৎকৃষ্ট জিকির, কেননা নামাযের মধ্যে যেমনিভাবে জিকিরে লেছানী তথা বিভিন্ন মৌখিক জিকিরের ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনিভাবে হুজুরে কলবী বনাম জিকিরে কল্‌বী তথা মন-আত্মার জিকিরের ব্যবস্থাও রয়েছে।

তাই এ সর্বোত্তম জিকির "নামাযের" দ্বারা মানব জীবনে খোদার সেই পরম সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। পরম সান্নিধ্যও নৈকট্য লাভ হয় এবং নামায আদায়ের পরক্ষণে তা মানবাত্মার মাঝে স্বর্গীয় প্রশান্তি এনে দেয়।

সাংসারিক ব্যর্থতা, পার্থিব দুঃখ-ক্লেশ ও পৃথিবীর জঞ্জাল-ঝামেলায় যখন বান্দার জীবনে অতিষ্টতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি নেমে আসে, স্বীয়-মন-প্রাণকে অস্থির, উদ্বিগ্ন, চঞ্চল ও নৈরাশ করে তোলে, পরিণামে সে টেন্‌শন (Tension), প্রেসার (রক্তচাপ) ও মানসিক রোগে ভোগতে থাকে। শান্তি ও স্বস্তির অন্বেষায় সে পাগল-ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত যখন সে অনেক চেষ্টা-সাধনার পরও শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পেতে ব্যর্থ হয়, তখন তার জীবনে চরম নৈরাশ্যতা নেমে আসে। পরিণামে সে জীবনে বেঁচে থাকাটাকে নিরর্থক জ্ঞানে মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু "জীবনের" মায়া ত্যাগ করতঃ আত্ম হত্যা পর্যন্ত করে বসে।

মূলতঃ সেই নৈরাশ্যময় অশান্ত ও অস্থির হৃদয়-মনে একমাত্র "নামাযই" স্বস্তি, শান্তি ও স্থীরতা ফিরিয়ে এনে তার অন্তর-মনে নব আশা উদ্দিপনার সঞ্চার করে।

নামায আদায়ান্তে সে নূতন আশা উদ্দিপনা নিয়ে পুনরায় জীবন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে সাহস পায়। সুতরাং শোক-দুঃখ, বালা-মছিবাত কালে নামাযই হচ্ছে শান্তনা-প্রশস্তি এবং নিরাপত্তা লাভের প্রধান আশ্রয়-উপকরণ।

নামাযের মাধ্যমে নামাযী বান্দা মহা-মহীয়ান, প্রেমময় প্রভূ আল্লাহ পাকের দরবারে হৃদয়ের পুঞ্জিভূত ব্যাথা ও আবেগের প্রকাশ দেয়, প্রাণের তৃষ্ণা ব্যক্ত করে। মনের আবেদন-নিবেদন পেশ করতে থাকে।

উহাতে সে পরম আনন্দ পায়, তার হৃদয় মাঝে চির শান্তির সুশীতল তরঙ্গ-ঢেউ খেলতে শুরু করে দেয়।

পরিশেষে নামায তার প্রাণ-মনকে অপূর্ব স্বাদও আনন্দ উৎসাহে সিক্ত ও উজ্জিবীত করে তোলে।

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র জিন্দেগীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন।

পবিত্র হাদীছে হযরত হোজাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ-

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْزَنَهُ اَمْرٌ فَزِعَ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ (ابو داؤد)

অর্থঃ আল্লাহর পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে যখনই কোন দুঃখ-যাতনা ও অশান্তি, চিন্তা ক্লিষ্ট করে তুলত এবং কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন-তখন প্রিয় নবী (দঃ) আকুল-ব্যাকুল হয়ে নামাযেই মনোনিবেশ করতেন। অর্থাৎ নামায পড়া শুরু করে দিতেন।

হযরত ছাহাবায়ে কেরামদের আমল ও অনুরূপ ছিল-যখনই তারা কোন কারণে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়তেন, তখনই রব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টিময় এবাদত-নামাযে মশগুল হয়ে পড়তেন। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের চাচাত ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) একবার ছফরে ছিলেন, পথি মধ্যে তাঁর পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পৌছলে তিনি তৎক্ষণাৎ উট হতে নেমে প্রথমে দু'রাকাত নামায আদায় করে নিলেন, অতঃপর পাঠ করলেন "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" এবং বললেন, অশান্তি ও দুঃখ-চিন্তার মুহূর্তে আমার প্রভূ আল্লাহ যা করতে আদেশ দিয়েছেন, আমি তাই পালন করলাম। সুতরাং দুঃখ-বিপদে নামাযের আশ্রয়েই আত্মিক শান্তনা লাভে ব্রতী হওয়াই অধিকতর উত্তম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রিয় পাঠক!

আপনি যদি নামাযী হন তা'হলে এ ব্যাপারে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ আপনি নামাযের সে অনন্ত শান্তি ও প্রাণের আস্বাদ নিশ্চয় পেয়ে থাকবেন। কিন্তু আপনি যদি নামাযে অভ্যস্ত না হন এবং এতদিন আপনি এ পৃথিবীর ক্ষণকালের মায়াজালে আবদ্ধই ছিলেন, এ নশ্বর পৃথিবীর রঙ্গরসে ও রূপ-জশে বিমূহিত হয়ে অনন্ত শান্তি দাতা মহা-মহীয়ান প্রভূ আল্লাহকে, আল্লাহর স্মরণকে ভুলেই ছিলেন। কিন্তু ক্ষণকালের সুখ উপভোগ ও আমোদ-প্রমোদের পর এখন আপনার ঐসব নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। আপনি বিরক্ত, নৈরাশ ও অতিষ্ট হয়ে পড়েছেন– তাহলে বন্ধু! আসুন, একবার প্রভূর দরবারে হাজির হয়ে নামায আদায়ে মনোনিবেশ করে দেখুন। নিশ্চয় আপনি অনুভব করতে পারবেন, কি আস্বাদ ও শান্তি নামাযের মধ্যে রয়েছে। নামাযের মাধ্যমে আত্মার কি অপূর্ব সন্তুষ্টি ও স্বস্তি অর্জিত হয়। এতে আপনার প্রানের জ্বালা মিটবে, মনের ব্যাকুলতা-নৈরাশ্যতা ও টেন্‌শ্যান দুরিভূত হবে, এক অজানা ও অব্যক্ত স্বাদ-আনন্দে আত্মা-মন পুলকিত হয়ে উঠবে। বন্ধু! সে স্বাদ ও আনন্দের পরিসমাপ্তি নেই; নেই কোন তার অন্ত ও শেষ। আপনি ইহকাল-পরকালের অনন্ত শান্তি রাজ্যে প্রবেশ করবেন।

উপসংহারে বলতে হয় যে, নামায আদায়কারী বান্দা সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হন। অন্যদিকে সে তার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সকলের সাথে সততা ও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ শান্তিময় জীবন যাপনের অনুশীলন পান, তদুপরি পৃথিবীতে মহা-কুদরতময় শ্রষ্ঠা আল্লাহ পাকের প্রতি সর্বক্ষণে আনুগত্য ও বন্দেগী প্রকাশ করার, আল্লাহর খালেছ ও খাটি বান্দা রূপে নিজেকে তৈরী করার সর্বোপরি প্রভূর সন্তুষ্টি অর্জনে ইহ-পরকালের অনন্ত শান্তি লাভ করার জন্য নামাযই হল সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়-উপকরণ।

অতএব, শ্রদ্ধেয় পাঠক মন্ডলী দৈনন্দিন নামায আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নামায আদায় করাটাই হচ্ছে, আল্লাহ-রাছুল প্রেমিকদের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

কুল কায়েনাত-বিশেষতঃ ইনছান সৃষ্টির পিছনে দয়াময় মহান প্রভু আল্লাহ তাআ'লার প্রেমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আমরা (মানব জাতি) আল্লাহ পাকের প্রেমপূর্ণ ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছি।

এককালে মহান রাব্বুল আলামীন ছিলেন একা, মহান আল্লাহর পবিত্র চির বিরাজমান অবিনশ্বর জ্বাত-সত্বা ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। রাব্বুল আলামীনের এ একাকিত্ব তাঁর নিজের নিকটই পছন্দসই হলনা। তিনি সৃষ্টির মাঝে নিজেকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী অধিপতি, স্রষ্টা, মনিব ও প্রভূ হিসাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন।

এভাবে তিনি স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়েই সৃষ্টির প্রতি প্রেমাসক্ত হলেন। সৃষ্টির প্রতি তাঁর এ-প্রেমানুরাগ একদা তার পবিত্র "নূরী কুদরতকে" আন্দোলিত করল, ফলে সেই নূরী শক্তি থেকে ধ্বনিত হল "কুন্" (হয়ে যাও)-সঙ্গে সঙ্গে হয়েগেল "নূরে মুহাম্মদী" তথা চরম ও পরম প্রশংসিত সুন্দরতম "নূর" অর্থাৎ জ্যোতি।

সেই মহা "নূরী" উপাদেয় জ্যোতি শক্তি থেকে মহা বিজ্ঞময় কৌশলী শিল্পী আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নির্দেশে অস্তিত্ব লাভ করতে শুরু করল– আরশ-কুরছী, লাওহ্-কলম, বেহেস্ত-দোজখ আছমান-জমিন-আলোকোজ্জল সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, বৃক্ষলতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী, ফেরেস্তা ও জ্বীন-পরি তথা একের পর এক অগণিত নূতন নূতন সৃষ্টি।

যখন মহান আল্লাহ নিখিল সৃষ্টিকে বিভিন্নভাবে অপরূপ সাজে বিভিন্ন রঙ্গে সাজিয়ে তোলার কাজ সমাপ্ত করলেন। ঐ সূত্রে অবশেষে তিনি অত্যন্ত আদর করে আভ্যন্তরিন গুণ ও গঠন-আকৃতির দিক থেকে অত্যন্ত কলা-কৌশল এবং নিপুণতার মাধ্যমে সুন্দরতম গঠন-প্রকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দিয়ে তদুপরি দেহ-অভ্যন্তরে অদৃশ্য শক্তির মৌল উপাদান-রূহ-মন-অন্তর-নফছ এবং অদৃশ্য গুণাবলী তথা জ্ঞান ধারণ শক্তি, বিবেক বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছা শক্তি, স্মরণ শক্তি, কল্পনা শক্তি ও চিন্তা শক্তির মত অনন্য শক্তি সমূহ দিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জ্বাত রূপে মানুষকে সৃষ্টি করলেন।

কারণ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহা এলম-জ্ঞানের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল যে, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কিত একমাত্র প্রেমাস্পদ "নূরে মুহাম্মদী (দঃ)-কে একদা এ মানব আকৃতির কভার পরিয়ে তিনি দুনিয়াতে পাঠাবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র কোরআনের ভাষায় আল্লাহ পাক বলেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

অর্থাৎ- নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠন-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।

সত্যিই এমন সুন্দরতম গঠন-প্রকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অদৃশ্য গুণাবলী অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি।

সুতরাং আমরা (মানুষেরা) মহা-মহীয়ান-গরীয়ান প্রেমিক স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রেমের আকর্ষণেই সৃষ্টি হয়েছি, আমরা দয়াময় মেহেরবান প্রভূ আল্লাহ তাআ'লার প্রেমেরই ফসল।

মহান আল্লাহ প্রেমাসক্ত, হয়ে মানুষকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ তার একক স্রষ্টা ও প্রভুকে আত্মা দিয়ে জেনে, অন্তর দৃষ্টি দিয়ে চিনে তাঁর মারফৎ পরিচিতি হাসেল করতঃ একান্ত প্রেম-ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে তাঁর প্রতি চরম ও পরম ভাবে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ-বিকাশ দেয় এবং যেন এ মানব সম্প্রদায় প্রভূ-ভৃত্য ও স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্কের ভিত্তিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ আল্লাহ তাআ'লাকে নিজের একক স্রষ্টা-প্রভূ-মনিব ও উপাস্যরূপে স্বীকার করতঃ একান্তভাবে তাঁর সামনে নিজের দেহ-মন-আত্মা তথা অস্তিত্বকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে রাব্বুল আলামীনের প্রেমের সঠিক মর্যাদা দেয়।

আর মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যত উপকরণ-পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ উপকরণ হচ্ছে নামায। এ নামাযই হচ্ছে আল্লাহ প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন।

কারণ কৃতজ্ঞ বন্ধুর নিয়ম হচ্ছে, প্রেমাস্পদ তাকে যেভাবে করতে বলেন সেভাবেই করা। যে ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা অবলম্বন করতে বলেন সেই ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা অবলম্বন করা।

স্বয়ং মহা স্রষ্টা আল্লাহ পাক নিজেই অত্যন্ত পছন্দ করে নামাযের প্রত্যেকটি আরকান-আহকামকে বান্দার জন্য ফরয, ওয়াজিব, ছুন্নাত-মুস্তাহাব পর্যায়ের পালনীয় বিধান রূপে করে দিয়েছেন। যাতে বান্দা আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআ'লা কর্তৃক গ্রহণীয় পছন্দনীয় পন্থায় আল্লাহ প্রেমের প্রকাশ দানে এবং প্রভূর প্রতি চরম কৃতজ্ঞতার বিকাশ দানে ও নিবেদনে সক্ষম হয়।

কেননা কোন্ পন্থায় কিংবা কোন্ ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা অবলম্বনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তা মহা মহীম আল্লাহর মহান শান-মর্যাদা মাফিক হতে পারে, তা আমাদের মোটেই জানার কথা নয়, যেহেতু বিশ্ব স্রষ্টার মহান শান-মর্যাদা নির্ণয় করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও নিবেদনের পন্থা উদ্ভাবন করাটা এক্ষুদ্র ও নগন্য সৃষ্টির জন্য কোনক্রমেই সম্ভব পর নয়।

কাল্পনিক উদ্ভাবিত পন্থায় মহান স্রষ্টা ও প্রভূ আল্লাহর এবাদত-উপাসনা করা মূলতঃ অন্ধকারে ঢিল মারার মতই ব্যাপার।

নামাযের প্রতিটি কাজই যেহেতু প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশেই আদায় হয়ে চলেছে। সেহেতু নামাযের প্রতিটি কর্মই মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রেম পূর্ণ আনুগত্যের স্বাক্ষর বহন করে। সুতরাং সংক্ষেপে বলতে হয়, নামায রূপ এবাদতের মধ্যে খোদা প্রেমের যে অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠে, তা মোটেই বলার অপেক্ষা রাখে না, ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব পর নয়।

প্রিয় পাঠক!

এই আলোকে ঐ বিশেষ পদ্ধতির এবাদত নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেমের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন রাব্বুল আলামীনের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত নিষ্পাপ ফেরেস্তা মন্ডলী।

এমনিভাবে নামায আদায়ের মাধ্যমে তার প্রেমের প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছেন নিষপাপ, পুত-পবিত্র নবী-রাছুল আলাইহিমুস্ সালামগণ, আল্লাহ-রাছুল প্রেমিক ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং মারফতে খোদার ধারক-বাহক, কামিল- সাধক-তাপস অলি-দরবেশ-গাউছ, কুতুব-আবদালগণ। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহা প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এবিশাল সৃষ্টি রাজ্যে-মাহবূবে খোদা, হাবীবে পাক, রাহ্মাতুললিল আলামীন, ছৈয়্যেদুল মুরছালীন নবীয়ে আকরাম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ প্রেমিক। এ বিশাল সৃষ্টি রাজ্যের মাঝে নূরানী নবী (দঃ) এর চাইতে বড় আল্লাহ প্রেমিক আর কেউ নেই এবং হতেও পারেন না।

কারণ স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহু নিজেই যাকে স্বীয় নূর থেকে সর্বদিক থেকে মহিমান্বিত, শ্রেষ্ঠ করে, সুন্দরতম করে এবং সর্ব মহা গুণে গুণান্বিত করে সৃষ্টি করেছেন।

শুধু তাই নয় বরং নূরের নবী রহমাতুললিল্ আলামীন (দঃ) কে নিজের "হাবীব" তথা সর্বাধিক প্রিয়-প্রেমাস্পদ হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন তার সমতুল্য আল্লাহ-প্রেমিক আর কেউ হতে পারে না।

সুতরাং খোদা প্রেমিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসনে সমাসীন হওয়া একমাত্র তাঁরই জন্য শোভা পায়।

এ ভিত্তিতে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র নূর মোবারক এর সৃষ্টি লগ্ন থেকে এ ধরার বুকে আগমন ও অবস্থান কাল পর্যন্ততথা সর্বকালে তিনি কথায় ও কাজে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক হওয়ার সর্বোত্তম পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তদরূপ নামায আদায়ের বেলায়ও প্রিয় নবী (দঃ) আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক বান্দা হওয়ার পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং নিজ উম্মাৎদেরকে ও একজন প্রেমিক বান্দা হিসাবে মন-অন্তর দিয়ে যথাযথভাবে নামায আদায়ের জন্য নির্দেশ দান করে ও উৎসাহিত করে গিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে এবিষয়টি ও প্রনিধান যোগ্য যে, বিশ্বনবী (দঃ) আল্লাহ কতৃক প্রেরিত নবী-রাছুল আলাইহিমুচ্ছালামগণের সম্রাট হওয়ার সাথে সাথে নিঃসন্দেহে তিনি বেলায়ত-মারেফত তথা অলি-দরবেশ ও গাউছ-কুতুব আবদালগণের ও মহা সম্রাট।

এ হিসেবে তিনি (দঃ) নামায আদায়ের মাধ্যমে রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে প্রেম-মূলক আবেদন-নিবেদন পেশ করে চরম ও পরম কৃতজ্ঞতা এবং ভক্তি ভালোবাসা প্রকাশের দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর সামনে রেখে গেছেন। আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম প্রকৃতই আল্লাহ প্রেমের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে গেছেন। স্বাভাবিক মর্যাদা নয় শুধু বরং প্রভূ আল্লাহ কর্তৃক প্রিয়নবী (দঃ) কে নিষ্পাপ, পুত-পবিত্র রূপে ঘোষণা দেওয়া সত্বেও তিনি তাঁর নূরানী জিন্দেগীর রাতগুলো নফল নামায আদায়ের মাধ্যমেই কাটিয়েছেন। মহান আল্লাহর অত্যাধিক প্রেম-মুহাব্বতের তাড়নায় নফল নামাযে অত্যাধিক দাঁড়ানোর ফলে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূরানী পা- মোবারক ফুলে-ফেটে তা থেকে রক্ত পর্যন্ত ঝরা শুরু করে দিত। নবী প্রেমিক ছাহাবীগণের পক্ষ থেকে প্রিয় হাবীব (দঃ) এর খেদমতে আরজ করা হল।

ইয়া রাছুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম!

পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা কতৃক আপনাকে নিষ্পাপ ও পূত-পবিত্র রূপে ঘোষণা দেওয়া সত্বেও আপনি অধিক অধিক নফল নামায আদায় দ্বারা এত কষ্ট স্বীকার করার কারণ কি?

উত্তরে হুজুর পুরনূর (দঃ) এরশাদ করেন–

أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا

অর্থ ঃ আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না ?

অর্থ ঃ আমার পরম দয়াবান-মেহেরবান মাওলা মহাপ্রভূ আল্লাহ তা'আলা তার অসরিসীম দয়া ও মেহেরবানী গুণে আমার নিষ্পাপত্বের ঘোষণা দিয়ে আমার উপর যে অপরিসীম করুণার প্রকাশ দিয়েছেন, তদুপরি নিখিল সৃষ্টির মাঝে আমাকেই যে, তাঁর একমাত্র হাবীব-প্রেমাস্পদ রূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন, সমগ্র সৃষ্টির উপর আমাকেই যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছেন।

শুধু তাই নয় অধিকন্ত পরকালের হাশরের মহা বিচার দিবসে একমাত্র আমাকেই যে, প্রধান ও প্রথম শাফায়াতকারী নিয়োগ করতঃ "শাফায়াতে কোবরা" তথা মহা

সুপারিশের অনুমতি দানে সমগ্র হাশরবাসীর জন্যে "সুপারিশের দ্বার খুলে দেওয়ার এবং অসংখ্য অগণিত পাপী তাপী গুনাহগার ঈমানদার বান্দাদের ব্যাপারে রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে সুপারিশ করে প্রভুর গজব-আযাব থেকেমুক্ত করে বেহেস্তী বানানোর সুযোগ দান করেছেন এবং ঐ বিচার দিবসে "মকামে মাহমূদ" তথা চরম প্রশংসিত আসনে আমি মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (দঃ) কে বসিয়ে সমগ্র হাশরবাসীর সামনে সকলের উপর আমার মর্যাদাকে সমুন্নত, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত করবেন, এ সমস্ত নজির বিহীন খোদার করুণা পেয়ে ও আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ বেশী বেশী নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয় দেবনা? অবশ্যই আমাকে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে হবে।

তাইতো প্রিয় নবী (দঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার নাজুক মুহূর্তেও নামায ত্যাগ করেননি। বরং ভীষণ রোগ যন্ত্রণার অস্থির অবস্থার মধ্যেও ছাহাবায়ে কেরামের কাধে ভরকরে মসজিদে তশরিফ নিয়ে নামায আদায় করেছেন।

এমনিভাবে নবী প্রেমিক ছাহাবায়ে কেরামগণ, তা'বেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণ, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুহাদ্দেছীন ও মুফাচ্ছেরীনগণ, বিশ্ব বরেণ্য উল্লেখযোগ্য অলি-দরবেশগণ-প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের হুবহু পদাঙ্ক অনুসরণে নবী পাক (দঃ) এর তরীকা পদ্ধতি অনুযায়ী জামাত সহকারে ফরজ নামায এবং জীবনের অধিকাংশ অবসর সময়ে বিশেষতঃ রাতের আরামের ঘুম-নিদ্রা ত্যাগ করে নফল নামায আদায়ের দ্বারা খোদা প্রেমিকের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয়-দিয়েছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়,

তাবেয়ীনগণের মহাসম্রাট খোদার প্রেম পিয়াসী মহা তাপস-সাধক, অলিকুল শিরমণি, হযরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন ঃ–

مَاكَانَ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَعْبَدُ مِنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تَقُوْمُ بِالْأَسْحَارِ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهَا .

অর্থঃ সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদাহ জাহেদাহ ছিলেন নবী দুলালী জগত-জননী বেহেস্তীরমনী কুলের মহান সরদার মা ফাতেমাতুজ্ জাহরা (রাঃ)। তিনি প্রত্যহ শেষ রাতে খোদা প্রেমের তাড়নায় দাঁড়িয়ে অধিক অধিক নফল নামায আদায় করার ফলে তার উভয় পা-মোবারক ফূলে যেত, অথচ মহান আল্লাহ তাকে বেহেস্তী রমনী কুলের মহান সম্রাজ্ঞী রূপে দুনিয়াতে থাকতেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন।

অন্যত্র বর্ণিত আছে,

وَكَانَتْ رَابِعَةُ الْبَصَرِيُّ تُصَلِّيْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَتَقُوْلُ وَاللّٰهِ

مَا اُرِيْدُ بِهَا ثَوَابًا وَلٰكِنْ لِيَسُرَّ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْلَ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اُنْظُرُوْا اِلٰى اِمْرَاَةٍ مِنْ اُمَّتِىْ هٰذَا عَمَلُهَا فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ -

অর্থঃ মহা সাধ্বী তাপসী হযরত রাবেয়া বছরী (রঃ) দিবা-রাতের ফরয নামায সমুহ ছাড়া ও এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন এবং তিনি এ প্রসঙ্গে বলতেন যে, মহান আল্লাহর শপথ! এ নামায আদায়ের দ্বারা আমি কোন বিশেষ ছাওয়াব-পুন্য পাওয়ার আশা করিনা বরং আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকেই সন্তুষ্ট-আনন্দিত করা, যেন নবী-রাছুল সম্রাট আকাও মওলা (দঃ) বিচার দিবসে সমগ্র নবী-রাছুল (আঃ) গণকে লক্ষ্য করে বলতে পারেন যে, হেআল্লাহর নবী-রাছুল (আঃ) গণ! দেখুন, আমার এক মহিলা উম্মাতের রাত্র-দিনের এ হচ্ছে আমল।

প্রিয় পাঠক!

দেখুন! একজন তাপসী আল্লাহ-রাছুল প্রেমিকা মহিলার নামাযের প্রতি তার কত অনুরাগ ও নামাযের ভিতরই জীবন অতিবাহিত করার কি চমৎকার দৃষ্টান্ত!

✪ আমার শ্রদ্ধাভাজন পাঠিকা মা-বোনেরা লক্ষ্য করুন!

নফল তো দুরের কথা, আমাদের মা-বোনেরা তাদের সাংসারিক জীবনের আনন্দ বহুল ভোগ বিলাসময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপনে কিংবা সামান্যতম বিপদাপদ, ও অসুবিধা দেখা দিলেই আল্লাহর ফরয-ওয়াজিব নামায পর্যন্ত কাজা করে-বাদ দিয়ে বসেন। আর ঐ সমস্ত মহীয়সী মহিলাগণ শত আনন্দ-অসুবিধার ভিতরেও ফরয, ওয়াজিব বাদেও হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করে গিয়েছেন। তাঁদের পবিত্র জীবন থেকে মা-বোনদের শিক্ষা হাসিল করা উচিৎ।

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের এর দৌহিত্র, সাধক-তাপস মহামনীষীদের মহান নেতা হযরত জায়নুল আবেদীন (রঃ) প্রতি দিন-রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। ফরয নয় বরং তাহাজ্জুদের নামায ও জীবনে কোন দিন কাজা করেন নি।

আল্লাহ ও রাছুল প্রেমিক অলি-দরবেশ গণের মহা শাহিন্‌শাহ্‌, বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ওয়াইছকরনী (রঃ) সর্বদা নফল নামায আদায়ের মধ্যে মশগুল থাকতেন, মাঝে-মধ্যে এমন হত যে, এক রুকুতে বা কোন কোন সময় একই ছেজদার মাঝে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন।

এমনিভাবে আরো লক্ষ্য করুন ঃ-

وَكَانَ الْحَمَامُ يَقَعُ عَلٰى رَاسِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ رض فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَحْسَبُهُ جِذْعًا مَنْصُوْبًا لِطُوْلِ اِنْتِصَابِهِ فِى الصَّلٰوةِ وَكَانَتِ الْعَصَافِيْرُ تَقَعُ عَلٰى ظَهْرِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ شَرِيْكٍ (رض) وَهُوَ سَاجِدٌ -

অর্থ ঃ আল্লাহর রাছুলের (দঃ) বিশিষ্ট প্রেমিক ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন্ জোবাইর (রাঃ) কা'বা শরীফের মাসজিদে হারামের মধ্যে নফল নামায সমূহে অধিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে কবুতর পাখী তাকে খেজুর বৃক্ষের খুটি ধারণা করতঃ তাঁর মাথা মোবারকের উপর বসে থাকত। এমনিরূপে হযরত ইব্রাহিম ইবনে শোরাইক (রঃ) এত দীর্ঘক্ষণ ধরে নফল নামাযসমূহের ছিজদায় পড়ে থাকতেন, যার ফলে চড়ুই পাখিরা (তাকে কোন কিছুর স্তুপ মনে করতঃ) তাঁর পিঠে বসে থাকত।

✪ বিশ্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সাধক, ইসলামী শরীয়াতের শ্রেষ্ঠতম মহান ইমাম হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেমের যে অপূর্ব নজির রেখে গেছেন তা সাধক-তাপসদের ইতিহাসে চিরকাল সোনালী হরফে লেখা থাকবে।

যিনি শতবারের মত স্বপ্ন যোগে রুহানী দৃষ্টি দিয়ে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দর্শন স্বাদ উপভোগ করেছেন এবং দিন-রাত ইসলামী শরীয়াতের গবেষণালব্ধ বিধান রচনায়, মুসলিম মিল্লাতের উদ্ভূত সমস্যাবলীর কোরআন-হাদীস সম্মত সমাধান দানে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সেই মহান ইমাম চল্লিশ/পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এশার নামাযের জন্য যে অযু করতেন তা দিয়েই সারা রাত ব্যাপী নফল নামায আদায় করে যেতেন। শেষ পর্যন্ত ঐ একই ওযু দিয়েই পুনঃ ফজরের নামায আদায় করতেন-তাতে বুঝে নিতে পারেন যে, শুধু আমাদের নয়; বরং সারা বিশ্ব মুসলিমের যিনি ইমাম আযম। তিনি নামায আদায়ের দ্বারা আল্লাহ প্রেমের কত উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন।

✪ এরূপভাবে ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রঃ) শরীয়াতে ইসলামীর গবেষণার কর্ম ব্যস্ততার ভিতরে ও প্রত্যেব দিন-রাতে তিন শত রাকাত নফল নামায আদায় করে যেতেন।

আমাদের মহান ইমাম হযরত আবু ইউছুফ (রঃ) ইসলামী শরীয়াতের গবেষণায় তদুপরি প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়েও দিবা-রাতে নিয়মিত দু'শত রাকাত নফল নামায আদায় করে যেতেন।

বেলায়ত-মারেফতের মহান সম্রাট, সাধক-তাপসকুলের মহান শাহেনশাহ, মাহবুবে ছোবহানী, গাউছুল আযম হযরত শেখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জীলানী

pdf By Syed Mostafa Sakib

(রঃ) প্রতি-রাত-দিনে অন্যান্য এবাদত-রেয়াজত ছাড়াও শত শত রাকাত নফল নামায আদায় করে যেতেন, সাথে সাথে তিনি প্রতিরাতে নফল নামাযের মধ্যে পবিত্র কোরআন পুরা খতম করে যেতেন।

আর ও বর্ণিত আছে যে, জীবনের প্রায় ৪০ বৎসরের অধিককাল যাবৎ রাতে ঘুমাননি বরং এশার নামাযের জন্য কৃত ওযু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করে যেতেন।

বিশ্বের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে ইজাম যাকে একবাক্যে তৎযুগ থেকে কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্তের জন্য "গাউছুল আযম" রূপে স্বীকৃতি দিয়ে চলেছেন, সেই মহা সাধক পুরুষ মহান আল্লাহর অকৃত্রিম প্রেমের তাড়নায় কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করতঃ প্রত্যহ নফল নামায আদায়ের দ্বারা আল্লাহ প্রেমের দৃষ্টান্ত জগতবাসীর সামনে রেখে গেছেন তা অবশ্যই লক্ষণীয় বিষয়।

✪ বেলায়ত-মারফতের অপর মহা সম্রাট, আ'তায়ে রাছুল (দঃ) সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীব নাওয়াজ মঈনউদ্দীন হাছন সাঞ্জারী চিশ্‌তী আজমীরী (রঃ) সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর যাবৎ এশার নামাযের পর আর বিছানায় পিঠ লাগাননি, সারারাত ধরে মওলার প্রেম তাড়নায় শত শত রাকাত নফল নামায আদায়ে রাত শেষ করেছেন এবং ঐ ওযু দিয়েই পুনঃ ফজরের নামায আদায় করে যেতেন।

অন্যান্য এবাদত রেয়াজত ছাড়া ও বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তিনি এশরাক চাশ্‌ত আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নামায জীবনে কাযা করেননি। হযরত খাজা সোলতানুল হিন্দ বলেন ঃ

নামাযই হচ্ছে মো'মেন লোকের মে'রাজ তথা আল্লাহর দীদার ও সান্নিধ্য অর্জনের মুল সোপান। এ নামায ব্যতীত মহা প্রভূ আল্লাহ তাআ'লার সান্নিধ্য নৈকট্য লাভ মোটেই হতে পারেনা।

এভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, হাজার হাজার আল্লাহ রাছুল প্রেমিক অলিয়াল্লাহ-সাধক-তাপস রয়েছেন যারা আল্লাহ তাআ'লার শ্রেষ্ঠতম এবাদত-নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ প্রেমের ও আল্লাহর মারফতের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয়-প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

অথচ আজকাল দেখা যায় অনেক নামী-দামী, গণ্যমান্য, হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থ জ্ঞান-বিবেক সম্পন্ন লোক, ভেশ-ভূষায় ও ভাব-ভঙ্গিতে আল্লাহ রাছুলের বড় আশেক, আল্লাহ প্রেমিক মারফতী কামেল ফকীর-দরবেশ বড় বুজূর্গ ও পীরে কামেল হওয়ার দাবী করেন, কিন্তু নফলতো দূরের কথা ফরয নামায আদায়ের বেলায় পর্যন্ত দেখা যায় যে, তারা সম্পূর্ণ উদাসীন ও অমনোযোগী, আবার অনেকে সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেন, কামেল হয়ে গেলে আর জাহেরী নামায-রোযা ইত্যাদি আদায় করা লাগেনা।

অনেক সময় দরবেশ সাহেব শাগরিদগণ নিয়ে বসা আছেন। নামাযের আযান শুনার পর শাগরিদও ভক্তবৃন্দদের বলেন, তোমরা গিয়ে নামায আদায় করে আস। তিনি আন্দর খানায় চলে যান, তথায় গিয়ে নামায আদায় করলে তো ভালই হত-কিন্তু খোজ খবর নিয়ে জানা যায় যে, তিনি জাহেরীভাবে নামায আদায় করেন না।

অথচ আল্লাহর একমাত্র হাবীব, রহমাতুললিল আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের রেখে যাওয়া ইসলামের সঠিক বিধান হচ্ছে, যতবড় মারফতী কিংবা আল্লাহ-প্রেমিক হওয়ার দাবী করা হউকনা কেন, হুশজ্ঞান স্বাভাবিক থাকাকালে মৃত্যু অবধি বিনা ওজরে কোন অবস্থাতেই নামায তরক করা কিংবা কাজা করার কোন অবকাশ-সুযোগ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম রেখে যাননি।

বরং যিনি যতবড় মারফতী আল্লাহ-প্রেমিক-নবী-প্রেমিক হওয়ার দাবী করবেন, তিনি তত বেশী পাকা নামাযীই হবেন।

তবে হাঁ মাজ্জুব অলিয়াল্লাহ তথা আল্লাহ-রাছুলের প্রেম-আগুনের প্রভাবে যাদের ইহলৌকিক জ্ঞান-বিবেক লোপ পেয়ে বসেছে তাদের ব্যাপারটা ভীন্ন ধরনের, সাধারণ মস্তিষ্ক বিকৃত লোকদের জন্য যেমন শরীয়াতের বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে জোরজবরদস্তী করা যায় না, অনুরূপ আল্লাহ-রাছুলের প্রেম আগুনের দহনে যাদের দৈহিক বিবেক লোপ পেয়ে বসেছে তাদের বেলায়ও শরীয়াতের বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা নেই। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা যা করার তাই করবেন। আল্লাহ– রাছুলের সাথে তাদের রূহানী সম্পর্ক সরাসরি বিধায় তাদের ব্যাপারে কথা বলার ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ তারা সদা-সর্বদা আল্লাহ-রাছুলের প্রেমে এবং ধ্যানে বিভোর থাকার ফলে তাদের বাহ্যিক বিবেক-বুদ্ধি ঠিক থাকেনা-তাই তারা জাহেরী শরীয়াতের বিধি-বিধান বহির্ভুত লোক হিসাবেই গণ্য।

তাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সুস্থ বিবেক-জ্ঞান সম্পন্ন কোন লোকের-আল্লাহ প্রদত্ব অবশ্যই পালনীয়-অলঙ্গনীয় ফরয বিধান তথা ফরয নামায, ফরয রোযা ইত্যাদি পালন না করা এবং অন্যান্যদেরকেও আদায় না করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৎ বুঝ দান করুন। আমীন ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জামাত সহকারে নামায আদায়ের ইহজাগতিক উপকারিতা

সম্মানিত পাঠক!

এ প্রসঙ্গে আরো একটু লক্ষ্য করুণ! আল্লাহ-রাছুলে বিশ্বাসী মুছলিম মিল্লাতের মাঝে একতা ও শৃংখলা বোধ সৃষ্টি এবং যোগ্য নেতৃত্বের প্রতি অনুগত করে তোলার অনুশীলন-প্রশিক্ষণদানে জামাতের নামাযের প্রভাব ও ভুমিকা অতুলনীয়।

ইহা একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, একতা ও শৃংখলাই হচ্ছে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের শ্রেষ্ঠতম উপাদান ও মূলচাবিকাঠি।

মুছলিম উম্মা সুশৃংখল, সুন্দর ও নিয়ম তান্ত্রিক উপায়ে জীবন যাপন করার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে এবং সমাজ ও জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে কিভাবে একজন ধর্ম প্রাণ, আদর্শবান ও যোগ্য নেতার আনুগত্য করে যেতে হয় এর একটা উত্তম প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন জামাতের নামাযে পেয়ে থাকেন।

উম্মাতে মুছলেমীন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের আযান তথা প্রভূ আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে মসজিদ অর্থাৎ খোদায়ী প্রশিক্ষণ সেন্টারে উপস্থিত হন এবং জামাতের নামাযে ইমামের নির্দেশনা অনুযায়ী নামায আদায়ের মাধ্যমে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কোন্ পন্থায় অত্যন্ত সুন্দর সুশৃংখল ও সুষ্ঠুভাবে নিজেকে পরিচালিত করা যায়, এ সম্পর্কে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

সম্মিলিতভাবে মহা মহীয়ান প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রতি নিজেদের চরম দীনতা-হীনতাপূর্ণ তা'জীম ও ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করাটা জামাতে নামায আদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও এর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে, একজন প্রকৃত মো'মেন নামাযী নাগরিক যেমনিভাবে নামাযরত অবস্থায় ইমাম সাহেবের অবাধ্য হয়ে কোন নির্দেশনার বিপরিত কিছুই করতে পারেন না। তেমনি ভাবে নামাযের বাইরে এসেও তিনি সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মপ্রাণ যোগ্য কোন নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে পারেন না। তিনি আরও পারেন না নিজের ধর্ম, দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে। কারণ তিনি মহান আল্লাহর চির শাশ্বত বাণী,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

কে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং কর্ম ক্ষেত্রে আল্লাহর এ নির্দেশকে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট থাকেন। বরং অহেতুক একজন ধর্মপ্রাণ যোগ্য ও আদর্শবান নেতার বিরোধিতা করাকে তিনি আল্লাহ-রাছুলের সাথেই বিরোধিতা করার নামান্তর মনে করেন।

তবে হ্যাঁ যেমনি ভাবে নিজ ইমাম সাহেব নামায আদায়ের সময় নামাযের কোন ফরয-ওয়াজিব তথা জরুরী বিধানাবলীর বিপরিত করতে গেলে মুক্তাদী (মুছাল্লী)

লোকমা দিয়ে অর্থাৎ শরীয়াতের নির্দেশনা মত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইমাম সাহেবের ভুল শোধরানোর জন্য চেষ্টা করে যেতে হয়।

আর ছুন্নাত-মুস্তাহাব জাতীয় তথা বিশেষভাবে অপরিহার্য নয়, ইমাম সাহেবের এরূপ কোন ভুল-ক্রটিকে Overlook করে যেতে হয়। কারণ মানুষের ক্রটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক, তাই সামান্য এবং ছোট-খাট ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য পদে পদে যদি লোকমা দেওয়া (পাকড়াও করা) হয় তাহলে নামাযের শান্ত ও সুশৃংখল পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। আর এটা নষ্ট করার অপরাধও কম মারাত্মক নয়।

একইভাবে নামাযের বাইরের জীবনে ও কোন নেতা-নেতৃত্ব যদি বিশেষ অপরিহার্য মৌলিক আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির বরখেলাফ কিছু করতে যান তখন নিয়ম তান্ত্রিক পন্থায় ঐ ক্রটি-বিচ্যুতির সংশোধনের চেষ্টা করে যাবেন, অনিয়ম তান্ত্রিক পন্থায় নয়। আর ছোট-খাট ভুল ও ক্রটি-বিচ্যুতিকে এড়িয়ে চলতে হয়। কারণ কথায় কথায় পদে পদে ভুলের জন্য পাকড়াও করা দ্বারা সমাজ ও দেশের স্থীতিশীল, সুশৃংখল এবং শান্ত পরিবেশ পরিস্থিতীর উপর মারাত্মক ভাবে আঘাত আসে। যেমনিভাবে অনিয়ম তান্ত্রিক পন্থায় মুক্তাদী নিজ ইমামের ভুল সংশোধন করতে গেলে তাতে মুক্তাদির নিজের ও অন্যান্য মুছাল্লিগণেরই ক্ষতি হয়। অনেক ক্ষেত্রে নিজের নামাযই বাতেল হয়ে যায়।

ঠিক তেমনিভাবে নামাযের বাইরের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে ও কোন যোগ্য আদর্শবান নেতা-নেতৃত্বের ভুল-ক্রটির সংশোধনও যদি অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় করতে যায়, তাতে প্রকৃত পক্ষে নিজের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন প্রকারের কল্যাণ তো হয়না বরং রাষ্ট্রীয় বিশৃংখলারই সৃষ্টি হয়। দেশ ও সমাজের স্থীতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা জাতিরই এক বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়।

সারকথা হল, উল্লেখিত ধরনের একটি উন্নতমানের ট্রেনিং-অনুশীলন একজন নামাযী নাগরিক প্রত্যহ জামাতের নামাযে অবশ্যই পেয়ে থাকেন।

এভাবে প্রত্যহ জামাতের নামায নিরবভাবে মুছলিম জন সাধারণকে সুশৃংখল, সুনিয়ন্ত্রীত ও সুন্দর রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক চিরন্তন দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে।

শ্রদ্ধেয় পাঠক !

আমরা আজকের মুছলিম সমাজ নামাযের আসল শিক্ষা থেকে অনেক অনেক দূরে সরে পড়েছি, আমরা প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে থাকি ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের উপর নামায কেন ফরয করে দিয়েছেন? আবার এ নামাযকে জামাতের সাথে আদায় করার বিধান কেন দিলেন? এর মাঝে কি নিগুড় তত্ব ও রহস্য নিহিত রয়েছে ? আমরা এসব বিষয়গুলোর প্রতি অন্তর-মন দিয়ে মোটেই দৃষ্টিপাত করিনা, একটু চিন্তাও করে দেখিনা এর কারণটাকে নিয়ে।

আমরা শুধু গতানুগতিক নিয়মে মছজিদে যাওয়ার আছে যাই। রুকু-ছজ্দা করার আছে উহা করেই চলে আসি। এর বেশী আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে নামায প্রভূ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তাআ'লার শ্রেষ্ঠতম এবাদত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র মুছলিম মিল্লাতের জাতীয় জীবনের সার্বিক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্বে নামায একটি সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ কোর্সই বটে, অথচ তৎপ্রতি আমরা মোটেই নজর দেইনা।

তাইতো আজ সারা বিশ্বব্যাপী মুছলিম জাতির এ চরম নৈতিক, আদর্শিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দৈন্যদশা এবং অধঃপতন। ইসলামের অন্য কোন পন্থায় না হউক আমরা যদি অন্ততঃ নামাযের অন্তর্নিহিত শিক্ষাটাকে অনুধাবন করতঃ তদ্বানুযায়ী নিজের জীবনটাকে গঠন করে নিতে পারতাম তাহলে আমাদের এত মারাত্মক অবনতি আসত না।

সম্মানিত পাঠক! আমাদের মুছলিম ভাইদের শতকরা ৮০ ভাগ লোকেই নামায আদায় করে না এবং ২০ ভাগের মত যারা নামায আদায় করে থাকেন তাদের মধ্যে এধরনের অনেক ভায়েরাও রয়েছেন যারা নামায আদায় করে থাকেন সত্য, কিন্তু নামাযের বাইরের জীবনে তাদের কে পুনঃ আল্লাহ-রাছুলের আদেশ-নিষেধাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং লঙ্গণ করতেও দেখা যায়।

সামান্য আগেই যে সমস্ত ভাইদেরকে দেখা গেল যে, তারা নামায আদায়কালে মহান আল্লাহর দরবারে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ও অঙ্গীকার করছেন যে; হে প্রভূ আল্লাহ!

এ অধম বান্দা কুপ্রবৃত্তি লোভ-লালসা ও শয়তানী প্ররোচনায় পড়ে অহরহ-অসংখ্য যেসব নাফরমানী ও পাপ-গুণাহ করে আস্‌ছি ওহে আমার পরম ক্ষমাশীল দয়াময়-করুণাময় প্রভূ! আপনার পাক দরবারে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে ঐসব পাপ-গুণাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, প্রভূ! এতদ্বসঙ্গে আপনার মহান দরবারে এ তাওবা-অঙ্গীকারও করতেছি যে, এখন থেকে আর এ ধরনের অন্যায় ও পাপ-গুনাহ করবনা।

এর পরক্ষণেই সামান্য জুতা চুরি হতে শুরু করে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানী, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ওয়াদা খেলাপী প্রতারণা, অপরকে ঠকানো, অধিক মুনাফা খুরী ঘুষখোরী, সুদখোরী, শারাবখুরী, জোর-জুলম করা, ছলে-বলে কৌশলে জোর খাটিয়ে, অস্ত্র দেখিয়ে অন্য মুসলমান ভাইদের সর্বস্ব লুটে নেওয়া, কলমের খোচায় অপরের অর্থ চুরি ও আত্মসাত করা, ডাকাতী ও হাইজাক করা, মুসলমান ভাইদের রগ কেটে দেওয়া, চোখ উপড়ে ফেলা ও নৃশংষভাবে হত্যা করা ইত্যাদির মত সমাজ ও দেশ বিধ্বংসী মারাত্মক পাপ-গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নামায আদায় করে আল্লাহর ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই কিছু কিছু মুসলমানের প্রথম বুলি হচ্ছে ঃ অপর মুসলমান ভাইয়ের ও ইমাম-মুয়ায্‌যিনের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা ও মুসলমান ভাইয়ের গীবৎ-সমালোচনা করা। কোথায় নামাযের মহান শিক্ষা আর কোথায় আমাদের বাস্তব জীবন! এরূপ পরিস্থিতি দেখে সত্যিই দুঃখ হয়।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের জনসাধারণের সুন্দর আচার-আচরণ এবং সাম্য ও

সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহারের কথা শুনে সত্যিই আমাদেরকে আর্শ্চায্যান্বিত হতে হয়। অথচ ঐসব সুন্দর আচার-আচরণ আমরা মুসলমানদেরই হওয়া উচিৎ ছিল, কারণ ওদের চেয়ে অনেক অনেক গুণের উন্নতমানের আচার-আচরনের নিয়মনীতি ও আদর্শ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। নামাযের মধ্যে আমরা যেভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই, নামাযের বাইরে এসে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা সে প্রতিশ্রুতির কথা স্বরণ রাখতাম এবং সে অনুসারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মগুলো করে যেতে পারতাম– তাহলে নিজ নফছ-প্রবৃত্তিও শয়তানের প্ররোচনা-প্রলোভন কিংবা পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে হউক-কোন কিছুই আমাদেরকে আদর্শচ্যুত ও বিপথগামী করতে পারতনা।

নামাযের মধ্যে সবাই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী প্রভূ আল্লাহরই বাধ্য রূপে ঘোষণা দিয়ে অঙ্গীকার বদ্ধ হই। পরক্ষণেই নামাযের বাইরে এসে কিভাবে প্রভূ আল্লাহর আদেশ নিষেধের সরাসরি বিপরিত কাজ করা যেতে পারে! তা সত্যিই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার।

শ্রদ্ধেয় পাঠক। আরো একটু চিন্তা করে দেখুন! আমরা সবাই প্রত্যহ নামাযের মধ্যে "সূরা ফাতেহা" পাঠে মহা প্রভূর দরবারে প্রার্থনা জানাই!

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ -

অর্থাৎ, হে মহামহিম প্রভূ আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐ সত্য-সরল-সোজা পথে পরিচালিত করুণ যে পথে আপনার নেয়ামত (দান-অনুগ্রহ)প্রাপ্ত (নবী-রাসূল (স) গণ, ছিদ্দীকীন, শহীদান ও ছালেহীন তথা অলি-দরবেশ) বান্দারা চলেছেন।

অভিশপ্ত (ইয়াহুদী)দের পথে কিংবা বিপথগামী (গোমরাহ খ্রীষ্টান) দের তথা কাফির ও মুশরিকদের পথে নহে। প্রত্যেক নামাযে আমরা এভাবে মহামহিম প্রভূ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে যাচ্ছি যে, হেপ্রভূ! আমাদেরকে অভিশপ্ত ইয়াহুদী, পথভ্রষ্ট খ্রীষ্টান অথবা নাস্তিক ও মূর্তী পুজারীদের অনুসৃত পথও মতে মোটেই পরিচালিত করবেন না।

আর নামায থেকে বের হয়ে আসা মাত্রই আচার ব্যবহারে, লেবাছ-পোষাকে রীতি-নীতিতে শিক্ষা দীক্ষায় উৎসবে-অনুষ্ঠানে, কৃষ্টি-সভ্যতা ও সাংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান কিংবা নাস্তিক ও হিন্দুদের অনুসরণ অনুকরণই করে থাকি।

তারা যা করে নির্বিচারে উহাকেই জাতীয় উন্নতি এবং সমৃদ্ধির চাবিকাঠি রূপে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে থাকি এবং সে হিসাবে চলায়-ফেরায়, আচারে- ব্যবহারে উৎসবে-অনুষ্ঠানে তাদের কাল্‌চার ও রীতিনীতিকেই আমরা সানন্দে মেনে চলি।

প্রিয় পাঠক! একটু ভেবে দেখুন! সামান্য আগেই নামাযের মধ্যে যে হেদায়তের জন্য প্রার্থনা করা হল নামাযের বাইরে এসে তার সম্পূর্ণ উল্টোটাই করা হলে নামাযের ভিতরের এ প্রার্থনার আর কোন স্বার্থকতা রইল কি?

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নামায ও বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মান

✪ মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এবাদত সমূহের মধ্যে নামাযই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্টতম এবাদত।

মহান আল্লাহর জিকির-স্মরণ ও তার প্রতি চরমভাবে তা'জীম প্রদর্শনের নিমিত্তে, রব্বুল ইজ্জতের প্রতি চরম দীনতা-হীনতা সহকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পবিত্র কোরআন করিমের বিভিন্ন স্থানে যে বলা হয়েছে ঐ সব জিকির-স্মরণ ও তা'জীম প্রদর্শনের উপকরণ-পন্থা সমূহের মধ্যে নামাযই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা ও উপকরণ। তদুপরি সর্বোত্তম পন্থায় তা'জীম ও ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রধানতম উপাদান।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে : وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

অর্থ : এবং তোমরা আমার জিকির-স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। কোরআন হাকীমের অন্যত্র বলা হয়েছে :

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ

অর্থ : নিশ্চয় নামাব-যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে (নামাযীকে) বিরত রাখে, তদ্দুপরি (এ নামায) আল্লাহ পাকের সর্বোত্তম জিকির।

কিন্তু এ নামায মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম জিকির ও নিরেট এবাদত হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রভূ আল্লাহ ছুব্হানাহু ওয়া তাআ'লার নৈকট্য, সান্নিধ্য ও পরম সন্তুষ্টি লাভের প্রধানতম উপকরণ হওয়া সত্বেও একটু গভীরভাবে ঈমানী চিন্তা-চেতনার দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এরূপ আল্লাহর নিরেট এবাদতের মধ্যে ও আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর পেয়ারা নবী রহ্মাতুললিল্ আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ, প্রশংসা ও তা'জীমকে বাদ দেননি বরং নামাযের বৈঠক সমূহে প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রতি সম্বোধন সূচক বাক্য দ্বারা সালাম পেশ করার জন্য তাশাহ্হুদ-"আত্তাহিয়্যাতু" পাঠকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের পর দরূদ শরীফ পাঠের বিধান দানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় হাবীব, নবী সম্রাট, শাফীউল মুজনেবীন (দঃ) এর স্মরণ, প্রশংসা এবং তা'জীমকে ও নামাযের ভিতর সংযোজন করে দিয়েছেন। কারণ মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন করিমে আগে থেকেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন— وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

অর্থ : হে প্রিয় নবী! আমি আপনার (জিকির স্মরণ কে আমার কলেমায়, আযানে-নামাযে সংযুক্ত করে দিয়ে) আপনার মর্যাদাশীল স্মরণকে মহানতর করেছি।

সম্মানিত পাঠক!

"তাশাহ্হুদ-আত্তাহিয়্যাতুর শুধু স্বাভাবিক পাঠকে ওয়াজিব করা হয়নি বরং অধিকাংশ ইমামগণের মতানুসারে আত্তাহিয়্যাতু পাঠের সময় যখন মুছাল্লী "আচ্ছালামু আলাইকা আয়ইয়্যুহান্ নাবীয়্যু" বলবে, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র নূরানী সূরাত-আকৃতির খেয়াল-ধ্যানকে অন্তরের মধ্যে এনে প্রিয় নবী (দঃ)-কে নিজের কাছে হাজির জেনেই সালাম পেশ করতে হয় এবং বলতে হয়—

আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু" অর্থাৎ হে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম! আপনার পাক-পবিত্র দরবারে আমার স্বশ্রদ্ধ সালাম নিবেদিত হউক এবং আপনার উপর মহান আল্লাহ তাআ'লার অফুরন্ত ও পরিপূর্ণ রহমত এবং বরকত নাজিল হউক।

উপরের বর্ণনার আলোকে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আল্লাহর মহান নবী (স) এর ইজ্জত ও মান মর্যাদা প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে কত উচ্চ, কত অধিক ও মহান এবং বন্দেগী সূত্রের প্রিয় হাবীব (দঃ) কে তিনি কত অধিক ভালবাসেন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপ-আফসোসের ব্যাপার হল যে, আমাদের মধ্যকার মুসলিম নামধারী এক শ্রেণীর লোক নামাযের মধ্যে "আত্তাহিয়্যাতু" পাঠের মাধ্যমে প্রিয় নবী (দঃ) কে সালাম দেওয়ার সময় আল্লাহর নবী (দঃ) এর খেয়াল-ধ্যান করাকে "শিরিক" গুনাহ রূপে মন্তব্য করে চলেছে। এমনকি তাদের অনেকে আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দঃ) এর খেয়াল-ধ্যান করাটাকে চতুষ্পদ জন্তু তথা গরু-গাধার খেয়াল আনার চাইতেও মন্দ এবং মারাত্মক বলে ভ্রান্ত মত ব্যক্ত করে চলেছে। তাই এ বিষয়ে শরীয়াতে ইসলামীয়ার অনুসরণ, অনুকরণ ও নির্ভরযোগ্য সঠিক দলিল-প্রমাণ সহকারে একটু দীর্ঘ আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুণ!

✪ আমাদের হানাফী মাজহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফতোওয়া তথা ইসলামী বিধানাবলীর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "দুররুল্ মোখতার" এ বর্ণিত আছে—

(وَيَقْصُدُ بِاَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ) مَعَانِيَهَا مُرَادَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِ (الْاِنْشَاءِ) كَاَنَّهُ يُحَيِّى اللّٰهَ وَيُسَلِّمُ عَلٰى نَبِيِّهٖ الخ

✪ এমনিভাবে "আমাদের হানাফী মাজহাবের সর্বমান্য ইসলামী বিধান গ্রন্থ "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত আছে॥

اَىْ لَاَيَقْصُدُ الْاَخْبَارَ وَالْحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِىْ الْمِعْرَاجِ مِنْهُ صلعم وَمِنْ رَبِّهٖ سُبْحَانَهُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الخ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ এভাবে ইসলামী জগতের সুবিখ্যাত ও সর্বমান্য ফতোওয়া গ্রন্থ- আলমগীরিতে" উল্লেখ আছে—

وَلَابُدَّ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ مَعَانِيَهَا الَّتِيْ وُضِعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحَيِّي اللّٰهَ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

✪ মারাকিউল ফালাহ নামক প্রসিদ্ধ-গ্রন্থে বলা হয়েছে—

(وَقَرَأَ) الْمُصَلِّيْ وَلَوْ مُقْتَدِيًا (تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضى الله عنه) وَيَقْصِدُ مَعَانِيَهُ مُرَادَةً لَهُ عَلٰى أَنَّهُ يُنْشِئُهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا مِنْهُ .... فَيَقْصِدُ الْمُصَلِّيْ اِنْشَاءَ هٰذِهِ الْأَلْفَاظِ مُرَادَةً لَهُ قَاصِدًا مَعْنَاهَا الْمَوْضُوْعَةَ لَهُ مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحَيِّي اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى خِلَافًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ حِكَايَةُ سَلَامِ اللّٰهِ لَا اِبْتِدَاءُ سَلَامٍ مِنَ الْمُصَلِّيْ ـ

(مراقى الفلاح شرح نور الايضاح)

✪ সর্বনির্ভরযোগ্য বিশ্বখ্যাত ফতোয়ার কিতাব বাহ্‌রুর রায়েক গ্রন্থে এসেছে-

وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا بَعْضَ مَعَانِي التَّشَهُّدِ لِمَا أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَقْصِدُ بِهٰذِهِ الْأَلْفَاظِ مَعَانِيَهَا مُرَادَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُجْتَبٰى بِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ مَعْنَاهَا الَّتِيْ وُضِعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحَيِّي اللّٰهَ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلٰى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَائِهِ =ـ وَعَلٰى هٰذَا فَالضَّمِيْرُ فِيْ قَوْلِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا عَائِدًا إِلَى الْحَاضِرِيْنَ مِنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ وَالْمَلَائِكَةِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْغَايَةِ عَنِ النَّوَوِيِّ وَاسْتَحْسَنَهُ وَبِهٰذَا يَضْعُفُ مَا ذَكَرَهُ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّ قَوْلَهُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ حِكَايَةُ سَلَامِ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَا اِبْتِدَاءُ سَلَامٍ مِنَ الْمُصَلِّيْ عَلَيْهِ ـ (بحر الرائق ج١، صفحه ٣٢٥)

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা সমূহের সারমর্ম হল—

নামাযের বৈঠক সমূহে "তাশাহ্হুদ-আত্তাহিয়্যাতু" পাঠের সময়- এর শব্দ সমূহের যে উদ্দেশ্য মূলক নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, নামাযী বান্দা ঐ সব অর্থের দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করতঃ যেন মুছাল্লী আল্লাহ তাআ'লাকে নিজের কাছে হাজের-নাজের জেনে এক্ষনিই-এমুহূর্তেই "তাহিয়্যাহ" অর্থাৎ আল্লাহর মহান দরবারে যাবতীয় চরম তা'জীম-সম্মান ও প্রশংসা সমূহ নিবেদন করে যাচ্ছে, অনুরূপ ভাবে যেন নামাযী আল্লাহর পেয়ারা নূরানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের সামনে ধ্যান করে এক্ষনিই এমুহূর্তেই নিবেদন করছে- আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু অর্থাৎ হে প্রিয় নবী! আপনার পবিত্র খেদমতে আমি অধমের স্বশ্রদ্ধ সালাম কবুল হউক----- ।

এ আত্তাহিয়্যাতু পাঠকে মে'রাজের রাতে মহান আল্লাহ তাআলা ও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরস্পরের মধ্যে যে, "তাহিয়্যা" ও সালামের আদান-প্রদান এবং কথোপকথনের অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়েছে- শুধু এর পুনরাবৃত্তি মূলক বর্ণনা প্রদান করা হচ্ছে বলে মনে করবে না।

✪ অনুরূপভাবে ইসলামী জগতের অন্যতম মুহাককেক, দর্শন জগতের সম্রাট হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) নামাযের "আত্তাহিয়্যাতু" এর "আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু" বলার সময় নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র খেয়াল মনে আনার সমর্থনে স্বীয় "এহ্‌য়াউল্ উলুম" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে বলেছেন ঃ

وَاَحْضِرْ فِيْ قَلْبِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ

অর্থ ঃ হে নামাযী! তুমি তোমার নামাযের "আত্তাহিয়্যাতু" পাঠের সময় তোমার অন্তরের আসনে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হাজির (উপস্থাপিত) কর ও প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র নূরানী সূরাত-আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করে বল- আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

✪ বিশ্ববরেণ্য অলিয়াল্লাহ, মারেফাত জগতের মহান ইমাম, হযরত শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ারদী (রঃ) স্বীয় "আওয়ারিফুল মু'আরিফ কিতাবে "আত্তাহিয়্যাতু" এর সালাম পাঠ প্রসঙ্গে বলেছেন—

وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمَثِّلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْ قَلْبِهِ

অর্থ ঃ মুছাল্লী নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র আকৃতিকে তার অন্তর চক্ষুর সামনে চিত্রিত করেই নবী করিম (দঃ) এর খেদমতে সালাম পেশ করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ বোখারী শরীফের অন্যতম ভাষ্যকার হযরত ইমাম কাছ্তুলানী (রঃ) مَسَالِكُ الْحُنَفَاءِ নামক কিতাবে বলেছেন–

وَلَا يَخْفٰى مَنْ كَانَ بَعِيْدًا يَسْتَحْضِرُ نَفْسَهٗ حِيْنَ قِرَائَتِهَا فِىْ حَضْرَتِهٖ صلى الله عليه وسلم ـ

অর্থঃ ইহা কারও অনবগত নয় যে, সুদূরবাসী মুছাল্লী "আত্তাহিয়্যাতু" পাঠ করার সময় নিজেকে হুজুর পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মূখে হাজির রূপে ধারণা-খেয়াল করেই আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে যাবে।

✪ বোখারী শরীফের সর্বোত্তম ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ "ওমদাতুলক্বারী" এর মধ্যে হযরত আল্লামা আইনী হানফী (রঃ) বলেন–

وَيُحْتَمَلُ اَنْ يُقَالَ عَلٰى طَرِيْقَةِ اَهْلِ الْعِرْفَانِ ـ اَنَّ الْمُصَلِّيْنَ لَمَّا اسْتَفْتَحُوْا بَابَ الْمَلَكُوْتِ بِالتَّحِيَّاتِ اُذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُوْلِ فِىْ حَرِيْمِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ فَقَرَّتْ اَعْيُنُهُمْ بِالْمُنَاجَاةِ فَنُبِّهُوْا عَلٰى اَنَّ ذٰلِكَ بِوَاسِطَةِ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ وَبَرَكَةِ مُتَابَعَتِهٖ فَاِذَا الْتَفَتُوْا ـ فَاِذَا الْحَبِيْبُ فِىْ حَرِيْمِ الْحَبِيْبِ حَاضِرٌ فَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِ قَائِلِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

✪ বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব বৃহৎ বিশ্বস্থও নির্ভর যোগ্য জীবনী গ্রন্থ مَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَا مَعَ شَرْحِ الزُّرْقَانِىْ কিতাবের ৭ম খন্ডে হযরত আল্লামা কাছ্তুলানী (রঃ) এবং এর ব্যাখ্যায় আল্লামা জোরকানী (রঃ) বলেন–

وَيُحْتَمَلُ اَنْ يُقَالَ عَلٰى طَرِيْقَةِ اَهْلِ الْعِرْفَانِ ـ اَنَّ الْمُصَلِّيْنَ لَمَّا اسْتَفْتَحُوْا بَابَ الْمَلَكُوْتِ بِالتَّحِيَّاتِ اُذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُوْلِ فِىْ حَرِيْمِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ فَقَرَّتْ اَعْيُنُهُمْ بِالْمُنَاجَاةِ لِاَنَّ الْمُصَلِّىْ يُنَاجِىْ بِهٖ فَنُبِّهُوْا عَلٰى اَنَّ ذٰلِكَ بِوَاسِطَةِ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ وَبَرَكَةِ مُتَابَعَتِهٖ فَالْتَفَتُوْا اِلْتِفَاتًا مَعْنَوِيًّا فَاِذَا الْحَبِيْبُ) صلى الله عليه وسلم (فِىْ حَرِيْمِ الْمَلِكِ الْحَسِيْبِ) جَلَّ وَعَلَا وَفِىْ نُسْخَةٍ فِىْ حَرِيْمِ الْحَبِيْبِ (حَاضِرٌ فَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِ قَائِلِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

উপরের উভয় উদ্ধৃতির সারমর্ম হচ্ছে– আহলে মারফত তথা আধ্যাত্মিক জগতের মহা মনিষী গণের মতানুসারে বলা যায়, নামাযীরা যখন নামাযে "আত্তাহিয়্যাতু" পাঠের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্যের দরজা খুলে নেয়, তখন তাকে চিরঞ্জীব প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পবিত্র হেরেম তথা খাচ দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, এতে বান্দা রূহানী ভাবে প্রভূ আল্লাহর দরবারে মুনাজাত অর্থাৎ নিজের অন্তরের আবেদন-নিবেদন পেশ করার ভিতর দিয়ে তার চক্ষু জুড়ায়। এরই মাঝে নামাযী অবগত হয় যে, প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানূহুর এত নৈকট্যে পৌছা সম্ভব হয়েছে একমাত্র রহমতের নবী,.রহমাতুললিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াছিলায় এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর অনুসরণে এ তাশাহ্হুদ-আত্তাহিয়্যাতু পাঠের বদৌলতেই।

এরূপ ধ্যান-ভাবনার মাঝে নামাযী তার দৃষ্টি ফিরাতেই হাবীবকে হাবীবের দরবারে তথা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহা প্রেমিক প্রভূ আল্লাহ ছুব্হানাহু ওয়া তাআ'লার দরবারে উপস্থিত দেখতে পায়।

ঐ সময় ও মুহূর্তটাকে নামাযী তার নিজের জন্য সুবর্ণ সুযোগ মনে করতঃ নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুতাওয়াজ্জাহ হয়ে সে আরজ করতে থাকে আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

✪ আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর একটি বিশ্ব খ্যাত জীবনী গ্রন্থ "মাদারেজুন্ নুবুয়্যাত" (উর্দূ সংস্করণ) ১ম খন্ডে মুহাদ্দেছ সম্রাট হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) বলেন–

بعض عرفاء کے کلام میں واقع ہوا ہے کہ نمازی کا التحیات میں صیغہ خطاب سے حضور صلعم پر سلام عرض کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے شہود وملا حظہ کرنے اور تمام موجودات میں روح مقدس کے ذراری سرایت کرنا خصوصا نماز یون کی روحون مین جلوہ فگن ہونے کی بنا پرھے غرضیکہ نمازکی حالت مین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہود و حضور ووجود گرامی کے جلوہ فگن ہونسے غافل وبے خبر نہ رھنا چاھئے ـ

অর্থঃ কোন কোন আরেফ তথা আল্লাহ-রাসূল প্রেমিক অলি-আল্লাহগণের বাণীতে পাওয়া যায়, নামাযের "আত্তাহিয়্যাতু" পাঠের বেলায় (নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যভাবে নামাযীর সামনে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও) নামাযী কর্তৃক সম্বোধন সূচক শব্দ দ্বারা নবী পাক (দঃ)এর খেদমতে সালাম পেশ করাটা– নূরানী নবী (দঃ) এর পবিত্র রূহ মোবারক এর সর্বত্র হাজির থাকার ও পরিদর্শন করার কারণেই এবং সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মহানবী (দঃ)-এর রূহ (আত্মা) পাকের নূর-জ্যোতির

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রভাব বিদ্যমান থাকার কারণে– বিশেষতঃ নামাযীগণের রূহের মধ্যে নূরানী নবী (দঃ)-এর রূহানিয়াত বিশেষ ভাবে প্রকাশিত থাকার উপর ভিত্তি করে সম্বোধন সূচক সালাম পেশ করা হয়ে থাকে।

সংক্ষেপে বলতে হয় যে, নামাযরত অবস্থায় মুছাল্লীর নিকট হুজুরপূরনূর (দঃ)-এর হাজের থাকা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র (অজুদ) অস্তিত্ব মোবারক নামাযীর কাছে বিকশিত হওয়ার ব্যাপারে নামাযী বান্দার অমনোযোগী ও অসতর্ক থাকাটা মোটেই উচিৎ নয়।

যে বিষয়টিকে ইসলামের অধিকাংশ মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরাম, মুহাদ্দেছীন ও মুহাক্কেকীন ইজামগণ সমর্থন করেছেন, করার জন্য আদেশ করেছেন, সে বিষয়টি কি কখনো শিরিক হতে পারে ? মোটেই হতে পারে না; বরং যারা এ বিষয়টিকে শিরিক রূপে বলে সরলমনা মুসলমানদের ধোকায় ফেলে দিচ্ছে, বিভ্রান্ত করছে তারাই মূলতঃ অজ্ঞ, গোমরাহ ও নবী বিদ্বেষী রূপে নিশ্চিৎভাবে বিবেচিত।

সম্মানিত পাঠক মন্ডলী !

আরও একটু লক্ষ্য করুন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পেয়ারা রাসূল (দঃ) এর শান-মর্যাদা সম্পর্কে বান্দাদেরকে অভিহিত করতে গিয়ে এরশাদ করেন–

يايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم -

অর্থ ঃ হে মো'মেনগণ! যখনই তোমাদেরকে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তার প্রিয় রাসূল (দঃ) এরূপ কিছুর দিকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে ডাক দেন আহবান করেন, তখনই সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া–হাজির হওয়া তোমাদের জন্য ফরয।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কোন ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক সরাসরি আহবান করা ডাক দেওয়া এটা নবী-রাসূল (সাঃ) ব্যতীত সাধারণ লোকদের জন্য হতে পারেনা বরং আল্লাহর আহবান তার নবী-রাসূল (সাঃ) গণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে এও স্মরণ রাখতে হবে যে, সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাবেয়ীন (রঃ) ও আইম্মায়ে দ্বীন (রঃ) এ ব্যাপারে একমত যে, যে কোন লোক যে কোন অবস্থাতে থাক্‌ত না কেন– নামায রত অবস্থায় থাকত কিংবা অন্য কোন জরুরী কাজ কর্মে রত থাকত আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দঃ) যখনই কাকেও ডাক দিতেন, আহবান করতেন সাথে সাথে সাড়া দেওয়া, খেদমত শরীফে হাজির হওয়া ফরয ছিল।

হযরত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আমলের মাধ্যমেও তা প্রমাণ করে গিয়েছেন। যখনই আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাকেও ডাক দিতেন–আহবান করতেন। সঙ্গে সঙ্গেই তারা জরুরী কাজ-কর্ম ছেড়ে এমনকি নামায পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র খেদমতে হাজির হয়ে পড়তেন।

পাঠক শুনুন!

বোখারী শরীফের কিতাবুত্ তাফ্‌সীর অধ্যায়ে উল্লেখিত একদার ঘটনা–

عن ابى سعيد بن المعلى قال كنت اصلى فى المسجد فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يارسول الله انى كنت اصلى فقال صلعم الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم -

(تفسير سورة الفاتحة)

وعن ابى سعيد بن المعلى قال كنت اصلى فمر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعانى فلم اته حتى صليت ثم اتيته فقال ما منعك ان تاتى الم يقل الله يايها الذين امنوا استجيبوا الخ -

উদ্ধৃত হাদীস শরীফদ্বয়ের সার অর্থ—

হযরত আবু ছাঈদ ইব্‌নুল মুআল্লা (রঃ) বলেন, একবারের ঘটনা, আমি মাসজিদে নামায আদায়রত ছিলাম, এমতবস্থায় আল্লাহর রাসূল (দঃ) আমার পাশ দিয়ে তাশরিফ নিলেন এবং আমাকে ডাক দিলেন, ডাকা মাত্র আমি সাড়াও দেইনি, খেদমত মোবারকে হাজিরও হইনি; বরং (তাড়াতাড়ি) নামায শেষ করেই পবিত্র খেদমতে হাজির হই, তখন আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আবু ছাঈদ!

তোমার আসতে দেরী হল কেন ? উত্তরে আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! আমি নামায আদায়রত ছিলাম তাই আসতে দেরী হয়েছে। তা শুনে নবী আকরাম (দঃ) এরশাদ করেন, আবু ছাঈদ! আল্লাহ তাআ'লা কি আদেশ করেন নি ?

يايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول الخ -

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুণ!

উপরে বর্ণিত উভয় হাদীস শরীফ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হল যে, নামায আদায় রত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে হউক কিংবা অনিচ্ছায় হউক কারো অন্তর-মনে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর খেয়াল আসা বা খেয়াল আনা এবং আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রতি মনোযোগী হওয়া শিরিক নয়-যদি এরূপ খেয়াল আনা-মনোযোগী হওয়া শিরিক কিংবা নিষেধ হত-তাহলে আল্লাহর নবী (দঃ) র ডাক-আহবান শুনামাত্র নামায আদায় করাটাকে মওকুফ রেখে পবিত্র খেদমতে কেন তাড়াতাড়ি হাজির হলনা? এ ব্যাপারে হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় রত ছাহাবী হযরত আবু ছাঈদ (রাঃ) থেকে কৈফিয়ত তলব করতেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তদুপরি কোন ছাহাবী নামাযরত অবস্থায় থাকলে ও প্রিয় নবী (দঃ) তাকে ডাক দিলে তাতে সাড়াদান উদ্দেশ্যে নিজ নামায আদায় করাটাকে আপাততঃ মওকুফ রেখে অতি সহসা পবিত্র খেদমতে হাজির হয়ে পড়ার জন্য মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন করিমের উল্লেখিত আয়াতকে দলিল রূপে উল্লেখ করতঃ এত অধিকভাবে তাগিদ দিতেন না।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করে দেখুন, নামায আদায়রত কোন ছাহাবীর নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাক-আহ্বানে সাড়া দিয়ে পবিত্র খেদমতে হাজির হতে হলে আল্লাহর প্রিয় নবীর খেয়াল-ধ্যান মন-অন্তরে আনা ব্যতীত এবং আল্লাহর হাবীব (দঃ) এর প্রতি মনোযোগী হওয়া ব্যতিরেকে সম্ভবপর কিনা ? মোটেই সম্ভবপর নয়।

এ ব্যাপারে হযরাত ফোকাহায়ে কেরামগণের বিশুদ্ধমত হল নামায আদায়ের মাঝখানে আল্লাহর নবীর ডাকে সাড়া দিয়ে খেদমত মোবারকে হাজির হয়ে নবীয়ে পাক (সাঃ) কর্তৃক নির্দেশিত কাজ সেরে নামাযের বাকী অংশ আদায়ে পুনঃ লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত ফাঁকের এ সময়টায় উক্ত ছাহাবী নামাযরত অবস্থাতেই মশগুল আছেন বলে গণ্য হতেন এবং আল্লাহর নবী (দঃ) এর খেদমতে হাজির হওয়াটাকে নামাযের ভিতরের কাজ রূপেই গণ্য করা হত।

এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরাম (রঃ) বলেছেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে-আহবানে সাড়া দিয়ে খেদমত পাকে হাজির হয়ে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর আদেশ পালন করতঃ পূর্ব নিয়তের উপর ভিত্তি করে পুনঃ গিয়ে বাকী নামায আদায় করা যেত।

মাঝখানের ক্রিয়া-কলাপের দ্বারা ঐ নিয়তকৃত নামাযকে কেউ বাতেল হয়ে গিয়েছে বলে মত প্রকাশ করেননি। অর্থাৎ পুনঃ ঐ নামাযের জন্য নূতন নিয়্যত করতঃ আদায় করা লাগতনা বরং নামাযের যত অংশ আদায় করে আল্লাহর নবী (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিল খেদমত সারার পর শুধুমাত্র নামাযের বাকী কাজ সমূহ আদায় করে নিয়ে নামায সমাপ্ত করলে হয়ে যেত।[১]

টীকা ঃ (১)

صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ) كَالْعَلَامَةِ بَهْرَامْ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِىْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ (اَنَّهَا لَاتَبْطَلُ) وَلَوْ فَرَضْنَا بَلْ هِىَ صَحِيْحَةٌ وَلَوْ اَجَابَهُ بِالْفِعْلِ - (مواهب اللدنيه مع الزرقانى)

✪ ছহী বোখারী ও মুছলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আরও একটি ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন, হযরত ছাহাল্ বিন ছা'য়াদ ছায়েদী (র) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবীয়ে আকরাম (দঃ) আমর বিন্ আউফ গোত্রে কোন ব্যাপারে পারস্পরিক সন্ধি করার উদ্দেশ্যে তাশরিফ নিয়েছিলেন, অতঃপর সম্ভবতঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে কোন কাজে অন্য কোন দিকে গিয়েছিলেন, ইত্যবসরে নামায আদায়ের সময় হয়ে পড়ায়-------হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) নামাযের ইমামতী করছিলেন। এরই মাঝে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) তাশরিফ নিয়ে আসলেন এবং প্রথম কাতারে গিয়ে দাড়ালেন। নামাযরত মুছাল্লীরা---------নবীয়ে পাক (দঃ)-এর আগমন সম্পর্কে হাতের আওয়াজ দ্বারা হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ)-কে ইঙ্গিত করলেন–

اِلْتَفَتَ فَرَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ.رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ اسْتَاخَرَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اسْتَوٰى فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَامَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذَا اَمَرْتُكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَاكَانَ لِاَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থ ঃ এতে হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) ফিরে দেখলেন যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। তখন প্রিয় নবী (দঃ) হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা) কে ইশারায় নির্দেশ দিলেন, হে আবু বকর! তুমি নিজস্থানে স্থীর থেকে ইমামতী করে যাও. এতে হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) হাত তুলে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশের জন্য শুকরিয়া স্বরূপ "আলহাম্দু লিল্লাহ"-বললেন এবং আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর তা'জীমার্থে পিছনে সরে এসে মুছাল্লিদের কাতারে ঢুকে পড়লেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (দঃ) ইমামের স্থানে গমন করতঃ বাকী নামাযের ইমামতী করে নামায সমাপ্ত করলেন।

পরিশেষে আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু বকর! আমি তোমাকে (অত্র নামাযের) ইমামতীতে স্থীর থেকে ইমামতী করে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন তা তুমি পালন করলেনা ?

উত্তরে হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) আরজ করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু কুহাফার ছেলে আবু বকরের দ্বারা আল্লাহর মহান রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে ইমামতী করে যাওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রিয় পাঠক! এমনিভাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস শরীফের আর একটি ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন!

কোন এক ছফরে কোন কারণ বশতঃ আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন। পরে কাফেলার মাঝে এমন অবস্থায় নবী আকরাম (দঃ) এসে যোগদিলেন। যখন কাফেলার ছাহাবায়ে কেরামগণ জামাতের সাথে নামায আদায়রত ছিলেন, এতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) নামাযের ইমামতি করছিলেন,

فَلَمَّا اَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ اَنْ يَتَاخَرَ فَاَوْمَا اِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ -

অর্থ ঃ যখন আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ) আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর আগমন অনুভব করতে পারলেন তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তা'জীম প্রদর্শন করতঃ তিনি ইমামতীর স্থান হতে সরে গিয়ে নবী আকরাম (দঃ) কে ইমামতীতে দিতে চাইলেন। আল্লাহর নবী (দঃ) তখন ইশারায় বললেন ইবনে আউফ! তুমিই ইমামতি করে যাও। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ক্রমে শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফই ইমামতী করে নামায শেষ করলেন।

প্রিয় পাঠক!

উদ্ধৃত হাদীস শরীফ দু'খানার প্রতি একটু ঈমানী দৃষ্টি দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি বিষয় নিঃসন্দেহে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

প্রথমতঃ আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জীমের উদ্দেশ্যে "নামাযরত অবস্থায় একস্থান হতে অন্যস্থানে জায়গা পরিবর্তন করা জায়েজ এবং এ তা'জীমের দ্বারা নামাযের কোন ক্ষতি হয়না ও "হুজুরে কল্‌বী" তথা মনের একনিষ্ঠতা– একাগ্রতা নষ্ট হয়না বরং নামাযে তা'জীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা নামায আল্লাহর দরবারে আরও বেশী গ্রহণীয় হয়ে পড়ে।

নতুবা হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর নবী (দঃ) এর তা'জীমের উদ্দেশ্যে কখনও পিছনে সরে আসতেন না এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ) পিছনে সরে আসতে চাইতেন না।

দ্বিতীয়তঃ আরও দেখতে পেলেন যে, নামাযের ভিতর তা'জীমের সাথে আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল আনা ও ধ্যান করা কোরআন-হাদীছ বিরুদ্ধ নহে এবং শিরিকও নহে, নতুবা হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রাঃ) নামাযরত অবস্থায় তা'জীম প্রদর্শন উদ্দেশ্যে হুজুর পুরনূর হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল

নামাযের মধ্যে কি করে আনলেন ? শিরিক ও নাজায়েজ হলে উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ছাহাবা ইসলামী জগতের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ), অপর বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) জামাতে শরীক-শামিল অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম কস্মিণকালেও তাদের স্ব স্ব নামাযে নবী আকরাম (দঃ) এর খেয়াল-স্মরণ এনে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি উল্লেখিত তা'জীম-সম্মান মূলক আচরণ দেখাতেন না।

হযরাত আম্বিয়া (আঃ) গণের পর উম্মাতদের মধ্যে যার মর্যাদা সর্ব উর্দ্ধে হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ)। অপর বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রঃ) এবং ঐ উভয় নামাযের জামাতে শরীক-শামিল ছাহাবায়ে কেরামগণের জন্য নামাযে আল্লাহর নবীর খেয়াল আনা-মনযোগী হওয়া শিরিক হলনা! নামাযের বৈঠকসমূহে শুধু "তাশাহ্‌হুদ-আত্ত্যাহিয়্যাতু" পাঠকালে আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু" বলার সময় আমাদের জন্য আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল আনা ও নবী পাক (দঃ) এর প্রতি মনযোগী হওয়া শিরিক হবে কেন ? মোটেই শিরিক হতে পারেনা।

অনেকে এক্ষেত্রে আপত্তির সুরে বলেন যে, নামায যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার জন্যই, সেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহর ধ্যান ছাড়া অন্য কারো ধ্যান নামাযে করা যাবেনা।

এর প্রতি উত্তরে আবারো আমাদের বলতে হয় যে, নামায যে একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুরই জন্য এবং নামাযে আল্লাহ পাকের ধ্যানই যে মুখ্য উদ্দেশ্য এটা আপত্তিকারীদের চেয়ে আমরা আরো বেশীভাবে অন্তঃকরণ থেকে বিশ্বাস করি এবং মানি– সে কারণে আমরা তথা ইসলামের একমাত্র সত্যপন্থী জামাত অর্থাৎ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল্ জামাতের আক্বীদায় বিশ্বাসী সুন্নী মুসলমানেরা নামাযের দাঁড়ানো, ও রুকু-সিজ্‌দা ইত্যাদি অবস্থায় কস্মিণকালেও আল্লাহ ছুব্‌হানাহু ওয়া তাআ'লা ছাড়া আল্লাহর নবী (দঃ) বা অন্য কারো খেয়াল আনার জন্য বলিও না এবং নিজেরা তদ্বানুযায়ী আমল ও করি না, আমরা শুধু নামাযের বৈঠক সমূহে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহ যে, তশাহ্‌হুদ পাঠে তাঁর একমাত্র হাবীব নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম দানের জন্য আদেশ করেছেন, দরূদ পাঠের বিধান দিয়েছেন, যখন নামাযে সালাম দানের "আল্লাহ প্রদত্ত বাক্য "আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীইয়্যু" পাঠ করা হয়, সেই মুহূর্তেই মাত্র আল্লাহর নবীর (দঃ) পবিত্র খেয়াল-ধ্যান করার জন্য আমরা বলে থাকি, যা আসলে মহান আল্লাহ প্রদত্ত হুকুম পালনেরই নামান্তর। সালাম দানের সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল-ধ্যান করার দাবী খানা শুধু আমরা বর্তমানের সত্যপন্থী সুন্নী আক্বীদায় বিশ্বাসী লোকদেরই দাবী নয় বরং ইসলামী বিধানাবলীর মহান সংস্কারক, সংকলক ও গবেষক

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজতাহিদ আইম্মা ও ফোকাহায়ে কেরামগণ স্ব স্ব নির্ভর যোগ্য ফেকাহ্-ফতোওয়ার গ্রন্থ সমূহে-নামাযে তাশাহ্হুদ পাঠে-প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম দানের সময় তাঁর পবিত্র খেয়াল-ধ্যান এনেই সালাম পেশ করার জন্য বলেছেন, অত্র আলোচনার শুরুতেই ঐ সমস্ত মূল্যবান বাণীগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে। সুতরাং অহেতুক এ বিষয়ে শুধু মাত্র বর্তমানের সুন্নী মুসলিমদের উপর মুশরেক হওয়ার অপবাদ আরোপ করে কোন লাভ হবে না; বরং যে সমস্ত মহামনীষী মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরামের দেওয়া মতামতের উপর ভিত্তি করে আমরা এরূপ আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে নামাযে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম দান করে থাকি সর্বাগ্রে ইসলামের ঐ সমস্ত মহা-মনীষী ফোকাহায়ে কেরামগণের উপরই বিরুদ্ধবাদীদের শিরিকের অপবাদ সমূহ চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন এসে যায়।

তদোপরি আপনারা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ সমূহ পাঠে নিশ্চিৎভাবে জানতে পেরেছেন যে, হযরত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) স্ব স্ব নামায আদায়ের সময় প্রয়োজন বোধে নামাযের ভিতর আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ধ্যানী ও মনোযোগী হয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! একমাত্র মহান আল্লাহর চরম তা'জীম-ধ্যানই নামাযের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও "আনুষঙ্গিক কারণে" নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল-ধ্যান আসা ও আনা উভয়টাই স্বাভাবিক।

আল্লাহ জাল্লা শানুহুই সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র মহান স্রষ্টা ও উপাস্য। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্রষ্টাও নন উপাস্যও নন বরং সুনিশ্চিৎভাবে তিনি একজন আল্লাহর সৃষ্টি এবং উপাসকই বটে। কিন্তু আল্লাহর নামাযে তারই সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক প্রেমাসপদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেয়াল-ধ্যান আনার আনুষঙ্গিকতা অর্থাৎ সালাম দানের বিধান স্বয়ং, তিনি আল্লাহই যোগ করে দিয়েছেন, এতে আপত্তিকারীদের আর কিছুই করার নাই।

এ প্রসঙ্গে আরও জেনে রাখা দরকার যে, প্রাপকের দিক বিবেচনায় তা'জীম সম্মান (تَعْظِيْمٌ وَتَوْقِيْرٌ) দু'প্রকার-

✪ প্রথমতঃ কাকেও নিজের এবং কুল মাখলুকাতের অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভু অনাদি-অনন্ত একমাত্র খালেক-স্রষ্টা ও রাব্বুল আলামীন তথা নিজের ও সারা জাহানের লালন-পালন কর্তা-মহা প্রভূজ্ঞানে এবং এ পরম পূত-পবিত্র সত্তাকেই সমুদয় সৃষ্টি রাজ্যের সর্বস্তরের সৃষ্ট বস্তুর একমাত্র সর্ব শক্তিমান মালিক-মনিব -নিয়ামক-পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক বিধাতা রূপে মেনে নিয়ে তাকেই একমাত্র সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা-সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাবান, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সর্বত্র বিরাজমান নিখিল সৃষ্টির সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক রূপে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়ে তাকেই একমাত্র ইলাহ-মাবুদ

তথা একমাত্র উপাস্য-সমুদয় এবাদতের যোগ্য প্রাপক রূপে বিশ্বাস করে ও মেনে নিয়ে চরম ভাবে তার তা'জীম-ইজ্জত করা, এ পর্যায়ের তা'জীম-ইজ্জত একমাত্র আল্লাহ-জাল্লা শানুহুরই প্রাপ্য-অন্যকারও নয়।

কিংবা কাকেও এ সর্বশক্তিমান পরমপূত-পবিত্র সত্তা, মহা স্রষ্টা এবং প্রভূর সমকক্ষ-সমতুল্য জেনে অথবা মহা প্রভূর বিশাল সৃষ্টি রাজ্য পরিচালনায় কাকেও শরীকদার সাহায্য-সহায়তাকারী রূপে স্বীকার করতঃ তা'জীম-ইজ্জত করা- যা সম্পূর্ণ শিরিক রূপে গণ্য, উপরুল্লেখিত ভাবে কাকেও মেনে-বিশ্বাস করে তা'জীম করা যাবেনা। করলে মুশরিক হয়ে যাবে।

✪ দ্বিতীয়তঃ কাকেও মাখলুক তথা সর্বশক্তিমান মহান স্রষ্টা ও রাব্বুল আলামীনের নিরেট সৃষ্টজাত রূপেই বিশ্বাস করতঃ মহান খালেক ও মালিকের উপাসক ও সুনিয়ন্ত্রিত বান্দা জ্ঞানে এবং মহীয়ান- গরীয়ান স্রষ্টা-রাব্বুল আলামীনের মহান জ্বাত ও ছেফাত তথা সত্তা ও গুণাবলীর সাথে কোন প্রকারের বিন্দু মাত্র শরীক-অংশিদারিত্ব নাই বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতঃ একমাত্র মহান স্রষ্টা ও প্রভূ প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর কারণে-তদুপরি স্বয়ং স্রষ্টার নিজেরই প্রদত্ত নির্দেশে কাকেও তা'জীম-ইজ্জত করা। যেমন কোরআন করিমে এরশাদ হয়েছে, إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ ঃ নিশ্চয় ইজ্জত-তা'জীম-সম্মান "একমাত্র আল্লাহ তাআলা এবং তদ্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ-রাসূলের উপর আস্থা-বিশ্বাস স্থাপনকারী মো'মেনগণেরই প্রাপ্য।

অত্র আয়াতে কারিমায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজের ইজ্জত-তা'জীমের ঘোষণার সাথে সাথে তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মো'মেনগণ ও ইজ্জতের পাত্র বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

যদিও আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআ'লার ইজ্জত-তা'জীম এবং পেয়ারা নবী (দঃ) ও মো'মেনগণের তা'জীম-ইজ্জতের মধ্যে মৌলিকভাবেই পার্থক্য রয়েছে।

এমনিভাবে আরও দেখুন! ইসলাম মাতা-পিতার তা'জীম-ইজ্জত ও ভক্তি-সেবা করার জন্য সন্তানদেরকে আদিষ্ট করেছে অথচ আম্মা-আব্বা আল্লাহ পাক ছোবহানাহু ওয়া তাআ'লার সৃষ্টজাত বান্দাই বটে। এতদ্বসত্ত্বে ও তাদেরকে কেন তা'জীম ভক্তি করার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হল ? অথচ প্রকৃত তা'জীম একমাত্র আল্লাহ তাআ'লারই প্রাপ্য।

এর কারণ রূপে বলা যায়, যেহেতু মাতা-পিতাই হচ্ছেন এ পৃথিবীতে সন্তানের জন্য লাভের একমাত্র ওছিলা-মাধ্যম। তদুপরি গর্ভাবস্থায় মাতা এবং ভুমিষ্ট হওয়ার পর মুহূর্ত হতে মাতা ও পিতা উভয়েই অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে নিজ সন্তানদেরকে লালন-পালন করে বড় করেছেন, উপযুক্ত ও সুযোগ্য মানুষ রূপে গড়ে তুলেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ ভিত্তিতে সন্তানের উপর মাতা-পিতার বিশেষ এহছান-অনুগ্রহ রয়েছে এবং এই এহ্ছান-অনুগ্রহের জন্যই তাদের প্রতি সন্তানদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য, আর এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপকরণ হিসাবে মাতা-পিতাকে তা'জীম-ইজ্জত ও তাদের সেবা করার জন্য ইসলামের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠক!

সারকথা হল উপরে বর্ণিত প্রথম প্রকারের তা'জীম-ইজ্জতের ইসলামী পরিভাষাগত নাম হচ্ছে এবাদত-উপাসনা।

আর দ্বিতীয় প্রকারের তা'জীম শুধু শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনের বেলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এটাকে ওরফ তথা রেওয়াজ-প্রচলনেও এবাদত বলা হয়না।

উক্ত প্রথম প্রকারের তা'জীম তথা সরাসরি প্রত্যক্ষ এবাদত-উপাসনার আল্লাহ তাআ'লাই হচ্ছেন একমাত্র প্রাপক। কারণ ইলাহ্-মাবুদ তথা উপাস্য-স্রষ্টা এবং আমাদের প্রকৃত মালিক-মনিব ও রাব্বুল আলামীন জ্ঞানে নিজেদের অন্তর-মনের চরম দীনতা-হীনতা নিবেদন ও এর আঙ্গিক প্রকাশের প্রধানতম উপকরণ রুকু-সিজ্দা ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহকেই তা'জীম করা হয়।

তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত অন্যান্য সকলকে প্রভূ আল্লাহ ছুব্হানাহু ওয়া তাআ'লার নিরেট মাখলুক (সৃষ্টি) এবং তাঁরই উপাসক বান্দা জেনেই ইজ্জত-তা'জীম করা হয় এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সত্তা ও গুণাবলীর সাথে এদের কোন প্রকারের বিন্দুমাত্র শরীক-অংশিদারিত্ব নাই বলে অন্তর-মন দিয়ে বিশ্বাস ও স্বীকার করতঃ রুকু-সিজ্দা ব্যতীত সাধারণ নিয়মেই তা'জীম-ভক্তি করা হয় এবং এ কারণে উল্লেখিত প্রকারের তা'জীম নিরেট সম্মান-শ্রদ্ধারই অর্ন্তভূক্ত, সরাসরি এবাদত-উপাসনার অন্তর্ভূক্ত নয়।

উভয় তাজীমের মধ্যকার এ পার্থক্যটুকু সকলেরই জেনে রাখা অত্যন্ত দরকার। এ আলোকে এখন আসুন! আমরা আল্লাহর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত ও তাজীম সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করি।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের সঠিক জ্ঞানে জ্ঞানী, প্রকৃত মো'মেন বান্দা মাত্রেরই একথা জানা আছে যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পবিত্র নূরেই সৃষ্ট, রাব্বুল আলামীনের বন্দেগী সূত্রের একমাত্র "হাবীব" (প্রেমাসপদ), হযরত নবী রাসূল আলাইহিমুস্ সালামগণের মহা সম্রাট, রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম-মুহাব্বতের খাতিরেই রাব্বুল ইজ্জত আমরা তথা এ নিখিল জাহানের বিকাশ দিয়েছেন; যা অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ সমূহে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। কোরআন করিমের আয়াতঃ وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

এর ভাষ্য অনুযায়ীও প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ইহ-পরকালের বিশাল সৃষ্টি রাজ্যের জন্য তাঁর "মহান রহমত" তথা তাঁর "করুণার মূর্ত প্রতিক" হিসাবেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিকাশ দিয়েছেন। অধিকন্তু

শাফিউল মুজনেবীন, রহমাতুল লিল্ আলামীন নবী সম্রাট (দঃ) এর মাধ্যমেই সমগ্র সৃষ্টি জগত রব্বুল আলামীনের অপরিসীম রহমত-করুণা ও নেয়ামত সমূহ অহরহ পেয়ে আসছে।

স্থুল দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার কারণে মুলতঃ আমরা তা অনুধাবন করতে পারছি না। তদুপরি আল্লাহর মহান হাবীব (দঃ)ইহ জগতে নবী-রাসূল আলাইহি মুছ্ছালামগণের "সম্রাট" রূপে আগমন করে সারা জিন্দেগীতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার এবং অতুলনীয় অবর্ননীয় নির্যাতন অত্যাচার সহ্য করতঃ অবিরাম সংগ্রাম-সাধনার মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার যে সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করে গিয়েছেন এবং মহা মহিম আল্লাহ জাল্লা শানুহু ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে পরিচিতি ঘটিয়ে প্রভু-ভৃত্যের যে মিলন-বন্ধন কায়েম করে দিয়েছেন, সর্বোপরি পরকালে মো'মেন বান্দাদের উপর রহমতের নবী, শাফিউল মুজনেবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত-সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের যে অপরিসীম দয়া, ক্ষমা ও অপার অনুগ্রহ-করুনা প্রদর্শিত হবে, এর বর্ণনায় পবিত্র কোরআন ও হাদীস ভরপুর।

এসব বিবেচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র মাখলুকাত ও বিশ্ব মানব গোষ্ঠি বিশেষতঃ উম্মাতে মুসলেমীনের উপর নূরে মুজাচ্ছাম, রাহ্মাতুল লিল্ আলামীন নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ-এহছানই আল্লাহর পরে সবচাইতে বেশী ও অধিক।

অতএব, মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর পরে নিখিল সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর হাবীব নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই আমাদের সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অতীব কর্তব্য। আর এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপকরণ হিসাবে মহান আল্লাহর পরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই সর্বাধিক তাজীম-তাওকীর তথা ইজ্জত-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাটাই হচ্ছে উম্মাতে মুসলেমীনের জন্য একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য।

এদিকে লক্ষ্য করেই স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনী ঘোষণার মাধ্যমে তার প্রিয় নবী (দঃ)এর প্রশংসাকরণ, স্মরণ ও ইজ্জত তা'জীমকে সর্বাবস্থায় ফরয করে দিয়েছেন।

যেমন আল্লাহ জাল্লা শানুহু পবিত্র কোরআন করিমে ঘোষণা দিয়েছেন,

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ -

অর্থঃ হে প্রিয় নবী! আমি আপনাকে (আমার অস্তিত্বের) স্বাক্ষী, [ও উম্মাতের ভাল-মন্দ সার্বিক আমলের পরিদর্শণকতা-স্বাক্ষ্যদাতা অর্থাৎ হাজের- নাজের] রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি, যাতে (হে মানব-দানব) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে তা'জিম কর (সাহায্য কর) ও সম্মান কর। উল্লেখ্য যে, মুফাচছির কুলের সম্রাট হযরত আবদুল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইবনে আব্বাছ (রাঃ) تُعَزِّرُوْهُ -এর তাফছীর تُعَظِّمُوْهُ দ্বারা করেছেন অর্থাৎ উনাকে তাজীম কর। হযরত ইমাম মুবাররদ (রঃ) বলেছেন–

تُعَزِّرُوْهُ اَىْ تُبَالِغُوْا فِىْ تَعْظِيْمِهٖ

অর্থ ঃ তাঁর অধিক অধিক তা'জিম কর। আর ইমাম اَخْفَش (রঃ) বলেছেন تَنْصُرُوْهُ তার সাহায্য কর।

এমনকি আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর শ্রেষ্ঠতম তা'জীম সম্বলিত এবাদত- নামাযের মধ্যেও বৈঠকের অবস্থায়-তাশাহ্হুদ-আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ শরীফ পাঠের বিধান দানে তার প্রিয় হাবীব (দঃ) এর প্রশংসা, স্মরণ ও তাঁর প্রতি তা'জীম-তাওকীর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

সুতরাং এ সত্যটাকে অনুধাবন করা দরকার যে, নামাযের তাশাহ্হুদ আত্তাহিয়্যাতু পাঠের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জীম-সম্মান পূর্ণ খেয়াল ধ্যান এনে আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীয়্যু বলে সালাম পেশ করা মোটেই শিরিক নয় ; বরং স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধানেরই অনুসরণ মাত্র।

কেননা, কোন (মুসলমান) মুছাল্লী কষ্মিণকালেও নামাযে আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (নাউজু বিল্লাহি মিন জালিকা) ইলাহ- মাবুদ তথা উপাস্য ও স্রষ্টা জ্ঞানে কিংবা আল্লাহ তাআ'লার কোন রূপ অংশিদার রূপে বিশ্বাস করতঃ তা'জীম বা স্মরণ করেনা বরং আল্লাহর নবী (দঃ) কে আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমাসপদ উপাসনা-এবাদতকারী বান্দারূপেই জ্ঞান করতঃ সালাম ও দরূদ শরীফ পেশ করে থাকে। অতএব তা কখনই শিরিক হতে পারেনা।

এ ক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, নামাযের বৈঠক সমূহে তাশাহ্হুদ আত্তাহিয়্যাতু পাঠের মধ্যে সালাম পেশ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর খেয়াল আনা প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের একদল বলে থাকে যে, অনিচ্ছায় নামাযের মধ্যে প্রিয় নবী (দঃ) এর খেয়াল আসা শিরিক নয় বরং ইচ্ছা করে খেয়াল ধ্যান করতঃ সালাম পেশ করাটাই হচ্ছে দোষণীয় শিরিক। এর উত্তরে বলতে হয় যে, এ ক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনা-আপনি প্রিয় নবী (দঃ) এর খেয়াল আসা যেমন শিরিক নয় অনুরূপ ইচ্ছাকৃত ভাবে আত্তাহিয়্যাতু পাঠের সালাম দেওয়ার সময় পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের কাছে জেনে, নবী পাক (দঃ) কে নিজের খেয়ালে এনে সালাম দেওয়াও মোটেই শিরিক নয়– এভাবে খেয়ালে এনে যদি সালাম দেওয়াটা শিরিক হত তা হলে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীস শরীফের ঘটনা সমূহে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর বিশিষ্ট ছাহাবায়ে কেরামগণ তাদের স্বস্ব নামাযের মধ্যে প্রিয় নবী (দঃ) এর পবিত্র খেয়াল কষ্মিণকালেও আনতেন না।

তদুপরি ইসলামের সর্বমান্য মুজ্‌তাহিদ ইমাম ও ফোকাহায়ে কেরামগণ আত্তাহিয়্যাতু পাঠের মধ্যে সালাম পেশ করার সময় নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে নিজেদের কাছে মনে করেই সালাম পেশ করার জন্য কখনও এত তাগিদ দিতেন না।

পরিশেষে অনুরোধ জানাই যে, এবিষয়টা নিয়ে আর অহেতুক বাড়াবাড়ি করতঃ আল্লাহর মাহবুব নবী (দঃ) এর পবিত্র নূরানী অন্তরে اِيْذَاءُ (কষ্ট) পৌছিয়ে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল ঈমান বিররাসূলকে নষ্ট করতঃ দুনিয়া আখেরাতকে বরবাদ করে দেওয়া কোন মো'মেন হওয়ার দাবীদার ভায়ের জন্য মোটেই শুভ ও কল্যাণকর হবে বলে মনে করি না।

প্রিয় পাঠক!

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের "শান ও নামায" প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় এযে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর শ্রেষ্ঠতম এবাদত নামাযের নাম করণ করেছেন "সালাত (صلوة)" শব্দ দ্বারা। অনুরূপ তাঁর পেয়ারা নবী, রাহমাতুল্ লিল 'আলামীন' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা, স্মরণ ও প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উপকরণ বিষয়ক ও তাঁর জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত-করুণা কামনা করণ-মূলক আমলের ও নাম করণ করেছেন "সালাত" শব্দ দ্বারা। যা এ গ্রন্থের শুরুতেই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আরবী "সালাত" শব্দেরই রূপান্তর মূলক নাম হচ্ছে "নামায ও দরূদ"।

শুধু তাই নয় বরং রাব্বুল আলামীন আল্লাহ জাল্লাশানুহু তার শ্রেষ্ঠতম এবাদত নামাযের দাঁড়ান, রুকু-সেজদা ও বৈঠক ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গি তথা নামাযের বাহ্যিক "আকৃতিও রূপটি" পর্যন্ত তার প্রিয় নবী (দঃ) এর দ্বিতীয় নাম اَحْمَدُ (আহমদ) শব্দের আকৃতিতেই নির্ধারণ করেছেন। যেমনিভাবে ইহা ব্যক্ত করেছেন ইসলামী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তার "দাকায়েকুল আখবার" নামক গ্রন্থে।

তিনি উক্ত গ্রন্থে বলেনঃ নামায (সালাত) কে আল্লাহ তাআ'লা اَحْمَدُ (আহমদ) শব্দের আকৃতিতে রূপ দিয়েছেন–

যেমন একজন মুছাল্লির নামাযের জন্য দন্ডায়মান অবস্থা اَحْمَدُ শব্দের। [আরবী আলিফ] বর্ণেরই মত, মুছাল্লির রুকুর অবস্থা اَحْمَدُ শব্দের ح [আরবী "হা"] বর্ণেরই মত, মুছাল্লির সেজদার অবস্থা اَحْمَدُ শব্দের م [আরবী মীম] বর্ণেরই মত এবং মুছাল্লির বৈঠকের অবস্থা اَحْمَدُ শব্দের د [আরবী দাল] বর্ণেরই মত। (দাকায়েকুল্ আখবার বাংলা সংস্করণ)

পাঠক ভায়েরা একটু চিন্তা করে দেখুন! আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু নিজের শ্রেষ্ঠ এবাদত "নামাযের" নাম করণের জন্য যে (صَلٰوةٌ সালাত) শব্দ খানা বেছে নিয়েছেন, সে একই শব্দ তাঁর প্রিয় হাবীব-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, প্রশংসা, স্মরণ ও প্রিয় নবী (দঃ) এর জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ করুণা কামনা মূলক আমলের জন্যও কেন মনোনীত করলেন ? নবী পাক (দঃ) এর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য এ "সালাত" শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ কি মহাজ্ঞানী আল্লাহু আলীমুন্-হাকীমুন্ -এর ভান্ডারে ছিলনা ? নিশ্চয় ছিল কিন্তু তবুও কেন এ শব্দ ব্যবহার করলেন ? তদুপরি নিজের শ্রেষ্ঠ এবাদত সালাত-নামাযের রূপটিকেও কেন তাঁর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর নাম মোবারক أَحْمَدْ (আহমদ) এর রূপে রূপ দান করলেন এবং এসবের নিগুড় তত্ত্ব ও রহস্য কি ? তা নিশ্চয় সঠিক ঈমানী ও প্রেম পূর্ণ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই বুঝে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

সার সংক্ষেপ কথা হচ্ছে, নামাযের নাম করণে, নামায আদায়ের দৈহিক অঙ্গভঙ্গির আকৃতি প্রকৃতিতে এবং নামাযে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর সালাত-সালাম তথা স্মরণ, প্রশংসা ও তা'জীমকে সংযোজন করে দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথাই প্রমাণিত করেছেন যে, আল্লাহর পেয়ার-মাহ্বুব নবী (দঃ) এর স্মরণ, তা'জীম ও প্রশংসা শুন্য কোন এবাদত-পুণ্য কাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় নয় এবং মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে আল্লাহর এবাদতে নবীয়ে পাক (দঃ) এর স্মরণ ও খেয়াল আসা এবং স্বেচ্ছায় খেয়াল আনা মোটেই শিরিক নয় বরং দরবারে ইলাহীতে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য অন্যতম উপকরণ রূপেই বিবেচিত।

এমনিভাবে যেরূপ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম এবাদত নামাযেও পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ, প্রশংসা ও তা'জীমকে বাদ দেওয়া হয়নি তদরূপ মো'মেন বান্দার জিন্দেগীর সর্বক্ষেত্রে নবীয়ে আকরাম রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জীম, স্মরণ প্রশংসা ও প্রেমপূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণকেও বাদ দেওয়া যায়না; বরং কামেল ঈমানদার হওয়ার জন্য ইহা একান্তই অপরিহার্য। মহান আল্লাহ তাঁর অফুরন্ত ফজল ও করমের বদৌলতে নিখিলের নবী রাহমাতুল লিল্ আলামীন শাফীউল মুজনেবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক শান ও মান-মর্যাদা উপলব্ধি করতঃ তদ্বানুযায়ী তা'জীম -সম্মান ও আন্তরিক মুহাব্বত পূর্ণ (আল্লাহর পরে) সর্বাধিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের তৌফিক দিয়ে ঈমান-আমল ঠিক রেখে এ পৃথিবী থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সুযোগ দান করুন-

আমীন ॥

[illegible] محمد سلطان الحسني عفا الله عنه

خادم العلم والعلماء [illegible]

حقيقة الصلوة ودلائلها و مسائلها

নামাযায়ের হাকীকত, দালায়েল ও মাসায়েল

[দ্বিতীয় খণ্ড]

الحمد لله حمد الشاكرين والصلوة والسلام على رحمة للعالمين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين-

اما بعد .....

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথম অধ্যায়
তাহারাত (পাক-পবিত্রতা)

প্রথম পরিচ্ছেদ
পাক-পবিত্রতার বিরবণ, এবং নাজাসাতের প্রকারভেদ,হুকুম ও পাক-পরিষ্কারের নিয়ম।

উল্লেখ্য যে, ছালাত তথা নামায আদায়ের জন্য মুছাল্লী (নামাযী) এর শরীর ও নামায আদায়ের জায়গা ইত্যাদি পাক-পবিত্র হওয়াটা পূর্বশর্ত।

হাদীস শরীফে তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম طهارة (তাহারত) তথা পাক-পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ রূপে ঘোষণা দিয়েছেন।[১]

অপর এক হাদীস শরীফে যেমনিভাবে নামাযকে বেহেশতের চাবি বলা হয়েছে তেমনিভাবে পাক-পবিত্রতাকে নামাযের চাবিকাটি বলা হয়েছে।[২]

সুতরাং পাক-নাপাক সম্পর্কে অন্ততঃ কিছুটা অবগত হওয়া আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

টীকা ঃ

(১) اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ (مسلم) اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ (ترمذى)

(২) مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ (احمد)

আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, ইসলামী শরীয়াত নাপাকী (دَنَس)-কে সর্বপ্রথম দু'ভাগে ভাগ করেছে ঃ

১. নাজাছাতে হাক্বীক্বী (اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ) অর্থাৎ প্রকৃত দৃশ্যমান নাপাকী যার অপর নাম خبث (খুব্‌ছ)।

২. নাজাছাতে হুক্‌মী (اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ) অদৃশ্য শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত নাপাকী এর অপর নাম حدث (হাদছ)।

নাজাছাতে হাক্বীক্বী অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রকৃত নাপাকী যা বাহ্যিক ভাবে চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, যাকে ধরা যায় এবং যার গন্ধ পাওয়া যায়, তা আবার দু'প্রকার ঃ

১. নাজাছাতে গালীযা (মারাত্মক নাপাকী)

২. নাজাছাতে খাফীফা (গৌণ-হালকা নাপাকী) [আলমগীরী]

✪ নাজাছাতে গালীযা ঃ

হযরত ইমাম আযম (র)-এর মতে যে সব বস্তুর নাপাক হওয়া সম্পর্কে শরীয়াতের সুস্পষ্ট মজবুত দলীল রয়েছে এবং বিপরীতে এর সাথে দন্দ্বমূলক অন্য কোন নির্ভর যোগ্য দলীল নেই, একেই "নাজাছাতে গালীযা" বলা হয়।

অপর পক্ষে হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র) ও হযরত ইমাম আবু ইউছূফ (র)-এর মতে যে সব বস্তুর নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মুজ্‌তাহিদ আয়েম্মায়ে কেরাম (র)-গণের إِجْمَاع (এজ্‌মা) তথা সর্ববাদী ঐকমত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ঐসব বস্তুর নাপাক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে দলীলের দিক থেকে আয়েম্মায়ে কেরামের পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক ধরণের কোন এখ্‌তেলাপ-মতানৈক্য হয়নি ঐ সব নাপাকীকে শরীয়াতের পরিভাষায় বলা হয় "নাজাছাতে গালীযা"।

✪ নাজাছাতে খাফীফা ঃ

হযরত ইমাম আযম (র) এর মতে যে সব বস্তুর পাক-নাপাক উভয়টা হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর বিপরীত দন্দ্বমূলক দলীল বিদ্যমান রয়েছে, ঐ সব নাপাকীকে শরীয়াতের পরিভাষায় "নাজাছাতে খাফীফা বলা হয়।

আর ছাহেবাইন (র) তথা ইমাম আযম (র)-এর দু'শাগরিদ অর্থাৎ হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র) ও হযরত ইমাম আবু ইউছূফ (র)-এর মতে যে সব বস্তুর পাক-নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মুজ্‌তাহিদ ইমামগণের মধ্যে ইখতেলাপ-মতানৈক্য রয়েছে, সে সব নাজাছাতকেই বলা হয় "নাজাছাতে খাফীফা"। (শরহে মুনিয়া)

✪ নাজাছাতে গালীযা কি কি?

মানুষের মল, মূত্র, বীর্য, মযি, যে কোন প্রাণীর প্রবাহমাণ রক্ত, পুঁজ, মুখভরা বমি, মেয়েলোকের হায়য– নেফাছ ও ইস্তেহাযার রক্ত, শূকরের মাংস ও মল-মূত্র, গরু, উট, মহিষ, ছাগল-ভেড়া, দুম্বা ও হরিণ ইত্যাদি হালাল পশুর মল, হারাম পশু

যেমন– বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, শিয়াল ও কুকুরের মল-মূত্র, বিড়ালের মল, হাঁস ও মুরগীর মল, সাপ প্রভৃতির মল-মূত্র এবং প্রাণীর মৃতদেহ ইত্যাদি হচ্ছে নাজাছাতে গালীযা– (বাহ্রুর রায়েক, আলমগীরী দোররুল মোখতার মারাকীউল ফালাহ্)

নাজাছাতে গালীযার হুকুম ঃ

যেহেতু নাজাছাতে গালীযার হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে ফোকাহায়ে কেরাম (রা) উক্ত নাজাছতকে দু'পর্যায়ে বিভক্ত করতঃ হুকুম বর্ণনা করেছেন ঃ

যেমন ঃ (১) গাঢ় নাজাছাতে গালীযা ; (২) তরল নাজাছাতে গালীযা

সে অনুসারে অত্র পুস্তকেও দু'পর্যায়ে এর হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সাথে সাথে এর আনুষঙ্গিক কিছু আলোচনাও করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সকলের জানা থাকা দরকার যে, ইসলামী শরীয়াত একটি বড় দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এর পরিমাণকেই কারো শরীর কিংবা পোশাকে উপরোল্লিখিত উভয় প্রকারের নাজাছাতে গালীযা লাগার পরিমাণ র্নিধারণ করেছে ঃ

কিন্তু কোন্দিক বিবেচনায় উক্ত দেরহাম (মুদ্রা)-এর পরিমাণ র্নিধারণ করা হবে, তা নিয়ে সম্মানিত মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ-মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরামের মতানুসারে নাজাছাতে গালীযা যদি গাঢ় বস্তু হয় তাহলে নাজাছাতের এক দেরহাম পরিমাণ বলতে তখন দের্হামের ওজন পরিমাণকেই বুঝাবে। দের্হামের ওজন সম্পর্কে পবিত্র হাদীস ও ফেকাহ গ্রন্থ সমূহের বর্ণিত মতামত সমূহের সারসংক্ষেপ হচ্ছে–

১ দেরহাম মুদ্রার পরিমাণ = ১ মিছ্কাল

১ মিছকাল পরিমাণ = ৪$\frac{১}{২}$ মাশা

৮ রতিতে ১ মাশা হিঃ ৪$\frac{১}{২}$ × ৮ রত্তি = ৩৬ রত্তি

১২ মাশায় ১ তোলা হিঃ ১২ × ৮ রত্তি = ৯৬ রত্তি বা ১ তোলা

সুতরাং ১ দেরহাম = ৩৬ রত্তি বা $\frac{৩৬}{৯৬}$ অংশ তোলা।

✪ গাঢ় নাজাছাতে গালীযার হুকুম ঃ

এ জাতীয় নাজাছাত যেমন– মানুষের মল ইত্যাদি থেকে যদি এক দেরহাম তথা ৩৬ রত্তি বা $\frac{৩৬}{৯৬}$অংশ তোলা ওজনের সম পরিমাণ কারো শরীর কিংবা পোশাকে লাগে, তাহলে একে পাক-পরিষ্কার করে নেয়া ওয়াজিব। আর উহা সহ নামায আদায় করা মাক্রূহে তাহ্রীমী। ঐ আদায়কৃত নামাযকে দ্বিতীয়বার দোহ্রায়ে আদায় করা ওয়াজিব।

✪ আর যদি ঐ গাঢ় নাজাছাতে গালীযা উল্লেখিত ঐ এক দেরহাম ওজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে শরীর বা পরিধেয় কাপড়ে লাগে তখন উক্ত নাপাকীকে পাক-পরিষ্কার করে নেওয়া ফরয।

ঐ পরিমাণের নাজাছাতে গালীযা সহ নামায আদায় করা হারাম এবং এ পরিমাণ নাপাকী সহ আদায়কৃত নামায পুণর্বার দোহ্রায়ে আদায় করাও ফরয। কিন্তু যদি এক দের্হামের চেয়ে কম ওজনের নাজাছাত শরীর বা পোশাকে লাগে তাহলে উহা পাক-পরিষ্কার করে নামায আদায় করা সুন্নাত।[১] অর্থাৎ যদি নামাযের সময় বেশি থাকে এবং জামায়াতের সাথে নামায না পাওয়ার আশংকা না থাকে কিংবা দ্বিতীয় জামাতে নামায আদায় করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে উল্লেখিত পরিমাণ নাপাকীকে কাপড় কিংবা শরীর থেকে পাক-পরিষ্কার করেই নামায আদায় করা উচিত।

কিন্তু যদি নামাযের ওয়াক্তের শেষ মুহূর্ত হয় কিংবা উক্ত নাজাছাত পরিষ্কার করতে গেলে মোটেই জামায়াতে নামায না পাওয়ার আশংকা থাকে, সে অবস্থায় ঐ পরিমাণ নাপাকীসহ জমাতের সাথে নামায আদায় করে নেওয়া মাকরূহে তানজীহী সহকারে জায়েয, তবুও যথাসম্ভব সহসা পরিষ্কার করতঃ পবিত্র হয়েই নামায আদায় করা উত্তম। (বাহ্রুর রায়েক)

✪ তরল নাজাছাতে গালীযার হুকুম ঃ

যদি নাজাছাতে গালীযা পানি জাতীয় তরল বস্তু হয় তাহলে এক দেরহাম (মুদ্রা) পরিমাণ বলতে দেরহামের ওজন পরিমাণকে না বুঝিয়ে দেরহামের গোলাকৃতি পরিমাপের স্থানকেই বুঝাবে।

হাযরাত ফোকাহায়ে কেরামগণের বর্ণনা অনুযায়ী অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পানি জাতীয় কোন তরল বস্তু হাতের তালুতে রাখলে তালুর মাঝখানের স্থানে যতটুকু ঐ তরল বস্তু প্রসারিত অবস্থায় টিকে থাকে, সেস্থান আর একটি দেরহাম তথা রৌপ্য মুদ্রার গোলাকৃতি পরিমাণ স্থান প্রায় সমান সমানই বটে। তাই ফোকাহায়ে কেরাম (র) দেরহামের এ গোলাকৃতির ভিতরের স্থান পরিমাণকে হাতের তালুর মাঝখানের স্থানের পরিমাপ দিয়েই বুঝাতে চেয়েছেন।

✪ উক্ত আলোচনার আলোকে তরল নাজাছাতে গালীযার হুকুম হল–কারো শরীর কিংবা পোশাকে এক দেরহাম তথা হাতের তালুর মাঝখানের পরিমাপের সম পরিমাণ জায়গায় যদি এ নাপাকী লাগে তাহলে তাকে পাক-পবিত্র করে নেয়া ওয়াজিব, আর ঐ নাপাকীসহ নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। উক্ত নাপাকী সহকারে আদায়কৃত নামায দ্বিতীয়বার দোহরায়ে পড়া ওয়াজিব।

টীকা ঃ (১) (وَعَفَا) اَلشَّارِعُ (عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ) وَاِنْ كُرِهَ تَحْرِيْمًا فَيَجِبُ غَسْلُهُ وَمَا دُوْنَهُ تَنْزِيْهًا فَيُسَنُّ وَفَوْقَهُ مُبْطِلٌ فَيُفْرَضُ (درمختار)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ এমনিভাবে যদি এক দেরহাম পরিমাপের চেয়ে বেশি জায়গায় উক্ত নাপাকী লাগে তখন তা পাক-পরিষ্কার করে নেওয়া ফরয এবং তা সহ নামায আদায় করা সম্পূর্ণই হারাম। আর ঐ নাপাকীসহ আদায়কৃত নামায পুনর্বার দোহরায়ে আদায় করাও ফরয।

✪ কিন্তু যদি এক দেরহাম তথা রৌপ্য মুদ্রার পরিমাপের চেয়ে কম জায়গায় তরল নাজাছাতে গালীযা লাগে তখন তা ধুয়ে পাক-পরিষ্কার করে নেওয়া সুন্নাত। উক্ত নাপাকীসহ নামায আদায় করা মাকরূহ। যথাসম্ভব উক্ত নাপাকী পাক পরিষ্কার করে নিয়েই নামায আদায় করা উত্তম।

নাজাছাতে খাফীফা কি কি?

হালাল প্রাণী তথা গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ঘোড়া ও হরিণ ইত্যাদির পেশাব, সকল প্রকার হারাম পাখী যেমন– বাজ, চিল ও কাক ইত্যাদির বিষ্ঠা (মল) নাজাছাতে খাফীফার অর্ন্তভুক্ত।[১]

নাজাছাতে খাফীফার হুকুম ঃ

উল্লেখ্য যে, কারো শরীর কিংবা পোশাকে উক্ত নাজাছাত লাগার বিষয়টাকে চতুর্থাংশের ভিত্তিতেই হিসাব করতে হয়, অর্থাৎ শরীর বা পোশাককে চারভাগে ভাগ করতঃ নাজাছাত কত ভাগে লেগেছে, তা দেখতে হয় এবং এ চতুর্থাংশের উপর ভিত্তি করেই পাক পরিষ্কারের হুকুম নির্ণয় করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে আরো জানা থাকা দরকার যে, উক্ত নাজাছাত শরীর কিংবা পোশাকে লাগার হিসাবের ব্যাপারে পূর্ণ শরীর কিংবা পোশাকের চারভাগের এক ভাগ ধরে হিসাব করতে হয়, না-কি শরীর ও পোশাকের পৃথক পৃথক প্রত্যেক অঙ্গ ও অংশকে চারিভাগ করতঃ হিসাব করতে হয়, তা নিয়ে সম্মানিত ফোকাহায়ে ইযামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ঃ

কারো মতে পূর্ণ শরীর ও পূর্ণ পোশাকের চারিভাগের একভাগ ধরেই নাজাছাত লাগার হিসাব করতে হয়।

অপর পক্ষে অন্য কিছু সংখ্যক ফোকাহায়ে কেরামের মতে পূর্ণ পোশাক কিংবা পূর্ণ শরীরের হিসাব না করে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ ও কাপড়ের প্রত্যেক অংশ যেমন– শরীরের হাত-পা ও জামার হাত-আঁচল ইত্যাদিকে পৃথক পৃথক ধরে প্রত্যেক অঙ্গের কত অংশে নাপাকী লেগেছে তা দেখে হিসাব করতে হয়।

টীকা ঃ

(২) بَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَالْفَرَسُ وَخُرْءُ طَيْرٍ لَا يُؤْكَلُ مُخَفَّفٌ هٰكَذَا فِي الْكَنْزِ ۔
(عالمگیریه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে পূর্ণ শরীর ও পূর্ণ পোশাকের চারভাগের একাংশের তুলনায় শরীর-পোশাকের পৃথক পৃথক প্রত্যেক অঙ্গের চারভাগের একভাগ হিসাবেই হুকুম নির্ণয় করাটা ফোকাহায়ে কেরাম কর্তৃক অধিক সমর্থিত।[১]

সুতরাং উক্ত নিয়মের ভিত্তিতে নাজাছাত লাগার পরিমাণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পুরা শরীরের হিসাব না করে প্রতিটি অঙ্গকেই পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ণ একক ধরেই নাপাকী লাগার হিসাব করতে হবে।

এমনিভাবে সেলাইযুক্ত জোড়া কাপড়ের অংশ যেমন– জামার হাত, আঁচল ও কল্লি ইত্যাদির এবং পায়জামা প্যান্টের দু'পায়ের দু'অংশের কোন অংশে কত নাপাকী লেগেছে তাও দেখতে হবে অর্থাৎ পুরা কাপড়কে এক না ধরে বরং প্রতিটি অংশকে পূর্ণ একটি কাপড় গণ্য করতঃ নাপাকী লাগার হিসাব করতে হয়।

তবে যে সব কাপড়-পোশাকের অংশ নাই যেমন– লুঙ্গি, শাড়ী, চাদর, পেটিকোট ও রুমাল ইত্যাদিকে পূর্ণ একখানা কাপড় ধরেই হিসাব করতে হবে। (গায়তুল আওতার)

✪ এ হিসাবে যদি উক্ত নাজাছাতে খাফীফা শরীরের কোন অঙ্গ বা পোষাকের কোন অংশের পূর্ণ এক চতুর্থতাংশ পরিমাণ জায়গায় লেগে থাকে। তাহলে উহা পাক-পবিত্র করে নেওয়া ওয়াজিব। উক্ত নাপাকী সহ নামায আদায় করা মাক্রূহে তাহরীমা, ময়লা পাক-পরিষ্কার করতঃ নামাযকে দ্বিতীয় বার দোহ্রায়ে আদায় করা ওয়াজিব।

✪ এমনিভাবে শরীরের কোন অঙ্গ বা পোষাকের কোন অংশের এক চতুর্থাংশের বেশি জায়গায় যদি উক্ত নাজাছাত লাগে তখন তাকে পাক-পরিষ্কার করে নেওয়া ফরয। উক্ত নাপাকীসহ নামায আদায় করা সম্পূর্ণই হারাম। যদি উক্ত নাপাকী সহ নামায আদায় করা হয়, তখন উহাকে পাক-পরিষ্কার করে নিয়ে পুনর্বার ঐ নামায আদায় করে নেওয়া ফরয।

টীকা ঃ

(১) ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ كَيْفِيَّةِ اِعْتِبَارِ الرُّبُعِ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَقْوَالٍ فَقِيْلَ رُبُعُ طَرَفٍ اَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ كَالذَّيْلِ وَالْكُمِّ وَالدِّخْرِيْصِ اِنْ كَانَ الْمُصَابُ ثَوْبًا وَرُبُعُ الْعُضْوِ الْمُصَابِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ اِنْ كَانَ بَدَنًا وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ التُّحْفَةِ وَالْمُحِيْطِ وَالْبَدَائِعِ وَالْمُجْتَبٰى وَسِرَاجُ الْوَهَّاجِ وَفِي الْحَقَائِقِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ۔
(২) وَقِيْلَ رُبُعُ جَمِيْعِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَبْسُوْطِ ۔
(৩) وَقِيْلَ رُبُعُ اَدْنٰى ثَوْبٍ تَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلٰوةُ كَالْمِئْزَرِ ۔ فَقَدِ اخْتَلَفَ التَّصْحِيْحُ كَمَا تَرٰى لٰكِنْ تَرَجَّحَ الْاَوَّلُ بِاَنَّ الْفَتْوٰى عَلَيْهِ ۔ (بحر الرائق ۔ شامی، عالمگیریه)

আর যদি ১/৪ এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম জায়গায় উক্ত নাজাছাত লাগে, তাহলে উহাকে পাক-পরিষ্কার করে নেওয়া সুন্নাত এবং উক্ত নাপাকী সহ নামায আদায় করা মাকরূহে তানজীহী। (শামী, আলমগীর)

উপরে নাজাছাতে হাকীকী তথা নাজাছাতে গালীযা ও খাফীফার যে হুকুম বর্ণনা করা হল তা ছিল শরীর কিংবা পোশাক-বিছানা ইত্যাদিতে নাজাছাত লাগার প্রসঙ্গ।

কিন্তু ঐসব নাজাছাত-নাপাক বস্তু যদি কোন তরল খাদ্য বা ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে পতিত হয় যেমন– পানি, দুধ, তৈল ও অন্যান্য পানি জাতীয় দ্রব্যাদি, তখন উক্ত দ্রব্যাদির সবটাই নাপাক হয়ে যাবে। যদিও বা উক্ত নাপাকীসমূহের এক ফোটাও পড়ে থাকে।

নাজাছাতে হাকীকী তথা নাজাছাতে গালীযা ও খাফীফা পাক-পবিত্র করার নিয়ম

ইসলামী শরীয়তে উক্ত নাপাকীকে শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু থেকে পাক-পরিষ্কার করে নেওয়ার বিভিন্ন সূত্র ও পদ্ধতি রয়েছে যেমন– (১) কাপড়-চোপড় ও শরীরকে পানি বা পানি জাতীয় কোন কিছুর মাধ্যমে ধুয়ে নিলে, (২) কাঁচ, স্টীল, এলুমিনিয়াম এবং চিনামাটি ইত্যাদির বাসন-পাত্র ভালভাবে মুছে নিলে, (৩) জমি ও মাটি ইত্যাদি শুকিয়ে গেলে, (৪) কাঠ ইত্যাদিকে চিড়িয়ে নিলে, (৫) হাকীকত তথা কোন কিছুর প্রকৃতি ও মৌলিকত্বকে পরিবর্তন করে নিলে— যেমন লবণের স্তূপে গাধা ও শূকর ইত্যাদির মত নাপাক প্রাণী পড়ে গিয়ে লবণে পরিণত হয়ে গেলে, তেমনি ভাবে মদ-শরাব ইত্যাদির মধ্যে লবণ ঢেলে দিয়ে সিরকা বানিয়ে নিলে, (৬) পশুর চামড়াকে দাবাগত করে নিলে, (৭) শুকনা বীর্যকে কাপড়-শরীর থেকে ঘষে উঠিয়ে নিলে, (৮) নাপাক তুলা ইত্যাদিকে ধুনীয়ে নিলে পাক পবিত্র হয়ে যায়।

✪ শরীরে হউক কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদে হউক উক্ত নাজাছাত বা নাপাকী লাগার স্থানকে পাক-পরিষ্কার পানি অথবা পানি জাতীয় কোন কিছু যেমন- গোলাপজল, বিভিন্ন ফল নিংড়ানো রস ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করে নিলে পাক হয়ে যায়।[১]

টীকা :

(۱) (وتطهير النجاسة) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية (عن الثوب والبدن بالماء) المطلق إتفاقا وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به وكذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح (بكل مائع) طاهر على الأصح (مزيل) لوجود إزالتها به (مراقى الفلاح)

✪ জুতা ইত্যাদি থেকে উক্ত নাজাছাত ঘষে নিলে যদি এর চিহ্ন তথা নাপাকীর রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ চলে যায় তখন উহা পাক-পবিত্র হয়ে যায়। (দুররে মোখতার)

✪ এমনিভাবে কাঁচের বাসন-পাত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্র, স্টীল, লোহা, তামা-পিতল, স্বর্ণ, রূপা, চিনামাটি ইত্যাদির নক্সাবিহীন বাসন-পাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী, মেলামাইন এর বাসন-পাত্র, ছোরা, তরবারী, হাত-পায়ের নখ এবং মাংস বিহীন হাত ইত্যাদিতে উক্ত নাজাছত-নাপাকী লাগলে মাটি-কাপড়খণ্ড, তুলা ও পশম ইত্যাদি দ্বারা উক্ত দ্রব্য সামগ্রী থেকে নাপাকী মুছে নেওয়ার পর নাপাকীর কোন চিহ্ন বাকী না থাকলে তা পুরাপুরি পাক-পবিত্র হয়ে যায়। (গায়তুল আওতার)

কিন্তু উল্লেখিত পাত্র সমূহ নক্শীদার হলে তখন পানি দ্বারা ধুয়েই পাক করে নিতে হয়।

✪ উক্ত নাপাকী পতিত জমি ও মাটি রোদ্রে কিংবা অন্য কোন উপায়ে শুকিয়ে গিয়ে নাপাকির চিহ্ন চলে গেলেও উহা পাক হয়ে যায়।

যেসব বস্তুকে নিংড়ানো যায়না যেমন– তুলা, মোটা গদি, ম্যাট্রেস, বালিশ ও লেপ-তোশক ইত্যাদিতে নাপাকী লাগাতে ঐ সবের উপরে তিনবার পানি ঢেলে ঘষে ধুয়ে নিলে পাক হয়ে যায়। (আলমগীরী)

✪ কোন কিছুর সাথে যদি এরূপ দুর্গন্ধময় কোন নাপাকী লাগে, ধৌত করার পরও যার দুর্গন্ধ যায় না। যেমন– নাপাক তৈল ও মৃত পশুর চর্বী ইত্যাদি সে অবস্থায় উক্ত নাজাছাতকে তিনবার ধৌতকরার পর এর দুর্গন্ধ বিদ্যমান থাকলেও এতে কোন অসুবিধা নাই বরং উক্ত বস্তু পাক পবিত্র হয়ে গিয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে।

✪ পরণের পোশাকে নাপাকী লাগার পর নাপাকী লাগার স্থান যদি নির্দিষ্ট করা না যায় তাহলে গ্রহনযোগ্য মতানুসারে বিনাচিন্তায় উক্ত কাপড়ের যে কোন পার্শ্ব ধুয়ে নিলে উক্ত কাপড়কে সম্পূর্ণ পাকরূপেই ধরে নেওয়া হবে। (দুররে মোখ্তার)

তবে "বদায়েউচ্ছনায়ে" নামক প্রশিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ফেকাহ্গ্রন্থে এ অবস্থায় পূর্ণ কাপড়কে ধুয়ে নেওয়া ওয়াজিব বলা হয়েছে। আর কোন কোন ফকীহ সাহেবের মতে একটু চিন্তা করে অনুমান করতঃ নাপাকী লাগার স্থান নির্ধারণপূর্বক তা ধুয়ে নেওয়া জরুরী। (তাহতাবী)

✪ যে সমস্ত নাজাছত-নাপাকী শরীর কাপড় কিংবা অন্য কিছুতে লাগার পর দেখা যায়, যেমন রক্ত ও মানুষের মল ইত্যাদি। উহা যতবার পরিষ্কার করে নিলে মূল নাজাছাত শরীর ও কাপড় ইত্যাদি থেকে দূরীভূত হয়ে পড়ে তাকে ততবারই পরিষ্কার করা লাগবে। যদি একবার ভালভাবে পরিষ্কার করে নেওয়ার দ্বারাই মূল নাজাছাত চলে যায় তাহলে এ একবারের পরিষ্কারের দ্বারাই পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। তবে প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ হযরত ইমাম ফখরুল ইসলাম বাজ্দুভী (রা) এ ধরনের নাজাছতকেও তিনবার ধৌত কিংবা পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য বলেছেন।

(মারাকিউল ফালাহ, দুররে মোখতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ আর যে সমস্ত নাজাছত-নাপাকী কোন কিছুতে লাগলে সাধারণতঃ দেখা যায় না, ওয়াছ্ওয়াছা-সন্দেহমুক্ত মন-অন্তর বিশিষ্ট বিবেকবান লোকদের বেলায় উক্ত নাজাছাত যতবার ধুয়ে নিলে পাক-পরিষ্কার হয়ে পড়েছে বলে তার মন-অন্তর স্বাক্ষ্য দিবে, সেলোক ততবারই তা ধুয়ে নিলে পাক-পবিত্র হয়ে পড়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। একবার ধুয়ে নেওয়ার পরেই যদি তার মন পাক-পবিত্র হয়ে পড়েছে বলে স্বাক্ষ্য দেয়, তাহলে ঐ একবারের ধোয়াতেই পাক হয়ে যাবে।

কিন্তু ওয়াছ্ওয়াছা-সন্দীহান ওয়ালা লোকদের জন্য উক্ত নাজাছাত কমপক্ষে তিনবার ধৌত করা ওয়াজিব ও সাতবার ধৌত করা মুস্তাহাব।

(বাহরুর রায়েক, মারাকিউল ফলাহ)

নাজাছাতে হুক্মী তথা হাদ্ছ ঃ

যে নাজাছাত-নাপাকী সাধারণতঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় না; বরং শরীয়তের মাধ্যমেই এর নাপাক-অপবিত্র হওয়ার বিষয়টা আমরা জানতে পারি এবং শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী অযু কিংবা গোছল করেই উক্ত নাপাকী থেকে পাক হওয়া যায়। উক্ত নাপাকীকেই বলা হয় নাজাছাতে হুকমীয়া। যেমন ধরুন, কোন লোকের পায়খানা পেশাব হল,[১] আর ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, মানুষের মল-মূত্র নাজাছাতে হাকীকির অর্ন্তভুক্ত। সুতরাং শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী শরীরের মল-মূত্র বাহির হওয়ার স্থান ও এর আশ-পাশের যেখানে যেখানে মল-মূত্র লেগেছে—ঐ জায়গা সমূহ ঢিলা-কুলুখ ও পানি দ্বারা ধুয়ে পাক-পরিষ্কার করে নেওয়ার পর মূলতঃ শরীরে আর কোন নাজাছাত-ময়লা রইল না, কিন্তু এর পরেও সে অবস্থায় নামায ইত্যাদি পড়া যায় না, যতক্ষণ না অযু করে নেওয়া হয়।

শরীরে দেখা যায় এমন ধরনের কোন নাপাকী না থাকা সত্ত্বেও আবার কেন অযু করে পাক-পবিত্র হতে হয়? এর যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলেও সাধারণতঃ আমরা তা বুঝি না। বরং "শরীয়ত প্রবক্তা" শরীয়তের মাধ্যমে এ অবস্থাটাকে "হাদ্ছে আছগর" (ছোট নাপাকী) ঘোষণা দিয়ে এ অবস্থা থেকে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য অযু–তায়াম্মুমের বিধান প্রদান করেছেন।

এভাবে দেখুন স্ত্রীসহবাস, স্বপ্নদোষ কিংবা অন্য কোন উপায়ে বীর্যপাত ঘটল, বীর্য যেহেতু "নাজাছাতে গালীযা" তাই বীর্য বের হওয়ার স্থান ও বীর্য যেখানে যেখানে

টীকা ঃ (١) وَهُوَ وَصْفٌ شَرْعِيٌّ يَحِلُّ فِيْ الْاَعْضَاءِ يُزِيْلُ الطَّهَارَةَ (درمختار)

نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ بِمَعْنٰى اَنَّ الشَّارِعَ حكم بِكَوْنِ الْحَدَث نَجَاسَةً تَمْنَعُ مِنَ الصَّلوٰةِ كَمَا تَمْنَعُ مِنْهَا النَّجَاسَةُ الْمُحَسَّسَةُ (مذاهب الاربعة)

نجاست حکمی وہ ہے جو شرع کے حکم سے اسکی نجاست ثابت ہوئی ظاہر میں کوئی نجاست بدن پرمحسوس نہیں (غاية الاوطار)

লেগেছে সেসব জায়গা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার দ্বারা নাজাছাতে হাকীকী থেকে পাক-পবিত্র হয়ে গেল। কিন্তু তবুও সে অবস্থায় নামায ইত্যাদি পড়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত গোছল করা না হয়।

শরীরে কোনরূপ দৃশ্যমান নাপাকী না থাকা সত্ত্বেও পুনরায় কেন গোছল করে পবিত্র হতে হয়? এর হেতু-রহস্য আমরা সাধারণতঃ বুঝি না বরং শরীয়াতই এ অবস্থাকে "হাদছে আকবর" (বড় নাপাকী) ঘোষণা দিয়ে এ নাপাকী থেকে পাক পবিত্র হওয়ার নিমিত্তে গোছল করার বিধান প্রদান করেছে।

সুতরাং এ আলোচনার আলোকে আমরা অবগত হলাম যে, মল-মূত্র বের হওয়াতে উহা ধুয়ে-মুছে পাক-পরিষ্কার করে নেওয়ার পর পুনঃ ওজু করার এ পূর্ববর্তী অবস্থা, এভাবে বীর্যপাত হওয়াতে উহা ধুয়ে-মুছে পাক-পরিষ্কার করে নেওয়ার পর পুনঃ গোছল করার পূর্ববর্তী অবস্থা; এ অবস্থাদ্বয়কে শরীয়ত "নাজাছাতে হুক্মী" রূপে আখ্যায়িত করেছে।

ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, শরীয়াতে নাজাছাতে হুকমীয়ার অপর নাম হাদ্ছ।

ইহা পুনঃ দু'প্রকার ঃ ১. হাদছে আকবর (বড় নাপাকী)

২. হাদছে আছগর (ছোট নাপাকী)[১]

✪ **হাদছে আকবর ঃ** যেমন স্ত্রীসহবাস, ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা অন্য কোনভাবে বীর্যপাত হওয়া, স্ত্রীলোকদের হায়েজ-নেফাছের রক্ত বের হওয়া ইত্যাদি নাপাকীকে হাদছে আকবর বলা হয়।

✪ **হাদছে আকবর এর হুকুম ঃ** হাদছে আকবর অবস্থায় অযু করার পরেও নামায পড়া যায় না, কোরআন করিম স্পর্শ করা ও তেলাওয়াত করা যায় না, কোরআন শরীফের কোন আয়াত-সূরা তেলাওয়াতের নিয়তে মুখস্থও পড়া যায় না, মছজিদে প্রবেশ করা যায় না, কা'বা শরীফে তাওয়াফ করা যায় না, বরং "তাহারাতে কোবরা" তথা গোছল করেই এরূপ নাপাকী হতে পাক হতে হয়।

হাদছে আছগর ঃ যেমন পেশাব-পায়খানা করা, পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হওয়া, শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত বের হয়ে উক্ত স্থান অতিক্রম করে গড়িয়ে বা টপকে পড়া, নামাযরত অবস্থায় দাঁত দেখিয়ে খিল খিল করে হাসা ইত্যাদি নাপাকীকে হাদছে আছগর বলা হয়।

হাদছে আছগর এর হুকুম ঃ এধরনের নাপাকী অবস্থায় নামায আদায় করা যায় না, কোরআন করীম হাত দ্বারা স্পর্শ করতঃ তেলাওয়াত করা যায় না ও তাওয়াফ করা যায় না। এ জাতীয় নাপাকী অবস্থা থেকে "তাহারাতে ছুগ্রা" অর্থাৎ "শরয়ী অযু" করেই পাক-পবিত্র হতে হয়।

টীকা ঃ اِنَّ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ هِيَ الْحَدَثُ الْاَصْغَرُ وَالْاَكْبَرُ (مذاهب الاربعه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোছল ও অযুর আলোচনা

শ্রদ্ধেয় পাঠক !

নাজাছাতে হুকমী তথা "হাদাছ" (নাপাকী) থেকে পাক-পবিত্র হওয়ার বিষয়টাকে শরীয়তের পরিভাষায় "তাহারত" বলা হয়।

হাদছ (অপবিত্রতা)-এর ন্যায় তাহারত (পবিত্রতা অর্জন)-কেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (১) তাহারাতে কুবরা (বড় পাকী)

(২) তাহারাতে ছুগ্‌রা (ছোট পাকী)

তাহারাতে কুবরার অপর নাম "গোছল" এবং তাহারাতে ছুগ্‌রার অপর নাম হচ্ছে "অযু"।

অর্থাৎ "হাদছে আকবর" (বড় নাপাকী) থেকে "তাহারতে কোবরা" তথা গোছল করার মাধ্যমেই পাক-পবিত্র হতে হয় এবং "হাদাছে আছগর" (ছোট নাপাকী) থেকে "তাহারতে ছুগরা" তথা অযু করার মাধ্যমেই পাক-পবিত্র হতে হয়।

সুতরাং তাহারাতে কুব্‌রা তথা গোছল এবং তাহারতে ছুগ্‌রা তথা অযুর মাছ্‌আলা ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে ঃ

গোছল ঃ

গোছল আরবী শব্দ এর غ (গাইন) বর্ণকে পেশ দিয়ে "গুছল" উচ্চারণ করলে তখন এর অর্থ হয়, সমস্ত শরীর ধৌত করা এবং এর গাইন বর্ণকে জবর দিয়ে "গছল" উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় "পানি প্রবাহিত করে যে কোন কিছুর ময়লা দূরীভূত করা। (গায়তুল আওতার)

আর যে পানি দ্বারা ধৌয়ার কাজ করা হয় কারো কারো মতে একে ও "গুছল" (গায়াতুল আওতার) আবার কারো কারো মতে "গছল" বলা হয়।[১]

শরীয়তের পরিভাষায় কুলীকরা ও নাকে পানি দেওয়া সহ সমস্ত শরীর পাক পানি দ্বারা ধৌত করাকে "গোছল" বলা হয়।

টীকা ঃ

غَسْلٌ - بِفَتْحِ الْغَيْنِ كَانَ مَعْنَاهُ الْمَاءُ الَّذِىْ يَغْتَسِلُ بِهٖ (مذاهب الاربعه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ **গোছল চার প্রকার ঃ**

(১) ফরয গোছল (২) ওয়াজিব গোছল (৩) সুন্নাত গোছল ও (৪) মুস্তাহাব গোছল। (আলমগীরী)

✪ **চারটি কারণ পাওয়া গেলে গোছল ফরয হয়।**

(১) স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর (২) স্বপ্নে বীর্যপাত হলে (৩) যে কোন উপায়ে কামোত্তেজনা ও পুলকের সাথে নারী-পুরুষের বীর্যপাত ঘটলে এবং (৪) স্ত্রী লোকদের হায়য কিংবা নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে গোছল ফরয হয়।

(আলমগীরী, তানবীরুল আবছার)

✪ **গোছলের ফরয কাজ ঃ**

গোছলের নিয়মাবলীর মধ্যে ফরয কাজ মোট তিনটি।

(১) গরগরার সাথে কুলি করা,

(২) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা,

(৩) সমস্ত শরীর উত্তমরূপে একবার ধৌত করা।

✪ **গোছলের ফরয কাজ প্রসঙ্গে কিছু জরুরী আলোচনা ঃ**

ক. ফরয গোছলের বেলায় মেয়ে লোকদের লজ্জাস্থানের ফাঁক ধৌত করাও ফরয।

খ. সমস্ত শরীরের একটি পশম পরিমাণ জায়গাও যদি শুকনা থেকে যায় তাতেও গোছল শুদ্ধ হবে না।

গ. রোযা অবস্থায় কুলি করার সময় গরগরা করা নিষেধ। কারণ গলার মধ্যে পানি প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই শুধু কুলি করে নিতে হয়।

ঘ. রোযা অবস্থায় নাকের মধ্যে ছিটিয়ে পানি দিতে নাই, কারণ নাকের শক্ত হাড্ডির উর্দ্ধে পানি প্রবেশ করে বসলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তাই রোজা অবস্থায় ভিজা আঙ্গুলী দ্বারা নাকের ছিদ্রপথ মছেহ করেই নাক ধৌত করার ফরয আদায় করে নিতে হয়।

✪ **নিম্নে বর্ণিত কারণসমূহ পাওয়া গেলে গোছল ওয়াজিব হয় ঃ**

(১) সমস্ত শরীরে নাপাকী লাগলে কিংবা শরীরের কোন অংশে নাপাকী লেগেছে তাজানা না থাকলে। (২) কোন কাফের লোক স্ত্রী সহবাস জনিত নাপাকী অবস্থায় মুছলমান হলে। (৩) মুছলমান মৃত নারী-পুরুষকে গোছল দেওয়া, (৪) (পনর বছরের পূর্বে) কোন বালক-বালিকার বালেগ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেলে গোছল করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। (আলমগীরী, দোররে মোখতার)

✪ **নিম্ন বর্ণিত কারণে গোছল করা সুন্নাত ঃ**

(১) জুম্‌আবারে জুম্‌আর নামায আদায়ের জন্য, (২) দু'ঈদের দিবসে ঈদের

নামায আদায়ের জন্য গোছল করা, (৩) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার জন্য এবং (৪) হজ্জ ও ওমরার এহরাম বাঁধার জন্য গোছল করা সুন্নাত। (শামী, আলমগীরী)

✪ নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গোছল করা মুস্তাহাব ঃ

(১) শবে বরাত ও শবে কদরের রাতে গোছল করা, (২) মুসলমান মুরদারকে গোছলদানের পর গোছলদান কারীর নিজে গোছল করে নেওয়া মুস্তাহাব, (৩) কাবা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য গোছল করা, (৪) মিনায় শয়তানকে কংকর মারার জন্য, (৫) মদীনা শরীফ এলাকায় প্রবেশ করার জন্য, (৬) শাহিন শাহে দো'আলম নূরে মুজাচ্ছাম নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক যেয়ারতের জন্য, (৭) গুনাহ হতে তাওবা করার জন্য, (৮) কোন কাফের মুসলমান হতে চাইলে প্রথমে তার গোছল করে নেওয়া মুস্তাহাব। (শামী)

✪ গোছলের সুন্নাত কাজসমূহ ঃ

১। নিয়্যত করা।

আরবী নিয়্যত ঃ نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى

উচ্চারণ ঃ নাওয়াতুল গুছ্‌লা লিরাফ্‌য়িল জানাবাতি ওয়া তাকার্‌রুবান্‌ ইলাল্লাহি তাআলা।

২। উভয় হাতের কব্‌জী পর্যন্ত ধোয়ার সময় "বিসমিল্লাহ" বলা।

৩। পুরুষাঙ্গ ধৌত করা।

৪। স্ত্রীলোকদের লজ্জাস্থানের মুখের ফাঁক ধুয়ে নেওয়া।

৫। শরীরের অন্য কোন অংশে নাপাকী লেগে থাকলে তা ধুয়ে নেওয়া।

৬। পা-ধোয়া বাদ রেখে নামাযের অযুর ন্যায় অযু করা।

৭। মাথায় তিনবার পানি ঢালা।

৮। ডান কাঁধের উপর তিনবার ও বাম কাঁধের উপর তিনবার পানি ঢালা।

৯। সমস্ত শরীরে তিন বার পানি ঢালা।

১০। অতঃপর গোছলের জায়গা হতে খানিকটা সরে উভয় পা ধৌত করা।

১১। সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের ছতর ঢাকা অবস্থায় গোছল করা।

১২। দাঁতের ফাঁকে সুপারি বা অন্য কোন খাদ্যকণা আটকানো থাকলে তা বের করে নিয়েই কুলি করতে হয়। কেননা, দাঁতের গোড়ায় পানি না পৌঁছলে ফরয গোছল আদায় হয় না।

১৩। হাত-পায়ের নখের ভিতর, পায়ের তলায় কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে ধুনা, চুনা, আটা-বা অন্য কোন শক্ত আঠাজাতীয় কিছু যদি আটকিয়ে জমে থাকে, তা ঘষে-মেজে তুলে নিয়েই ফরয গোছলের পানি পৌঁছাতে হবে। নতুবা গোছল আদায় হবে না।

এমনিভাবে নারী-পুরুষের যে কারো হাত-পায়ের নখের উপর যদি নখ পালিশ লাগানো থাকে বা মুখ ইত্যাদিতে শক্ত ও মোটাভাবে মেকাপ করা থাকলে তা ঘষে তুলে নিয়ে পানি পৌঁছাতে হবে। নতুবা ফরয গোছল ও অযু মোটেই শুদ্ধ হবে না।

১৪। মেয়েলোকদের কোন অঙ্গে অলংকার আটকানো থাকলে তা নেড়ে-চেড়ে অলংকারের নীচের চামড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। পুরুষদের ঘড়ি ও আঙটি নেড়ে চেড়ে এর নীচের চামড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে।

১৫। নাভী ও কানের প্যাচের মধ্যে পানি পৌঁছাতে হবে নতুবা গোছল আদায় হবে না।

✪ গোছলের মুস্তাহাব কাজসমূহ ঃ

১। সমস্ত শরীর উত্তমরূপে ঘষে মেজে গোছল করা।

২। সর্বসাধারণের অগোচরে নির্জন স্থানে গোছল করা।

৩। গোছল করার সময় বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা না বলা।

৪। গোছল শেষ হলে সমস্ত শরীর গামছা-তোয়ালে কিংবা অন্য কোন পরিষ্কার পাক কাপড় দ্বারা মুছে নেওয়া।

৫। উচ্চস্থানে বসে গোছল করা।

ফরয গোছলের নিয়ম ঃ

যে কাপড় পরিধান করে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়েছে অথবা যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়েছে এবং তাতে বীর্য ইত্যাদি লেগেছে তা খুলে নিয়ে অন্য কাপড় পরে গোছল করাই উত্তম। তাতে কাপড়ের ময়লা শরীরে পুনঃ পুনঃ লাগার সম্ভাবনা থাকে না। যদি পরিহিত কাপড়ে ময়লা-বীর্য ইত্যাদি না লেগে থাকে তা হলে উক্ত কাপড় খোলার প্রয়োজন নেই। তদুপরি অতিরিক্ত অন্য কাপড় না থাকলে গোছলের পূর্বে পরিহিত কাপড়ে লাগা নাপাকী খুঁজে উত্তমরূপে ধুয়ে নিতে হয়।

অতঃপর গোছলের নিয়্যত করতঃ বিসমিল্লাহ বলে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে নিতে হয়। এরপর লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতে হয়। শরীরের অন্য কোন স্থানে নাপাকী লাগলে তাও ধুয়ে নিতে হয়। অতঃপর অযু করতে হয়। অযুতে কুলি করার সময় রোযাদার না হলে উত্তমরূপে গরগরা সহকারে তিনবার কুলি করে নিতে হয়। রোযাদার শুধু কুলি করবে, কিন্তু গরগরা করবে না। রোযাদার না হলে পূর্বে উল্লিখিত নিয়মে পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করে নিতে হয় অযুতে ঘাড় মছহে করতঃ পা ধোয়া বাদ রেখে যথাক্রমে মাথায় তিনবার, ডান কাঁধে তিন বার, বাম কাঁধে তিনবার এবং সমস্ত শরীরে একবার এরূপভাবে পানি ঢালতে হয় যাতে সারা শরীর পানিতে ভিজে পানি শরীর দিয়ে গড়িয়ে যায়। অতঃপর শরীর উত্তমরূপে সম্ভব হলে সাবান ইত্যাদি লাগিয়ে ঘষে মেঝে পরিষ্কার করতঃ পুরা শরীরে পর পর আরো দু'বার পানি ঢেলে দিতে হয়।

এভাবে গোছল শেষে গোছলের স্থান থেকে কিছুটা সরে গিয়ে তিন বার পা ধুয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিতে হয়। অতঃপর কালেমায়ে তামজিদ পড়াটা উত্তম এবং শুকনা পাক-পরিষ্কার কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর মুছে নিতে হয়।

কিছু জরুরী মাছআলা ঃ

✪ গোছল সমাধা করে আসার পর দেখা গেল যে সামান্য জায়গা শুকনা রয়ে গেছে তখন শুধু ঐ শুকনা স্থানটুকু ধুয়ে নিলে গোছল পূর্ণ হয়ে যাবে। পুনঃ গোছল করা লাগবে না। (গায়াতোল আওতার, তাহতাবী)

✪ এমনিভাবে গোছল সেরে আসার সময় মনে পড়লো যে ভুল বশতঃ কুলি করা হয় নি কিংবা নাকে পানি দেয়া হয়নি তখন শুধু কুলি বা নাকে পানি দিয়ে দিলেই গোছলের কাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। পুনঃ গোছল করা লাগবে না।

(তাহ্তাবী, গায়াতোল আওতার)

✪ এরূপভাবে গোছলের পর দেখা গেল ধুনা, চুনা, আটা ও আঠাল জাতীয় কোন কিছু হাতে-পায়ে-নখে কিংবা অন্যকোন স্থানে লেগে রয়েছে যাতে গোছলের সময় পানি পৌঁছেনি তখন ঐ স্থানের আটকানো জিনিষগুলো খোঁচায়ে উঠিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করতঃ শুধু ঐ স্থান পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে হয়ে যাবে। পুনরায় গোছল করা লাগবে না। (গায়াতুল আওতার)

✪ পুকুর কিংবা খাল-বিল ও নদীতে ডুব দিয়ে বা বৃষ্টির পানিতে ভিজে আসলে তৎসঙ্গে যদি কুলি করে নেওয়া হয় ও নাকে পানি দিয়ে দেয়া হয় তা হলে তাতে ফরয গোছল আদায় হয়ে যাবে। তবে তাতে শর্ত হচ্ছে শরীরের সমস্ত অঙ্গে পানি পৌঁছতে হবে, অন্যথায় নয়। (জাওহারাতুন নাইয়ারা)

✪ শরীরের কোন স্থানে ক্ষত, ব্যান্ডেজ-পাট্টি ইত্যাদি থাকার কারণে ঐ স্থানে পানি পৌঁছানো সম্ভব না হলে এটুকু স্থান বাদ দিয়ে শরীরের বাকী সমস্ত অংশে পানি পৌঁছিয়ে গোছল করে নিতে হবে আর ঐ স্থান মছেহ করে নিতে হবে। (আলমগীরী)

✪ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর না ঘুমিয়ে, প্রস্রাব না করে, কিংবা অন্ততঃ চল্লিশ কদম হাটাহাটি না করেই গোছল করতঃ নামায পড়ে নিল, অতঃপর দেখা গেল কিছু বীর্য নির্গত হয়েছে তাহলে ইমাম আযম (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে পুনঃ গোছল করে নেওয়া ওয়াজিব, তবে আদায়কৃত নামায পুনঃ পড়া লাগবে না। (আলমগীরী)

আর যদি সঙ্গম শেষে প্রস্রাব করার, ঘুমাবার অথবা অন্ততঃ চল্লিশ কদম হাটাহাটি করার পরই গোছল করতঃ নামায শেষান্তে দেখা গেল যে বীর্য নির্গত হয়েছে, তাহলে তখন গোছলও পুনঃ করা লাগবে না।

অবশ্য যদি পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় বীর্য নির্গত হতে দেখা যায় তাহলে পুনরায় গোছল করা লাগবে।

✪ অনুরূপ ভাবে স্ত্রীর গোছল সমাধা করার পর তার গুপ্তস্থান হতে বীর্য বের হতে দেখলে, তখন যদি তার বিশ্বাস হয় যে, ইহা তার নিজেরই বীর্য, তাহলে পুনরায় গোছল করা লাগবে। আর যদি স্বামীর বীর্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তখন আর গোছল করা লাগবে না শুধু অযু করে নিলেই চলবে।

৩. মিছ্ওয়াকের মাছায়েল

মিছ্ওয়াক বলতে সাধারণ অর্থে যে কাঠ দ্বারা দাঁত মাজা হয় ঐ কাষ্ঠ খণ্ডকেই বুঝায়।

মিছওয়াক করা বলতে আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়মে দাঁত পরিষ্কার করতেন সেটাকেই বুঝায়।

মিছওয়াক করা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যধিক পছন্দনীয় একটি আমল (কর্ম)। তিনি সর্বদা মিছওয়াক করতেন। কখনো তিনি মিছওয়াক করা ছাড়েন নি। এমনকি জীবনের শেষ মুহূর্তে মিছওয়াক করার প্রবল আগ্রহ দেখে হযরত মা আয়েশা সিদ্দিকা (রা) নিজ দাঁত দ্বারা মিছওয়াককে চিবিয়ে নরম করে দিলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা জীবনের অন্তিম শয্যায়ও মিছওয়াক করতঃ শেষ বিদায় গ্রহণ করেন।

তাই এ মিছওয়াক প্রসঙ্গে আল্লাহর হাবীব রাহমাতুললিল আলামীন (স) এরশাদ করেছেন— আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে, এ বিষয়টি যদি আমি বুঝে না নিতাম তাহলে আমি প্রত্যেক অযুর সময় অবশ্যই মিছওয়াক করে নেওয়ার জন্য তাদেরকে আদেশ করতাম। (বোখারী-মুছলিম)

অপর এক হাদীছে তিনি এরশাদ করেন ঃ

মিছওয়াক না করে নামায আদায় করার তুলনায় মিছওয়াক করে নামায় আদায় করার ছাওয়াব-পুণ্য সত্তর গুণ বেশি। [বায়হাকী]

প্রিয় নবী (স) আরও এরশাদ করেন ঃ

তোমরা অবশ্যই মিছওয়াক করিও–কারণ মিছওয়াক একেতঃ মুখকে পরিষ্কার করে অধিকন্তু ইহা আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি পাওয়ার উপায় স্বরূপ।

✪ জয়তুন কাঠের মিছওয়াকই সবচেয়ে উত্তম। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে– মিছওয়াক হিসাবে জয়তুন কাঠই সর্বোত্তম। এ বরকতময় কাঠ মুখকে সুগন্ধিময় করে তোলে এবং দুর্গন্ধ দূরীভূত করে। ইহা আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবী (আ) গণেরও মিছওয়াক। (তাবরানী)

✪ জয়তুন কাঠের মিছওয়াক পাওয়া না গেলে তিক্ত জাতীয় কাঠ তথা নিম ইত্যাদি কাঠের ডাল দ্বারা মিছওয়াক করা মুস্তাহাব। [এনায়া-কাফী]

উল্লিখিত কাঠ সমূহের মিছওয়াক পাওয়া না গেলে এরূপ কাঠের ডাল দ্বারা মিছওয়াক করতে হয় যদ্বারা দাঁতের ক্ষতি হওয়ার আশংকা না থাকে।

মানুষের খাদ্যোপযোগি ফলবান গাছের ডাল দ্বারা মিছওয়াক করা নিষেধ। এমনিভাবে যে সব কাঠ দ্বারা মিছওয়াক করলে দাঁতের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে তা দ্বারা ও মিছওয়াক করা মাকরূহ। যেমন বাঁশের কঞ্চি, আনারের ডাল ও খেজুরের ডগা ইত্যাদি। (শামী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাঁচা-শুকনা-ভেজা সব প্রকারের মিছওয়াক দ্বারা রোযাদার সহ সকলেরই যে কোন সময়ে মিছওয়াক করা জায়েয। (তাতার খানিয়া)

আর যে গাছ বিষাক্ত তা দ্বারা মিছওয়াক করা হারাম। যে মিছওয়াক ব্যবহার করবে উহা মিছওয়াককারীর নিজ হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলির পরিমাণ মোটা, গিরাবিহীন, সোজা নরম এবং এক বিঘত পরিমাপের লম্বা হওয়া মুস্তাহাব।(তাহতাবী)

এক বিঘতের চেয়ে বেশি লম্বা হলে মিছওয়াক করার সময় শয়তান মিছওয়াকের উপর চড়ে বসে এবং মিছওয়াককারীর অন্তরে ওয়াছওয়াছা সৃষ্টি করতে থাকে। এক বিঘত লম্বা মিছওয়াক দ্বারা কাজ শুরু করে মিছওয়াক করতে করতে উহা খাট হয়ে আসলে এতে কোন অসুবিধা নাই। (শামী) কিন্তু শুরুতেই এক বিঘতের চেয়ে কম পরিমাপের মিছওয়াক দ্বারা মিছওয়াকের কাজ শুরু করা নাজায়েয। (শামী, তাহতাবী)

মিছওয়াকের জন্য কাঠ পাওয়া না গেলে শাহাদৎ আঙ্গুলি দ্বারা আপাতত মিছওয়াকের কাজ সারানো জায়েয। এভাবে কাঠের অভাবে কাপড়ের টুকরা দ্বারা ও মিছওয়াক করা যায়। এতেও মিছওয়াকের ছওয়াব পাওয়া যাবে। কাঠ পাওয়া না গেলে আঙ্গুল কিংবা কাপড়খণ্ড দ্বারা মিছওয়াক করলেও ছওয়াব পাওয়া যাবে বলাতে এর উপর অনুমান করে অনেকে বলেছেন যে টুথ ব্রাশ দ্বারা মিছওয়াক করলে ও ছওয়ার পাওয়া যাবে। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানতে হবে যে, এসব টুথ ব্রাশ গুলো শুকরের লোম বা অন্য কোন নাপাক কিংবা হারাম বস্তু দ্বারা তৈরি কিনা? যদি শুকরের লোম বা হারাম বস্তুদ্বারা তৈরি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ঐ সব টুথব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজা হারাম। (তাহতাবী, গায়াতুল আওতার)

✪ মাটি দ্বারা দাঁত মাজা নিষেধ, কয়লা-ছাই ভস্ম দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা সুন্নাতের খেলাপ। তদুপরি কয়লা জ্বিন জাতির আহার হিসাবেও তদ্বারা মিছ্ওয়াক করা মাকরূহ। যে সব টুথপেষ্ট বা মাজনে কোন নাপাক কিংবা হারাম দ্রব্য রয়েছে বলে প্রমাণিত হয় ঐসব টুথপেষ্ট বা মাজন দ্বারা দাত মাজা হারাম।

মিছ্ওয়াক করার হুকুম ঃ

আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে প্রত্যেক নামাযের অযু করার সময় কুলি করার পূর্বে মিছওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াককাদা (তাহতাবী, জাওহারাতুন নাইয়ারা) মিছওয়াক করেই কুলির কাজ সমাধা করতে হয়।

✪ নিম্নবর্ণিত অবস্থায় মিছওয়াক করা মুস্তাহাব ঃ

(১) নিয়মিত দাঁত পরিষ্কারের জন্য। (২) মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত করার জন্য। (৩) কোরআন করিম তেলাওয়াতের জন্য। (৪) রাতে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে। রাতে, ভোর বেলা অথবা দিনের বেলা নিদ্রা থেকে উঠলে, (৫) স্বামী-স্ত্রী মিলনের জন্য, (৬) লোকসমাজে গমন করার জন্য। (তাহতাবী)

✪ মেয়েলোকদের জন্য মিছওয়াক করা মুস্তাহাব, সুন্নাত নয়। এরা নরম প্রকারের সুগন্ধি কাঠ চিবিয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করলে মিছওয়াকের ছাওয়াব পাবে। মেয়েলোক-দের দাঁত ও দন্তপাটি নরম বিধায় তারা পুরুষদের ন্যায় মিছওয়াক করতে গেলে দাঁত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে।

✪ মিছওয়াক করার নিয়ম ঃ

ডান হাত দ্বারা মিছওয়াক করা মুস্তাহাব। মিছওয়াকের যেদিক দ্বারা দাঁত মাজবে সেদিকের কিছু নিম্নে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পেট স্থাপন করতঃ শাহাদত, মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুলীত্রয়কে মিছওয়াকের উপর রাখতে হয় এবং মিছওয়াকের শেষাংশ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর উপরে রেখে মিছওয়াক করা আরম্ভ করতে হয়। (শামী)

প্রথমে উপরের দন্তপাটির মধ্যখানে মিছওয়াক রেখে ডান দিক হতে ঘসে বাম দিকে নিতে হয়। পরে নিচের দন্তপাটির মাঝখানে মিছওয়াক রেখে ঘসে ঘসে ডান দিকে এনে পুনঃ বাম দিকে নিতে হয়। এভাবে পুনঃ বাম দিক থেকে ঘষে ডান দিকে নিতে হয়। অনুরূপ ভাবে দাঁতের অপর পার্শ্বও ঘষতে হয়। এ নিয়মে তিনবার মাজা সুন্নাত।

মুঠ পাকিয়ে মিছওয়াক ধরে মিছওয়াক করতে নাই। কারণ এতে অর্শ রোগ হতে পারে। শুয়ে শুয়ে মিছওয়াক করতে নাই। এতে প্লীহা রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। মিছওয়াক করার সময় মিছওয়াক চুষতে নাই। কারণ এতে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

✪ পেশাব-পায়খানার কাজ সমাধা করার সময়, ঢিলা কুলুখ ব্যবহারে হাটাহাটি করার সময় মিছওয়াক করা মাক্রূহ।

✪ মিছওয়াক করার কাজ শেষ হয়ে গেলে, মিছওয়াকের আগার অংশ ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। অতঃপর মিছওয়াক খানাকে যত্ন সহকারে সুরক্ষিত স্থানে রাখতে হয়। যেদিক দিয়ে দাঁত মাজা হয়ে থাকে সে দিককে উপরমুখি করে খাড়াভাবে রাখতে হয়। মিছ্ওয়াককে অযত্নে ফেলে রাখলে পাগল হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে-মধ্যে নিজ কান মোবারকের উপরেই মিছওয়াক রাখতেন, পাগড়ীর প্যাচের মধ্যেও রাখতেন।

যাই হউক মিছওয়াক রাখার বেলায় পকেটে হউক কিংবা রুমালে হউক বা নিজের আসবাব পত্রের মধ্যে হউক অত্যন্ত যত্ন সহকারে ইজ্জতের সাথেই মিছওয়াক খানা রাখা চাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) অযু ঃ

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, "হাদ্‌ছে আছ্‌গর" তথা ছোট নাপাকী থেকে "তাহারতে ছুগ্‌রা" তথা অযু করার মাধ্যমে একজন মুসলিমকে পাক-পবিত্র হতে হয়।

অযু (وضو) শব্দটাকে وضاءة মূল থেকে নিলে এর অর্থ হয় সুন্দর, মনোরম, উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি। আর একে الوضيئة কিংবা التوضؤ মূল থেকে নিলে এর অর্থ হয় ধৌত বা পবিত্র করা।

অযু শব্দের واو বর্ণকে পেশ দ্বারা উচ্চারণ করা হলে তখন অর্থ হয়, অযু করা। আর যখন واو -কে যবর দ্বারা উচ্চারণ করা হয় তখন এর অর্থ হয় ওযুর পানি[১] আর واو বর্ণে যের যোগে অর্থ হয় অযুর পাত্র।

শরীয়াতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট অঙ্গ সমূহ তথা মুখ-হাত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মাছেহ করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়াকে অযু বলা হয়।[২]

✪ অযু করার নিয়মের মধ্যে চারটি কাজ ফরয। এর একটিও বাদ পড়লে ওযু শুদ্ধ হয় না।

(১) কপালের চুল উঠার জায়গা হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত একবার পুরা মুখমণ্ডল ধৌত করা।

(২) কনুই সহ উভয়হাত ধৌত করা।

(৩) সমস্ত মাথার চারভাগের এক ভাগ মছেহ করা এবং (৪) উভয় পা গীরাসহ একবার ধোয়া।

✪ অযুর সুন্নাত কাজসমূহ ঃ

(১) অযুর নিয়ত করা। অর্থাৎ نَوَيْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ..... الخ শেষ পর্যন্ত পাঠ করা।

(২) অযু শুরু করার সময় তাছ্‌মিয়া অর্থাৎ "বিস্‌মিল্লাহিল্ আলিয়্যিল আযীম- শেষ পর্যন্ত পাঠ করা।

টীকা ঃ (١) فَالْمَفْتُوحُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَالْآلَةِ (طحطاوى)

(٢) اَلْوُضُوْءُ لُغَةً مَعْنَاهُ الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ وَهُوَ إِسْمُ مَصْدَرٍ لِأَنَّ فِعْلَهُ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ تَوَضَّأَ فَيَكُوْنُ مَصْدَرُهُ التَّوَضُّؤُ وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فِعْلُهُ وَضُؤَ. فَيَكُوْنُ مَصْدَرُهُ الْوَضَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ فَيُقَالُ وضو ككرم. وضاءة بمعنى حُسْنٌ وَنَظُفَ فَالْوُضُوْءُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ إِسْمٌ لِلنَّظَافَةِ. أَوْ لِلْوَضَاءَةِ وَهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنَ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَفِي الشَّرْعِ اَلْغَسْلُ وَالْمَسْحُ فِيْ أَعْضَاءٍ مَخْصُوْصَةٍ (مذاهب اربعه)

(৩) প্রথমে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিন বার ধোয়া। (৪) মিছ্‌ওয়াক করা, (৫) (প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে) তিনবার কুলিকরা। (৬) রোজাদার না হলে গড়গড়া করা। (৭) প্রত্যেকবার নতুন পানি দ্বারা তিনবার নাক পরিষ্কার করা। (৮) মুখ ধৌত করার সময় দাড়ি খেলাল করা। (৯) উভয় কান মাছেহ করা। (১০) পুরা মাথা একবার মাছেহ করা। (১১) হাত-পায়ের অঙ্গুলি সমূহ খেলাল করা। (১২) প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া। (১৩) এক অঙ্গ না শুকাতেই অপর অঙ্গ ধৌত করা। (১৪) অযুর ফরযসমূহ আদায় করার সময় তারতিব-মত তথা আগের কাজ আগে করা ও পরের কাজ পরে করা (দুররে মুখতার, শামী)। (১৫) ডান দিক হতে অযুর কাজ আরম্ভ করা। (১৬) দু'হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ধৌত করা। (এনায়া) (১৭) হাত ধোয়ার সময় কনুই এর সাথে বাহুর কিছু অংশও ধৌত করা। (তাহ্‌তাবী)

✪ অযুর মুস্তাহাব কাজসমূহ ঃ

(১) কেবলামুখী হয়ে অযু করা। তবে থুথু বা কুলির পানি কেবলার দিকে ফেলা নিষেধ।

(২) উঁচু স্থানে বসে অযু করা।

(৩) পবিত্র স্থানে বসে অযু করা।

(৪) কপালের উপরিভাগ হতে মুখধোয়া আরম্ভ করা।

(৫) বাম হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে নাক পরিষ্কার করা।

(৬) উভয় হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাছ্‌হ করা।

(৭) প্রত্যেক অঙ্গ উত্তমরূপে ঘষে-মেজে ধৌত করা।

(৮) উভয় পা শুধু বাম হাত দ্বারা ধৌত করা।

(৯) অযু করার সময় বিনা কারণে দুনিয়াবী কথাবার্তা না বলা।

(১০) অযুর পানির পাত্র বাম পার্শ্বে রেখে অযু করা।

(১১) নামাযের সময় হওয়ার আগেই অযু করতঃ নামাযের জন্য অপেক্ষা করা।

(১২) অযু করার বেলায় তাড়াতাড়ি না করা।

(১৩) কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কর্ণ-কুহর মছ্‌হে করা।

(১৪) অযু করা শেষ হলে কালেমা শাহাদত পাঠ করতঃ অযুর নির্ধারিত দোয়া খানা পাঠ করা।

(১৫) অযুতে অঙ্গসমূহ ধৌত করার সময় যে যে নির্ধারিত দোয়াসমূহ রয়েছে তা স্ব স্ব স্থানে পাঠ করা।

(১৬) অযু শেষে অযুর পানির কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা দাঁড়িয়ে পান করে নেয়াও মুস্তাহাব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ অযুর ক্ষেত্রে মাকরূহ কাজসমূহ ঃ

(১) মুখ ধৌত করার সময় জোরে জোরে মুখে পানি নিক্ষেপ করা।

(২) বাম হাত দ্বারা মুখ ধৌত করা।

(৩) বাম হাত দ্বারা মুখে কুলির পানি দেয়া।

(৪) বিনা ওজরে ডান হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করা।

(৫) নুতন পানি দ্বারা তিনবার মাথা মছেহ করা। (আলমগীরী)

(৬) অনাবশ্যক বেশি পরিমাণ পানি খরচ করা।

(৭) মছজিদে বসে অযু করা।

(৮) নাপাক জায়গায় বসে অযু করা।

✪ অযুর হুকুম ঃ

নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ করার জন্য অযু ফরয ঃ

(১) যে কোন প্রকারের নামায আদায় করার জন্য।

(২) তেলাওয়াতে ছিজদা আদায়ের জন্য।

(৩) জানাযার নামায আদায়ের জন্য।

(৪) কুরআন শরীফ দেখে দেখে হাতের দ্বারা স্পর্শ করতঃ তেলাওয়াত করার জন্য, অথবা কোরআন পাককে শুধু হাত দ্বারা ধরার জন্য অযূ করা ফরয।

(আলমগীরী, শামী)

✪ কা'বা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য অযু করা ওয়াজিব। (শামী, আলমগীরী)

✪ নিম্নে উল্লিখিত আমলসমূহ আদায় করার জন্য অযু করা সুন্নাত ঃ

(১) আযান ও একামত বলার জন্য।

(২) জুম্আ ও দু'ঈদের খুতবা দানের জন্য।

(৩) জনাবাতের (ফরয) গোছল করার পূর্বে।

(৪) স্ত্রী সহবাস তথা বীর্যপাত ঘটার কারণে নাপাক হয়ে গেলে গোছলের পূর্বে যদি নিদ্রা যাওয়া ও পান-আহারের প্রয়োজন পড়ে তখন অযূ করে নেওয়া সুন্নাত।

(৫) আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের জন্য ও ছাফা-মরওয়া পাহাড়ে ছায়ীর (দৌড়ের) জন্য এবং (৬) হুজুর পুরনূর নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওজা মুবারক যেয়ারত করার জন্য অযু করা সুন্নাত। (মারাকিউল ফালাহ)

✪ নিম্নে উল্লিখিত আমলসমূহ করার জন্য অযু করা মুস্তাহাব ঃ

(১) কোরআন শরীফ হাতে স্পর্শ না করে শুধু মুখে তেলাওয়াত করার জন্য।

(২) হাদীছ শরীফ শিক্ষা দেয়া, শিক্ষা নেয়া এবং ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা নেয়া দেয়ার জন্য অযু করা।

(৩) ধর্মীয় পুস্তকাদি স্পর্শ করার জন্য।

(৪) পানাহার করা ও নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এবং নিদ্রা হতে উঠে।

(৫) মছজিদে প্রবেশ করার জন্য।

(৬) আল্লাহ পাকের জিকির, তাছবীহ, তাহলীল, দরূদ শরীফ, মীলাদ শরীফ ও নবী পাক (সঃ)-এর সম্মানার্থে কেয়াম তথা দাঁড়িয়ে ছালাত-ছালাম পেশ করার জন্য।

(৭) মৃত লোককে গোছল দেয়ার জন্য গোছল দানকারীর অযু করা।

(৮) স্ত্রী সহবাসের পূর্বে।

(৯) রাগ উঠলে।

(১০) লজ্জাস্থান স্পর্শ করার পর।

(১১) ওয়াজ-নাছিহত করার জন্য।

(১২) উটের গোশত খাওয়ার পর।

(১৩) মৃত লোককে ধরে দাফন করার জন্য।

(১৪) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সময়।

(১৫) বেগানা মহিলাদের সাথে গাড়ী বা অন্যান্য যানবাহনে চলাফেরা করার সময় বা ঘটনাক্রমে অন্য কোন ভাবে বেগানা মহিলা-পুরুষের একের শরীর অন্যের সাথে লাগলে উভয়ের অযু করে নেয়া মুস্তাহাব।

(১৬) গীবত, মিথ্যা, গালাগালী ও অশ্লীল বাক্যালাপ করার পর। অশ্লীল বই-পুস্তক পাঠ করার পর, সিনেমা-টেলিভিশনে অশ্লীল ছবি ইত্যাদি দেখার পর।

(১৭) কাফের/মুশরিকদেব সাথে শরীরের স্পর্শ হলে এবং

(১৮) মূর্তি ইত্যাদি স্পর্শ করার পর অযু করে নেয়া মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ)

অযু করার নিয়ম ঃ

অযু করার পূর্বে পেশাব-পায়খানা করার প্রয়োজন হলে, উহা সেরে যথারীতি পাক-পরিষ্কার হতে হয়। অতঃপর কোন পাক-পরিষ্কার উঁচু জায়গায় কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে অযু করার জন্য বসতে হয়।

হযরত ফোকাহায়ে কেরাম (রঃ) গণের মতানুসারে অযুর অঙ্গসমূহ ধোয়ার সময় যেসব দোয়া পবিত্র হাদিস শরীফের বরাতে ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে অযুর স্ব-স্ব স্থানে ঐসব দোয়া পাঠ করা উত্তম। অযুর পানির লোটা-বদনা কিংবা অন্য কোন পাত্র নিজের বাম পার্শ্বে রাখতে হয়।

অতঃপর নিম্নের নিয়্যতখানা পাঠ করতে হয় ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণঃ নাওয়াইতু আন্ আতাওয়ায্যাআ লিরাফ্য়িল হাদাছি ও তাকাররু- বান ইলাল্লাহি তাআলা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর অযুর কাজ তথা কব্জী পর্যন্ত হাত ধোয়ার কাজ শুরু করার মুহূর্তে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে হয়ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلَامِ - اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْإِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا -

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি আলা দ্বীনিল ইসলাম-আল্ইস্‌লামু হাক্কুন ওয়াল্ কুফ্‌রু বাতিলুন আল্ ইসলামু নূরুন ওয়াল্ কুফ্‌রু যুলমাতুন্- আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী জাআলাল্ মা-আ তাহুরা।

উক্ত দোয়া পাঠ শেষ করে প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কব্জী পর্যন্ত পৃথক পৃথক ভাবে তিনবার করে ধুয়ে নিতে হয় এবং এ ধোয়ার মাঝে নিম্নবর্ণিত যে কোন একটি দোয়া পাঠ করে নেয়া উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ احْفَظْ يَدَىَّ مِنْ مَعَاصِيْكَ كُلِّهَا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহ্‌ফিয ইয়াদী মিন মাআছিয়্যিকা কুল্লিহা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যাবতীয় পাপ-গুনাহ হতে আমার হাতকে হেফাজত করুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَلَكَةِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্‌আলুকাল্ ইউমনা ওয়াল বার্‌কাতা ওয়া আউযুবিকা মিনাশ্‌শুমি ওয়াল্ হালাকাতি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কল্যাণ ও বরকত কামনা করছি এবং অনিষ্ট ও ধ্বংস হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এরপর ডান হাত দ্বারা মুখে পানি দিয়ে রোযাদার না হলে গরগরা সহ আর রোযাদার হলে গরগরা বাদ দিয়ে তিনবার কুলি করতে হয়। কুলি করার সময়ে দাঁতের ফাঁকের আটকানো খাদ্যকণা বের করে নিতে হয়।

এ কুলি করার সময়েই উপরে বর্ণিত সুন্নাতী নিয়মে মিছ্‌ওয়াক করে নিতে হয়। সাথে সাথে নিম্নের দোয়া দু'টো পাঠ করা উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنِىْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَأْسًا لَا اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَدًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইছ্‌কিনী মিন্ হাউজি নাবিয়্যিকা কা'চান্-লা আয্‌মাউ বা'দাহু আবাদান্।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে (হাশরের ময়দানে) আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজে কাউছার থেকে এভাবে এক পেয়ালা শরবত পান করান, যাতে আমি আর কখনো পিপাসার্ত না হই। (শরহে মুনিয়া)

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি ওয়া যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুছ্‌নি ইবা-দাতিকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, আপনার যিকির, আপনার শোকর ও আপনার উত্তম এবাদত করার নিমিত্তে আপনি সাহায্য করুণ। (শামী)

কুলি করার কাজ শেষ হলে ডান হাত দ্বারা পর পর তিনবার নাকে পানি দিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি নাকের ছিদ্র পথে প্রবেশ করিয়ে নাক ঝেড়ে ও ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। সাথে সাথে নিম্নের দোয়াসমূহ পাঠ করা উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تُحَرِّمْنِىْ رَائِحَةَ نِعَمِكَ وَجِنَانِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-তুহাররিম্‌নী রায়েহাতা নিয়ামিকা ওয়া জেনানিকা।

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَارْزُقْنِىْ مِنْ نَعِيْمِهَا وَلَا تُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আরিহ্‌নী রায়েহাতাল জান্নাতি ওয়ারযুক্‌নী মিন্ নায়ীমিহা ওয়ালা তুরিহ্‌নী রায়িহাতান নারি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমাকে জান্নাতের সুঘ্রাণ ও বিবিধ নাজ-নেয়ামত প্রদান করুন আর জাহান্নামের দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখুন।

অতঃপর ডান হাতে করে পানি নিয়ে দু'হাতের সাহায্যে কপালের উপরিভাগের চুল গজানোর স্থান হতে থুতনির নীচ পর্যন্ত এবং এককানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরা মুখমণ্ডল তিন বার এমনভাবে ধুয়ে নিতে হয় যেন চুল পরিমাণ স্থানও শুক্‌না না থাকে।

ঘন দাড়িওয়ালা লোকদের দাড়ি সমূহের উপরিভাগ ধৌত করা ফরয, আর পাতলা দাড়িওয়ালা লোকদের দাড়ি খেলাল করতঃ গোড়ায় পানি পৌছিয়ে থুতনির চামড়া ধৌত করা ফরয এবং সাথে সাথে নিম্নের দোয়াসমূহ হতে পাঠ করা উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বাইয়িদ্ব ওয়াজ্‌হি ইয়াওমা তাব্‌ইয়াদ্বদ্বু উজূহুন্ ওয়া তাছ্‌ওয়াদ্দু উজূহুন্।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! ঐ দিন আমার চেহারা উজ্জ্বল করুন যে দিন [আপনার প্রিয় বান্দাগণের] চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং [নাফরমান বান্দাদের] চেহারা মলিন হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ اَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِىْ بِذُنُوْبِىْ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهُ اَعْدَائِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বাইয়িদ্ব ওয়াজ্হী বিনূরিকা ইয়াওমা তাব্ইয়াদ্দু উজূহ্ আউলিয়াইকা ওয়া-লা তুছাভ্ভিদ্ ওয়াজ্হী বিজুনূবী ইয়াওমা তাছওয়াদ্দু উজূহ্ আ'দা-য়িকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! ঐদিন আপনার পবিত্র নূর দ্বারা আমার চেহারা উজ্জ্বল করুন যেদিন আপনার অলি (প্রিয়) বান্দাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং আমার পাপ-গোনাহর কারণে আমার চেহারাকে মলিন করবেন না ঐ দিন যেদিন আপনার শত্রু [নাফরমান] বান্দাদের চেহারা মলিন হবে।

এরপর প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুইর কিছু উপর পর্যন্ত পানি দ্বারা তিন তিন বার ধুয়ে নিতে হয়। হাতে এভাবে পানি দিতে হয় যাতে পানি হাত বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে। তেল মালিশের ন্যায় ঘষা মাকরূহ।

ঘড়ি, আংটি, টাইট চুড়ি কিংবা মহিলাদের হাতে অন্যকোন প্রকারের অলংকার পরা থাকলে তা নেড়ে-চেড়ে পানি পৌছাতে হবে। সাথে সাথে হাতের আঙ্গুলিসমূহ খিলাল করা লাগবে।

✪ ডান হাত ধৌত করার সময় নিম্নের দোয়াখানা পাঠ করা উত্তম।

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'তিনি কিতাবী বিইয়ামীনী ওয়া হা-ছিবনী হিছাবাই ইয়াছীরা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার কিতাব তথা আমল নামা আমার ডান হাতে প্রদান করুন এবং আমার হিসাব-নিকাশকে একেবারে সহজভাবে গ্রহণ করুন।

✪ বাম হাত ধৌত করার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা-তু'তিনী কিতাবী বিশিমালী ওয়ালা মিন ওয়ারায়ে যাহ্রী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! [হাশরের বিচার দিবসে] আমার আমলনামা আমার বাম হাতে কিংবা পিছন দিক হতে দিবেন না।

হাত ধোয়ার কাজ শেষ হলে মাথা মছেহ করার জন্য দু'হাত নতুন পানি দ্বারা ভিজিয়ে উভয় হাতের বৃদ্ধা ও শাহাদত আঙ্গুলীদ্বয়কে আলগা রেখে উভয় হাতের বাকী তিন আঙ্গুলের মাথায় মাথায় মিলিয়ে আঙ্গুল সমূহের পেটাংশ দ্বারা কপালের চুলের গোড়া থেকে মাথার উপরিভাগ দিয়ে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে মাথার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মছেহ করতে হয়।

অতঃপর উভয় হাতের তালু দ্বারা মাথার উভয় পার্শ্ব পিছনের দিক হতে সামনের দিকে টেনে এনে মছেহ করা লাগে। এরপর শাহাদত আঙ্গুলের দ্বারা কানের ভিতরের অঙ্গ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের বাইরের অংশ মছেহ করতে হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রাভাগ দ্বারা উভয় কানের ছিদ্রপথ মছেহ করতে হয়। অতঃপর উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহের পিঠাংশ দ্বারা ঘাড় মছেহ করা লাগে। কিন্তু গলা মছেহ করা বেদআত। [বাহ্রুর রায়েক]

✪ **মাথা মছেহ ঃ** করার সময় নিম্নের দোয়া পাঠ করে নেয়া উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِىْ وَبَشَرِىْ عَلَى النَّارِ وَاَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হার্‌রিম শা'রী ওয়া বিশ্‌রী আলান্‌ নারি ওয়া আযিল্লিনী তাহ্‌তা যিল্লি আরশিকা ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লু আর্‌শিকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার শরীরের পশম ও চামড়াকে জাহান্নামের জন্য হরাম করে দিন এবং আমাকে [ঐ দিন] আরশের ছায়া দান করুন যেদিন আপনার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা গাশ্‌শিনী বিরাহ্‌মাতিকা ওয়া আন্‌যিল্‌ আলাইয়া মিন্‌ বারাকা-তিকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার বিশেষ রহমত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করে নিন এবং আমার উপর আপনার বিশেষ বরকতনাযিল করুন। (শরহে মুনিয়া)

✪ কান মাছেহ করার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্‌আলনী মিনাল্‌ লাযীনা ইয়াছ্‌তামেউনাল্‌ কাওলা ফাইয়াত্তা-বিউনা আহ্‌ছানাহূ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সদুপদেশ শুনে যারা তদনুযায়ী আমল করে আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করে নিন।

✪ ঘাড় মাছেহ করার সময়ের দোয়া ঃ اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'তিক রাকাবাতী মিনান্‌নারি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার গর্দানকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করুন,

অতঃপর প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা গিরার উপর পর্যন্ত তিন তিন বার উত্তম রূপে ধুয়ে নিতে হয়। পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হতে ধোয়া আরম্ভ করা সুন্নাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রথমে বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলি দ্বারা ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলির দিক হতে খেলাল আরম্ভ করে ডান পায়ের খেলাল সমাধা করতঃ পুনঃ বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি হতে বাম পায়ের খেলাল আরম্ভ করতে হয়। এভাবে বাম পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলীতে গিয়ে খেলালের কাজ সমাপনের মাধ্যমে অযুর কাজ শেষ করতে হয়।

✪ ডান পা ধোয়ার সময় নিম্নের দোয়া পাঠ করা উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ছাব্বিত কাদামাইয়া আলাছছিরাতি ইয়াওমা তাজিল্লুল আকদামু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যে দিন অনেকেই পুলছেরাত হতে পিছলিয়ে পড়ে যাবে, ঐ দিন আপনি আমার পদদ্বয়কে পুলছিরাতের উপর স্থির-সুদৃঢ় রাখুন।

✪ বাম পা ধোয়ার সময় নিম্নের দোয়াখানা পাঠকরা উত্তমঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্ যনবী মাগফূরাওঁ ওয়া ছা'য়ী মাশকূরাও ওয়া তেজারাতী লান্ তাবুরা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ মার্জনা করুন এবং আমার চেষ্টা-সাধনা সার্থক করুন ও আমার (নেক আমলের) ব্যবসাকে ধ্বংস-নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

✪ অযু শেষ হওয়ার পরপরই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। ইমাম জাইলাঈ (র)-এর মতে, প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার পরপরই দরূদ-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।[১]

অযু শেষ হওয়ার পর দরূদ পাঠের সাথে সাথে নিম্নের দোয়াসমূহ পাঠ করাও মুস্তাহাব।

টীকা ঃ ১

(১) وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَهٗ اَىْ بَعْدَ الْوُضُوْءِ لٰكِنْ فِى الزَّيْلَعِىْ اَىْ بَعْدَ كُلِّ عُضْوٍ وَاَنْ يَّقُوْلَ بَعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔

(২) وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ غَسْلِ عُضْوٍ (عالمگيريه)
وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَيْضًا كَمَا فِى التَّوْضِيْحِ (مراقى الفلاح)

✪ প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ তিরমিজী শরীফে হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ ....

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন− যে লোক উত্তম রূপে অযুর কাজ শেষ করতঃ পাঠ করবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ/ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আশ্হাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শরীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু-আল্লাহুম্মাজ্ আল্নী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ আল্নী মিনাল্ মুতাত্বাহ্হিরীন।

فُتِحَتْ لَهٗ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِّنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ۔

অর্থাৎ ঃ ঐ লোকের জন্য বেহেশতের আটখানা দরজা খুলে দেওয়া হবে সে যে দরজা দিয়েই চাইবে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।

✪ মুনিয়াতুল্ মুছাল্লী গ্রন্থে বর্ণিত আছে অযু, শেষ হওয়ার পর নিম্নের দোয়া পাঠ করবে−

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্নী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ্ আল্নী মিনাল্ মুতাত্বাহ্হিরীনা ওয়াজ্ আল্নী মিন ইবা-দিকাছ ছালেহীনা ওয়াজ আল্নী মিনাল্ লাযীনা লা খাওফুন্ আলাইহিম্ ওয়ালা-হুম্ ইয়াহযানূন্−

✪ উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে, অযু সমাপ্ত হওয়ার পর পাঠ করবে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ۔

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আললা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্দাকা লা-শারীকা লাকা ওয়াছতাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা।

✪ অপর এক হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে নিম্নে বর্ণিত দোয়াখানা পাঠ করা উত্তম।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফির্লী জান্বী ওয়া ওয়াছ্ছি'লী ফী দারী ওয়া বা-রিকলী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফী রিয্‌কী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার পাপ-গুনাহ ক্ষমা করে দিন ও ঘরকে প্রশস্ততা দান করুন এবং আমার রিজিকে বরকত দান করুন। (গায়াতুল আওতার, শরহে মুনিয়া)

অতঃপর হারাম ও মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে অযুর পর "তাহিয়্যাতুল অযুর নিয়্যতে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

✪ অযু ভঙ্গের কারণসমূহ ঃ

১। পায়খানার রাস্তা দিয়ে মল, বায়ু, চির-ক্রিমি ইত্যাদি, পাথর, রক্ত ও পুঁজ ইত্যাদি বের হলে অযু ভেঙ্গে যায়। (আলমগীরী, গায়াতুল আওতার)

২। পেশাবের রাস্তা দিয়ে পেশাব, বীর্য, মজি, ওদি, পাথর, কীড়া, মেয়ে লোকদের হায়েজ, নেফাছ ও ইস্তেহাজা (প্রদর, রক্তপ্রদর রোগের) রক্ত-পুঁজ ইত্যাদি বের হলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। [আলমগীরী]

৩। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের প্রস্রাবদ্বার দিয়ে দূষিত বায়ু বের হলেও বিশুদ্ধ মতানুসারে অযু নষ্ট হয় না তবে অযু করে নেওয়া উত্তম। (মুনিয়া)

৪। পায়খানার রাস্তায় পিচকারী ও ডোজ প্রবেশ করিয়ে বের করতঃ পিচকারী বা ডোজের অগ্রভাগ ভিজা দেখা গেলে অযু নষ্ট হয়ে পড়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। আর বের করার পর অগ্রভাগ শুক্‌না দেখা গেলে অযু নষ্ট হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

(মুনিয়া)

৫। শরীরের কোন স্থানের ক্ষত, ফোড়া-পাঁচড়া ও জখম হতে রক্ত-পুঁজ ও পানি ইত্যাদি বের হয়ে ক্ষতস্থান হতে গড়িয়ে পড়লে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। (আলমগীরী, মুনিয়া)

৬। জখম, ক্ষত-ফোড়া ইত্যাদির রক্ত-পুঁজ পানি নিজে নিজে বের না হয়ে যদি টিপে টিপে বের করা হয় তখনও অযু নষ্ট হয়ে যাবে। (আলমগীরী, মুনিয়া)

৭। নাক-কান, স্তনের বোটা ও নাভীস্থান হতে ব্যাথা-যন্ত্রণা সহকারে পানি বের হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ব্যথা-যন্ত্রণা ছাড়া বের হলে অযু নষ্ট হবে না।

(গায়াতুল আওতার)

৮। নাক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পতিত হলে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

৯। যদি শরীরে শিংগা লাগানোর কারণে তা হতে এ পরিমাণ রক্ত বের হয় যে, ক্ষতস্থানের উপরে থাকলে তা থেকে গড়িয়ে পড়ত সে অবস্থায় অযু নষ্ট হয়ে যাবে।

(শরহে বেকায়া)

১০। মুখ ভরে বমি হলে, উম্মাদ-পাগল হয়ে পড়লে, বেঁহুশ হয়ে পড়লে, নেশাদ্রব্য ব্যবহারের ফলে মাতাল হয়ে পড়লে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

✪ বমিতে অন্য কিছু বের না হয়ে শুধু চির-কৃমি বের হলে অযু নষ্ট হবে না।

(তাহতাবী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ অনুরূপ শুধু কফ বমি হলে ও অযু নষ্ট হয় না, কিন্তু ভুক্ত দ্রব্য ও কফ মিশ্রিত বমি হলে তখন দেখতে হবে যে, কফের চেয়ে ভুক্ত দ্রব্যের অংশ বেশি না কি কম। ভুক্ত দ্রব্য বেশি হলে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। আর ভুক্ত দ্রব্য কম হয়ে কফ বেশি হলে অযু ভঙ্গ হবে না।

✪ চিৎ বা কাত হয়ে কিংবা কোন কিছুতে ঠেস-হেলান দিয়ে নিদ্রা গেলে অযু নষ্ট হয়ে যায়।

✪ মুখের ভিতর থেকে রক্ত বের হয়ে রক্তের পরিমাণ যদি থুথুর পরিমাণের সমান হয় কিংবা অধিক হয়, সেমতাবস্থায় অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। থুথুর রং যদি পূর্ণ রক্ত বর্ণ ধারণ করে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, রক্তের পরিমাণ বেশি।

থুথুতে রক্তের পরিমাণ কম হলে অযু নষ্ট হয় না। (আলমগীরী)

✪ দাঁড়ানো কিংবা বসা অবস্থায় নিদ্রা গেলে এবং ঝিমুতে ঝিমুতে জমিতে পড়ে যাওয়ার ক্ষণকাল পরেই নিদ্রা ভঙ্গ হলে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। (তাবিনুল হকায়েক)

কিন্তু উক্ত অবস্থাদ্বয়ে যদি উপুর কিংবা কাৎ হয়ে জমিনে পড়ে যাওয়া মাত্রই বা পড়ে যাওয়ার মুর্হূতে নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে অযু নষ্ট হবে না। (তাবিনুল হকায়েক)

✪ নামাযের তশাহ্‌হুদ পাঠের জন্য বসার ন্যায় বসা অবস্থায় নিদ্রা গেলে অযু ভঙ্গ হয় না।

✪ দু'হাত দ্বারা হাঁটুদ্বয় বেড় দিয়ে হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসে বসে নিদ্রা গেলে অযু নষ্ট হবে না।

✪ কোন পুরুষ লোক সুন্নাতী তরিকার ছিজদায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে অযু নষ্ট হয় না। (খানিয়া, গায়তুল আওতার)

কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাদের জন্য নির্ধারিত সুন্নাত তরিকায় ছিজদায় গিয়ে ঘুমালে অযু নষ্ট হয়ে যাবে।

✪ নামাযে দাঁড়ান ও রুকু অবস্থায় নিদ্রা গেলে অযু নষ্ট হয় না। (খানিয়া)

✪ রুকু-ছিজদা বিশিষ্ট নামাযে বালেগ নারী-পুরুষ ভুলে হোক কিংবা ইচ্ছায় হোক খিলখিল করে দাঁত দেখিয়ে উচ্চ হাস্য করলে নামায ও অযু উভয়টাই ভেঙ্গে যায়।

(আলমগীরী, ইত্যাদি)

আর ছোট নাবালেগ বালক যদি এরূপ হাস্য করে তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না বরং শুধু নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি নামাযের মধ্যে তাবাচ্ছুম (মুচকি হাঁসি) তথা যার আওয়াজ নিজে কি অপর কেউ শুনতে পেল না, তাহলে অযু ও নামায কোনটাই যাবে না। (আলমগীরী)

✪ জানাযার নামাযে ও তেলাওয়াতে ছিজদা আদায়ের সময় যদি এরূপ উচ্চহাস্য করে তাহলেও অযু কিংবা নামায কোনটাই নষ্ট হবে না। (মুনিয়া)

কিন্তু "আলমগীরীতে" বলা হয়েছে এতে জানাযার নামাযও তেলাওয়াতে ছজদা নষ্ট হয়ে যাবে তবে অযু ভঙ্গ হবে না।

✪ সাধারণত যে সব কাজের দ্বারা ওযু নষ্ট হয় না ঐসব কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

ওযু থাকা অবস্থায় মাথা মুড়ালে, গোফ-গাঁড়ি ও শরীর থেকে অন্যান্য পশমাদি কাটলে, কিংবা হাত-পায়ের নখ ইত্যাদি কাটলে ওযু নষ্ট হয় না।

যেমন "শরহে মুনিয়া" গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَوْ حَلَقَ الشَّعْرَ اَىْ شَعْرَ رَأْسِهٖ اَوْ لِحْيَتِهٖ اَوْ شَارِبَهٗ اَوْ قَلَّمَ الْاَظْفَارَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اِعَادَةُ الْوُضُوْءِ وَلَا اِعَادَةُ غَسْلِ مَا تَحْتَ الشَّعْرِ اَوِ الظُّفْرِ وَلَا مَسْحَهٗ لِاَنَّ الْغَسْلَ وَالْمَسْحَ فِىْ مَحَلِّهٖ قَدْ وَقَعَ طَهَارَةً حُكْمِيَّةً لِلْبَدَنِ كُلِّهٖ مِنَ الْحَدَثِ لَا تَخْتَصُّ بِذٰلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يَزُوْلُ حُكْمُهٗ بِزَوَالِهٖ۔

(بحث ناقض الوضوء : صفحه١٦٧)

✪ হানাফী মাযহাব অনুসারে পুরুষ নিজ পুরুষাঙ্গ বা মহিলা নিজ লজ্জাস্থান নিজের হাত দ্বারা স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয় না। অনুরূপ গুহ্যদ্বার তথা পায়খানার রাস্তায় হাত দিলে ওযু নষ্ট হয় না। তবে এ অবস্থায় হাত ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব।

(মারাকিউল ফালাহ্, শামী)

✪ মশা, মাছি, ছারপোকা ইত্যাদি শরীর থেকে রক্ত পান করলে ওযু নষ্ট হয় না।

(আলমগীরি)

✪ হানাফী মাযহাব অনুসারে উটের গোশ্ত খেলে কিংবা আগুনে রান্না করা কোন খাদ্যবস্তু খেলে ওযু নষ্ট হয় না।

✪ ওযু অবস্থায় নিজের ছত্র খুলে গেলে বা অন্য কারো সত্র কিংবা নিজের সতরের প্রতি নজর পড়লে, কোন ছবির প্রতি দৃষ্টি দিলে অথবা কোন বেগানা নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি পড়লে ওযু নষ্ট হয় না। (বাহরুর্ রায়েক)

তবে এসব ক্ষেত্রে নতুনভাবে ওযু করে নেওয়া উত্তম।

✪ কোন ব্যাথা ছাড়া মহিলাদের স্তন থেকে দুধ বের হলে অথবা শিশুকে দুধ পান করালে ওযু নষ্ট হয় না। (বাহরুর্ রায়েক)

✪ অযু নষ্ট হয়েছে কি-না তা সম্পর্কে নিশ্চিৎ না হয়ে নিরেট সন্দেহ সৃষ্টি দ্বারা ওযু নষ্ট হয়ে পড়েছে বলে ধরা হবে না, যথক্ষণ পর্যন্ত নির্দ্দিষ্টভাবে ওযু ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া না যায়। কারণ শরীয়াতের মূল সূত্র হচ্ছে- اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

অর্থাৎ, ("কারো ওযু আছে" এরূপ) ইয়াকীন-বিশ্বাস (ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন কারণ পাওয়া না যাওয়া সত্ত্বেও) নিরেট শোবা-সন্দেহ দ্বারা রহিত তথা ওযু নষ্ট হয়ে পড়েছে বলে হুকুম দেওয়া যাবে না। (শামী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তায়াম্মুমের মাছায়েল

পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়ে পড়লে কিংবা পানি পাওয়া না গেলে গোছল বা অযুর পরির্বতে পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়তে পাক মাটি দ্বারা শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গ তথা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই সহ মছেহ করাকে ইসলামী শরিয়াতের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলা হয়। [বাহ্রুর রায়েক, শামী]

পানির বিকল্প হিসাবে পবিত্রতালাভের এ ব্যবস্থা আমাদের জন্য সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহর এক বিরাট মেহেরবানী। পানির মধ্যে যেরূপ নাজাছাত-নাপাকী তথা দূষিত পদার্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নষ্ট করার ক্ষমতা নিহিত রয়েছে, তদরূপ পাক-পরিষ্কার মাটির মধ্যেও দূষিত পদার্থের ক্ষতিকর জীবানু বিনাশ করতঃ তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিবারণের গুণ-শক্তি রয়েছে, সমকালীন বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের ইহাই অভিমত।

সুতরাং অপারগতার ক্ষেত্রে নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার উপকরণ স্বরূপ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ সহজলভ্য পন্থা আমাদেরকে দান করেছেন।

❑ **তায়াম্মুমের মধ্যে ফরয কাজ তিনটি ঃ**

(১) পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে "নিয়ত" করা। এটা শর্ত পর্যায়ের প্রসিদ্ধ ফরয।

(২) নিয়ত করতঃ পাক মাটিতে দু'বার হাত মারা। প্রথম বার পাক মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডলের যে পর্যন্ত অযুতে ধোয়া লাগে সে পর্যন্ত একবার সমস্ত মুখমণ্ডল মছেহ করা। এটা রোকন পর্যায়ের ফরয।

(৩) দ্বিতীয় বার পাক মাটিতে হাত মেরে দু'হাত কনুইর কিঞ্চিৎ উপরে সহ একবার মছেহ করা। এটাও রোকন পর্যায়ের ফরয। [মুনিয়া, মালাবুদ্ধা মিনহু]

❑ **আনুষঙ্গিক কয়েকটি মাছআলা ঃ**

তায়াম্মুম হচ্ছে নাপাক থেকে পাক-পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী বিধান অযু এবং গোসলের বিকল্প ব্যবস্থা। তাই তায়াম্মুমের মছেহ্র কাজ সমাধা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মছেহ্ করা থেকে একচুল বরারর অংশও বাদ না পড়ে। অতএব মুখ মছেহ করার সময়, দু'হাতের আঙ্গুলী সমূহের পেট ও হাতের তালু দ্বারা কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া হতে থূতনীর নীচ পর্যন্ত এক কানের লতি হতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল মছেহ করা লাগবে। এমনকি চক্ষুদ্বয়ের পাতাসহ তার উপরিভাগ দু'গালের উপরস্থ দাড়ি ও ভ্রূদ্বয়সহ মাছেহ করা লাগবে। মহিলাদের নাকের উপর বালি পরা থাকলে তা ঘুরিয়ে ঐ অংশেরও মছেহ করা লাগবে, নতুবা ফরয আদায় হবে না।

উভয় হাত মছেহ্ করার বেলায়ও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি কারো হাতে ঘড়ি-আংটিও চুড়ি পরা থাকে তা হলে ঐ সব ঘুরিয়ে ঐ অংশেও মছেহ করা ফরয; অন্যথায় মছেহ্র ফরয আদায় হবে না।

✪ মাছেহ করার সময় যদি হাতের তিন আঙ্গুলের কম ব্যবহার করা হয়, তাহলে মাছেহ শুদ্ধ হবে না। (আলমগীরী)

❑ তায়াম্মুমের সুন্নাত কাজসমূহ ঃ

(১) বিস্মিল্লাহ---- বলে তায়াম্মুমের কাজ আরম্ভ করা, (২) উভয় বার হাত মেরে প্রথমে সম্মুখে অতঃপর পিছনে মাটিতে হাত টানা (হালকা ভাবে ঘষা)। (৩) অতঃপর হাত ঝাড়া। (৪) অঙ্গুলি সমূহ বিস্তার করতঃই মাটিতে হাত মারা, (৫) তার তীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা। (৬) উপর্যুপরি তায়াম্মুমের কাজ করা (মারাকিউল ফালাহ)। (৭) হাতের তালু মাটিতে মারা (৮) ডানদিক হতে মাছেহ্র কাজ আরম্ভ করা (৯) হাতের পিঠের দিকই প্রথম মাছেহ করা (১০) দাড়ি খেলাল করা (১১) পাক-পবিত্র মাটিতে হাত মারা। [শামী]

✪ যে সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয এবং যা দ্বারা নাজায়েয এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

✪ শুক্না পাক মাটি কিংবা মাটি জাতীয় পদার্থ দ্বারাই তায়াম্মুম করা জায়েয।

স্মরণ রাখা দরকার যে, যা আগুনে পোড়ালে পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে যায় না, গলে না, নরম ও তরল হয়ে পড়ে না, তাই হল মাটি জাতীয় বস্তু হওয়ার চিহ্ন। আর যে দ্রব্যকে আগুনে পোড়ালে, পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে যায়, গলে যায়, গলে নরম ও তরল হয়ে পড়ে তা মাটি জাতীয় বস্তু না হওয়ারই আলামত-চিহ্ন। যেমন লোহা, কাসা, তামা, পিতল, সীসা, ও স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি পদার্থ। এসব কিছু আগুনে গলে তরল ও নরম হয়ে যায়। কাঠ-ঘাস ইত্যাদি পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে যায়। সুতরাং এসব দ্রব্য ও পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নাই। (আলমগীরী, বদায়েউচ্ছনায়ে)

✪ পাক-পবিত্র সাদা ও এটেল মাটি, ভিজা ও পোড়ামাটি, ধুলা-বালি, বা অন্যান্য রং এর মাটি, কাঁচা-পাকা ইট, চুনা পাথর, প্রত্যেক প্রকারের পাথর, কাঁচা-পাকা দেওয়াল, দেওয়ালে লাগানো চুনা ইত্যাদি বস্তুদ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয।

[বদায়েউচ্ছানায়ে, আলমগীরী, বাহরুর রায়েক]

✪ মাটি ও পাথর দ্বারা তৈরী থালা-বাসন, কলসী, ঘটা, পাতিল ইত্যাদি সামগ্রির উপর হাত মেরেও তায়াম্মুম করা জায়েয। এমনিভাবে কোন বস্তুর উপর পাক মাটির প্রলেপ দেওয়া থাকলে তাতেও তায়াম্মুম করা জায়েয।

✪ এসব মাটি-পাথর ও মাটি জাতীয় বস্তুর উপর তায়াম্মুম করাটা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে এসব বস্তুর উপর কোন প্রকারের ধুলা-বালি থাকা শর্ত নয়। বরং এসব মাটি ওপাথর জাতীয় দ্রব্য ধোয়া এবং মসৃণ হলেও এসবের উপর হাত মেরে তায়াম্মুম কর জায়েয। কারণ এসব বস্তু নিজেই মাটি কিংবা মাটি জাতীয় পদার্থ।

তবে এসব মাটি দ্বারা তৈরি সামগ্রির উপর মাটি জাতীয় প্রলেপ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রলেপ—যেমন আধুনিক কালের প্লাস্টিক পেইন্ট ও রং কিংবা অন্য কোন কেমিক্যাল জাতীয় কিছু দ্বারা প্রলেপ দেওয়া থাকলে তখন এর দ্বারা সরাসরি তায়াম্মুম জায়েয নাই। বরং এসবের উপর ধুলা-বালি পড়ে জমে থাকলে তখনই এর উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করা জায়েয।

✪ মাটি কিংবা মাটি জাতীয় নয় এমনকিছু, যেমন কাপড়, টেবিল, ব্যাঞ্চ, তক্তার চৌকী, প্লাস্টিকের থালা বাসন, তামা–পিতলের থালা-বাসন ও এ জাতীয় অনেক কিছুর উপর মাটির প্রলেপ থাকলে কিংবা বেশি ধুলা-বালি পড়তে পড়তে তা জমে মাটির প্রলেপের মত হয়ে গেলে– তখন এসব সামগ্রীর উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করা জায়েয।

✪ কোন মাটিতে পেশাব-পায়খানা কিংবা অন্য কোন নাপাক দ্রব্য পড়ার পর তা শুকিয়ে নাপাকীর চিহ্ন চলে গেলেও তা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।[১]

❑ তায়াম্মুম কখন করা যাবে ঃ

(ক) চতুর্দিকে এক মাইল এলাকার মধ্যে অনেক অনুসন্ধান ও খোঁজাখুঁজি করার পরেও কোথাও বা কোন উপায়ে পানি পাওয়া না গেলে তখনই তায়াম্মুম করতঃ নামায আদায় করা যাবে।

এক মাইলের ভিতরে পানি রয়েছে এবং পাওয়া যাবে মর্মে যে লোক জানতে পেরেছে— সে শহরে হউক কিংবা গ্রামে হউক, মুকীম হউক বা মুছাফির হউক, তার জন্য তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা মোটেই জায়েয হবে না। [বাদায়েউচ্ছানায়ে]।

(খ) এরূপ কোন নির্জন এলাকা বা গভীর জঙ্গলে গিয়ে পৌছলে যেখানে পানি কোথায় রয়েছে, তা জানার জন্য কোন লোকজন পাওয়া না গেলে, কিংবা অন্য ভাবে জানারও কোন ব্যবস্থা নাহলে, তখন তায়াম্মুম করেই নামায আদায় করা যাবে।

টীকা ঃ

الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست وذهب أثرها لا يجوز التيمم كذا في فتاوى قاضي خان (عالمگيريه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(গ) মুছাফিরী অবস্থায় নিজের সাথে যে পানি রয়েছে, উহা অযু-গোছলের কাজে খরচ করে নিলে, পরে নিজের ও সঙ্গীদের পিপাসায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আশংকা হলে, পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয।

(ঘ) পানির স্থানে যাওয়ার পথে শত্রু প্রাণ বিনাশ করে ফেলার ভয় থাকলে কিংবা কোন হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করে বসার অথবা পথে চোর ডাকাত- হাইজাকার ও সন্ত্রাসীদের কর্তৃক নিজের মালামাল ও আসবাবপত্র লুটে নেওয়ার এবং মান-ইজ্জত হানির আশংকা থাকলে।

(ঙ) পানির কূপ সামনে থাকা সত্ত্বেও কূপ হতে পানি উঠানোর কোন উপায়-উপকরণ যেমন রশি, বালতি ইত্যাদি না থাকলে।

(চ) পানি বেচা-বিক্রয় হওয়ার জায়গায় উহা খরিদ করার জন্য টাকা- পয়সা পাওয়া না গেলে এবং বিনা মূল্যে চাওয়া সত্ত্বেও কেউ পানি না দিলে।

(ছ) কারো এরূপ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়া যে, পানি ব্যবহার করলে তার রোগ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রবল আশংকা হলে তখন এ লোক এবং উপরুল্লিখিত সবধরনের লোকই অযু-গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতঃ নামায-তেলাওয়াত ইত্যাদি আদায় করে যাবে।

✪ এক মাইলের ভিতর পানি আছে কিনা বা পাওয়া যাবে কিনা এ সম্পর্কে জানার লোক কিংবা উপায় থাকা সত্ত্বেও জানার চেষ্টা কিংবা উপায় অবলম্বন না করে শুধু নিজে নিজে অনুমান করতঃ এক মাইলের ভিতর পানি নাই ধারণা করে তায়াম্মুম করতঃ নামায আদায় করা কারো জন্য জায়েয হবে না। (বদায়েউছ্ছানায়ে)

✪ শীত মওছুমে শীতপ্রধান দেশে কোন মুছাফির বরফ ছাড়া সহনীয় অন্য কোন পানি না পেলে, তখন অযু না করে তায়াম্মুম করতঃ নামায আদায় করা তার জন্য জায়েয, আর এ অবস্থা যদি গ্রীষ্ম প্রধান এলাকায় হয়, তাহলে তখন বরফের পানি দ্বারা অযু করেই তাকে নামায আদায় করতে হবে। (আলমগীরী)

✪ জানাযার নামায শুরু হয়ে যাচ্ছে বা শুরু হয়ে গেছে এ মুহূর্তে যদি কোন জুনুবী (নাপাক) লোক গোছল-অযু করতে যায় তাহলে জানাযার নামায শেষ হয়ে যাবে বলে নিশ্চিত ধারণা হয় তখন পানি থাকা সত্ত্বেও সে লোকের জন্য তায়াম্মুম করেই জানাযার নামাযে শরীক হওয়া জায়েয। (তাহ্তাবী, শামী)

✪ ঈদের নামাযের জমাআত আরম্ভ হয়ে গেছে এ অবস্থায় কোন নাপাক লোক গোছল-অযু করতে গেলে-জামাআত শেষ হয়ে যাবে, মর্মে প্রবল আশংকা হলে, সে ক্ষেত্রেও অযু গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করেই ঈদের জামায়াতে শরীক হওয়া যাবে। (শামী, তাহতাবী)

✪ সকলেই এমন সময় ঈদের নামায আদায়ের জন্য উপস্থিত হল যে অযু করতঃ নামায পড়তে গেলে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে, এ ক্ষেত্রে ইমাম- মুক্তাদী সবাই তায়াম্মুম করতঃ তাড়াতাড়ি ঈদের জামায়াত আদায় করা জায়েয।

[ফতহুল কাদীর, তাহ্তাবী]

❑ তায়াম্মুম করার নিয়ম ঃ

প্রথমে নিয়ত করতঃ বিস্‌মিল্লাহ্- বলে উভয় হাত [আঙ্গুলিসমূহ বিস্তার করতঃ] পাক মাটি কিংবা মাটি জাতীয় কোন বস্তুর উপরে মারতে (রাখতে) হয়। অতঃপর সামনে-পিছনে উভয় হাতকে টানতে হয় যাতে হাতের মধ্যে ভাল ভাবে মাটি লাগে। হাতে মাটি বেশি লাগলে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বদ্বয় পরস্পরের সাথে লাগিয়ে হাত ঝাড়া দিয়ে বালু-মাটির পরিমাণ কমিয়ে নিতে হয়।

অতঃপর দু'হাতের আঙ্গুলি সমূহের পেট ও হাতের তালুর অংশ দ্বারা কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া হতে থুতনির নিম্নদেশ পর্যন্ত, এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত মুখমণ্ডলের পুরা অংশ এমনভাবে মাছেহ্ করা লাগে যেন চক্ষুদ্বয়ের পাতার উপরিভাগ, দু'গালের উপরস্থ দাড়ি এবং ভ্রূদ্বয়ও মছেহ করা থেকে বাদ না পড়ে। নাসিকার অগ্রভাগ এবং কানের লতি সহ মাছেহ করতে হয়। [আলমগীরী] মেয়ে লোকদের নাকের উপর বালি পরা থাকলে তাকে নেড়ে চেড়ে সেস্থানও মাছেহ করে নিতে হয়। মোটকথা মুখমণ্ডল মাছেহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন একচুল পরিমাণ মুখের অংশও মছেহ করা থেকে বাদ না পড়ে।

এরপর পুনঃ পূর্ব নিয়মে পাক মাটিতে উভয় হাত মারতে হয়। হাত ঝেড়ে প্রথমে বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী তথা শাহাদত—এ চার আঙ্গুল দ্বারা ডান হাতের পিঠ পার্শ্বকে মছেহ করতে হয়। অর্থাৎ ডান হাতের উল্লিখিত চার আঙ্গুলের পিঠ পার্শ্বস্থ আঙ্গুলের মাথার নখের বাম হাতের ঐ চার অঙ্গুলিকে বসায়ে মালিশ করতঃ টেনে এনে ডান হাতের পিঠের কনুইর কিছু উপর পর্যন্ত মছেহ্ করে নিতে হয়। অতঃপর বাম হাতের তালুকে ডান হাতের পেটের কনুইর উপরিভাগে রেখে মালিশের নিয়মে কব্জি পর্যন্ত টেনে এনে ডান হাতের পেটপার্শ্ব মছেহ করে নিতে হয়। এরপর বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পিঠ মছেহ করে নিতে হয়। অতঃপর এ একই নিয়মে ডান হাত দ্বারা বাম হাতকেও মছেহ করে নিতে হয়।

এরপর পাঞ্জা ধরার মত করে এক হাতের আঙ্গুলি সমূহ অপর হাতের আঙ্গুলি সমূহের মধ্যে ঢুকিয়ে খেলাল করে নিতে হয়। (শামী, আলমগীরী, বাদায়েউছ্ছানায়ে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

❑ তায়াম্মুমের আনুষঙ্গিক কয়েকটি মাছআলা ঃ

✪ যে লোকের অযু আবশ্যক সে অযুর পরিবর্তেই তায়াম্মুম করবে। আর যে লোকের অযু-গোছল দু'টিরই আবশ্যক হয়, উভয়টির জন্য তাকে শুধু একবারই তায়াম্মুম করা লাগবে। দু'বার তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই। তবে নিয়ত করার সময় উভয়টির জন্য একসঙ্গে নিয়ত করতে হবে। নতুবা যেটির নিয়ত করা হবে না তা আদায়ও হবে না।

✪ কোন লোকের অযু-গোছল উভয়েরই আবশ্যক, কিন্তু গোছল করতে গেলে তার স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে এমতবস্থায় সে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। অতঃপর অযু করে নিবে।

✪ আমাদের মযহাব অনুসারে একই তায়াম্মুম দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়া জায়েয আছে।

✪ নামায আদায়ের নিয়তে যে তায়াম্মুম করা হয়েছে তা দ্বারা অন্যান্য যত ব্যাপারে অযু লাগে তত রকমের এবাদতের কাজ সমাধা করা যায়, কিন্তু জানাযার নামায ও তেলাওয়াতে ছিজ্‌দা আদায় করার জন্য কৃত তায়াম্মুম ব্যতীত অন্যান্য এবাদতের যেমন– মছজিদে প্রবেশের জন্য কোরআন শরীফ স্পর্শ না করেঃ মৌখিক তেলাওয়াতের জন্য, কবর যেয়ারত করার জন্য, মৃত লোক দাফন করার জন্য, আযান-একামত দেওয়ার জন্য কৃত তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করা জায়েয নাই।

✪ অপর লোককে তায়াম্মুম করিয়ে দিতে হলে যে করিয়ে দেবে মাটিতে তিন বার তারই হাত মারতে হবে।

একবার হাত মেরে ঐ লোকের মুখমণ্ডল মাছেহ করিয়ে দিতে হবে। ২য় বার হাত মেরে ডানহাত এবং তৃতীয়বার হাত মেরে বাম হাত মছেহ করিয়ে দিতে হবে। [জামেউর রুমুজ] তায়াম্মুম যাকে করিয়ে দিবে নিয়ত সে লোকই করে নিবে।

[বাহ্‌রুর রায়েক]

❑ তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ঃ

✪ যে সমস্ত কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। এছাড়া পানি পাওয়া মাত্রই তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। এমনি ভাবে অসুস্থ লোক সুস্থ হয়ে পড়লে এবং যে সব ওজরের কারণে তায়াম্মুম বৈধ হয়েছিল ঐ সব ওজর দূরীভূত হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। [মারাকিল ফালাহ ইত্যাদি]

✪ তায়াম্মুম কৃত ব্যক্তি নামায শুরু করার পূর্ব মুহূর্তেই পানি পেলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। তখন অযু করেই পুনরায় তার নামায আদায় করা লাগবে।

✪ নামায রত অবস্থায় পানি পেলে, এমনকি শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বক্ষণেও যদি পানি পায়, তাহলেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে, তার সাথে সাথে নামাযও বাতেল হয়ে যাবে এবং নতুন করে অযু করতঃ উক্ত নামায পুনরায় পড়তেহবে। তবে দু'ঈদ ও জানাযার নামায তায়াম্মুম করতঃ শুরু করে থাকলে এমতবস্থায় পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। আর নামাযও বাতেল হয়ে যাবে না।

✪ কোন লোক পানি নাই ধারণা করতঃ তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিল। পরে দেখা গেল যে পানি আছে, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায় এবং অযু করতঃ আদায়কৃত নামায পুনঃ দোহরায়ে পড়তে হবে।

✪ এক ব্যক্তি অনুসন্ধানের পর তায়াম্মুম করতঃ নামায আদায় করে নেওয়ার পর পানি পেল, তখন তার আদায়কৃত নামায দোহ্‌রান লাগবে না।

✪ পানির ব্যাপারে সন্ধানদাতা নিকটে থাকা সত্ত্বেও তার নিকট জিজ্ঞাসা না করেই তায়াম্মুম করতঃ নামায আদায় করার পর পানি নিকটে আছে, একথা জানতে পারলে অযু করতঃ পুনঃ নামায পড়তে হবে।

✪ কোন লোকের নিকট পানির সংবাদ প্রথম বারে জিজ্ঞাসা করার সময় সে কোন সংবাদ দিলনা এমতবস্থায় ঐলোক তায়াম্মুম করতঃ নামায আদায় করে নিল। নামায শেষ করার পর ঐ লোক সংবাদ দিল যে, পানি আছে। তখন আদায়কৃত নামায পুনঃ দোহ্‌রানো লাগবে না।

❑ **অযু ও তায়াম্মুমের জন্য পানি ও পাক মাটি না পাওয়া অবস্থা (فَاقِدُ الطَّهُوْرَيْنِ)-এর হুকুম ঃ**

✪ কোন ব্যক্তি কোথাও যদি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, অযু করার জন্য পানিও না পায় এবং তায়াম্মুমের জন্য পাক মাটিও না পায়। যেমন কোন লোক এ ধরনের একটি কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ল, যেখানে পানিও পাওয়া যাচ্ছেনা এবং পাক জায়গা-মাটিও নাই। অর্থাৎ তাকে কোন প্রকারের পানিও দেওয়া হচ্ছে না তদুপরি তাকে নাপাক ও ময়লা মাটির উপর দাড় করিয়ে রাখা হয়েছে, কিংবা কোন রোগ-ব্যাধির কারণে পানি ও মাটি উভয়টা ব্যবহারে অক্ষম হয়ে পড়ায় অযু-তায়াম্মুম করে পাক-পবিত্র হওয়ার কোন সুযোগ না থাকলে, তখন হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর মতে তখনকার জন্য নামায আদায় করা মওকুফ রাখবে। সুযোগ ফিরে আসলে অযু কিংবা তায়াম্মুম করে ঐ সব নামায কাযা আদায় করতে হবে।

আর সাহেবাইন তথা হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র) ও হযরত ইমাম আবু ইউছুফ (র)-এর মতে ওয়াক্তে ওয়াক্তে ঐ লোকের নামাযী লোকের রূপ ধারণ করা ওয়াজিব। অর্থাৎ অযু-তায়াম্মুম ছাড়া নামাযের নিয়ত না করে নামাযীর ন্যায় শুকনা স্থান হলে রুকু-ছিজদা করে আর কাদাময় ও নাপাক স্থান হলে ইশারায় রুকু-ছিজদা করতঃ নামাযের আহকামগুলো করে যাবে। পরে পানি কিংবা পাক শুষ্ক মাটি পাওয়া গেলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অথবা পানি-মাটি ব্যবহারের যোগ্যতা ফিরে আসলে অযু বা তায়াম্মুম করে পুনরায় ঐ ছুটে যাওয়া নামায সমূহ কাযা আদায় করে দেওয়া লাগবে।[১]

যে যে ক্ষেত্রে পানি থাকা অবস্থায় পানি ব্যবহারে কোন রকমের বাধা না থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয ঃ

✪ যৌন-মিলন জনিত কারণে কেউ নাপাক হয়ে পড়লে এবং এমতবস্থায় কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ হঠাৎ মসজিদে প্রবেশ করতে হলে অযু করে অথবা তায়াম্মুম করেও মাসজিদে প্রবেশ করা জায়েয।

✪ এমনি ভাবে কোন ভয়-ভীতির কালে জানাবতের নাপাকীর অবস্থায় প্রাণ ভয়ে মাছজিদে আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করতে হলে- মসজিদের তাযীমার্থে তায়াম্মুম করতঃ অবস্থান করা জায়েয। [আলমগীরী]

✪ কোরআন করিম মুখস্থ তেলাওয়াত করার জন্য অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা ও জায়েয।

✪ দ্বীনী তালিম দান করার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয।

✪ স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদির পরক্ষণে তথা গোছল ফরয হওয়ার অবস্থায় পানাহার করতে চাইলে তায়াম্মুম করতঃ পানাহার করা জায়েয। (শামী)

টীকা ঃ

(والمحصور فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بان حبس فى مكان نجس لايمكنه اخراج تراب مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرها عنده وقالا يتشبه) بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد ان وجد مكانا يابسا والا يومى قائما ثم يعيد كالصوم (درمختار)

(قوله يؤخرها عنده) لقوله عليه الصلوة والسلام لا صلوة الا بطهور سراج (قوله وقالا يتشبه بالمصلين) اى احتراما للوقت قال ولايقرأ كما فى ابى السعود سواء كان حدثه اصغر او اكبر اه قلت وظاهره انه لا ينوى ايضا لانه تشبه لا صلوة حقيقة تامل (قوله وان وجد مكانا يابسا) اى لا منه من التلوث - لكن فى الحلية الصحيح على هذا القول انه يومى كيفما كان - لانه لوسجد صار مستعملا للنجاسة (شامى)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জানাবত [যৌন সম্পর্কিত নাপাকী], হায়য-নেফাছ সম্পর্কিত নাপাকী অবস্থায় এবং অযু না থাকা অবস্থায় যে যে কাজ করা হারাম ও যা যা করা জায়েয এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

✪ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার কিংবা অন্য যে কোন অবৈধ যৌনমিলন এবং স্বপ্নদোষ, কামভাব ও পুলকের সাথে যে কোন উপায়ে নারী-পুরুষের বীর্যপাত ঘটার পরবর্তী অবস্থাকে শরীয়াতের পরিভাষায় "জানাবত" (যৌনমিলন ও বীর্যপাত জনিত নাপাকী) বলা হয়। এবং যে সব নারী-পুরুষের এরূপ অবস্থা হয় এদেরকে "জুনুবী" (যৌন জনিত নাপাক লোক) বলা হয়।

✪ মেয়েলোকদের মাসিক রক্তস্রাবকে "হায়য" বলা হয়।

✪ সন্তান প্রসবের মুহূর্ত হতে মেয়েলোকদের যে রক্তস্রাব হয় একে নেফাছ বলা হয়। ইস্তেহাযার মাছআলা হায়য নেফাছ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লিখিত তিন প্রকারের নাপাকী থেকে পাক-পবিত্র হতে হলে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তরিকায় গোছল এবং অপারগতায় শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় তায়াম্মুম করে নিতে হয়।

✪ অযু ভঙ্গ হওয়াকে শরীয়াতে "হাদাছ" বলা হয় এবং যার অযু ভঙ্গ হয়, তাকে শরীয়াতে "মুহ্‌দিছ" (নাপাক লোক) বলা হয় এবং এ থেকে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য শরীয়াত কতৃক নির্ধারিত পন্থায় অযু করে নিতে হয়, অপারগতায় তায়াম্মুম করে নিতে হয়।

উপরুল্লিখিত চার প্রকারের নাপাকী অবস্থায়—

✪ যে কোন প্রকারের নামায আদায় করা হারাম।

✪ জানাবত ও হায়য-নেফাছের অবস্থায় কোরআন করিমকে স্পর্শ করা, স্পর্শ করতঃ কোরআন তেলাওয়াত করা বা স্পর্শ না করে শুধু মুখস্থ কোরআন কিংবা কোরআনের আয়াতাংশ তেলাওয়াত করা সম্পূর্ণই হারাম।[১]

টীকা ঃ

قال النبى صلى الله عليه وسلم لا تقراء الحائض ولا الجنب شيأمن القران .... (ترمذى، وابن ماجه) وهذا كله اذا قرأ على قصدانه قرأن اما اذا قرأه على قصد الثناء او افتتاح امر لايمنع فى اصح الروايات وفى العيون لابى الليث ولو انه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء اوشيأ من الايات التى فيها معنى الدعاء ولم يرد به القراءة فلا باس به - (بحر الرائق)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে এ তিন প্রকারের নাপাকী অবস্থায় কোরআন মজিদের সূরা-আয়াত সমূহ বা আয়াতাংশ তেলাওয়াতের নিয়্যতে নয় বরং শুধুমাত্র দোয়া-ফরিয়াদ ও জিকিরের নিয়তে পাঠ করা জায়েয। এ ক্ষেত্রেও অযু করে নিয়ে পাঠ করা উত্তম।

✪ বিনা অযুতে কোরআন করিম হাত দ্বারা স্পর্শ করে তেলাওয়াত করা হারাম। কিন্তু হাতে স্পর্শ না করে শুধু চোখে দেখে দেখে তেলাওয়াত করা বা একেবারে মুখস্থ কোরআন করিমের তেলাওয়াত করা হারাম নয় বরং জায়েয।

✪ তেমনিভাবে জানাবত ও হায়য-নেফাছের নাপাকী অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত মুখস্থ তাছবীহ্-তাহলীল, যিকির, দোয়া ও ইস্তেগফার পাঠ করে যাওয়া জায়েয (শামী)।

✪ জানাবত ও হায়য-নেফাছ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। বিশেষ প্রয়োজনে তায়াম্মুম করেই প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে।

✪ জানাবত (যৌনজনিত নাপাকী) ও হায়য-নেফাছের অবস্থায় এবং বিনা অযুতে আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা হারাম। (আলমগীরী, মারাক্বিউল ফলাহ)

✪ জানাবত (যৌনজনিত নাপাকী)-এর অবস্থায় গোছল না করে আযান দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী। এরূপ নাপাকী অবস্থায় প্রদত্ত আযান পুনঃ দোহরায়ে দেওয়া লাগবে। (আলমগীরী)

✪ হায়য-নেফাছের অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করা সম্পূর্ণই হারাম। (আলমগীরী) এ অবস্থায় জেনেশুনে স্ত্রী সহবাস করে বসলে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে এ অপরাধের ক্ষমার জন্য তওবা-ইস্তেগফার করে যাওয়া কর্তব্য।[১]

✪ যদি পবিত্র কোরআন করিম এরূপ কোন আলগা গিলাফ (কভার) দ্বারা জড়ানো থাকে যা কোরআন করিমের সাথে বাইন্ডিং করানো নয় বা গাম ইত্যাদি দ্বারা আটকানো নয় কিংবা সেলাই করাও নয় ঐ অবস্থায় জুনুবী (নাপাক ব্যক্তি), হায়য-নেফাছওয়ালী মেয়েলোক এবং অযু বিহীন লোকের কোরআন মজিদকে বহন করা, গেলাফের উপর স্পর্শ করা জায়েয।

বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এ জাতীয় লোকের কোরআন শরীফ ধরতে কিংবা বহন করে নিতে হলে, আলগা পাক-পবিত্র রুমাল, কাপড়খণ্ড বা গিলাফ ইত্যাদি দ্বারা জড়িয়ে ধরেই বহন করে নেওয়া জায়েয।

✪ উল্লিখিত নাপাকী অবস্থায় এবং বিনা অযুতে প্রয়োজনে পবিত্র কাঠের খণ্ড দ্বারা কলম, ছুরি ও কাঠি ইত্যাদি দ্বারা কুরআন করিমের পৃষ্ঠা উল্টানো জায়েয।
[তাব্য়ীনুল হাকায়েক]

টীকা ঃ

فَاِنْ جَامَعَهَا وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيْمِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اِلاَّالتَّوْبَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ ـ (عالمگیریه)

✪ জুনুবী তথা নাপাক স্ত্রী-পুরুষ ও হায়য-নেফাছওয়ালী মহিলার কোরআন করিমের সূরা-আয়াত সমূহ তাবিজ আকারে লিখা কিংবা অন্য কারণে লিখা সম্পূর্ণই হারাম। [কবীরী, আলমগীরী]

বিনা অযুতে কোরআন মাজিদের সূরা-আয়াত তাবিজ হিসাবে হউক কিংবা অন্য কারণে হউক লেখাটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মাকরূহে তাহরীমী।

✪ উল্লিখিত জানাবত ও হায়য-নেফাছ জনিত নাপাকী অবস্থায় এবং বিনা অযুতে নিজের শরীরে "পরিহিত" জামার আস্তিন ও অন্যান্য পোশাক দ্বারা কোরআন করিম স্পর্শ করাও ধরা নাজায়েয। [ফাতহুল কাদীর, আলমগীরী, ইত্যাদি]

✪ যে সব রচনা, প্রবন্ধ, দ্বীনী বই-পত্র ও ফতোয়া ইত্যাদির মাঝে-মাঝে কোরআন করিমের সূরা-আয়াত সমূহ লিখিত রয়েছে এসব কিছুকে উল্লিখিত জুনুবী (নাপাক লোক) ও হায়য-নেফাছ ওয়ালী মেয়ে লোকদের জন্য অন্য কাগজে পুনঃ লেখা-নকল করাও হারাম। [আলমগীরী]

✪ আরবী ভাষার মূল কোরআন শরীফ নয় বরং শুধু কোরআন করিমের বাংলা-ইংরেজী ও উর্দূ ভাষার নিরেট অনুবাদ গ্রন্থকে উল্লিখিত তিন প্রকারের নাপাক লোকের স্পর্শ করা মাকরূহ। [আলমগীরী]।

কিন্তু আরবী বর্ণের লেখা কোরআন শরীফ না হলেও অন্যভাষায় উচ্চারণ কৃত কোরআন করিমকে উল্লিখিত নাপাকী অবস্থায় ও বিনা অযুতে স্পর্শ করা আরবী বর্ণে লিখিত কোরআন করিমের ন্যায় হারামই বটে। [গায়াতুল আওতার, তাহতাবী]

✪ যে বস্তুর (যেমন– কাপড়, ব্যানার, প্লেকার্ড, কাঠের বোর্ড, পাথর খণ্ড লৌহ-তামা-পিতল ও প্লাস্টিকের প্লেটের) উপর কোরআন করিমের সূরা-আয়াত ইত্যাদি লিখিত কিংবা খোদাইকৃত রয়েছে, ঐ সব কিছুর অলিখিত অংশ স্পর্শ করা নাপাক লোকদের জন্য মাকরূহে তাহরীমী। আর লিখিত স্থানে স্পর্শ করা হারামই বটে। (শামী, জাওহারাতুন নাইয়ারা)

✪ যেহেতু কোরআন করিমের তাফছীর, হাদীস শরীফ-ও এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ, ফেকাহ-ফতোওয়ার গ্রন্থ সমূহ, শরীয়াতের বিবিধ মাছআলা-মাছায়েলের কিতাব সমূহ বিভিন্ন বিষয়ের ধর্মীয় পুস্তকাদী পবিত্র কোরআনের সূরা-আয়াত থেকে খালি নয় বরং এসব গ্রন্থ সমূহের স্থানে স্থানে কোরআন করিমের সূরা-আয়াত সমূহ লিখিত আছে তাই এ জাতীয় গ্রন্থ সমূহকে উক্ত নাপাকী অবস্থায় এবং বিনা অযুতে স্পর্শ করা মাকরূহে তাহরীমী।[১]

টীকা ঃ

(١) وَفِىْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ يَقْتَضِىْ اَنَّهُ لاَ يُرَخَّصُ بلاكم قَالُوْا يُكْرَهُ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيْرِ وَالْفِقْهِ وَالسُّنَنِ لِاَنَّهَا لاَ تَخْلُوْ مِنْ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ.......... وَفِىْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন কোন ফোকাহায়ে কেরামের মতে যেসব তাফছীর গ্রন্থে অন্যান্য কথা অপেক্ষা কোরআন করিমের আয়াতই অধিক সংখ্যায় লিখিত আছে, ঐ ধরনের তাফছীর গ্রন্থসমূহ উক্ত নাপাকী অবস্থায় এবং বিনা অযুতে স্পর্শ করা হারাম আর যদি কোরআনী আয়াত অপেক্ষা অন্য কথা বেশি থাকে তাহলে ঐ জাতীয় তাফছীর গ্রন্থসমূহ স্পর্শ করা মাক্রূহে তাহরীমী।

✪ মহান আল্লাহ-রাসূলের পবিত্র নাম সম্বলিত বই-পুস্তকের দ্বারা, বিজ্ঞাপন হ্যান্ডবিল দ্বারা বা কুরআন-হাদীস ও ফেকাহ ইত্যাদি লিখিত কাগজ-পত্রাদি দ্বারা কোন বস্তু জড়ানো বা বাঁধা সম্পূর্ণই হারাম। [গায়াতুল আওতার]। অথচ বর্তমানে অনেক দোকানদারদেরকে দেখা যায় যে, উনারা কোরআন করিমের সূরা-আয়াত-লিখিত বই এর পাতা দিয়ে তাদের বিক্রিত দ্রব্যসামগ্রী বেঁধে ক্রেতাদের কাছে হস্তান্তর করে। এটা সরাসরি আল্লাহর পবিত্র কালামের সাথে বেয়াদবীরই নামান্তর এবং ঈমান বিধ্বংসী আচরণ। তাই এ ব্যাপারে ঈমানের দাবীদারগণের সচেতন ও সতর্ক হওয়া একান্ত অপরিহার্য, আল্লাহ-রাসুল ও কোরআন-হাদীস লিখিত কাগজ-পত্রাদির ইজ্জত করা এবং অতি তাযীম ও যত্নসহকারে এর হেফাজত করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। [শামী–কবীরী]

✪ কোন কোরআন শরীফ তেলাওয়ত করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে তখন উহাকে একখণ্ড পাক-পবিত্র কাপড় জড়িয়ে লোকজনের যাতায়াত হয় না এমন একটি পাক-পবিত্র স্থানের মাটিতে গর্ত করতঃ পুতে ফেলা জরুরী।[১]

অথবা, বড় দিঘী নদী ও সমুদ্রের পানিতে ভালভাবে কাপড় মুড়িয়ে ভারী কোন ইট-পাথর ইত্যাদি বেঁধে ছেড়ে দেওয়া যায়। তবে প্রথম পদ্ধতিটাই উত্তম।

টীকা ঃ

اَلْخُلَاصَةِ يُكْرَهُ مَسُّ كُتُبِ الْاَحَادِيْثِ وَالْفِقْهِ لِلْمُحْدِثِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الْاَصَحُّ اَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَفِىْ شَرْحِ الدُّرَرِ وَ الْغُرَرِ وَرُخِّصَ الْمَسُّ بِالْيَدِ فِى الْكِتَابِ الشَّرْعِيَّةِ اِلَّا التَّفْسِيْرَ ذَكَرَهُ فِىْ جَمْعِ الْفَتَاوٰى وَغَيْرِهِ وَفِى السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ معزيا اِلَى الْحَوَاشِىْ اَلْمُسْتَحَبُّ اَنْ لَا يَاْخُذَ كُتُبَ الشَّرْعِيَّةِ بِالْكُمِّ اَيْضًا بَلْ يُجَدِّدُ الْوُضُوْءَ كُلَّمَا اَحْدَثَ وَهٰذَا اَقْرَبُ اِلَى التَّعْظِيْمِ ۔ (بحرالرايق)

(١) اَلْمُصْحَفُ اِذَا صَارَ كهنا اى عَتِيْقًا وَصَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَاءُ فِيْهِ وَخَافَ اَنْ يَضِيْعَ يَجْعَلُ فِىْ خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ يُدْفَنُ لِاَنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا مَاتَ يُدْفَنُ فَالْمُصْحَفُ اِذَا صَارَ كَذٰلِكَ كَانَ دَفْنُهُ اَفْضَلَ مِنْ وَضْعِهِ مَوْضِعًا يَخَافُ اَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ اَوْ نَحْوُ ذٰلِكَ (بحرالرائق)

✪ কোরআন করিম ও অন্যান্য দ্বীনী পুস্তকাদির দিকে পা টেনে বসা ও শোয়া তাযীমের খেলাপ।[২]

✪ মূল কোরআন গ্রন্থের উপর অন্য কোন কিতাব গ্রন্থাদি রাখা নাজায়েজ কিতাবাদী রাখার নিয়ম হল নিম্নরূপ ঃ

(১) সর্বনীচে লোগাত, নাহু-ছরফ-এর উপরে
(২) স্বপ্ন তাবীরের কিতাবাদী– এর উপরে
(৩) আকীদা বিষয়ক কিতাবাদী– এর উপরে,
(৪) ফেকাহ তথা শরীয়াতের মাছআলা-মছায়েলের কিতাবাদী– এর উপরে
(৫) হাদীস শরীফের কিতাবাদী– এর উপরে
(৬) কোরআন– হাদীস সম্বলিত নছিহতের কিতাবাদী– এর উপরে
(৭) তাফছীর শরীফ– সর্বোপরি
(৮) মূল কোরআন শরীফ।[১]

✪ ইয়াহুদী এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণকে কোরআন করিম স্পর্শ করতে দিবেনা। হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর ইহাই অভিমত, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ যেমন– হিন্দু, বৌদ্ধ, ইত্যাদির জন্যও এই একই হুকুম প্রযোজ্য (বাহরুর রায়েক)

এ জাতীয় কাফির-মুশরিকদেরকে যে ইচ্ছা করে আল্লাহর পবিত্র কোরআন স্পর্শ করতে দেবে সেই লোকই মারাত্মক ভাবে গুনাহগার হবে। (গায়াতুল আওতার)

টীকা ঃ

(١) مِنَ التَّعْظِيْمِ اَنْ لَا يَمُدَّ رِجْلَهُ اِلَى الْكِتَابِ (بحرالرائق)

(٢) وَفِى الْقِنْيَةِ اَللُّغَةُ وَالنَّحْوُ نَوْعٌ وَاحِدٌ فَيُوْضَعُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَالتَّعْبِيْرُ فَوْقَهُمَا وَالْكَلَامُ فَوْقَ ذٰلِكَ وَالْفِقْهُ فَوْقَ ذٰلِكَ وَالاَخْبَارُ وَالْمَوَاعِظُ وَالدَّعْوَاتُ الْمَرْوِيَّةُ فَوْقَ ذٰلِكَ وَالتَّفْسِيْرُ فَوْقَ ذٰلِكَ (بحرالرائق)

يُوْضَعُ النَّحْوُ ثُمَّ فَوْقَهُ التَّعْبِيْرُ ثُمَّ الْكَلَامُ ثُمَّ الْفِقْهُ ثُمَّ الْاَخْبَارُ (اَلْاَحَادِيْثُ) وَالْمَوَاعِظُ ثُمَّ التَّفْسِيْرُ .... م لغت كى كتابيں نحوكے ما تحت ہيں چنانچه قنيه ميں ہے اور مصحف كا ذكر نہيں كيا اس واسطے كه وه فوق الكل ہے (درمختار مع غاية الاوطار)

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মল-মূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে পালনীয় বিধানাবলী

মল-মূত্র ত্যাগের বেলায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি একজন মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকের অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত ঃ

✪ পশ্চিম দিক কিংবা পূর্বদিক তথা কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে অথবা কা'বা শরীফকে পিছে রেখে পায়খানা-পেশাব করতে বসা মাকরুহে তাহরীমী। ইহা একটি জঘন্যতম বেয়াদবী, যেদিকে মুখ করতঃ মহাপ্রভু আল্লাহ জল্লা শানুহুকে ছিজদা করা হয় সেদিকে মুখ করে বা উহাকে পিছে রেখে পায়খানা-পেশাব করতে বসাটা কত বড় মারাত্মক বেয়াদবী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[১]

✪ পবিত্র কা'বাঘর আমাদের পশ্চিমে বিধায় দক্ষিণ দিক কিংবা উত্তর দিকেই মুখ করে আমাদের কে মল-মূত্র ত্যাগ করতে বসা উচিত।

✪ রোগ-ব্যাধি ও অঙ্গ-ত্রুটির কারণে বসতে অক্ষম লোক ব্যতীত অন্যান্য সকলের জন্য দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ। (আলমগীরী, দুররে মোখতার)

✪ আংটি কিংবা হাত-গলায় পরিহিত কোন পাতে বা খোলা কাগজে আল্লাহ-রাসূলের পবিত্র নাম অথবা কোরআন পাকের কোন আয়াত, হাদীস পাকের কোন দোয়া লেখা থাকলে তা নিয়ে এমনিভাবে খোলা তাবিজাদি নিয়ে পেশাব-পায়খানা করতে বসা নিষেধ বরং ঐ সব খুলে রেখেই যাওয়া উচিত।

তবে খোলের মধ্যে আবদ্ধ তাবিজাদি নিয়ে পায়খানা-পেশাব করতে বসাটা জায়েয। (শামী, আলমগীরী)

✪ লোকজনের সামনে, জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায়, পথিকদের বিশ্রাম নেয়ার স্থানে, ফলদার ও ছায়াদার গাছের নিছে, দিঘী বা পুকুরের ব্যবহারের পানিতে, অযু-গোসলের ঘাটে, কবরস্থান ও উহার আশে-পাশে, মসজিদের আশ-পাশের যেখানে-সেখানে মল-মূল ত্যাগ করা নিষেধ। [দুররে মোখতার]

টীকা ঃ ১

اَلْحَنَفِيَّةُ : قَالُوْا يُكْرَهُ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ اَوْ اِسْتِدْبَارُهَا حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ مُطْلَقًا دَاخِلَ الْبِنَاءِ اَوِالْفَضَاءِ .... وَمِثْلَ الْبَوْلِ وَالتَّغَوُّطِ اَلْاِسْتِنْجَاءُ وَالْاِسْتِجْمَارُ فَاِنَّهُمَا مَكْرُوْهَانِ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ (مذاهب الاربعه)

✪ নির্দিষ্ট পায়খানাগৃহ ও পেশাবখানায় কিংবা পর্দা-বেড়া দ্বারা ঘেরাও কৃত নির্ধারিত জায়গায় অথবা বন-জঙ্গলের আড়ালে এভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করতে বসা উচিত যেন অপর লোকজন মল-মূত্র ত্যাগকারীর ছতর-লজ্জাস্থান দেখতে না পায়।

লোকজনের সামনে খোলা জায়গায় আড়ালবিহীন অবস্থায় মল-মূত্র ত্যাগ করতে বসা বাস্তবিকই লজ্জাহীন লোকদের কাজ।

আল্লাহর পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– প্রকাশ্য স্থানে নির্লজ্জভাবে যে ব্যক্তি মল-মূত্র ত্যাগ করতে বসে ফেরেশতাগণ ঐ লোকের জন্য বদ দোয়া করেন।

✪ খালি মাথায় পায়খানা-পেশাব করতে বসা মাকরূহ। তবে টুপির পরিবর্তে এমনকি টুপি মাথায় থাকলেও মাথায় গামছা-রুমাল-তোয়েল কিংবা অন্য কোন কাপড় জড়িয়েই মল-মূত্র ত্যাগ করতে বসা উত্তম। [দুররে মোখতার]

✪ পেশাব-পায়খানা করার সময় কতার্বাতা বলা, আলাপ আলোচনা করা মাকরূহ। তবে বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ শুধু কারও জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়া যায়।

✪ জমিনের কোন ছোট গর্তে কিংবা ছিদ্রপথে পেশাব করা নিষেধ। কারণ এসব থেকে বিষাক্ত কোন সাপ-বিচ্ছু বের হয়ে দংশন করার আশংকা থাকে।

[দুররে মোখতার, শামী]

✪ সরাসরি চন্দ্র-সূর্যের দিকে মুখ করে পেশাব করা মাকরূহ। এর দ্বারা মারাত্মক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

✪ পায়খানা-পেশাব করার সময় লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ঠিক নয়। এতে চোখের জ্যোতি কমে যাওয়ার ভয় রয়েছে। (আলমগীরী)

✪ পায়খানা করে বেশিক্ষণ দেরী করা ঠিক নয়, বেশিক্ষণ দেরী করলে অর্শ্বরোগ কিংবা কলিজা দরদ রোগ হতে পারে। [বাহ্রুর রায়েক, আলমগীরী, দুররে মোখতার]

✪ পায়খানা-পেশাবখানা ঘরে বসে মুখে উচ্চারণ করে কোন প্রকারের আয়াত সূরা, দোয়া-দরূদ পাঠ করা কিংবা আল্লাহ-রাসূলের নাম ইত্যাদি নেয়া নিষেধ।

✪ কারো সালামের জবাব দেয়া, আজানের জবাব দেয়া, আজান শেষের দরূদ-দোয়া পাঠ করা নিষেধ।

✪ নামাযের পরিধেয় কাপড় নিয়ে পায়খানা-পেশাব করা বৈধ হলেও অন্য কাপড় পরিধান করেই পেশাব পায়খানা করা মুস্তাহাব। অন্য কাপড় না থাকায় নামাযের কাপড় নিয়ে পায়খানা পেশাব করতে গেলেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী, যাতে নাপাকীর কোন কিছু কিংবা ব্যবহৃত পানির বেশি অংশ কাপড়-চোপড়ে না লাগে।

pdf By Syed Mostafa Sahib

✪ পায়খানা-পেশাবের মধ্যে নিজের থুথু ইত্যাদি ফেলা ঠিক নয়।

✪ পায়খানা-পেশাব করার জন্য নির্দিষ্ট ঘর থাকলে উহাতে প্রবেশের পূর্বে, এমনিভাবে পায়খানা ঘর ব্যতীত অন্যত্র মল-মূত্র ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পায়খানা করতে বসার আগে এবং গুপ্তাঙ্গের কাপড় অনাবৃত করার পূর্বেই নিম্নের দোয়াটি পাঠ করা সুন্নাত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ)

দোয়া পড়ার পর বাম পা প্রথমে দিয়েই পায়খানা ঘরে প্রবেশ করা লাগে।

পেশাব-পায়খানা শেষ হওয়ার পর ইস্তিঞ্জা তথা শৌচকর্ম সমাধা হলেই প্রথমে ডান পা দিয়ে পায়খানা-পেশাবখানা হতে বাহির হতে হয় এবং সাথে সাথে নিম্নের দোয়াখানা পাঠ করা সুন্নাত ঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

(গুফরানাকা আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আযহাবা আন্নীল আ'যা ওয়া আফানী)

✪ ইস্তিঞ্জা (শৌচকাজ)-এর নিয়মাবলী ঃ

মলমূত্র ত্যাগ করার পর মলদ্বারে জড়িত মল-মূত্র নালীর বাহিরের অগ্রমুখে লাগা অংশ এবং মূত্র নালীস্থ প্যাচে আটকানো মূত্র পানি ও ঢিলা কুলুখ-টয়লেট পেপার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিষ্কার করতঃ পবিত্রতা হাসিল করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় "ইস্তিঞ্জা" (শৌচকর্ম) বলা হয়।

সঠিক ভাবে ইস্তিঞ্জা (শৌচকর্ম) তথা পায়খানা-পেশাব হতে পবিত্র না হলে অযু-নামায ইত্যাদি কিছুই আদায় হবে না।

সুতরাং মল-মূত্র ত্যাগের পর অত্যন্ত সর্তকতা ও গুরুত্ব সহকারে ইস্তিঞ্জা (শৌচকর্ম) সমাধা করা একান্ত কর্তব্য।

✪ কতেক ওলামাগণের মতে শুধুমাত্র পানি দ্বারা ভাল করে শৌচকর্ম করেই পবিত্রতা লাভ করা যায়।

অপর কতেক ওলামার মতে পায়খানা-পেশাবের রাস্তা মুখে বেশি মল-মূত্র না জড়ালে পানি ছাড়া শুধু ঢিলা-পেপার দ্বারা রাস্তাদ্বয় মুছে নেয়ার মাধ্যমেও পবিত্রতা লাভ করা যায়।

তবে শরহে মুনিয়াতুল মুছাল্লী গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

اِنَّ الْاِسْتِنْجَاءَ مُطْلَقًا سُنَّةٌ لَا عَلٰى سَبِيْلِ التَّعْيِيْنِ مِنْ كَوْنِهٖ بِالْحَجَرِ اَوْ بِالْمَاءِ

✪ কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করাখা দরকার যে, পেশাব-পায়খানা করার

পর মলদ্বারে কিংবা মূত্রনালীর অগ্রমুখে যদি এক দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এর সমপরিমাণের চেয়ে বেশি মল-মূত্র জড়ায় তখন ঢিলা-পেপার ব্যবহারের পর পুনঃপানি দ্বারা উক্ত ময়লা ও ময়লা জড়ানো স্থান ধৌত করা ফরয।

দেরহাম (রৌপ্যমূদ্রা)-এর সম পরিমাণ মল-মূত্র লাগলে উক্ত নাপাকী ও এতদুভয় স্থান ধৌত করা ওয়াজিব। আর দেরহামের চেয়ে কম পরিমাণ মল মূত্র লাগলে উহা ধৌত করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (جامع الرموز)

✪ মল-মূত্র ত্যাগের পর মলদ্বার ও মূত্রনালীর অগ্রমুখের কোন পার্শ্বে মল/মূত্র লাগাটা দেখা না গেলেও ঢিলা-পেপার ব্যবহারসহ পানি দ্বারা ধৌত করা মুস্তাহাব।[১]

এরূপ ধৌত করা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব হবার কারণ হল ঃ মল-মূত্র বের হয়ে মলদ্বার ও মূত্র নালী মুখের চামড়ার সাথে যখন লাগে তখন শরীরের গরমে মল-মূত্রের ভিজা অংশ শরীরের চামড়ায় সঙ্গে সঙ্গে শোষণ করে নেয়।

শুধু মল-মূত্র কেন ভিজা যে কোন দ্রব্যই মানুষের শরীরে যখন লাগে সাথে সাথে উহার ভিজা অংশ শরীরে টেনে নেয়। মল-মূত্রের ব্যাপারেও একই অবস্থা, সুতরাং শুধু শুষ্ক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের দ্বারা সেই শোষিত অংশ পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মোটেই সম্ভব নয়, তাই মল-মূত্র ত্যাগ শেষে মলদ্বার ও মূত্রনালীর অগ্রমুখে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার সত্ত্বেও অবস্থাভেদে ধৌত করে নেয়া ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব করা হয়েছে। (তরিকুল ইসলাম)

উল্লেখিত বর্ণনার আলোকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হল যে, মল-মূত্র ত্যাগের পর ঢিলা-কুলুখ দ্বারা মলদ্বার ও পেশাবনালীর মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করতঃ পুনঃ পানি দ্বারা ধৌত করাটাই হচ্ছে ইস্তিঞ্জা শৌচকর্মের সুন্নাতী পন্থা।

টীকা ঃ

وَالْاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ اَفْضَلُ اِنْ اَمْكَنَهٗ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَاِنْ اِحْتَاجَ اِلٰى كَشْفِ الْعَوْرَةِ يَسْتَنْجِىْ بِالْحَجَرِ وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ـ قِيْلَ هُوَ سُنَّةٌ فِىْ زَمَانِنَا وَقِيْلَ عَلٰى الْاِطْلَاقِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى (عالمگيريه)

ثُمَّ الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْاَحْجَارِ اِنَّمَا يَجُوْزُ اِذَا اقْتَصَرَتِ النَّجَاسَةُ عَلٰى مَوْضَعِ الْحَدَثِ فَاَمَّا اِذَا تَعَدَّتْ مَوْضَعَهَا بِاَنْ جَاوَزَتِ الشَّرْجَ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ مَا جَاوَزَ مَوْضَعَ الشَّرْجِ مِنَ النَّجَاسَةِ اِذَا كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ يَفْتَرِضُ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ وَلَا يَكْفِيْهَا الْاِزَالَةُ بِالْاَحْجَارِ (عالمگيرى، كشف العروة)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ সাধারণ নিয়মে পেশাব করা শেষ হওয়ার পর মূত্রনালীস্থ প্যাচে আটকানো পেশাব সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ কয়েকবার কাঁশি অথবা গলা খাঁকার দিতে হয়। এতেও যদি মূত্রনালীস্থ আটকানো পেশাব সরে আসেনি বলে সন্দেহ থেকে যায়, তখন দাঁড়িয়ে উভয় রাণকে প্যাচ দিয়ে এদিক-ওদিক একটু নাড়া-চড়া দিতে হয়, যাতে পুরুষাঙ্গের প্যাচে আটকানো পেশাব অনায়াসে বের হয়ে আসে।

অতঃপর বসে পুরুষাঙ্গের নিম্নদিকস্থ নালীটি অণ্ডকোষের নিকট থেকে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ পর্যন্ত ২/১ বার আস্তে আস্তে দোহন করত আটকানো পেশাব বের করে আনার জন্য চেষ্টা করতে হয়। [শামী, আলমগীরী)]

এতে অন্ততঃ মূত্রনালীতে পেশাব আর আটকিয়ে নেই বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।

সবশেষে ডান হাত দ্বারা পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ভাল ভাবে ধুয়ে নিতে হয়।

✪ তবে এক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে পবিত্রতা হাসিল করার জন্য ঢিলা-কুলুখের ব্যবহারের পর পানি দ্বারা ধৌত করাটাই হচ্ছে সুন্নাতি তারিকা।

✪ শুকনা মাটির চাকা, কংকর, পাথরখণ্ড, অব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা, তুলা ও টয়লেট পেপার ইত্যাদি দ্বারা কুলুখ নেয়া জায়েয।

✪ হাড়, শুক্না চামড়ার টুকরা, ব্যবহৃত কাপড়, লিখিত কাগজের টুকরা এবং কয়লা ইত্যাদি কুলুখরূপে ব্যবহার করা মাকরূহ। তাছাড়া কোন প্রকার খাদ্য-দ্রব্যাদি দ্বারা কুলুখ নেয়া হারাম।

✪ একটি মাত্র কুলুখ দ্বারা পরিষ্কার হওয়া গেলেএকটিতেই সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। তবে তিনটি কুলুখ ব্যবহার করাই মুস্তাহাব।

✪ পেশাব করার পর কাশি কিংবা গলা খাঁকার দিয়ে বাম হাতে প্রথম কুলুখটি নিয়ে পেশাব ভালভাবে মুছে নেয়ার পর কুলুখটি পুরুষাঙ্গের মুখে ধরে রাখতে হয়। অতঃপর উভয় রাণেপ্যাচ দিয়ে একটু এদিক ওদিক মোচড় দিতে হয়। সম্ভব-সুযোগ হলে ১০/২০ কদম হাটা-হাটি করতে হয়। বিশ কদম হাটাটাই উত্তম।

তবে এ হাটা-পদচারণা করাটা সংরক্ষিত ঘর কিংবা নির্জনস্থানে লোকদের অগোচরেই করতে হবে, নতুবা নয়। কারণ জনবহুল স্থানে, খোলামেলা জায়গায় লোকজনের সম্মুখে পুরুষাঙ্গে ঢিলা ধরে রাখা অবস্থায় হাটা-হাটি করা মোটেই শোভনীয় নয়। বরং এতে লজ্জাহীনতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এরপর প্রথম কুলুখটি ফেলে দিয়ে বসে যেতে হয়, এ বসা অবস্থায় পুরুষাঙ্গ দোহন করতঃ দ্বিতীয় কুলুখ দ্বারা পুরুষাঙ্গের অগ্রমুখ পুনঃ মুছে নিতে হয়। এভাবে তৃতীয় কুলুখটিও ব্যবহার করতে হয়।

✪ এমনিভাবে পায়খানা করার পরেও তিনটি কুলুখ ব্যবহার করা লাগে।

গ্রীষ্মকালে পুরুষদেরকে প্রথম কুলুখটি মলদ্বারের সামনের দিক থেকে টেনে নিয়ে পিছন দিকে শেষ করতে হয়, দ্বিতীয় কুলুখটি পিছন দিক থেকে টেনে এনে সামনের দিকে শেষ করতে হয়। তৃতীয় কুলুখটিও প্রথম কুলুখের ন্যায় সামনের দিক থেকে টেনে নিয়ে পিছন দিকে শেষ করতে হয়।

শীতকালে প্রথম কুলুখটি পিছন দিক হতে সামনের দিকে টেনে এনে শেষ করতে হয়, দ্বিতীয় কুলুখটি সামনের দিক থেকে পিছন দিকে টেনে নিয়ে শেষ করা লাগে, তৃতীয় কুলুখটি ও প্রথমটির ন্যায় পিছন দিক হতে সামনের দিকে টেনে এনে শেষ করতে হয়।

✪ পায়খানা করার পর মেয়েলোকদেরও কুলুখ লওয়া সুন্নাত এবং সকল মওসুমেই মেয়েলোকদেরকে প্রথম ও তৃতীয় কুলুখটি সামনের দিক থেকে পিছন দিকে টেনে নিয়ে শেষ করতে হয়। আর মধ্যম কুলুখটি পিছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে এনে শেষ করতে হয়।

কুলুখ ব্যবহারের পর পানি দ্বারা ধৌত করার মাছআলা ঃ

✪ মল-মূত্র ত্যাগ শেষে সম্ভব-সুযোগ হলে পায়খানা-পেশাবের স্থান হতে সামান্য তফাতে সরে গিয়ে বসা উত্তম। প্রথমে পেশাবনালী ২/১ বার দোহন করতঃ উপরে উল্লেখিত নিয়মে মলদ্বারে কুলুখ ব্যবহারের কাজ শেষ করতে হয়। অতঃপর দু'হাত ধুয়ে নেয়া সুন্নাত, এরপর পেশাব লিঙ্গের কুলুখের ব্যবহার ইতি পূর্বে অত্র অধ্যায়ে উল্লেখিত নিয়মে সামাধা করতে হয়। পরিশেষে প্রথমে পেশাবলিঙ্গ ধুয়ে নিতে হয়। তারপরই মলদ্বারা ধৌত করতে হয়।

✪ উভয় স্থান কমপক্ষে ৩ বার বেশিতে ৯ বার পর্যন্ত ধুতে হয়। কারও কারও মতে মলদ্বার খড়-খড়িয়া না হওয়া পর্যন্ত ধৌত করা লাগে, তাতে যতবারই ধৌত করার প্রয়োজন হউক না কেন।

✪ (বাম হাতের) কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা এ তিন অঙ্গুলীকে আড়াআড়ি ভাবে মিলিয়ে আঙ্গুলির পেট দ্বারা আস্তে আস্তে মলে মলে পানি ঢেলে ধৌত করতে হয়।

অতঃপর রুমাল-নেকড়া ও গামছা ইত্যাদি দ্বারা মলদ্বার ও পুরুষাঙ্গ ভালরূপে মুছে নিতে হয়, যাতে উভয় স্থানের ময়লা ধৌয়ার পানি বিন্দুমাত্র ও লেগে না থাকে।

শৌচ তথা পানি দ্বারা ধৌয়ার কাজ সমাধা হলে পুনঃ দু'হাত পাক পবিত্র মাটি পাওয়া গেলে মাটিতে ঘষে মলে, অন্যথায় সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করতঃ তিনবার ধুয়ে নিতে হয় এবং ইহাও সুন্নাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হায়য ও নেফাছের মাছায়েল

✪ প্রতি মাসে বালেগা (বয়োঃপ্রাপ্ত) মেয়েদের জরায়ু হতে যৌনাঙ্গ দিয়ে রোগ ও গর্ভাবস্থা ব্যতীত নির্দিষ্ট দিন সমূহে স্বাভাবিক নিয়মে যে রক্তস্রাব হয়ে থাকে উহাকে "হায়য (ঋতুস্রাব)" বলা হয়। (বদায়েউচ্ছনায়ে, আলমগীরী)

✪ সন্তান প্রসবের মুহূর্ত হতে স্ত্রীলোকদের যে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়, একে "নেফাছ" বলা হয়।[১]

✪ হায়যের রং ছয় প্রকার, যথা— লাল, কাল, সবুজ,হলুদে, ধুসর ও ধুমেল।

✪ পবিত্র কোরআন ও হাদীসে এসব রক্তকে নাপাক অপবিত্র রূপে বলা হয়েছে।

✪ আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশের মেয়েদের বিভিন্ন বয়সে "হায়য" হয়ে থাকে। কোন দেশে ৯ বছর বয়সে, কোনদেশে ১০/১১ বৎসর বয়সে আবার কোন কোন দেশে ১৫/১৬ বৎসর বয়সে ও হায়য হয়ে থাকে। আমাদের দেশের মেয়েদের সাধারণতঃ ১১/১২ বৎসর বয়সেই হায়য হয়ে থাকে।

যা হউক এ তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী শরীয়াত মেয়েদের হায়য হওয়ার ব্যাপারে একটা বয়স সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে ঃ

উহা হচ্ছে ৯ বৎসর বয়স থেকে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের হায়য হওয়ার সময়। তাই নয় বৎসর বয়সের আগে কোন মেয়ে লোকের রক্তস্রাব হলে উহাকে হায়য বলা যাবে না বরং উহাকে "ইস্তেহাজা" তথা স্ত্রীরোগ রূপে গণ্য করা হবে। (আলমগীরী)

✪ সাধারণতঃ হায়য জারী থাকার শেষ বয়স সীমা হচ্ছে ৫০ বৎসর, কোন কোন ফোকাহায়ে কেরামের মতে ৫৫ বৎসর পর্যন্ত জারী থাকে (শামী)।

কিন্তু ৫৫ বৎসর বয়সের পরেও যদি কোন মেয়েলোকের লাল কিংবা গাঢ় কাল বর্ণের রক্ত-স্রাব নিয়মিত ৬০ বৎসর পর্যন্ত হতে থাকে তখন উহাকেও হায়য রূপে গণ্য করা হবে।

৬০ বৎসরের পরের যে কোন বর্ণের রক্তস্রাবকে ইস্তেহাজা (রোগ) রূপে গণ্য করা হবে।

টীকা ঃ

وَاَمَّا النِّفَاسُ فَهُوَ فِىْ عُرْفِ الشَّرْعِ اِسْمٌ لِلدَّمِ الْخَارِجِ مِنَ الرَّحِمِ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ فَاَقَلُّهُ غَيْرُ مِقْدَارٍ بِلَا خِلَافٍ وَاَمَّا اَكْثَرُ النِّفَاسِ فَاَرْبَعُوْنَ يَوْمًا عِنْدَ اَصْحَابِنَا (بدائع الصنائع)

✪ হায়যের নিম্নতম মুদ্দাত তথা সময়কাল কমপক্ষে পূর্ণ তিনদিন ও তিন রাত, আর সর্বোচ্চ মুদ্দাত পূর্ণ দশদিন ও দশরাত।

✪ দু' হায়জের মাঝখানে মেয়েলোকেরা পনরদিন পাক অবস্থায় থাকে, বেশি দিন পাক থাকার সম্ভাবনাও আছে। (শামী) দু'হায়জের মধ্যবর্তী সময়ে এ পাক থাকাকে শরীয়াতের পরিভাষায় ত্বোহ্‌র বলা হয়। তিনদিন তিন রাতের কম ও দশদিন দশরাতের বেশি রক্তস্রাব হলে উহাকে ইস্তেহাজা তথা স্ত্রীরোগ রূপে ধরে নিতে হবে।

✪ নেফাসের রক্তস্রাব চালু থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশদিন ও চল্লিশরাত। নিম্নতম মুদ্দতের কোন সীমা নাই। চল্লিশ দিনের বেশি সময় ধরে কারো রক্তস্রাব হতে থাকলে চল্লিশদিনের অতিরিক্তটাকে ইস্তেহাজা হিসাবে গণ্য করে নিতে হবে।

✪ কোন কোন মেয়েলোকের হায়য প্রতি মাসে একই নিয়মে হয়ে থাকে। আবার অনেকের একই নিয়মে হয় না।

কোন কোন স্ত্রীলোকের দশদিনের ভিতর কোন এক নির্দিষ্ট দিনে হায়যের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়াটা অভ্যাস বা নিয়মে পরিণত হয়। অর্থাৎ হায়য আরম্ভ হওয়ার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ৭ম, ৮ম, ৯ম কিংবা ১০ম দিনসমূহের যে নির্দিষ্ট দিনে যে মেয়েলোক প্রতি মাসে হায়য হতে পাক হয় ঐ নির্দিষ্ট দিনই সে মেয়েলোকের জন্য হায়য বন্ধ হওয়ার অভ্যস্থ নিয়মের দিন রূপে গণ্য করা হবে।

✪ যেমন— কোন মেয়েলোকের সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে তিনদিন রক্তস্রাব হয়ে থাকে। তিনদিন পর প্রত্যেক মাসে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এ আলোকে ঐ মেয়েলোকের হায়য হওয়ার সময়সীমা তিন দিনই ধরে নিতে হবে এবং এটাই তার অভ্যাস।

✪ কোন মেয়েলোকের মাসে তিনদিন কিংবা পাঁচ দিন করে হায়য হওয়ার নিয়ম রয়েছে, কিন্তু কোন একমাসে এসে ৮/৯ দিন পর্যন্ত তার রক্তস্রাব হয়ে বসল। এমতবস্থায় এ ৮/৯ দিনকেই তার হায়য ধরে নিবে এবং মনে করতে হবে যে, তার পূর্বের নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে, কারণ মাঝে-মধ্যে অভ্যাসের এরূপ পরিবর্তন হয়ে থাকে। কিন্তু দশদিনের বেশি সময় ধরে রক্তস্রাব হতে থাকলে পূর্বের নিয়মানুসারে ৩ কি ৫ দিনকেই হায়য ধরে বাকী দিনগুলোকে ইস্তেহাজা তথা রোগ রূপে মেনে নিতে হবে।

✪ যে মেয়ে মানুষের হায়য হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের কোন অভ্যাস-নিয়ম নাই বরং কোন মাসে তিন দিন কোন মাসে পাঁচ দিন কোন মাসে ৭/৮ দিন ধরে হায়য-রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এরূপ অনিয়মিত অবস্থায় যে মাসে যে কয়দিন রক্তস্রাব দেখবে সে কয়দিনকেই তার হায়যের দিনরূপে গণ্য করে নিবে।

✪ এভাবে যদি স্ত্রীলোকের নেফাছের রক্ত ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫ দিন অর্থাৎ ৪০ দিনের মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার নিয়ম চলে আসতে থাকে। তাহলে ঐ নির্দিষ্ট নিয়মের দিবসে তার নেফাছ শেষ হয়েছে বলে ধরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিতে হবে। যদি কোন একবার ঐ নির্দিষ্ট নিয়মের দিন অতিক্রান্ত করে ৪০ দিনের ভিতর যে কোন দিন পর্যন্ত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। তাহলে নিয়মের ঐ অতিরিক্ত দিনগুলোকেও নেফাছের মধ্যে গণ্য করে নিতে হবে।

আর যদি তার অভ্যাসের নির্ধারিত দিন অতিক্রান্ত হয়ে তা ৪০ দিনের বেশি সময় ধরে নেফাছের রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে তার পূর্বের নির্ধারিত নিয়মের দিনগুলোকে নেফাছের সময় গণ্য করতঃ অতিরিক্ত দিনগুলোকে ইস্তেহাজা তথা রোগ-ব্যাধি রূপেই ধরে নিতে হবে।

✪ হায়য-নেফাছের রক্তসমূহ যাতে শরীর কিংবা কাপড়ে না লাগে তজ্জন্য কাপড়ের ভাজ করা পুটুলী, কিংবা রেডিমেড মেডিকেটেড তুলা ইত্যাদি লজ্জাস্থানের মুখে রেখে এর উপরে একখানা লেংটি পরতে হয় এবং মাঝে-মধ্যে উহা পরিবর্তন করতঃ নুতনভাবে পুনঃ লাগাতে হয়।

✪ হায়য-নেফাছের হুকুম ঃ

✪ হায়য-নেফাছ মেয়েলোকদের প্রকৃতিগত একটি নাপাকী অবস্থা। তাই হায়য-নেফাছ ওয়ালী (ঋতুবতী) স্ত্রীলোকদের জন্য যে কোন প্রকারের নামায পড়া এবং রোযা রাখা সম্পূর্ণই হারাম। [আলমগীরী]

উভয় প্রকারের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোছল করার মাধ্যমে পাক-পবিত্র হলে ঐ ছুটে যাওয়া রোযা সমূহের কাযা আদায় করে দিতে হবে। [আলমগীরী] কিন্তু ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় করা লাগবে না। আল্লাহ তাআলা বন্দার প্রতি দয়াবান হয়ে হায়য-নেফাছের সময়ের ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় করাকে মাফ করে দিয়েছেন, অনুরূপ হায়য-নেফাছওয়ালী মহিলা কোরআন শরীফের ছিজদার আয়াত শুনতে পেলে তার উপর তেলাওয়াতে ছিজদা ওয়াজিব হবে না। [আলমগীরী]

হায়য-নেফাছের অবস্থায় মেয়েলোকদের জন্য কোরআন করিম স্পর্শ করা হারাম। অনুরূপ কোরআন শরীফ স্পর্শ করতঃ দেখে দেখে কিংবা মুখস্থ তেলাওয়াত করাও হারাম। কিন্তু দোয়ার নিয়তে কোরআন করিমের আয়াত-সূরাসমূহ মুখস্থ পড়া জায়েয।

✪ হায়য-নেফাছ এর অবস্থায় কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা হারাম। তদ্রূপ হায়য-নেফাছ বা এরূপ অন্য কোন কারণে যাদের উপর গোছল ফরয হয়, গুরুতর কোন প্রয়োজন ব্যতীত তাদের মছজিদে প্রবেশ করাও হারাম। [আলমগীরী]

✪ এ উভয় অবস্থায় স্বামীর সাথে সহবাস করা এমনকি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর নাভির নিম্নে ও হাটুর উপরি ভাগে কোন প্রকারের স্পর্শ করাও হারাম।

কিন্তু হাঁ তার সাথে তার স্বামীর একই বিছানায় শয়ন করা, স্পর্শ ও চুম্বন ইত্যাদি জায়েয। স্বামী এবং অন্যান্য সকলের সাথে হায়য-নেফাছ ওয়ালা মেয়ে লোকের উঠা বসা করা, তার হাতের রান্না খাওয়া, একত্রে পানাহার করা সবই জায়েয।(আলমগীরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ হায়য-নেফাছ অবস্থায় যাবতীয় দোয়া ও তাছবীহ্ তাহলীল্ পড়া জায়েয।

✪ হায়য-নেফাছওয়ালী মেয়েলোক প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে অযু করতঃ কেবলামুখী হয়ে বসে বসে তাছবীহ-তাহলিল পাঠ করবে। তার জন্য ইহা মুস্তাহাব। বিশেষতঃ ৭০ বার আছতাগফিরুল্লাহ— শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে অপরিসীম সওয়াব পাওয়া যায়। [আলমগীরী]

✪ হায়য-নেফাছ এর রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে গোছল করে পবিত্র হওয়া ফরয। (শামী)

✪ হায়য-নেফাছের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তাড়াতাড়ি গোছল করে নিয়ে পাক-পবিত্র হয়ে নামায আদায় করা জরুরী।

রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর অলসতা বশতঃ গোছল না করে বসে থাকতে থাকতে যদি একটি ওয়াক্তের নামাযও কাযা হয়ে যায়, এর জন্য অবশ্যই সে মেয়েলোক গুনাহ্গার হয়ে পড়বে এবং গোছলের পর এ ছুটে যাওয়া নামায কাযা আদায় করে দিতে হবে।

✪ নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সামান্য পূর্বে তথা নিয়তকরতঃ তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারার মত সময় থাকতে যদি হায়য-নেফাছের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে পড়ে তাহলে তাড়াতাড়ি গোছল করতঃ সেই ওয়াক্তের নামায পড়ে নিতে হবে। আর তখন যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার দরুন নামায আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে এর কাযা আদায় করে দিতে হবে।

✪ কোন নামাযের শেষ ওয়াক্তে যদি কোন মেয়েলোকের হায়জের রক্তস্রাব আরম্ভ হয়, এমতবস্থায় সে যদি ঐ ওয়াক্তের নামায না পড়ে থাকে, তাহলে উক্ত ওয়াক্তের নামায তার উপর থেকে মাফ হয়ে যাবে। (শামী)

✪ কোন মেয়েলোকের নাভি ফেটে যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে শরীরের অন্যান্য ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার যে হুকুম, এক্ষেত্রেও ঐ একই হুকুম প্রয়োজ্য হবে। অর্থাৎ নামায-রোযা ইত্যাদি নিয়মিত আদায় করে যেতে হবে। নেফাছের হুকুম তার জন্য প্রযোজ্য হবে না।

কিন্তু নাভির দিক দিয়ে সন্তান বের হওয়ার পর পর ঐ মেয়েলোকের লজ্জাস্থান দিয়েও যদি রক্তস্রাব হয় শুধু তখনই উহাকে নেফাছ রূপে গণ্য করা হবে এবং নেফাছের হুকুম প্রযোজ্য হবে। [আলমগীরী]

এ ভিত্তিতে বর্তমানে যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মহিলাদের পেট কেটে সন্তান প্রসব করানো হয়, এর হুকুমও অন্যান্য সাধারণ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার হুকুমের মতই, অর্থাৎ এ অবস্থায় উক্ত মহিলার হুঁশ-জ্ঞান বহাল থাকলে নিয়মমত যথাসম্ভব নামায-রোযা ইত্যাদি আদায় করে যেতে হয়। সে সময়ে করতে না পারলে পরে কাযা হিসাবে আদায় করে দিতে হবে।

হাঁ-যদি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পর সাথে সাথে ঐ মেয়ে লোকের

লজ্জাস্থান দিয়েও রক্ত বের হতে থাকে, তখনই শুধু একে নেফাছ রূপে গণ্য করা হবে এবং নেফাছের যে হুকুম- এ ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে। বর্তমানের অনেক আলেমদের ইহাই অভিমত। তাহ্‌কীকের মাধ্যমে যদি এর বিপরীত প্রমাণ করা যায়, তাহলে সেভাবেই আমল করা যাবে।

✪ ইস্তেহাজার মাছায়েল ঃ

✪ মেয়েলোকদের গুপ্তাঙ্গের ভিতর অংশের একটি শিরা-রগ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে যে রক্তস্রাব হয়, একে ইস্তেহাজা বলা হয়। ইহা এক প্রকারের রোগ, হায়জের স্রাবে গন্ধ আছে। ইস্তেহাজার স্রাবে গন্ধ নাই। (শামী)

✪ ইস্তেহাজা রোগবিশিষ্ট মেয়েলোকদের ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুম এযে, তারা প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে নিজ লজ্জাস্থান ধৌত করতঃ নূতন নূতন অযু করেই নামায আদায় করে যাবে। কোরআন করিমের তেলাওয়াত এবং তাছবীহ-তাহলীল ও দোয়া-দরূদ সব পাঠ করতে পারবে। স্ত্রী সহবাসও করতে পারবে।

স্বাভাবিক অবস্থা ও ইস্তেহাজার মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এবং অযু দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করা যায় কিন্তু ইস্তেহাজা রোগবিশিষ্ট মেয়েলোকদের জন্য প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায ও তেলাওয়াতে কোরআনের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নূতন অযু করা জরুরী। (শামী)

✪ **সর্তক বাণী ঃ** প্রতিটি স্ত্রীলোকের উপর নেফাছ সম্পর্কিত শরীয়াতের প্রয়োজনীয় মাছআলা সমূহ জানা থাকা একান্ত দরকার। তদুপরি প্রতি মাসের হায়েজ ও প্রতিবারের নেফাছ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার দিন/তারিখের যথাযথ হিসাব রাখাটাও একান্ত ভাবে উচিত যাতে শরীয়াতের নিয়ম অনুযায়ী আমল করা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পবিত্রতা অর্জনের উপকরণসমূহের বর্ণনা

পবিত্র কোরআন ও হাদিস এর ভাষ্য অনুযায়ী দুটি বস্তু দ্বারা নাজাছাত নাপাকী তথা অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্রতা লাভ করা যায়, প্রথমতঃ পানি, দ্বিতীয়তঃ মাটি।

তবে বিভিন্ন প্রকারের নাপাকী থেকে শরীর ও পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি পাক-পবিত্র করার বেলায় পানিই হচ্ছে প্রধান উপকরণ। তাই পানি পাক পরিষ্কার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অপবিত্র পানি দ্বারা কোন কিছু ধৌত করলে তাতো পাক হবেইনা বরং অপবিত্র পানি যোগ হয়ে নাপাকির মাত্রা আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং পানির পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্পর্কে মোটামুটি একটা সাধারণ অবগতি থাকা একান্তই দরকার।

✪ পানি দু'প্রকার। যথা- (১) মা-এ মাত্‌লাক্ ও (২) মা-এ মুকাইয়্যেদ।

✪ **মাত্‌লাক্ পানি ঃ** সাধারণ আলোচনায় কোন বিশেষ গুণবাচক নামে অভিহিত না করে যাকে পানি রূপে লোকেরা বুঝে থাকে-তাকে "মাতলাক পানি" বলা হয়। যেমন— সমুদ্র, নদ-নদী, হ্রদ, খাল-বড় বিল, দিঘী, বড় পুকুর, প্রবাহমান ঝর্ণা ও বৃষ্টি ইত্যাদির পানি। এসব পানি পাক-পবিত্র রূপেই গণ্য এবং ইহা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

✪ **মুকাইয়্যেদ পানি ঃ** আর যা দেখতে পানিরই মত কিন্তু সাধারণ আলাপ-ব্যবহারে সাধারণতঃ এসবকে পানি বলা হয় না বরং অন্যান্য নামে অভিহিত করা হয় তখন এসব পানিকে মুকাইয়্যেদ পানি বলা হয় ঃ যেমন— পানির সাথে কোন বস্তু মিশ্রিত হবার পর উহার তরলতা থাকা সত্ত্বেও ঐসবকে পানি বলা হয় না। যথা- গোলাপজল, শরবৎ, তরকারীর ঝোল, সিরকা, কেউড়ার পানি, সোড়া পানি, সেভেন-আপ ও স্প্রাইট ইত্যাদি। এমনি ভাবে গাছ নিংড়ানো কিংবা বিভিন্ন ফল নিংড়ানো নির্যাস। যথা- তরমুজের রস, আঁখের রস, কমলা লেবুর রস ইত্যাদি।

এসব পানি নিজে পাক-পরিষ্কার হলেও এসব দ্বারা নাজাছাতে হুক্‌মী হতে পবিত্রতা লাভ অর্থাৎ অযু-গোছল করলে শুদ্ধ হবে না। পেশাব- পায়খানা জাতীয় নাপাকী থেকে পবিত্রতা লাভ করা যায়।

✪ মাত্‌লাক পানি পুনঃ দু'প্রকার। যথা—(১) জারি (প্রবহমান) পানি,
(২) আবদ্ধ পানি।

✪ **প্রবাহমান পানি ঃ** যেমন- সমুদ্র, নদী, খাল ও প্রবাহমান ঝরণা ইত্যাদির পানি-যা সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকে।

✪ **আবদ্ধ পানি ঃ** ইহা পুনঃ দুপ্রকার- (১) মা-এ কাছীর (প্রচুর আবদ্ধ পানি) ও (২) মা-এ কালীল (স্বল্প আবদ্ধ পানি)।

✪ মা-এ কাছীর (প্রচুর আবদ্ধ পানি) ঃ

ইমাম আযম (র) -এর মতে, যার এক প্রান্তে পানিকে নাড়া দিলে তার অপর প্রান্তের পানি নড়ে না, তাকেই মা-এ কাছীর [প্রচুর আবদ্ধ পানি] বলা হয়। কিংবা একপ্রান্তে নাপাকী পতিত হলে তার অপর প্রান্তে এর প্রভাব-চিহ্ন পৌছেনা—একেই মা-এ কাছীর বলা হয়। যেমন— দিঘী, বড় পুকুর এবং ঐরূপ বড় হাউজ যার দৈর্ঘ-প্রস্থ যথাক্রমে ১০ × ১০ হাতের কম নয় এবং যার গভীরতা অন্ততঃ এ পরিমাণ হয়, যা থেকে আঁচল ভরে পানি উঠালে নীচের কাদা-ময়লা উঠে পানি ঘোলা হয়ে যায় না, যাকে ফেকাহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় "দাহ্‌দরদাহ্" হাউজ বলা হায়।

✪ প্রবাহমান [প্রচুর] পানির হুকুম ঃ

যেমন সমুদ্র, নদী-খাল ও ঝরণা ইত্যাদির প্রবাহমান পানিসমূহ সাধারণতঃ পাক পানিরূপেই গণ্য। এতে অযু গোছল বিনা দ্বিধায় জায়েয।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এছাড়া এ জাতীয় পানিতে কোন প্রকার নাজাছাত্-নাপাকী পতিত হলে ও সহজে অপবিত্র হয়ে পড়ে না, কারণ এসবের পানি সর্বদা প্রবহমান থাকে বিধায় এসব পানিতে কোন নাপাক বস্তু কিংবা ময়লা জমে থাকতে পারেনা। তাই এতে নাপাকী পড়ার পরও এর দ্বারা অযু-গোছল সবই ছহীহ-শুদ্ধ হয়ে থাকে।

✪ **আবদ্ধ প্রচুর পানির হুকুম ঃ**

যেমন দিঘী, বড় পুকুর কিংবা বড় হাউজ যা "দাহ্দরদাহ" পরিমাপের বা এর চেয়ে আরও বড়মাপের হয়ে থাকে। এসব পানিও পাক-পবিত্র রূপে গণ্য। এসবের পানি যদিও প্রবাহিত নয় তবুও এতে নাজাছাত নাপাকী পতিত হলে প্রবাহমান প্রচুর পানিরই অনুরূপ সহজে ইহা নাপাক হয়ে যায় না। কারণ পানির পরিমাণ বেশি হওয়ার ফলে অত্র পানিতে সহসা নাপাকী প্রভাব ফেলতে পারে না।

এ হিসাবে এতে যদি এ ধরনের নাজাছাত পড়ে; যা পতিত হওয়ার পর দেখা যায় না, যেমন— প্রবাহিত রক্ত, পেশাব, মদ-শরাব ইত্যাদি। তখনও উক্ত পানিতে চর্তুদিকে অযু-গোছল করা যায়। আর যদি এরূপ পানিতে এমন ধরনের কোন নাজাছাত পড়ে যা পড়ার পর দেখা যায়, যেমন— মরা কুকুর-শৃগাল ইত্যাদি। তখন যে স্থলে নাপাক পড়ে রয়েছে, সে স্থল থেকে ৩/৪ হাত সরে গিয়ে কিংবা অন্য পারে গিয়ে উক্ত পানিতে অযু-গোছল করা জায়েয।

✪ তবে হাঁ উপরে উল্লেখিত উভয় প্রকারের পানি সমূহের মধ্যে অপবিত্র-ময়লা-নাপাকী পড়তে পড়তে যদি পানির স্বাভাবিক গুণাবলী সমূহ তথা রং-গন্ধ ও স্বাদ এ তিনটি গুণের যে কোন একটি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পানি হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে তখন ঐ সব পানি আর পাক থাকে না বরং নাপাক হয়ে যায় এবং তখন ঐ পানি দ্বারা আর অযু-গোছল করতঃ পাক-পবিত্রতা হাছেল করাও যায় না।

✪ **আবদ্ধ স্বল্প পানি ঃ** যেমন— ছোট পুকুর, গর্ত, কূপ, "দাহদরদাহ" পরিমাপের চেয়ে ছোট মাপের হাউজ, বড় মাটির পাত্র, ড্রাম, বালতি, গামলা ইত্যাদির পানি। এসব পানিতে যে কোন প্রকারের নাপাকী পতিত হউক বেশি হউক বা একেবারেই সামান্য পরিমাণে হউক, নাপাকী পড়ার পর দেখা যাক আর না যাক, পানির গুণাবলী সমূহের যে কোন একটি গুণ তথা ঘনত্ব রং ও স্বাদ নষ্ট হোক বা নাই হোক সামান্য নাপাকী পড়ার সাথে সাথে এ সব পাত্রের সমুদয় পানি নাপাক হয়ে যাবে।

✪ আর আবদ্ধ-প্রচুরপানিতে যদি (নাপাক বস্তু নয় বরং) পাক বস্তু কিংবা গাছের পাতা ইত্যাদি পড়তে পড়তে পানির তিন গুণের দু'টি গুণ তথা রং ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু পানির তরলতা বহাল থাকে, তাহলে সে অবস্থাতেও উক্ত পানি সমূহ না পাক হয় না। হাঁ রং ও স্বাদের সাথে সাথে যদি পানি অতিশয় গাঢ় হয়ে যাওয়ার দরুন পানির তরলতাও নষ্ট হয়ে যায় সে সময় উক্ত পানি আর পাক রূপে গণ্য হবে না। সুতরাং এর দ্বারা অযু-গোছল করতঃ পবিত্রতা অর্জন করাও জায়েয নয়। মাটি মিশ্রিত পানির একই হুকুম।

✪ **মা-এ মুছ্তা'মাল্ [ব্যবহৃত পানি] ঃ**

যে সব পানি দ্বারা নাপাকী থেকে পাক হওয়ার জন্য অযু-গোছল করা হয়েছে কিংবা অযু থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নতুন অযু করা হয়েছে ঐ সব পানিকে মা-এ মুছ্তামাল্ [ব্যবহৃত পানি] বলা হয়।

এরূপ ব্যবহৃত পানি দ্বারা অযু গোছল করা জায়েয নাই। উক্ত পানি পান করা কিংবা তরি তরকারিতে ব্যবহার করাও মাকরূহ। তবে উক্ত পানি দ্বারা নাজাছাতে হাকীকী থেকে পবিত্রতা লাভ করা যায়। [দুররে মুখতার, শামী, আলমগীরী]

✪ সাধারণ বৃষ্টির পানি পবিত্র-ই তবে তা যদি কোন নাপাক জায়গায় পড়ে জমা হয় তখন উহা নাপাক রূপেই গণ্য হবে।

✪ মাছ, ব্যাঙ, কাকড়া ও কচ্ছপ ইত্যাদি জীব যাদের পানিতেই জন্ম এবং উহারা সাধারণতঃ পানিতেই বাস করে, এগুলোর কোন একটি কূপ কিংবা ছোট পুকুরের পানিতে মরে থাকলেও পানি নাপাক হয়ে যায় না, তবে হা ঐ পানি পান করা মাকরূহ।

✪ যে সব প্রাণীতে প্রবাহিত রক্ত নাই যেমন— মশা, মাছি, পিপড়া ছারপোকা কিংবা এজাতীয় কোন কীট-পতঙ্গ অল্প-সংরক্ষিত পানিতে পড়লে কিংবা মরে থাকলেও পানি নাপাক হয়ে যায় না।

✪ সকল মানুষের মুখ দেওয়া (উচ্ছিষ্ট) পানি বা অন্য বস্তু পাক-পবিত্র রূপেই গণ্য। চাই সে লোক যে কেউই হোক। তবে কারো হাত কিংবা মুখে কোন নাপাক বস্তু লেগে থাকা অবস্থায় যদি সে পানি কিংবা অন্যকোন বস্তুতে মুখ-হাত দিয়ে ঝুটা করে ফেলে তখন উক্ত পানি কিংবা বস্তু নিশ্চয় নাপাক হয়ে যাবে। যেমন— শরাব-মদ পানকারী ব্যক্তির মুখে শরাব-মদ লেগে থাকা অবস্থায় কোন পানি ইত্যাদিতে মুখ দিলে তা নাপাক হয়ে যাবে।

✪ শূকর, কুকুর এবং সকল প্রকার হিংস্রপ্রাণী যেমন— বাঘ, চিতা, শিয়াল-ভালুক ইত্যাদি পশুর মুখ দেওয়া (উচ্ছিষ্ট) অল্প সংরক্ষিত পানি কিংবা অন্যবস্তু নাপাকরূপেই গণ্য। এ হুকুম একেবারে ছোট গর্ত, ছোট গোছলের হাউজ, কিংবা কোন ড্রাম-পাত্রে সংরক্ষিত পানির ব্যাপারে প্রযোজ্য।

সমুদ্র, নদী, খাল-বিল, দিঘী, বড়-ছোট পুকুর, বড় হাউজ ইত্যাদির বেলায় উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

✪ কুকুরের মুখের লালা নাপাক। তাই থালা-বাসন কিংবা অন্য কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে উহা নাপাক হয়ে যায়।

উহা পাক-পবিত্র করতে হলে উক্ত পাত্রকে অবশ্যই তিন বার ধৌত করতে হবে। তবে সাতবার ধোয়া এবং তন্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা লিপনী দিয়ে শুকিয়ে পুনঃ ধৌত করা উত্তম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ কারো শরীর কিংবা জামা-কাপড়ের সাথে কুকুরের পরিষ্কার শুকনা দেহ লাগলে তা নাপাক হয়ে যায় না। তবে কুকুরের শরীর ভিজা হলে কিংবা উহার শরীরে অন্য কোন আলগা নাপাকী লেগে থাকলে কিংবা কুকুরের মুখ-জিহ্বা দ্বারা কারো শরীর কিংবা কাপড়-পাত্র লেহন করলে তখন উহা নাপাক হয়ে যায় এবং উপরিউল্লিখিত নিয়মে পাক করে নিতে হয়।

✪ চিড়া-মুড়ি, ছাতু, আটা-ময়দা ইত্যাদি শুকনা খাদ্যদ্রব্যে কুকুর মুখ দিলে যে অংশে মুখ দিয়েছে এবং উহার মুখের লালা লেগেছে বলে প্রবল ধারণা হয়, শুধু সে অংশের দ্রব্যগুলো তুলে ফেলে দিলেই সারে। বাকীগুলো পাকই থাকে।

✪ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ- নাপাক নয়। বিড়াল পানিতে মুখ দিলে অন্য পানি থাকতে উক্ত মুখ দেওয়া পানি দ্বারা অযু-গোছল করা ঠিক নয়। অন্য পানি না থাকলে তখনই শুধু জায়েয।

✪ তবে বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদি খাবার পরক্ষণেই যদি থালা-পাত্রে মুখ দেয় তাহলে উহা নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু কিছু বধ করার পর কিছুক্ষণ নিজের মুখ চাটিয়ে মুখ দিলে নাপাক হয় না।

✪ যে সমস্ত পশুর গোশত হালাল যেমন— গরু-ছাগল, মহিষ-ভেড়া ইত্যাদি। উহাদের ঝুটা পাকরূপেই গণ্য। কিন্তু উহাদের মুখে কোন প্রকারের নাজাছাত লেগে থাকা অবস্থায় যদি কোন কিছুতে মুখ দেয় তাহলে নাপাক হয়ে যায়। যেসব গরু-ছাগল আবর্জনা খায়, কোন কিছুতে মুখ দেওয়া কালে উহাদের মুখে আবর্জনা লেগে না থাকলেও মাকরূহ হয়ে যায়।

✪ যেসব হাঁস-মোরগ মল-আবর্জনাময় স্থানে চরে বেড়ায় এবং নাজাছাত খায় ঐসব প্রাণী পানি ইত্যাদি কোন কিছুতে মুখ দিলে উহা মাকরূহ হয়ে যায় আর যে গুলো বাঁধা অবস্থায় লালিত-পালিত হয় উহাদের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয় বরং পাকই বটে।

✪ মৃতপ্রাণী অথবা যবাই করা প্রাণীর হাড়, শিং অথবা এগুলোর পশম ইত্যাদি পানিতে পতিত হলে পানি নাপাক হয়ে যায় না, তবে শূকরের হাড়-পশম সবটাই নাপাক। সুতরাং এর কোন কিছু পানিতে পতিত হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

✪ যে সমস্ত পাখির গোশত খাওয়া হালাল যেমন- চড়ুই, বাবুই, ঘুঘু, তোতা-বক, ময়না, কবুতর ইত্যাদির মুখ দেওয়া উচ্ছিষ্ট পাক।

✪ যেসব পশু-পাখির মুখ দেওয়া উচ্ছিষ্ট নাপাক উহার ঘামও নাপাক। যাদের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ উহাদের ঘামও মাকরূহ। যাদের উচ্ছিষ্ট পাক উহাদের ঘামও পাক-পবিত্র রূপে গণ্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাজের প্রকারভেদ

ইসলামী শরীয়তে ছালাত তথা নামায মোট ছয় (৬) পর্যায়ে বিভক্ত। যথা-

১. ফরয নামায
২. ওয়াজিব নামায
৩. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায
৪. সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা তথা সুন্নাতে যায়েদা নামায।
৫. ওয়াক্তিয়া (মুস্তাহাব) নফল নামায এবং
৬. সাধারণ নফল নামায।

ফরয নামায ঃ

যে নামায কোরআন করিমের মুহকাম (স্পষ্ট অর্থ সম্বলিত) আয়াত, হাদীছে মুতাওয়াতের ও ইজমায়ে মুতাওয়াতেরের কাতয়ী তথা অকাট্য ও সন্দেহাতীত দলীলাদি দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং এ সব কোরআনী আয়াত ও হাদীছ বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং তদ্বীয় মহান রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যে নামায আদায় করার জন্য কঠোর ভাবে নির্দেশ দান করেছেন এবং যা অনাদায়ে পরকালের ভীষণ শাস্তির অঙ্গীকার রয়েছে ঐ সব নামায কে ফরয নামায বলা হয়।

ফরয নামাযের হুকুম ঃ

(ক) বালেগ ও হুশজ্ঞান সম্পন্ন (পাগল, মাতাল ও অচেতন নয় এরূপ) প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য এ নামায আদায় করা ফরয তথা অপরিহার্য ও অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

(খ) বিনা ওজরে আলস্য ও অবহেলা বশতঃ ফরয নামায আদায় না করলে ফাসেক তথা শাস্তি যোগ্য অপরাধী হতে হয়।

(গ) আর এর ফরযীয়্যত তথা অপরিহার্য অলঙ্ঘনীয় পালনীয় কর্তব্য হওয়াটাকে ইনকার কিংবা হালকা মনে করলে কাফের হয়ে যায়।

(ঘ) এ ফরজ নামাজ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করে দিতে না পারলে পরে কাযা হিসাবে আদায় করে দিতে বাধ্য থাকে।

(ঙ) বেঁচে থাকতে কাযা রূপেও আদায় করে দিতে না পারলে মৃত্যুর পর প্রতি ওয়াক্তের ফরয নামাযের জন্য নির্দিষ্ট হারে ফিদইয়া-কাফ্ফারা দিতে হয়।

ফরয নামায দু' প্রকার ঃ (১) ফরযে আইন ও (২) ফরযে কেফায়া।

ফরযে আইন ঃ যে নামায প্রত্যেক বালেগ হুশ-জ্ঞান সম্পন্ন মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকে বাধ্য বাধকতার সাথে আদায় করে যেতে হয় এবং সকলের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক লোকে ইহা আদায় করলে সকলের তরফ থেকে আদায় হয়ে যায় না, এরূপ নামাযকে "ফরযে আইন' নামায বলা হয়।

যেমন- পাঁচ ওয়াক্তের এবং জুমআর ফরয নামায সমূহ। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে ফরয নামায মোট ১৭ রাকাত।

ফজর	-	২ রাকাত
যোহর	-	৪ রাকাত
আছর	-	৪ রাকাত
মাগরিব	-	৩ রাকাত
এশা	-	৪ রাকাত
	মোট	১৭ রাকাত

জুমআ বারে যোহরের চার রাকাত ফরযের পরিবর্তে জুমআর দু'রাকাত ফরয নামাযই আদায় করতে হয়।

ফরযে কেফায়া ঃ যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য রূপে আদায় করা কর্তব্য; তবে কিছু সংখ্যক লোক এ ফরয নামায আদায় করে নিলে সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় কিন্তু একমাত্র আদায়কারীই ছাওয়াবের ভাগী হন। আর কেউ আদায় করে না দিলে সকল মুসলিমই সমানভাবে গুনাহগার হয়ে পড়ে। এ জাতীয় নামাযকে শরীয়াতের পরিভাষায় ফরযে কেফায়া বলা হয়। যেমন- জানাযার নামায।

ওয়াজিব নামায ঃ যে নামায আদায় করার নির্দেশনা কোরআন হাকিমের আয়াতে মুয়াওয়ালা (ব্যাখ্যা সাপেক্ষ) অথবা বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ দ্বারা সুপ্রামানিত, তদুপরি যে নামায নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রা) সর্বদা আদায় করেছেন এবং আমাদেরকেও অত্র নামায আদায় করার জন্য আদেশ করেছেন। ঐ সমস্ত নামাযকেই ওয়াজিব নামায বলা হয়।

যেমন- দু' ঈদের দু'রাকাত করে ২+২=৪ (চার) রাকাত নামায ওয়াজিব।

বিতরের মোট তিন রাকাত নামায ওয়াজিব।

কাবা শরীফের তাওয়াফ শেষ করে দু'রাকাত নামায আদায় করা ওয়াজিব।

ওয়াজিব নামাযের হুকুম ঃ আমল তথা আদায় করার দিক থেকে ফরয ও ওয়াজিব নামায একই স্তরের। অর্থাৎ ফরয নামাযের ন্যায় ওয়াজিব নামায ও প্রত্যেক কে আদায় করে যেতে হয় এবং অবহেলায় আদায় না করলে গুনাহগার হতে হয় মৃত্যুর পূর্বে আদায় করে দিতে না পারলে মৃত্যুর পর ওয়াজিব নামাযের জন্যও কাফফারা দিতে হয়।

কিন্তু আকীদাহ-বিশ্বাসগত দিক থেকে ফরয ও ওয়াজিব নামাযের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ ফরজ নামাযকে অস্বীকার করলে সরাসারি কাফের হয়ে যায়, কিন্তু ওয়াজিব নামাযের অস্বীকারকারী সরাসরি কাফের হয়ে যায় না; তবে অবশ্যই ফাসিক হয়ে পড়ে।

সুন্নাত নামায ঃ ঐসব নামাযকে বলা হয় যা হযরত নবী করিম রাউফুর রাহিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আদায় করেছেন এবং আমাদেরকেও আদায় করার জন্য আদেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

ইহা দু'প্রকার। যথা-(১) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামায ও (২) সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা তথা সুন্নাতে যায়েদা নামায।

সুন্নাতে মুয়াককাদা নামায ঃ যে নামায হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বদা আদায় করে গিয়েছেন; ওজর ব্যতীত কখনো ছাড়েননি। ওজর বশতঃ মাঝে-মধ্যে আদায় করেননি একে বলা হয় সুন্নাতে মুয়াককাদা নামায। ফোকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় একে সুন্নাতে রাতেবাও বলা হয়ে থাকে।

প্রত্যহ (জুমআর দিনের যোহর ওয়াক্ত ব্যতীত) আমাদের পাঁচ ওয়াক্তে মোট বার (১২) রাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদার নামায আদায় করতে হয়।[১]

ফজর ওয়াক্তের ফরযের পূর্বের	-	২ রাকাত
যোহর ওয়াক্তের ফরযের পূর্বের	-	৪ রাকাত
যোহর ওয়াক্তের ফরযের পরের	-	২ রাকাত
মাগরিব ওয়াক্তের ফরযের পরের	-	২ রাকাত
এশার ওয়াক্তের ফরযের পরের	-	২ রাকাত
মোট		১২ রাকাত

টীকা ঃ ১

(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثَابَرَ عَلٰى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِىْ الْجَنَّةِ - اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ - (ترمذى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

জুমআ বারে যোহর ওয়াক্ত ব্যতীত অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা উল্লেখিত সংখ্যায় আদায় করে যেতে হয়। জুমআবারে যোহর ওয়াক্তের সংখ্যায় সুন্নাত না পড়ে বরং জুমআর ফরযের আগে ৪ রাকাত, জুমআর ফরযের পরে প্রথম নিয়্যতে ৪ রাকাত, জুমআর ফরযের পরে দ্বিতীয় নিয়তে দু'রাকাত, মোট দশ রাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদার নামায আদায় করতে হয়।

সুন্নাতে মুয়াককাদা নামাযের হুকুম ঃ উক্ত নামায সমূহ আদায় করার বিনিময়ে বিপুল ছাওয়াব রয়েছে। আদায় না করার জন্য তিরস্কার ও এক পর্যায়ের পাপ রয়েছে। উক্ত ছুন্নাত নামাযসমূহ তরককারীর প্রতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নারাজী রয়েছে এবং উক্ত নামায তকরকারীরা আখেরাতে নবী আকরাম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শফায়াত (সুপারিশ) প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে।[১]

সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদাহ তথা সুন্নাতে জায়েদা নামায ঃ ইহা ঐসব নামাযকে বলা হয় যা আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অধিকাংশ সময়ে আদায় করেছেন, আবার কোন কোন সময় ওজর না থাকা সত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে উহা আদায় করেননি, যাতে ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযের ন্যায় আদায়ের ব্যাপারে বাধ্য-বাধকতার প্রশ্ন না আসে।

প্রত্যহ আমাদেরকে সর্ব মোট উর্ধ্ব সংখ্যায় আট রাকাত এবং নিম্ন সংখ্যায় ৪ রাকাত সুন্নাতে জায়েদার নামায আদায় করতে হয়।

প্রত্যহ আছরের ফরযের পূর্বে	৪ রাকাত / অপারগতায়	২ রাকাত
এশার ফরযের পূর্বে	৪ রাকাত / অপরগতায়	২ রাকাত
মোট	৮ রাকাত	৪ রাকাত

উক্ত নামাযের হুকুম ঃ ইহা আদায়েও অনেক ছাওয়াব রয়েছে। এতে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি ও আখেরাতে শাফায়াত (সুপারিশ) পাওয়া যাবে। তবে আদায়ের ব্যাপারে কোন কঠোরতা নাই।

টীকা ঃ ৯

(١) حُكْمُ السُّنَّةِ اَنَّهُ يَنْدُبُ اِلٰى تَحْصِيْلِهَا وَيُلَامُ عَلٰى تَرْكِهَا مَعَ لُحُوْقِ اِثْمٍ يَسِيْرٍ وَفِىْ التَّلْوِيْحِ تَرْكُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ قَرِيْبٌ مِنَ الْحَرَامِ مُسْتَحَقٌّ بِهٖ حِرْمَانُ الشَّفَاعَةِ لِقَوْلِهٖ ع مَنْ تَرَكَ بِسُنَّتِىْ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ وَفِىْ شَرْحِ الْمَنَارِ لِلشَّيْخِ زَيْنِ الْاَصَحِّ اَنَّهُ يَاْثَمُ تَرْكُ الْمُؤَكَّدَةِ لِاَنَّهَا فِىْ حُكْمِ الْوَاجِبِ (طحطاوى)

ওয়াক্তিয়া মুস্তাহাব (নফল) নামায ঃ যে সব নামায হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বদা নয় বরং মাঝে-মধ্যে আদায় করতেন আবার মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দিতেন। একাধারে আদায় করতেন না। উহাকে ওয়াক্তিয়া মুস্তাহাব নামায বলা হয়। যেমনঃ যোহরের ফরজের পরের দু রাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদা নামাযের শেষে আরও দু রাকাত নামায, মাগরিবের ফরযের পরের দুরাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদা নামাযের পরে আরও দু রাকাত নামায। এছাড়া,

এশার ফরজের পরের দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদা শেষে আরও দু রাকাত মুস্তাহাব নামায। উল্লেখিত নামাযসমূহ আদায় করার বর্ণনা হাদীস শরীফেই রয়েছে।

সাধারণ নফল নামায ঃ হারাম ও মাকরূহ ওয়াক্ত বাদে সব সময়ে যা পড়া যায়, উহাকেই সাধারণ নফল নামায বলা হয়। এসব আদায়ের সুনির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নাই।

নামাজের ওয়াক্তের বিবরণ

নামাযের উল্লেখিত প্রকারসমূহ থেকে সাধারণ নফল নামায ব্যতীত ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও কতেক মুস্তাহাব নফল নামায আদায়ের জন্য প্রধানতঃ পাঁচটি ওয়াক্ত (সময়) নির্ধারিত রয়েছে ঃ যথা–
১. ফজরের ওয়াক্ত
২. জোহরের ওয়াক্ত
৩. আছরের ওয়াক্ত
৪. মাগরিবের ওয়াক্ত এবং
৫. এশা ও বিতরের ওয়াক্ত।

উল্লেখিত পাঁচটি ওয়াক্তে (সময়ে) আমাদেরকে বিভিন্ন পর্য্যায়ের নামায আদায় করে যেতে হয়।

(১) ফযর ওয়াক্তের নামায ঃ এ সময়ে আমাদেরকে ফরয এবং সুন্নাতে মুয়াককাদা এ দু'পর্যায়ের নামায আদায় করে যেতে হয়।

✪ **ফজরের নামাযের ওয়াক্ত (সময়) ঃ** রাত শেষ হওয়ার পর ছোবহে ছাদেক হতে শুরু করে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়কে ফজরের নামায আদায়ের পূর্ণ সময় ধরা হয়।

✪ **ফজরের নামায আদায়ের মুস্তাহাব ওয়াক্ত (উত্তম সময়) ঃ** পুরুষদের জন্য ছোবহে ছাদেক হওয়ার পর পূর্বাকাশের অন্ধকার ক্রমঃ দূরীভূত হয়ে উহা আলোকময় হয়ে উঠলেই ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব। এ ওয়াক্তে প্রথমে সুন্নাতে মুয়াককাদার দু'রাকাত নামাযই আদায় করে নিতে হয়।

অতঃপর এতটুকু সময় হাতে রেখে দু'রাকাত ফরয নামায আরম্ভ করা মুস্তাহাব, যে সময়ের ভিতর কোরআন করিমের চল্লিশ হতে ষাট-খানা আয়াত দ্বারা নামায

pdf By Syed Mostofa Sakib

আদায় করার পর যদি কোন কারণ বশতঃ উক্ত নামায পুনঃ দোহরায়ে আদায় করা লাগে, তা হলে যেন পুনরায় কোরআন করিমের উপরোল্লেখিত সংখ্যক আয়াত দ্বারা উক্ত নামায আদায় করা যায়।

মেয়েলোকদের জন্য সব সময় কিছুটা অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব। (শামী, আলমগীরী ইত্যাদি)

✪ **ছোবহে ছাদেক ঃ** রাত শেষ হওয়ার পর পূর্ব আসমানের নীচে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি সাদা আলোর রেখা দেখা যায় এবং পরপর ক্রমশঃ সে আলোখানা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, একেই শরীয়াতের পরিভাষায় "ছোবহে ছাদেক" বলা হয়।

✪ উল্লেখ্য যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ফজরের দুরাকাত সুন্নাত অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ নামায।[১]

তাই যথা সম্ভব একে এর নির্ধারিত সময়ে তথা ফরয দু'রাকাতের আগেই আদায় করে নেওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকার জন্য জোর তাগিদ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, যদি কোন মুছাল্লী ফজরের নামায আদায়ের জন্য উপস্থিত হয়ে দেখতে পান যে, ফজরের ফরযের জমাত শুরু হয়ে পড়েছে, এ ক্ষেত্রে অন্য কোন ওয়াক্তের নামায হলে তখন সুন্নাত বাদ দিয়ে জামাতে শামিল হয়ে ফরয আদায় করে যাওয়া জরুরী।

কিন্তু এ ফযরের ওয়াক্তের বেলায় মুছাল্লীকে তখন জামাতে শামিল না হয়ে দেখতে হবে যে, সুন্নাত দু'রাকাত আদায় করতে গেলে ফরযের জামাত পাওয়া যাবে কি না। যদি মুসাল্লির দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তাড়াতাড়ি দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করে কমপক্ষে জামাতে এক রাকাত নামায পাওয়া যাবে অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাতের রুকুতে গিয়ে জমাতে শরীক হওয়া যাবে, আর কারো কারো মতানুসারে দ্বিতীয় রাকাতের শেষে ইমামের তশাহহুদ (আত্ত্যাহিয়াত.........) পাঠকালে গিয়ে অন্ততঃ জামাতে শামিল হওয়া যাবে, তাহলে ঐ মুছাল্লী তখন জামাতে শামিল না হয়ে আগে তাড়াতাড়ি করে সুন্নাতে মুয়াককাদার ঐ দু'রাকাত নামায আদায় করে নিবে। অতঃপর গিয়ে জমাতে শামিল হবে।

আর যদি অনুরূপ বিশ্বাস না হয়, তখন আপাততঃ উক্ত সুন্নাত নামায না পড়েই তাড়াতাড়ি জামাতে শামিল হয়ে ফরযই আদায় করে নিবে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে সূর্যোদয়ের পর দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ভিতর (ইচ্ছা করলে) উক্ত ছুটে যাওয়া দু'রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করে নিতে পারবে। (হেদায়া, আলমগীরী ইত্যাদি)

টীকা ঃ

عن عائشة رضـ قالت لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر (بخارى) وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ـ (مسلم)

(২) যোহর ওয়াক্তের নামায ঃ এ সময়ে আমাদের ফরজ, সুন্নাতে মুয়াককাদা ও মুস্তাহাব তথা নফল এ তিন পর্যায়ের নামায আদায় করতে হয়।

পবিত্র কোরআন, হাদীস ও মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরাম (রঃ) গণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ ওয়াক্তে প্রথমে আমাদের চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদার নামায আদায় করা লাগে। অতঃপর চার রাকাত ফরয ও এরপর দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদার নামায আদায় করে যেতে হয়। অপর এক হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে,[১] মুজতাহিদ ফোকাহায়ে ইজাম (রঃ) গণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরো দু'রাকাত নামায ওয়াক্তিয়া মুস্তাহাব হিসাবে আদায় করা লাগে।

এতে সব পর্যায়ের নামায মিলিয়ে যোহর ওয়াক্তের নামাযের সর্বমোট রাকাত সংখ্যা দাড়ায় বার।[২] নামায বিষয়ের কোন কোন পুস্তিকায় যে, যোহরের নামাযের সর্বমোট রাকাত সংখ্যা দশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয় বরং সর্বমোট রাকাত সংখ্যা বার হওয়াটাই সঠিক।

টীকা ঃ

(١) فنقول صرح جماعة من المشائخ انه يستحب اربع بعد الظهر لحديث رواه وهو انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى اربعا ...... قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار ـ فتح القدير

وعن ام سلمة رضـ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ علي اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعدها حرمه الله على النار ـ (رواه ابو داود والترمذى والنسائى)

(٢) (ومنها ركعتان بعد الظهر) ويندب ان يضم ركعتين فتصير اربعا (مراقى الفلاح) وقوله ويندب ان يضم اليها ركعتين) وهو مخير ان شاء جعلها بسلام واحد وان شاء جعلها بسلامين (طحطاوى على المراقى الفلاح) ويستحب كثير من اصحابنا الاربع بعد الظهر لما روى عن ام سلمة رضـ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ علي اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار (شرح منيه)

ووقع عندى انه اذا صلى اربعا بعد الظهر بتسليمة او ثنتين وقع عن السنة والمندوب سواء احتسب هو الراتبة منها اولا لان المفاد بالحديث المذكور انه اذا وقع بعد الظهر اربعا مطلقا حصل الوعد المذكور ـ (فتح القدير)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ যোহরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত (সময়) ঃ

প্রত্যহ বেলা দ্বি প্রহরের পর যখন সূর্য কিঞ্চিৎ হেলে পশ্চিম দিকে যায় তখন হতে যোহরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত (সময়) আরম্ভ হয়।

ওয়াক্তের শেষ মুহূর্ত সম্পর্কে আমাদের মহান ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া (তার আছলী ছায়া ব্যতীত) দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে যোহরের শেষ সময়।

পক্ষান্তরে ছাহেবাইন তথা ইমাম আযম (রঃ) এর শাগারিদদ্বয় অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এর একগুণ হওয়া পর্যন্ত সময়টাই যোহরের নামায আদায়ের জন্য শেষ সময়।

উক্ত দ্বন্ধের সমাধান স্বরূপ আমাদের মাজহাবের পরবর্তী ইমামগণ বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এর এক গুণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই যোহরের নামায আদায় করে নিবে। আর প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে সাবধানতা বশতঃ আছরের নামায আদায় করতে নাই। বরং ছায়া দ্বিগুণ পরিপূর্ণ হওয়ার পরেই আসরের নামাযের সময় শুরু হয়েছে বলে ধরে নিবে, এতে আর কোন প্রকারের মত ভেদের অবকাশ থাকে না।[১]

যোহরের নামায আদায়ের মুস্তাহাব (উত্তম) সময় ঃ গরমের মওসুমে ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর সূর্যোত্তাপের প্রখরতা কিছুটা কমে আসলে, অনুরূপ বৃষ্টি বাদলের দিন যোহরের নামায কিছুটা দেরী করে আদায় করা মুস্তাহাব

আর শীতের মওসুমে ওয়াক্ত আরম্ভ হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হওয়ার পর বেশীক্ষণ দেরী না করেই সহসা যোহরের নামায আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব।[২]

এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য যে, যোহরের ফরযের আগের ও পরের সুন্নাতে মুয়াকাদার নামায সমূহ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

টীকা ঃ

(١) فَالْاِحْتِيَاطُ اَنْ يُصَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ اَنْ يَصِيْرَ الظِّلُّ مِثْلَهُ وَالْعَصْرُ بَعْدَ مِثْلَيْهِ لِيَكُوْنَ مُؤَدِّيًا بِالْاِتِّفَاقِ كَذَا فِىْ الْمَبْسُوْطِ (مراقى الفلاح) وَذَكَرَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اَنَّ الْاِحْتِيَاطَ اَنْ لَا يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ اِلَى الْمِثْلِ وَلَا يُصَلِّى الْعَصْرَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْمِثْلَيْنِ لِيَكُوْنَ مُؤَدِّيًا لِلصَّلَاتَيْنِ فِىْ وَقْتِهِمَا بِالْاِجْمَاعِ كَذَا فِىْ سِرَاجِ الْوَهَّاجِ. (بَحْرُ الرَّائِق)

(٢) وَيُسْتَحَبُّ تَاخِيْرُ الظُّهْرِ فِىْ الصَّيْفِ وَتَعْجِيْلُهُ فِى الشِّتَاءِ هٰكَذَا فِىْ الْكَافِىْ / وَفِىْ يَوْمِ الْغَيْمِ .... يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ لِئَلَّا يَقَعَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
(عالمگيريه)

এসবের আদায়ের ব্যাপারে শরীয়াতের বিশেষ তাগিদ রয়েছে।[১]

এ আলোকে যোহরের ফরযের পূর্বেকার চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদার নামায ফরয নামাজের জামাত আরম্ভ হয়ে যাওয়ার কারণে (এ ক্ষেত্রে যেহেতু সুন্নাত আপাততঃ না পড়ে আগে তাড়াতাড়ি জামাতে শামিল হয়ে ফরয নামায আদায় করে নেওয়া জরুরী) ঐ সুন্নাত নামায ফরযের আগে আদায় করতে না পারলে জামাতের সাথে ফরয নামায আদায় করে নেওয়ার পর ফরযের পরের দু'রাকাত সুন্নাতের আগে কিংবা পরে ফরযের পূর্বের ঐ ছুটে যাওয়া চার রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করে নিতে হয়।[২]

(৩) আছর ওয়াক্তের নামায ঃ এ ওয়াক্তে আমাদেরকে সুন্নাতে জায়েদা এবং ফরয এ দু'পর্যায়ের নামায আদায় করে যেতে হয়।

আছরের নামায মোট ৮ রাকাত। প্রথমে চার রাকাত সুন্নাতে জায়েদা অতঃপর চার রাকাত ফরয নামায আদায় করা লাগে। সময় সুযোগের অভাবে আছরের সুন্নাতে জায়েদার এই নামাযকে চার রাকাতের স্থলে দুরাকাত করেও আদায় করার অনুমতি রয়েছে।[৩]

আসরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত (সময়) ঃ যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এর দ্বিগুণ হওয়ার পর থেকে শুরু করে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে আছরের নামায আদায় করার সময়।

টীকা ঃ

(١) قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يَنَلْهُ شَفَاعَتِىْ (عناية)

(٢) وَاَمَّا الْاَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ اِذَا فَاتَتْهُ وَحْدَهَا بِاَنْ شَرَعَ فِىْ صَلٰوةِ الْاِمَامِ وَلَهُ يَشْتَغِلُ بِالْاَرْبَعِ فَعَامَّتُهُمْ عَلٰى اَنَّهُ يَقْضِيْهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الظُّهْرِ مَادَامَ الْوَقْتُ بَاقِيًا وَهُوَ الصَّحِيْحُ هٰكَذَا فِىْ الْمُحِيْطِ / وَفِىْ الْحَقَائِقِ يُقَدِّمُ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُقَدِّمُ الْاَرْبَعَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى كَذَا فِىْ سِرَاجِ الْوَهَّاجِ (عالمكيرية)

(٣) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا (ترمذى)

وَعَنْ عَلِىٍّ رض اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ (ابوداؤد) وَاَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَفِىْ مُخْتَصَرِ الْقُدُوْرِىْ وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ لِاِخْتِلَافِ الْاٰثَارِ (شرح منية)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসরের নামায আদায়ের মুস্তাহাব সময় ঃ

মেঘ-বৃষ্টির দিন ব্যতীত সকল মওসুমে সূর্যের আলোর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সময় বিলম্ব করে আসরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব কিন্তুসূর্য লাল-হলুদ বর্ণ-ধারণ করা পর্যন্ত বিলম্ব করে ফেলা মাকরূহ।

আর মেঘ-বৃষ্টির দিবসে আসরের নামায ওয়াক্ত হওয়ার পরক্ষণেই আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব। যেন অজ্ঞাতে নামায আদায়ের মাকরূহ সময় চলে না আসে।[১]

উল্লেখ্য যে, সূর্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে যদি দৃষ্টি শক্তি সংকুচিত হয়ে আসে, তাহলে ঐ সময়টাকে সূর্যের আলো পরিবর্তন না হওয়ার চিহ্ন রূপে ধরে নিতে হবে। আর যদি সূর্যের দিকে তাকালে দৃষ্টি শক্তি সংকুচিত হয়ে না আসে বরং সূর্যের দিকে দৃষ্টি স্থীর থাকে, তা হলে উহাকে সূর্যের রং আলো, পরিবর্তিত হওয়ার চিহ্ন রূপে ধরে নিতে হবে। (এনায়া)

✪ এ ক্ষেত্রে এও উল্লেখ্য যে, যে মুসাল্লী মুস্তাহাব সময়ে কোন ওজর বশতঃ আছরের নামায আদায় করতে পারেনি সে লোক সূর্যের রং-আলো পরিবর্তিত হয়ে অস্ত যাচ্ছে এমন সময়ে হলেও ঐ দিনের আছরের ফরয চার রাকাত নামায আদায় করে নিলে মাকরূহ সহকারে উহা আদায় হয়ে যাবে। (শরহে বেকায়া)

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে ফযর ও আছর ওয়াক্তের নামায সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নামায, কারণ নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ দু-ওয়াক্তের গুরুত্ব বর্ননা করতে গিয়ে এরশাদ করেন–

يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ـ (بخارى شريف)

৪. মাগরিবের ওয়াক্তের নামায ঃ এ সময়ে আমাদেরকে ফরয, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও মুস্তাহাব এ তিন পর্যায়ের নামায আদায় করে যেতে হয়।

টীকা ঃ

(১) وَيُسْتَحَبُّ تَاخِيْرُ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَيْفًا وَشِتَاءً مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَالتَّاخِيْرُ اِلَى التَّغَيُّرِ مَكْرُوْهٌ تَحْرِيْمًا وَيُسْتَحَبُّ (تَعْجِيْلُهُ) اَىْ الْعَصْرُ فِىْ يَوْمِ الْغَيْمِ (مَرَاقِى الْفَلَاحِ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ মাগরিব ওয়াক্তের নামায মোট ৭ রাকাত। প্রথমে তিন রাকাত ফরয, অতঃপর ২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদা এরপর দু'রাকাত মুস্তাহাব / নফল নামায।[১]

মাগরিবের নামায আদায়ের ওয়াক্ত ঃ

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমাকাশের 'শফক" বিলীন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে মাগরিবের নামায আদায়ের পূর্ণ সময়। কিন্তু এ 'শফক" এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাদের মহান ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (র) এর মতে পশ্চিমাকাশের লালিমা চলে যাওয়ার পর যে উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ ধারণ করে উহাকেই 'শফক" বলা হয়। আর ছাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে যে লাল বর্ণ দেখা যায় উহাকেই 'শফক" বলা হয়।

এ হিসাবে ইমাম আজম (র) এর মতে, পশ্চিমাকাশের লালিমা চলে গিয়ে ঐ উজ্জল শ্বেতবর্ণ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে মাগরিবের নামাযের শেষ সময়।

আর ছাহেবাইন এর মতে লালবর্ণ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে মাগরিবের শেষ সময়।

আমাদের হানাফী মাজহাবের পরবর্তী অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরামগণের মতে ইমাম আযম (র) এর মতটাই হচ্ছে (আহ্ওয়াত্) অধিক সতর্কতা মূলক মত। যেমন - মুনিয়া, বাহরুর রায়েক, ফাতহুল কাদীর তাবঈনুল হাকায়েক জওহারাতুন নাইয়ারা, তাহতাবী ওগায়াতুল আওতার ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতাগণ ইমাম আযম (র) এর মতই গ্রহণ যোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে শরহে বেকায়া, আলমগীরী ও দুরারুল হেকম ইত্যাদি কিতাবে ছাহেবাইন (র) এর মতের উপরই ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে।

তবে উল্লেখিত দ্বন্দ্বের সমাধান স্বরূপ আমাদের হানফী মাজহাবের পরবর্তী ইমাম গণের অনেকে বলেছেন যে, পশ্চিমাকাশের লালিমা বিদ্যমান থাকতেই মাগরিবের

টীকাঃ

(১) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ اَحَدًا رُفِعَتْ لَهُ فِىْ عِلِّيِّيْنَ الخ (مراقى الفلاح) وَفِىْ شَرْحِ الْوِقَايَةِ لِشَيْخِى زَادَهْ مَانَصُّهُ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّلٰوَاتِ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَغْرِبُ لَمْ يَحُطَّهَا عَنْ مُسَافِرٍ وَلَامُقِيْمٍ فَتَحَ بِهَا صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَخَتَمَ بِهَا صَلٰوةُ النَّهَارِ. فَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلّٰى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ صَلّٰى بَعْدَهَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُ عِشْرِيْنَ اَوْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً (طحطاوى على المراقى الفلاح)

নামায আদায় করে নিলে এবং পশ্চিমের শ্বেতবর্ণ মিশে যাওয়ার আগে নয় বরং পরেই এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে বলে ধরে নিলে উক্ত দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে যায় (তাহতাবী)।

মাগরিব ওয়াক্তের নামায আদায়ের মুস্তাহাব সময় ঃ

সূর্যাস্তের পরক্ষণেই অবিলম্বে মাগরিবের নামায আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু মেঘ–বৃষ্টির দিবসে মাগরিবের নামায সামান্য দেরী করে আদায় করা মুস্তাহাব। কারণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারটা সন্দেহ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দেরী করা উত্তম।[১]

(৫) এশা নামাজের ওয়াক্ত ঃ এ সময়ে আমাদের ছুন্নাতে জায়েদাহ, ফরয, সুন্নাতে মুয়াককাদা এবং মুস্তাহাব তথা নফল - এ চার পর্যায়ের নামায আদায় করে যেতে হয়। এশার নামাজ সর্বমোট বার রাকাত। প্রথমে চার রাকাত ছুন্নাতে জায়েদা, অতঃপর চার রাকাত ফরয, এরপর দু'রাকাত ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা সবশেষে কমপক্ষে দু'রাকাত বেশীতে চার রাকাত মুস্তাহাব তথা নফল সর্বমোট ১২ বা১৪ রাকাত নামায আদায় করা লাগে।

নামায বিষয়ের কোন কোন পুস্তিকায় সবশেষের এ দু' বা চার রাকাত মুস্তাহাব নামাযকে বাদ দিয়ে এশা ওয়াক্তের নামাযের সর্বমোট রাকাত সংখ্যা দশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে উহা সঠিক নয়। কারণ হাদীস শরীফ এবং মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরাম (র) গণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরযের পরের দু'রাকাত সুন্নাতে মোয়াককাদার পর আরো দু'কিংবা চার রাকাত নামায মুস্তাহাব রূপে আদায় করার বিধান রয়েছে।[২]

টীকা ঃ

(١) وَيُسْتَحَبُّ (تَعْجِيْلُ) صَلٰوةُ (الْمَغْرِب) صَيْفًا وَشِتَاءً وَلَايَفْصِلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْاِقَامَةِ فِيْهِ اِلَّا بِقَدْرِ ثَلَاثِ اٰيَاتٍ اَوْ جَلْسَةٍ خَفِيْفَةٍ (مراقى الفلاح)

وَاِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فِيْ وَقْتِ الْغَيْمِ عَدْمُ تَعْجِيْلِه لِخَشْيَةِ وُقُوْعِهَا قَبْلَ الْغُرُوْبِ لِشِدَّةِ الْاِلْتِبَاسِ (فتوخرفيه) حَتّٰى يَتَيَقَّنَ الْغُرُوْبَ (مراقى الفلاح)

(٢) نُقِلَ فِى الْاِخْتِيَارِ عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعِشَاءِ اَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّىْ بَعْدَهَا اَرْبَعًا ثُمَّ يَضْطَجِعُ۔

(منحة الخالق على البحرالرائق)

টীকার বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য-

এশা-এর নামায আদায়ের ওয়াক্ত ঃ

ইতিপূর্বে উল্লেখিত মাগরিবের নামাযের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু করে ছোবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে এশা-এর নামায আদায়ের পূর্ণ সময়।

এশা-এর নামায আদায়ের মুস্তাহাব সময় ঃ

শীত মওসুমে রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতঃ এশার নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (বদায়েউচ্ছানায়ে, খানীয়া)

গরমের মওসুমে এক তৃতীয়াংশ রাত পূর্ণ হওয়ার আগেই এশার নামায আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব। (১) শীতকালে রাত বড় হয়ে থাকে তাই একটু দেরী করে আদায় করা উত্তম। আর গ্রীষ্মকালে রাত ছোট হয়ে থাকে, ঐ কারণে এ শার নামায প্রথম দিকেই আদায় করে নেওয়া উত্তম। কারণ গ্রীষ্মকালে বিলম্বে এশার নামায আদায় করতে গেলে এশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

অনুরূপভাবে মেঘ-বৃষ্টির সময়ে ও এশার নামায ওয়াক্তের প্রথম দিকে আদায় করে নেওয়া উত্তম। (মুনিয়া)

وَاَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَاَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ اَىْ وَاِنْ شَاءَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَمَّا الْاَرْبَعُ فَلِمَا رُوِىَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى قَبْلَ الْعِشَاءِ اَرْبَعًا كَاَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهٖ وَمَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَرَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِىْ سُنَنِهٖ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِىْ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ وَالنَّسَائِىْ وَالدَّارَقُطْنِىْ مِنْ قَوْلِ كَعْبٍ وَالْمَوْقُوْفُ فِىْ هٰذَا كَالْمَرْفُوْعِ لِاَنَّهٗ مِنْ قَبِيْلِ تَقْدِيْرِ الْاَثْوِبَةِ وَهُوَ لَايُدْرَكُ الْاَسْمَاعًا (شرح منية المصلى) ثُمَّ الَّذِىْ يَقْتَضِيْهِ النَّظْرُ كَوْنُ الْاَرْبَعِ بَعْدَ الْعِشَاءِ سُنَّةً لِنَقْلِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا فِىْ اَبِىْ دَاؤُدَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىْ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رضـ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَاصَلَّى الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ بَيْتِىْ اِلَّا صَلّٰى فِيْهِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْسِتَّ رَكَعَاتٍ (فتح القدير) وَفِى الْاِمْدَادِ عَنِ الْاِخْتِيَارِ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُصَلِّىَ قَبْلَ الْعِشَاءِ اَرْبَعًا وَقِيْلَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا وَقِيْلَ رَكْعَتَيْنِ وَالظَّاهِرُ اَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَتَيْنِ وَخَيَّرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَيْنَ الرُّبْعِ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ وَالْاَفْضَلُ الْاَرْبَعُ كِلَيْهِمَا۔ (عالمكيريه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত মুস্তাহাব সময়ের পর হতে রাত দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে এশার নামায আদায়ের জন্য মুবাহ ওয়াক্ত[১]

আর দ্বিপ্রহর রাতের পর তথা আনুমানিক রাত ১২টার পরে বিনা ওজরে এশার নামায আদায় করতে যাওয়া মাকরূহ। (১) ওজরবশত ছোবহে ছাদেকের আগ পর্যন্তসময়ের মধ্যে আদায় করা জায়েজ (الضرورة تبيح المحظورات)

(শরহে মুনিয়া)

বিতরের নামায ঃ ইহা ওয়াজিব নাযায। মোট তিন (৩) রাকাত নামায একই নিয়্যতে আদায় করা লাগে।

বিতরের নামায আদায় করার ওয়াক্ত (সময়) ঃ এশা ও বিতরের নামায আদায়ের সময় একটাই। কিন্তু বিতরের নামায় সব সময় এশার নামায আদায় করে নেওয়ার পরেই আদায় করাটা শর্ত (জরুরী) শামী)।

বিতরের নামায আদায়ের মুস্তাহাব সময় ঃ যে মুছাল্লী নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে থাকেন এবং প্রত্যহ শেষ রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন, এ প্রকারের মুছাল্লীর জন্য তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের পরে রাতের শেষ অংশেই বিতরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

কিন্তু যিনি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত নন, তাঁর জন্য এশার নামায আদায়ের পরপরই বিতরের নামায আদায় করে নেওয়া জরুরী।

(জাওহরাতুন নাইয়ারা)

নামায আদায়ের হারাম ও মাকরূহ সময়ের বর্ণনা

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে,প্রত্যহ এমন কয়েকটি সময় রয়েছে যাতে প্রত্যেক প্রকারের নামায আদায় করাটাকে আল্লাহ-রাসূল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হারাম (সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল—

সূর্য উদয়ের সময়,দ্বিপ্রহর অর্থাৎ সূর্য ঠিক মাথার উপর স্থীর হওয়া কালে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার মূহূর্তে প্রত্যেক পর্যায়ের নামায আদায় করা হারাম।

টীকা ঃ

(وَفِي مَجْمَعِ الرِّوَايَاتِ الخ) حَاصِلُهُ اَنَّ تَاخِيْرَ الْعِشَاءِ بَعْدَ الثُّلُثِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحٌ (طحطاوى)

وَفِي الْقِنْيَةِ تَاخِيْرُ الْعِشَاءِ اِلَى مَازَادَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَالْعَصْرِ اِلَى وَقْتِ اِصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبِ - اِلَى اِشْتِبَاكِ النُّجُوْمِ يُكْرَهُ كَرَاهَةَ التَّحْرِيْمِ -

(بحر الرائق)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ তিনটি সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সূর্য পুজারীগণ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশেষত সিজদা, রুকুর ন্যায় মাথা নোয়ায়ে মাটিতে লুটে পড়ে সূর্যের উপাসনা করে থাকে। ঠিক এ সব মূহূর্তে মুছলিমেরাও যদি সিজদা রুকু সম্বলিত এবাদত নামায আদায়ে আল্লাহ তাআলার উপাসনা করতে থাকে, তখন সূর্য পুজারী মুশরেক-কাফেরদের অনুকরণ করা হচ্ছে বলে অহেতুক একটা অপবাদ আসার সম্ভাবনাকে বিবেচনায় এনে উল্লেখিত তিনটি সময়ে যে কোন প্রকারের নামায আদায় করাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

তবে আল্লাহর প্রিয় রাসূল (স) এর হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করে কোন গ্রহনীয় ওজরবশত সূর্যঃ অস্ত যাওয়ার পূর্বে ঐ দিনের আছরের নামায আদায় করতে না পারলে তা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ে হলেও মাকরুহের সাথে আদায় করা যাবে বলে হযরাত ফোকাহায়ে কেরাম মত ব্যক্ত করেছেন। একেবারে কাযা করে ফেলার চেয়ে এ মাকরূহ সময়ে আদায় করে নেওয়াটাই উত্তম। (শামী, আলমগীরী)

তেমনি ভাবে উক্ত তিন মাকরুহ ওয়াক্তের মধ্যে যদি জানাযার নামাযের জন্য লাশ উপস্থিত করা হয় কিংবা কোরআন করিমের সিজদার আয়াত পাঠ করাহয় তাহলে এ মাকরূহ ওয়াক্ত ত্রয়ে জানাযার নামায ও তেলাওয়াতে সেজদা আদায় করে নওয়া জায়েজ।

এক্ষেত্রে এও উল্লেখ্য যে, সপ্তাহের অন্যান্য দিন দ্বিপ্রহরের সময় ফরয ওয়াজিব ও নফল নামায আদায় করা হারাম হলেও শুধুমাত্র জুমাবারে দ্বিপ্রহরের সময়ে ও নফল নামায আদায় করা মাকরূহ নহে। (আশবাহ,শরহে মুনিয়া, গায়তুল আওতার)

কত পরিমান সময়কে সূর্যোদয়ের সময় হিসাবে ধরে নিয়ে উহা বাদ দিয়ে নামায আদায় করতে হয় তা সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

এক বর্ণনা মতে পূর্ব আকাশে সূর্য এক নেজা উপরে না উঠা পর্যন্ত সময়কে উদয়ের সময় ধরে নিতে হবে। এক নেজা সমান বার বিঘত তথা ছয়হাত। অর্থাৎ সকালবেলা সূর্য পূর্বদিকে আনুমানিক ছয়হাত উপরে উঠা পর্যন্তকে সূর্য উদয়ের সময় ধরে নিতে হবে (ঘন্টার সময় অনুপাতে আনুমানিক ২০/২২ মিনিট সময়)। অর্থাৎ প্রত্যহ সূর্য উদয়ের শুরু থেকে ২০/২২ মিনিট সময় বাদ দিয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর এ ২০/২২ মিনিট সময়ের ভিতর নামায আদায় করা হারাম।

(কেফায়া, শামী, তাহতাবী)

অপর এক বর্ণনা মতে সূর্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে গেলে সূর্য কিরণের তেজে দৃষ্টি সূর্যের দিক থেকে ফিরে না আসা (সূর্য কিরণ অতটুকু তীক্ষ্ণ না হওয়া) পর্যন্ত সময়টাই হচ্ছে সূর্য উদয়ের সময়।

সুতরাং সূর্য কিরণ তিক্ষ্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতঃ এর পরেই নাময আদায় করতে হবে। (গায়তুল আওতার, তাহতাবী)

সতর্ক বানী ঃ আমাদের দেশের সাধারণ মুছাল্লী ভাইদের অনেকেই নামায আদায়ের হারাম ও মাকরুহ সময়গুলো সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। এমনও অনেক নামাযী ভাই রয়েছেন যারা নিদ্রা থেকে উঠে উল্লেখিত হারাম ওয়াক্তের কোন ভেদ বিচার না করে ঘরে কিংবা মসজিদে ইচ্ছামত সূর্য উদিত হচ্ছে এরূপ হারাম সময়েই নামায আদায় করে থাকেন। অথচ এ সময়ে আদায়কৃত নামায শরীয়ত মতে মোটেই আদায় হবেনা এবং কবুলও হবেনা।

সুতারাং যারা ফজরের নামায জামাতের সাথে না পড়ে একটু দেরীতে পড়েন, তারা হারাম ও মাকরূহ ওয়াক্ত সম্পর্কে জেনে নিয়েই প্রত্যহ ফজরের নামায আদায় করা ইহাদের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

বর্তমানের দৈনিক পত্রিকা ও রেডিও টেলিভিশনে প্রত্যহ সূর্য উদয়- অস্তের সময় প্রচার করা হয়। এ সূত্রেও জেনে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

✪ আর প্রত্যহ এমন কিছু কিছু সময় রয়েছে যাতে ইসলামী শরীয়াতের পক্ষ থেকে নফল নামায আদায় করাটাকে মাকরূহ বলা হয়েছে।

উহার কিছু অংশ নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

ছোবহে ছাদেক তথা ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে ফজরের ফরয নামায আরম্ভ করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ফজরের ২ রাকাত ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও ফরয-ওয়াজিবের কাযা নামায ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের ছুন্নাত কিংবা নফল নামায আদায় করা মাকরূহ।

এমনিভাবে ফজরের ফরয নামায আদায় করে নেওয়ার পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতর প্রত্যেক প্রকারের ছুন্নাত ও নফল নামায ইত্যাদি আদায় করা মাকরূহ। তবে ফরয-ওয়াজিবের কাযা আদায় করা যায়।

আছরের ফরয নামায আদায় করে নেওয়ার পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতর এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের (ফরয) নামায শুরু করা পর্যন্ত সময়ের ভিতরেও প্রত্যেক প্রকারের নফল/ ছুন্নাত নামায আদায় করা মাকরূহ।

প্রত্যেক ফরয নামাযের জমাতের জন্য একামত শুরু হওয়ার মুহূর্তে (ফজরের ছুন্নাত ব্যতীত) অন্য কোন ওয়ক্তের যে কোন প্রকারের ছুন্নাত /নফল নামায আরম্ভ করা মাকরূহ।

যে কোন নামাযের ওয়াক্ত সংকীর্ন হয়ে পড়লে অর্থাৎ ওয়াক্তের এমন শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌছল যে, তখন যদি নফল ও ছুন্নাত আদায় করতে যায় তাহলে ওয়াক্তিয়া ফরয নামায ওয়াক্তের ভিতর আদায় করার সময় থাকেনা, সে স্থলেও ছুন্নাত এবং নফল আদায় করা মাকরুহ, বরং তাড়াতাড়ি ওয়াক্তের সুনির্দিষ্ট ফরয/ওয়াজিব নামায সমূহই শুধু আদায় করে নিতে হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম যখন খোৎবা দেওয়ার জন্য দাড়াবেন (কারো কারো মতে মিম্বরে আরোহন করবেন) তখন থেকে খোৎবা শেষকরা পর্যন্ত সময়ে যে কোন প্রকারের ছুন্নাত ও নফল নামায আরম্ভ করতঃ আদায় করা মাকরূহ। (শামী, গায়াতুল আওতার ইত্যাদি)

আর খোৎবা দানের সময় কাযা নামায আদায় করা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান হল, যে লোকের জীবনের এ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের বেশী কোন কাযা নামায নাই– যাকে শরীয়াতের পরিভাষায় "ছাহেবে তারতিব" বলা হয়, এ জাতীয় মুছাল্লির তারতিব রক্ষা করার জন্য খোৎবা দানের সময়েও কাযা নামায আদায় করে নেওয়ার অনুমতি রয়েছে।

কিন্তু সাধারণ মুছাল্লিদের জন্য খোৎবা দানের সময়ে কাযা নামায আদায় করাও মাকরূহ। (দুররে মোখতার)

উল্লেখ্য যে, যদি কোন লোক তাহাজ্জুদ নামায ছোবহে কাজেব অর্থাৎ ছোবহে ছাদেক হওয়ার আগে আরম্ভ করতঃ এক রাকাত আদায় করা অবস্থায় ছোবহে ছাদেক হয়ে যায় এবং বাকী এক রাকাত ছোবহে ছাদেক তথা ফজরের ওয়াক্তের মধ্যেই আদায় করে তাহলে উহা তাহাজ্জুদের নামাযের মধ্যেই গন্য হবে এবং মাকরূহও হবেনা। কেননা ইহা অনিচ্ছায় হয়ে পড়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে করে নাই।

(শামী, জাওহারাতুন নাইয়ারা)

মেরু অঞ্চলের নামাযের হুকুম

ভূগোলবিদগণের প্রদত্ত বিবরনী অনুযায়ী জানা যায় যে, পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরু অঞ্চলে এরূপ কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে দিবা-রাতের আবর্তন অন্যান্য অঞ্চলের নিয়ম মাফিক নয়, মেরু অঞ্চলে বৎসরে একটানা ছয় মাস দিন ও ছয়মাস রাত হয়ে থাকে, আর মেরুর নিকটবর্তী কোন কোন অঞ্চলে দিন-রাতের আবর্তন এমনভাবে হয়ে থাকে যে, সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর আকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়ার আগেই ছুবহে ছাদিকের উদয় ঘটে, অর্থাৎ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয়েপড়ে, যদ্দরুন ঐসব অঞ্চলে এশা ও বিতির নামাযের ওয়াক্তই পাওয়া যায় না। অনুরূপ কোন কোন জায়গায় সূর্য মোটেই অস্ত যায়না। যেহেতু ইসলামী শরীয়াতে নামাযের ওয়াক্ত-সময়সূচী সূর্যের আবর্তন ও গতির ভিত্তিতে নিরূপিত হয়ে থাকে, ঐ কারণে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য নামাযের ওয়াক্ত নির্ণয় করার ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় ইসলামের মুজ্‌তাহিদ ফকীহগণের মধ্যে ইখতেলাফ হয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে হানাফী ফোকাহায়ে কেরামগণ থেকে দু'টি অভিমত পাওয়া যায় ঃ-

✪ একদল ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে, মেরু অঞ্চলের যে যে এলাকায় যে যে ওয়াক্তের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, সেখানে সে ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরয নয়,

কানজুদ্ দাকায়েক, দুরর ও মুল্তাকাল্ আবহোর নামক ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থত্রয়ের মুছান্নিফগণ নামাযের ওয়াক্ত পাওয়া না গেলে নামায আদায় করা ফরয নয়, স্ব-স্ব গ্রন্থে এমতটিরই বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মতে আর যেখানে নামাযের ওয়াক্তসমূহ দেরীতে আসে সেখানে সে ওয়াক্তের নামায দীর্ঘ বিলম্বিত সময়ের পরেই ফরয হবে।

এর হেতু হল, নামায ফরয হওয়ার কারণ হল ওয়াক্ত হওয়া; সুতরাং যেখানে সে ছবব-কারণ পাওয়া যাবেনা- সেখানে (مسبب) মুছাব্বাব অর্থাৎ নামায ফরয হবে না।

ছাইফুছ্ছুন্নাহ আল্লামা বাক্কালী (র) এ অবস্থায় এশা'র নামায ঐ অঞ্চলের লোকদের পড়া লাগবেনা বলেই ফতোয়া দেন, এরপর ইমাম শামসুল আইম্মা হালুয়ানীও উনার মতকেই সমর্থন করেন। আল্লামা বাক্কালী নিজের মতের পক্ষে যুক্তি স্বরূপ বলেন- যেরূপ কোন লোকের দু'হাত-দু'পা না থাকলে তারজন্য হাত-পা ধোয়ার ফরয ব্যতিরেকে ওযু সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, অনুরূপ যে অঞ্চলে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত থাকে সে অঞ্চলে পূর্ণ একবছরে মাত্র একদিনের নামায তথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয হবে।

✪ আর যে অঞ্চলে সন্ধ্যার লালিমা অস্তমিত হওয়ার আগেই পুনঃ ছুবহে-ছাদেক তথা ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে পড়ে- সে সব অঞ্চলে এশা ও বিতিরের নামাযের ওয়াক্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে এশা'ও বিতিরের নামায ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ আদায় করা লাগবে না।

✪ অপর একদল হানফী ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ন্যায় মেরু অঞ্চলের অধিবাসীদের উপরও প্রত্যহ পূর্ণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে যাওয়া ফরয।

সূর্যের আবর্তনের ব্যতিক্রমের কারণে যেখানে ওয়াক্তের ব্যাপারে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে অর্থাৎ নিয়ম মাফিক (নামাযের) ওয়াক্তের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। সেসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিকটবর্তী অঞ্চল যেখানে স্বাভাবিক ভাবে পাঁচ ওয়াক্তের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, সেখানকার নামাযের সময়সূচী অনুযায়ী এ মেরু অঞ্চলের অধিবাসীগণকেও দৈনিক নামায আদায় করে যেতে হবে।

✪ বিশ্ব বরেন্য মুহাক্কেক ও মুজ্তাহিদ ফকীহ্ কামাল উদ্দিন ইবনুল হুমাম (রঃ) এমতটিকেই গ্রহণ করেন এবং দুররুল মোখতার গ্রন্থের মুছান্নিফ আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকপী (রঃ) এমতই বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেন। ওয়াহ্বানিয়া গ্রন্থের শারেহ আল্লামা ইব্নে শাখ্না (রঃ) ও এর অনুসরন করেন, এ মতের উপরই বর্তমান মুফতীগণের ফতোয়া।

উক্তমতের অনুসারী ফোকাহায়ে কেরামগণ দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীছ দ্বারা নিজেদের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেন।

✪ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত নাওয়াছ ইব্নে ছাম্আন্ (র) বলেনঃ

ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ وَلُبْثَهُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ. قُلْنَا فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ يَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلٰوةُ يَوْمٍ قَالَ لَا قَدِّرُوْا لَهُ قَدْرَهُ.

অর্থাৎ (একদা) আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দাজ্জাল, এবং পৃথিবীতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন, (এবং বলেন) ঐ চল্লিশ দিনের একটা দিন হবে এক বছরের সমান, আর একটা দিন হবে এক মাসের সমান, অপর একটি দিন হবে এক জুমা তথা এক সপ্তাহের সমান -বাকী অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের সাধারণ দিন গুলোর সমানই হবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এ সময় জনৈক ছাহাবী আল্লাহর প্রিয়নবী (স) কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যখন তার একদিন এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে তখন ঐ পূরা এক বছরের সমান সময়ের একদিনে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করাটা কি যথেষ্ট হবে? উত্তরে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ না -সারা বৎসরে মিলে শুধু একদিনের নামায আদায় করা যথেষ্ট হবে না।

তবে তোমাদেরকে তা অনুমান করতঃ নির্ধারণ করে নিতে হবে, অর্থাৎ এক বছরের সমান ঐ দিনটিকে ২৪ ঘন্টার একদিন ধরে ভাগ ভাগ করে নিতে হবে এবং সে মোতাবেক প্রতি চব্বিশ ঘন্টা অন্তর অন্তর পাচ ওয়াক্ত হিসেবে মোট পূর্ণ এক বছরের নামাযই আদায় করে যেতে হবে।

✪ মুহাক্কিক, সম্রাট হযরত ইব্নুল হুমাম্ (র) বলেন, একথা সকলেরই জানা আছে যে, মে'রাজের রাতে মহান আল্লাহ্তাআলা প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মারফত বান্দাদের উপর মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয করেছেন, পৃথিবীর সব দেশের ও সব অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য এ হুকুম-আদেশ একও অভিন্ন, এক্ষেত্রে মেরু ও অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে না।

✪ নামায ফরয হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার এ-নির্দেশই মূল কারণ, ওয়াক্ত মূল কারণ নয়, বরং ওয়াক্ত হল ঐ ফরয আদায়ের সময় মাত্র, সুতরাং مَحَلِّ فَرْض -কে عَدَمُ السَّبَب রূপে মেনে নেওয়া ঠিক নয়।[১]

টীকা : ১

(١) ومن لا يوجد عند هم وقت العشاء كما قيل يطلع الفجر قبل غيوبة الشفق عند هم افتى البقالى رح بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب وهو

pdf By Syed Mostafa Sakib

সারসংক্ষেপ কথা হচ্ছে ঃ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে ও মৌসুমের পার্থক্যের দরুণ পৃথিবীর সকল স্থানে দিন-রাত এক সমান হয় না, কোথাও কোথাও দিন ছোট হয়ে তের ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে আবার কোথাও কোথাও দিন বড় হয়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে তদুপরি মেরু এলাকায় মাসের পর মাস একটানা দিন ও একটানা রাত চলতে থাকে।

তাই যে সমস্ত এলাকায় ২৪ ঘন্টার বেশী বা একটানা দিন রাত হয়ে থাকে ঐ সকল এলাকার বাসিন্দাগণ তাদের নিকটতম দেশ বা অঞ্চলে যেখানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে দিন রাত হয়ে থাকে ঐ দেশের সময়কে ষ্টান্ডার্ড সময় ধরে সে অনুযায়ী নামায আদায় করে যেতে হবে।[২]

টীকার বাকী অংশ ঃ

مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ـ وانكر الحلوا نى ثم وافقه وافتى الامام البرهان الكبير برجوبها ـ ولا يرتاب متامل فى ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلى الذى جعل علا مة على الوجوب الخفى الثابت فى نفس الامر رجواز تعدد المعرفات للشئ ـ فانتفاء الوقت انتفاء المعرف وانتفاء الدليل على شى لا يستلزم انتفاء لجواز دليل اخر وقد وجد ـ وهو ما تو اطأت اخبار الاسراء من فرض الله تعالى الصلوة خمسا بعد ما امروا اولا بخمسين ثم استقر الامر على الخمس شرعا عاما لاهل الا فاق لا تفصيل فيه بين اهل نطر وقطر ـ وما روى ذكر الدجال رسول الله عليه وسلم ـ قلنا ما لبثه فى الارض ـ قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر و يوم كجمعة قال لا اقدروا له رواه مسلم فقد اوجب اكثر من ثلثمأة عصر قبل صيروزه الظل مثلا اومثلين رنس عليه ـ فاستفد نا ان الواجب فى نفس الامر خمس على العموم غير ان توز يعها على تلك الاوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب ـ وكذا نال صلى الله عليه وسلم ـ خمس صلوات كتبهن الله على العباد ـ ثم هل ينوى القضاء الصحيح انه لا ينوى القضاء لفقد وقت الاداء ومن افتى لوجوب العشاء يجب على قوله الوتر ايضا (فتح القدير جـ١، صفحـ٢٢٤)

টীকার বাকী অংশ ঃ

(قوله ومن لم يجد وقتها لم يجبا) اى العشاء والوتر كما لوكان فى بلد يطلع فيه الفجر قبل ان يغيب الشفق كبلغار فى اقصر ليالى السنة فيما حكا ه معجم صاحب البلدان لعدم السبب وافتى به البقالى كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المر فقين وافتى بعضهم بوجوبها واختاره المحقق فى فتح القدير بثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلى..... الخ (بحر الرائق ج صفحه٢٤٧)

(وفاقد وقتهما) كبلغار فان فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق فى اربعينية الشتاء

(مكلف بهما فيقدر لهما) ولا ينوى القضاء لفقد وقت الاداء به افتى البرهان الكبير واختاره الكمال وتبعه ابن الشحنه فى الغازه فصححه فزعم المصنف انه المذهب (وقيل لا) يكلف لعدم سببهما وبه جزم فى الكنز والدرر والملتقى وبه افتى البقالى ووافقه الحلوانى والمر غينانى ورجحه الشرنبلالى والحلبى (درالمختار)

والحاصل انهما قولا ن مصححان ـ ويتايد القول بالوجوب بانه قال به امام مجتهد وهو الا مام الشافعى كما نقله فى الحلية عن المتولى عنه .... قال الرملى فى شرح المنهاج ـ ويجرى ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة اه قال فى امداد الفتاح قلت ـ وكذلك يقدر لجميع الاجال كالصوم والزكاة والحج والعدة واجال البيع والسلم والاجارة وينظر ابتداء اليوم فيقد ركل فصل من الفصول الاربعة بحسب مايكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا فى كتب الا ئمة الشافعية ونحن نقول مثله اذ اصل التقدير مقول به اجماعا فى الصلوة اهـ ـ (شامى ج ا ـ صفحه ٣٦٥)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আযান ও ইকামত

আযান শব্দের অর্থ اَلْاِعْلَامُ (আল্‌ই'লাম) অর্থাৎ অবগত-অবহিত করা ও ঘোষণা করা ইত্যাদি। যে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ বাক্য দ্বারা বিশেষ বিশেষ সময়ে মুসলিম জনসাধারণকে নামায আদায়ের ব্যাপারে অবগত করা হয় ও নামায আদায়ের প্রতি আহবান করা হয় একে শরীয়াতের পরিভাষায় আযান বলা হয়।[১]

যদিও একটি সুনির্দিষ্ট এবাদত, নামাযের সাথেই আযানের সম্পর্ক, তথাপি ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যহ এ আযানের মাধ্যমেই আল্লাহর এ বিশাল দুনিয়ার শহরে, নগরে, গ্রামে-গঞ্জে এমনকি পাহাড়ের চূড়ায় তথা সর্বত্রই মহীয়ান গরীয়ান মহা-মহিম প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহত্বের ও একত্ববাদের ঘোষণা ধ্বনিত হচ্ছে। নিখিলের নবী আল্লাহর হাবীব রহমাতুললিল আলামীন (দঃ) এর রেছালতের সুমধুরসুর ধ্বনিত হচ্ছে। মূলতঃ এ আযান ইসলাম ও মুসলিমের গৌরব এবং ঐতিহ্যের প্রতিক, ইসলামী সাংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

ইহা শয়তান তথা আল্লাহ দ্রোহী নাস্তিক মালউনদের জন্য এটমের চেয়েও মারাত্মক।

তাই যেমনিভাবে শয়তান এ আযানের আওয়াজকে মোটেই সইতে পারে না বরং আযানের সুর ধ্বনি বেজে উঠার সাথে সাথে সে দ্রুত পালিয়ে যায়। তেমনি ভাবে মানুষের মাঝেও এমন কিছু মানব রূপী শয়তান রয়েছে যারা এ আযানের আওয়াজকে মোটেই সহ্য করতে পারে না।

প্রত্যহ নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক মোমেনকে যে মহান আল্লাহর জিকির- এবাদত তথা নামায আদায় করে যেতে হয়, ঐ সুনির্ধারিত সময় সমাগত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণকে সতর্ক ও অবগত করনের উদ্দেশ্যেই শরীয়াতে আযান প্রবর্তিত হয়।

প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হিজরী সনেই আযানের প্রবর্তন হয়।

টীকা ঃ ১

اَلْاَذَانُ هُوَ الْاِعْلَامُ بِالْفَاظٍ مَّخْصُوْصَةٍ فِىْ اَوْقَاتٍ مَّخْصُوْصَةٍ لِاِحْضَارِ النَّاسِ لِلصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ ـ

هُوَ اِعْلَامٌ مَّخْصُوْصٌ عَلٰى وَجْهٍ مَّخْصُوْصٍ بِالْفَاظٍ مَّخْصُوْصَةٍ (در مختار)

✪ আযানের ফাযায়েল ঃ

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, এ লোকের চেয়ে কার বাণীই উত্তম যে আল্লাহ জাল্লা শানুর প্রতি আহবান করে এবং আমলে ছালেহ করে ও বলে যে, আমি নিশ্চয়ই মুসলমানদেরই একজন।

✪ হযরত আনছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন আযান বলা হয় তখন আসমানের (রহমতের) দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং যখন একামতের ওয়াক্ত হয় তখন কোন দোয়া করলে তা রদ হয় না। (رواه ابو الشيخ)

✪ অপর এক হাদীস শরীফে এসেছে, রাসুল পাক (স) এরশাদ করেন ঃ

كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَذَّنَ فِىْ قَرْيَةٍ اٰمَنَهَا اللّٰهُ مِنْ عَذَابِهٖ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ـ (كشف الغمة)

অর্থাৎ যে জনপদে (এলাকায়) আযান দেওয়া হয় আল্লাহ তাআলা ঐ এলাকাকে ঐ দিনের জন্য আজাব থেকে নিরাপদ রাখেন।

✪ অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী আকরাম (স) এরশাদ করেন,

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى (بخارى)

অর্থাৎ যখন আযান হতে থাকে তখন শয়তান বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে যেন আযানের আওয়াজ শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে আবার সে ফিরে আসে। যখন ইকামত বলা হয় পুনঃ সে পালিয়ে যায়। ইকামত শেষ হলে সে পুনরায় এসে নামাযরত লোকদের মনে নানা ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। যে সব বিষয় স্মরণে থাকে না ঐ সব স্মরণ করাতে থাকে এতে শেষ পর্যন্ত কত রাকাত নামায পড়া হয়েছে মুসাল্লী তা পর্যন্ত ভুলে বসে। (বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড)

✪ হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ কেয়ামতের দিন মোয়াজ্জেনদের গরদান বেশী উচু হবে অর্থাৎ তারা অত্যধিক সম্মানী হবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ অন্য একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ وَهُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِّنْ مِسْكٍ حَتّٰى يَفْرُغَ حِسَابُ الْخَلَائِقِ - رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَاَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ - وَدَاعٍ يَدْعُوْ اِلَى الصَّلٰوةِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَعَبْدٌ اَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ رَبِّهٖ وَفِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ (رواه الطبرانى فتح القدير)

অর্থাৎ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিন শ্রেণীর লোক কেয়ামতের মহা সংকট দিবসের ভয়-ভীতির মধ্যে পড়বেনা এবং তাদের হিসাব-নিকাশও নেওয়া হবেনা। বরং ভীষণ চিন্তা-ভীতির দিবসেও এরা (পানাহারের) আনন্দে মশগুল থাকবে। এরই মাঝে মাখলুকের হিসাব-নিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এদের এক শ্রেণী হচ্ছেন (ঐ সমস্ত আলেম) যারা একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে আল্লাহর কোরআন তথা কোরআন-ছুন্নাহর এলম শিক্ষা করেন অতঃপর কওম তথা মুছাল্লীদের সন্তুষ্টি রেখে ইমামতির দায়িত্ব পালন করে যান।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে, ওরা (মোয়াজ্জেনেরা) যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আযান দিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর নামাযের দিকে আহবান জানিয়ে থাকেন। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে ওরা যারা তাদের প্রভু আল্লাহ তাআলার হক (নামায, রোজা ইত্যাদি) সঠিক ভাবে আদায় করেছেন সাথে সাথে তার দুনিয়ার মনিবের দেওয়া দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন করে গিয়েছেন। (তিরবানী -ফাতহুল কাদীর)

অপর একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহর নবী (দঃ) এরশাদ করেন-

لِلْاِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى مَعَهُمَا - (كشف الغمه)

অর্থাৎ ইমাম-মোয়াজ্জেন যাদের কে নিয়ে জমাত সহকারে নামায আদায় করে থাকেন তাদের প্রত্যেকে (ব্যক্তিগত ভাবে) যত ছাওয়াব পাবে ঐ সকল মুছাল্লিদের ছাওয়াবের সমপরিমান ছাওয়াব ইমাম-মোয়াজ্জেন একাই পাবেন।

হাদীছ শরীফে আরও উল্লেখ আছে ঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এক মাত্র ছাওয়াবের আশায় পাঁচ ওয়াক্ত (নামাজের জন্য) আযান দেয় তার অতীতের গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায় এবং যে লোক ঈমান সহকারে একমাত্র ছাওয়াবের আশায় নিজের সাথী সঙ্গীদের (মুছাল্লীদের) ইমামতির দায়িত্ব পালন করে থাকে তার অতীতের গুনাহ সমূহও মাফ করে দেওয়া হয়। (বায়হাকী)

আযানের মাছায়েল ঃ

প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং জুমআ বারে যোহরের স্থলে জুমআর নামাযের জন্য নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর পুরুষ মুসলমানদের উপর আযান দেওয়া ছুন্নাতে মুয়াককাদাহ কেফায়া, আর কারো কারো মতে ওয়াজিবে কেফায়া।

অপর এক শ্রেণী ফোকাহায়ে কেরামের মতে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করার জন্যই আযান দেওয়া ছুন্নাত।[১]

যে কোন একজন লোক আযান দিয়ে দিলে যত দূরের লোকেরা উক্ত আযান শুনতে পায় তাদের প্রত্যেকেই ছুন্নাতে মুয়াককাদা কিংবা ওয়াজিব আদায়ের দায় দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে। আর কেহ যদি আযান না দেয় তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।

এমনি ভাবে মহল্লা, গ্রাম বা শহর বাসীর সকলেই যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে আযান একামত বলা পরিহার করে বসে এমতাবস্থায় সবাইতো গুনাহগার হবেই বরং হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর মতানুসারে এধরনের ইচ্ছাকৃত ভাবে আযান একামত তরককারিদের সাঙ্গে (প্রয়োজনে) জেহাদ করতে হবে। যেহেতু আযান হচ্ছে شعار الاسلام واعلام الدين (ইসলামের নিদর্শন ও দ্বীনের প্রতীক)·

আমাদের হানাফী মাজহাব অনুযায়ী নিয়ম হল প্রত্যেক ফরয নামায তা ঠিক ওয়াক্তের ভিতরে আদায় করা হউক বা কাযা আদায় করা হউক, জমাত সহকারে আদায় করা হউক কিংবা একাকী ঘরে পড়া হউক এসব ক্ষেত্রে আযান ও একামত বলতে হয়। (আলমগীরী গায়াতুল আওতার)

ঘরে একাকী নামায আদায়কারীর জন্য মহল্লার মাসজীদের আযানই যথেষ্ট। তবে একাকী নামায আদায় করার বেলায় একামত বলেই নামায আদায় করা উত্তম। অনুরূপ ঘরে জমাত সহকারে নামায আদায়ের জন্য আযান দেওয়া উত্তম। একামত বলা জরুরী।

টীকা ঃ

اَلْاَذَانُ سُنَّةٌ فِىْ قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .... وَقَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا وَاجِبٌ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رح (شرح منية) هُمَا سُنَّةٌ لِلصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ اَدَاءً وَقَضَاءً (سنن للفرائض) اى سَنَّ الْاَذَانَ لِلصَّلٰوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ قَوِيَّةٌ قَرِيْبَةٌ مِنَ الْوَاجِبِ حَتّٰى اَطْلَقَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُجُوْبَ وَلِهٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رح لَوِاجْتَمَعَ اَهْلُ بَلَدٍ عَلٰى تَرْكِهٖ قَاتَلْنَا هُمْ عَلَيْهِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح يُحْبَسُوْنَ وَيُضْرَبُوْنَ (بحر الرائق) لِاَنَّ الْاَذَانَ مِنْ اَعْلَامِ الدِّيْنِ (شرح منية)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযান ও একামতের বাক্যসমূহ শুদ্ধ রূপে জানা ব্যক্তি(১) আযান একামত (২) ও নামাযের মছায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞ পরহেজগার (৩) বয়ঃপ্রাপ্ত (৪) সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন (৫) পুরুষ লোকের (৬) ওযুর সাথে (৭) কেবলা মুখী হয়ে (৮) উচ্চস্থানে (৯) দাড়িয়ে (১০) উভয় কানের ছিদ্র পথে শাহাদত আঙ্গুলী প্রবেশ করিয়ে (১১) শুদ্ধ ভাবে (১২) আযানের বাক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতঃ (১৩) উচ্চ ও সুমিষ্ট স্বরে (১৪) আযান দেওয়া সুন্নাত (বদায়ে উচ্ছানায়ে, দুররে মোখতার)

✪ এক বাক্য উচ্চারণ করার পর শ্রোতা যেন এর জাওয়াব দিতে পারে, দু-বাক্য উচ্চারণের মাঝ খানে এতটুকু সময় বিলম্ব করে আযান দেওয়া সুন্নাত।

✪ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দিয়ে দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দেওয়া জরুরী (আলমগীরী)

✪ গোছল ফরয হয়েছে অবস্থায় গোছল না করে আযান দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী (আলমগীরী)। এ ক্ষেত্রে পাক পবিত্র হয়ে পুনরায় আযান দেওয়া লাগবে। (শামী, বাহরুর রায়েক)

✪ স্ত্রী লোকদের আযান ও একামত বলা মাকরূহে তাহরীমী। এদের দেওয়া আযান পুরুষ কর্তৃক দোহরায়ে দিতে হবে। (বাহরুর রায়েক, শামী, তাহতাবী)

✪ অবুঝ ছেলে, পাগল ও নেশাগ্রস্থ মাতালদের আযান মাকরূহ এবং এক্ষেত্রেও পুনরায় আযান দেওয়া জরুরী। তদুপরি হেটে হেটে কিংবা বসে বসে আযান দেওয়াও মাকরূহ (বাহরুর রায়েক)। তবে নাবালেগ ছেলে বুদ্ধিমান হলে তার দেওয়া আযান মাকরূহ নহে। (আলমগীরী)

✪ বিনা ওযুতে আযান দেওয়া মুস্তাহাবের খেলাফ। তবে ঘটনাক্রমে বিনা ওযুতে আযান দিয়ে দিলে পুনঃ আযান দোহরানো লাগবে না। (আলমগীরী)

✪ মুছাফেরের একা নামায আদায় করার বেলায় আযান-একামত উভয়টা তরক করা মাকরূহ! শুধু আযান তরক করলে মাকরূহ হবে না। (জামেরউ রুমুজ)

✪ যে মাসজিদে ইমাম মুয়াজ্জেন নির্ধারিত আছেন ঐ ধরনের মাসজিদে আযান একামতসহ জামাত সহকারে একবার জামাত হয়ে থাকলে পরে আগত মুছাল্লীদের পুনঃ আযান-একামত দিয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ। কিন্তু এ জাতীয় মাসজিদে কতেক অজানা মুসাল্লি এসে নিজেরা আযান বলে নামায আদায় করে নেওয়ার পর প্রত্যেক দিনের ন্যায় নির্ধারিত সময়ে ইমাম-মোয়াজ্জেন ও নিয়মিত মুছাল্লিবৃন্দ এসে জমাতে নামায আদায় করার বেলায় পুনঃ আযান একামত বলেই জমাত আদায় করা মুস্তাহাব। (আলমগীরী)

✪ যে মসজিদে ইমাম-মোয়াজ্জেন নির্ধারিত নাই ঐ সব মাসজিদে পৃথক পৃথক আযান- একামত বলে জমাত আদায় করা মাকরূহ নহে। ঘরে বা অন্যত্র কাযা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে জামায়াতের সাথে আদায় করা হউক কিংবা একাকী আদায় করা হউক একটু নিম্নস্বরে আযান ও একামত বলা সুন্নাত (গায়াতুল আওতার)। কিন্তু মাসজিদে কাযা নামাজ আদায় করার বেলায় আযান একামত বলবে না। (শামী)

✪ নামায ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে আযান দেওয়া মস্তাহাব ঃ

১। সন্তান জন্ম নেওয়ার পর গোছল দিয়ে তার কানে আজন দেওয়া মুস্তাহাব।

২। অধিক চিন্তাক্লিষ্ট ব্যক্তির কানে।

৩। ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত ব্যক্তির কানে।

৫। দুষ্ট জ্বিনের উৎপীড়ন অবস্থায়।

৬। নির্জন মাঠে বা জায়গায় পথ হারিয়ে গেলে।

৭। প্রবল ঝড়-তুফান ভুমীকম্প চলাকালে ৫/৭ জন মিলে আযান দেওয়া মুস্তাহাব। (শামী)

৮। জ্বিন-ভুতের উপদ্রব থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ী বন্ধ করার বেলায়ও আযান দেওয়া জায়েজ।

আযান দেওয়ার নিয়ম

নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর মোয়াযযিনকে ওযু অবস্থায় উচু স্থানে কেবলা মুখী হয়ে দাড়াতে হয়। অতপর বাধ্যবাধকতা স্বরূপ নয় বরং ঐচ্ছিক ভাবে ঈমান ও নবী প্রেমের তাড়নায় যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আল্লাহ রাছুলের সন্তোষ ও ভালবাসা অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রিয় নবী শাফিউল মুজনেবীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লমের উপর-

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া ছায়্যিদী এয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া ছায়্যিদী এয়া নাবীয়্যাল্লাহ,আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া ছায়্যিদীএয়া হাবীবাল্লাহ, আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া রাহমাতাল লিল আলামীন আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া শাফীয়াল মুজনেবীন। উক্ত নিয়মে ছালাত-ছালাম (দরূদ) পেশ করা উত্তম।[১]

টীকা ঃ

(وتسن الصلوة) اى غير الصلوة والسلام بعد الاذان (على النبى صلى الله عليه وسلم قبل الاقامة على ما قاله النووى رح فى شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد وقال اما قبل الاذان فلم ار فى ذلك شيئا وقال الشيخ الكبير البكرى رح (انها) اى الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم (تسن قبلهما) اى الاذان والاقامة - (اعانة الطالبين صفحه ٢٨٠ جـ١)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর ২/৩ মিনিট নিরবতা পালন করে আযানের বাক্যাবলী ও ছালাত ছালামের মাঝখানে কিছুটা ফাঁক সৃষ্টি করা দরকার। যাতে দরূদ ছালামের বাক্যগুলো আযানের বাক্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে না যায়।

বিরতির পর উভয় হাতের শাহাদত আঙ্গুলিদ্বয়কে দু'কানের ছিদ্রপথে রেখে উচ্চ আওয়াজে সুমিষ্টস্বরে আযানের সুনির্ধারিত বাক্যগুলো শুদ্ধভাবে ধীরস্থীরতার সাথে সপষ্টরূপে উচ্চারণ করতঃ আযান দিতেহয়।

✪ আযানের বাক্য 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' বলার সময় ডান দিকে মুখ ফিরাতে হয়। অনুরূপ 'হাইয়া আলাল্ ফালাহ' বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরাতে হয়।

আযান ও উহার জাওয়াবের নির্ধারিত বাক্যসমূহ ঃ-

আযানের শুরুতে সর্ব প্রথম মুয়াযযিন সাহেব কে বলতে হয়,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর)

এর জবাবে শ্রোতাগণকে মৃদুস্বরে এ একই বাক্য বলে যেতে হয়–

২য় বার মুয়াযযিনকে বলতে হয়,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর)

এর জবাবে শ্রোতাগণকে মৃদু স্বরে একই বাক্য বলে যেতে হয়।

৩য় বার মুয়াযযিন কে বলতে হয়,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশহাদু আললা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

এরজবাবে শ্রোতাগণকে মৃদ স্বরে একই বাক্য বলে যেতে হয়।

৪র্থ বার মুয়াযযিনকে বলেতে হয়,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশহাদু আললা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

এর জবাবে শ্রোতাগণকে মৃদুস্বরে একই বাক্য বলে যেতে হয়।

৫মবার মুয়াযাযিনকে বলতে হয়ঃ-

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ)

এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, শ্রোতাগন মুয়াযযিনের مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ) বাক্যাংশ শুনার সাথে সাথে প্রিয় নবী (দ:)-এর প্রতি তা'জীম ও মুহাব্বত প্রদর্শনার্থে অতি নম্রতা ও আদবের সাথে নিজের দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গালিদ্বয়ের নখে মুখ দ্বারা চুমু দিয়ে–

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ছাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাছুলাল্লাহ)

বলে নিজের চোখে লাগাবে, ইহা একটি মুস্তাহাব আমল।

মুয়াযযিনের উক্ত শাহাদত কলেমা বলার মধ্যেই শ্রোতাগণ চুমু দানের আমল শেষ করে মুয়াযযিনের অনুরূপ শ্রোতাগণ কেও পুনরায় এ একই বাক্য আশ্হা দুআন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ বলতে হয়।

৬ষ্ঠ বার মুয়াযযিনকে বলতে হয়–

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ)

আর শ্রোতাগণ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ) বাক্য শুনার সাথে সাথে পূর্ব নিয়মে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে চুমু দিয়ে قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (কুররাতু আইনি বিকা এয়া রাছুলাল্লাহ) বলে দু'চোখে লাগাতে হয় অতঃপর বলতে হয়,

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

(আল্লাহুম্মা মাততি'নী বিচ্ছাম্য়ী ওয়াল বাছারি)

অতপর মুয়াযযিনের অনুরূপ শ্রোতাগণকেও পুনরায় একই বাক্য 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ' বলতে হয়।

৭ম বারে মুয়াযযিনকে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়—

حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাচ্ছালাহ)

এর উত্তরে শ্রোতাগণকে বলতে হয়,

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاْ لَمْ يَكُنْ

লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ মা'শা আল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন।

৮ম বারও মুয়াযযিনকে অনুরূপ ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে পুনরায় বলতে হয়,

حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাচ্ছালাহ)

শ্রোতাগণকে উত্তরে পূর্বে উল্লেখিত ঐ একই বাক্য বলতে হয়।

৯ম বার মুয়াযযিনকে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়,

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ)

এবং শ্রোতাগণকে উত্তরে ঐ ....لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ)

(লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা.....) শেষ পর্যন্ত বলতে হয়।

১০ম বারও মুয়াযযিনকে অনুরূপ বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়,

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং শ্রোতাগণকে উত্তরে এ লা-হাওলা শেষ পর্যন্ত বলতে হয়।

একাদশ বারে মুয়াযযিনকে বলতে হয়ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লহু আকবর আল্লাহু আকবর)

শ্রোতাগনকে উত্তরে এ একই বাক্য বলতে হয়।

দ্বাদশ বারে মুয়াযযিনকে বলতে হয়—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ)

আর শ্রোতাগণকেও উত্তরে এ একই কালেমা বলতে হয়।

উল্লেখ্য যে, মুয়াযযিনকে শুধু মাত্র ফযর ওয়াক্তের আযানে হাইয়া আলাল ফলাহ" দ্বিতীয় বার বলা শেষ করে অতঃপর–

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌمِنَ النَّوْمِ (আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম)

একে একে দুবার বলতে হয় এবং শ্রোতাগণকে প্রতিবার উত্তরে—

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ

(ছাদাকতা ওয়া বাররতা ওয়া বিলহাককি, নাত্বাকতা) –বলতে হয়।

আযান শেষের দোয়া ও দরূদ শরীফ ঃ

যখন আযান বলা শেষ হয় তখন ছহীহ হাদীছ শরীফের নির্দেশ অনুসারে মুয়ায্যিন সাহেবের এবং শ্রোতামণ্ডলী সকলেরই আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা অতপর হাদীছ শরীফে বর্ণিত নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করতঃ হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা ছুন্নাতঃ-

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

আল্লাহুম্মা রাব্বা হা জিহিদ্দা ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াচ্ছালাতিল্ কা-য়িমাতি আ-তি ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদানিল্ ওয়াছীলাতা ওয়াল্ ফাদীলাতা ওয়াদ দারাজাতার্ রাফীআতা ওয়াব্ আছহু মাকামাম্ মাহ্মুদানি ল্লাযী ওয়া আদ্তাহু ওয়াজ্ আল্না ফী শাফা আতিহি ইয়াও মাল্ কিয়ামাতি (ওয়ারযুক্না শফা-আতাহু ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি) ইন্নাকা লা- তুখ্লিফুল্ মীয়াদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! পরিপূর্ণ আহবান ও অনুষ্ঠিতব্য নামাযের মহান মালিক! হুর ওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে ওয়াছিলা নামক সম্মানের সর্বোচ্চ স্থান, সর্বোত্তম মর্যাদা ও সুমহান সম্মান দান করুন এবং মাকামে মাহমুদ তথা হাশর দিবসে শাফয়াত করার চরম প্রশংসিত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করুন, যার অঙ্গিকার আপনি তাকে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তার শাফায়াত-সুপারিশের মধ্যে শামিল করে নিন,নিশ্চয় আপনি কখনো ওয়াদা- প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

মুছলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছ পাকে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ ....فَمَنْ سَالَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ ـ

অর্থাৎ যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনতে পাবে তখন মুয়ায্যিন যা বলবে প্রতি উত্তরে তোমরাও অনুরূপ কালেমা গুলো বলে যাবে, অতপর তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত (করুনা) বর্ষণ করে থাকেন। এরপর তোমরা দোয়ায়ে ওয়াছিলা তথা আযানের দোয়া পাঠ করবে ----আর যে (আমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ দোয়া পাঠ করবে তার জন্য অমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আযান শেষের দোয়া পাঠের বেলায় বর্তমানে আমাদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য দেখা যায়।

আযানের দোয়ার শেষে 'ওয়ারজুক্না শাফায়াতাহু ইয়াওমাল্ কিয়ামাহ' বাক্য খানা ইতিপূর্বে বিনা দ্বিধায় সবাই বললেও এখন এটা বলার ব্যাপার নিয়ে এক শ্রেণীর লোক প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে দিয়েছে যে, উল্লেখিত বাক্য খানা হাদীছে নাই সুতরাং উহা বলা যাবে না।

সন্মানিত পাঠক, এ প্রসঙ্গে আপনাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, ইসলামী জগতের সর্বমান্য ফেকাহ শাস্ত্রের অন্যতম কিতাব হেদায়ার ব্যাখ্যগ্রন্থ

'ফাতহুল কাদীর' এ আল্লামা কামাল উদ্দিন ইবনুল হুমাম (রাঃ) আযান শেষের 'দোয়া' প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত দোয়া সমূহের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মনীষী ইমাম তিবরানী (রঃ) এর 'মো'জামুল কাবীর' নামক হাদীছ গ্রন্থের বরাতে একটি হাদীছ শরীফের উল্লেখ দেন ঃ

وَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيْلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ـ

অর্থাৎ হুজুর পুরনুর (দ:) এরশাদ করেছেন—

"যে কেউ আযান শুনে পাঠ করবে, আশহাদু আল্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শরীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু আল্লাহুম্মা ছাল্লী আলা মোহাম্মাদিন ওয়া বাল্লিগহু দারাজাতাল্ ওয়াছিলাতি ইন্দাকা ওয়াজ্ আল্‌না ফী শাফা আতিহী ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি। তার জন্য (আমার) শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে পড়বে।"

✪ মুনিয়তুল মুছাল্লি কিতাবের শরাহ غنية المستملى গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

✪ এমনিভাবে হাদীছ শাস্ত্রের অপর প্রসিদ্ধ মনীষী হযরত ইমাম ছাখাভী (র:) اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ الشَّفِيْعِ নামক কিতাবের اَلصَّلٰوةُ بَعْدَ الْاَذَانِ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন—

اَخْرَجَهُ ابْنُ عَاصِمٍ وَالطَّبْرَانِىُّ فِى الدُّعَاءِ وَالْكَبِيْرِ وَالْاَوْسَطِ وَلَفْظُهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ / قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هٰذَا عِنْدَ النِّدَاءِ جَعَلَهُ اللّٰهُ فِىْ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনো আছেম (রাঃ) এবং আল্লামা হযরত ইমাম তিবরানী স্বীয় কিতাব যথাক্রমে আদদোয়া আল্‌মুজামুল্ কবীর' এবং আল্ মুজামুল্ আওছত্ এর মধ্যে বর্ণনা করেনঃ হুজুর (দঃ) যখন আযান শুনতেন তখন বলতেন, আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ্দাওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াচ্ছালাতিল ক-য়িমাতি, ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়ারাছুলিকা ওয়াজ আল্‌না ফী শাফাআতিহি ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি।

উক্ত দোয়া সম্পর্কে হুজুর (দঃ) বলেন, যে কেউ আযান শুনে এ দোয়া পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিবসে আমার শাফায়াতের অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।

وَرَوٰى اَبُوالشَّيْخِ مِنْ حَدِيْثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض يَرْفَعُهُ مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَبْلِغْهُ الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيْلَةَ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّاوَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ـ

(عمدة القارى شرح بخارى ج ـ ٥ صفحه ١٢٤)

সম্মানিত পাঠক সমাজ!

আপনারা উপরে উল্লেখিত হাদীছ শরীফ সমূহে নিশ্চয়ই দেখতে পেলেন যে, আল্লাহর মহান রাছুল (দঃ) এর বানীতে وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ বাক্যখানা রয়েছে।

হাদীছ বিষয়ের জ্ঞানী মাত্রেরই জানা থাকার কথা যে اجعلنا (ইজ্‌আল্‌না) আর ارزقنا (উরজুক্‌না) এ ক্ষেত্রে শব্দ দু'টির প্রয়োগ, উদ্দেশ্য ও মমার্থ প্রায় একই।

তাই এস্থলে হাদীছ শরীফে হুবহু ارزقنا শব্দটির উল্লেখ না থাকলেও তার ভাবার্থ বোধক শব্দ اِجْعَلْنَا হাদীছ শরীফে নিশ্চয়ই রয়েছে। رِوَايَتْ بِالْمَعْنٰى-এর সুত্রে কোন হাদীছ বিশারদ মনীষী আযানের দোয়ার ক্ষেত্রে اُرْزُقْنَا ব্যবহার করলে হাদীছের বিপরীত হওয়ার কথা নয় বরং হাদীছ শরীফ অনুযায়ী দোয়া পাঠকরা হয়েছে বলে প্রমানিত হবে।

এ প্রসঙ্গে এর চেয়ে আরও অধিক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। খাটি ও অকৃত্রিম নবী প্রেমিক উম্মাতের আমলের জন্য অতটুকু প্রমাণই যথেষ্ট।

আযানের জাওয়াব দান প্রসঙ্গ ঃ

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে দুভাবেই আযানের জাওয়াব দিতে হয়। (১) কার্যতঃ জাওয়াব প্রদান করা ও (২) মৌখিক ভাবে জাওয়াব প্রদান করা।

প্রথমতঃ যে এবাদতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য আযান দেওয়া হল সে এবাদত তথা নামায আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ পূর্বক নামায আদায়ের মাধ্যমে আযানের জাওয়াব দান করা যাকে جواب فعلى (কার্যতঃ জাওয়াব প্রদান করা) বলা হয়। সকল ফোকাহায়ে কেরামগনের মতে এভাবে কার্যতঃ আযানের জাওয়াব প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। কারণ প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যহ পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরযে আইন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যহ মোয়াজ্জিনের আযান দানের বাক্য সমূহ শুনার সাথে সাথে মৌখিক ভাবে মোয়াজ্জিনের একই রূপ বাক্যাবলী বলে আযানের মৌখিক জাওয়াব প্রদান করা হযরাত ফোকাহায়ে কেরাম (রাঃ) গনের কতেকের মতে ওয়াজিব। অপর কতেকের মতে আযানের মৌখিক জাওয়াব প্রদান করা ছুন্নাত, আর কতেকের মতে মুস্তাহাব। তবে মৌখিক জাওয়াব প্রদান ছুন্নাত হওয়াটাই বেশী গ্রহণ যোগ্য রূপে প্রমাণিত হয়।

✪ পবিত্র ছহী হাদীছ শরীফে হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন,

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ - (بخارى شريف)

অর্থাৎ যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাবে তখন মোয়াজ্জিনের ন্যায় একই বাক্য বলে আযানের উত্তর দিবে। (বোখারী শরীফ)

✪ হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِىْ الْجَنَّةِ لَاتَنْبَغِى اِلَّالِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ (مسلم)

অর্থাৎ তিনি আল্লাহর রাসূল (দঃ)-কে এরশাদ করতে শুনেছেন যে, তোমরা যখন মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাবে তখন তোমরাও মোয়াজ্জিনের ন্যায় একই বাক্যসমূহ বলে আযানের জাওয়াব দিবে। আযান শেষ হলে তোমরা আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে। কেননা যে লোক আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত দান করবেন। অতঃপর দোয়ায়ে ওয়াছিলা তথা আযানের নির্ধারিত দোয়া পাঠ করতঃ আমার জন্য আল্লাহর দরবারে ওয়াছীলা নামক স্থান বা মর্যাদা দানের জন্য ফরিয়াদ জানাবে।

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহর নবী (দঃ) এরশাদ করেছেন, কোন মোমেনের বদবখত ও বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইহাই যথেষ্ট যে,সে প্রত্যহ আযান শুনে অথচ এর উত্তর দেয়না।

✪ অন্য একটি হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে যে,আল্লাহর রাসূল (দঃ) এরশাদ করেছেন, চার প্রকারের লোক (কেয়ামত দিবসে) জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

প্রথমতঃ যে লোক দাড়িয়ে পেশাব করে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি নামাযে কপালে লাগা ধুলা বালি নামাযরত অবস্থায় মুছতে থাকে, তৃতীয়তঃ যে লোক প্রত্যহ আযান শুনে অথচ আযানের জাওয়াব দেয় না। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি আমার নাম শুনে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না। (তাবয়ীনুল হকায়েক)

হাদীছ শরীফে আরো বর্নিত আছে যে,

وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُبِاِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ حَتّٰى يَسْمَعُ مَنْ حَوْلَهُ (كشف الغمه)-

অর্থাৎ রাসূল আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আযানের জাওয়াব এতটুকু বড় আওয়াজে দিতেন যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর পাশের লোকেরা তা শুনতে পেত। উপরের হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযানের মৌখিক জাওয়াব দান করা ছুন্নাত। কেননা, হাদীছ শরীফের শব্দ প্রয়োগের প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায় যে, আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) আযান শ্রবণ কারীদের প্রতি আযানের উত্তর দেওয়ার জন্য فَاسْعَوْ (ফাছআও) অর্থাৎ নামাযের দিকে যাও বলেন নাই বরং তিনি হুকুম করেছেন قُوْلُوْا (কুলু) বল। বলাটা মুখের সাথেই সম্পৃক্ত সুতরাং আল্লাহর নবী (দঃ) এর এ আদেশের দ্বারা মৌখিক জাওয়াবই ছুন্নাত রূপে প্রমানিত হয়।

তদুপরি উল্লেখিত হাদীছ শরীফ সমূহ দ্বারা আরো প্রমানিত হয় যে, আযান শুনে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) নিজেও মৌখিকভাবে জাওয়াব দান করেছেন এবং আমাদেরকেও মৌখিক জাওয়াব দানের জন্য আদেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে আযান শেষে প্রিয় নবী (দঃ) এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য এবং দোয়ায়ে ওয়াছিলা পাঠ করতঃ মুনাজাত করার জন্যও আদেশ দিয়েছেন।

✪ ফোকাহায়ে কেরামগনের মধ্যে "দুররে মোখতারের" প্রণেতা বলেছেন, وَيَجِبُ وُجُوْبًا

✪ 'মারাকিউল ফালাহ' কিতাবের 'শরাহ তাহতাবী' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

(قَوْلُهُ لِيُجِيْبَ) اختلف فِىْ الْاِجَابَةِ فَقِيْلَ وَاجِبَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ مَافِى الْخَانِيَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتُّحْفَةِ وَاِلَيْهِ مَالَ الْكَمَالُ قَالَ فِى الدُّرِّ فَلَايَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يَشْتَغِلُ بِشَئٍ سِوَى الْاِجَابَةِ ....وَالتَّفْرِيْعُ بِنَدْبِ الْاِمْسَاكِ عِنْدَ التِّلَاوَةِ الخ لَايَظْهَرُ اِلْاَعْلٰى الْقَوْلِ بِالسُّنَّةِ وَقِيْلَ مَنْدُوْبَةٌ وَبِه قَالَ مَالِكٌ رح وَالشَّافِعِىْ رح وَاَحْمَدُ رح وَجُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ وَاخْتَارَهُ الْعَيْنِى فِىْ شَرْحِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

البخاري وقال الشهاب في شرح الشفاء هو الصحيح ...... وصرح جماعة بنفي وجوبها باللسان وانها مستحبة وفي مجمع الانهر عن الجواهر اجابة المؤذن سنة وفي الدرة المنفية انها مستحبة على الاظهر ـ والحاصل انه اختلف التصحيح في وجوب الاجابة باللسان والاظهر عدمه ـ (طحطاوى على المراقى الفلاح)

✪ রাহরুর রায়েক গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

وفى فتاوى قاضيخان ـ اجابة المؤذن فضيلة وان تركها لا يائم .... وفى المحيط يجب السامع للاذان الاجابه ....وقال الحلوانى الاجابة بالقدم لاباللسان / .... والظاهر ان الاجابة واجبة لظاهر الامر فى قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول الخ ـ

✪ ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে,

يجب على السامعين عند الاذان الاجابة وهى ان يقول مثل ماقال المؤذن كذا فى المحيط السرخسى وهو الصحيح ـ

উপরের উদ্ধৃতি সমুহের সারমর্ম হচ্ছে, কারো মতে আযানের মৌখিক জাওয়াব দেওয়া ওয়াজিব; কেউ কেউ বলেছেন ছুন্নাত আর কেউ কেউ বলেছেন মুস্তাহাব।

যাই হউক অবহেলা নাকরে আমাদের আযানের মৌখিক জাওয়াব দিয়ে যাওয়াটাই উচিৎ এবং আযান শেষে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করতঃ দোয়ায়ে ওয়াছিলা দ্বারা মুনাজাত করাটা ছুন্নাত।

আযানের পর হাত তোলে মুনাজাত করা প্রমানিত কি-না ?

✪ এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে এ বিষয়টি ও স্বরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ)-এর অনেক বিশুদ্ধ হাদীছ শরীফ দ্বারা যে কোন দোয়া মুনাজাতের সময় দু'হাত তোলে মুনাজাত করা বৈধ বরং উত্তম রূপে সুপ্রমানিত। ঐসব দলীলাদির ভিত্তিতে আযান শেষে দরূদ শরীফ পাঠের পর দোয়ায়ে ওয়াছিলা পড়ার ক্ষেত্রেও হাত তোলে মুনাজাত করা বৈধ বরং উত্তমই বটে । তাই এ ব্যপারে নুতন করে আর কোন দলীল প্রমানাদি পেশ করার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না।

তথাপি আমাদের দেশে এ বিষয়ে এখনো বাড়া বাড়ি বিদ্যমান রয়েছে বিধায় এসম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

✪ মিশকাত শরীফ হাদীছ গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতে দোয়া মুনাজাতে হাত উঠানোর বৈধতা বর্ণণা মুলক হাদীছ শরীফ সমুহের ব্যাখ্যার সার সংক্ষেপরূপে বলা হয়েছে—

اُسْتُفِيْدَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَالَّذِيْ قَبْلَهُ اَنَّهُ يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ اِلَى السَّمَاءِ فِيْ كُلِّ دُعَاءٍ ...... وَقَالَ النَّوَوِيُّ رح وَمَنِ ادَّعَى حَصْرَهَا فَقَدْ غَلَطَ غَلَطًا فَاحِشًا ـ

অর্থাৎ দোয়া–মুনাজাতে হাত উঠানো সংক্রান্ত আলোচ্য হাদীছ ও এর পূর্বের হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হয় যে প্রত্যেক দোয়া মুনাজাত করার ক্ষেত্রে হাত উঠানো ছুন্নাত। ইমাম নববী (রঃ) বলেন, যারা দোয়া-মুনাজাতে হাত উঠানোর বিষয়টা সীমাবদ্ধ বলে দাবী করে অর্থাৎ সকল দোয়া মুনজাতে নয় বরং বিশেষ দোয়া মুনাজাতে হাত উঠানো ছুন্নাত এ কথা বলে তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যেই রয়েছে।

✪ বিশ্বখ্যাত ফতোওয়া গ্রন্থ শামীতে বলা হয়েছে—

يَرْفَعُهُمَا لِمُطْلَقِ الدُّعَاءِ فِيْ سَائِرِ الْاَمْكِنَةِ وَالْاَزْمِنَةِ عَلٰى طِبْقِ مَاوَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ ـ

অর্থাৎ হাদীছ শরীফের বর্ণনা অনুসারে সর্বস্থানে সব সময়ে সকল প্রকারের দোয়া মুনাজাতে হাত উঠানো ছুন্নাত প্রমাণিত হয়।

উপরের উদ্ধৃতি সমুহের আলোকে আযান শেষে দোয়া পাঠের সময় ও হাত উঠানোটা বৈধ প্রমাণিত হয়।

০– ফতোওয়ায়ে দেওবন্দে উল্লেখ আছে।

سوال : بعد اذان رفع یدین کر کے مناجات کرنا ثابت ہے یا نہیں؟

جواب : خصوصیت کی ساتھ اس موقع پر رفع یدین ثابت نہیں ہے مگر عموما دعا میں رفع یدین کا مستحب ہونا اسکے استحباب کو مقتضی ہے ـ

উত্তর ঃ বিশেষভাবে আযানের মুনাজাতে হাত উঠানোর বিষয়টি প্রমানিত নয় কিন্তু যেহেতু সর্ব প্রকারের মুনাজাতের ক্ষেত্রে হাত তোলা মুস্তাহাব রূপে প্রমাণিত সে ভিত্তিতে আযান শেষের মুনাজাতেও হাত উঠনো মুস্তাহাব হওয়াটা প্রমাণ করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ ফতোওয়ায়ে রহীমিয়াতে উল্লেখ আছে–

اذان کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھانا منقول نہیں ہے ویسے مطلقا دعا میں ہاتھ اٹھانا قولی اور فعلی حدیث سے ثابت ہے لہذا دعائے اذان میں ہاتھ اٹھا نے کو سنت کی خلاف ورزی نہیں کہا جائیگا ۔

অর্থাৎ, আযানের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করার বিষয়টি বর্ণিত নেই। কিন্তু যেহেতু সকল প্রকারের দোয়া মুনাজাতে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাটা কাওলী ফেলী উভয় প্রকারের হাদীছ শরীফদ্বারা সুপ্রমানিত, ঐ আলোকে আযান শেষে ও হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাটাকে ছুন্নাত বিরোধী বলা যাবে না।

০– ইয়ানাতুত্ তালেবীন নামক ফেকাহ গ্রন্থে এ বিষয়ের মীমাংসা স্বরূপ বলা হয়েছে–

وَيُسَنُّ لِكُلِّ اَحَدٍ مِنْ مُؤَذِّنٍ وَمُقِيْمٍ وَسَامِعِهَا اَنْ يُصَلِّيَ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِهَا اَيْ بَعْدَ فَرَاغِ كُلِّ مِنْهُمَا اِنْ طَالَ فَصْلٌ بَيْنَهُمَا وَالَّا فَيَكْفِيْ لَهُمَا دُعَاءٌ وَاحِدٌ ثُمَّ يَقُوْلُ كُلٌّ مِنْهُمْ رَافِعًا يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ـ الخ

অর্থাৎ, আযান দানকারী, একামত দাতা এবং শ্রোতাগণ প্রত্যেকের জন্যই ছুন্নাত যে, আযান ও একামতের পর রাসুল আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ ও ছালাম পেশ করা। তবে বিশেষ কারণে আযান ও একামতের মাঝখানে বিরতি যদি অনেক দীর্ঘ সময় ধরে না হয় তাহলে আযান ও একামতের জন্য একই দোয়াই যথেষ্ট।

অতঃপর প্রত্যেকেই দুহাত উঠিয়ে দুয়ায়ে ওয়াছিলা তথা আল্লাহুম্মা রাববা হাজিহিদ্ দা ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি--- শেষ পর্যন্ত পাঠ করে যাবে।

মাওঃ আশরফ আলী থানভী সাহেব এমদাদুল ফতোওয়া গ্রন্থে বলেন,

بالتخصیص دعائے اذان میں ہاتھ اٹھانا توثابت نہیں دیکھا گیا مگر مطلقا دعا میں ہاتھ اٹھانا احادیث قولیۃ وفعلیہ مرفوعہ وموقوفہ کثیرۃ ۔ شہیرہ سے ثابت ہے من غیر تخصیص بدعاء دون دعاء ۔ پس دعائے اذان من بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہوگا لاطلاق الدلائل چپانچہ ۔

(১) وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ (২) وَعَنْ سَائِبِ بْنِ

يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلْمَسْئَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهَا اَلْحَدِيْثُ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ كلها فِي الْمِشْكٰوةِ كِتَابُ الدَّعَوَاتِ رَوَاهَا اَحَادِيْثُ مُتَكَاثِرَةٌ مُتَوَافِرَةٌ فِيْ هٰذَا الْبَابِ يُفْضِيْ ذِكْرُهَا اِلَى الْاِطْنَابِ ـ

অর্থাৎ বিশেষভাবে আযানের দোয়াতে হাত উঠানোর বিষয়টি সম্পর্কে কোথাও দৃষ্টি গোচর হয়নি। তবে সাধারণ ভাবে মুনাজাত দোয়া করার বেলায় হাত উঠানো বিষয়টি অনেক সুপ্রসিদ্ধ কওলী (মৌখিক) বাণী, ফেয়লী (কর্ম) মরফু, মওকুফ ও অত্যাধিক প্রসিদ্ধ হাদীছ শরীফ সমুহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। উক্ত হাদীছ শরীফ সমুহ কোন্ কোন্ দোয়ায় হাত উঠাবে আর কোন্ কোন্ দোয়াতে হাত উঠাবেনা এরূপ কোন تخصيص তথা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি বরং দলিল সমুহ মাতলক তথা ব্যাপক ও শর্তহীন হওয়াতে আলোচ্য হাদীছ শরীফ সমূহ আযানের দোয়াতেও হাত উঠানোকে ছুন্নাত প্রমাণিত করল। যেমন লক্ষ্য করুন–

(১) হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দোয়া করার সময় উভয় হাত মোবারক এত উপরে তোলতেন যাতে হুজুর পুর নুর (দঃ)-এর বগল মোবারকের উজ্জলতা দেখা যেত (২) হযরত ছায়েব ইবনো এযাজিদ (রঃ) নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) প্রত্যেক প্রকারের দোয়া মুনাজাতেই হাত উঠাতেন এবং দোয়া শেষে দুহাত দ্বারা চেহারা মোবারক মাছেহ করতেন। (সংক্ষিপ্ত)।

অতএব, সন্মানিত পাঠক মন্ডলী! এসব বিষয় নিয়ে আর বাড়াবাড়িতে না গিয়ে উপরে বর্ণিত হাদীছ-ফেকাহ ও ফতোওয়ার বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য দলীলাদির উপর ভিত্তি করে আযানের মৌখিক জাওয়াব দান করতঃ আযান শেষে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছালামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পরিশেষে দুহাত তোলে দোয়ায়ে ওয়াছিলা দ্বারা মুনাজাত করাটাই হবে আমাদের জন্য প্রকৃত কল্যাণকর আমল।

✪ জুমআর আযানের জাওয়াব প্রসঙ্গ ঃ

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, রাসূল আকরম ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াছাল্লাম, ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) ও ওমর ফারুকে আযম (রাঃ) এর যমানায় (জুমআর নামযের জন্য যা বর্তমানে খোৎবার পুর্বে ইমাম সাহেব খুতবা দানের জন্য মিম্বরে আরোহন করলে দেওয়া হয়,) শুধুমাত্র এ একটা আযানই দেওয়া হত। বর্তমানের ন্যায় দুবার আযান

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওয়া হতনা। মুসলমানদের সংখ্যা ও মুসলিম এলাকা বৃদ্ধি পাওয়াতে তৃতীয় খলিফা হযরত ওছমান জিন নুরাইন (রাঃ)-এর শাসন আমলে উনারই নির্দেশে বর্তমানে জুমআ বারে সর্ব প্রথম যে আযান দেওয়া হয় এটির প্রচলন শুরু হয় এবং তখন থেকেই জুমআর নামায এর জন্য দুবার আযান দেওয়ার প্রথা চালু হয়। এ উভয় আযান তথা জুমআর প্রথম আযান এবং জুমআর ছানী আযান যা ইমাম মিম্বরে আরোহন করে বসার পর তারই সামনে দেওয়া হয়, এর জাওয়াব দানের ব্যাপারে সঠিক শুদ্ধ শরীয়াতের বিধান হচ্ছে, এ উভয় আযানেরই জাওয়াব দেওয়া সুন্নাত এবং আযান শেষে দোয়ায়ে ওয়াছিলা পাঠকালে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

কিন্তু আমাদের দেশে অন্যান্য আযানের জাওয়াব দানের ব্যাপারে তত বেশী বাড়াবড়ি না থাকলেও জুমআর ছানী (দ্বিতীয়) আযানের জওয়াব দানের ব্যাপারে যথেষ্ঠ বাড়াবাড়ি রয়েছে। তাই ঐ বির্তকের নিরসন কল্পে তদুপরি এ নেক আমলটি করার মাধ্যমে প্রত্যেককে ছাওয়াবের অংশিদারী বানানোর নেক নিয়্যতে বলা হচ্ছে যে, স্বয়ং শরীয়াত প্রবক্তা আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)গণ অন্যান্য ওয়াক্তের আযানের ন্যায় জুমআর আযানের বিশেষতঃ খোৎবা দানের পূর্বে ইমাম মিম্বারে আরোহন করার পর যে আযান দেওয়া হয় এবং যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর জমানায় জুমআর একমাত্র আযান হিসাবেই প্রচলিত ছিল ঐ আযানের জাওয়াব দান করেছেন এবং দোয়ায়ে ওয়াছিলা পাঠ করতঃ মুনাজাত ও করেছেন।

যেমন বোখারী শরীফে হযরত আবু উমামা (রা) হতে বিশদ্ধ হাদীছ বর্ণিত আছে যে,তিনি বলেন,

سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - وَهُوَ جَالِسٌ عَلٰى الْمِنْبَرِ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ الخ فَلَمَّا اَنْ قَضَى التَّاذِيْنُ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى هٰذَا الْمَجْلِسِ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّىْ مِنْ مَقَالَتِىْ -

অর্থাৎ আমি শুনেছি যে, হযরত মাবিয়া (রাঃ) জুমআর দিন মিম্বরের উপর বসে মুয়াজ্জিনের আযানের জাওয়াব দিয়েছেন এবং আযান শেষে মুছাল্লিদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে লোকেরা! আমি নবী করিম (দঃ)-কে জুমআর দিনে মিম্বর শরীফে বসা অবস্থায় মুয়াজ্জিনের আযানের জাওয়াব দিতে শুনেছি, যে ভাবে তোমরা আজকে আমার কাছ থেকে আযানের জাওয়াব দিতে শুনতে পাচ্ছ।

উল্লেখিত জুমআর ছানী আযান তথা ইমামের খোৎবা দানের পূর্বে যে আযান দেওয়া হয়, যা মূলতঃ প্রবর্তণ-প্রচলনের দিক থেকে শরীয়াতে ইসলামীয়ায় প্রথম

আযান রূপেই স্বীকৃত। যদিও অত্র আযানের জাওয়াব দান প্রসঙ্গে হযরাত আইম্মা ও ফোকাহায়ে কেরাম (রঃ) গনের বক্তব্য সমূহের মধ্যে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটু গভীর বিচার-বিবেচনার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামের বক্তব্য সমূহের সমর্থন উত্তর দানের স্বপক্ষেই পরিলক্ষিত হয়।

✪ যেমন ইসলামী বিশ্বের সর্বমান্য ফেক্হার তবকাতের কিতাব "বদায়েউ-চ্ছানায়ে" -এর সম্মানিত প্রনেতা বলেন—

ثُمَّ الْاَذَانُ الْمُعْتَبَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هُوَ مَا يُؤْتٰى بِهٖ اِذَا صَعَدَ الْاِمَامُ الْمِنْبَرَ وَتَجِبُ الْاِجَابَةُ وَالْاِسْتِمَاعُ لَهٗ دُوْنَ الَّذِىْ يُؤْتٰى بِهٖ عَلَى الْمَنَارَةِ وَهٰذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ يَقُوْلُ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْاَذَانُ عَلَى الْمَنَارَةِ لِاَنَّ الْاِعْلَامَ يَقَعُ بِهٖ وَالصَّحِيْحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَارُوِىَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى عَهْدِ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَذَانًا وَاحِدًا حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُثْمٰنَ وَكَثُرَ النَّاسُ اَمَرَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِالْاَذَانِ الثَّانِىْ عَلَى الزَّوْرَاءِ وَهِيَ الْمَنَارَةُ -

(بدائع الصنائع ج ١ - ١٥٠)

✪ ফতোওয়ায়ে শামী গ্রন্থে بَابُ الجمعة তে উল্লেখ রয়েছে,

(وَلَا كَلَامَ) اَىْ مِنْ حُسْنِ كَلَامِ النَّاسِ اَمَّا التَّسْبِيْحُ وَنَحْوُهُ فَلَا يُكْرَهُ وَهُوَ الْاَصَحُّ

✪ হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে,

(وَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ الْجُمُعَةَ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلٰوةَ وَالْكَلَامَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ) قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح وَقَالَا لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ قَبْلَ اَنْ يَخْطُبَ -

✪ হেদায়ার হাশিয়্যাতে উল্লেখ আছে,

وَاَمَّا قَبْلَ الشُّرُوْعِ بَعْدَ صُعُوْدِهٖ عَلَى الْمِنْبَرِ فَيُكْرَهُ الْكَلَامُ الدُّنْيَوِىُّ اِتِّفَاقًا وَاَمَّا الْكَلَامُ الدِّيْنِيُّ كَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ فَلَا يُكْرَهُ عِنْدَهُمَا وَرُوِىَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

بعض المشائخ عنه انه يكره والاصح انه لايكره عنده ايضا صرح في النهاية وغيره ـ فعلى هذا لايكره اجابة الثانى ودعاء الوسيلة بعده مالم يشرع الامام فى الخطبة وقد ثبت ذلك من فعل معاوية رضى الله عنه فى صحيح البخارى ـ

✪ মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) এর শারাহ আত্তালিকুল মুমাজ্জাদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

وقد ثبت فى صحيح البخارى ان معاوية رضى الله عنه اجاب الاذان وهو على المنبر وقال ايها الناس انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ .... فاذا ثبت الاجابة عن صاحب الشرع وصاحبه فما معنى الكراهة ؟ تعليق الممجد لموطا امام محمد رح ـ

✪ বাহরুর রায়েক গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

وفى عيون المراد اجابة المؤذن اما غيره من الكلام فيكره اجماعا ـ

✪ উক্ত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে,

وفى النهاية اختلف المشائخ على قول ابى حنيفة رح قال بعضهم انما يكره ماكان من كلام الناس اما التسبيح ونحوه فلا ـ وقال بعضهم كل ذلك مكروه والاول الاصح ـ

✪ ইমাম তাহতাবী (রঃ) মারাকিউল ফালাহ কিতাবের শরাহ গ্রন্থে এ মাছআলা সম্পর্কিত আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে বলেন,

فعلم بهذا انه لا خلاف بينهم فى جواز غير الدنيوى على الاصح ويحمل الكلام الوارد فى الاثر على الدنيوى ويشهد له ما اخرجه البخارى ان المعاوية اجاب المؤذن بين يديه فلما ان قضى التاذين قال يا ايها الناس انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن الخ ـ

✪ কেফায়াতুল মুফতী কিতাবে উল্লেখ আছে,

امام محمد رح کے نزدیک اذان خطبة کا جواب دینا جائز ہے امام ابو یوسف رح اور امام محمد رحمة الله علیهما خطبه شروع ہونے سے پہلے غیر خطیب کیلئے کلام دینی کو جائز فرمائے ہیں تو اجابت اذان اور دعاء وسیله انکے نزدیک جائز ہے ـ

✪ গায়াতুল আওতার গ্রন্থে বলা হয়েছে,

صحیح ترقول یہ ہے کے امام کے نزدیک اذکار جائز ہے خطبه شروع ہونے سے پہلے تو اب کون مانع ہے اجابت کا كذا فى الطحطاوى ـ

✪ ফতোওয়ায়ে রেজভীয়ার ২য় খন্ডের ৪৬২ পৃষ্ঠায় এবং ৩য় খন্ডের ৬৮৩ পৃষ্ঠায় ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান (রঃ) মুক্তাদীগন কর্তৃক অত্র আযানের মৌখিক জাওয়াব দেওয়াটা সমূচিৎ নয় বলে মন্তব্য করলেও মনে মনে জাওয়াব দান করা ও দোয়া পাঠ করাটাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি ইমাম তথা খতীবের মৌখিক জাওয়াব দানকে বৈধ রূপে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন।

اور امام یعنی خطیب تو اگر زبان سے بھی جواب اذان دے یا دعاکرے بلا شبه جائز ہے وقد صح كلام الامرين من سيد الكونين صلى الله عليه وسلم فى صحيح البخارى وغيره ـ

✪ এমনিভাবে উক্ত ফতোওয়া গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৭৪০ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন,

اذان ثانی کا جواب امام دے مقتدیوں کو ہمارے امام کے نزدیک جائز نہیں صاحبین اجازت دیتے ہیں تبیین الحقائق میں اول کو احوط کہا اور نہایہ اور عنایہ میں ثانی کو واضح تو عمل اول ہی پر کرے وہی قول امام ہے اور اگر کوئے ثانی پرعمل کرے تو اس سے بھی نزاع نہ چاہئے که صحیح اس طرف بھی ہے ـ

✪ দুররে মোখতার গ্রন্থে نهر الفائق কিতাবের উদ্ধৃতি এনে বলা হয়েছে,

وينبغى ان لايجيب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين يدى الخطيب ـ

উপরে উদ্ধৃত ফোকাহায়ে কেরামের মতামত সমুহের সার সংক্ষেপ হচ্ছে দু'একজন ব্যতীত বলতে গেলে অন্যান্য সকল ফোকায়ে কেরাম (রঃ) গন একমত যে, জুমআর নামাযে ইমামের খুতবা দানের জন্য বের হওয়ার মুহূর্ত থেকে খুতবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরম্ভ করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইমাম আযম (রঃ) ও ছাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে দুনিয়াবী তথা পার্থিব যাবতীয় কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা নাজায়েজ; কিন্তু দ্বীনী কথাবার্তা তথা ওয়াজ, উপদেশ, জিকির-আজকার, তাছবীহ-তাহলিল ইত্যাদি জায়েযই বটে। এমনিভাবে ছানী আযানের জাওয়াব প্রদান, আযান শেষে খতীব ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য হাত তোলে দোয়ায়ে ওয়াছিলা পাঠ করতঃ মুনাজাত করা মুস্তাহাব (উত্তম) এবং দুররে মোখতারের উদ্ধৃত নাহরুল ফায়েকের বক্তব্য قَوْلٌ مَرْجُوحٌ وَيَنْبَغِى اَنْ لاَيُجِيْبَ টিকে হিসাবে নেওয়া হবে আর মুস্তাহাব হওয়ার বক্তব্য সমূহকে قول راجح হিসাবে গ্রহণ করে নিতে হবে- এতে এ ব্যাপারে আর মতবিরোধ থাকবে না।

আযানে প্রিয় নবী (দঃ)-এর নাম মোবারক শ্রবণকালে চুমু দেওয়ার মাছআলা ঃ

আযান হওয়ার সময় মুয়াজ্জিন যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) বলে তখন আযান শ্রবণ কারীদের জন্য প্রথম বার আশ্‌হাদুআন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ শুনামাত্র صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (সাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাসূলল্লাহ) বলে নিজের উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমা দিয়ে তা পুনরায় উভয় চোখে লাগানো এবং দ্বিতীয় বার আশ্‌হাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনে قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (কুররাতু আইনী বিকা এয়া রাসূলাল্লাহ) অতঃপর اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (আল্লাহুম্মা মাত্‌তিনী বিছ্ছাময়ী ওয়াল বাছারী) বলে।

প্রথম বারের নিয়মে চুমু খেয়ে চোখ মছেহ করা মুস্তাহাব এবং এ আমলটি যে মুস্তাহাব তা মারফু ও মাওকুফ উভয় প্রকারের হাদীছ শরীফ দ্বারা সুপ্রমানিত। এবং অসংখ্য মুজতাহিদ ফোকাহয়ে কেরাম (রঃ) দ্বারা সমর্থিত ।

যেমন ঃ মারাকিউল ফালাহ কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে হানাফী ফকীহ আলেম কুল শিরমনি ইমাম তাহতাভী (রঃ) বলেন:-

(فائده) ذَكَرَ الْقُهُسْتَانِىُّ مِنْ كَنْزِ الْعِبَادِ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ سِمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ سِمَاعِ الثَّانِيَةِ قرة عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ اِبْهَامَيْهِ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَاِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ قَائِدًا لَهُ فِى الْجَنَّةِ وَذَكَرَ الدَّيْلَمِىُّ رح فِى الْفِرْدَوْسِ

مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرٍ صِدِّيْقٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا مِنْ مَسْحِ الْعَيْنِ بِبَاطِنِ اَنْمِلَةِ السَّبَّابَتَيْنِ بَعْدَ تَقْبِيْلِهِمَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ - وَكَذَا رُوِىَ الْخِضْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِمِثْلِهِ يُعْمَلُ فِى الْفَضَائِلِ - (صفحه ١٣٨)

অর্থাৎ, আল্লামা কোহেস্থানী কানজুল ইবাদ নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, যে লোক আযান হওয়ার সময় প্রথম বার আশ্‌হাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শুনে ছাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাছুলাল্লাহ বলে এবং দ্বিতীয় বার মুয়াজ্জিনের আশ্‌হাদুআন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ শুনে কুররাতু আইনি বিকা এয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহুম্মা মাত্‌তিনী বিচ্ছাময়ী ওয়াল বাছরী বলে এবং উভয় বারে নিজের বৃদ্ধাঙ্গলীদ্বয়ের নখে চুমু খেয়ে নিজের দু'চোখে লাগাবে এর বিনিময়ে আল্লাহর পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াছাল্লাম তাকে বেহেস্তে নিয়ে যাবেন।

এবং আল্লামা তাহ্‌তাভী(রঃ) আরো বলেন যে, ইমাম দাইলামী (র) তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ "আল্‌ফেরদাউছে" হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রঃ) থেকে মারফু পর্যায়ের হাদীছ বর্ণণা করেন যে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দঃ) বলেছেন, যে লোক মুয়াজ্জিনের আযানে আশ্‌হাদুআন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ শুনে দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমু দিয়ে পুনরায় তা চোখে লাগাবে এবং বলবে আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু রাদিতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল্‌ ইসলামে দ্বীনান ওয়া বিছায়্যাদিনা মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবীয়্যান; তার জন্য আমার সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। অনুরূপ ভাবে হযরত খিজির (আঃ) থেকেও হাদীছে বর্ণিত আছে এবং এ ক্ষেত্রে এও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এ জাতীয় হাদীছ শরীফ অনুযায়ী ফযীলত অর্জনের উদ্দেশ্যে আমল করা জায়েজ।

এভাবে হাদীছ শাস্ত্রের মশহুর ইমাম আল্লামা ছাখাভী (রঃ) স্বীয় আল্‌-মকাছেদুল হাছানা গ্রন্থে ইমাম দায়লামী (রঃ) এর আল-ফেরদাউছ গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে,

لَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رض قَوْلَ الْمُؤَذِّنِ اشهد ان مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ هٰذَا وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْاَنْمِلَتَيْنِ السَّبَّابَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِىْ فَقَدْ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ একদা ইসলামী দুনিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান নবী প্রেমিক ছাহাবায়ে কেরামের মহা সম্রাট, নবীগণের পরে যিনি সকল মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি [হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)] মুয়াজ্জিনের আযানের বাক্য আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ শুনে এ একই বাক্য নিজেও বললেন অতঃপর নিজের উভয় হাতের উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলির নখদ্বয় কে চুমু দিয়ে তা পুনরায় চোখে লাগালেন। ইহা দেখে আল্লাহর প্রিয় রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার যে উম্মাত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিদ্দিক আকবর(রঃ) এর মত আমল করবে,আমার শাফায়াত-সুপারিশ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে।

✪ বিশ্বখ্যাত ফতোওয়ার কিতাব শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে—

يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة - صلى الله عليك يارسول الله وعند الثانية منها قرة عينى بك يارسول الله ثم يقول اللهم متعنى بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون قائدا له الى الجنة كذا فى كنز العباد قهستانى ونحوه فى فتاوى الصوفية وفى كتاب الفردوس من قبل ظفر ابهاميه عند سماع اشهد ان محمدا رسول الله فى الاذان انا قائده ومدخله فى صفوف الجنة وتمامه فى حواشى البحر للرملى رح عن المقاصد الحسنة للسخاوى رح -

(অনুবাদ ঃ প্রায় প্রথম উদ্ধৃতির অনুরূপই, তাই আর পুনরাবৃত্তি করা গেল না)

আল্লামা শামী (রঃ) এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত ফতোওয়ায়ে ছুফীয়া গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকীহ কামেল অলিয়াল্লাহ হযরত ফজলুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আয়ুব ছোহ্‌রাওয়ার্দী (রঃ) যিনি আল্লামা ইউছুফ ইবনে ওমর (রঃ) (কুদুরী গ্রন্থের শরাহ المضمرات (আল্‌মুজমেরাত) গ্রন্থের প্রণেতার শাগরিদ তিনি) বলেন মক্কা মুকাররামস্থ ওলামায়ে হানফীয়াগণের শিরমনি,শেখুল মাশায়েখ,মুহাক্‌কেককুল সম্রাট, হযরত আল্লামা জামাল ইবনে আবদুল্লাহ মক্কী (রঃ) স্বীয় ফতোওয়া গ্রন্থে বলেছেন-

سئلت عن تقبيل الابهامين ووضعهما على العينين عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فى الاذان هل هو جائز ام لا ؟ اجبت بما نصه

نعم تقبيل الابهامين و وضعهما على العينين عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فى الاذان جائز بل هو مستحب صرح به مشائخنا فى غيرما كتاب -

অর্থাৎ আমাকে প্রশ্নকরা হয় যে,আযান শ্রবন কালে নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারকের চুমু খাওয়া অতঃপর তা চোখে লাগানো জায়েজ কিনা? আমি এভাবে এর জাওয়াব দান করেছি যে, আযানে হুজুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শুনে মুখে চুমু খাওয়া অতঃপর তা চোখে লাগানো জায়েজ বরং মুস্তাহাবই বটে, আমাদের মশায়েখ হযরাতগণ বিভিন্ন কিতাবে এ আমলকে মুস্তাহাব বলেছেন।

✪ বিশ্বখ্যাত অলীয়াল্লাহ ও ফকীহ হযরত আবুল আব্বাছ আহমদ ইবনে আবু বকর (রঃ) স্বীয় মাওজিবাতুর রহমাতি ওয়া আজায়িমুল মাগফিরাতি গ্রন্থে বর্ণণা করেন যে, হযরত খিজির (আঃ) থেকে বর্নিত,

من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله مرحبا بحبيبى وقرة عينى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد ابدا -

অর্থৎ, (হযরত খিজির (আঃ) বলেন) যে লোক আযানে আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসুল্লাল্লাহ শুনে মারহাবান বিহাবীবী ওয়াকুররাতা আইনী মুহাম্মাদ ইবনি আবদিল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলে স্বীয় দু' হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের চুমু খেয়ে তা পুনরায় চোখে লাগাবে, এর চোখে রোগ-ব্যাধী হবেনা।

এভাবে ইমাম ছাখাভী (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে,তৎকালীন মাছজীদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ হযরত আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ছালেহ মাদানী (রঃ) স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে,আমি বিশ্বখ্যাত অলিয়াল্লাহ হযরত মাজদ মিশরী (রঃ) কে বলতে শুনেছি,

من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم اذا سمع ذكره فى الاذان وجمع اصبعيه المسبحة والابهام وقبلهما ومسح بهما على عينيه لم يرمد ابدا -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযানে নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম শুনে ছালাত ছালাম পাঠ করতঃ শাহাদত ও বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ে চুমু দিয়ে তা দ্বারা উভয় চোখ মাছেহ করবে, তার চোখে রোগ-যন্তনা হবেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এছাড়া আরো অসংখ্য সম্মানিত মুজতাহিদ ইমাম (রঃ) গণ এবং অসংখ্য আওলিয়ায়ে কেরাম (রঃ) গণ নিজেদের স্ব স্ব অনুসরনীয় হাদীস, তাফছীর ও ফেকাহ-ফতোওয়ার গ্রন্থ সমুহে যেমন, তাফছীরে রুহুল বয়ান, তাফছিরে জালালাইন, শরহে নেকায়া, হুজ্জাতুল্লাহী আলাল আলামীন,মওজুআতে কবীর লিমুল্লা আলী ক্বারী,আল্লামা তাহের পাটনভীর মজমায়ে বেহারিল আনোওয়ার গ্রন্থে আল্লামা লাক্ষ্মৌভীর মাজমুয়ায়ে ফতোওয়া ইত্যাদিতে এ আমলকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। ফতোওয়ায়ে রেজভীয়া শরীফেই এ মাছআলার বিস্তারিত আলোচনা ও বিশুদ্ধ সামাধান বর্ণিত হয়েছে। এমনকি ফতোওয়ায়ে দেওবন্দ ও আহছানুল ফতোওয়াতেও আযানে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের নাম মোবারকের চুমু দেওয়াকে মুস্তাহাব রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, বাতেল নীতির অনুসারী কেউ কেউ যে তাদের স্ব স্ব পুস্তক পুস্তিকায় আযানে আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনার সময় হযরত নবীয়ে আকরম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত ও নাম মোবারকের তাজীমার্থে পবিত্র হাদীছ- ফেকাহ সমর্থিত চুমু দানের আমলটিকে বেদআত রূপে উল্লেখ করে বসেছে এবং এ আমলটি বর্জনীয় রূপে মন্তব্য করেছে, এদের এ ভ্রান্ত মতের উপর ভিত্তি করে বাস্তবেও দেখা যায় যে, যারা এ ভ্রান্ত নীতির অনুসারী- তারা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শুনে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে দরূদ শরীফ ও দোয়া পাঠ তো করেইনা এবং চুমু ও দেয়না বরং যারা আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মুহাব্বত ও আন্তরিক তাজিম ভক্তি নিয়ে এ বরকতময় আমলটি করে থাকেন, তাদেরকে তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপার্থক বেয়াদবী মুলক আচরন ও মনোভাবের প্রকাশ করে।

প্রিয় পাঠক, আপনি যে মতবাদেরই অনুসারী হউন না কেন আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকৃত্রিম মুহাব্বাত ভালোবাসা ও তাজিম ভক্তি অন্তরে রেখে নিরেপেক্ষ মন দিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন, এত অধিক সংখ্যক মুহাদ্দেছীন কেরাম, মুফাচ্ছেরীন ইজাম, ফোকাহায়ে কেরাম এবং কামেল মোকাম্মাল আউলিয়াল্লাহ গন যে আমলটিকে পবিত্র হাদীছ শরীফ সমুহের ভিত্তিতে মুস্তাহাব রূপে সিদ্ধান্ত দিয়ে তদানুযায়ী নিজেরাও আমলটি করে গেছেন এবং বর্তমানেও করে চলেছেন এবং আমলটিকে সকলের জন্য কল্যাণকর রূপে মন্তব্য করতঃ একে পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন, তদুপরি আমলটি আর যাই হউকনা কেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকের তাজীমের সাথেই সম্পৃক্ত। এ মুস্তাহাব কাজটিকে নিজে না করলেও না করুক তাতে কিছুই আসে যায়না। কিন্তু যারা করেন উনাদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমুলক এবং ঠাট্টা বিদ্রুপার্থক আচরণ করার অর্থ হচ্ছে মুলতঃ আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এর সাথেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করা- যার ফলে তাদের ঈমানের মধ্যে খতরা আসার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

ادب گا هیست زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کرده می آید جنید وبایزید اینجا ـ

যাই হউক ঈমানের দাবীদার প্রত্যেক ভাইদের সন্দেহ সংশয় নিরসন কল্পে এ আমলটির প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য মুলক আলোচনা করা হচ্ছে-

সন্মানিত পাঠক মন্ডলী, একটু লক্ষ্য করুন,উপরোল্লেখিত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক চুমু খাওয়ার সমর্থনের হাদীছ শরীফ সমুহ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে প্রায় সময় আপত্তি স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে-(১) এ বিষয়ের সমর্থনে পেশকৃত হাদীছ শরীফ সমুহ ছহী নয় তাই, তদানুযায়ী আমল করা যাবেনা। (২) উক্ত হাদীছ শরীফসমুহ জ্বাঈফ (দুর্বল) সুতরাং উক্ত হাদীছ সমুহ আমল যোগ্য নয়।

এ জাতীয় আপত্তি সমুহের জবাব দানের পুর্বে আমরা সকলেরই জানা থাকা একান্ত দরকার যে, প্রিয় নবী (দঃ) এর হাদীছ শরীফ সমুহের ছনদ তথা বর্ননাকারী সুত্রের বিষয়টি তিন পর্যায়ে বিভক্ত। যথা-(১) مَرْفُوْعٌ (মারফু) (২) مَوْقُوْفٌ (মাওকুফ) ও (৩) مَقْطُوْعٌ (মাক্তু) এর অপর নাম مرسل (মুরছাল)।

এমনিভাবে প্রিয় নবী (দঃ) এর হাদীছ শরীফ সমুহের বর্ণনাকারীদের গুণাগুন ও যোগ্যতার বিচারে হাদীছ শরীফ সমুহকে পুনরায় ২ স্তরে ভাগ করা হয়েছে। (১) صَحِيْحٌ (ছাহীহ) ও (২) حَسَنٌ (হাছন) এ উভয় প্রকার কে পুনরায় দু 'দু ভাগে ভাগকরা হয়েছে। (১) صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ ছহীহ লিজাতিহী (২) صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ (ছাহিহ লিগাইরিহি) (৩) حَسَنٌ لِذَاتِهٖ (হাছান লিজাতিহী) (৪) حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ (হাছান লিগাইরিহী) এসবের সংজ্ঞা এবং এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে উসুলে হাদীছ বিষয়ক পুস্তকাবলী পাঠ করা দরকার।

পাঠক মণ্ডলী !

হাদিছ শাস্ত্র সম্পর্কে যাদের সামান্যতম জ্ঞান রয়েছে উনারা এ বিষয়টাকে অবশ্যই মেনে নেবেন যে,উপরে উল্লেখিত হাদীছ শরীফ সমুহের প্রথম যে তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর প্রথম প্রকার ও দ্বিতীয় প্রকারের হাদীছ শরীফ সমুহ দ্বারা ইসলামী শরীয়াতের বিভিন্ন আহকাম (বিধানাবলী) ছাবেত করা হয়েছে এবং অবস্থার পরি প্রেক্ষিতে তৃতীয় প্রকার তথা মুরছাল পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা ও আহকামে শারীয়াহ ছাবেত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে পরবর্তিতে যে স্তরটি তথা ছহীহ-হাছন ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্য থেকে যেমনি ভাবে ছহী হাদীছ শরীফ সমুহ দ্বারা ইসলামী বিধানাবলী ছাবেত করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে হাছান ও অন্যান্য প্রাকারের হাদীছ শরীফ সমুহ দ্বারাও

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের বিধানাবলি ছাবেত করা হয়েছে; যার হাজার হাজার নজীর-দৃষ্টান্ত ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে।

তবে হাঁ, হাদীছ শরীফের মানের উপরই শরয়ী বিধানের মান নির্ভরশীল। হাদীছ শরীফখানা উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকলে উক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা সাবস্থ্য বিধানাবলী ও উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকবে। অর্থাৎ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াককাদা পর্যায়ের বিধানাবলীই প্রমানিত হয়ে থাকবে। হাদিছ শরীফ খানা উচ্চ পর্যায়ের না হলে তা দ্বারা সাব্যস্থ বিধানাবলীও উচ্চ পর্যায়ের হবেনা বরং মুস্তাহাব ও মুবাহ পর্যায়ের বিধানাবলীই সাব্যস্থ হয়ে থাকবে।

এখন আসুন আমাদের আলোচ্য মাছআলা তথা প্রিয় নবী (দঃ)-এর পবিত্র নাম মোবারকের চুমু খাওয়ার বিধানের সমর্থনে যে সব হাদীছ শরীফ সমুহের উল্লেখ করা হয়েছে,, এসব হাদীছ শরীফ সমুহ প্রসঙ্গে যে কোন কোন মুহাদ্দিছ ও ফকীহ যেমন হযরত আল্লামা ছাখাভী (রঃ) ও আল্লামা শামী (রঃ) বলেছেন–

وَلَايَصِحُّ فِى الْمَرْفُوْعِ مِنْ كُلِّ هٰذَاشَيْئٌ

অর্থাৎ উল্লেখিত হাদীছ শরীফ সমুহ মরফু তথা হাদীছ বর্ণনা করার সুত্রটি সরাসরী নবী করিম(দঃ) পর্যন্ত পৌছার বিষয়টি ছহি পর্যায়ের নয় বরং মওকুফ পর্যায়ের। এভাবে আরো কেউ কেউ যে বলেছেন لَمْ يَصِحَّ অত্র হাদীছ শরীফটি ছহি নয়। অর্থাৎ উছুলে হাদীছের সুত্র মতে পুর্বে উল্লেখিত হাদীছের যে চারটি পর্যায় রয়েছে উল্লেখিত চুমু প্রদানের হাদীছটি ছহি লিজাতিহী প্রকারের নয় বরং ছহি লিগাইরিহী কিংবা হাছান পর্যায়েরই বটে।

لَمْ يَصِحَّ কিংবা وَلَمْ يَصِحَّ فِى الْمَرْفُوْعِ مِنْ كُلِّ هٰذَا شَيْئٌ বলার কারণে এ জাতীয় হাদীছ শরীফ সমুহের উপর মোটেই আমল করা কোন হাদীছ সর্ম্পকে কোন মুহাদ্দেছের এ জাতীয় উক্তির জবাবে অন্যান্য মুহাদ্দেছিন কেরাম ও ফোকাহায়ে ইজাম কিরূপ সিদ্ধান্ত দান করেছেন একটু লক্ষ্য করুনঃ—

✪ যেমন হযরত ইমাম তিরমিজী (রঃ) সর্ম্পকে প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম হালাবী (রঃ) মুনিয়্যাতুল মুছাল্লীর শরাহ গ্রন্থে বলেছেন,

قَوْلُ التِّرْمِذِىِّ لَايَصِحُّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِىْ هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ اِنْتَهٰى لَايَنْفِىْ وُجُوْدَ الْحَسَنِ وَنَحْوَهٗ وَالْمَطْلُوْبُ لَايَتَوَقَّفُ ثُبُوْتُهٗ عَلَى الصَّحِيْحِ بَلْ كَمَا ثَبَتَ بِهٖ ثَبَتَ بِالْحَسَنِ اَيْضًا ـ

অর্থাৎ ইমাম তিরমিজী (রঃ) কর্তৃক কোন হাদীছ সম্পর্কে এ বিষয়ে নবী আকরম

(দঃ) এর কোন ছহী হাদীছ বর্ণিত নাই,বলার দরুন হাদীছ শরীফ খানা হাছান বা অন্য স্তরের হওয়াটাকে রহিত করেনা। কারণ কোন বিষয়ের বৈধতা প্রমাণ করন শুধু পরিভাষাগত ছহী হাদীছের উপর নির্ভরশীল নয় বরং যেমনি ভাবে ছহী পর্যায়ের হাদীছ দ্বারা আহকামে শরীয়াহ (বিধানাবলি) এর বৈধতা প্রমানিত হয় অনুরূপ হাছান ও অন্যান্য স্তরের হাদীছ শরীফ দ্বারাও ইসলামী বিধানাবলীর বৈধতা প্রমাণিত হয়।

অনুরূপ ভাবে প্রসিদ্ধ হাদীছবেত্তা হযরত ইমাম ইবনে হাজার আছকালানী صواعق محرقة গ্রন্থে বলেন—

قَوْلُ اَحْمَدَ حـ اِنَّهٗ حَدِيْثٌ لَايَصِحُّ اَىْ لِذَاتِهٖ فَلَا يَنْفِىْ كَوْنَهٗ حَسَنًا لِغَيْرِهٖ وَالْحَسَنُ لِغَيْرِهٖ يَحْتَجُّ بِهٖ كَمَا بُيِّنَ فِى الْحَدِيْثِ ـ

অর্থাৎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এর এরুপ উক্তি করা যে, 'এ হাদীছ খানা ছহী নয়" এর প্রকৃত অর্থ এই যে, এ হাদীছ খানা ছহী লিজাতিহী পর্যায়ের নয়, এরূপ উক্তি হাদীছখানার হাছান লিগাইরিহী হওয়াটাকে নফী করে না। আর হাছান লিগাইরিহী স্তরের হাদীছকেও শরীয়াতের দলীল রূপে নেওয়া হবে যেভাবে উছুল হাদীছ গ্রন্থে এ বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

✪ হযরত ইমাম ইবনে হাজার (রঃ) হযরত ইমাম নববী (রঃ) এর আল আজকার গ্রন্থের تخريج احاديث প্রসঙ্গে বলেছেন—

مِنْ نَفْىِ الصِّحَّةِ لَايَنْتَفِى الْحَسَنُ

অর্থাৎ কোন হাদীছের ছাহী হওয়াটা নাফী (রহিত) করার দ্বারা হাদীছখানা হাছান স্তরের হওয়াটাও নাফী (রহিত) হয়ে যায়না।

তিনি نُزْهَةُ النَّظْرِ فِىْ شَرْحِ نُخْبَةِ الْفِكْرِ গ্রন্থে বলেছেন—

هٰذَا الْقِسْمُ مِنَ الْحَسَنِ مُشَارِكٌ لِلصَّحِيْحِ فِى الْاِحْتِجَاجِ بِهٖ اِنْ كَانَ دُوْنَهٗ ـ

অর্থঃ حسن لذاته স্তরের হাদীছ শরীফ সমুহকে শরীয়াতে দলিল রূপে গ্রহণ করার ব্যাপারটি ছহী স্তরের হাদীছের মতই, যদিও ইহার মান ছহীর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

✪ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাত এ ফকীহ কুল শিরমনি, মুহাককেক সম্রাট হযরত কামাল উদ্দিন ইবনুল হুমাম (রঃ)-এর বক্তব্য খানাকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে,

وَقَوْلُ مَنْ يَقُوْلُ فِىْ حَدِيْثٍ اَنَّهٗ لَمْ يَصِحَّ اِنْ سُلِّمَ لَمْ يَقْدَحْ لِاَنَّ الْحُجَّةَ لَاتَتَوَقَّفُ عَلَى الصِّحَّةِ بَلِ الْحَسَنُ كَافٍ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ কোন হাদীছ সর্ম্পকে কোন মুহাদ্দিছ কর্তৃক এ কথা বলা যে, "এ হাদীছ খানা ছহীহ নয়" কোন কারণ বশতঃ ঐমুহাদ্দিছ সাহেবের একথাকে যদি মেনেও নেওয়া হয় তথাপি উক্ত হাদীছ খানাকে শরীয়াতের দলিল রূপে গ্রহণ করে নিতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ কোন হাদীছ শরীফ কে দলিল হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারটা শুধুমাত্র পরিভাষাগত ছাহীহ হাদীছের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং পরিভাষাগত হাছান স্তরের হাদীছ শরীফ হওয়াটাই শরীয়াতের দলিল রূপেগ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট।

✪ এমনিভাবে অত্র হাদীছ শরীফসমূহ জাঈফ (দুর্বল) হওয়ার আপত্তির উত্তরে বলা হচ্ছে যে, এতেও কোন অসুবিধা নাই। কেননা বিশ্ব খ্যাত ফেকাহ গ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর' এ বর্ণিত আছে, اَلْاِسْتِحْبَابُ يَثْبُتُ بِالضَّعِيْفِ অর্থাৎ, জাঈফ হাদীছ শরীফসমূহ দ্বারা শরীয়াতের মুস্তাহাব পর্যায়ের আহকাম (বিধানাবলী) সাব্যস্ত হয়ে থাকে। হযরত আল্লামা মূল্লা আলী কারী (র:) বলেন, اَلضَّعِيْفُ يُعْمَلُ فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ اِتِّفَاقًا অর্থাৎ, এ বিষয়ে সকল ফাকীহগণ একমত যে, ফাজায়েলে আমলের ক্ষেত্রে জাঈফ হাদীছ সমূহ গ্রহণযোগ্য।

এমনকি যে ক্ষেত্রে জাঈফ হাদীছ বিদ্যমান থাকে সে ক্ষেত্রে কোন প্রকারের কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। একারণে সকল আইম্মায়ে মুজতাহেদীগণ কিয়াসের (কোরআন হাদীছ ভিত্তিক গবেষণামূলক রায়ের) উপর কোন হাদীছ জাঈফ হলেও উহাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রঃ) তাই বলেছেন,

اَلْخَبْرُ الضَّعِيْفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَوْلٰى مِنَ الْقِيَاسِ وَلَايَحِلُّ الْقِيَاسُ مَعَ وُجُوْدِهٖ -

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে বর্ণিত জাঈফ হাদীছ কিয়াস' থেকে অনেক উত্তম এবং যে বিষয়ের সমাধান কল্পে অন্তত: জাঈফ হাদীছ পাওয়া যাবে সে ক্ষেত্রে কেয়াস করা হারাম। (مُقَدَّمَةُ اِعْلَاءِ السُّنَنِ)

প্রিয় পাঠকমন্ডলী!

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উল্লেখিত পর্যায়ের হাদীছ শরীফ সমূহ দ্বারা অন্যান্য যে কোন আমলের বৈধতা প্রমাণ করা হয়ে থাকলে তখন তথা কথিত আলেম- মোহাদ্দেছগন ও মুফতী সাহেবানরা তত বেশী মাথা ঘামান না। প্রবল কোন আপত্তিও উত্থাপন করেন না; বরং অনেক সময় আলোচ্য হাদীছ শরীফ সমূহের চেয়ে আরও নিম্ন মানের দুর্বল হাদীছ দ্বারা ও স্বপক্ষীয় আমল সমূহের বৈধতা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান।

কিন্তু যে মুহূর্তে এ স্তরের হাদীছ শরীফসমূহ দ্বারা আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের তা'জীম, গুনাবলী ও শান-মান প্রকাশকারী কোন প্রসঙ্গ আসে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিংবা আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও আমল সমূহের বৈধতার বিষয় আসে, তখন ঐসব হাদীছ শরীফ সমূহের উপর অপ্রাসাঙ্গিক আপত্তি সমূহ উত্থাপন করে বসে। হাদীছ সমূহ শুদ্ধ নয়, এমন- তেমন অনেক রকমের আপত্তি এনে ঐ হাদীছ শরীফ অনুযায়ী আমলের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকে।

মূলতঃ ইহা নবীয়ে আকরম (দঃ) ও ছুন্নী মুসলিমদের প্রতি তাদের একটি সুক্ষ্মও গোপন বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ বই আর কিছুই নয়।

আযান ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও আল্লাহর পেয়ারা হাবীব (দঃ) এর নাম মোবারক শুনে হাতে চুমু খেয়ে তা চোখে লাগানো উত্তম।

ফাতোওয়ায়ে রেজভীয়া শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে,

سوال : حضور پر نور صلى الله عليه وسلم کے نام مبارك سن کر ہاتہ چوم کرانکھون پر لگانا کیسا ھے؟

الجواب : جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ کوئی ممانعت شرعی نہو مثلا حالت خطبہ میں یا جس وقت قران مجید سن رہا ہو یا نماز پڑھ رہاھے ایسی حالتوں میں اجازت نہیں۔ باقی سب اوقات میں جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ بہ نیت محبت وتعظیم ہو۔

প্রশ্ন ঃ হুজুর পুর নুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মোবারক নাম শুনে হাতে চুমু দিয়ে চোখে লাগানোর হুকুম কি?

উত্তর ঃ ইহা জায়েজ বরং মুস্তাহাবই বটে। যদি শরীয়াতের কোন বাধা না থাকে। যেমন জুমা-ঈদের খোতবা শ্রবণের সময়, কুরআন করিমের তেলাওয়াত শুনার সময় এবং নামায রত অবস্থায় চুমুদানের অনুমতি নেই। এছাড়া অন্যান্য সব সময় প্রিয় নবী (দঃ) এর নামেপাকের চুমু খাওয়া জায়েজ বরং মুস্তাহাবই বটে। যদি তা আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর মহাব্বত ও তা'জীম প্রদর্শনের নিয়্যতেই হয়ে থাকে।

✪ معارج النبوة (মুআরেজুন নুবুয়্যাত) নামক প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বহু মূল্যবান জীবনী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত আছে, বনি ইস্রায়িলের চরম উন্নতির যুগে এক ঈমানদার ফাসেক লোক তার বাইশ বৎসরের যৌবনকাল আল্লাহর নাফরমানীতেই কাটিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন তার অত্যাচারে অতিষ্ঠিত হয়ে তার থেকে পারিত্রাণ কামনা করতে থাকে। হঠাৎ একদা তার মৃত্যু হলে স্থানীয় লোকেরা তার লাশকে টানা-হেছড়া করে নিয়ে গিয়ে বনী ইস্রায়িলের এক কবরস্থানের অন্ধকার জঙ্গলে নিক্ষেপ করে আসে-এবং সবাই স্বস্তি বোধ করতে থাকে। ইত্যবসরে হযরত মুছা (আঃ) এর নিকট ওহি আসল, হে আমার প্রিয় নবী মুছা! আমার এক পেয়ারা বান্দার মৃত্যু হয়েছে। লোকেরা তাকে কবরস্থানের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে

এসেছে। তাকে সেখান থেকে এনে কাফন পরিয়ে এবং তোমার কাওমকে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে জানাযার নামায আদায় কর। হয়তঃ এর দ্বারা বনী ইস্রায়িলের মুক্তি অর্জন সম্ভব হতে পারে।

হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর আদেশ ক্রমে কবর স্থানের তথায় গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সত্যিই একটি লাশ অযত্নে পড়ে আছে। দৃষ্টি দিয়ে দেখার পর চিনতে পারলেন যে,ইহা ঐ পাপীষ্ট লোকটিরই মরদেহ, এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। কিন্তু আদেশ ছিল স্বয়ং আল্লাহর, তাই অগত্যা ঐ মর দেহকে নিয়ে এসে আল্লাহর আদেশ মোতাবেক সবাইকে নিয়ে জানাযার নামায আদায় করত; তাকে কবরস্থানে দাফন করে দিলেন। হযরত মুছা (আঃ) অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন, হে প্রভু আল্লাহ! ব্যাপারটাকি? তখন জিব্রায়িল (আঃ) এর মারফত আল্লাহ তাআলা বললেন হে মুছা! আমার অন্যান্য বান্দারা তার নাফরমানী ও অপরাধগুলোই দেখেছে, কিন্তু একদিনের ঘটনা— সে তৌরাত কিতাব পাঠ করছিল এবং সেখানে আমার প্রিয় হাবীব আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহর নাম ও তার নাত (গুণগানের) এর আয়াতগুলো পাঠ করে তাঁর অন্তরের মধ্যে অমার আখেরী নবী (দঃ)-এর তা'জীম ও মুহাব্বতের জোয়ার শুরু হয়ে গেল।·ইশ্‌কে রাছুলের তাড়নায় তৌরাতের যে পাতাগুলোতে, 'নামে মুহাম্মদ (দঃ)' ও 'না'তে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম লিখা ছিল, তাকে চুমু দিয়ে চোখে লাগাচ্ছিল। আমি আল্লাহ আমার হাবীবের প্রতি তার এ প্রেম ও ভক্তি-শ্রদ্ধা বোধ দেখে তার জিন্দেগীর পাপ সমূহ মাফ করে দিয়েছি এবং আমার নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের দলে তাকেও শামিল করে নিয়েছি।

পাঠক, লক্ষ্য করুন! প্রিয় নবী (দঃ)-এর পবিত্র নাম মোবারকের প্রতি মুহব্বত ও শ্রদ্ধা বোধের মর্যাদা মহান আল্লাহ তা'লার নিকট কত অধিক! এজাতীয় বর্ণনা ছীরাতে হালবীয়া এবং 'হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়া' নামক গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ও বিদ্যমান আছে।

উক্ত معارج النبوة গ্রন্থে তাফছীর বাহরুল উলুমের বরাতে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত বাবা আদম (আঃ) এর তৈরী মাটির দেহে যখন রূহকে স্থাপন করা হয়, তখন তিনি তার প্রথম হাঁচি আসার সাথে সাথে 'আলহামদু লিল্লাহ, এয়ার হামুকাল্লাহু রাববুকা-ছাবাকাত রাহমাতী আলা গাজাবী-বাক্যের আওয়াজ শুনতে পান। সে মুহূর্তে নূরে মুহাম্মাদী (দঃ) হযরত আদম (আঃ) এর ললাট অভ্যন্তরে প্রকাশিত হয় ও স্বক্রীয় হয়ে উঠে। হাঁচিকালে ঐ বাক্য উচ্চারণের আওয়াজ তথা থেকে এসেছিল। তখন মনে হচ্ছিল যেন মুক্তায় মুক্তায় ঘর্ষণ হচ্ছে সে মুহূর্তে আদম (আঃ) আল্লাহর কাছে জানতে চাইলেন, হেপ্রভু! এটা কিসের আওয়াজ? উত্তরে রাব্বুল আলামীন এরশাদ করলেন, এটা তোমারই সন্তান শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূরের আওয়াজ, এতে হযরত আদম (আঃ) আকাঙ্খা পোষণ করলেন হে প্রভু! আমাকে নূরে মুহাম্মাদী (দঃ) দেখানো হউকঃ তখন

আল্লাহ জাল্লা শানুহু এরশাদ করেলেন হে আদম! নূরে মুহাম্মাদী (দঃ) তোমার অন্তর রাজ্যেই বিরাজমান আছে এবং এখনই তোমার ললাট দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে-এতেকরে হযরত আদম (আঃ) নূরে মোহাম্মদী (দঃ) কে অবলোকন করলেন এবং কপালে হাত দেওয়ার ফলে নূরের কিছু অংশ আদম (আঃ) এর হাতের নখেও লেগে পড়েছিল। নিজ নখে ঐ পবিত্র নূরের অংশকে দেখেতে পেয়ে পবিত্র নূরের ইজ্জত-সম্মানার্থে তিনি নিজ হাতের নখে চুমা দিয়ে চোখে লাগালেন। ঐ দিন থেকেই আওলাদে আদম (আঃ) এর মধ্যে প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের তাজীম ইহ্‌তেরামের উদ্দেশ্যে হাতের নখে চুমা দেওয়ার ছুন্নাত-প্রথা চালু হয়ে এ পর্যন্ত চলে আসছে। এ ধরণের বর্ণনা 'তাফছীরে রুহুল বয়ানের মধ্যেও বিদ্যমান আছে।

একামতের জরুরী মাসায়েল ঃ

✪ পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায ঘরে একা একা আদায় করা হউক, কিংবা ঘরে ও মাসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করা হউক, ওয়াক্তীয়া আদায় করা হউক কিংবা কাযা আদায় করা হউক সবক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে জুমআর নামাযের জন্য আযানের ন্যায় একামত বলেই নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

✪ আযানে যে সমস্ত বাক্য বলা হয়ে থাকে, একামতেও ঐ একই বাক্য সমূহ বলতে হয়। তবে একামতের সময় حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর অতিরিক্ত একে একে দু'বার করে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (কাদ্ কা মাতিচ্ছালাতু) বলতে হয়।

✪ একামতের জাওয়াব প্রদান করা মুস্তাহাব। একামতের জাওয়াবগুলো আযানের জাওয়াবের মতই। তবে একামত দাতা যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে তখন উপস্থিত মুছাল্লিগণ উত্তরে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا (আকা-মাহাল্লাহ ওয়া আদামাহা) বাক্যখানা বলবে।

✪ একামত দ্রুত ও কেবলামুখী হয়ে বলাটাই সুন্নাত।

✪ একামত বলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে নামায আরম্ভ করা মুস্তাহাব।

✪ জামাতের নামাযে একামত বলার সময় মোয়াজ্জেন যখন হাইয়া আলাছালাতি বা হাইয়া আলাল্ ফালাহ বলবে তখনই ইমাম-মুক্তাদী সকলকে নামায আদায়ের জন্য দাড়াতে হয়।

আমাদের দেশের অনেক মাসজিদে একামত বলা শুরু করার সাথে সাথে কাতার সোজা করা হউক বলে সকলেই যে দাড়িয়ে যায় এবং কথাবার্তা বলে বিশৃঙ্খলা শুরু করে দেয়, এটা শরীয়াতে নির্ধারণকৃত নিয়মের খেলাফ ও বিপরিত।[১]

টীকা ঃ ১

وَيَقُوْمُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ شرح وقايه / (و) مِنَ الْأَدَبِ (الْقِيَامُ) اَىْ قِيَامُ الْقَوْمِ وَالْإِمَامِ اِنْ كَانَ حَاضِرًا بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ (حِيْنَ قِيْلَ) اَىْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং একমাতের পূর্বেই কাতার সোজা করে বসা এবং হাইয়া আলাসছালাহ কিংবা হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সাথে সাথেই নামাযের জন্য দাড়াবে, এর আগে নয়।

টীকার বাকী অংশ

وَقْتَ قَوْلِ الْمُقِيْمِ (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) (مراقى الفلاح) وَالْقِيَامُ لِإِمَامٍ وَمُؤْتَمٍّ حِيْنَ قِيْلَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (در مختار)

وَاِذَا اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْاِقَامَةِ وَدَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَاِنَّهُ يَقْعُدُ وَلَايَنْتَظِرُ قَائِمًا فَاِنَّهُ مَكْرُوْهٌ كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ ـ وَيُفْهَمُ مِنْهُ كَرَاهَةُ الْقِيَامِ اِبْتِدَاءَ الْاِقَامَةِ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُوْنَ (طَحْطَاوِىْ عَلٰى مَرَاقِي الْفَلَاحِ)

اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عِنْدَالْاِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ الْاِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلٰكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ اِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلَهُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ (عالمگيري)

اِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْاِمَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَ الْاِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُ يَقُوْمُ الْاِمَامُ وَالْقَوْمُ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ ـ

(عالمگيريه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের ফরয সর্ম্পকীয় আলোচনা

উল্লেখ্য যে, নামাযের ফরয বিষয়টি দু'পর্যায়ে বিভক্ত। যথা–

১) নামাযের শর্তসমূহ। ২) নামাযের রুকনসমূহ।

নামাযের শর্তসমূহ সম্পর্কে আল্ ফেক্হা আলাল মাজাহিবিল আরবাআ কিতাবের ১ম খণ্ডে উল্লেখ রয়েছে,

اَلْحَنَفِيَّةُ قَسَّمُوْا شُرُوْطَ الصَّلٰوةِ اِلٰى قِسْمَيْنِ : (١) شُرُوْطِ وُجُوْبٍ (٢) وَشُرُوْطِ صِحَّةٍ ـ

অর্থাৎ হানফী মাজহাবের ফোকাহায়ে কেরাম নামাযের শর্তসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন যথা ঃ ১) নামায ফরয হওয়ার শর্তসমূহ।

২) নামায ছহী-শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ।

০ নামায ফরয হওয়ার শর্তসমূহ সম্পর্কে 'مَذَاهِبِ اَرْبَعَةْ' কিতাবে বলা হয়েছে,

اَمَّا شُرُوْطُ الْوُجُوْبِ عِنْدَهُمْ فَهِيَ خَمْسَةٌ : (١) بُلُوْغُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (٢) وَالْاِسْلَامُ (٣) وَالْعَقْلُ (٤) وَالْبُلُوْغُ (٥) وَالنقا مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ـ

০ 'ফতোওয়ায়ে শামী' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে,

كَالتَّكْلِيْفِ وَالْقُدْرَةِ وَالْوَقْتِ

০ 'গায়াতুল আওতার' নামক কিতাবে বলা হয়েছে,

منجمله شرائط وجوب يك تكليف ہے يعنى مسلمان ہونا عاقل وبالغ ہونا واز اں جمله عاجز نه ہو نا نماز سے وازاں جمله وقت ہے

উল্লেখিত উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে জানা যায় যে, কোন নারী পুরুষের উপর নামায ফরয হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১) নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দ্বীনী দাওয়াত পৌছা।
২) মুছলমান হওয়া।
৩) বালেগ-বিবেকবান হওয়া এবং সাথে সাথে হুশ-চৈতন্য বহাল থাকা।
৪) মেয়েলোকদের হাইজ-নেফাছ মুক্ত হওয়া।

৫) নামায আদায়ে অপারগ-অক্ষম না হওয়া।

৬) নামাযের ওয়াক্ত হওয়া।

যখন কোন নারী পুরুষের মধ্যে উপরোল্লেখিত শর্তসমূহ পাওয়া যায় তখন তার উপর প্রত্যহ নিয়মিত নামায আদায় করা ফরয তথা অবশ্যই পালনিয় অলজ্ঘনীয় কর্তব্য হয়ে পড়ে।

নামায ছহী– শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ[১] ঃ

নামায ছহী-শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ তথা আমরা যে কাজগুলোকে নামাযের বাইরের ফরয কাজ রূপে জানি তৎসম্পর্কে مذاهب اربعه নামক কিতাবে বলা হয়েছে:

اَمَّا شُرُوْطُ الصِّحَّةِ فَهِىَ سِتَّةٌ ـ (١) طَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْحَدَثِ ـ (٢) وَطَهَارَةُ الثَّوْبِ مِنَ الْخُبْثِ ـ (٣) وَطَهَارَةُ الْمَكَانِ مِنَ الْخُبْثِ (٤) وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ ـ (٥) وَالنِّيَّةُ ـ (٦) وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ـ

✪ 'তান্‌ভীরুল আবছার' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

وَهِىَ (١) طَهَارَةُ بَدَنِهٖ مِنْ حَدَثٍ وَخُبْثٍ (٢) وَثَوْبِهٖ (٣) وَمَكَانِهٖ مِنَ الثَّانِىْ (٤) وَسَتْرُ عَوْرَتِهٖ (٥) وَالنِّيَّةُ (٦) وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ـ

✪ ইমাম হালবীর শরহে মুনিয়্যাতিল মুছাল্লী' নামক কিতাবে বলা হয়েছে,

اَمَّا الشَّرَائِطُ فَسِتَّةٌ ـ (١) اَلْاَوَّلُ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ ... (٢) وَالثَّانِىْ الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ ....(٣) وَالثَّالِثُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ .... (٤) وَالرَّابِعُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ....(٥) وَالْخَامِسُ دُخُوْلُ الْوَقْتِ الْمَعْهُوْدِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ .....(٦) وَالسَّادِسُ النِّيَّةُ ـ

✪ ফতোওয়ায়ে আলমাগীরির মধ্যে উল্লেখ আছে,

وَهِىَ عِنْدَنَا سَبْعَةٌ ـ (١) اَلطَّهَارَةُ مِنَ الْاَحْدَاثِ ـ (٢) وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْاَنْجَاسِ (٣) وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ ـ (٤) وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ـ(٥) وَالْوَقْتُ ـ (٦) وَالنِّيَّةُ (٧) وَالتَّحْرِيْمَةُ ـ

টীকা ঃ

اَلشَّرْطُ لُغَةً اَلْعَلَامَةُ اللَّازِمَةُ وَشَرْعًا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْئُ وَلَا يَدْخُلُ فِيْهِ ـ (در المختار)

✪ 'মারাকিউল ফালাহ' কিতাবে বলা হয়েছে,

فَمِنَ الشَّرَائِطِ (الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ) اَلْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمِنْهَا (طَهَارَةُ الْجَسَدِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ) اَلَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ .... وَمِنْهَا (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) لِلْاِجْمَاعِ عَلٰى اِفْتِرَاضِهٖ ....وَمِنْهَا (اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ) (وَ) مِنَ الشُّرُوْطِ (اَلْوَقْتُ) لِلْفَرَائِضِ الْخَمْسِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْاِجْمَاعِ .... (وَ) تشترطُ (النِّيَّةُ) وَهِىَ الْاِرَادَةُ الْجَازِمَةُ ..... اَلْمَشَائِخُ الْمُحَقِّقِيْنَ[১] (وَ) يُشْتَرَطُ (التَّحْرِيْمَةُ) وَلَيْسَتْ رُكْنًا وَعَلَيْهِ عَامَّةُ عَلَى الصَّحِيْحِ ـ

উপরের উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, কতেক ফোকাহায়ে কেরামের মতে নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ছয়টি আর কতেকের মতে সাতটি।

'তাক্‌বীরে তাহরীমাকে রুকন গন্য না করে যারা শর্ত রূপে মেনে নিয়েছেন, তারা নামাযের শর্ত সাতটি বলেই উলেখ করেছেন। আর যারা তাকবীরে তাহরীমাকে শর্ত হিসাবে গণ্য না করে নামাযের রুকন হিসাবে ধরে নিয়েছেন তারা শর্তের সংখ্যা 'ছয়' হিসাবেই উল্লেখ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, নামায ছহী-শুদ্ধ হওয়ার শর্তের সংখ্যা যারা ছয় বলে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

কারণ শর্তের সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে সম্মানিত ফকীহগনের কেউ কেউ নাজাছাত-নাপাকীর সর্ম্পক যেহেতু মুছাল্লির তিনটি দিক অর্থাৎ, (১) মুছাল্লীর শরীর (২) মুছাল্লীর পোষাক ও (৩) মুছাল্লির নামায আদায়ের জায়গার সাথে রয়েছে ইহা বিবেচনা করে।

✪ طَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ -কে নামাযের শর্তের প্রথম প্রকার এবং طَهَارَةُ الثَّوْبِ مِنَ الْخُبْثِ কে শর্তের ২য় প্রকার ও طَهَارَةُ الْمَكَانِ مِنَ الْخُبْثِ কে শর্তের ৩য় প্রকার রূপে ভাগ করত শর্তের পাক পবিত্রতার বিষয় টিকে তিন গণনা করে এর সাথে (১) ছতর ঢাকা (২) কেবলামুখি হয়ে দাড়ান ও (৩) নিয়্যাতকে যোগ করতঃ ওয়াক্তকে অত্র-শরায়েত থেকে বাদ দিয়ে নামাযের শর্তের সংখ্যা ছয় বলে উল্লেখ করেছেন।

টীকা ঃ

وَهُوَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ مَشَائِخِنَا (بَدَائِع) وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ مِنَ الْمَذْهَبِ ـ (شرح منية)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপরদিকে ফোকাহায়ে কেরামের কেউ কেউ নাজাছাত নাপাকির দিক বিবেচনা করে যেহেতু নাজাছাত দুপ্রকার ঃ (১) হাকীকী ও (২) হুকমী সেহেতু পাক পবিত্রতার শর্তকে طَهَارَةٌ مِّنَ الْحَدَثِ الْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ وَمِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ-কে শর্তের প্রথমম প্রকার এবং طَهَارَةٌ مِّنَ الْخُبْثِ اى النجاسة الحقيقية-কে শর্তের দ্বিতীয় প্রকার রূপে গণনা করত নামাযের পাক পবিত্রতা বিষয়ের শর্তের সংখ্যাকে দু'য়ের মধ্যে সীমিত করে (১) ছতর ঢাকা (২) কেবলা মুখী হওয়া (৩) নিয়্যত করা ও (৪) নামাযের ওয়াক্ত হওয়া এ চার প্রকার কে যোগ করতঃ নামাযের শর্তের মোট সংখ্যা ছয় বলে বর্ননা করেছেন।

এ ক্ষেত্রে অত্র বিষয়টিও স্মরণ রাখা দরকার যে, কতেক ফোকাহায়ে কেরাম ওয়াক্তকে কারো উপর নামায ফরয হওয়ার শর্ত রূপে উল্লেখ করেছেন। অপর কতেকে ওয়াক্তকে নামায ছহী শুদ্ধ হওয়ার শর্ত রূপেই উল্লেখ করেছেন, যা বিভিন্ন গ্রন্থের স্ব স্ব স্থানে উল্লেখ রয়েছে।

এ সংক্ষিপ্ত তথ্যপুর্ণ আলোচনার ভিত্তিতে নামায ছহী-শুদ্ধ হওয়ার শর্ত সমুহ নিম্নে দেয়া হল–

(ক) এক দল ফকীহদের মতে নামাযের শরায়েত সমুহ—

১। (নাজাছাতে হুকমী ও নাজাছাতে হাকিকী হতে) মুছাল্লির শরীর পাক পবিত্র হওয়া।

২। (নাজাছাতে হাকীকীহতে) মুছাল্লির পোষাক পাক হওয়া।

৩। (নাজাছাতে হাকীকী হতে) মুছাল্লির নামাযের জায়গা পাক হওয়া

৪। মুছাল্লির ছতর ঢাকা (শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত শরীরের অংশ আবৃত রাখা)

৫। কেবলা মুখী হয়ে নামায আদায় করা।

৬। নামাযের নিয়্যত করা।

(খ) অন্য একদল ফকীহ ছাহেবানগনের মতে—

১। নাজাছাতে হুকমী হতে (মুছাল্লির শরীর) পাক হওয়া।

২। নাজাছাতে হাক্বীকী হতে মুছাল্লির শরীর, পোষাক ও নামাযের জায়গা পাক-পবিত্র হওয়া।

৩। ছতর ঢাকা।

৪। কেবলা মুখী হওয়া।

৫। নিয়্যত করা

৬। নামাযের নির্ধারিত ওয়াক্ত হওয়া।

(গ) অপর একদল ফোকাহায়ে কেরাম গনের মতে—

(১) নাজাছতে হুকমী হতে (মুছাল্লির শরীর) পাক হওয়া।

(২) নাজাছাতে হাকীকীহতে (মুছাল্লির শরীর, পোষাক ও নামাযের জায়গা) পাক হওয়া। (৩) ছতর ঢাকা। (৪) কেবলা মুখী হয়ে নামায আদায় করা। (৫) নামাযের জন্য নির্ধারিত ওয়াক্ত হওয়া। (৬) নিয়্যত করা। (৭) তাকবীরে তাহরীমা বলা।

নামাযের শর্তসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১. মুছাল্লির শরীর পাক পবিত্র হওয়া ঃ

যে কোন লোকের নামায আদায় করার বেলায় ইতি পুর্বেকার নাজাছতে হাকীকী অধ্যায়ে উল্লেখিত নাজাছতে গলীজা ও খাফীফা তথা মল, মূত্র, প্রবাহমান রক্ত ও বীর্য ইত্যাদির শরীয়াত নির্ধারিত পরিমাণ নাপাকী মুছাল্লির শরীরে লেগে থাকলে উহা ধুয়ে শরীরকে পাক পবিত্র করে নেওয়া ফরয।

এমনি ভাবে নাজাছতে হুকমী (হাদছে আকবর ও হাদছে আছগর) তথা কারো উপর গোছল ফরয হলে গোছল করে নিয়ে এবং ওযু ফরয হলে ওযু করে নিয়ে নামায আদায়ের জন্য নাজাছাতে হুকমী থেকে পাক পবিত্র হওয়াও ফরয।

আনুষাঙ্গিক মছায়েল ঃ

✪ নামায আদায়রত অবস্থায় নামাযির শরীর জুনুবী তথা গোছল ফরয হয়েছে এমন ধরনের কোন লোকের শরীরের সাথে লাগলেও উক্ত মুছাল্লির নামায হয়ে যাবে।[১]

✪ অনুরূপ নামাযরত অবস্থায় কোন শিশু সন্তান নাপাক শরীর কিংবা কাপড় সহ এসে নামাযির কোলে বসে পড়লে আর ঐ অবস্থায় যদি নামাযী শিশুকে নিজে স্পর্শ না করে রীতিমত নিজের নামাযই আদায় করে যায়, তাহলে তার ঐ নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এমতাবস্থায় নামাযী যদি স্ব-ইচ্ছায় ঐ শিশুকে নিজ কোলে বসায় বা নিজ শরীর কিংবা কাপড়ের সাথে লাগায়, তাহলে ঐ মুছাল্লির নামায শুদ্ধ হবে না।[২]

✪ এরূপভাবে যদি কোন কুকুর বা কুকুর ছানা মুখবাধা অবস্থায় এসে কোন নামাযরত লোকের শরীর বা কাপড়ের উপর পড়ে কুকুরের মুখের লালা যা নাপাক তা না লাগার কারণে মুছাল্লির নামায হয়ে যাবে। কিন্তু যদি মুখ খোলা থাকে এবং কুকুরের মুখের লালা নামাযীর শরীর বা কাপড়ে লাগে তাহলে নামায শুদ্ধ হবে না।[৩]

টীকা ঃ

(١) فَلَوْحَمَلَ الْمُصَلِّىْ جُنُبًا لَايَمْنَعُ صَلَاتَهُ مُطْلَقًا لِاَنَّ نَجَاسَتَهُ حُكْمِيَّةٌ. (شامى)

(٢) كَصَبِىٍّ عَلَيْهِ نَجَسٌ اِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِنَفْسِهِ منع وَالَّا لَا (درالمختار) اَىْ وَاِنْ كَانَ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ لَايَمْنَعُ لِاَنَّ حَمْلَ النَّجَاسَةِ حِيْنَئِذٍ يَنْسَبُ اِلَيْهِ لَا اِلَى الْمُصَلِّىْ - (شامى)

(٣) وَلَوْصَلّٰى وَمَعَهُ جَرْوُكَلْبٍ اَوْكُلُّ مَا لَايَجُوْزُ اَنْ يَتَوَضَّا بِسُؤْرِهِ قِيْلَ لَمْ يَجُزْوَ الْاَصَحُّ اَنَّهُ اِنْ كَانَ فَمُهُ مَفْتُوْحًا لَمْ يَجُزْ لِاَنَّ لُعَابَهُ يَسِيْلُ فِىْ كُمِّهِ فَيَصِيْرُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ পেশাব পায়খানা ভর্তি কোন শিশি বা পাত্র কোন মুছাল্লি নিজের সাথে রেখে নামায আদায় করলে সে ক্ষেত্রে তার ঐ নামায আদায় হবে না।[১]

✪ নামাযীর শরীর বা পোষাক যদি বিড়ালে চাটে, তবে তা না ধুয়ে নামায আদায় করে থাকলে বিশুদ্ধ মতানুসারে মাকরূহে তানজিহের সাথেই উক্ত নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (ছাগিরী)

২. মুছাল্লির পোষাক-পরিচ্ছদ পাক পবিত্র হওয়া ঃ

যেসব পোশাক পরিধান করে নামায পড়া হয় ঐ সব পোষাক পরিচ্ছদ শরীয়ত কর্তৃক নিধারিত পরিমাণ নাপাকী হতে পাক পবিত্র হওয়া ফরয।

নামাযের কাপড় বলতে পুরুষেদের জামা. লুঙ্গি, চাদর পায়জামা, প্যান্ট, জাইঙ্গা, গেঞ্জী জ্যাকেট, রুমাল, টুপি, পাগড়ি মোজা ইত্যাদি এবং মেয়ে লোকদের শাড়ী, ব্লাউজ, পেটি কোট, ফরক ও উড়না ইত্যাদি কে বুঝায়। যদি কোন মুছাল্লির মাত্র এক খানা কাপড় থাকে এবং উক্ত কাপড়ের এক চতুর্থাংশ তথা চার ভাগের এক ভাগ মাত্র পাক থাকে ঐ অবস্থায় উক্ত কাপড় পরেই তাকে নামায আদায় করে যেতে হয়।

আর যদি উক্ত কাপড়ের চার ভাগের এক ভাগও পাক না থাকে কিংবা যদি সম্পূর্ণ কাপড়টিই নাপাক হয় এমতাবস্থায় সে লোক উলঙ্গ অবস্থায় ও নামায আদায় করতে পারবে। তবে উলঙ্গ অবস্থায় নামায আদায় করার চেয়ে ঐ নাপাক কাপড় পরিধান করতঃ নিয়ম মাফিক রুকু সিজদা আদায়ের মাধ্যমে নামায পড়াটাই তার জন্য উত্তম। (আলমগীরী)

✪ কোন কাপড়ে নাপাকী লাগলে কোন্ জায়গায় নাপাকী লেগেছে তা সঠিক করে জানা না থাকলে তখন সম্পূর্ণ কাপড় খানা ধৌত করতঃ পাক করেই নামায আদায় করাটা অধিক উত্তম।[১]

✪ আর যদি কোন কাপড়ের শুধুমাত্র এক পার্শ্বেই নাপাকী লাগে কিন্তু কোন পার্শ্বে নাপাকী লেগেছে তা সঠিক জানা না থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত কাপড়ের যে কোন পার্শ্ব ধৌত করে নিয়ে নামায আদায় করা যাবে।[২]

৩. নামাযের জায়গা পাক-পবিত্র হওয়া

যে স্থানে নামায আদায় করা হয় তা পাক পবিত্র হতে হবে, উক্ত জায়গা কোন প্রকারের বিছানা শুন্য খালি জমি (মাটি) হউক কিংবা পাকা ফ্লোর হউক, অথবা পাটি চাটাই, চাদর, গালিচা ,কার্পেট ,বা অন্য জাতীয় কোন প্রকারের জায়নামায বিছানো হউক উহা পাক পবিত্র হওয়া ফরয।

আনুষঙ্গিক মাছআলা ঃ

✪ ছোট বড় বিছানার কোন অংশ যদি নাপাক থাকে আর দু'পা রাখার ও সিজদা করার স্থান টুকু পাক থাকে,তাহলে উক্ত বিছানার পাক অংশে দু'পা রেখে এবং পাক অংশে সিজদা করতঃ নামায আদায় করাটা শুদ্ধ হবে (আলমগীরী)।

কিন্তু পবিত্র স্থানে দাড়িয়ে নাপাক স্থানে সিজদা করলে নামায শুদ্ধ হবে না।

✪ নামায আদায়ের জন্য বিছানো দো পাল্লা বিশিষ্ট বেডসিট বা চাদর ইত্যাদির মধ্যভাগে বা দ্বিতীয় পাল্লার নীচ ভাগে নাপাকী থাকলে দেখতে হবে উক্ত বেডসিট কিংবা কাপড় খানা একত্রে সেলাই করা কিনা, যদি একসাথে সেলাই করা হয় তাহলে এমতাবস্থায় উহার উপরি অংশে নামায আদায় করা শুদ্ধ হবেনা। কিন্তু যদি সেলাইযুক্ত না হয় বরং দু'খানা পৃথক পৃথক কাপড়ই হয়ে থাকে তাহলে উহার উপর নামায পড়া শুদ্ধ হবে। (আলমগীরী)

ইটের উপরের অংশ পাক থাকলে উহার নীচের অংশে নাপাকী থাকলে ও উপরের অংশে দাড়িয়ে নামায আদায় করা জায়েজ। (মুনিয়া)

✪ যদি কোন নাপাক জমি কিংবা নাপাক বিছানার উপর কোন পাক পবিত্র কাপড় বিছানো হয় তা হলে দেখতে হবে কাপড় খানা কোন ধরনের। কাপড় খানা যদি এমন ধরনের পাতলা হয় যাতে নীচের নাপাকীর রং অথবা গন্ধ অনুভূত হয়, তাহলে উক্ত কাপড়ে দাড়িয়ে নামায পড়া শুদ্ধ হবেনা।

টীকা ঃ

مُتَبَلِّلاً بِلُعَابِهِ فَيَتَنَجَّسُ كُمُّهُ فَيَمْنَعُ الْجَوَازَ اِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَاِنْ كَانَ فَمُهُ مَشْدُوْدًا بِحَيْثُ لَايَصِلُ لُعَابُهُ اِلٰى ثَوْبِهِ جَازَ لِاَنَّ ظَاهِرَ كُلِّ حَيْوَانٍ طَاهِرٌ وَلَايَتَنَجَّسُ اِلَّا بِالْمَوْتِ وَنَجَاسَةُ بَاطِنِهِ فِىْ مَعْدَنِهِ فَلَا يَظْهَرُ حُكْمُهَا كَنَجَاسَةِ نجاسة بَاطِنِ الْمُصَلِّىْ (بحر الرائق)

(١) وَلَوْصَلّٰى وَفِىْ كُمِّهِ قَارُوْرَةٌ مَضْمُوْمَةٌ فِيْهَا بَوْلٌ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ لِاَنَّهُ فِىْ غَيْرِ مَعْدَنِهِ وَمَكَانِهِ (بحر الرائق)

টীকা ঃ

(١) وَالْاِحْتِيَاطُ اَنْ يَغْسِلَ جَمِيْعَ الثَّوْبِ (عالمكيريه)

(٢) اِذَا تَنَجَّسَ طَرْفٌ مِنْ اَطْرَافِ الثَّوْبِ وَنَسِيَهُ فَغَسَلَ طَرْفًا مِنْ اَطْرَافِ الثَّوْبِ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ حَكَمْ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ هُوَ الْمُخْتَارُ (عالمكيريه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ আর যদি উপরের কাপড় খানা এমন ধরনের মোটা হয় যাতে নীচের নাপাকির বর্ণ বা ঘ্রান; গন্ধ উহাতে মালুম না হয় যেমন মোটাকার্পেট ,তেরপাল,গালিচা কিংবা মোটা জায়নামায ইত্যাদি তাহলে উহাতে দাড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহের সঙ্গে জায়েজ। অন্য স্থান থাকতে উক্ত জায়গায় নামায আদায় করাটা উচিৎ নয়। এঁকারনেই নিম্নে বর্নিত স্থানসমূহে নামায আদায় করা সর্বদা মাকরূহ ঃ

(১) পায়খানা-পেশাব খানা ঘরে (২) পায়খানা ঘরের ছাদের উপর । (৩) পায়খানার সেফটি ট্যাংকের উপর। (৪) মানুষ পশু ইত্যাদির মল-মুত্র ও আর্বজনা নিক্ষেপের স্থানে। (৫) যে স্থানে সর্বদা পশু জবেহ করা হয়। (৬) কবরস্থান ও চিতায়। (৭) ময়লা-আর্বজনা চলাচলের নালা -নর্দমার উপর । (আলমগীরী)

৪. ছতর ঢাকা (নামাযের পোষাক)

পুরুষের নাভি সংলগ্ন নিম্ন স্থান হতে হাটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত ছতর অর্থাৎ কাপড় ইত্যাদি দ্বারা সর্ববিস্থায় বিশেষ করে নামায রত অবস্থায় ঢেকে রাখাটাকে শরীয়ত ফরজ করে দিয়েছে।

স্বাধীন স্ত্রীলোকদের মুখমন্ডল ,হাতের তালুদ্বয় এবং পায়ের পাতাদ্বয় ব্যতীত শরীরের বাকী সমস্ত অঙ্গ ছতর। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় বিশেষতঃ নামায আদায় কালীন সময়ে ঢেকে রাখা ফরয।

নারী হউক কিংবা পুরুষ হউক স্বীয় অঙ্গ সমুহের যতটুকু অংশ ঢেকে রাখার জন্য শরিয়ত ফরয তথা অপরিহার্য অলঙ্গনীয় কর্তব্য করে দিয়েছে নামাযরত অবস্থায় ছতর অংশের প্রত্যেক অঙ্গের এক চতুর্থাংশ উলঙ্গ হয়ে গিয়ে যদি এক রোকন আদায় করতে যা সময় লাগে ততক্ষণ সময় অনাবৃত (খোলা) থাকে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ছোবহানাল্লাহ কলেমা তিন বার উচ্চারণ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ সময়কে এক রোকন আদায়ের সময় ধরে নেওয়ার জন্য শরীয়ত বিধান দিয়েছে। অর্থাৎ তিন বার ছোবহানাল্লাহ বলতে যত সময় লাগে ততক্ষণ সময় যদি নামাযরত অবস্থায় কোন মুছাল্লীর ছতর অংশের কোন এক অঙ্গের এক চুতুর্থাংশ উলঙ্গ অবস্থায় থাকে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

যেমন পুরুষ লোকের এক রান একটি অঙ্গ, নামাযরত অবস্থায় এ-রান অঙ্গের চারভাগের এক অংশের কাপড় সরে গিয়ে যদি তিনি বার ছোবহানাল্লাহ বলতে পারার সময় পরিমাণ উলঙ্গ থাকে, তাহলে তার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে

✪ এমনিভাবে মেয়ে লোকের কর্ণ ও বাহুর নীচের কনুই গিরা হতে হাতের আঙ্গুলসহ একহাত একটি অঙ্গ। যদি নামাযরত অবস্থায় এক কানের এক চতুর্থাংশ কিংবা পুরা হাতের (তালুবাদে) এক চতূর্থাংশের কাপড় সরে গিয়ে তিনব্যর

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছোবহানাল্লাহ বলতে পারার পরিমান সময় কাপড় বিহীন (খোলা) থাকে তাহলে তার নামায ভেঙ্গে যাবে। নারী হউক পুরুষ হউক উক্ত খোলা অঙ্গে কাপড় দিয়ে নতুনভাবে নিয়্যত করতঃ ঐ নামায পুনরায় তাকে আদায় করে নিতে হবে।

পুরুষের লুঙ্গি পায়জামা, কোর্তা ও টুপিসহ পাগড়ি পরিধান করে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (আলমগীরী)

✪ শুধু লুঙ্গি, পায়জামা পরিধান করতঃ (শরীরের বাকী অংশ খোলা রেখে) নামায আদায় করা মাকরূহ। (জামেউর রমুজ)

✪ হাদীছ শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, পাগড়ি বিহিন নামাযের তুলনায় পাগড়ি সহকারে নামাযের ছাওয়াব সত্তর-গুণ বেশি।

✪ পাগড়ির শামলা একহাত হতে অর্ধপীঠ পর্যন্ত লম্বা হওয়া মুস্তাহাব (ফয়জুলবারী)। অর্ধপিঠের চেয়ে শামলা লম্বা হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামদের অনেকের আপত্তি থাকার কারণে অর্ধপিঠের চেয়ে অধিক লম্বা না হওয়াটাই উত্তম।

✪ তিবরানি শরীফের এক বর্ণনা মতে নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাধারণ অবস্থায় তিন হাত লম্বা পাগড়ি পরতেন। পাঞ্জেগানা নামায আদায়ের সময় নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাত হাত লম্বা পাগড়ি পরিধান করতেন এবং জুম'আ ও ঈদের নামায বার হাত লম্বা পগড়ি পরিধান করতঃ আদায় করতেন।

হাদীছ শাস্ত্রের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার হযরত মুল্লা আলী কারী (র) বলেন, পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত। বিশেষত নামায আদায়ের সময় পাগড়ি বাঁধা সুন্নাত। পিছনের দিকেই শামলা ছেড়ে দেওয়া উত্তম। ডান কাধের দিকে ছেড়ে দেওয়া জায়েজ কিন্তু বাম দিকে শামলা ছেড়ে দেওয়া সুন্নাতের খেলাপ। (জামউল ওয়াছায়েল শরহে শামায়েল, মিরকাত) টুপি না পরে খালী মাথায় পাগড়ি পরিধান করা মাকরূহ।

✪ তবে যদি কোন পুরুষ লোক লম্বা জুব্বা কিংবা ঐরূপ একখানা লম্বা কাপড় যা দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর ও মাথা ঢেকে যায় তা পরিধান করত নামায আদায় করে তাহলে মাকরূহ হবে না (আলমগীরী)।

✪ স্ত্রীলোকের ও তিন কাপড় যেমন- (দুপায়ের সমস্ত অংশ ঢেকে যায় এমন লম্বা) সেলোওয়ার, পায়জামা, (উভয় হাতের আঙ্গুলের মাথাসহ ঢেকে যায় এমন লম্বা হাত বিশিষ্ট) ফরক এবং (সমস্ত মাথা-সীনাসহ ঢাকা যায় এমন বড়) ওড়না পরিধান করেই নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (আলমগীরী)

স্ত্রীলোকের শুধুমাত্র একখানা কাপড় পরিধান করে নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না।

তবে শাড়ী কিংবা চাদর জাতীয় কাপড় যদি এধরনের মোটা হয় যাতে-শাড়ী পরিধান করার পর কাপড়ের ফাকে শরীর দেখা না যায় এবং এত লম্বা হয়, যাকে পেঁচিয়ে পরিধান করা যায় ও সাথে সাথে সমস্ত শরীর এবং পুরো মাথা পরিপুর্ণভাবে

ঢাকা যায় তাহলে ঐ ধরণের শাড়ী বা চাদর পরিধান করে নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

✪ শাড়ী পরিধান করার পরেও একখানা বড় উড়না দ্বারা মাথা ও ঘাড় পেঁচিয়ে নেওয়া ভাল,এতে মাথা হতে শাড়ী কাপড় পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে।

✪ এরূপ পাতলা কাপড় যা পরিধান করার পরেও ছতর অংশের শরীর দেখা যায় এমন সব পাতলা কাপড় পরে নামায আদায় করলে (স্ত্রী-পুরুষ) কারও নামায শুদ্ধ হবেনা। (আলমগীরী)

✪ কাপড়হীন লোক নিকটস্থ অপর লোকের নিকট কাপড় চেয়ে নিবে। চাওয়ার পরও যদি কাপড় পাওয়া না যায় তখন উলঙ্গ অবস্থাতেই শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে নামায আদায় করে নিলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।(আলমগীরী)

✪ কাপড়হীন লোক গাছের পাতা, চাটাই, পাটি ও কাগজ তথা ছতর ঢাকা যায় এমত কোন বস্তু দ্বারা যদি ছতর ঢেকে নিতে সক্ষম হয় তখন ঐসব দ্বারা ছতর ঢেকেই নামায আদায় করবে। কিছুই পাওয়া না গেলে কাঁদা মাটি দ্বারা লিঙ্গ ঢেকে নামায আদায় করতে হয়। (আলমগীরী)

✪ কাপড়হীন লোক নামায আরম্ভের পর কাপড় পেয়ে গেলে তখন তাকে নামায ভেঙ্গে দিয়ে ঐ কাপড় পরিধান করতঃ নতুন সুত্রে নামায আদায় করতে হবে। নতুবা নামায আদায় হবেনা (আলমগীরী)

✪ কাপড়হীন লোক যদি এ পরিমাণ কাপড় পায় যদ্দারা তার সর্বছোট লজ্জাস্থানটুকু ঢাকা যায় তাহলে সে উহা ঢেকেই নামায আদায় করবে। (আলমগীরী)

✪ কাপড় হীনলোক যদি এ পরিমাণ কাপড় বা অন্য-বস্তু পায় যদ্দারা শুধু মাত্র মলদ্বার ও প্রশ্রাবদ্বার ঢাকা যায় তাহলে সে উহা দ্বারা উভয় স্থান ঢেকেই নামায আদায় করবে।

✪ নামাযরত অবস্থায় কোন মুছাল্লির ছতর স্থান যদি হঠাৎ উলঙ্গ হয়ে পড়ে আর সে যদি অতি তাড়াতাড়ি তা ঢেকে নেয় তাহলে তার নামায ভঙ্গ হবেনা। কিন্তু যদি তিন বার ছোবহানাল্লাহ বলতে যত সময় লাগে ততক্ষণ সময় উলঙ্গ থাকে তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (কবিরী)

✪ যে সমস্ত নারী -কিংবা পুরুষের ছতর ঢাকার মত পাক কিংবা নাপাক কোন প্রকারের কাপড় ইত্যাদি না থাকে এবং ধার হিসাবেও কারো কাছ থেকে পাওয়া না যায় সে পরিস্থিতিতেও উলঙ্গ অবস্থায় তাকে ওয়াক্ত মত নিয়মিত নামায আদায় করে যেতে হবে।

✪ উলঙ্গ অবস্থায় নামায আদায় করার ২টি পদ্ধতি রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ সে লোক আত্তাহিয়্যাতু পাঠের বৈঠকের ন্যায় দুজানু হয়ে বসে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু সিজদা না করে ইশারায় রুক- সিজদা করতঃ নামায আদায় করে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ সে লোক নিজের দু'পা পশ্চিম দিকে লম্বা করতঃ লজ্জাস্থানের উপর নিজের হাত রেখে ইশারায় রুকু সিজদা করতঃ নামায আদায় করে যাবে। উভয় নিয়মের মধ্যে দ্বিতীয় নিয়মটিই উত্তম। (আলমগীরী)।

৫. কেব্‌লা তথা কাবা শরীফ মুখী হয়ে নামায আদায় করা ঃ

সকল প্রকারের নামায তা ফরয-ওয়াজিব হউক কিংবা সুন্নাত নফলই হউক অথবা জানাযার নামায হউক, সব ধরণের নামায আদায়ের সময় কেব্‌লা তথা কাবা শরীফের দিকে সীনা ও মুখ করে দাড়ানো এবং নামাযের সর্বাবস্থায় কাবা মুখী থাকাটা ফরয।

✪ এমনিভাবে সব ধরনের সিজদা তা নামাযের সিজদা হউক বা কোরআন তেলাওয়াতের সিজদা হউক কিংবা শোকরের সিজদা হউক সব ধরনের সিজদা কাবা শরীফ মুখী হয়ে করাটা ফরয। কাবা শরীফের দিক ব্যতীত অন্য দিকে হয়ে এসব করা না-জায়েজ।

✪ কাবা শরীফই যে মুসলমান মাত্রেরই একমাত্র কেবলা এ বিষয়টির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন পূর্বক স্বেচ্ছায় বিনা ওজরে কাবা শরীফের দিক ব্যতীত অন্যান্য দিকে ফিরে কেউ নামায কিংবা সিজদা আদায় করলে কাফের হয়ে যাবে। তবে শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত ওজর অপারগতা বশতঃ কা'বা শরীফের দিক ভিন্ন অন্য দিক হয়ে নামায ইত্যাদি আদায় করার অনুমতি আছে। (ফাতহুল কাদীর, জাওহারাতুন নাইয়ারা, শহরে মুনিয়্যা ইত্যাদি)।

✪ মানব ও জ্বীন জাতির জন্য কা'বা শরীফই একমাত্র কেবলা রূপে আল্লাহ -রাসূল কর্তৃক মনোনিত ও নির্ধারিত। আর ৬ষ্ঠ আসমানে অবস্থিত "বায়তুল মামুর" সাধারণ ফেরেস্তাদের জন্য কেবলা রূপে নির্ধারিত।

"কাররুবিয়ান" ফেরেস্তাগণের জন্য "কুরছী" এবং 'মহান আরশধারী" ফেরেস্তা-দের জন্য 'আরশ-মুআল্লা" কেবলা রূপে নির্ধারিত। (দুররুল হেকম)

✪ কাবা শরীফের দিকে সীনা-মুখ করতঃ নামায আদায় করা শর্ত তথা ফরয। তবে কাবা শরীফের দিকে সীনা-মুখ করার নিয়্যত করা শর্ত নয়। তাই নামায ইত্যাদি আদায়কালে নিয়্যত ব্যতীত কাবা শরীফের দিকে সীনা-মুখ করে দাড়ানোটা পাওয়া গেলেই নামায ইত্যাদি শুদ্ধরূপে আদায় হয়ে যাবে।

✪ পবিত্র কাবা ঘরের চতুর্পার্শ্বস্থ মসজিদ যা মসজিদুল হারাম তথা হেরম মাসজিদ নামে প্রসিদ্ধ উহাতে অবস্থানকারী মুছাল্লীগণের জন্য عَيْنِ كَعْبَةْ (মূল কাবা তথা) ঐ ছোট চারকোণী কাবা ঘরকেই সরাসরি নিজেদের সামনে রেখে অর্থাৎ কাবাঘরের চতুর্দিকে গোলাকৃতি হয়ে দাড়িয়েই নামায আদায় করা ফরয।

মসজিদুল হারামের চতুর্পার্শ্বস্থ লোকেরা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ পবিত্র মক্কা শহরের চতুর্পার্শ্বের অধিবাসীরা পবিত্র কাবা ঘরের নিয়্যতে পবিত্র মক্কা শহরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে যাবে।

✪ আর হেজাজ প্রদেশের চতুপার্শ্বস্থ শহর নগরের লোকেরা (কাবা ঘরের নিয়্যতে) হেজাজ প্রদেশের দিকে হয়ে নামায আদায় করে যাবে। (এনায়া, জামেউর রুমুজ)

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন—

✪ মক্কা শরীফের পূর্ব দিকের লোক (কাবা ঘরের নিয়্যতে) পশ্চিম দিক হয়ে, পশ্চিম দিকের লোক কাবা ঘরের নিয়্যতে পূর্বদিক হয়ে, উত্তর পার্শ্বের লোকেরা কাবা ঘরের নিয়্যতে দক্ষিণ দিক হয়ে এবং দক্ষিণ দিকের লোকেরা (কাবা ঘরের নিয়্যতে) উত্তর দিকে সীনা-মুখ করে নামায আদায় করে যাবে।

(তাবয়ীনুল হাকায়েক, জামেউর রুমুজ)

✪ কোন মুসলিম নতুন কোন অজানা-অচেনা জায়গায় গিয়ে পৌছলে, অথবা দূরের রাস্তা অতিক্রমের জন্য কোন যান-বাহনে থাকা অবস্থায় যদি নামাযের ওয়াক্তে কাবা-কেবলা কোনদিকে তা ঠিক জানতে না পারে তাহলে আস-পাশের কারও নিকট জিজ্ঞাসা করতঃ কেবলার দিক সম্পর্কে অবশ্যই তার জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

✪ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার মত লোক পাওয়া না গেলে কিংবা লোক থাকা সত্ত্বেও কেবলার সঠিক দিক তাদের দ্বারা জানা না গেলে বা অন্য কোন উপায়ে কেবলার সঠিক দিক ঠিক করা সম্ভব না হলে, তাহাররী তথা অন্তর-মন দিয়ে কেবলার দিক সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা চালাতে হবে, এতে কাবা শরীফ যেদিকে বলে অন্তর-মন দৃঢ়ভাবে স্বাক্ষ্য দেয়, সেদিকে সীনা-মুখ করেই নামায আদায় করে যেতে হবে।

এ ক্ষেত্রে নামায আদায়ের পর যদি জানা যায় যে, যেদিকে ফিরে নামায পড়া হয়েছে কা'বা-কেবলা সেদিকে ছিল না। বরং অন্য দিকেই ছিল তবু ও তার ঐ আদায়কৃত নামায শুদ্ধ হয়েছে বলেই শরীয়ত স্বীকৃতি দিবে। পুনরায় সঠিক কেবলা মুখী হয়ে তার নামায আদায় করা লাগবে না।

কিন্তু যদি তাহাররী না করে তথা মন-অন্তর দিয়ে চিন্তা অনুমান করত ঃ অন্তর দিলের দৃঢ় স্বাক্ষ্য-বিশ্বাস না নিয়ে এমনিই এক দিকে ফিরে নামায আদায় করে নেওয়া হয়। তাহলে ঐ নামায আদায় হয়নি বলেই শরীয়াতের সিদ্ধান্ত। যদিও নামায আদায়ের পর জানা যায় যে কেবলা ঠিক সেদিকেই ছিল। কারণ কেবলার দিক জানা না থাকলে মন-অন্তর দ্বারা চিন্তা-অনুমান করতঃ কেবলার দিক ঠিক করাই শরীয়াতের বিধান।

✪ যদি কোন লোক অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং চেষ্টা জিজ্ঞাসা করার পরেও কাবা শরীফের সঠিক দিক নির্ণয় করতে না পেরে অনুমান করে কেবলার দিক স্থীর করতঃ

নামায আদায় করতে থাকে আর ঐ নামায রত অবস্থায় বিশ্বস্থ পন্থায় কাবা শরীফ অন্য দিকে বলে জানতে পারে তা হলে এ নামাযের মাঝেই সে লোকের সঠিক কেবলার দিকে ফিরে গিয়েই নামাযের বাকী কাজ আদায় করা লাগবে। (আলমগীরী)

✪ কিন্তু যদি কোন রূপ চিন্তা-ভাবনা বা জিজ্ঞাসা ইত্যাদির মাধ্যমে চেষ্টা না করতঃ একদিকে ফিরে নামায আদায় করতে থাকে অতঃপর এ নামাযরত অবস্থায় জানতে পারে যে, তার নামায কাবা কেবলার দিকে আদায় করা হচ্ছেনা বরং এর বিপরীত দিকে বা অন্য দিকে আদায় করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তাকে ঐ নামায ভেঙ্গে ফেলে কাবা শরীফের সঠিক দিকে ফিরে নতুনভাবে নিয়্যত করতঃ পুনরায় ঐ নামায আদায় করা লাগবে। (আলমগীরী)

✪ যদি কোন লোক রেল, নৌকা, স্টীমার, কিংবা বিমানে ফরয কিংবা নফল নামাজ আদায় করতে চায় তাহলে তাকে কাবা শরীফের দিক নির্ণয় করতঃ সেদিকে ফিরেই নামায আরম্ভ করতঃ কাবা-কেবলার দিক ঠিক রেখেই শেষ পর্যন্ত নামায আদায় করে যেতে হবে।

কাবা শরীফের দিক ঠিক করতঃ নামায আরম্ভ করার পর যদি ঐ সব যানবাহন অন্য দিকে ঘুরে যায়, তাহলে নামাযীও ঘুরে ঘুরে কা'বা শরীফের দিকে ফিরেই নামায আদায় করে যেতে হবে– অন্যথায় নামায শুদ্ধ হবে না। (আলমগীরী)

✪ অসুস্থ লোক যদি কাবা শরীফের দিকে ফিরতে অক্ষম হয় বা তাকে ফিরায়ে দেওয়ার মত কোন লোক না থাকে কিংবা ফিরায়ে দিতে গেলে রোগীর বেশী কষ্ঠ পাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে কাবা শরীফের দিকে না ফিরে যেদিকে রয়েছে সেদিকে থেকেই নামায আদায় করে গেলে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

✪ যদি কোনলোক পবিত্র কাবা ঘরের চাইতে উচু স্থানে (পাহাড়, পরবত, সুউচ্চ দালানে) চড়ে নামায আদায় করে কিংবা একেবারে নীচের পাতাল গর্তের নিম্নস্থানে নামায আদায় করে এমতাবস্থাও তাকে কা'বা শরীফ মুখী হয়ে নামায আদায় করা লাগবে। কারণ আমরা যে কা'বা ঘর দেখতে পাই,উচু নীচুতে এর সীমানা এ মাপের উপর সীমাবদ্ধ নয়। বরং কাবা শরীফের সীমানা উর্দ্ধে আরশ আজীমপর্যন্ত এবং নিম্নে সাত স্তর জমিনের নীচ পর্যন্ত।

✪ যদি কোন লোক এরূপ সমস্যা সংকুল অবস্থায় পতিত হয় যে, নামাযের জন্য কাবা শরীফের দিকে ফিরতে গেলে হিংস্র জন্তু, কিংবা শত্র, ডাকাত, হাইজ্যাকার তার উপর হামলা করে বসবে, অথবা চোর তার মাল-পত্র চুরি করে নিয়ে যাবে, এমনিভাবে কোন নদী সাগরের মাঝে কোন কাঠ ইত্যাদির উপর করে চলাচল করে এবং সে যদি কেবলার দিকে মুখ করতে যায় তাহলে ডুবে যাওয়ার আশংকা থাকে, এমতাবস্থায় ঐ লোক যেদিকে পারে সেদিকে ফিরে নামায আদায় করে নিলে তা শুদ্ধ রূপে আদায় হয়ে যাবে। (দোররে মোখতার, শামী, আলমগীরী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. নিয়্যত করা

নামায আদায়ের জন্য নিয়্যত করা শর্ত তথা ফরয। নিয়্যত ব্যতীত নামায মোটেই আদায় হবে না।

✪ নিয়্যতের অর্থ প্রসঙ্গে হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, - اَلنِّيَّةُ هِىَ الْاِرَادَةُ অর্থাৎ নিয়্যত অর্থ সংকল্প , ইচ্ছা।

✪ হেদায়া গ্রন্থের শরাহ "এনায়া" কিতাবে আছে,

هِىَ الْاِرَادَةُ اَىِ الْاِرَادَةُ الْجَازِمَةُ الْقَاطِعَةُ

অর্থাৎ দৃঢ়-অলজ্ঘনীয় এরাদা– ইচ্ছা ও সংকল্পকেই নিয়্যত বলা হয়।

✪ বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে —

وَهِىَ لُغَةً عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى الشَّئِ وَاصْطِلَاحًا كَمَا فِى التَّلْوِيْحِ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِيْجَادِ الْفِعْلِ -

অর্থাৎ কোন বিষয়ের প্রতি মন-অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্পকেই আভিধানিক দৃষ্টিতে নিয়্যত বলা হয়। যেমন তাল্‌বীহ্ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে,

শরীয়াতের পরিভাষায় কোন কাজ সম্পাদনে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বন্দেগী আদায় ও তার নৈকট্য অর্জনের দৃঢ় এরাদা-ইচ্ছা করাকেই নিয়্যত বলা হয়।

✪ المستملى شرح منية المصلى গ্রন্থে বলা হয়েছে —

اَلنِّيَّةُ وَهِىَ فِى اللُّغَةِ مُطْلَقُ الْقَصْدِ وَفِى الشَّرِيْعَةِ قَصْدُ كَوْنِ الْفِعْلِ مُوَافِقًا لِمَا شُرِعَ وَالْعِبَادَاتُ اِنَّمَا شُرِعَتْ لِنَيْلِ رِضَاءِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَلَايَكُوْنُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْاِخْلَاصِهَا فَالنِّيَّةُ فِى الْعِبَادَاتِ قَصْدُ كَوْنِ الْفِعْلِ لِلّٰهِ تَعَالٰى لَيْسَ لِغَيْرِهٖ -

অর্থাৎ সার-সংক্ষেপ কথা হচ্ছে, আভিধানিক অর্থে কোন কাজ করার قصد তথা ইচ্ছা সংকল্পকেই নিয়্যত বলা হয়।

আর শরীয়াতে, অন্য কারো জন্য নয় বরং এবাদত উপাসনাকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য সুনির্দিষ্ট করাকেই নিয়্যত বলা হয়। এ হিসেবে কোন্ ওয়াক্তের নামায, কোন প্রকারের নামায, ফরয কি ওয়াজিব, সুন্নাত কি নফল বা কাজা নামায-এসব বিষয়ের স্থীর জ্ঞান অন্তর-মনের মধ্যে রেখে একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের উপাসনা আদায়ার্থে তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সালাত (নামায) রূপ এবাদত আদায়ের দৃঢ় এরাদা ইচ্ছা ও সংকল্প করার নামই হচ্ছে নামাযের "নিয়্যত"।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে অন্তর দিলের নিয়্যতই হল আসল নিয়্যত। তাই অন্তর মনে নিয়্যত করাই শর্ত তথা ফরয। মুখে নিয়্যত পাঠ করা শর্ত তথা ফরয নয়। অন্তর-মনের এরাদা ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে "আল্লাহু আকবর" এ তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায আরম্ভ করতঃ নামায আদায় করে দিলে নামায শুদ্ধভাবে আদায় হয়ে যাবে।

তবে ইসলামের বিশেষতঃ আমাদের হানফী মাজহাবের অধিকাংশ মহা-মনীষী মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরামগণ অন্তর-মুখের উদ্দেশ্যেকে একিভূত করার লক্ষ্যে অন্তর দিলের নিয়্যত তথা এরাদা সংকল্পের সাথে সাথে মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করাকেও মুস্তাহাব-হাছন তথা উত্তম বলে মত-মন্তব্য করেছেন।

অনেক মুজতাহিদ ফকীহ হয়ত একে নামাযের সুন্নাতের পর্যায়ে স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন ফেকাহ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ তবকাতের কিতাব بَدَائِعُ الصَّنَائِعُ এর নামাযের সুন্নাত অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

وَمِنْهَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهٖ مَانَوَاهُ بِقَلْبِهٖ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِىْ كِتَابِ الصَّلٰوةِ نَصًّا وَلٰكِنَّهُ اَشَارَ اِلَيْهِ فِىْ كِتَابِ الْحَجِّ فَقَالَ وَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تُحْرِمَ الْحَجَّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ فَكَذَا فِىْ بَابِ الصَّلٰوةِ يَنْبَغِىْ اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ صَلٰوةَ كَذَا فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ لِاَنَّ هٰذَا سُوَالُ التَّوْفِيْقِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِلْاَدَاءِ وَالْقَبُوْلِ بَعْدَهُ فَيَكُوْنُ مَسْنُوْنًا (ج ـ ١ صف ١٩٩)

✪ এমনিভাবে মৌখিক নিয়্যত উচ্চারণ যে উত্তম এ প্রসঙ্গে "হেদায়া" গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

وَالنِّيَّةُ هِىَ الْاِرَادَةُ وَالشَّرْطُ اَنْ يَعْلَمَ بِقَلْبِهٖ اَىَّ صَلٰوةٍ يُصَلِّىْ اَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَلَا مُعْتَبَرَ بِهٖ وَيَحْسُنُ ذٰلِكَ لِاِجْتِمَاعِ عَزِيْمَتِهٖ -

✪ উক্ত কিতাবের হাশিয়াতে উল্লেখ আছে—

قَوْلُهٗ وَيَحْسُنُ ذٰلِكَ الخ اختلف عِبَارَاتُ فُقَهَائِنَا وَغَيْرِهِمْ فِى التَّلَفُّظِ بِاللِّسَانِ اَنَّهٗ مَاذَا هَلْ هُوَ سُنَّةٌ اَمْ مُسْتَحَبٌّ اَمْ بِدْعَةٌ اَمْ مَكْرُوْهٌ فَذَكَرَ جَمْعٌ اَنَّهٗ حَسَنٌ اَوْ مُسْتَحَبٌّ كَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَاَقَرَّ عَلَيْهِ شُرَّاحُهَا .... و

pdf By Syed Mostafa Sakib

تَبِعَهُمُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ فِيْ مُخْتَصَرِهِ وَكَقَاضِيْخَانْ وَالنَّسَفِيِّ وَالْكَافِيْ وَصَحَّحَهُ الزَّاهِدِيْ فِي الْمُجْتَبٰى وَفِي الْمُنْيَةِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْغُرَرِ وَالتَّنْوِيْرِ الخ ـ

✪ بحرالرائق গ্রন্থে বলা হয়েছে —

وَقَدِ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْمَشَائِخِ فِي التَّلَفُّظِ بِاللِّسَانِ فَذَكَرَ فِيْ مُنْيَةِ الْمُصَلِّيْ اَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُجْتَبٰى وَفِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِيْ وَالتَّبْيِيْنِ اَنَّهُ يَحْسُنُ لِاجْتِمَاعِ عَزِيْمَتِهِ وَفِي الْاِخْتِيَارِ مَعْزِيًا اِلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ سُنَّةٌ هٰكَذَا فِي الْمُحِيْطِ وَالْبَدَائِعِ ـ

ج ١، صفحه ٢٧٧

✪ ফতোওয়ায়ে আলমগীরীর মধ্যে বলা হয়েছে —

وَلَا عِبْرَةَ لِلذِّكْرِ بِاللِّسَانِ فَاِنْ فَعَلَهُ لِتَجْتَمِعَ عَزِيْمَةُ قَلْبِهِ فَهُوَ حَسَنٌ كَذَا فِي الْكَافِيْ ـ

✪ দুররে মোখতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে —

(وَالتَّلَفُّظُ) عِنْدَ الْاِرَادَةِ (بِهَا مُسْتَحَبٌّ) هُوَ الْمُخْتَارُ ـ

✪ এ প্রসঙ্গে المستملى شرح منية المصلى গ্রন্থের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে যে,

وَالْمُسْتَحَبُّ فِي النِّيَّةِ اَنْ يَنْوِيَ بِقَصْدٍ بِالْقَلْبِ وَيَتَكَلَّمُ بِاللِّسَانِ بِاَنْ يَقُوْلَ اُصَلِّيْ صَلٰوةَ كَذَافِي الْهِدَايَةِ وَيَحْسُنُ ذٰلِكَ اَيِ التَّكَلُّمُ بِاللِّسَانِ لِاجْتِمَاعِ عَزِيْمَتِهِ يَعْنِيْ اَنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ تَفَرُّقُ الْخَاطِرِ فَاِذَاذَكَرَ بِلِسَانِهِ كَانَ عَوْنًا عَلٰى تَجَمُّعِهِ .... وَنَقَلَ اِبْنُ الْهُمَامِ عَنْ بَعْضِ الْحُفَّاظِ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيْقٍ صَحِيْحٍ وَلَا ضَعِيْفٍ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ اُصَلِّيْ كَذَا وَلَا عَنْ اَحَدٍ

مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعِيْنَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ بَلِ الْمَنْقُوْلُ اَنَّهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَهٰذَا بِدْعَةٌ الخ لٰكِنَّ عَدَمَ النَّقْلِ وَكَوْنَهُ بِدْعَةً لَا يُنَافِيْ كَوْنَهُ حَسَنًا لِقَصْدِ اجْتِمَاعِ الْعَزِيْمَةِ عَلٰى مَا اَشَارَ اِلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّجْنِيْسِ وَهٰذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَذٰلِكَ لِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ عَلَى الْقُلُوْبِ فِيْمَا بَعْدَ زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ حَتّٰى ذَكَرَ نَجْمُ الدِّيْنِ الزَّاهِدِيُّ فِي الْقُنْيَةِ وَفِيْ شَرْحِ الْقُدُوْرِيْ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا الخ ـ

উপরের নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতিসমূহের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমানিত হল যে, অন্তরের নিয়্যতের সাথে সাথে মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করতঃ অন্তর মুখের একিভূত নিয়্যতের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা শুধু মুবাহ তথা জায়েজ বা বৈধ নহে বরং মুস্তাহাব-উত্তমই বটে।

কিন্তু অতি আক্ষেপের সাথে বলতে হয় যে, নামায বিষয়ের কোন কোন পুস্তিকায় এ মৌখিক নিয়তের উচ্চারণকে 'বাহুল্য মাত্র' এবং একে বর্জনীয় বেদআত রূপে মন্তব্য করতঃ সরল প্রাণ মুসাল্লীদেরকে এ বিষয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।[১] এ বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে এ বিষয়ে একটু স্ববিস্তারে আলোচনা করা হল।

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

এ প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত সঠিক তথ্য নির্ভর উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে হয় যে, কোন কোন ফকীহ মৌখিক নিয়্যত উচ্চারণের ব্যাপারটি বেদআত হওয়ার কথা নকল করলেও হাফেজ ইবনুল কাইয়েম ছাড়া এ বিষয়কে কেউ মন্দ বেদআত বলেননি বরং অধিকাংশরাই একে হাসন তথা উত্তম বলেছেন।

যা উপরের আরবী উদ্ধৃতি সমূহের মধ্যে স্ববিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তদুপরি হেদায়া গ্রন্থের এ প্রসঙ্গীয় হাশিয়ায় (টিকায়) বেদআত হওয়ার মতটিকে আমাদের হানফী মজহাবের নয় বরং হাম্বলী মজহাবের মতবাদ রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

টীকা ঃ

(১) আমার নামায –হাফেয আবু জাফর, নবীর নামাজ –শেখ ইবনে বাজ

(২) وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اَنَّهُ بِدْعَةٌ لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ هداية ج ١، صفحه ٩٦

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতএব, মৌখিক নিয়্যত উচ্চারনের আমলটি আমাদের মজহাব অনুসারে মোটেই বর্জনীয় নয় বরং অনুকরনীয়, অনুসরণীয়। আসলে ঐ পুস্তিকায় উল্লেখিত বিভ্রান্তিকর বক্তব্য গুলোই এ ক্ষেত্রে বর্জনীয়।

এ প্রসঙ্গে সঠিক অনুসরণ যোগ্য মত হচ্ছে, নামাযের নিয়্যত করার বেলায় যদি সময় ও সুযোগ থাকে তাহলে নামায শুরু করার মুহূর্তে অন্তর-মনের নিয়্যতের সাথে সাথে মৌখিক ভাবেও নিয়্যত উচ্চারণ করতঃ নামায শুরু করা মুস্তাহাব–উত্তম।

আর যদি নামাযের ওয়াক্তের শেষ মুহূর্তেই নামায আদায় করা হয় অথবা জমাতের নামাযে ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলে নেয় কিংবা ইমামকে রুকু অবস্থায় পাওয়াতে ইমামের রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেওয়ার আশংকায় সময়-সুযোগ যদি না থাকে-তাহলে মুখে নামাযের নিয়্যত উচ্চারণ বাদ দিয়ে অন্তর মনের নিয়্যত দ্বারা তাড়াতাড়ি নামায আরম্ভ করে নিবে ও তাকবীরে তাহরীমা বলে তাড়াতাড়ি জমাতে শরীক হয়ে যাবে।

কারণ একেতঃ এ ক্ষেত্রে মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার ভয় রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নিয়্যত উচ্চারণ করতঃ নামায আরম্ভ করতে গেলে ইমাম সূরা ফাতেহা, কেরাত পাঠ আরম্ভ করে দেওয়ার ফলে মুক্তাদির দোয়ায়ে ছানা পাঠ করার সুযোগ চলে যাবে অথবা ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নিলে মুক্তাদির জামাতের নামাযের ঐ রাকাত ছুটে গিয়ে রাকাত পাওয়ার সাওয়াব প্রাপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

✪ ফরয নামায আদায়ের ক্ষেত্রে "ফরয"ও ওয়াক্তের নাম নির্ধারণ করতঃ নিয়্যত করা ফরয।[১]

✪ ওয়াজিব নামায আদায়ের বেলায়ও কোন ওয়াজিব, বিতরের নামায কি মান্নতের নামায, তাওয়াফের নামায কি ঈদের নামায? এ সব নির্ধারণ করতঃ নিয়্যত করা লাগবে।

✪ ফোকাহায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মতানুসারে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও তারাবীহর নামাযের নাম উল্লেখ করতঃ নিয়্যত করতে হয়। (কাজীখান, তাবীনুল হকায়েক)

✪ দু'ঈদের নামায ও জানাযার নামায আদায়কালে ও উভয়ের নাম উল্লেখ পূর্বক নিয়্যত করা লাগবে।

✪ কাযা নামাযের বেলায়ও দিন এবং ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করতঃ কাযা নামাযের নিয়্যত করা লাগবে।[২]

টীকা ঃ

(١) وَالْوَاجِبَاتُ وَالْفَرَائِضُ لَا تَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ اِجْمَاعًا كَذَا فِى الْغِيَاثِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ـ (عالمگيرى)

(٢) وَيَحْتَاجُ اِلَى التَّعْيِيْنِ فِىْ الْقَضَا هٰكَذَا فِىْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ (عالمگيريه)

কারো যদি বেশী দিনের নামায কাযা হয়ে থাকে তাহলে ১ম জোহর, ২য় জোহর বা তৃতীয় জোহরের কাযা আদায় করতেছি বললেও বিশুদ্ধ মতানুসারে কাযা নামায আদায় হয়ে যাবে।

কিন্তু কাযা নামাযের সংখ্যা অধিক হওয়ার ফলে এভাবে বলা ও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে "কাযা জোহর" "কাজা আছর" আদায় করতেছি, এরূপ নিয়্যতে আদায় করলেও হয়ে যাবে। (মুনিয়া ও কুহেস্তানী)

✪ নামাযের নিয়্যত করার সময় রাকাতের সংখ্যা উল্লেখ না করলেও চলবে।[১]

✪ আমাদের হানাফী আইম্মায়ে কেরামগণের সম্মিলিত মতানুসারে নামায আরম্ভ করার মুহূর্তেই তথা তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার পূর্বক্ষণে নামাযের নিয়্যত করা উত্তম।

✪ নামায আরম্ভ করার (অনেক) পূর্বেও নামাযের নিয়্যত করা বৈধ, যদিনা নিয়্যত ও তাকবীরে তাহরীমার মধ্যকার সময়ে নামায সম্পর্কিত কাজ ব্যতীত যথা নামাযের জন্য যাওয়া ও ওজু করা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন পার্থিব কাজ পাওয়া না যায়। (শামী)

✪ হানাফী মাজহাবের ছহি মতানুসারে তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায আরম্ভ করার পর নিয়্যত করলে নামায শুদ্ধ হবে না। (দোররুল মোখতার, মুনিয়া)

✪ কোন লোক জোহরের নামায আদায়ের এরাদায় নামাযে দাড়িয়ে নিয়্যত করার সময় মুখে আছরের নামাযের নাম উল্লেখ করে বসলে জোহরের নামাযই আদায় হয়ে যাবে।[২] অনুরূপভাবে অন্যান্য নামাযের বেলায়ও এই একই হুকুম প্রযোজ্য।

টীকা ঃ

(١) وَلَاتُشْتَرَطُ نِيَّةُ عَدَدِ الرَّكْعَاتِ اِجْمَاعًا لِعَدَمِ الْاِحْتِيَاجِ اِلَيْهَا لِكَوْنِ الْعَدَدِ مُتَعَيَّنًا بِتَعْيِيْنِ الصَّلٰوةِ ـ (شرح منيه)

(٢) عَزَمَ عَلَى الظُّهْرِ وَجَرٰى لِسَانُهُ الْعَصْرَ يُجْزِيْهِ (عالمگيرية)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাযের রুকণ (ভিতরের ফরয কাজ) সমূহের ধারাবাহিক আলোচনা

আমাদের এটিও জানা থাকা দরকার যে,যে সমস্ত কাজের সমন্বয়ে নামায কায়েম করা হয় উহা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মুস্তাহাব পর্যায়ে বিভক্ত।

নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এর বর্ণনা দেওয়া গেল।

নামাযের রুকুন (ভিতরের ফরয কাজ) সমুহ ঃ

নামাযের রুকন[১] তথা ভিতরের ফরয কাজ মোট ৭টি।

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা।
২. কেয়াম তথা দাড়িয়ে নামায আদায় করা।
৩. কেরাত তথা কোরআন করিমের কিছু অংশ পাঠকরা।
৪. রুকু করা।
৫. সিজদা করা।
৬. শেষ বৈঠকে বসা।
৭. কোন কাজ করে নামায থেকে বের হওয়া।

তাকবীরে তাহ্‌রীমা ঃ

দাড়িয়ে নামাযের নিয়্যাত করার পর আল্লাহু আকবর কিংবা আল্লাহ তাআলার মহানত্ব প্রকাশ মুলক যে বাক্য উচ্চারণ করতঃ নামায আরম্ভ করতে হয়, নামাযের এ তাকবীরে উলা তথা প্রথম বাক্যকেই তাকবীরে তাহরীমা বলা হয়। (আলমগীরী)

অত্র তাকবীর দ্বারা মুছাল্লী পানাহার ও কথাবার্তা অর্থাৎ যাবতীয় পার্থিব মোবাহ কাজ কর্মকে নিজের উপর হারাম করে নেয় বলে নামাযের এ প্রথম তাকবির কে তাকবিরে তাহরীমা বলা হয় । (ফাতহুলকাদির)।

আমাদের হানাফী মাজহাব অনুসারে তাকবিরে তাহরিমা বলাটা নামাযের শর্ত তথা বাহিরের ফরয কাজসমুহের অন্তর্ভুক্ত। (আলমগীরী)

টীকা ঃ ১

اَلرُّكْنَ جَمْعُهُ اَلْاَرْكَانُ/ وَهُوَ فِىْ اللُّغَةِ اَلْجَانِبُ اَلْاَقْوىٰ وَفِىْ اَلْاِصْطِلَاحِ اَلْجُزْءُ الذَّاتِىْ الَّذِىْ تَتَرَكَّبُ الْمَاهِيَّةُ مِنْهُ / وَالرُّكْنَ مَاكَانَ مِنْ حَقِيْقَةِ الشَّيِّ / وَدَاخِلاً فِىْ مَاهِيَّتِهِ-

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) তাকবীরে তাহরীমাকে নামাযের রুকন তথা ভিতরের ফরয সমূহের পর্যায়ভুক্ত না বলে নামাযের শর্ত অর্থাৎ বাহিরের ফরয কাজসমুহের অন্তর্ভুক্ত বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

তা সত্ত্বেও আমাদের মাজহাবের অপর ইমাম হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) ও অন্যান্য মাজহাবের ইমামগণ একে রুকন বলার কারণে এতদ্ব্যতীত ইহা নামাযের ভিতরের প্রথম ফরয কাজ কেয়াম অর্থাৎ দাড়ানোর অত্যন্ত নিকটতম হওয়ার কারণে আমাদের হানফী মাজহাবের অধিকাংশ কিতাবে নামাযের আরকান সমুহের বর্ণনার শুরুতেই অত্র "তাকবীরে তাহ্‌রীমার" বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল তথা সব ধরনের নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলা ফরয।

দাড়িয়ে নামায আদায় করা যেরূপ ফরয তদরূপ তাকবীরে তাহরীমাকে ও দাড়িয়ে বলা ফরয। নফল ও সুন্নাতে যায়েদা নামায ব্যতীত অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মোয়াককাদাহ নামাযে বিনা ওজরে বসা অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায আরম্ভ করলে নামায শুদ্ধ হবেনা। (আলমগীরী)

হযরত ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে জামাতের নামাযে ইমামের তাকবীর বলার সাথে সাথে মুক্তাদিগণকেও তাকবীর বলে নিতে হয়।

ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) এর মতে ইমামের তাকবীর বলা শেষ হওয়ার পরক্ষণেই মুক্তাদিগণকে তাকবীরে তাহরীমা বলে নিতে হয় এবং এমতের উপরই ফতোওয়া। তবে উল্লেখিত উভয় মতের যে কোন একটি অনুযায়ী তাকবীর বলে নিলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

আল্লাহু আকবর বাক্যের উচ্চারনের সময় যদি আল্লাহ শব্দের আ-অক্ষরটিকে টেনে আরবীতে প্রশ্নকরার মত করে বলে বসে তাহলে নামায শুদ্ধ হবেনা। (আলমগীরী)

তাকবীরে তাহরীমা এরূপভাবে বলতে হয় যেন নিজ কানে শুনা যায়। এত চুপে (মনেমনে) বলতে নাই যাতে নিজ কানেও শুনা যায় না।

টীকা ঃ

(١) ثُمَّ قَوْلُهُ يَجُوْزُ التَّطَوُّعُ الخ يَسْتَثْنىٰ فِيْهِ سُنَّةَ الْفَجْرِ فَاِنَّهَا لَا تَصِحُّ قَاعِدًا بِلَاعُذْرٍ (شَرْحُ مُنْيَةُ) وَيَجُوْزُ التَّطَوُّعُ اَىْ يَجُوْزُ اَنْ يُصَلَّى التَّطَوُّعُ وَسَائِرُ النَّوَافِلِ قَاعِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ (شرح منيه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেয়াম তথা নামাযের দাড়ান ঃ

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায,জুমআর নামায, বিতিরের নামায, দু'ঈদের নামায, এবং বিশুদ্ধ মতানুসারে ফজরের দুরাকাত সুন্নাতে মুয়াককাদাহ[১] নামাযের প্রতি রাকাতের শুরুতে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর তাজীম সম্মানার্থে দাড়ান ফরয এবং দাড়ান অবস্থাতেই তাকবীরে তাহরীমা বলা ও কেরাত (কুরআন) পঠকরা ফরয।

সুতরাং ওজর অপারগতা ব্যতীত ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি নামায বসে পড়লে শুদ্ধ হবেনা। তবে রোগ-ব্যাধি, ছতর ঢাকার মত কাপড় না থাকা ইত্যাদি ওজর অপারগতা বশতঃ ঐসব নামায বসে বসে আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

(শরহে মুনিয়া)

সুন্নাতে যায়েদাহ ও যাবতীয় নফল নামায বিনা ওজরেও বসে বসে আদায় করার অনুমতি রয়েছে। বসে বসে কৃত নামাযের মাত্র অর্ধেক ছাওয়াবই পাওয়া যাবে। তবে ওজরবশতঃ বসে বসে নামায আদায় করলে পুণ্যের লাঘব হবেনা।[২]

কোরআন পাকের বড় একখানা আয়ত পাঠ করতে যত সময় লাগে ততক্ষন সময় নামাযের এক রাকাতে দাড়ান ফরয। সুরা ফাতেহা ও এর সাথে অন্য একটি ছোট সূরা বা তিন খানা ছোট আয়াত পাঠ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযে দাড়ান ওয়াজিব। বাকী অন্যান্য দোয়া যেমন- দোয়ায়ে ছানা ইত্যাদি পাঠ করার জন্য দাড়ান সুন্নাত ও মুস্তাহাবের পর্য্যায়ভুক্ত। (তাহতাবী)

কোন লোক দাড়িয়ে নামায আরম্ভ করার পর কোন ধরনের রোগে আক্রমন করে বসার কারনে দাড়াতে অক্ষম হয়ে পড়লে সে লোক তখন বসে বসে রুকু সিজদা দিয়েই নামায আদায় করবে।

পীড়িত অবস্থায় নামায আরম্ভ করার পর যদি রোগ ছুটে যায়, তাহলে সে লোক বাকী নামায দাড়িয়েই আদায় করবে। (মুনিয়া)

কোন লোক মানসিক, শারিরিক রোগ বশতঃ জমাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য হেটে মসজিদে গেলে দাড়িয়ে নামায পড়তে পারেনা কিন্তু বাসস্থানে থাকলে দাড়িয়ে নামায পড়তে পারে,এ অবস্থায় সে লোক বাসাতে একাকী দাড়িয়ে নামায আদায় করবে; কারণ জমাতে নামায আদায় করা সুন্নাত আর কিয়াম তথা দাড়িয়ে নামায পড়া ফরয।

টীকা ঃ

(২) (يَجُوْزُ ا لتَنَفُّلُ قَاعِدًا مَعَ الْقَدْرَةِ عَلٰى الْقِيَامِ لٰكِنْ لَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ) لِقَوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ (اِلَّا مِنْ عُذْرٍ) (نُوْرُالْاِيْضَاحِ مَعَ مَرَاقِي الْفَلَاحِ)

সুন্নাতের জন্য ফরয তরক করা যাবে না।[১]

কেরাত পাঠ করা ঃ

কোরআন করিমের যে কোন অংশ নামাযের দাড়ানো অবস্থায় পাঠ করা ফরয।

বড় এক আয়ত কিংবা ছোট তিন খানা আয়ত পাঠের দ্বারাই কেরাতের ফরয আদায় হবে,অন্যথায় নয়। তা সুরা ফাতেহা পাঠের দ্বারা হউক কিংবা অন্য কোন সুরা-আয়াত পাঠের দ্বারা হউক।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে উক্ত পরিমান কোরআন পাঠের দ্বারা কেরাতের ফরয আদায় হলেও এ অবস্থায় নামাযে কেরাত পাঠের ওয়াজিব বিষয়টি তরক হয় বিধায় নামাযী গুনাহগার হবে।

কেননা ফরয নামাযের প্রথম দুরাকাতের মধ্যে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযসমুহের প্রত্যেক রাকাতে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সুরা ফাতেহা ও তৎসঙ্গে কোরআন করিমের অন্য যে কোন সূরা- আয়াত মিলিয়ে পাঠ করা ওয়াজিব।

নামাযের কেরাত পাঠের ব্যাপারে কোরআন করিমের সুরা হুজরাত থেকে একেবারে শেষ তথা সুরা নাস পর্যন্ত সূরাসমুহকে মুফাচ্ছাল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ মুফাচ্ছাল কে পুনরায় তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছেঃ

(১) সুরা হুজরাত থেকে সুরা বুরুজ পর্যন্তকে "তিওয়ালে মুফাচ্ছাল বলা" হয়।

(২) সুরা বুরুজ হতে লাম্‌ইয়াকুনিল্ লাজীনা সুরা পর্যন্ত কে "আওছাতে মুফাচ্ছাল বলা" হয়।

(৩) আর লামইয়াকুনিল লাজিনা" সুরা হতে সুরা নাছ" পর্যন্ত সূরাসমুহকে "কিছারে মুফাচ্ছাল" বলা হয়।

বিতির, সুন্নাত, এবং নফল নামায, সমুহের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত পাঠ করা ফরয (আলমগীরী)।

উল্লেখিত বর্ণনার আলোকে নামাযে কেরাতের সুন্নাতী তরীকা হচ্ছেঃ

(ক) ফজর ও যোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাচ্ছল

(খ) আছর ও এশার নামাযে আওছাতি মুফাচ্ছল এবং

(গ) মাগরিবের নামাযে কেছারে মুফাচ্ছাল পর্যায়ের সূরাসমুহ কেরাত রূপে পাঠ করা।

টীকা ঃ ৯

(١) لِاَنَّ الْقِيَامَ فَرْضٌ فَلَا يَجُوْزُ تَرْكُهٗ لِلْجَمَاعَةِ الَّتِىْ هِىَ سُنَّةٌ بَلْ يُعَدُّ هٰذَا عُذْرًا فِىْ تَرْكِهَا (شامى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রত্যেক প্রকারের নামাযে প্রথম রাকাতে যে সুরা বা আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে এর উপরের সুরা বা আয়াত সমূহ ইচ্ছাকৃত ভাবে পাঠকরা মাকরূহ (শামী) ।

কারণ এতে কোরআন করিম তেলাওয়াত-পঠনের যে তারতিব-ক্রমানুবর্তিতা রয়েছে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা বুঝায়। হ্যাঁ ইচ্ছাকৃতভাবে ও জেনে শুনে নয় বরং অজানা ঘটনা ক্রমে হঠাৎ এ রূপ করে বসলে মাকরুহ হবে না।[১]

ফরয নামাযের একই রাকাতে একই সুরা দু'বার কিংবা বার বার পাঠ করা মাকরূহ কিন্তু নফলে মাকরুহ নয়।

এমনিভাবে অন্য সুরা জানা থাকা সত্বেও ফরয নামাযের উভয় রাকাতে একই সুরা পাঠ করা মাকরূহ। কিন্তু অন্য কোন সুরা জানা না থাকলে তখন একই সুরা উভয় রাকাতে পাঠ করার অনুমতি আছে। এমনিভাবে নফল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে একই সুরা পাঠ করা মাকরূহ নয়।[২]

ফরয নামায দু'তিন বা চারি রাকাতের হউক না কেন মাত্র দুরাকাতেই কোরআন পাঠ করা ফরয।

তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের যে কোন দু রাকাতে কোরআন পাঠ করলেই কেরাতের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে প্রথম দু রাকাতেই সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সুরা ফাতেহা পাঠ করার পর কেরাত তথা কোরআন করিমের অন্য যে কোন অংশ পাঠ করা যে ওয়াজিব এর প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর একটা সুরা পড়া হল,দ্বিতীয় রাকাতে গিয়ে প্রথম রাকাতে পাঠকৃত সুরার পরের সুরা খানাকে বাদ রেখে এর পরের সুরাখানা পাঠ করা হল যেমন– প্রথম রাকাতে সুরা কাফেরুন পাঠ করা হল আর দ্বিতীয় রাকাতে গিয়ে তৎমধ্য খানের সুরা নছর কে বাদ রেখে সুরা লাহাব (তাব্বাত ইয়াদা) পাঠ করে

টীকা ঃ

(١) وَيُكْرَهُ اَنْ يَقْرَأَ فِى الثَّانِيَةِ فَوْقَ الَّتِىْ قَرَأَهَا فِى الْاُوْلٰى وَلِاَنَّ فِيْهِ تَرْكَ التَّرْتِيْبِ الَّذِىْ اَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ـ هٰذَا اِذَاكَانَ قَصْدًا اَوْ اَمَّا اِذَا سَهْوًا فَلَا (المستملى شرح منية)

(٢) وَيُكْرَهُ تَكْرَارُ السُّوْرَةِ فِىْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْفَرْضِ وَكَذَا تَكْرَارُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ اِنْ حَفِظَ غَيْرَهَا وَتَعَمَّدَهُ لِعَدَمِ وُرُوْدِهِ فَاِنْ لَمْ يَحْفَظْهُ وَجَبَ قِرَاءَتُهَا لِوُجُوْبِ ضَمِّ السُّوْرَةِ لِلْفَاتِحَةِ (مَرَاقِىُ الْفَلَاحِ)

নেওয়া হল; প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতের মাঝখানে এরূপ ছোট সুরা বাদ দেওয়া মাকরুহ। কিন্তু যদি উভয় রাকাতের কেরাতের মাঝখানে বড় ও দীর্ঘ সুরা বাদ দেওয়া হয় কিংবা সুরা ছোট হলে কমপক্ষে দুটি সুরা বাদ রেখে দ্বিতীয় রাকাতে যদি পরবর্তী সুরা পাঠ করা হয়, তাহলে মাকরূহ হবেনা।

যদি প্রথম রাকাতে কোন সুরার শেষাংশ বা অংশ বিশেষ পাঠ করা হয় আর দ্বিতীয় রাকাতে কোন একটি ছোট পুর্ণ সুরা পাঠ করা হয়, যেমন প্রথম রাকাতে আ-মানার্ রাসূলু বিমা উনজিলা ইলাইহি-এর শেষ পর্যন্ত পাঠ করা হয় আর শেষ রাকাতে সুরা এখলাছ তথা কুলহুয়াল্লাহু আহাদ ------ পাঠ করা হয় তাহলে মাকরূহ হবে না।[১]

কোন লোক দ্বিতীয় রাকআতে ভুলবশত প্রথম রাকাতে পঠিত সুরার উপরের সুরা কিংবা আয়াত পাঠ করে চলল অথবা প্রথম রাকাতে পাঠকৃত সুরার পরবর্তী একটি সুরাকে বাদ দিয়ে কিংবা তৎসংলগ্ন এক দু' আয়াতকে বাদ দিয়েই পড়া আরম্ভ করে দিল; যে রূপ সকলের থেকে অনেক সময় হয়ে থাকে। কিছু অংশ এভাবে পাঠ করার পর এ অনিয়মের কথা স্মরণ হলে তখন যে সুরা বা আয়াত অংশ পাঠরত আছে তাহাই পাঠ করে যাবে। তা বাদ দিয়ে নিয়মে যাবেনা কারণ এতে বিশৃংখলা আরও বেড়ে যাবে। তাই এ ফিরে যাওয়াটা মাকরূহ। (শামী)

আর এ অনিয়মটা যখন ইচ্ছাকৃতভাবে নয় বরং যখন ভুল ক্রমেই হয়ে পড়েছে, সে দৃষ্টিতে এটা ক্ষমা যোগ্য।

রুকু করা ঃ

✪ নিজ মাথা ও পিঠকে সম্মুখ দিকে অবনত করাকে শরিয়াতের পরিভাষায় রুকু বলা হয়। (মুনিয়া)

✪ পিঠ বাকা করতঃ দু হাতের আঙ্গুল দ্বারা হাটুর নাগাল পেলে রুকুর ফরয আদায় হয়ে যাবে। (মুলতাকাল আবহোর)

যে লোক এরূপ কুঁজ (কোমর বাকা) যে সর্বদা রুকুর ন্যায় ঝুকানো অবস্থায় থাকে, সে লোক যে পরিমাণ মাথা নিচু করতে পারে সে পরিমান নিচু করলেই রুকু এর ফরয আদায় হয়ে যাবে।

অথবা শুধুমাত্র ইশারা দ্বারাই সে লোক রুকু আদায় করে যাবে। (শামী)

টীকা ঃ ১

(١) فِىْ الْحُجَّةِ لَوْ قَرَأَ فِىْ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى اٰخِرَسُوْرَةٍ وَفِىْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُوْرَةً قَصِيْرَةً كَمَا لَوْ قَرَأَ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ .... فِىْ رَكْعَةٍ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فِىْ رَكْعَةٍ لَا يُكْرَهُ كَذَا فِىْ التَّاتَارْ خَانِيَةِ (عالمكيريه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ জামাতের নামাযে মুক্তাদী যদি ইমামের আগে রুকু হতে মাথা উঠিয়ে নিয়ে নিজ ইমামকে রুকুতেই দেখতে পায়, তখন তাড়াতাড়ি সে পুনঃ রুকুতে গিয়ে ইমামের তাবেদারী করবে,নতুবা সে মাকরূহে তাহরীমের গুনাহে গুনাহগার হবে। (আলমগীরী)

বসে বসে নামায আদায় কারী মুছাল্লি মাথাকে এ পরিমান ঝোকাবে যেন মাথা হাটুর সামনা সামনি হয়ে যায়। এ হল পুরাপুরি রুকু। হ্যাঁ যদি মাথা ও পিঠ সামান্যও ঝোকানো হয় তাহলেও রুকুর ফরয আদায় হয়ে যাবে।[১]

সিজদা করা ঃ

কপাল, নাসিকা, দু'হাত, দু'হাটু ও দু'পা এ আট অঙ্গকে একসাথে মাটিতে রাখাকে সিজদা বলা হয়। (শরহে মুনিয়া)

✪ কপাল ও নাসিকা দ্বারা ছসদা করা ফরয, তবে ওজর অপারগতা বশতঃ শুধু কপাল কিংবা নাসিকা দ্বারা সিজদা করতে পারলেই সিজদা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু বিনা ওজরে শুধু নাসিকা দ্বারা সিজদা করলে ছাহেবাইন তথা হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র) ও হযরত ইমাম আবু ইউসূফ (র)-এর মতে, সিজদা শুদ্ধ ও আদায় হবে না এবং এমতের উপরই ফতোয়া।

✪ প্রত্যেক রাকাতে দু'টি সিজদা করা ফরয (আলমগীরী, বাহরুর রায়েক ও আলমগীরী ইত্যাদি)।

✪ প্রথম সিজদা হতে দ্বিতীয় সিজদা পৃথক করে আদায় করতে হয়।

✪ সিজদা করার সময় যদি উভয় পাঁ জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে আলগা করে রাখা হয় কিংবা আলগা হযে যায় তাহলে সিজদা শুদ্ধ হবে না এবং এ কারণে নামাযও হবে না।

কিন্তু যদি একপা শুণ্যে উঠিয়ে আর একপাকে জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখে তাহলে সিজদা শুদ্ধ হয়ে যাবে, তবে এরূপ করা মাকরূহ (আলমগীরী)।

✪ ঘাস, তুলা, শুষক খড়, নরম গদি ও স্পঞ্জের নরম বিছানার উপর সিজদা করলে যদি কপাল ও নাসিকা কিছু বসে ঠেকা পড়ে যায় এবং স্থীর হয়ে থাকে তাহলে

টীকা ঃ

(১) وَفِىْ حَاشِيَةِ الْفَتَّالِ عَنِ الْبُرْجَنْدِىْ ـ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّىْ قَاعِدًا يَنْبَغِىْ اَنْ يُحَاذِىْ جَبْهَتَهُ قدام رُكْبَتَيْهِ لِيُحْصِلَ الرَّكُوْع اهـ قُلْتُ وَلَعَلَّهُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى تَمَام الرُّكُوْعِ ـ وَاِلَّا فَقَدْ لممت حُصُوْلُهُ بِاَصْلِ طَاْطَاَةِ الرَّاسِ اَىْ مَعَ اِنْحِنَاءِ الظَّهْرِ تَاَمَّلْ (شامى)

এ ধরনের বস্তুর উপর সিজদা করতঃ নামায আদায় করা শুদ্ধ হবে। আর যদি এ সব বস্তুর উপর মাথা না ঠেকে ক্রমঃ নিচের দিকে দাবতে থাকে ও নাচতে থাকে তাহলে ঐ সব বিছানার উপর সিজদা দিয়ে নামায আদায় করা শুদ্ধ হবে না।

(আলমগীরী)

✪ বড় জমাতে লোকাধিক্যের কারণে ওজর বশতঃ নিজ রানের উপর সিজদা করলে তাতে নামায শুদ্ধ হয়ে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু হাটুর উপর সিজদা করলে তা শুদ্ধ হবেনা।

কিন্তু বিনা ওজরে রানের উপর সিজদা দিয়ে নাময়ায আদায় করলে তা আদায় হবেনা। (মুনিয়া, আলমগীরী)

✪ লোকাধিক্য বশতঃএকই জামাতের পিছনের কাতারের মুছাল্লি তার সম্মুখের কাতারের মুছাল্লির পিঠের উপর সিজদা দিয়ে নামায আদায় করলে সে নামায আদায় হয়ে যাবে । (মুনিয়াহ)

কিন্তু একই নামায আদায়কারী না হয়ে যদি প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন নামায আদায়কারী হয়ে থাকে অথবা সম্মুখের লোক যদি নামাযরত না হয় এমতাবস্থায় লোকাধিক্যবশতঃ সম্মুখের কাতারের মুছাল্লির পিঠের উপর পিছনের কাতারের লোকেরা সিজদা দিয়ে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবেনা।

✪ কোন মুছাল্লী জমিনে হাত বা হাটু না রেখে শুধু কপাল ও নাসিকা দ্বারা সিজদা করত ঃ নামায আদায় করলে নামায আদায় হয়ে যাবে,তবে এরূপ করা মাকরূহ বটে। (আলমগীরী)

✪ পা রাখার স্থান হতে দু'ইট তথা ১২ আঙ্গুলীর চেয়ে বেশী উঁচু স্থানে সিজদা দিয়ে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না।[১]

✪ পাগড়ির পেটের উপর বা পরিহিত কাপড়ের কতকাংশ পাক জায়গায় বিছিয়ে সিজদা করতঃ নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু নাপাক স্থান বা দ্রব্যের উপর এরূপ বিছিয়ে সিজদা করলে তখন নামায শুদ্ধ হবে না। (মুনিয়া)

✪ নামাযের শেষ বৈঠক ঃ

অর্থাৎ দু'রাকাত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাকাতের উভয় সিজদা করার পর তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাকাতের উভয় সিজদা করার পর এবং চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের চতুর্থ রাকাতের উভয় সিজদা করে নেওয়ার পর পরিশেষে বসা ফরয

টীকা ঃ

(১) اِذَاكَانَ مَوْضَعُ السُّجُوْدِ اَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ بِقَدْرِ لَبِنَةٍ اَوْ لَبِنَتَيْنِ مَنْصُوْبَتَيْنِ جَازَ وَاِنْ زَادَلَمْ يَجُزْ وَحَدُّ اللَّبِنَةِ رُبُعُ ذِرَاعٍ (عالمگيريه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং এতে তশাহহুদ পাঠ করার সময় পরিমাণ বসাই ফরয।[২]

✪ যদি কোন মুছাল্লী এ শেষ বৈঠকে না বসে যথা ক্রমে তৃতীয়, চর্তুথ ও পঞ্চম রাকাতের জন্য ভুলক্রমে দাড়িয়ে যায় এবং উল্লেখিত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম রাকাতের সিজদা করার পুর্বেই বসে না পড়ে, বরং সিজদা করে বসে তাহলে ঐ সব নামায আর নিয়্যতকৃত নামায থাকেনা বরং শরিয়তের দৃষ্টিতে তা সাধারণ নফল নামাযে পরিণত হয়ে পড়ে। পুর্বের নিয়্যতকৃত নামায তাকে পুনঃ দোহরায়ে আদায় করে দেওয়া লাগবে।

কারণ নামাযের শেষ বৈঠক-যা ফরয ছিল, উহা তার থেকে বাদ পড়ায় নামাযের হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে।

নামায থেকে কোন কাজ করে বের হওয়া (خروج بصنعه) ঃ

হা মুলতঃ একটি মতভেদজনিত ফরয কাজ, সর্ববাদী ঐকমত্য জনিত ফরয কাজ নয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হাশিয়ায়ে তাহতাবী গ্রন্থের লিখক বলেন— আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম মোহাম্মাদ (রঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এর মধ্যে যে ১২টি মাছআলা নিয়ে মতভেদ রয়েছে ঐ সবের উপর কেয়াছ অনুমান করেই আমাদের মাজহাবের একজন মনীষি ইমাম আবু ছাঈদ বুরদায়ী (রঃ) কোন কাজ করে নামায থেকে বের হওয়া ফরয, এ মতটাকে হযরত ইমাম আযম (রঃ) এরই মত রূপে উল্লেখ করে বসেছেন এবং উনার ঐ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই হেদায়া, শরহে বেকায়া, দোররুল হেকম ও অপরাপর কতেক ফেকাহ্ গ্রন্থে "খুরুজে বিছানইহী" তথা কোন কাজ করে নামায থেকে বের হওয়টাকে নামাযের সর্বশেষ ফরয কাজ রূপে উল্লেখ করেছেন।

অপর দিকে আমাদের হানাফী মাজহাবের সুপ্রসিদ্ধ মনীষি হযরত ইমাম কারখী (রঃ) বুরদায়ী (রঃ)-এর এ কেয়াছ অনুমান কে অশুদ্ধ প্রমান করতঃ বলেছেন যে,হযরত ইমাম আযম (রঃ)-এর এ রূপ মতের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

টীকা ঃ

(٢) وَهِيَ فَرْضٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طُرُقٍ عَدِيْدَةٍ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عَلَّمَ الْاَعْرَابِيَّ المسى صلاته اَرْكَانَ الصَّلٰوةِ اِلٰى اَنْ قَالَ فَاِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ اٰخِرِ سَجْدَةٍ وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ / وَقَالَ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِيْ شَرْحِ الدُّرَرِ قَدْ وَرَدَتْ اَدِلَّةٌ كَثِيْرَةٌ بَلَغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ عَلٰى اَنَّ الْقَعْدَةَ الْاَخِيْرَةَ فَرْضٌ (بحر الرائق) وَقَدْرُ الْفَرْضِ فِي الْقَعْدَةِ مِقْدَارُ اَدْنٰى قِرَاةِ التَّشَهُّدِ (شرح منيه)

তাই দোররোল মোখতার, শামী, মুলতাকাল আবহোর, বাহরুর রায়েক, তাবঈনোল হাকায়েক, আলমগীরী, জামেউর রুমুজ ও আল্লামা হালবী (রঃ)-এর শরহে মুনিয়া প্রভৃতি গ্রন্থে ছহি মতানুসারে خروج بصنعه তথা কোন কাজ করে নামায থেকে বের হওয়া ফরয নয় বলেই মন্তব্য রয়েছে।

বাদায়ে-উচ্ছনায়ে, মারাকিউল ফালাহ ও তৎশরাহ্ তাহতাবী ইত্যাদি গ্রন্থের নামাযের ফরয অধ্যায়ে ঐ কাজ ফরয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোন রকমের উল্লেখই নাই।[১]

টীকা ঃ

(وَمِنْهَا الْخُرُوْجُ بِصُنْعِهِ) كَفِعْلِهِ الْمُنَافِيْ لَهَا بَعْدَ تَمَامِهَا وَاِنْ كُرِهَ تَحْرِيْمًا ـ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ اِتِّفَاقًا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَاَقَرَّ الْمُصَنِّفُ رح (درمختار) اِعْلَمْ اَنَّ كَوْنَ الْخُرُوْجِ بِصُنْعِهِ فَرْضًا غَيْرُ مَنْصُوْصٍ عَنِ الْاِمَامِ ـ وَاِنَّمَا اِسْتَنْبَطَهُ الْبَرْدَعِيُّ عَنِ الْمَسَائِلِ الْاِثْنَيْ عَشَرِيَّةِ الْاٰتِيَةِ قُبَيْلَ بَابِ مُفْسِدَاتِ الصَّلٰوةِ ـ فَاِنَّ الْاِمَامَ لَمَّا قَالَ فِيْهَا بِالْبُطْلَانِ مَعَ اَرْكَانِ الصَّلٰوةِ تَمَّتْ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا الْخُرُوْجُ دَلَّ عَلٰى اَنَّهُ فَرْضٌ / وَصَاحِبَاهُ لَمَّا قَالَا فِيْهَا بِالصِّحَّةِ كَانَ الْخُرُوْجُ بِالصُّنْعِ لَيْسَ فَرْضًا عِنْدَهُمَا وَرَدَّهُ الْكَرْخِيُّ بِاَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيْ اَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَاَنَّ هٰذَا الْاِسْتِنْبَاطَ غَلَطٌ مِنَ الْبَرْدَعِيِّ ...... (قوله وعليه) اَيْ عَلَى الصَّحِيْحِ الَّذِيْ هُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ الْمُقَابِلُ لِقَوْلِ الْبَرْدَعِيِّ (شامى)

وَنُقِلَ عَنِ الدُّرَرِ الصَّحِيْحُ اَنَّ الْخُرُوْجَ بِصُنْعِهِ اَيْ بِاِخْتِيَارِهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ اِتِّفَاقًا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَاَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَقَالَ فِي الْمُجْتَبٰى وَعَلَيْهِ الْمُحَقِّقُوْنَ ـ ...... وَنُقِلَ عَنِ الْكَرْخِيِّ اَنَّهُ يَقُوْلُ لَا خِلَافَ مِنْ اَصْحَابِنَا فِيْ اَنَّ الْخُرُوْجَ بِصُنْعِهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَيْسَ فِيْهِ نَصٌّ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح وَاِنَّمَا اِسْتَنْبَطَهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْبَرْدَعِيُّ لَمَّا رَاٰى جَوَابَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح فِيْ هٰذِهِ الْمَسَائِلِ الْاٰتِيَةِ ـ اَنَّهَا تَبْطُلُ فَقَالَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ لَا تَبْطُلُ اِلَّا بِتَرْكِ الْفَرْضِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ اِلَّا الْخُرُوْجُ مِنْهَا بِفِعْلِهِ فَقَالَ الْخُرُوْجُ بِفِعْلِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ فَرْضٌ عِنْدَهُ وَهٰذَا غَلَطٌ مِنْهُ اَيْ مِنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ كَذَا تَفْصِيْلُهُ فِي الْاِصْلَاحِ (شرح منية، للحلبى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নামাযের ওয়াজিব কাজসমূহের বিবরণ

✪ নামায আরম্ভ করার সময় তাকবীরে তাহরীমা বলার ক্ষেত্রে "আল্লাহু আকবর" এ নির্ধারিত বাক্য দ্বারা উক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব।[১]

✪ ফরয নামায সমুহের ১ম ও ২য় রাকাতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামায সমূহের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা তথা আলহামদু লিল্লাহি -- শেষ পর্যন্ত পাঠ করা ওয়াজিব।

✪ প্রত্যেক ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে এবং ওয়াজিব সুন্নাত ও নফল নামায সমুহের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর কেরাত তথা কোরআন কারিম হতে অন্য যে কোন পূর্ণ সূরা কিংবা আয়াত সমূহ পাঠ করাও ওয়াজিব।

✪ **কওমা করা ঃ** রুকু হতে উঠে সোজা দাঁড়ানকে কওমা বলা হয়। এ দাঁড়ানটা এবং দাড়ান অবস্থায় এক তাছবীহ পাঠ তথা একবার "ছোবহানাল্লাহ" কিংবা "ছোবহানা রাব্বিয়াল আজিম-ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা" বলার পরিমাণ সময় স্থির থাকা ওয়াজিব।

✪ **জলছা করা ঃ** প্রথম সিজদা দিয়ে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসাকে জলছা বলা হয়। ১ম সিজদা করার পর সোজা হয়ে বসা এবং এ বসা অবস্থায় এক তাছবীহ পাঠ করার সময় পরিমান স্থিরথাকা ওয়াজিব।

টীকা ঃ

(١) وَاِذَا اَرَادَ الشُّرُوعَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ لَوْقَادِرًا (لِلْاِفْتِتَاحِ) اَىْ قَالَ وُجُوبًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ (درمختار) قَالَ فِى الْحِلْيَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُنْيَةِ وَلاَ دُخُوْلَ فِى الصَّلٰوةِ اِلاَّ بِتَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ وَهِىَ قَوْلُهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَوْاَللّٰهُ الْاَكْبَرُ اَوْ اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ اَوْ اَللّٰهُ كَبِيْرٌ وَعَيَّنَ مَالِكٌ رح الْاَوَّلَ لِاَنَّهُ الْمُتَوَارِثُ وَاُجِيْبَ بِاَنَّهُ يُفِيْدُ السُّنِّيَّةَ اَوِ الْوُجُوْبَ وَنَحْنُ نَقُوْلُ بِهٖ ـ فَاِنَّ الْاَصَحَّ اَنَّهُ يُكْرَهُ الْاِفْتِتَاحُ بِغَيْرِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح كَمَا قَالَ فِى التُّحْفَةِ وَالذَّخِيْرَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا وَتَمَامُهُ فِى الْحِلْيَةِ ـ وَعَلَيْهِ فَلَوْ اُفْتُتِحَ بِاَحَدِ الْاَلْفَاظِ الْاَخِيْرَةِ لاَ يَحْصُلُ الْوَاجِبُ فَافْهَمْ (شامى)

اور الله اكبر كهنے كى وجوب سے يه نكلا كر اگر اَللّٰهُ كَبِيْرٌ يا اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ يا اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ كهيكا تو واجب ادا نه هوگا (غاية الاوطار)

✪ "আলকুউদুল আওয়াল" তথা প্রথম বৈঠকঃ অর্থাৎ তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাকাতের উভয় সিজদা করার পর বসা ওয়াজিব।

✪ তাশাহহুদ পাঠ করাঃ দু'রাকাত বিশিষ্ট নামাযের একমাত্র বৈঠকে এবং তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ১ম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি- শেষ পর্যন্ত পাঠকরা ওয়াজিব।

✪ প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে ৩য় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ওয়াজিব।[১]

✪ **তারতিব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ঃ** কেরাত ও রুকুর মধ্যকার তারতীব রক্ষা করা প্রতি রাকাতের মধ্যে যে রোকন দুবার করে আদায় করা লাগে এর মধ্যকার তারতীব রক্ষা করা। যেমন দু'সিজদার মধ্যকার তারতিব। এমনি ভাবে ঐ সমস্ত কাজ যা পুরা নামাযের মধ্যে বার বার আদায় হয়ে থাকে। এর মধ্যকার তারতীব রক্ষা করা যেমন নামাযের রাকাআত সমূহের মধ্যকার তারতীব, অবশ্য ইহা মাছবুক মুছাল্লির জামাতের নামায থেকে ছুটে যাওয়া বাকী রাকাত সমূহ একাকি আদায়ের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

যেমন কোন মুছাল্লি যদি চার রাকাত বিশিষ্ট জমাতের নামাযে ইমামের সাথে শুধুমাত্র শেষের এক রাকাতই পেয়ে থাকে তখন ইমামের ছালাম ফিরানোর পর উক্ত মুছাল্লির বাকি রাকাত সমূহ আদায় করার বেলায় তাকে রাকাতের তারতীব পালন করে যেতে হয়।

অর্থাৎ ঐ ছুটে যাওয়া তিন রাকাত নামায হতে সূরা ফাতেহা ও কেরাত বিশিষ্ট প্রথম দু'রাকাত নামাযই তাকে প্রথমে আদায় করে যেতে হবে. এবং এর পরেই বাকী কেরাত বিহীন রাকাত টি আদায় করে যেতে হবে।

এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা দরকার যে, নামাযের আরকান সমূহের মধ্যকার তারতীব তথা নামাযের সুনির্ধারিত আগের ফরয কাজকে আগে এবং পরের ফরয কাজকে পরে আদায় করাটা আমাদের হানাফী মজহাবের অনেক ইমামগণের মতে ওয়াজিব নয়; বরং ফরযই বটে।

অর্থাৎ নামাযে কেয়াম তথা দাঁড়ানোর ফরয কাজকে রুকুর ফরয কাজের আগে, রুকুর ফরয কাজকে সিজদার ফরয কাজের আগে এবং নামাযের শেষ বৈঠকের ফরযকে অন্যান্য ফরয কাজ আদায় করার পরেই আদায় করা ফরয। এর ব্যতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

টীকা ঃ

(١) وَيَجِبُ (الْقِيَامُ) اِلَى الرَّكْعَةِ (الثَّالِثَةِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ بَعْدَ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ ـ (مراقى الفلاح)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ তা'দীল আরকান ঃ নামাযের রুকু সেজদা ইত্যাদি ফরয কাজকে ধীরস্থির ও শান্ত শিষ্টভাবে আদায় করাকে তাদীল আরকান বলা হয়।

এ ভিত্তিতে নামাযের রুকু সেজদা ইত্যাদিতে এক তাছবীহ বলা যায় পরিমাণ সময় স্থিরথাকা ওয়াজিব। এমনিভাবে সূরা-কেরাত ও অনান্য যাবতীয় রোকন আদায়ের ক্ষেত্রে ও ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা দরকার।[১]

✪ নামাযের মধ্যে রুকু করার সময় হলে বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ রুকু করে নেওয়া ওয়াজিব।[২]

✪ অনুরূপভাবে সিজদা করার সময় হলে বিলম্ব না করে সহসা সিজদা করে নেওয়া ওয়াজিব।

✪ "আচ্ছালামু" শব্দ বলে নামায শেষ করা ওয়াজিব।[৩]

✪ বিতিরের নামাযে তাকবীর বলার পর দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব।

✪ বিতিরের নামাযে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করার পূর্বে তাকবীর বলা ওয়াজিব।[৪]

টীকা ঃ

(١) (قوله تعديل الاركان) وهو تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله وادناه مقدار تسبيحة وهو واجب على تخريج الكرخي وهو الصحيح (بحرالرائق) واما الاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن هو اصل بنفسه ذكر الكرخي انه واجب على قولهما هكذا في الظهيرية وهوا لصحيح كذافى شرح المنية (عالمگيريه)

(٢) ومنها الانتقال من الفرض الذي هو فيه الى الفرض الذي بعده فان ذلك واجب حتى لو اخل به اذاركع ركوعين يجب عليه سجود السهو لانه لم ينتقل من الفرض وهوالركوع الاول الى الفرض الذي بعده وهو السجود بل ادخل بينهما فعلا اجنبيا وهو الركوع الثاني فقد انتقل من الفرض الى غير الفرض (شرح منيه)

(٣) (يجب لفظ السلام) مرتين في اليمين واليسار للمواظبة (طحطاوى)

(٤) وقراة قنوت الوتر وهو مطلق الدعاء وكذا تكبيرة قنوته (تنو برالابصار) وفى شرح المنية. ثم اذا اراد القنوت كبر ورفع يديه عندنا.

✪ দু'ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলা ওয়াজিব।[৩]

✪ যে সব ওয়াক্তের নামাযে ইমাম সাহেবের বড় স্বরে সূরা কেরাআত পড়া লাগে ঐসব ওয়াক্তের জামাতের নামাযে ইমামের বড় স্বরে সূরা কেরাত পাঠ করা ওয়াজিব অর্থাৎ ফজরের ফরয নামাযের জামাতের উভয় রাকাতে, মাগরিব ও এশার ফরয নামাযের জমাতের ১ম ও ২য় রাকাতে জুমা ও ঈদের নামাযের উভয় রাকাতে, রমজান মাসের তারাবীহ ও বিতিরের জামাতের নামাযের সব রাকাতে ইমাম সাহেবের বড় স্বরে সূরা কেরাত পাঠ করা ওয়াজিব।

✪ যে যে ওয়াক্তের জামাতের নামাযে সূরা কেরাত চুপে চুপে পড়তে হয় তাতে ইমামের চুপে চুপে কেরাত পাঠ করা ওয়াজিব। যেমন- জোহর ও আসরের ফরয নামাযের সূরা কেরাত, মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে এবং এশার নামাযের শেষ দু'রাকাতের সূরা ফাতেহা ও দিনের বেলার নফল নামাযের[৪] সূরা কেরাত চুপে চুপে পাঠ করা ওয়াজিব।

✪ আর একাকী নামায আদায়কারীর বেলায় যে যে ওয়াক্তের নামাযে কেরাত বড় স্বরে পড়া লাগে তাতে মুসাল্লী ইচ্ছা করলে স্বাভাবিক বড় স্বরে সূরা-কেরাত পাঠ করতে পারবে এবং এটাই তার জন্য উত্তম। ইচ্ছা করলে সে চুপেও চুপেও সূরা-কেরাত পাঠ করতে পারবে। কিন্তু যে যে ওয়াক্তের নামাযে সূরা কেরাত চুপে চুপে পড়া লাগে তাতে একাকী নামায আদায় কারীর জন্যও চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব।[১]

✪ জামাতের নামাযে ইমামের সূরা কেরাত পাঠকালে মুক্তাদীগণের নিরব থাকা ওয়াজিব।

✪ জামাতের নামাযে ফরযওয়াজিব কাজ সমূহে মুক্তাদীগণের ইমামের তাবেদারী করা ওয়াজিব।[২]

টীকা ঃ

(١) ويجب (تكبيرة العيدين) وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو (طحطاوى)

(٢) واما نوافل النهار فيخفى فيها حتما وفى نوافل الليل يخير كذافى الزاهدى (عالمگيريه)

(٣) يعنى ان الجهر يجب على الامام فيما يجهر فيه وهو صلاة الصبح

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

টীকার বাকী অংশ ঃ

وَالْأُولَيَانِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ - وَالْإِسْرَارُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ وَهُوَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْأُخْرَيَانِ مِنَ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ وَالْاِسْتِسْقَاءِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلٰكِنْ وُجُوبُ الْإِسْرَارِ عَلَى الْإِمَامِ بِالْاِتِّفَاقِ (شامی)

وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا إِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ يُخَافَتُ فِيهَا يُخَافِتُ حَتْمًا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ يُجْهَرُ فِيهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ وَلٰكِنْ لَا يُبَالِغُ مِثْلَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا يُسْمِعُ غَيْرَهُ (عالمگیریه)

(২) قَوْلُهُ وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لَا خِلَافَ فِي لُزُومِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْأَرْكَانِ الْفِعْلِيَّةِ إِذْ هِيَ مَوْضُوعُ الْاِقْتِدَاءِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُتَابَعَةِ فِي الرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ فَعِنْدَنَا لَا يُتَابِعُ فِيهَا بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ وَفِيمَا عَدَا الْقِرَاءَةِ مِنَ الْأَذْكَارِ يُتَابِعُهُ - وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَاجِبَةٌ - فَإِنْ عَارَضَهَا وَاجِبٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفُوتَهُ بَلْ يَأْتِي ثُمَّ يُتَابِعُ (شامی)

সাহু সেজদার মাছায়েল

سَهْوٌ (ছাহবুন) শব্দের আভিধানিক অর্থ গাফিল হওয়া, ভুলে যাওয়া, অন্তর-মনকে অন্য দিকে ফিরানো (মিছবাহ)।

✪ জানা বিষয়ের প্রতি অমনোযোগিতা বেখেয়ালীকে আরবীতে ছাহু سَهْوٌ বলা হয়। এ জাতীয় ভুল সামান্যতম সতর্কতা অভিহিতির দ্বারা পুনঃস্মরণে এসে পড়ে।

✪ জানা ও জ্ঞাত বিষয়কে সম্পূর্ণ রূপে ভুলে যাওয়াকে আরবী পরিভাষায় নিসইয়ান (نِسْيَانٌ) বলা হয় এবং এটাকে পুনঃ অর্জনের জন্য নতুনভাবে উপায় উপকরণ অবলম্বন করতে হয়।

✪ কোন বিষয়ের হওয়া-না হওয়া ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মূলক ধারণাকে শাক্ (شَكٌّ) সন্দেহ বলা হয়।

✪ প্রবল ধারণাকে আরবীতে ظَنٌّ (জাননুন) বলা হয় এবং দুর্বল ধারণাকে ওয়াহ্মুন (وَهْمٌ) বলা হয়।

হযরাতে ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে ছাহু নিছইয়ান ও শক্ হুকুমের বিচারে একই পর্য্যায়ের।[১] অর্থাৎ ছাহু পর্য্যায়ের ভুলের কারণে যেরূপ ছাহু- সিজদা দেওয়া লাগে, শাক-সন্ধেহ হলেও অনুরূপ ছাহু ছেজদা দিতে হ য়।

টীকা ঃ

(১) وَفِي الْبَحْرِ عَنِ التَّحْرِيرِ لَا فَرْقَ فِي اللُّغَةِ بَيْنَ النِّسْيَانِ وَالسَّهْوِ وَهُوَ عَدَمُ اسْتِحْضَارِ الشَّيْءِ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ قَالَ الرَّمْلِيُّ وَفِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ - اَلسَّهْوُ الْغَفْلَةُ عَنِ الْمَعْلُومِ فَيَتَنَبَّهُ لَهُ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ وَالنِّسْيَانُ زَوَالُ الْمَعْلُومِ وَقَالَ الْحُكَمَاءُ اَلسَّهْوُ زَوَالُ الصُّورَةِ عَنِ الْمُدْرِكَةِ مَعَ بَقَائِهَا فِي الْحَافِظَةِ وَالنِّسْيَانُ زَوَالُهُمَا عَنْهُمَا مَعًا فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ فِي تَحْصِيلِهَا إِلَى سَبَبٍ جَدِيدٍ - (شامی)

اَلسَّهْوُ وَالشَّكُّ وَالنِّسْيَانُ وَاحِدٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ وَالظَّنُّ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ وَالْوَهْمُ الطَّرَفُ الْمَرْجُوحُ (در)

اَلنِّسْيَانُ عُزُوبُ الشَّيْءِ عَنِ النَّفْسِ بَعْدَ حُضُورِهِ وَالسَّهْوُ قَدْ يَكُونُ عَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ عَالِمًا بِهِ وَعَمَّا لَا يَكُونُ عَالِمًا بِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ النِّسْيَانَ يَكُونُ عَمَّا أُزِيلَ مِنَ الْمُحَافِظَةِ بِحَيْثُ لَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِكَسْبٍ جَدِيدٍ وَالسَّهْوُ مَا يَتَحَصَّلُ بِالتَّذَكُّرِ - (طحطاوى علي مراقى الفلاح)

✪ নামাযরত অবস্থায় নামাযের নির্ধারিত ওয়াজিব সমূহের কোন একটি বা একাধিক, ওয়াজিব কাজ যদি ছাহু অর্থাৎ অমনোযোগিতা মূলক ভুল বশতঃ বাদ পড়ে যায়, অথবা নামাযের কোন ফরয কাজ যে স্থলে করা নির্ধারিত সে স্থলে না করে আগে পরে করা হয়, কিংবা কোন ওয়াজিব কাজ দু'দুবার করা হয় বা কোন ফরয কাজকে বাড়িয়ে করা হয়, (যেমন দু'ছিজদার স্থলে তিনটি ছিজদা করে বসা) নামাযের এ ত্রুটিগুলোর ক্ষতিপূরণ উদ্দেশ্যে যে দুটো অতিরিক্ত ছিজদা করতে হয় এ ছিজদা দ্বয়কে শরীয়াতের পরিভাষায় "ছাহু ছিজদা" বলা হয়।

নামায আদায়রত অবস্থায় উল্লেখিত রকমের কোন ছাহু তথা ভুল ত্রুটি হয়ে পড়লে উক্ত নিয়মে ছিজদাদ্বয় আদায় করে নিলে নামায শুদ্ধ হয়ে যায়।

✪ ছাহু ছাজদা ওয়াজিব হওয়া সত্বেও ইচ্ছা করে ছাহু ছিজদা না দিলে উক্ত নামাযকে পুনঃ আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব।[১]

✪ ছাহু ছিজদা ওয়াজিব হয়েছে এমন নামাযের শেষ বৈঠকে তশাহ্হুদ (আওয়াহিয়্যাতু লিল্লাহি .....ওয়ারাছুলুহু) পাঠকরার পর ছাহু ছিজদা আদায় করার কথা যদি ভুলে বসে এবং দরুদ দোয়া ইত্যাদি পাঠ করতঃ ছালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে দেয়। এমতাবস্থায় যদি ছালাম ফিরানোর পর নামায আদায় স্থানেই বসা থাকে এবং শরীর কেবলার দিক হতে অন্য কোন দিকে না ঘুরানো হয়ে থাকে এবং কারো সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ না করা হয়ে থাকে, তাহলে ঐ লোক তখনই সাথে সাথে ছাহু ছিজদা আদায় করে দিলে উক্ত নামায় শুদ্ধ হয়ে যাবে।(দুররে মোখতার)

কিন্তু ছালাম ফিরানোর পর যদি শরীর কেবলার দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়া হয়, কিংবা নামায আদায়ের স্থান পরিবর্তন করে ফেলা হয় বা কারো সাথে বাক্যালাপ করে বসে।

অথবা, তখনও ছাহু ছিজদা ওয়জিব হওয়ার কথা মনে না পড়ে বরং পরেই স্মরণে আসে তাহলে নামায পুনরায় আদায় করে দিতে হবে।[২]

টীকা ঃ

(١) وَاِنْ كَانَ تَرْكُهُ) اَلْوَاجِبَ (عَمَدًا اِثْمَ وَوَجَبَ) عَلَيْهِ (اِعَادَةُ الصَّلٰوة) تَغْلِيْظًا عَلَيْهِ (لِجَبْرِ نَقْصِهَا) فَتَكُوْنُ مُكَمِّلَةً وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِالْاُوْلٰى وَقِيْلَ تَكُوْنُ الثَّانِيَّةُ فَرْضًا فَهِىَ الْمُسْقِطُ (مراقى الفلاح مع نورالايضاح)

(٢) (قَوْلُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ الصَّلٰوةِ) فَاِنْ لَمْ يُعِدْهَا حَتّٰى خَرَجَ الْوَقْتُ سُقِطَتْ عَنْهُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ هٰذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ـ (طحطاوى على مراقى الفلاح)

✪ নামাযের ওয়াজিব কাজসমূহের কোন একটি ওয়াজিব ভুলে নয় বরং ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে, অনুরূপ ভাবে নামাযের কোন ফরয কাজ ইচ্ছায়-আনিচ্ছায় যে কোনভাবে আদায় করা থেকে বাদ গেলে তখন ছাহু ছিজদা আদায় করে দিলেও উক্ত নামায আদায় হবেনা। এক্ষেত্রে ছাহু ছিজদা কোন উপকারে আসবেনা কারণ নামায আদায় হবেনা ; বরং নামায পুনরায় আদায় করে দিতে হবে।

ছাহু সিজদা আদায়ের নিয়ম ঃ

নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ------- ওয়ারাছুলুহু পর্যন্ত পাঠ করার পর শুধুমাত্র ডানদিকে ছালাম ফিরিয়ে আল্লাহু আকবর বলে পরপর দু'টি সিজদা দিতে হয়। অতঃপর পুনঃ আত্তাহিয়্যাতু ---দরূদ শরীফ এবং দোয়ায়ে মাছূরা পাঠ করে নামাযের ছালাম ফিরাতে হয়।

✪ ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতের যে কোন এক রাকাতে কিংবা উভয় রাকাতে ছূরা ফাতেহা পাঠ করতে বা এর সাথে অন্য কোন সূরা-কেরাত মিলিয়ে পাঠ করতে ভুলে গেলে ছাহু ছাজদা ওয়াজিব হয়, (আলমগীরী)।

✪ ভুল ক্রমে সূরা ফাতেহা না পড়ে অন্য সূরা কেরাতের কিছু অংশ পড়ে নেওয়ার পর ফাতেহা না পড়ার কথা মনে পড়ায় পুনঃ সূরা ফাতেহা পাঠ করত: অন্যসূরা কেরাত পাঠ করলে ছাহু সিজদা দিতে হবে।[১]

✪ যদি ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে এবং বিতির ও নফল সুন্নাত নামাযের প্রত্যেক রাকাতের যে কোন এক রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতেহা পাঠ করল আর এর সাথে সূরা-কেরাত মিলিয়ে পড়তে সম্পূর্নই ভুলে গেল তখন ও ছাহু সিজদা দিতে হবে (আলমগীরী)।

কেউ তিন-চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের শেষের এক রাকাত কিংবা দু 'রাকাতে সূরা ফাতেহা কিংবা কোরআন কারিমের কোন সূরা পাঠ করল না অথবা তাছ্বীহ জিকির ও পাঠ করলনা সেক্ষেত্রে হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর মতে এরূপ ইচ্ছাকৃত ভাবে করলে সে গুনাহ্গার হবে, আর যদি ভুলে করে তাহলে ছাহু ছাজ্দা দেওয়া লাগবে। কিন্তু হযরত ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) হযরত ইমাম আযম (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন এ ক্ষেত্রে ছাহু ছিজদা দেওয়া লাগবেনা এবং

টীকা ঃ

(١) وَمَنْ سَهَا عَنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِى الْاُوْلٰى اَوْفِى الثَّانِيَةِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ مَا قَرَاءَ بَعْضَ السُّوْرَةِ يَعُوْدُ فَيَقْرَاُ بِالْفَاتِحَةِ ثُمَّ السُّوْرَةِ قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُو اللَّيْثُ يَلْزَمُ سُجُوْدُ السَّهْوِ (عالمگيريه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এটাই নির্ভর যোগ্য মত।[১]

✪ তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ২য় রাকাতের পর ভুলে মধ্যখানে না বসলে কিংবা উক্ত বৈঠকে ভুল ক্রমে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ না করলে ছাহু ছাজদা দেওয়া ওয়াজিব। (আলমগীরী)

✪ তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের পর প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ (আত্তহিয়্যাতু) পাঠ শেষ হওয়া মাত্র তৃতীয় রাকাত আদায়ের জন্য যে দাঁড়িয়ে যেতে হয়- সে স্থলে ভুল ক্রমে না দাঁড়িয়ে বসে থাকলে এর জন্যও ছাহু সিজদা দেওয়া ওয়াজিব।

✪ কেউ তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ২য় রাকাতের ছাজদা দু'টো আদায় করার পর প্রথম বৈঠক না করে অর্থাৎ মধ্যখানে না বসে ভুল ক্রমে তৃতীয় রাকাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতে আরম্ভ করল। এরই মাঝে সে যে প্রথম বৈঠক করে নাই এ কথা স্মরণে আসলে তখন তাকে দেখতে হবে যে, সে বসার দিকে বেশী আছে নাকি দাঁড়ানোর দিকেই বেশী উঠে পড়েছে।

এক্ষেত্রে মুছাল্লী যদি বসার দিকে বেশী থাকে অর্থাৎ অর্ধেকের নীচে থাকে তাহলে সে সহসা বসে যাবে এবং উক্ত ওয়াজিব বৈঠক আদায় করত তাশাহ্হুদ পাঠ করে পুনঃ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং এর জন্য ছাহু ছিজদা দেওয়া লাগবে না।

কিন্তু ঐ নামাযী যদি অর্ধেকের উপরে অর্থাৎ দাঁড়ানোর দিকেই বেশী অগ্রগামী থাকে তাহলে দাঁড়িয়েই যাবে আর বসবেনা অতঃপর বাকী নামায শেষ করতঃ শেষ বৈঠকে বসে তাশাহ্হুদ পাঠ করে প্রথম বৈঠক ও প্রথম বৈঠকের তাশাহ্হুদ পাঠের ওয়াজিব আদায় না করার ক্ষতি পূরণ উদ্দেশ্যে ছাহু ছাজ্দা দিয়ে নামায শেষ করবে।

কিন্তু ঐ মুছাল্লি যদি দাঁড়ানোর দিকেই বেশী অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও কিংবা সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে ও বেখেয়ালে কিংবা মাছআলা জানা না থাকার কারণে দাঁড়ান অবস্থা থেকে পুনঃ বসে পড়ে, এমতাবস্থায় অনেক ফোকাহায়ে ইজামের মতে তার নামায ফাছেদ নষ্ট হয়ে যাবে এবং এ নামায পুনঃ নি'য়্যত করতঃ আদায় করে দেওয়া লাগবে। কেননা সে মুছাল্লী কেয়াম (দাড়ান যেটা নামাযের ফরয সমূহের একটি ফরয

টীকা ঃ

(১) ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في الشفع الثاني ولم يسبح عن ابي حنيفة رح انه قال ان كان متعمدا فقد اساء وان كان ساهيا كان عليه سجود السهو وروى ابو يوسف عن ابي حنيفة رحمهما الله انه لا حرج عليه في العمد ولا سجود عليه في السهو وعليه الاعتماد .(قاضى خان)

কাজ) কে বাদ দিয়ে প্রথম বৈঠক (যেটা ওয়াজিব যা ফরয কাজের চেয়ে পরের স্তরের) সেটাকে প্রধান্য দিয়ে বসেছে।[১]

○ পক্ষান্তরে অপর অনেক ফোকাহায়ে কেরামগণ বলেছেন যে, এ অবস্থায় ঐ মুছাল্লির নামায ফাছেদ (নষ্ট) হয়ে যাবেনা কেননা মূলতঃ ঐ মুছাল্লী দাঁড়ানোর ফরয কাজ কে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বসেনি বরং ফরয টি আদায়ের বেলায় একটু বিলম্ব করেছে মাত্র এবং এটা মোটেই নামায ভঙ্গের কারন হতে পারেনা এবং এ ত্রুটিটি ছাহু ছাজদা দেওয়ার মাধ্যমে শুদ্ধ হয়ে যাওয়ারই কথা।[২]

✪ তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করতে বসে ভুলক্রমে 'ছুরা ফাতেহা' কিংবা অন্য কোন দোয়া-দরুদ পাঠ করে বসলে ছাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। এমনকি তাশাহ্হুদ পাঠকরার পর কিছু না পড়ে নিরব এক রুকন আদায় পরিমান সময় বসে থাকলেও ছাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (আলমগীরী)।

✪ যেসব নামাযে ইমামের বড় স্বরে সূরা-কেরাত পড়া লাগে, যেমন ফজর, মাগরিব, এশা, জুমা, দু'ঈদের নামায এবং রমজানের তারাবীহ ও বিতরের জামাতের নামায) সে স্থলে চুপে চুপে ছুরা ফাতেহা ও কেরাতপড়লে এবং যে সব নামাযে চুপে চুপে কেরাত পড়া লাগে (যেমন জোহর-আছর ইত্যাদির নামায) সে সব ক্ষেত্রে ইমাম বড় আওয়াজে কেরাত পড়ে বসলে ছাহু ছাজদা ওয়াজিব হবে।

টীকা ঃ

(১) (سها عن القعود الاول من الفرض) ولو عمليا واما النفل فيعود مالم يقيده بالسجدة (ثم تذكره عاد اليه) وتشهد ولا سهو عليه في الاصح (ما لم يستقم قائما) في ظاهر المذهب وهو الاصح فتح (والا) اى وان استقام قائما (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام (وسجد للسهو) لترك الواجب . (فلو عاد الى القعود) بعد ذلك (تفسد صلوته) لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعى (درمختار)

(২) (وان عاد الساهى عن القعود الاول) اليه (بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلوته) وارجحها عدم الفساد لان غاية ما في الرجوع الى القعدة زيادة قيام في الصلوة وهو ان كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل لان زيادة مادون ركعة لا يفسد وقد يقال انه نقص للا كمال فانه اكمال لانه لم يفعله الا لا حكام صلوته و قال صاحب البحر والحق عدم الفساد

(مراقى الفلاح شرح نور الايضاح)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয, ওয়াজিব এবং ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাযের প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠের পর দরুদ শরীফের কিছু অংশ যেমন– আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছৈয়্যিদিনা মুহাম্মদ' পর্যন্ত ভুল ক্রমে পড়ে বসলে ছাহু ছাজদা ওয়াজিব হয়। (আলমগীরী, শামী)

কিন্তু চার রাকাত বিশিষ্ট ছুন্নাতে যায়েদা কিংবা নফল নামায সমূহে প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের পর দরূদ-দোয়া পড়ে বসলে ছাহু ছাজদা দেওয়া লাগেনা বরং অনেকের মতে ছুন্নাতে যায়েদা ও নফল নামাযের ১ম বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের পর দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ে নিতে হয়।

✪ নামায আদায়ের সময় ভুলক্রমে অতিরিক্ত রুকু-ছাজদা অর্থাৎ দু'ছাজদার স্থলে তিন ছাজদা করে বসলে নামায ফাছেদ (নষ্ট) হয় না বরং ছাহু ছিজদা ওয়াজিব হয়।

✪ ওয়াজিব, ছুন্নাত কিংবা নফল নামাযের যে কোন রাকাতে সূরা ফাতেহা অথবা এর সাথে অন্য কোন সূরা-আয়াত মিলিয়ে পাঠ করতে ভুলে বসলে ছাহু ছাজদা ওয়াজিব হয়।

✪ বিতরের নামাযের তৃতীয় রাকাতের কেরাত পাঠ শেষে দুয়ায়ে কুনূত পাঠ করার পূর্বে ভুলবশতঃ তাক্বীর না বলে থাকলে এবং দোয়ায়ে কুনূত না পড়ে থাকলে ছাহু ছাজদা ওয়াজিব হবে।

✪ যদি নামাযের তাদীলে আরকান তথা নামাযের রুকু এবং সিজদাকে ধীরস্থীর ও শান্ত ভাবে আদায় না করে থাকে তাহলে ঐ লোকের উপর ছাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী)

✪ যদি প্রথম বৈঠকের ন্যায় শেষ বৈঠকেও ভুল বশত তাশাহ্হুদ নাপড়ে থাকে তাহলে এতেও ছাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার বাকী অংশ ঃ
وَقِيْلَ لَا تُفْسِدُ لٰكِنَّهُ يَكُوْنُ مسِيْئًا وَيَسْجُدُ لِتَاخِيْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْاَشْبَهُ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ وَهُوَ الْحَقُّ بحر (درمختار)

كمال الدين محقق نے كہاهے كه قعده كيطرف رجوع كرنے سے صرف قيام كى زيادتى لازم اتى ہے جو نمازكى مخل نہيں كيونكه يه ثابت هوچكا هے كه ايك ركعت سے كم كى زيادتى مفسد نماز نہين - باقى رهايه كه بيٹھ جانےسے فرض كو واجب كيلئے چھوڑنا لازم اتاهے يه بات بهى نہيں كيونكه يه ترك نہيں هے بلكه تاخيرهے توجيسے كسى كو ركوع ميں ياد پڑے كه سورة نہيں پڑھى اور كھڑاهوكر سورة پڑھے تو نماز فاسد نہيں هوتى ايساهى اس صورت ميں بهى فاسد نہيں هوگى كذافى الشامى (غاية الا وطار)

✪ ইমাম ভুলক্রমে ঈদের নামাযে তাকবির আদায় না করে থাকলে কিংবা নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে কম বেশী করে থাকলে বা নিয়ম মত আদায় না করে থাকলে উক্ত ইমামের উপর ছাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (বাহরুর রায়েক)।

✪ ফরয, নফল, সুন্নাত, জুমা ও ঈদের সকল প্রকার নামাযে ছাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে সমান ভাবে সর্বক্ষেত্রে ছাহু সিজদা আদায় করা ওয়াজিব, কিন্তু হানফী মাজহাবের মুতাখ্‌খেরীন ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে জুমআ ও ঈদের বড় জমাতে ছাহু ভুলের কারণে ছাহু সিজদা ওয়াজিব হলে ও সিজদা নাকরাই উত্তম, কারণ জমাত বড় হওয়ার ফলে সাধারণ মুছাল্লিরা কিসের সিজদা তা নিয়ে দ্বিধা ও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যেতে পারে।[১]

ঈদের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতের রুকুতে যাওয়ার "তাকবির" বাদপড়েগেলে ও ছহু সিজদা দেওয়া লাগবে (আলমগীরী)।

✪ যদি কোন মুছাল্লী দুরাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায আদায়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাকাতের সিজদা করার পর ভুলক্রমে না বসে তৃতীয় রাকাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, এমনি ভাবে তিন রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের তৃতীয় রাকাত আদায়ের পর ৪র্থ রাকাত আদায়ের জন্য দাড়িয়ে যায়, এভাবে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের ৪র্থ রাকাত আদায়ের পর ভুল ক্রমে পঞ্চম রাকাত আদায়ের জন্য দাড়িয়ে যায়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে দাড়িয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী রাকাতের সিজদা করার আগে আগে যদি এ ভুলের কথা স্বরণে এসে যায়, তাহলে বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি বসে পড়বে এবং তাশাহ্হুদ [redacted] পাঠ করার পর যথা নিয়মে ছাহু সিজদা দিয়ে নামায সমাপ্ত করে দিবে।

✪ কিন্তু যদি এসব ক্ষেত্রে যথাক্রমে দু'রাকাতের স্থলে তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে বসে, তিন রাকাতের স্থলে চতুর্থ রাকাতের সিজদা করে বসে ও চার রাকাতের স্থলে ৫ম রাকাতের সিজদা করে বসে এবং এর পরই ভুলের কথা স্মরণে আসে, তাহলে এর সাথে সাথে আরো এক এক রাকাত মিলিয়ে নামায সমূহ আদায় করতঃ ছাহু সিজদা দিয়ে নামায শেষ করে দিবে।

টীকা ঃ

(١) وَالسَّهْوُ فِىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ وَالْجُمْعَةِ وَالْمَكْتُوْبَةِ وَالتَّطَوُّعِ سَوَاءٌ وَالْمُخْتَارُ عِنْدِ الْمُتَاخِرِيْنَ عَدْمُهُ فِى الْاَوَّلَيْنِ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ كَمَا فِىْ جُمْعَةِ الْبَحْرِ وَاَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَبِهٖ جُزِمَ فِى الدّرر (درالمختار)

فتنه سے مراد لوگوں كا تردد هے يعني عيد وجمعه مين چونكه مجمع بهت هوتا هے تو عجب نہيں كه سجده سهو كرنے سے لوگ تشويش ميں پڑ جائين اسلئے متاخرين نے اختيار كيا هے كه نه كرنا سجده كا ايسے مجمعوں مين اولى هے (غاية الاوطار)

এ ক্ষেত্রে যেহেতু নামাযের শেষ বৈঠক যাহা ফরয-উহা বাদ পড়ায় উল্লেখিত নামাযগুলো আর ফরয নামায থাকবেনা বরং শরীয়াতের হুকুম অনুযায়ী ঐগুলো নফলে পরিনত হয়ে পড়বে এবং নুতন ভাবে ঐ ফরয নামায সমূহ পূণঃ নিয়্যত করতঃ যথা নিয়মে আদায় করে দিতে হবে।

✪ পক্ষান্তরে উল্লেখিত ফরয-ওয়াজিব নামায সমুহে যদি যথা ক্রমে দ্বিতীয় কিংবা চতুর্থ রাকাতের পরে "শেষ বৈঠক" যেটা ফরয সে বেঠকে বসে তাশাহহুদ পাঠ করার পরই ভুলক্রমে দুরাকাতের স্থলে তিন রাকাতের জন্য, তিন রাকাতের স্থলে চার রাকাতের জন্য চার রাকাতের স্থলে পাঁচ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। আর এ রাকাত সমূহের জন্য, সিজদা করার আগেই যদি ভুলের কথা স্মরণে পড়ে তাহলে সিজদা না করে বসে যাবে এবং যথা নিয়মে ছাহু সিজদা দিয়ে নিয়ম মত তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাছুরা পাঠ করে নামায শেষ করে নিবে।

✪ কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত রাকাত সমূহের সিজদায় চলে যায় তাহলে আর বসবেনা বরং এর সাথে আরও এক রাকাত নামায মিলিয়ে আদায় করতঃ শেষে বসে যথা নিয়মে ছাহু সিজদা দিয়ে নামায শেষ করবে।

এ ক্ষেত্রে নিয়্যতকৃত ফরয-ওয়াজিব নামায ও আদায় হয়ে যাবে। পুনঃদোহ্‌রায়ে পড়া লাগবেনা এবং পরের অতিরিক্ত দু রাকাত নফলে পরিণত হয়ে পড়বে।

✪ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কেরাত পড়া ভুলে গেলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে উক্ত কেরাত পড়ে দিয়ে নামায পূর্ণ করবে। আর তারতীবের খেলাপের জন্য এক্ষেত্রে ছাহু সিজদা করতে হবে।

✪ এমনিভাবে তিন রাকাত বিশিষ্ট নামাযের ১ম কিংবা দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত ভুলে না পড়লে তৃতীয় রাকাতে উক্ত কেরাত পড়ে দিয়েই পুর্ব নিয়মে ছাহু সিজদা আদায় করতঃ নামায সমাপ্ত করবে।

জামাতের নামাযে ইমামের ছাহু-ভুলের কারণে মুক্তাদীর উপর ও ছাহু সিজদা ওয়াজিব হয়ে থাকে। (মুহীত)

✪ জামাতের নামাযে মুক্তাদীর ভুলের কারণে তার নিজের উপর কিংবা তার ইমামের উপর ছাহু সিজদা ওয়াজিব হবেনা। (হেদায়া)

✪ প্রথম রাকাতে দোয়ায়ে ছানা,আউজুবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ পাঠ করা না হলে, সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত শেষে ভুল ক্রমে আমিন বলা নাহলে,বিছমিল্লাহ বা আমীন ইত্যাদিকে চুপে বলার পরিবর্তে উচ্চস্বরে বলে বসলে ছাহু সিজদা দেওয়া লাগেনা।

✪ এভাবে নামাযের কোন সুন্নাত-মুস্তাহাব কাজ ইচ্ছায় বা ভুল ক্রমে বাদ গেলে যেমন ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকাতে আলহামদু সূরা নাপড়লে কিংবা উক্ত রাকাত সমূহে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য কোন সূরা-কেরাত মিলিয়ে নিলে, রুকু সিজদার তাছবীহসমূহ এবং শেষ বৈঠকের দরুদ ইত্যাদি না পড়লে ছাহু সিজদা দেওয়া লাগেনা। তবে নামাযের কোন সুন্নাত কাজ স্বেচ্ছায় বাদ দিলে গুনাহ্‌গার হবে।

সন্দেহের মাছআলা ঃ

যদি নামাযের ছালাম ফিরানোর পর কোন বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে নামায আদায় হয়ে গিয়েছে বলেই হুকুম দেওয়া হবে।

যদি নামাযের রাকাত নিয়ে মনে সন্দেহ জাগে আর এ সন্দেহ যদি প্রথম বারই হয় তাহলে নুতন সুত্রে নামায আদায় করে নিতে হয়।

কিন্তু এরূপ সন্দেহ যদি প্রায় সময় হয়ে থাকে তাহলে গভীর ভাবে তড়িৎ মনে মনে চিন্তা করে দেখতে হয়। অতঃপর যত রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে দৃঢ় ইয়াকীন তথাপ্রবল ধারনা হয় তত রাকাত নামায পড়ে নেওয়া হয়েছে ধরে নিয়েই বাকী রাকাত গুলো আদায় করে নিতে হয়।

আর যদি ধারনা দুদিকেই সমান হয় তাহলে কমের দিকটি কে অগ্রাধিকার দিয়ে বাকি রাকাত গুলো আদায় করে নিতে হয়।

যেমন কোন মুছাল্লি ফজরের দুরাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের নিয়্যাত বাঁধলো-নামায আদায়ান্তে নামাযরত লোকটির সন্দেহ দেখা দিল যে সে কি এক রাকাত নামায আদায় করল নাকি দুরাকাত নামায আদায় করল!

এ ক্ষেত্রে পুর্বোল্লেখিত সুত্রমতে একরাকাত নামাযই আদায় করা হয়েছে বলে ধরে নিয়ে তখন বসে পড়তে হয় এবং এ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করতঃপুনঃ দাড়িয়ে আর এক রাকাত মিলিয়ে নিয়ে দুরাকাত নামায পূর্ণঃ করত ঃ শেষে ছহু সিজদা দিয়ে ঐ নামায শেষ করতে হবে।

এমনি ভাবে কেউ তিন রাকাত বিশিষ্ট ফরয-নামায যেমন মাগরিবের নামাযের নিয়্যত বাধল, নামায আদায়রত অবস্থায় সে সন্দেহের মধ্যে পড়েগেলে যে, দু'রাকাত নামায আদায় করল নাকি তিন রাকাত নামায আদায় করল এরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে দুরাকাত নামায আদায় করেছে বলেই তাকে ধরে নিতে হবে।

✪ এমনিভাবে অপর কেউ চাররাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায যেমন এশার ফরয নামাযের নিয়্যত বাঁধল, কয়েক রাকাত আদায় করার পর ঐ মুছাল্লি সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেল যে, সে কি তিন রাকাত নামায আদায় করল নাকি চার রাকাত আদায় করল! এমতাবস্থায় সে তিন রাকাত নামায আদায় করেছে বলেই ধরে নিবে।

এবং এক্ষেত্রে প্রতি রাকাত নামাযের পর বসে বসে তাশাহহুদ পাঠ করতঃ যত রাকাতের নিয়্যাত করা হয়েছিল তত রাকাত পূর্ণকরে শেষে ছাহু সিজদা দিয়ে নামায সমাপ্ত করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম পরিচ্ছেদ

তেলাওয়াতে সিজদার মাসায়েল

কোরআন করিমের মধ্যে চৌদ্দটি (১৪) আয়াত রয়েছে যার কোন একটি আয়াত পাঠ করলে বা অন্যের তেলাওয়াত শুনলে তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর একটি করে সিজ্‌দা আদায় করা ওয়াজিব হয়। একারণে এগুলোকে সিজ্‌দার আয়াত বলা হয়।

তিলাওয়াতে সিজ্‌দার আয়াতসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

(১) ছুরা আ'রাফের ২০৬ নং আয়াত, পারা নং- ৯

(ان الذين عند ربك হতে ولـه يسجدون পর্যন্ত)

(২) ছুরা রা'দের ১৫ নং আয়াত, পারা নং-১৩

(ولله يسجد হতে بالغدو والاصال পর্যন্ত)

(৩) ছুরা নাহলের ৫০ নং আয়াত, পারা নং-১৪

(ولله يسجد مافى হতে ويفعلون ما يؤمرون পর্যন্ত)

(৪) ছুরা বণী ইসরাঈলের ১০৭-১০৯ নং আয়াত, পারা নং- ১৫

(ويخرون للاذقان হতে خشوعا পর্যন্ত)

(৫) ছুরা মারইয়ামের ৫৮ নং আয়াত পারা নং- ১৬

(اولئك الذين انعم হতে سجداوبكيا পর্যন্ত)

(৬) ছুরা হজ্জের ১৮ নং আয়াত পারানং-১৭

(الم تر ان الله হতে ان الله يفعل مايشاء পর্যন্ত)

(৭) ছুরা ফোরকানের ৬০ নং আয়াত পারা নং-১৯

(واذا قيل لهم اسجدوا হতে وزادهم نفورا পর্যন্ত)

(৮) ছুরা নামালের ২৫ ও ২৬ নং আয়াত পারা নং-১৯

(الايسجد والله الذى হতে رب العرش العظيم পর্যন্ত)

(৯) ছুরা সিজ্‌দা এর ১৫ নং আয়াত পারা নং-২১

(انما يؤمن بايتنا হতে وهم لا يستكبرون পর্যন্ত)

(১০) ছুরা ছাদ্ এর ২৪ নং আয়াত পারা নং-২৩

(قال لقد ظلمك হতে وخر راكعاواناب পর্যন্ত)

(১১) ছুরা হা-মীম সিজ্‌দার ৩৭ ও ৩৮ নং আয়াত পারা নং ২৪

(من ايته الليل হতে وهم لايسئمون পর্যন্ত)

(১২) ছুরা আন্ নাজমের ৬২নং আয়াত পারা নং-২৭

(فاسجدوا لله واعبدوا)

(১৩) ছুরা ইন্‌শিকাক -এর ২১ নং আয়াত পারা নং- ৩০

(واذا قرى القران হতে لا يسجدون পর্যন্ত)

(১৪) ছুরা ইকরার ১৯নং আয়াত পারা নং-৩০ (كلا لا تطعه واسجد واقترب)

✪ তিলাওয়াতে সিজ্‌দার আহকাম ঃ

(২) নামাযের মধ্যে হউক কিংবা নামাযের বাইরে হউক সিজ্‌দার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করলে তিলাওয়তকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপর সিজ্‌দা করা ওয়াজিব, শ্রোতার মধ্যে শ্রবণের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, সিজ্‌দা আদায় করা লাগবেই (আলমগীরী)।

নামায আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সব শর্তাবলী রয়েছে যেমন- শরীর পাক, পোষাক পাক, জায়গা পাক পবিত্র হওয়া এবং কেব্‌লা মুখী হওয়া ইত্যাদি তেলাওয়াতের সিজ্‌দা আদায়ের ক্ষেত্রেও এসব শর্তাবলী মেনে চলা ফরয।

✪ তেলাওয়তে সিজ্‌দা আদায় করার নিয়ম ঃ

কেব্‌লামুখী হয়ে দাড়িয়ে হাত না উঠিয়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর বলে সিজ্‌দায় যেতে হয়, একটা সিজ্‌দা করার পর পুনঃ আল্লাহু আকবর বলে দাঁড়িয়ে যেতে হয়, সিজ্‌দার হালতে কমপক্ষে তিনবার ছুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা বলতে হয়।

✪ দাড়ান অবস্থা হতে আল্লাহু আকবর বলে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদা শেষে আল্লাহু আকবর বলে দাড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব [শামী]।

✪ নামাযের বাইরে সিজ্‌দার আয়াত তেলাওয়াত করলে সংগে সংগে সিজ্‌দা করে নেওয়া ওয়াজিব নয়,বরং মুস্তাহাব। তাই পরে অন্য সময়ে সিজ্‌দা আদায় করে দিলেও চলে (আলমগীরী)। তবে ভুলে একেবারে বাদ না পড়া চাই, অন্যথায় সিজ্‌দা তরকের গুণাহ জিম্মায় থেকে যাবে।

✪ নামাযের মধ্যে আয়াতে সিজ্‌দা তিলাওয়াত করলে আয়াত পাঠ শেষ হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে নামাযে থেকে সিজ্‌দা আদায় করে দেওয়া লাগে (আলমগীরী)'

(৩) সিজ্‌দা আদায় করে নেওয়ার পর দাড়িয়ে কেরাতের বাকী অংশ পাঠ করত ঃ অবশিষ্ট নামায আদায় করতে হয়।

✪ কেউ নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর তেলাওয়াতের সিজদা নামাযে থাকা অবস্থায় আদায় করলনা, বরং নামায থেকে বের হয়ে পরে আদায় করল, এতে উক্ত ওয়াজিব সিজ্‌দা আদায় হবে না, বরং এর জন্য চিরতরে গুনাহগার থেকে যাবে। তাই আল্লাহর কাছে মাফী পাওয়ার জন্য তাওবা ইস্তেগফার করে যাওয়া জরুরী (আলমগীরী, বদায়ে)।

✪ জামাতের নামাযে ইমাম আয়াতে সিজদা তেলাওয়াত করলে ইমাম-মুক্তাদি উভয়ের উপর সিজদা আদায় করা ফরয, (হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ আর জমাতের নামাযে কোন মুক্তাদী থেকে যদি সিজ্‌দার আয়াত শুনা যায় তাহলে এতে উক্ত মুক্তাদী-ইমাম এবং উক্ত নামাযে শামিল অন্যান্য মুছাল্লীর কারো উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব হবে না (আলমগীরী)। তবে যারা অন্য নামাযরত রয়েছে বা নামাযরত নাই তারা উক্ত মুক্তাদির তেলাওয়াত শুনলে তাদের উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব হবে (কবিরী)।

✪ জামাতের নামাযে থাকা অবস্থায় ইমাম- মুক্তাদী নামাযের বাইরের কোন তেলাওয়াতকারী থেকে সিজ্‌দার আয়াতের তেলাওয়াত শুন্‌লে এতে ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব হবে।

তবে উক্ত সিজ্‌দা নামায শেষ করার পরই আদায় করা লাগে, নামাযের ভিতর থাকা অবস্থায় আদায় করলে উক্ত সিজ্‌দা আদায় হবে না।

✪ একই বৈঠক- বা মাজলিসে সিজ্‌দার আয়াতকে বারবার পড়লে একটি মাত্র সিজ্‌দাই ওয়াজিব হয় (আলমগীরী)।

✪ শ্রোতা যদি তার স্থান পরিবর্তন করার মাধ্যমে সিজ্‌দার আয়াতখানা বার বার শুনে তাহলে স্থান পরিবর্তনের সংখ্যা অনুযায়ীই তার উপর ছজদা ওয়াজিব হবে।

✪ স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময়, এমনিভাবে ওযু গোছল ফরয হওয়ার হালতে যদি সিজ্‌দার আয়াত তেলাওয়াত করে বা কারো তেলাওয়াত শুনে এ অবস্থায়ও সিজ্‌দা ওয়াজিব হবে। পরে যথা নিয়মে ওযু গোছলের মাধ্যমে পাক-পবিত্র হয়ে সিজ্‌দা আদায় করে দিবে।

✪ অসুস্থ ব্যক্তিও সিজ্‌দার আয়াত তেলাওয়াত করলে বা শুনলে তার উপরও সিজদা করা ওয়াজিব হবে।

✪ তবে হায়েজ-নেফাস ওয়ালী স্ত্রীলোক কারো থেকে সিজ্‌দার আয়াতের তেলাওয়াত শুনতে পেলে তার উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব হবে না। (শামী)।

✪ ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে সিজ্‌দার আয়াত তেলাওয়াত করলে ঐ ঘুমন্ত তেলাওয়াতকারীর উপর সিজ্‌দা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু এ লোকের তেলাওয়াত যারা শুনবে তাদের উপর সিজ্‌দা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগরিত হওয়ার পর কেউ যদি তাকে জানিয়ে দেয় যে, ঘুমের অবস্থায় সে লোক সিজ্‌দার আয়াত তেলাওয়াত করেছিল, সে ক্ষেত্রে ঘুমন্ত লোকের উপরও সিজ্‌দা করা ফরজ হয়ে পড়ে (আলমগীরী)।

(৫) আয়াতে সিজ্‌দা যদি কোন ছুরার শেষেই হয়ে থাকে- এবং উক্ত আয়াতে সিজ্‌দার সিজ্‌দাখানা যদি কোন নামাযে তেলাওয়াত করা হয় তখন উক্ত আয়াতে সিজ্‌দা খানা তেলাওয়াত শেষ করার পর সরাসরি সিজ্‌দা করেও উক্ত তেলাওয়াতে সিজ্‌দা আদায় করা যায়,

অপরদিকে উক্ত সিজদার আয়ত পাঠ শেষ করতঃ নামাযের পরবর্তী ফরয কাজ রুকুর সাথে সিজদা আদায়ের নিয়্যত করে নিলেও তেলাওয়াতে সিজদা আদায় হয়ে যাবে পৃথকভাবে সিজ্‌দা করা লাগবে না। (নূরুল আনোয়ার)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নামাযের সুন্নাত কাজসমূহের বিবরণ

১। তাক্‌বীরে তাহরীমা বলার সময় পুরুষদের কানের লতি পর্যন্ত ,এবং মেয়েলোকদের কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠান ছুন্নাত, তবে এক্ষেত্রে গ্রহণীয় মতানুযায়ী পুরুষলোকদের জন্য হাত উঠিয়ে কানের লতি স্পর্শ করতঃ তাকবীর বলাটাই সুন্নাত।[১]

২। তাকবীর বলার সময় উভয় হাতের আঙ্গুলী সমূহ বিস্তার না করে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখাটাই সুন্নাত।

৩। তাকবীর বলার সময় মাথা ঝুকানো সুন্নাতের খেলাফ।[২]

৪। তাকবীর বলার পর পুরুষদের নাভীর নীচে আর মেয়ে লোকদের সীনার উপর বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাত রেখেই হাত বাঁধা সুন্নাত। হাত বাঁধার ক্ষেত্রে পুরুষ লোকদের ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি বেষ্টন করে ধরতে হয় এবং বাকী তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপরে রাখতে হয়। (বাহরুর রায়েক)

এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, মক্কা শরীফ মদীনা শরীফের মসজিদ সমূহে অনেক পুরুষ মুসাল্লী ও নিয়্যত করার পর সীনার উপর হাত রেখে যে নিয়্যত বাঁধে-তা আমাদের হানাফী মাজহাব অনুসারে নয় বরং শাফেয়ী-হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী মুসাল্লীরাই এভাবে বেঁধে থাকে। আমাদের হানাফী মাজহাবের অনুসারী ভায়েরা আমাদের মাজহাবের হাদীস শরীফ ভিত্তিক পদ্ধতি তথা নাভীর নিচেই হাত বাঁধ্‌বে।[৩]

✪ তাকবীর শেষে হাত বাঁধার পর দোয়ায়ে ছানা তথা সুবহা নাকা আল্লাহুম্মা.... শেষ পর্যন্ত পাঠ করা সুন্নাত।

টীকা ঃ

(১) وَالْمُرَادُ بِالْمُحَاذَاةِ اَنْ يَمَسَّ بِاِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ لِيَتَيَقَّنَ بِمُحَاذَاةِ يَدَيْهِ بِاُذُنَيْهِ كَمَا ذُكِرَ فِىْ النِّقَايَةِ ـ (بحر الرائق)

(২) وَاَنْ لَايُطَاطِئَ رَأْسَهُ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ فَاِنَّهُ بِدْعَةٌ ـ (تنوير الابصار)

(৩) وَيَسُنُّ وَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى تَحْتَ سُرَّتِهِ لِحَدِيْثِ عَلِيٍّ رضى الله عنه اَنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيُمْنٰى عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ ـ (مراقى الفلاح)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ মাসবুক মুছাল্লী তথা যে লোক ইমামের সাথে প্রথম রাকাত পায়নি-ইমাম ছালাম ফিরিয়ে নেওয়ার পর ঐ মুসাল্লী ছুটে যাওয়া রাকাত আদায় করার জন্য যখন দাড়াবে তখন সর্ব প্রথম তাকেও দোয়ায়ে ছানা পড়ে নিতে হবে। (গনিয়া)

✪ একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি, আর জমাত সহকারে নামায আদায়ের বেলায় শুধু ইমামের দোয়ায়ে ছানা পাঠের পর শুধুমাত্র ১ম রাকাতে আউজুবিল্লাহ .... রাজীম ও বিসমিল্লাহির........রাহীম পাঠ করা এবং প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা পাঠের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত ।[১]

✪ চার রাকাতী বা তিন রাকাতী ফরয নামাযের শেষ দু'রাকাত কিংবা এক রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা (আলহাম্দু) পাঠ করা সুন্নাত। (হেদায়া, মুনিয়া ইত্যাদি)

✪ সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে জমাতের নামাযে ইমাম ও-মুক্তাদী উভয়ের এবং একাকী নামায আদায়কারী মুসাল্লির চুপে চুপে 'আ-মীন বলা সুন্নাত।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মাসজিদ সমূহে যে, উচ্চস্বরে আ-মীন বলা হয় তা আমাদের হানাফী মাজহাব অনুসারে নয় বরং শাফেয়ী-হাম্বলী ইত্যাদি মাজহাবের নিয়ম অনুসারেই বলা হয়, সুতরাং আমরা হানাফী মাজহাবের অনুসারীদের কে সব সময় নিরবেই "আমীন" বলে যেতে হবে-উচ্চ স্বরে নয়।

✪ রুকুতে তিন বার (পাঁচ বার এবং শেষ সংখ্যায় সাত বার পর্যন্ত) ছুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" এবং ছজদারত অবস্থায়ও ৩বার ৫ বার এবং শেষ সংখ্যায় ৭ বার পর্যন্ত সুবহানা রাব্বীয়াল আলা" পাঠ করা সুন্নাত।

✪ রুকু হতে উঠার সময় জমাতের নামাযে শুধু ইমাম সাহেবেরই "ছামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলা-আর মুক্তাদিগণের শুধু রাব্বানা লাকাল হামদ অথবা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দা এবং একাকী নামায আদায়কারীর সামি-আল্লাহু লিমান্ হামিদা ও আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল্ হাম্দ এ উভয়টি বলা সুন্নাত।

✪ সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাটু অতঃপর দু'হাত এরপর যথাক্রমে নাক ও কপাল জমিনে রাখা-আর ছিজদা হতে উঠার সময় এর বিপরীত তথা প্রথমে কপাল অতঃপর নাক, এরপর দু'হাত এবং সবশেষে দু'হাটু উঠানো সুন্নাত।

✪ বৈঠকের অবস্থায় পুরুষের ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখা এবং বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তাতে ভর দিয়ে বসা সুন্নাত।

✪ আর মেয়ে লোকদের উভয় পায়ের পাতা ডান পার্শ্বে ছড়িয়ে দিয়ে বাম অংশের উপর ভর দিয়ে বসা সুন্নাত।

টীকা : (১) وَهِيَ اَيْ اَلتَّسْمِيَةُ فِيْ اَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ سُنَّةٌ (حليه مراقى الفلاح)

✪ উভয় ছিজদা আদায় করে নেওয়ার পর পরবর্তী রাকাত আদায় করার জন্য দাড়ানোর সময় হাটুদ্বয়কে উভয় পাঞ্জা দ্বারা মজবুত করে ধরেই দাড়ানো সুন্নাত।[১]

✪ নামাযের বসা অবস্থায় রানের উপর হাতের তালু স্বাভাবিক ভাবে বিছিয়ে রাখা সুন্নাত।

✪ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং অতঃপর দোয়ায়ে মাসুরা পাঠ করা সুন্নাত।

✪ সালাম ফিরানোর সময় প্রথমে ডানে অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরান সুন্নাত।

✪ ইমাম হলে উচ্চস্বরে মুকতাদী ও একাকী নামায আদায়কারী চুপে চুপে "আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ" এ বাক্য বলেই নামায শেষ করা সুন্নাত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দরূদ-ছালামের ফাজায়েল ও মাছায়েল

রহ্মাতুল্ লিল্ আলামীন্ শাফীউল্ মুজনেবীন নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পেশ করার ফাযীলত-মাহাত্ম্য বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্বয়ং মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাজেলকৃত পবিত্র কোরআনের মহা বানীটিরই উল্লেখ করতে হয়।

কারণ, কোন বিষয়ের ফযীলত, মাহাত্ম্য বর্ণনার ক্ষেত্রে মহা মহিম প্রভু আল্লাহ পাকের বানীই হচ্ছে সবচাইতে অধিক উৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম দলিল। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালামের উল্লেখ করা হচ্ছে।

পবিত্র কালামে মাজিদে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রেমাস্পদ নবী (সঃ)-এর শানে এরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

সরল অর্থ : নিশ্চয় মহান আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী প্রিয় নবী (সঃ) এর উপর ছালাত (দরূদ) প্রেরণ করে যাচ্ছেন, হে মোমিনগণ তোমরা ও প্রিয় নবী (সঃ) এর উপর দরূদ পেশ করতে থাক এবং (স্বশ্রদ্ধ) ছালাম নিবেদন করে যাও।

টীকা : (১)

(١) لِحَدِيْثِ اَبِىْ دَاوُدَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ فِى الصَّلٰوةِ / وَفِىْ حَدِيْثِ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ فِىْ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى الله عليه وسلم اِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى فَخِذَيْهِ (بحر الرائق) اَحَدُهُمَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَنَا (شامى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাবীবে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের শানে নাজেল কৃত উক্ত আয়াতে কারীমা খানা যদিও আমরা অহরহ তেলাওয়াত করে থাকি কিন্তু এর নিগূঢ় তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি আমরা মোটেও দৃষ্টি দিইনা।

তাই পাঠক সমাজ আজকের এ আলোচনার ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতে কারীমার প্রতি ঈমান ও মুহাব্বত পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে একটু লক্ষ্য করুন ঃ আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বীয় কালামে পাকে অসংখ্য আহকাম ও বিধানাবলী পালনের জন্য আমাদের কে র্নিদেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে অনেক নবী রাসুল আলাইহিমু চ্ছালামগনের উচ্চ শান-মান নিয়ে ও তিনি কোরআন কারিমের বহু জায়গায় আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তিনি কোন আহ্কাম-বিধানের ঘোষণা দানের বেলায় একথা বলেননি যে, আমি আল্লাহ নিজেও একাজটি করে থাকি সুতরাং তোমরাও এ কাজটি করে যাও, একমাত্র প্রিয় নবী (সঃ) এর উপর ছালাত (দরূদ) পাঠের বেলাতেই এ কথাটি বলেছেন।

সম্মানিত পাঠক!

যে কাজটি স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত করে থাকেন সে কাজটি কত অধিক গুরুত্বর্পূণ ও মর্যাদাশীল হয়ে থাকবে তা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

মূলতঃ এ উচ্চ শান-মর্যাদা ও বৈশিষ্ঠাবলী একমাত্র আমাদের মহান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের প্রতি তা'জীম- প্রশংসা মূলক এ দরূদ পাঠের হুকুম আদেশ ঘোষণার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছে।

মহান খালেক ও মালিক আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিকট প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের শান-মর্যাদা কত অধিক তা এ আয়াতের দ্বারা বুঝে নিতে পারেন।

আরো লক্ষ্যনীয় যে, উক্ত আয়তে করিমায় শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ও مُضَارِعْ এর صِيْغَةْ (শব্দ) يُصَلُّوْنَ ব্যবহার করা হয়েছে–যা বালাগত ও নাহশাস্ত্রের সূত্র অনুসারে اِسْتِمْرَارْ ও دَوَامْ অর্থাৎ কাজটি সদা-সর্বদা আদায় হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতামণ্ডলীকে নিয়ে তার মাহ্বুব নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি সাময়িক ভাবে নয় বরং অনন্তকাল থেকে সদা সর্বদা ছালাত (দরূদ) বর্ষনের কাজ অব্যাহত রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখবেন।[১]

টীকা ঃ ৯

(১) وَالْآيَةَ بِصِيْغَةِ الْمُضَارِعَةِ الدَّالَّةِ عَلٰى الدَّوَامِ وَالْإِسْتِمْرَارِ لِتَدُلَّ عَلٰى أَنَّهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَجَمِيْعُ مَلَائِكَتِهٖ يُصَلُّوْنَ عَلٰى نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم دَائِمًا اَبَدًا (القول البديع فى الصلوة على الحبيب الشفيع)

পাঠক মণ্ডলী!

আরো উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে কারিমায় "ছালাত' (দরূদ) প্রেরণ বা পাঠ করার সর্ম্পক যেহেতু একাধারে মহামহিম প্রভু আল্লাহ পাকের সাথে এবং তারই সৃষ্ট ফেরেশতামণ্ডলী ও মানুষ তথা আল্লাহর বান্দা 'মো'মেন গণের সাথে রয়েছে।

সে কারণে "ছালাত' পেশ কারী সত্ত্বার মধ্যে পার্থক্য থাকার ফলে ছালাত প্রেরণের অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ও পার্থক্য হবে।

ইমাম ছাখাভী (রহঃ) বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ يَخْتَلِفُ حَالُهَا بِحَسْبِ حَالِ الْمُصَلِّىْ وَالْمُصَلِّىْ لَهٗ وَالْمُصَلّٰى عَلَيْهِ

অর্থাৎ (১) ছালাত আদায় কারী কিংবা পাঠকারী (২) যার জন্য ছালাত আদায় করা হচ্ছে ও (৩) যার উপর ছালাত পাঠ করা হচ্ছে এ তিন অবস্থা ভেদে ছালাতের অর্থ ও তাৎপর্যাবলীও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীছ জাকারিয়া ছাহারান পুরী ফজায়েলে দরূদ গ্রন্থে বলেন ঃ

صاحب روح البیان لکھتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے اور وہ مقام شفاعت ہے اور ملئکہ کے درود کا مطلب انکی دعاکرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کیلئے اور حضور صہ کی امت کیلئے استغفار اورمؤمنین کے درود کامطلب حضور صہ کا اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور صہ کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف ہے ۔

অর্থাৎ বিশ্বখ্যাত তাফছীর গ্রন্থ "রূহুল বয়ান"-এর প্রণেতা লিখেছেন ঃ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক দরূদ প্রেরণের তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহ জাল্লা শানুহু কর্তৃক প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে "মাকামে মাহমুদ" তথা আল্লাহ কর্তৃক ওয়াদাকৃত সর্বোচ্চ প্রশংসিত পদ মর্যাদায় ও স্তরে পৌছিয়ে দেওয়া, যাতে প্রিয় নবী (সঃ) হাশরের কঠিন বিচার দিবসে গুনাহগার উম্মাতদের জন্য মহা ক্ষমতাধর প্রভু আল্লাহর দরবারে শাফাআত সুপারিশ করতে পারেন। আর ফেরেস্তাদের দরূদ পাঠ করার তাৎপর্য হলো হুজুর আকদাছ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উচ্চ মর্তবা আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা ও প্রিয় নবী (সঃ) এর উম্মাতের গুনাহ ক্ষমা চাওয়া।

আর মোমিনগণের "ছালাত (দরূদ)" পেশ করার তাৎপর্য হল হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি অগাধ ভক্তি অনুরক্তির প্রকাশ করা এবং প্রিয় নবী (সঃ) এর অনুপম অতুলনীয় খোদা প্রদত্ত গুণাবলীর সর্বদা তাজকেরা-চর্চা ও আলোচনা করা এবং তার অনুসরণ করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩-ইমাম ছাহল্ ইবনে মুহাম্মাদ(রহঃ) বলেনঃ-

هٰذَا التَّشْرِيْفُ الَّذِىْ شَرَّفَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ الاية اَتَمُّ وَاَجْمَعُ مِنْ تَشْرِيْفِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاَمْرِ الْمَلٰۤئِكَةِ لَهٗ بِالسُّجُوْدِ لِاَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ مَعَ الْمَلٰۤئِكَةِ فِىْ ذٰلِكَ التَّشْرِيْفِ وَ قَدْ اَخْبَرَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَنْ نَفْسِهٖ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَنِ الْمَلٰۤئِكَةِ فَتَشْرِيْفٌ يَصْدُرُ عَنْهُ اَبْلَغُ مِنْ تَشْرِيْفٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَلٰۤئِكَةُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَعَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ. (قول البديع)

অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেস্তাদের দ্বারা সেজদা প্রদানের মাধ্যমে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এর চেয়ে অনেক অধিকতর ও উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-য়িকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান্ নবীয়্" আয়াতে কোরআন নাজেল করতঃ প্রিয়নবী (সঃ) এর উপর দরূদ-ছালাম পাঠের বিধান দ্বারা। কেননা প্রিয় নবী (সঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা ও শরীক আছেন।

পক্ষান্তরে হযরত আদম (আঃ) এর প্রতি যে সম্মান দেখানো হয়েছে তা শুধু ফেরেস্তাদের মাধ্যমেই ছিল এবং সেখানে আল্লাহ তাআলার শরীক থাকার প্রশ্নই আসে না।

মোটকথা হচ্ছে আলোচ্য আয়াতে কারিমায় উল্লেখিত صلوة (ছালাত) শব্দটি لفظ عام অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক আরবী শব্দ, মোহাদ্দেছীনে কেরাম মুফাচ্ছেরীন ইজাম ও ইসলামের অপরাপর মহামনীষীগণ, অত্র ছালাত শব্দের অনেক অর্থ লিখেছেন, তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ জাল্লাশানুহু, ফেরেস্তা মণ্ডলী ও মো'মেনগণের শান অনুযায়ীই ছালাতের অর্থ নিতে হবে।

এ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের ১ম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে ছালাত সম্পর্কে এখানে ও কিছুটা সবিস্তারে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

হযরত ইমাম ছাখাবী (রহঃ) বলেন ঃ

فَفِى الْبُخَارِىْ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَنَّ مَعْنٰى صَلَاةِ اللّٰهِ عَلٰى نَبِيِّهٖ ثَنَاؤُهٗ عَلَيْهِ عِنْدَ مَلٰۤئِكَتِهٖ وَمَعْنٰى صَلَاةِ الْمَلٰۤئِكَةِ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ لَهٗ وَكَذَا

رَوَيْنَاهُ فِىْ اَوَاخِرِ الثَّامِنِ مِنْ حَدِيْثِ الْخُرَاسَانِىِّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ فِىْ قَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ قَالَ صَلَاةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ثَنَاؤُهٗ عِنْدَ مَلٰۤئِكَتِهٖ وَصَلَاةُ الْمَلٰۤئِكَةِ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ لَهٗ وَ قَوْلُهٗ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ اُدْعُوْا لَهٗ.

وَ تُسْتَعْمَلُ الصَّلَاةُ بِمَعْنَى الْاِسْتِغْفَارِ اَيْضًا . وَ مِنْهُ قَوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنِّىْ بُعِثْتُ اِلٰى اَهْلِ الْبَقِيْعِ لِاُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ . فَاِنَّهٗ فُسِّرَ فِى الرِّوَايَةِ الْاُخْرٰى اُمِرْتُ اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهُمْ .

وَ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْبَرَكَةِ وَ مِنْهُ قَوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى ...... وَ بِمَعْنَى الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ .

সার অর্থ ঃ হযরত ইমাম বোখারী (রহঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি টেনে বোখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের প্রতি মহান আল্লাহর ছালাত নাজিলের অর্থ হল আল্লাহ জাল্লা শানুহু কর্তৃক ফেরেস্তা সম্প্রদায়ের সামনে প্রিয় নবী (সঃ) এর প্রশংসা ও গুণগান করা।

আর ফেরেস্তাদের দরূদ পাঠ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) এর উচ্চ শান মর্যাদার উত্তরোত্তর আরও অধিক বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া-প্রার্থনা করে যাওয়া।

হযরত রাবী ইব্নে আনাছ (রহঃ) থেকে ঐ একই রকমের অর্থের কথা বর্ণিত আছে। তবে উহাতে মো'মেনগণের ছালাত পাঠের অর্থ ফেরেস্তাদের অনুরূপ দোয়া-প্রার্থনা করে যাওয়াটারই উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইমাম ছাখাভী (রহঃ) আরও বলেন ঃ

ছালাত শব্দটি গুনাহ ক্ষমা চাওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) এর বানী "আমাকে জান্নাতুল বাকী"র, কবরবাসীদের উপর ছালাত পাঠের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) অন্য হাদীছে উক্ত "ছালাতের" তাফছীর স্বরূপ এরশাদ করেছেন ঃ আমি জান্নাতুল বাকীর কবর বাসীদের মাগফেরাত কামনার ব্যাপারে আদেশ পেয়েছি। এখানে ছালাত শব্দের অর্থ যে, মাগফেরাত কামনা করা এটা স্বয়ং আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ)-এর বাণী দ্বারা প্রমানিত।

وَ عِنْدَ ابْنِ اَبِىْ حَاتِمٍ فِىْ تَفْسِيْرِهٖ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ مُقَاتِلِ وَابْنِ حَيَّانٍ هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ يَغْفِرُ لَكُمْ وَ يَاْمُرُ الْمَلٰۤئِكَةَ اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لَكُمْ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ হযরত ছাঈদ ইবনে যোবাইর (রহঃ) ও মোকাতিল ইবনে হায়্যান (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, কোরআন কারিমের আয়াত- هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَ مَلٰئِكَتُهٗ -এর মধ্যে ছালাত শব্দের অর্থ মহান আল্লাহ কর্তৃক গুনাহ মাফ করা, আর ফেরেস্তাদের ছালাতের অর্থ গুনাহ মাফ চাওয়া।

অর্থাৎ ঐ মহান সত্ত্বা (আল্লাহ) যিনি তোমরা মো'মেনদের গুনাহ পাপ সমূহ মাফ করে থাকেন, আর তাঁর ফেরেশতামন্ডলী তোমরা মো'মেনদের গুনাহ মাফ চাইতেই আছেন।

এভাবে ছালাত শব্দ বরকত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ)-এর বাণী اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى হে আল্লাহ আবু আওফার পরিবারের উপর ছালাত নাজেল করুন এর মুরাদী অর্থ হচ্ছে, এদের উপর বরকত নাজেল করুন।

এমনিভাবে "ছালাত' শব্দটি রহমত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেক ঈমানদার আশেকে রাসূল হওয়ার দাবীদার ভাইদেরকে অবশ্যই স্মরণ ও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ফেরেস্তামণ্ডলী কর্তৃক ছালাত পাঠ করাটা আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জন্য গুনাহ মাফ চাওয়ার অর্থে কখন ও হতে পারেনা। কারণ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ মাছুম তথা নিস্পাপই বটে।

তাই ইসলামের কোন মোহাক্কেক্ব মনীষী নবীপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামার জন্য গুনাহ-পাপ মাফ চাওয়ার অর্থে এ "ছালাত' শব্দের প্রয়োগ-ব্যবহার কোথাও দেখাননি- "وَصَلٰوةُ الْمَلٰئِكَةِ الْاِسْتِغْفَارُ" যে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সেখানে আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) এর গুনাহ মাফ এর জন্য নয় বরং উম্মাত মো'মেনিনের গুনাহ মাফ চাওয়ার অর্থে কিংবা আল্লাহর নবীর উপর যারা দরূদ ছালাম পেশ করে থাকেন তাদের পাপ-গুনাই ফেরেস্তারা সর্বদা মাফ চেয়ে থাকেন বলে বলা হয়েছে ঃ

এ বিশুদ্ধ মতের সমর্থনে ইসলামী বিশ্বের কয়েক খানা বিশুদ্ধ তাফছীরও প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দরূদ শরীফ এবং শান-মর্যাদা বর্ণনা বিষয়ক গ্রন্থ সমূহের উদ্ধৃতি পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে ঃ

✪ "সর্বজন মান্য তাফছীর গ্রন্থ "বায়জাবী" শরীফে উল্লেখ আছে ঃ

(اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ) يَعْتَنُوْنَ بِاِظْهَارِ شَرَفِهٖ وَتَعْظِيْمِ شَانِهٖ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ) اِعْتَنُوْا اَنْتُمْ اَيْضًا فَاِنَّكُمْ اَوْلٰى بِذٰلِكَ

✪ তাফছীর "রূহুল মাআনীতে' বর্ণিত আছে ঃ

وَاخْتَلَفُوْا فِىْ مَعْنٰى الصَّلٰوةِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ مَلٰئِكَتِهٖ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ صلى الله عليه وسلم عَلٰى اَقْوَالٍ . فَقِيْلَ هِىَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهٗ عَلَيْهِ عِنْدَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ تَعْظِيْمِهٖ وَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ وَ غَيْرِهٖ وَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ وَ جَرٰى عَلَيْهِ الْحَلِيْمِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَ تَعْظِيْمُهٗ تَعَالٰى اِيَّاهُ فِى الدُّنْيَا بِاِعْلَاءِ ذِكْرِهٖ وَ اِظْهَارِ دِيْنِهٖ وَ اِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيْعَتِهٖ وَ فِى الْاٰخِرَةِ بِتَشْفِيْعِهٖ فِىْ اُمَّتِهٖ وَاِجْزَالِ اَجْرِهٖ وَ مَثُوْبَتِهٖ وَاِبْدَاءِ فَضْلِهٖ لِلْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَ تَقْدِيْمِهٖ عَلٰى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالشُّهُوْدِ ...... وَ هِىَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اَلدُّعَاءُ لَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

✪ তাফছীর জালালাইন শরীফের শরাহ "তাফছীর ছাভী' শরীফে উল্লেখ আছে-

(قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ) ...... هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْهَا اَعْظَمُ دَلِيْلٍ عَلٰى اَنَّهٗ صلى الله عليه وسلم مَهْبَطُ الرَّحْمَاتِ اَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْاِطْلَاقِ اِذِ الصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى نَبِيِّهٖ رَحْمَتُهُ الْمَقْرُوْنَةُ بِالتَّعْظِيْمِ وَ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ النَّبِىِّ مُطْلَقُ الرَّحْمَةِ (لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَ مَلٰئِكَتُهٗ) .... فَقَدْ وَسِعَتْ رَحْمَةُ النَّبِىِّ كُلَّ شَىْءٍ تَبَعًا لِرَحْمَةِ اللّٰهِ فَصَارَ بِذٰلِكَ مَهْبَطُ الرَّحْمَاتِ وَ مَنْبَعُ التَّجَلِّيَاتِ (قَوْلُهٗ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ) اَىْ اُدْعُوْا لَهٗ بِمَا يَلِيْقُ بِهٖ وَ حِكْمَةُ صَلَاةِ الْمَلٰئِكَةِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى النَّبِىِّ تَشْرِيْفُهُمْ بِذٰلِكَ حَيْثُ اقْتَدَوْا بِاللّٰهِ فِىْ مُطْلَقِ الصَّلٰوةِ وَ اِظْهَارُ تَعْظِيْمِهٖ صلى الله عليه وسلم وَ مُكَافَاةُ بِبَعْضِ حُقُوْقِهٖ عَلَى الْخَلْقِ لِاَنَّهُ الْوَاسِطَةُ الْعُظْمٰى فِىْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَلَتْ لَهُمْ وَ حَقٌّ عَلٰى مَنْ وَصَلَ لَهٗ نِعْمَةٌ مِنْ شَخْصٍ اَنْ يُكَافِئَهٗ .

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ তাফছীর "রূহুল বয়ান' এ উল্লেখ আছে ঃ

وَقَالَ بَعْضُهُمُ الصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِمَعْنَى الرَّحْمَةِ لِغَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِمَعْنَى التَّشْرِيْفِ بِمَزِيْدِ الْكَرَامَةِ لِلنَّبِيِّ وَالرَّحْمَةُ عَامَّةٌ وَالصَّلٰوةُ خَاصَّةٌ كَمَا يَدُلُّ الْعَطْفُ عَلَى التَّغَايُرِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى (اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ)

وَ قَالَ بَعْضُهُمْ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ النَّبِيِّ رَحْمَةٌ وَ عَلَى النَّبِيِّ ثَنَاءٌ وَمِدْحَةٌ قَوْلًا وَ تَوْفِيْقٌ وَ تَأْيِيْدٌ فِعْلًا وَ صَلٰوةُ الْمَلٰئِكَةِ عَلٰى غَيْرِ النَّبِيِّ اِسْتِغْفَارٌ وَ عَلَى النَّبِيِّ اِظْهَارُ الْفَضِيْلَةِ وَالْمَدْحِ قَوْلًا وَالنُّصْرَةُ وَالْمُعَاوَنَةُ فِعْلًا وَ صَلٰوةُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى غَيْرِ النَّبِيِّ دُعَاءٌ وَعَلَى النَّبِيِّ طَلَبُ الشَّفَاعَةِ قَوْلًا وَ اِتِّبَاعُ السُّنَّةِ فِعْلًا -

(يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ) اِعْتَنُوْا اَنْتُمْ اَيْضًا بِذٰلِكَ فَاَنْتُمْ اَوْلٰى بِهٖ قَالَ فِيْ شَرْحِ الْكَشَّافِ وَ غَيْرِهٖ مَعْنٰى قَوْلِهٖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ عَظِّمْهُ فِى الدُّنْيَا بِاِعْلَاءِ دِيْنِهٖ وَاِعْظَامِ ذِكْرِهٖ -

✪ "শেফা নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন ঃ

قَوْلُهٗ (اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ) اَىْ يُعَظِّمُوْنَهٗ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ..... (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض مَعْنَاهُ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُبَارِكُوْنَ عَلَى النَّبِيِّ) اَىْ اَللّٰهُ يُبَارِكُ لَهٗ فِيْ اَمْرِهٖ وَيُزِيْدُ فِيْ قَدْرِهٖ وَ تَدْعُوا الْمَلٰئِكَةُ رَبَّهٗ اَنْ يَرْفَعَ ذِكْرَهٗ وَ يُظْهِرَ اَمْرَهٗ .... (قِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يَتَرَحَّمُ عَلَى النَّبِيِّ) اَىْ يُبَالِغُ فِيْ اِنْزَالِ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِ فَكَاَنَّهٗ يَطْلُبُ مِنْ نَفْسِهِ الرَّاْفَةَ اِلَيْهِ (وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْعُوْنَ لَهٗ) اَىْ وَ يَتَوَاضَعُوْنَ لَدَيْهِ (قَالَ الْمُبَرِّدُ وَ اَصْلُ الصَّلٰوةِ التَّرَحُّمُ وَ هِيَ (مِنَ اللّٰهِ رَحْمَةٌ) اَىْ اِنْزَالُهَا وَ اِيْصَالُهَا (وَ مِنَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْمَلٰئِكَةِ رِقَّةٌ) اَىْ مُوْجِبَةٌ لِلرَّحْمَةِ (وَاسْتِدْعَاءٌ لِلرَّحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى) اَىْ عَلٰى نَبِيِّ الْاُمَّةِ وَ كَاشِفِ الْغُمَّةِ وَ قَدْ وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ صِفَةُ صَلَاةِ الْمَلٰئِكَةِ عَلٰى مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ فَهٰذَا دُعَاءٌ) لٰكِنَّهٗ يَلِيْقُ بِالْاُمَّةِ وَلَا يَبْعُدُ اَنْ يَكُوْنَ دُعَاءُهُمْ لِلنَّبِيِّ بِاَنْ يَقُوْلُوْا - اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ شَانَهٗ وَ تَمِّمْ بُرْهَانَهٗ وَ اَكْثِرْ اُمَّتَهٗ وَ اَظْهِرْ مِلَّتَهٗ وَ اَرْفِعْ دَرَجَتَهٗ (وَ قَالَ بَكْرُ الْقُشَيْرِيُّ اَلصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِمَنْ دُوْنَ النَّبِيِّ) اَىْ لِغَيْرِهٖ (رَحْمَةٌ) اَىْ عَامَّةٌ (وَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم تَشْرِيْفًا) وَ هُوَ رَحْمَةٌ خَاصَّةٌ (وَ زِيَادَةُ تَكْرِمَةٍ وَ قَالَ اَبُوالْعَالِيَةِ صَلَاةُ اللّٰهِ ثَنَاؤُهٗ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلٰئِكَةِ) اَىْ الْمُقَرَّبِيْنَ (وَ صَلَاةُ الْمَلٰئِكَةِ الدُّعَاءُ) اَىْ بَارِ اَىْ بِزِيَادَةِ الْكِرَامِ وَ بِالْاِنْعَامِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -

✪ শেফা গ্রন্থের শরাহ "নাছীমুর রিয়াদ" এ বলা হয়েছে ঃ

(وَفِيْ حُكْمِ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيْمِ) وَالصَّلٰوةُ اَصْلُ مَعْنَاهَا الدُّعَاءُ وَالْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ .... (قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ الْاٰيَةَ) .... وَهٰذِهِ الْاٰيَةُ مَدَنِيَّةٌ اَخْبَرَ اللّٰهُ عِبَادَهٗ فِيْهَا بِشَرْفِ مَنْزِلَتِهٖ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُثْنُوْنَ عَلَيْهِ فِى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى ثُمَّ اَمَرَ اَهْلَ الْعَالَمِ السُّفْلٰى بِاَنْ يَفْعَلُوْا كَفِعْلِهِمْ -

✪ আল্লামা ইবনুল কাইয়িম- جلاء الافهام গ্রন্থে বলেন ঃ

فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْ مَعْنَى الصَّلٰوةِ مِنْهُ سُبْحَانَهٗ عَلٰى اَقْوَالٍ -

اَحَدُهَا : اِنَّهَا رَحْمَةٌ -

عَنِ الضَّحَّاكِ - قَالَ صَلَاةُ اللّٰهِ رَحْمَتُهٗ وَ صَلَاةُ الْمَلٰئِكَةِ الدُّعَاءُ -

وَقَالَ الْمُبَرِّدُ - اَصْلُ الصَّلٰوةِ الرَّحْمَةُ - فَهِيَ مِنَ اللّٰهِ رَحْمَةٌ وَ مِنْ

الملائكة رحمة واستدعاء الرحمة من الله . وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتاخرين .

الوجه السابع ان الصلوة لا بد فيها من كلام . فهى ثناء من المصلى على من يصلى عليه و تنويه به واشارة لمحاسنه و ما فيه و ذكره .

ذكر البخارى رح فى صحيحه عن ابى العالية . قال . صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة . عن ربيع بن انس عن ابى العالية ان الله و ملائكته يصلون على النبى . قال صلوة الله عز و جل ثناؤه عليه و صلاة الملائكة عليه الدعاء .

فاذا كان معنى الصلوة هو الثناء على الرسول والعناية به و اظهار شرفه و فضله و حرمته كما هو المعروف من هذه اللفظة . لم يكن الصلوة فى الاية مشتركا محمولا على معنييه بل يكون مستعملا فى معنى واحد و هذا هو الاصل فى الالفاظ .

.... ان الله سبحانه امر بالصلوة عليه عقيب اخباره بانه وملائكته يصلون عليه . والمعنى انه اذا كان الله و ملائكته يصلون على رسوله فصلوا انتم ايضا عليه فانتم احق بان تصلوا عليه و تسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والاخرة . و من المعلوم انه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم . فينتقض اللفظ والمعنى . فيصير التقدير الى ان الله و ملائكته ترحم و يستغفرون لنبيه فادعوا انتم له و سلموا . و هذا ليس مراد الاية قطعا . بل الصلوة مامور بها فيها هى الطلب من الله ما اخبر به عن صلاته و

صلاة ملائكته و هى ثناء عليه و اظهار لفضله و شرفه وارادة تكريمه و تقريبه . (جلاء الافهام صفحه ۷۸-۷۹)

o নূরুল আনোওয়ার গ্রন্থে আল্লামা মোল্লা জিউন (রহ) এর বক্তব্য ঃ

فيكون المعنى ان الله و ملائكته يعتنون بشانه يايها الذين امنوا اعتنوا ايضا بشانه و ذلك الاعتناء من الله تعالى رحمة و من الملائكة استغفار و من المؤمنين دعاء .

উক্ত বক্তব্যের জবাবে توضيح -গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

فاجاب عنه بقوله يصلون على النبى و هو الثناء اى تعظيم بحاله اى بشانه و ذلك لان سياق الاية لايجاب اقتداء المؤمنين بالله تعالى و ملائكته فى الصلوة على النبى فلا بد من اخذ معنى الصلوة عن الجميع لانه لو قيل ان الله يرحم النبى و ملائكته يستغفرون له يا ايها الذين امنوا ادعوا له . كان هذا الكلام فى غاية الركاكة . لان ايجاب الاقتداء فى مثله لازم فلا يصلح فى القران فلا بد من اتحاد معنى الصلوة من الجميع و هو الثناء بحاله عليه الصلوة والسلام . (توضيح تلويح . حاشية نور الانوار)

توضيح تلويح গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে ঃ

فكذا المراد ههنا ان الله تعالى يرحم النبى و يوصل اليه من الخير ما يليق بعظمه و كبريائه والملائكة يعظمونه بما فى وسعهم فاتوا ايها المؤمنون بما يليق بحالكم من الدعاء له و الثناء عليه كان كلاما حسنا . (توضيح تلويح صفحه١٩٣)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদ শরীফ পাঠের হুকুম সম্বলিত আয়তে করিমায় ফেরেস্তা মণ্ডলীর صَلٰوةٌ পাঠের অর্থ "নবী পাক (সঃ) এর গুনা মাফ চাওয়ার অর্থে যে নয়– এটা প্রমানের জন্য উপরের উদ্বৃতি সমূহ অকৃত্রিম আশেকে রাছুল বিজ্ঞ জ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্টই বটে।

পাঠক মন্ডলী,

আরও একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, আমরা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (হে আল্লাহ ! আপনি আমাদের আকা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর ছালাত বর্ষণ করুন) বলে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর যে ছালাত (দরূদ) পেশ করে যাচ্ছি এর অর্থ ও উদ্দেশ্য কখনও এ হতে পারেনা যে, আমরা আল্লাহর দরবারে প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্য সুপারিশ করে যাচ্ছি। কারণ আমাদের মত পাপী-তাপী উম্মাত ঐ পূত পবিত্র নিষপাপ মহা "নবী সত্ত্বার' জন্য সুপারিশ করতে পারিনা বরং তিনিই তো আমাদের জন্য সুপারিশ করে যাচ্ছেন ও করবেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ইমাম হাফিজ ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুছ্ছালাম (রহ) বলেন যে, আমাদের দরূদ পাঠ করার উদ্দেশ্য মোটেই সুপারিশ করা নয় বরং আল্লাহ তাআলা আমাদের কে কল্যাণ কারী দাতার দানের বদলা শোধ করার জন্য আদেশ করেছেন। আর মহান রব প্রতি পালক আল্লাহ তাআলার পরে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দান– এহছানই হচ্ছে আমাদের উপর সব চেয়ে বেশী। আকাও মাওলা শাহিন্‌শাহে দোআলম (সঃ) এর চেয়ে বেশী বড় দাতা ও কল্যাণ কারী আমাদের জন্য আর কেউ হতে পারে না। এর কারণ একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসার কথা, প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ঐ মহান দান এহছানের বদলা পেশ করার জন্য চেষ্টা করা আমাদের জন্য ফরয। তবে নবীয়ে আকরম (সঃ) এর ঐ অপরিসীম দান এহছানের বদলা শোধ করা আমরা নগন্য উম্মাতগনের দ্বারা কস্মিন কালেও সম্ভবপর নয় ; বরং বদলা শোধ করতে আমরা সম্পূর্ণই অক্ষম।

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের ঐ মহান এহছান ও কল্যাণের বদলা পরিশোধে আমাদের এ অক্ষমতা দেখে স্বয়ং প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নবীয়ে আকরম (সঃ)-এর "হক্কে আযীম' আদায়ের উপকরণ হিসাবে ছালাত, বরকত ও ছালাম পেশ করার আদেশ টি জারী করেন। কিন্তু আমরা এত ক্ষুদ্র ও নগণ্য যে, "মহান নবী সত্ত্বার' শান মর্যাদা মাফিক ছালাত পাঠের দায়িত্বটি আদায়েও আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। এ কারনে আমরা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ বলে আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজী পেশ করে থাকি যে, হে প্রভু আল্লাহ! আপনিই আপনার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উচ্চতর শান মর্যাদা মাফিক তার উপর ছালাত বর্ষণ করতে থাকুন।[১]

টীকা ঃ

(১) وَ اَمَّا الْمَقْصُوْدُ بِهَا فَقَالَ الْحَلِيْمِىُّ اَلْمَقْصُوْدُ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ

এ দরূদ শরীফ পাঠের ক্ষেত্রে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কে আদেশ করেছেন صلوا عليه অর্থাৎ তোমরা (মো'মেন উম্মাতেরা) নবী করিম (সঃ)-এর প্রতি ছালাত পেশ করে যাও, আর আমরা এর জবাবে নিজেরা ছালাত-ছালাম প্রেরণ না করে বরং اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا محمد (হে প্রভু আল্লাহ! আপনিই আপনার নবী পাক (সঃ) এর উপর ছালাত প্রেরণ করুন) কেন বলে থাকি ?

হযরত আল্লামা ইমাম ছাখাভী (রহঃ) তার জগত খ্যাত اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ فِىْ الصَّلٰوةِ عَلَى الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ -গ্রন্থে নিজের ও আল্লামা তুরকামানী (র) এবং আল্লামা নিশাপুরী (র)-এর বক্তব্য সমূহ উল্লেখ করতঃ উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলেন ঃ–

(উনাদের জবাবের সারমর্ম হচ্ছে) আল্লাহর প্রিয় নূরানী নবী হচ্ছেন যাবতীয় পাপ-পংকিলতা থেকে সম্পূর্ণ পূত পবিত্র ও মুক্ত। আমাদের ন্যায় পাপী-তাপী উম্মাতের পক্ষে তার পূত্র পবিত্র নবী (সঃ)-এর দরবারে তার শান-মান মাফিক ভক্তি উপহারের হাদীয়া পেশ করা কোন ক্রমেই সম্ভব পর নয়। এ কারণেই আমরা মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে এই বলে আরজী পেশ করে থাকি যে, হে প্রভু আল্লাহ!

আপনি আমাদের তরফ থেকে আপনার প্রিয় রাছুল (সঃ)-এর শান-মর্যাদা মাফিক ছালাত-ছালাম বর্ষণ করতে থাকুন। তাছাড়া আল্লাহর প্রিয় হাবীব আকা ও মাওলা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সত্যিকার মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের জানা না থাকার কারণে মহান আল্লাহর হুকুম পালনের যে গুরু দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে তা যথাযথ ভাবে পালনেও আমরা অক্ষম।

টীকার বাকী অংশ

صلى الله عليه وسلم اَلتَّقَرُّبُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِاِمْتِثَالِ اَمْرِهٖ ـ وَقَضَاءُ حَقِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَ تَبِعَهُ اِبْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَيْسَتْ صَلٰوتُنَا عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه و سلم شَفَاعَةً مِنَّالَهُ فَاِنَّ مِثْلَنَا لَا يَشْفَعُ لِمِثْلِهٖ (عليه السلام) وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنَا بِالْمُكَافَاةِ لِمَنْ اَحْسَنَ اِلَيْنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا فَاِنْ عَجِزْنَا عَنْهَا كَافَيْنَاهُ ـ بِالدُّعَاءِ فَاَرْشَدَنَا اللّٰهُ لَمَّا عَلِمَ عِجْزَنَا عَنْ مُكَافَأَةِ نَبِيِّنَا اِلَى الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ لِتَكُوْنَ صَلَاتُنَا عَلَيْهِ مُكَافَاةً بِاِحْسَانِهٖ اِلَيْنَا وَاِفْضَالِهٖ عَلَيْنَا اِذْلَا اِحْسَانَ اَفْضَلَ مِنْ اِحْسَانِهٖ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُ الْبَدِيْعِ فِىْ الصَّلٰوةِ عَلَى الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপর দিকে হাবীব পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সত্যিকার শান-মর্যাদা ও হাকীকাত সম্পর্কে স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ পাক ই সব চেয়ে বেশী জ্ঞাত যেহেতু তিনিই তাঁর স্রষ্টা।

সে হিসাবে আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি তাঁর উচ্চতর শান-মর্যাদা মাফিক, ছালাত প্রেরনের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে যাওয়াটাই আমাদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হিসাবে বিবেচিত।

যাতে করে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উচ্চতর মান-মর্যাদা অনুসারে ছালাত-ছালাম পেশ করার হক কিছুটা হলেও আদায় হয়ে থাকে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে-- যেমন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেনঃ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

অর্থাৎ হে প্রভু আল্লাহ! আমি আপনার শান মর্যাদা মাফিক যথাযোগ্য প্রশংসা করতে অক্ষম, আপনার মহান জাত পাক ঐ রকমই যে রকম আপনি নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন।[১]

টীকা ঃ ৯

قُلْنَا لِاَنَّهٗ صلى الله عليه وسلم طَاهِرٌ لَا عَيْبَ فِيْهِ وَنَحْنُ فِيْنَا الْمَعَائِبُ وَالنَّقَائِصُ فَكَيْفَ يُثْنِىْ مَنْ فِيْهِ مَعَائِبُ عَلٰى طَاهِرٍ ؟ فَنَسْاَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ لِتَكُوْنَ الصَّلٰوةُ عَنْ رَبٍّ طَاهِرٍ عَلٰى نَبِىٍّ طَاهِرٍ كَذَا فِى الْمُرْغِيْنَانِىْ اِنْتَهٰى - وَنَحْوُ ذٰلِكَ مَنْقُوْلٌ عَنِ النَّسَابُوْرِى فِىْ كِتَابِهِ اللَّطَائِفِ وَالْحِكَمِ فَاِنَّهٗ قَالَ لَا يَكْفِىْ لِلْعَبْدِ اَنْ يَقُوْلَ فِى الصَّلٰوةِ صَلَّيْتُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صلعم لِاَنَّ مَرْتَبَةَ الْعَبْدِ تَقْصُرُ عَنْ ذٰلِكَ بَلْ يَسْاَلُ رَبَّهٗ اَنْ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ -

আযানের পূর্বে ছালাত-ছালাম পাঠের আলোচনা

সম্মানিত পাঠক!

এক্ষেত্রে এও উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে কারীমার হুকুমটিকে মহান আল্লাহ তাআলা مُطْلَقْ (শর্তহীন) রেখেছেন। অর্থাৎ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পাঠের এ নির্দেশটিকে কোন নির্দিষ্ট সময়, স্থান ও অবস্থার সাথে مُقَيَّدْ তথা সীমিত ও সীমাবদ্ধ করে দেননি। অর্থাৎ এ সময়ে এ অবস্থায় দরুদ ছালাম পাঠ করা যাবে এবং এ সময়ে এ অবস্থায় পাঠ করা যাবে না, এ ধরনের কোন বাধ্য-বাধকতা এবং সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, বরং দিনরাত চব্বিশ ঘন্টার যেকোন সময়ে যেকোন মূহুর্তে দরুদ-ছালাম পাঠের সুযোগ দানে অফুরন্ত ও অপরিসীম ছাওয়াব-পূন্য হাসিলের ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়েছে।

মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এ مُطْلَقْ (শর্তহীন) আদেশ বলে প্রমানিত হয় যে, শরীয়ত অসম্মত ও অসমর্থিত স্থান-কাল-পাত্র ও অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য সব সময়ে-সর্ব অবস্থায় ও সব স্থানে দরুদ-ছালাম নিবেদন করে যাওয়া মুস্তাহাব। পাঠক! তিরমিজী শরীফে উল্লেখিত হযরত উবাই উবনে কা'ব (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ শরীফ খানার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, তিনি বলেন-

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلٰوةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلٰواتِىْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَلنِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ (رواه الترمذى)

অর্থঃ হযরত উবাই ইবনে কাব (র). বলেন, আমি আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমি আপনার উপর অধিক পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করতে ইচ্ছা করি। (আপনি নির্দেশ করুন) আমি আমার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কি পরিমান সময় দরুদ শরীফ পেশ করব? নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করলেন, যত সময় তোমার ইচ্ছা হয় তত সময় ধরে দরূদ পেশ করতে থাক। আমি (পুনঃ) আরজ করলাম ইয়া রাছুলাল্লাহি! এক চর্তুথাংশ সময় ধরে আপনার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে যাব। প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করলেন, তোমার যত সময় ইচ্ছা হয়, তবে এর চেয়ে বেশী পরিমাণ সময় দরুদ শরীফ পাঠ করা তোমার জন্য বেশী উত্তম হবে। আমি পুনঃ ; আরজ করলাম আমি যদি অর্ধেক সময় ব্যয় করি, প্রতি উত্তরে প্রিয় নবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

(সঃ) এরশাদ করলেন তোমার যত ইচ্ছা হয় তবে এর চেয়ে বেশী সময় ধরে দরূদ পাঠ করলে তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে। এতে আমি পুঃ আরজ করলাম, আমি দু'তৃতীয়াংশ সময় যদি দরুদ পাঠে ব্যয় করি ? উত্তরে প্রিয় রাছুল (সঃ) এরশাদ করলেন, তোমার যত ইচ্ছা হয় তবে এর চেয়ে ও বেশী সময় দরুদ পাঠে ব্যয় করতে পারলে তোমার জন্য অধিক অধিক উত্তম হবে। এরপর আমি আরজ করলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! তাহলে আমি আমার (নফল) এবাদতের জন্য নির্ধারিত পূর্ন সময়টা আপনার উপর দরুদ শরীফ পাঠে ব্যয় করব। তখন আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করলেন, এতে আল্লাহপাক তোমার দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের দুঃশ্চিন্তা দূরীভূত করার ব্যবস্থা করবেন ও তোমার জীবনের গুনা সমূহ মাফ করে দেবেন।

উক্ত হাদীছ শরীফ এর ব্যাখ্যায় ! মুজাহেরুল হক' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

ان حضرت صلے اللہ علیہ و سلم نے انکی درخواست پر درود بھیجنے کیلئے اس وقت کا کوئ حصہ مقرر نہیں فرمایا بلکہ اسے انکے اختیار پر چھوڑ دیا ۔ (جلد اول قسط صفحہ۲۵)

এবং 'মিরকাত' গ্রন্থে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ) বলেন ঃ

وَلَمْ يَرَ النَّبِيُّ صلى الله عله و سلم اَنْ يَحُدَّ لَهُ ذٰلِكَ (مرقاة جـ٢ صفحـ٣٤٤)

অর্থাৎ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম উক্ত ছাহাবীর অনুরোধের পর দরুদ পাঠের জন্য কোন সময়াংশ নির্ধারণ করে দেননি বরং উনাকে উনার বেশী বেশী দরুদ পাঠের আগ্রহের উপরই ছেড়ে দেন।

স্বরবে নাকি নিরবে, উচ্চস্বরে নাকি নিম্নস্বরে, বসা অবস্থায় নাকি দাঁড়ানো অবস্থায়, একাকি নাকি সম্মিলিত ভাবে- কোন অবস্থায় দরুদ ছালাম পাঠ করতে হবে আয়াতে কারিমায় এ বিষয়াবলীরও কোন উল্লেখ নাই।

এ ভিত্তিতে শরীয়াতের অন্য কোন নিষেধাজ্ঞা বা প্রতিবন্ধকতার কোন কারণ পাওয়া না গেলে নির্দ্বিধায় যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়েও যে কোন স্থানে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পেশ করে যাওয়া শুধু জায়েজই নয় বরং মুস্তাহাবই বটে।

মোটকথা হচ্ছে বসা অবস্থায় যেরূপ দরুদ ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব, অনুরূপ দাঁড়ানো অবস্থায় ও দরুদ ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। নীচুরবে চুপে চুপে যেরূপ দরুদ ছালাম পাঠকরা মুস্তাহাব অনুরূপ বড় আওয়াজে উচ্চস্বরে ও দরুদ ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। একা একা যেভাবে দরুদ ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব, সেরূপ সম্মিলিত স্বরে জমাতবদ্ধ অবস্থায় ও দরুদ ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

গদ্য আকারে যেরূপ ছালাত ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব অনুরূপ পদ্য-কবিতা তথা না'ত-গজলের ধারায় ও ছালাত ছালাম পেশ করে যাওয়া মুস্তাহাব নামাযের ছালাম

ফিরানোর পরেও ছালাত-ছালাম পাঠ করে যাওয়া মুস্তাহাব।

আযানের পরে যেরূপ ছালাত ছালাম পাঠ করা ছুন্নাত, অনুরূপ আযানের আগে ও ছালাত ছালাম পেশ করে যাওয়া মুস্তাহাব।

কারণ উল্লেখিত অবস্থা ও সময় সমূহে দরুদ ছালাম পাঠের বিপক্ষে শরীয়াতের তরফ থেকে কোন প্রকারের مَوَانِعْ তথা বাঁধা-বিপত্তির কোন উল্লেখ পবিত্র কোরআন ও হাদীছ এবং ফেকাহ্ শাস্ত্র সমূহের কোথাও নাই।

যাদের অন্তর প্রকোষ্ঠে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দুশমনি বিদ্বেষ লুকায়ীত রয়েছে তারাই একমাত্র এর বিরোধিতা করে থাকে।

এক শ্রেণীর আল্লামা, মুফ্তী ও আলেম হওয়ার দাবীদার লোকেরা দরুদ- ছালাম পাঠের কোন কোন সময় ও অবস্থাকে মেনে নিলেও আবার কোন কোন সময় ও অবস্থা বিশেষত: আযানের আগে ছালাত (দরুদ) ছালাম পাঠ বৈধ- মুস্তাহাব হওয়াটাকে মোটেই মেনে নিতে চায়না বরং এটাকে বর্জনীয় বেদ্আত ও হারাম কাজ রূপে মত-মন্তব্য দিয়ে চলেছে। তাই এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

সম্মানিত পাঠক!

বিদ্বেষপূর্ণ মন-অন্তর নিয়ে নয় বরং মুহাব্বৎ ও ভক্তিভরা মন-মানসিকতা সহকারে একটু লক্ষ্য করুন ঃ-

আলোচ্য আয়াতে কারিমার আলোকে ছালাত-ছালাম পাঠের নিয়ম পদ্ধতির উছুল (সুত্র) এর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রের বিশ্বখ্যাত নির্ভর যোগ্য গ্রন্থ 'দুররুল মোখ্তার' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ وَ مُسْتَحَبَّةٌ فِىْ كُلِّ اَوْقَاتِ الْاِمْكَانِ

আর এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী (রহ) বলেছেন ঃ اَىْ حَيْثُ لَامَانِعَ

অর্থাৎ যে সময়, স্থান ও অবস্থায় শরীয়াতের কোন নিষেধাজ্ঞা-বাঁধা নাই সে সকল সম্ভাব্য তথা উপযুক্ত সময় ও পরিবেশেই দরুদ ছালাম পেশ করে যাওয়া মুস্তাহাব।

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের শান-মর্যাদা, প্রশংসা ও গুনগানের বর্ণনা বিষয়ক নির্ভর যোগ্য বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ ঃ

اَلشِّفَا بِتَعْرِيْفِ حُقُوْقِ الْمُصْطَفٰے صلے اللہ علیہ و سلم ۔

(আশ্শিফা বেতা'রিফে হুকুকিল্ মুস্তফা (সঃ))-এর মধ্যে আল্লামা "কাযী আয়াজ'(রহ) এবং এর ব্যাখ্যায় "আল্লামা আহামদ শিহাব উদ্দিন খফাজী (রহ) 'নাছীমুর রিয়াদ' গ্রন্থে বলেন ঃ

(اِعْلَمْ اَنَّ الصَّلٰوةَ عَلٰى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَرْضٌ عَلٰى الْجُمْلَةِ)

اَىْ اِجْمَالاً مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنِ زَمَانٍ وَلاَ مَحَلٍّ (غَيْرُ مُحَدَّدٍ لِوَقْتٍ) مِنَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الأوقات المعلومة واستدل على مطلق الوجوب بقوله (لأمر الله تعالى بالصلوة عليه) وأصل الأمر الوجوب (بالصلوة عليه) بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما.

অর্থ ঃ আমাদের জানা থাকা দরকার যে, মোটামুটি ভাবে আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পাঠ করে যাওয়া ফরয, কোন সময় ও স্থানের সাথে এ দরুদ পাঠ করাটা সীমাবদ্ধ নয়।

অর্থাৎ এ সময়ে দরুদ পাঠ করা যাবে এ সময়ে পাঠ করা যাবেনা- অনুরূপ এ স্থানে পাঠ করা যাবে এবং ঐ স্থানে পাঠ করা যাবেনা এ ধরনের কোন সীমাবদ্ধতা নাই।

এমনিভাবে উক্ত গ্রন্থে আল্লামা কাযী আয়াজ (রহ) হযরত আল্লামা কাজী আবু বকর ইব্‌নে বোকাইর (রহ) এর উক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে এবং এর ব্যাখ্যায় হাদীছে নবী (সঃ) এর বিশ্ব বরেণ্য ভাষ্যকার আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ) বলেন ঃ

(وقال القاضى ابو بكر بن بكير) بضم موحدة و فتح كاف احد المالكية (افترض الله على خلقه) اى من المؤمنين (ان يصلوا على نبيه) اى تعظيما و تكريما (وسلموا تسليما ولم يجعل ذلك) اى الافتراض (لوقت معلوم) اى فى وقت معين و زمان مبين (فالواجب) .... (ان يكثر المرء منها) اى من الصلوة (ولا يغفل) ..... اى لايذهل (عنها) والمعنى انه تعالى لم يوقت ذلك ليشمل سائر الأوقات هنالك كما قيل فى الذكر انه سبحانه وتعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا فجعل لكل عبادة وقتا معينا الاذكره عز وجل فانه لم يجعل له زمانا مبينا سواء يكون ذكرا لسانيا او جنانيا وكذالك الصلوة عليه صلى الله عليه وسلم غير مؤقتة حيث قرن ذكره بذكره البتة. (شرح الشفا لعلى القارى رح) ج۳، صفحه٤٤٨

অর্থাৎ কাজী আবু বকর ইবনে বোকাইর (রহ) বলেন আল্লাহ, তাআলা নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর প্রতি তা'জীম ও সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্যে মো'মেনগনের দরুদ ছালাম পাঠ করে যাওয়াকে ফরয করে দিয়েছেন এবং এ ফরয আদায় করাটাকে নির্দিষ্ট কোন সময় ও মুহূর্তের সাথে সীমাবদ্ধ করে দেননি, তাই মো'মেনগনের উচিৎ বেশী বেশী করে প্রিয় নবী (সঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করে যাওয়া এবং এর থেকে গাফেল থাকা উচিৎ নয়।

এর মর্মার্থ হচ্ছে রাত্র দিনের পুরা ২৪ ঘন্টা সময়ের যে কোন মুহূর্তে যেন দরুদ শরীফ পাঠ করাটা বৈধ হয় এবং যে কোন সময়ে যেন দরুদ-ছালাম পাঠ করা যায় এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা দরুদ পাঠের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেননি।

যেমনিভাবে আল্লাহ জাল্লা শানুহু নিজের জিকির করাটাকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে দেননি (যাতে বান্দা তার দাড়ান অবস্থায়, বসা অবস্থায় শয়ন অবস্থায়, হাটা চলা অবস্থায়, চাকরীরত অবস্থায়, ব্যবসা পরিচালনার সময়, ওযু অবস্থায় ও বিনা ওযুতে তথা জীবনের সর্ব অবস্থায় ও সর্বক্ষেত্রে যখন ইচ্ছা তখনই যেন আল্লাহর জিকির করে যেতে পারে) আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কালামে এরশাদ করেন ঃ اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه بكرة واصيلا

অর্থঃ তোমরা অধিক অধিক হারে আল্লাহর জিকির করে যাও এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর তাছবীহ তথা নামায আদায় করে যাও।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, প্রত্যেক প্রকারের এবাদত আদায়ের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হলেও কিন্তু আল্লাহর নিরেট জিকির করার জন্য কোন স্পষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেননি (যাতে ২৪ ঘন্টার সারাক্ষণ জিকির ইলাহী চালু রাখা যায়)

অনুরূপ আল্লাহর একমাত্র হাবীব রহমাতুল লিল্ আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দরুদ ছালাম পাঠের বিষয়টিকেও কোন নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে দেননি, (যাতে বান্দা ২৪ ঘন্টা দিবা-রাতে নিজের যে কোন পছন্দসই ও সুবিধাজনক সময়ে প্রিয় নবী (সঃ) এর উপর দরুদ-ছালাম পাঠ করে যেতে পারে।

মহান আল্লাহর জিকিরের ন্যায় নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জিকির তথা দরুদ-ছালাম কেও ঐ একই ভাবে পাঠের সুযোগ দানের কারণ হল- আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর প্রিয় নবী (সঃ) এর জিকির কে নিজেরই জিকির রূপে ঘোষণা দান করেছেন শেফা গ্রন্থে বর্ণিত আছে- ذكرك ذكري فمن ذكرك ذكرني

হে প্রিয় নবী (স)! আপনার জিকির মূলতঃ আমি আল্লাহ তায়ালারই জিকির রূপে গণ্য। অতএব যে লোক আপনার জিকির করল সে আমারই জিকির করল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরের বর্ণনার আলোকে যে যে সময় ও ক্ষেত্রে আল্লাহর রাছুল (সঃ) দরুদ ছালাম পাঠের বিষয়টা চিহ্নিত করেছেন, যেমন নামাযের শেষ বৈঠকে, আযানের পরে, দোয়া মানাজাতের আগে ও পরে, সে সব ক্ষেত্রে দরুদ ছালাম পাঠ করে যেতেই হবে, আর যে সব ক্ষেত্রে দরুদ শরীফ পাঠ করার কথা প্রিয় রাছুল (সঃ) সুস্পষ্ট ভাবে বলেননি, সে সব ক্ষেত্রে দরুদ ছালাম পাঠ করা যাবেনা, এরূপ কোন ঘোষণা বা বিধান আল্লাহর প্রিয় রাছুল (সঃ) আমাদেরকে দিয়ে যাননি।

বরং আল্লাহর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এর উক্তি اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِىْ كُلَّهَا অর্থাৎ এয়া রাছুলাল্লাহ (সঃ)! "আমার পূর্ণ সময়টা আপনার উপর দরুদ পাঠে ব্যয় করব'- একথার প্রতি উত্তরে আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম একথা তো বলেননি যে হে কাব! না-না, আমি যে অবস্থা ও সময় নির্ধারণ করে দিয়েছি ঐ সময় ও অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় বা সময়ে তুমি দরুদ শরীফ পড়তে পারবেনা বা দরুদ পড়া যাবেনা। একথা না বলে বরং হযরত কা'ব (রাঃ)-এর উক্তি "আমার পূর্ণ সময়টা আপনার উপর দরুদ পাঠেই ব্যয় করব" এর প্রতি উত্তরে আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম তাকে সুসংবাদ জনাতে গিয়ে এরশাদ করেন "তুমি পূর্ণ সময় দরুদ শরীফ পাঠে ব্যয় করতে পারলে এর বদৌলতে আল্লাহ পাক তোমার (দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের) দুঃচিন্তাসমূহ দুরিভূত করে দেবেন এবং তোমার (জীবনের) গুনা সমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

আল্লাহর প্রিয় রাছুল আকরম (সঃ)-এর এ উক্তি দ্বারা প্রমানিত হল যে, দিবা রাতের ২৪ ঘন্টার প্রত্যেকটি সময় ও মূহূর্তে দরুদ পাঠ করা জায়েজ, সাথে সাথে এ সূত্রে এও প্রমাণিত হল যে, নিঃসন্দেহে আযানের আগে ও ছালাত (দরুদ) এবং ছালাম পাঠ করাটা জায়েজ।

আর আযানের আগে দরুদ ছালাম পাঠ করার বিষয়টা আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) চিহ্নিত করে দেননি, একথা বলে যদি এ সময়ে দরুদ-ছালাম পাঠ করাটাকে অহেতুক নাজায়েজ বলা হয় তাহলে আল্লাহর নবী (সঃ) কর্তৃক চিহ্নিত করে না দেওয়া অন্যান্য যে সকল সময়ে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়ে থাকে, আপত্তিকারীদেরই সূত্র মতে ঐ সকল সময়েও দরুদ শরীফ পাঠ করা যাবেনা। কারণ এ সময় গুলোতে দরুদ শরীফ পাঠ করার বিষয়টি আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) কর্তৃক চিহ্নিত না হওয়া সত্বেও আপত্তি কারীরা বিনা দ্বিধায় দরুদ শরীফ পড়ে থাকে।

আর অপর দিকে আযানের আগের সময়টায় দরুদ-ছালাম পাঠের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত জোরালো ভাবে আপত্তি উত্থাপন করে বসে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, আযানের আগে দরুদ-ছালাম পাঠের ব্যাপারে তাদের এ আপত্তি উঠানোটা অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে নয়।

হযরত আল্লামা কাযী আয়াজ, (রহ) ও হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ) এর উপরে উদ্ধৃত উক্তি সমূহ দ্বারা যেমনিভাবে আযানের আগে উচ্চস্বরে আল্লাহ তাআলার জিকির-তাছবীহ পাঠ করাটা হাদীছ শরীফ মতে বৈধ রূপে প্রমাণিত, অনুরূপ আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জিকির তথা দরুদ শরীফ পাঠ করা ও বৈধ রূপে প্রমাণিত।

০- যেমন আবু দাউদ শরীফ হাদীছ গ্রন্থের- بَابُ الْاَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ এর মধ্যে উল্লেখিত হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رضـ عَنْ اِمْرَاةٍ رضـ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِىْ مِنْ اَطْوَلِ بَيْتٍ كَانَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ـ فَكَانَ بِلَالٌ رضـ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ ـ فَيَاتِىْ بِسَحْرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ اِلَى الْفَجْرِ فَاِذَا رَاٰهُ تَمَطّٰى ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْمَدُكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُقِيْمُوْا دِيْنَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ ـ

অর্থঃ হযরত উরওয়া বিন যোবাইর (রাঃ) নাজ্জার গোত্রের জনৈকা মহিলা ছাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঐ মহিলা ছাহাবী বলেন আমার ঘরখানা মাছজিদে নববী শরীফের সন্নিকটস্থ ঘর সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উচু ছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) প্রত্যহ আমার ঘরের ছাদের উপরে উঠেই আযান দিতেন।

ঐ মহিলা ছাহাবী বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) প্রত্যহ ছোব্হে ছাদেকের পূর্বে এসে আমার ঘরের ছাদে উঠে ছোব্হে ছাদেক তথা ফজর হওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন, যখন তিনি দেখতেন যে, ছোব্হে ছাদেক হয়ে পড়েছে তখন তিনি প্রথমে এ দোয়া খানা ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْمَدُكَ وَاسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُقِيْمُوْا دِيْنَكَ

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই প্রশংসা করছি, আর তোমার দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে তোমার সাহায্য কামনা করছি।)

পাঠ করতেন অতঃপর আযান দিতেন, উক্ত মহিলা ছাহাবী আরও বলেন যে, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, হযরত বেলাল (রাঃ) সর্বদা আযানের পূর্বে এ দোয়া খানা পাঠ করতেন আমি হযরত বেলাল (রাঃ) কে এ দোয়া পাঠ করা বাদ দিতে কখনও দেখিনি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্মানিত পাঠক একটু লক্ষ্য করুণ !

হযরত বেলাল (রাঃ) আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জমানায় এবং প্রিয় নবী (সঃ) এর পবিত্র উপস্থিতিতেই আযানের পূর্বে এ দোয়া খানা পড়তেন। এ দোয়া পাঠ করা থেকে নবী করীম (সঃ) তাকে কখনও বারণ করেননি–বাঁধা দেননি। আযানের পূর্বে কোন প্রকারের দোয়া-দরূদ ইত্যাদি পাঠ করা যদি আল্লাহর প্রিয় নবী (সঃ) এর দৃষ্টিতে নাজায়েজ হত তাহলে আল্লাহর নবী (সঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) কে এ দোয়া খানা পাঠ না করার জন্য অবশ্যই বলতেন। কিন্তু যখন নিষেধ করেননি– তখন প্রিয় নবী (সঃ)-এর স্বীকৃতি দ্বারা আযানের আগে যে কোন দোয়া-দরূদ পাঠ করাটাকে বৈধ প্রমাণিত করে।

ইতিপূর্বে প্রমাণ করা হয়েছে যে, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জিকির তথা দরুদ-ছালাম মূলত: মহান আল্লাহ পাকের জিকিরের মধ্যেই শামিল।

সুতরাং উদ্ধৃত হাদীছ শরীফ অনুসারে আযানের পূর্বে যেহেতু মহান আল্লাহর জিকির করা জায়েজ, সে সূত্রে নবী পাক (সঃ) এর জিকির তথা দরুদ-ছালাম পাঠ করাও জায়েজ।

০–এছাড়া প্রসিদ্ধ ফকীহ্ হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান জজরী (রহ) তদীয় গ্রন্থ اَلْفِقْهُ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ-তে আযানের আগে ও পরে ছালাত ছালাম পাঠ করা বৈধ হওয়া সর্ম্পকে ইঙ্গিত করতঃ একটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন–

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَبْلَ الْاَذَانِ وَ بَعْدَهُ ـ

অর্থাৎ আযানের পূর্বে ও পরে নবী করিম (সঃ)-এর উপর ছালাত ছালাম পাঠ করা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ।

উক্ত শিরোনাম দ্বারা গ্রন্থকার আযানের পূর্বে ও পরে ছালাত ছালাম পাঠ করা বৈধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এভাবে প্রসিদ্ধ ফেকাহ্র কিতাব اِعَانَةُ الطَّالِبِيْنَ (ইয়ানাতুত্ তালেবীন) গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَ تُسَنُّ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْاِقَامَةِ عَلٰى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِىْ شَرْحِ الْوَسِيْطِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا اِبْنُ زِيَادٍ ـ وَ قَالَ اَمَّا قَبْلَ الْاَذَانِ فَلَمْ اَرَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا وَ قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ الْبَكْرِىُّ رح اِنَّهَا اَىِ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسَنُّ قَبْلَهُمَا اَىِ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ صفحہ ٢٨، ج١

অর্থঃ বিশ্ব বরেণ্য হাদীছের ইমাম, মুহাদ্দিছ কুল শিরমণি, প্রসিদ্ধ হাদীছ ভাষ্যকার আল্লামা ইমাম নববী (রহ) شرح الوسيط (শারহুল ওয়াসীত) নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, নামাযের একামত বলার পূর্বে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর ছালাত (দরুদ) ও ছালাম পাঠ করা ছুন্নাত, তিনি আরও বলেন যে, আযানের আগে ছালাত-ছালাম পাঠ করার মধ্যে আমি কোন অসুবিধা দেখিনা অথবা এ বিষয়ে কারও কোন মন্তব্য উক্তি আমার দৃষ্টি গোচর হয়নি।

তবে শায়খুল কবীর অর্থাৎ প্রখ্যাত সর্বজনমান্য মহান শায়খ (ইমাম) আল্লামা বিক্রী (রহ) বলেছেন যে, আযান একামত উভয়ের আগে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পেশ করা ছুন্নাত।

০– মুহাক্কেক্ কুল শিরমনি হযরত শেখ জাইন বিন্ শেখ আবদুল আজিজ (র) এর سُلُوْكُ اَقْرَبِ السُّبُلِ কিতাবে বর্ণিত আছে–

فَبِهٰذَا اَىْ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ثَبَتَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَبْلَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ اَلْمُفَقِّهِيْنَ اِسْتَحْسَنَ هٰذَا وَقَالَ عَلَّامَةُ بِكْرِىْ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اَنَّهَا تُسَنُّ اَىِ الصَّلٰوةُ .... قَبْلَ الْاَذَانِ وَالْاِ قَامَةِ صفحہ٢٢

অর্থাৎ "ছাল্লু আলাইহি ওয়াছাল্লিমু তাছলীমা" আয়তে কোরআনের আদেশ দ্বারা অন্যান্য এবাদত সমূহ শুরু করার সময় যেমনিভাবে দরূদ-ছালাম পাঠ করতঃ শুরু করা ছুন্নাত প্রমাণিত হয়, অনুরূপ আযান-একামতের আগেও দরূদ- ছালাম পাঠ করা বৈধ প্রমাণিত হয়। মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরাম এ আযান-একামতের শুরুতে দরূদ-ছালাম পাঠ করাকে "মুছতাহছান" (উত্তম) রূপে মন্তব্য করেছেন, এবং (বিশ্বখ্যাত অলিয়াল্লাহ) হযরত আল্লামা শেখ ইমাম বিক্রী (র) আযান ও একামত উভয়ের আগে দরূদ-ছালাম পাঠ করাটাকে সুন্নাত বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রিয় নবী (সঃ) এর গুন-গানের বর্ণনা বিষয়ক বিশ্বখ্যাত "আশ্‌শেফা' (اَلشِّفَا) গ্রন্থে হযরত ইমাম কাযী আয়ায (রহ) প্রিয় নবী (সঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করার ক্ষেত্র ও স্থান সমূহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَ مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَ سِمَاعِ اِسْمِهِ اَوْ كِتَابِهِ اَوْ عِنْدَ الْاَذَانِ ـ

অর্থঃ আল্লাহর হাবীব (সঃ) এর পবিত্র আলোচনা কালে, প্রিয় নবী (সঃ) এর নাম মোবারক উচ্চারনের সময়, অন্যের কাছ থেকে নাম মোবারক শুনা কালে, নাম মোবারক কোথাও লেখার সময় এবং আযানের ক্ষেত্রে নবী পাক (সঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করে যেতে হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাস্তব ক্ষেত্রেও আযানের আগে এবং পরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমন কি হারামাইন শরীফাইন, মিশর, সিরিয়া, ও ইরাক এলাকার বিভিন্ন মাছজিদ সমূহেও ছালাত ছালাম প্যাঠের প্রচলন ছিল।যেমন আল্লামা ইমাম ছাখাবী (রহ) বলেন ঃ

قَدْ اَحْدَثَ الْمُؤَذِّنُوْنَ الصَّلاَةَ وَالسَّلاَمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَقْبَ الاَذَانِ لِلْفَرَائِضِ الْخَمْسِ اِلاَّ الصُّبْحِ وَالْجُمُعَةِ فَاِنَّهُمْ يُقَدِّمُوْنَ ذٰلِكَ فِيْهَا عَلَى الاَذَانِ وَاِلاَّ الْمَغْرِبِ فَاِنَّهُمْ لاَ يَفْعَلُوْنَ اَصْلاً لِضِيْقِ وَقْتِهَا ـ

.... وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِىْ ذٰلِكَ هَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ اَوْ مَكْرُوْهٌ اَوْ بِدْعَةٌ اَوْ مَشْرُوْعٌ وَاِسْتَدَلَّ لِلاَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى (وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ) وَ مَعْلُوْمٌ اَنَّ الصَّلٰوةَ وَالسَّلاَمَ مِنْ اَجَلِ الْقُرَبِ ـ .... وَالصَّوَابُ اَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ ـ (اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ)

অর্থাৎ মোয়াযযেন সাহেবান্‌রা পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের আযানের পরে ও আগে ছালাত ছালাম পাঠের নিয়ম চালু করেছেন, তাঁরা ফজর ও জুমার (জোহর) ওয়াক্তে আযানের আগেই প্রিয় নবী (সঃ) এর উপর ছালাত ছালাম পাঠ করে থাকেন এবং আছর ও এশার ওয়াক্তে আযানের পরে ছালাত ছালাম পাঠ করে থাকেন, কিন্তু মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে এ ওয়াক্তে ছালাত ছালাম পাঠ করেন না।

আযানের আগে ও পরে এরূপ ছালাত ছালাম পাঠ করার কি হুকুম ? মুস্তাহাব না কি মাক্‌রূহ-বেদআত অথবা শরীয়াত সম্মত কিনা এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে।

প্রথম পক্ষ তথা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষ অবলম্বনকারী ফোকাহায়ে কেরামের মতে আযানের আগে ও পরে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব, এ পক্ষ অবলম্বন কারী ফোকাহায়ে কেরাম (রহ) তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল রূপে কোরআন করিমের আয়াত وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-কে পেশ করে থাকেন।

অর্থ- তোমরা কল্যাণকর (আমল সমূহ) করে যাও, যাতে তোমরা কামিয়াবী লাভ করতে সক্ষম হও। অর্থাৎ দরুদ শরীফ পাঠের ন্যায় ফযীলত পূর্ণ কল্যাণকর আমল আর কিছুই হতে পারেনা সুতরাং আযানের আগে ও পরে দরুদ পাঠ করে যাওয়া একটি কল্যাণকর মুস্তাহাব কাজই বটে। القول البديع গ্রন্থকার ইমাম ছাখাবী (রহ)

বলেন যে, আসলে ইহা হচ্ছে بدعة حسنة (উত্তম বেদআত)। যারা নেক নিয়্যাতে আযানের আগে ও পরে ছালাত ছালাম পাঠ করে যাবে তারা ছাওয়াব পাবে। কিছুটা ব্যতিক্রমের সাথে এরূপ বর্ণনা দুররে মোখতার, ফতোওয়ায়ে শামী, তাহ্‌তাবী, আল্লামা ইমাম শারানী (রঃ) এর "কাশ্‌ফুল্‌ গুম্মা' ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ সমূহেও রয়েছে।

সুতরাং আযানের আগে ও পরে ছালাত ছালাম পাঠের বিষয়টি বর্তমান কালের নূতন আবিষ্কৃত কোন বিষয় নয়। বরং ইহা ইসলামী বিশ্বের সর্বজন স্বীকৃত একটি উত্তম আমল।

তবে বর্তমানে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে তদুপরি মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন দৃষ্টি গোচর না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, মোহাম্মদ বিন্ আব্দুল ওহাব নাজদীর অনুসারী সাউদ বংশের সরকার ১৯৩৩ ইংরেজী সালের দিকে হারামাইন শরীফাইন ও তৎ আরব অঞ্চলে জোর করে ক্ষমতায় বসাতে এরা এ উত্তম আমলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাতে থাকে,তারা আযানের সময় দরুদ-ছালাম পাঠ করতে মুয়ায্‌যিন সাহেবানদেরকে বাধা দেয় এবং তাদের এ হুকুম অমান্য কারী অনেক মুয়ায্‌যিন কে কতল(শহীদ)করে দেয়। যেমন- خُلاَصَةُ الْكَلاَمِ فِىْ بَيَانِ اُمَرَاءِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ (খুলাছাতুল কালাম ফিবয়ানে উমারায়েল্‌ বালাদিল্‌ হারাম) নামক গ্রন্থে আল্লামা ছৈয়দ আহমদ বিন জাইনী দাহলান্ মাক্কী(রহ) বলেন ঃ

وَمِنْ ذٰلِكَ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَ يَتَأَذّٰى بِسَمَاعِهَا وَ يَنْهٰى عَنِ الاِتْيَانِ بِهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ عَنِ الْجَهْرِ بِهَا عَلَى الْمَنَائِرِ وَ يُؤْذِىْ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَ يُعَاقِبُهُ اَشَدَّ الْعِقَابِ حَتّٰى اَنَّهُ قَتَلَ رَجُلاً اَعْمٰى كَانَ مُؤَذِّنًا صَالِحًا ذَاتَ صَوْتٍ حَسَنٍ نَهَاهُ عَنِ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَنَارَةِ بَعْدَ الاَذَانِ فَلَمْ يَنْتَهِ وَاَتٰى بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَاَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقَتَلَ (صفحـ٢٣، جـ٢)

অর্থাৎ আল্লাহর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের শান মান ক্ষুন্নকারী তাদের কার্যক্রমের এও একটি যে, নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করাকে তারা অপছন্দ করতঃ এবং নবী পাক (সঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ শুনতে পেলে তারা মানসিক ভাবে কষ্ট পেত। এ কারণে তৎকালের প্রচলন অনুযায়ী (হাদীছ শরীফ ভিত্তিক আমল) জুমার রাতে বেশী বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করা এবং মিনারায়-মিনারায় নবী আকরাম (সঃ) এর উপর উচ্চ আওয়াজে দরুদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীফ পাঠ করা থেকে তারা জনসাধারণকে বারণ করতে ও বাধা দিতে লাগল এবং যারা এভাবে মিনারায়-মিনারায় উচ্চস্বরে দরুদ শরীফ পাঠ করত– তারা তাদের উপর বিভিন্ন নির্যাতন চালাত এবং মারাত্মক ধরণের শাস্তি দিত, এমন কি এক অন্ধ লোককে তারা কতল-শহীদ করে বসেছিল, ঐ অন্ধ লোকটি একজন ছালেহ তথা নেককার ধর্মভীরু ও অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠ বিশিষ্ট মোয়াজ্জেন ছিলেন। ছাউদ বংশের সরকার তাকে মিনারায় আযানের পর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পাঠ করতে বাঁধা দেয়, কিন্তু তিনি তাদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মিনারায় আযানের সময় নবীয়ে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পাঠ করার অপরাধে তাকে তারা শহীদ করে দেয়।

সার সংক্ষেপ কথা হচ্ছে সাউদ বংশীয় নজদী সরকারের অভ্যুত্থানের পর আযানের আগে ও পরে আবহমান কাল থেকে চলে আসা দরুদ-ছালাম পাঠের প্রচলিত নিয়মকে কঠোর ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সাউদীদের প্রভাবে মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য আরব দেশেও এর প্রচলন বিলুপ্ত প্রায় হয়ে পড়ে।

কেবল মাত্র ইরাকের বাগদাদ শরীফে, বিশ্ব অলিকুল সম্রাট, মাহবুবে ছোবহানী, কুতুবে রাব্বানী, গাউছুল আযম হযরত শেখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রহ) এর "মাজার শরীফ জামে মাছজিদে' বর্তমানেও আযানের সময় দরুদ ছালাম পাঠের উত্তম প্রচলন অব্যাহত রয়েছে। ওখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানের সময় অতি উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে প্রত্যহ প্রিয় নবী (সঃ) এর উপর ছালাত-ছালাম পাঠ করা হয়।

ইহা সারা বিশ্বের গাউছে পাক (রহ) এর কোটি কোটি ভক্ত ও অনুসারী ছুন্নী মুসলমানদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে। তদুপরি ইহা আযানের আগে মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পাঠের বৈধ ও উত্তম প্রচলন ইসলামের আবহমান কাল থেকে যে চলে আসছে এর উজ্জল নজীর ও স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

এ প্রসঙ্গে আমলের জন্য এর চেয়ে অধিক কিছু বলার আর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করিনা। নবী প্রেমিক আমলকারী উম্মাতের আমলের জন্য এতটুকু দলিল প্রমানই যথেষ্ট। এটা একটা ছুন্নাত-মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল।

তাই এ ব্যাপারে অধিক বাড়াবাড়ি না করে "যাদের ইচ্ছা হয়, যারা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের অধিক রেজামন্দী লাভে আগ্রহী, তারা নবী পাক (সঃ) এর অধিক ভক্তি মুহাব্বত সহকারে আযানের আগে ছালাত ছালাম পাঠ করে যাবে। তাদেরকে কোন প্রকারের বাঁধা দেওয়া যাবেনা।

আর যারা এক্ষেত্রে প্রিয় নবী (স) এর উপর দরুদ ছালাম পাঠ করতে ইচ্ছুক নয় তারা আযানের আগে ছালাত ছালাম পাঠ না করলে এর জন্য তাদের উপর কোন প্রকারের জোর জবরদস্তীও করা যাবেনা। এ নীতির উপর থাকাটাই হচ্ছে আমাদের জন্য-একান্ত কল্যাণকর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বড় আওয়াজে ও সম্মিলিতভাবে দরূদ-ছালাম পাঠ করা প্রসঙ্গ ঃ–

ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিরবে চুপে চুপে এবং একা একা যেমনিভাবে দরূদ-ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব– অনুরূপভাবে বড় আওয়াজে উচ্চস্বরে ও সম্মিলিতভাবে দরূদদ-ছালাম পাঠ করাটাও মুস্তাহাব, এর সম্পূর্ণটাই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অবস্থা ও পরিস্থিতির উপরই নির্ভরশীল, যেখানে যেভাবে সম্ভব ও সুন্দর হয়, পরিস্থিতির অনুকুলে হয় সেস্থলে সেভাবেই দরূদ-ছালাম পাঠ করে যাওয়া মুস্তাহাব।

আল্লাহর পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেনঃ

مَنْ ضَجَّ بِالصَّلٰوةِ عَلَىَّ ضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ فِى السَّمٰوَاتِ الْعُلٰى

অর্থাৎ আমার যে উম্মাত আমার উপর উচ্চরবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে উর্দ্ধ আছমানের ফেরেশতারা তার উপর উচ্চস্বরে রহমতের দোয়া পেশ করে যাবে।

نُزْهَةُ الْمَجَالِس নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ–

قَالَ فِى الرَّوْضَةِ اِذَا قَالَ الْخَطِيْبُ الْوَاعِظُ ـ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ الْاٰيَة .... فلسا معين اَنْ يَرْفَعُوْا اَصْوَاتِهِمْ بِالصَّلٰوةِ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ـ

অর্থাৎ 'রাওজা' নামক গ্রন্থে আছে–

যখন কোন খতীব বা ওয়ায়েজ ছাহেবান আয়াতে কোরআনী "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-ইকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান্নাবী......শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে তখন শ্রোতাগণের জন্য আল্লাহর পেয়ারা নবী (স) এর উপর বড় আওয়াজে ছালাত-ছালাম পাঠ করে যাওয়া জরুরী।

হযরত ইমাম হাফেজ ছাখাভী (র) বলেনঃ

وَقَالَ النَّوَوِىْ رح فِى الْاَذْكَارِ يُسْتَحَبُّ لِقَارِئِ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهٖ مِمَّنْ فِىْ مَعْنَاهُ اِذَاذُكِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهٗ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيْمِ وَلَا يُبَالِغُ فِى الرَّفْعِ مُبَالَغَةً فَاحِشَةً ـ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلٰى رَفْعِ الصَّوْتِ الْاِمَامُ الْحَافِظُ اَبُوْبَكْرٍ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُ وَاٰخَرُوْنَ وَقَدْ نَقَلْتُهُ اِلٰى عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَنَصَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ اَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلٰى اَنَّهٗ يُسْتَحَبُّ اَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهٗ بِالصَّلٰوةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى التَّلْبِيَةِ انتهى ـ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِى الْبَابِ الثَّانِى الْحِكَايَةُ عَنْ

مُسْتَطِيْحٍ فِى الْمَنَامِ اِنَّ اللّٰهَ غَفَرَ لَهٗ وَلِاَهْلِ الْمَجْلِسِ بِرَفْعِ اَصْوَاتِهِمْ بِالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ـ

উপরের উদ্ধৃতি সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বড় স্বরে সম্মিলিতভাবে দরূদ-ছালাম পাঠ করা হাদীস ফেকাহ অনুসারে মুস্তাহাব, সুতরাং কোন বাতেল ফেরকার অনুসারী লোকের কথায় আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নাই।

দরুদ ছালাম পাঠের আদাব (নিয়মাবলী)

১। কুরআন করিমের নির্দেশের ভিত্তিতে প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে অন্তত একবার আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ ছালাম পাঠ করা ফরয।

যেমন ফতোয়ায়ে শামীগ্রন্থে বর্ণিত আছেঃ-

فَتَكُوْنَ فَرْضًا فِى الْعُمَرِ وَوَاجِبًا كُلَّمَا ذُكِرَ عَلَى الصَّحِيْحِ وَسُنَّةً فِى الصَّلٰوةِ وَمُسْتَحَبَّةً فِىْ كُلِّ اَوْقَاتِ الْاِمْكَانِ اَىْ لَامَانِعًا ـ

২। কোন ক্ষেত্রে যখনই প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক উচ্চারণ করা হয় তখন প্রত্যেক উচ্চারণকারী ও শ্রোতামণ্ডলী সকলের জন্য ইমাম তাহাবী (রহ) ও অন্যান্য অনেক আইম্মায়ে কেরামের মতে দরুদ-ছালাম পাঠ করা ওয়াজিব।

হযরত আল্লামা ইমাম ছাখাভী (র) এর القول البديع গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ-

فَمِنْ تَعْظِيْمِهٖ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ كُلَّمَا جَرٰى ذِكْرُهٗ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى . اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ الاية ـ فَاَمَرَ عِبَادَهٗ بِهَا بَعْدَ اِخْبَارِهِمْ اَنَّ مَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰى نَبِيِّهٖ بِاَنَّ الْمَلَائِكَةَ مَعَ انفكا هم عَنِ التَّقْيِيْدِ بِشَرِ يْعَتِهٖ يَتَقَرَّبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِالصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمِ عَلَيْهِ فَنَحْنُ اَوْلٰى وَاَحَقُّ وَاَحْرٰى ...... وَمِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهٖ لِهٰذَا الْمَذْهَبِ اَعْنِىْ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا ذُكِرَ الْاٰيَةُ الْكَرِيْمَةُ فَاِنَّ الْاَمْرَ لِلْوُجُوْبِ وَيُحْمَلُ عَلَى التَّكْرَارِ اَبَدًا بِنَاءً عَلٰى اَنَّ الْاَمْرَ يَدُلُّ عَلَيْهِ صفحه ١٣

অনুবাদের সার সংক্ষেপ ঃ আল্লাহর প্রিয় হাবীব (স) এর প্রতি তা'জীম সম্মান প্রদর্শনের ইহাও একটি পদ্ধতি যে, যখনই আল্লাহর বাণী "ইন্নাল্লাহা ওয়ামালাইকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান্নাবী---- পাঠ করা হয় তখন ফেরেশতাদের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রিয়নবী (স)এর উপর আমাদের জন্য দরূদ-ছালাম পাঠ করে যাওয়াটা বেশী জরুরী।

অপর কতেকের মতে, একই মজলিশে বার বার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের নাম মোবারক উল্লেখ হলে তখন শুধু একবার দরুদ ছালাম পাঠকরা ওয়াজিব। প্রত্যেকবার নাম মোবারক শুনে প্রতি উত্তরে দরুদ ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

৩। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের নাম মোবারকের আগে "সায়্যিদুনা' শব্দটি সংযোজন করা মুস্তাহাব।

অনুরূপভাবে "মাওলানা" "শাফীয়ুনা" ইত্যাদি গুণবাচক এবং উপাধীমূলক শব্দ সমূহ সংযোজন করাও মুস্তাহাব।

কারণ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম উম্মাত কে দরুদ শরীফ তালিম দেওয়ার বেলায় নিজের মূল নাম মোবারকের আগে تَوَاضُعْ (শিষ্টাচার নম্রতা) গুনের প্রকাশ দিতে গিয়ে কোন রকমের উপাধী বা গুণ বাচক শব্দ যোগ না করে বরং اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ............ (আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মদ.........) বলে সরাসরি শুধুমাত্র মূল নাম মোবারক উল্লেখ করত ঃ দরুদ শরীফ পাঠের পদ্ধতি বাতলিয়ে থাকলেও প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লাশানুহু যে অতুলনীয় শান-মর্যাদা দান করেছেন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা আমরা উম্মাৎগনের একান্তই উচিৎ।

আমরা এ আখেরী জমানার আলেম-ওলামারা আল্লাহর মহান রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া চ্ছাল্লামের শান-মর্যাদা সম্পর্কে উদাসীন হলেও পূর্বতন আইম্মা ও ওলামায়ে কেরামগন স্বয়ং আল্লাহর মাহবুব নবী (সঃ) কতৃক এরশাদ কৃত হাদীছ শরীফ সমূহ যেমন ঃ

١ـ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الخ (مسلم)

٢ـ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الخ (بخارى ـ مسلم ـ ترمذى)

٣ـ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا فَخْرَ ـ (احمد ـ ترمذى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

٤ـ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ ـ (حاكم ـ بيهقى)

ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে سيدنا (সায়্যিদুনা) শব্দটি নাম পাকের আগে যোগ করতঃ প্রিয় নবী (সঃ)-এর পবিত্র নাম উল্লেখ পূর্বক দরুদ ছালাম পাঠ করা মুস্তাহাব বলে মন্তব্য করেছেন।

যেমন "দূররুল মোখতার" নামক ফতাওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَ نُدِبَ السِّيَادَةُ ـ لِاَنَّ زِيَادَةَ الْاِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ عَيْنُ سُلُوْكِ الْاَدَبِ فَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهٖ ـ ذكره الرملى الشافعى و غيره ـ

قَوْلُهٗ ذَكَرَهُ الرَّمْلِىُّ الشَّافِعِىُّ اَىْ فِىْ شَرْحِهٖ عَلٰى مِنْهَاجِ النَّوَوِىِّ وَ نَصَّهٗ وَ الْاَفْضَلُ الْاِتْيَانُ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ ظَهِيْرَةَ وَ صَرَّحَ بِهٖ جَمْعٌ وَ بِهٖ اَفْتَى الشَّارِحُ لِاَنَّ فِيْهِ الْاِتْيَانَ بِمَا اُمِرْنَا بِهٖ وَ زِيَادَةُ الْاِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَّذِىْ هُوَ اَدَبٌ فَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهٖ (شامى)

درود شریف میں لفظ سیدنا کا اضافہ :

بعض نجدی علماء درود شریف میں لفظ سیدنا کے اضافہ کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں چنانچہ ایک صاحب نے حال ھی میں اسپر ایک مستقل رسالہ لکھکر مفت شائع کیا ہے ـ جو گزشتہ حج کے موسم میں مدینہ منورہ و مکۃ معظمہ میں تقسیم کیا گیا ـ حالانکہ اوپر ذکر ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رض ایسے جلیل القدر صحابی کے درود شریف میں بھی سید کا لفظ حضور علیہ السلام کیلئے استعمال کیا گیا ہے اور انکا اثر مذکور ابن ماجہ و طبری میں روایت کیا گیا ہے جسکے بارے میں حافظ ابن القیم نے بھی اعتراف کیا کہ اس اثر کو ابن ماجہ نے وجہ قوی سے روایت کیا ہے کما ذکرہ الحافظ فی الفتح صفحہ۱۲٤ ۔

اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی ایسا منقول ہوا ہے اور خود حضور علیہ السلام نے بھی اپنے کو سید ولد بنی ادم فرمایا ہے تو اپکے سید الاولین والاخرین ہونے میں کیا شك ہے اسکے باوجود نئے نئے مسائل نکالنا اور ہر چیز کو بدعت و شرك قرار دینے کی رٹ لگانا موجودہ دورکی

نجدیت و سلفیت کا خاص شعار بن گیا ہے اسلئے امت کو ان لوگوں کی افراط و تفریط سے بچانے کی سعی کرنا نہایت ضروری ہے ـ واللہ المعین ـ

(انوار الباری شرح صحیح بخاری جلد یازدھم صفحہ۹۲، از سید احمد رضا صاحب فاضل دیوبند)

এমনিভাবে ছহী বোখারী শরীফে....

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন,

لَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اِسْقِ رَبَّكَ وَ لْيَقُلْ سَيِّدِىْ وَ مَوْلَائِىْ ـ وَلَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ وَ لْيَقُلْ فَتَاىَ وَ فَتَاتِىْ وَ غُلَامِىْ

ـ بخارى شريف جـ١ صفحه ٣٤٦

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের মনিব (কিংবা সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখাতে গিয়ে এরূপ বলবে না-যে, তোমাদের 'রব্' কে আহার করাও, তোমাদের 'রব' কে অযু করিয়ে দাও, তোমাদের 'রব' কে পানি পান করাও বরং ছায়্যিদী এবং মাওলায়ী বলেই সম্বোধন করবে। এমনি ভাবে একে অপরকে আমার 'আব্দ' (বান্দা) আমার 'আমাত (বান্দী) বল না বরং বল আমার পরিচারক-পরিচারিকা (সেবক-সেবিকা) ও আমার গোলাম। অত্র হাদীছ শরীফ দ্বারা আল্লাহ প্রিয় নবীর পবিত্র নামের আগে 'ছৈয়্যেদুনা' ও 'মাওলানা' বলা এবং আমরা নিজেদেরকে প্রিয় নবী (দঃ)-এর গোলাম বলা বৈধ প্রমাণিত হয়।

✪ প্রতিবারের নিয়্যতকৃত নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ (আত্ত্যাহিয়্যাতু) পাঠের পর দরুদ শরীফ পাঠ করা আমাদের হানফী মাজহাব অনুসারে ছুন্নাত, আর শাফী মাজহাব অনুসারে ফরয।

✪ শরীয়াত কর্তৃক নিষেধকৃত স্থান ও অবস্থান ব্যতীত অন্যান্য সবক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরুদ -সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

✪ দোয়া-মুনাজাতের শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব এতে মুনাজাত কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে আশাবাদি হওয়া যায়।

✪ আযানের আগে ছালাত-ছালাম তথা দরুদ শরীফ পাঠ করা হাদীছ-ফেকাহ অনুযায়ী মুস্তাহাব এবং আযানের পরে দরুদ শরীফ পাঠ করা সরাসরি হাদীছ শরীফ অনুযায়ী ছুন্নাত।

✪ দরুদ শরীফ পাঠ করার জন্য সাধ্য অনুসারে পোষাক-পরিচ্ছদ কে পাক পরিষ্কার করে নেওয়া উচিৎ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ সাধ্য অনুসারে আতর-সুগন্ধি লাগানো উত্তম।

✪ পাক-পরিষ্কার জায়গায় বসেই দরুদ পাঠ করা উচিত।

✪ সময় সুযোগ হলে কেবলামুখী হয়েই দরুদ শরীফ পাঠ করা উত্তম। সুযোগ না থাকলে যে কোন দিকে ফিরে দরুদ শরীফ পাঠ করা যায়।

✪ মন-অন্তরের অত্যাধিক ভক্তি-মুহাব্বত ও আগ্রহ একাগ্রতা নিয়েই দরুদ ছালাম পাঠ করতে হয়।

✪ রিয়া তথা মানুষকে দেখানোর জন্য দরুদ-ছালাম পাঠ করতে নাই বরং মহান আল্লাহ-রাছুলের পরম রেজামন্দী-সন্তুষ্টি এবং পরকালে আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত রহমত ও প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের শাফাআত সুপারিশ পাওয়ার আশায় দরুদ-ছালাম পাঠ করলেই এর পুরাপুরি উপকারিতা পাওয়া যাবে অন্যথায় নয়।

✪ পায়খানা-পেশাবখানায়, ময়লা আর্বজনাময় জায়গায়, দুর্গন্ধময়স্থানে দরুদ ছালাম পাঠ করা হারাম ও বেয়াদবীর মধ্যে শামিল।

✪ হাঁসী, ঠাট্টা ও হট্টগোলের মধ্যে দরুদ শরীফ পাঠ করা বেয়াদবী।

✪ পায়খানা-পেশাব করার সময়, স্ত্রী সহবাসকালীন অবস্থায় দরুদ শরীফ পাঠ করা হারাম।

✪ স্থায়ী ভাবে অহরহ শরীআত বিরোধী কার্যকলাপ ও পাপ গুনাহ করার নির্ধারিত স্থানে, যেমন– সিনেমা হল, শুধুমাত্র মদপান ও যেনা ব্যভিচার করার উদ্দেশ্যে যে সব ক্লাব ও হোটেল নির্ধারিত রয়েছে ঐ সব স্থানে এবং অশ্লীল নাচ গানের মঞ্চে বা স্থানে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও দরুদ-ছালাম পাঠ করা হারাম। জায়েজ মনে করে করলে ঈমান চলে যাওয়ার নিশ্চিত আশংকা রয়েছে।

✪ ওযু ব্যতীত দরুদ শরীফ পাঠ করা জায়েজ হলেও আদবের খেলাফ, তাই ওযু অবস্থায় পাঠ করাই উত্তম।

✪ কুরআনুল কারিমের নির্দেশের আলোকে ছালাত (দরুদ) ও ছালামকে এক সাথে মিলিয়ে পাঠ করা জরুরী। ছালাম বিহীন শুধু ছালাত তথা দরুদ পাঠ করাকে কিন্তু আইম্মায়ে কেরাম মাকরুহ বলেছেন। এ ভিত্তিতে নামাযের জন্য নির্ধারিত দরূদ ইব্রাহীমী কে নামাযের বাইরে অন্যান্য স্বাভাবিক অবস্থায় পাঠ করা মাকরূহ, কারণ উক্ত দরুদ শরীফ দ্বয়ে ছালাম নাই। হাঁ-ছালামসহ অন্যান্য যে সব দরুদে ইব্রাহীমী রয়েছে ঐ সব দরুদ শরীফ সমূহ যে কোন সময়ে পাঠ করা যাবে। যেমন হাদীছ শাস্ত্রের বিশ্বখ্যাত ইমাম ও ভাষ্যকার শায়খুল ইসলাম হযরত ইমাম নববী (রহ) মুছলিম শরীফের মুকাদ্দমার শরাহ্তে বলেছেন ঃ

ثم انه ينكر على مسلم رحمة الله تعالى كونه اقتصر على الصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التسليم و قد امرنا الله تعالى بهماجميعا فقال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فكان ينبغى ان يقول و صلى الله وسلم على محمد فان قيل فقد جاءت الصلوة عليه صلى الله عليه وسلم غير مقرونة بالتسليم و ذلك فى اخر التشهد فى الصلوات فالجواب ان السلام مقدم قبل الصلوة فى كلمات التشهد و هو قول السلام عليك ايها النبى ورحمة الله و بركاته و لهذا قالت الصحابة رضى الله عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا السلام عليك فكيف نصلى عليك الحديث۔ و قد نص العلماء على كراهة الاقتصار على الصلوة عليه صلى اللهٔ عليه وسلم من غيرتسليم ۔ والله اعلم ۔ صفحه ٣ ج

✪ শেখুদ্ দালায়েল, ভারত উপমহাদেশের মুহাদ্দেছকুল শিরমনি হযরত আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহলভী (রহ) স্বীয় جذب القلوب الى ديار المحبوب গ্রন্থে বলেন ঃ (উর্দু সংস্করণ)

تنبيه : ان الفاظ درود ميں سے جن ميں "سلام" كا لفظ مذكور نہيں ہے ہر ايك كے بعد سلام كے مندرجہ ذيل الفاظ بھی پڑھ لينا چاہئے ۔ تاكہ اپ پر كامل صلاۃ و سلام بھيجا جائے ۔كيونكہ اكثر علماء كے نزديك بلا لفظ سلام كے صرف درود بھيجنا مكروہ ہے ۔ كيونكہ قران پاك ميں حق تعالى شانہ كا ارشاد ہے " يايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما (ترجمہ " اے ايمان والو اپ پر درود بھيجو اور سلام بھيجو سلام بھيجنا) اس حكم الہی ميں سلام بھيجنے كا بھی حكم ديا گيا ہے ۔ سلام كے الفاظ يہ ہيں ۔ السلام عليك ايها النبى الكريم ورحمة الله و بركاته ۔ اور بعض علماء نے بلا سلام كے مكروہ كہنے ميں كلام بھی كيا ہے ۔ ليكن يہ بات متفق عليہ ہے كہ درود بلا سلام كے خلاف اولى ہے ۔ اور جہاں نبی كريم

pdf By Syed Mostafa Sakib

صلی اللہ علیہ وسلم نے درود میں الفاظ درود کے ساتھ سلام کے الفاظ ذکر نہیں کئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا علم تھا ۔

چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ! ہمیں اپ پر سلام بھیجنے کی کیفیت تو معلوم ہے (اس سے صحابہ کرام کی مراد یہ تھی کہ نماز میں جو سلام اپ پر بھیجا جاتا ہے وہ ہمکو معلوم ہے) اب اپ ہمکو بتلائے اپ پر درود کن الفاظ میں بھیجیں ؟ اپ نے ارشاد فرمایا ۔ درود کے یہ الفاظ پڑھا کرو۔ اللہم صل علی (سیدنا) محمد و علی ال (سیدنا) محمد الخ

اسی پر قیاس کرتے ہوئے صرف سلام ہی پر اکتفاء کرنا بھی مکروہ یا خلاف اولی ہے ۔ اور اکثر عجمی مصنفین کی تو یہ عادت ہے کہ وہ صرف "علیہ السلام" پرھی اکتفا کرتے ہیں ۔ لیکن عرب مصنفین کی کتابوں میں یہ بات بہت کم پائی جاتی ہے ۔ اور متقدمین و متاخرین مصنفین جو اپنی کتابوں میں درود شریف کے پورے الفاظ "صلی اللہ علیہ وسلم" اپنی کتابوں میں لکھنے کا التزام کیا ہے وہ بہت عمدہ اختصار اور حصول مقصود کا بہترین نمونہ ہے ۔ صفحہ ۳٦۰-۳٥۹

মহা প্রভুর পবিত্র জ্বাতী নাম "আল্লাহ" শব্দ উচ্চারণ কালে মাহাত্মসূচক গুণবাচক শব্দাবলী পাঠ করা প্রসঙ্গে

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সকল মো'মিন মুসলিমদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মহা প্রভুর পবিত্র জ্বাতি নাম "আল্লাহ" শব্দ উচ্চারণকালে উচ্চারণকারী ও শ্রোতামণ্ডলী উভয়েই মহত্ব প্রকাশক-গুণবাচক শব্দাবলী যেমন- আল্লাহ তা-আলা, জাল্লাশানুহু, জাল্লাজালালুহু ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু ও ছুবহা-নাহু ওয়া তাআলা ইত্যাদি বলে যাওয়া ওয়াজিব। কারো কারো মতে একই মজলিসে একবার বলা ওয়াজিব।

আর বার বার উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার বলে যাওয়া মুস্তাহাব। একবারও না বলা ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে।

যেমন ইমাম হালবী (র)-এর "শরহে মুনিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

وَلَوْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ اسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَوْ فِىْ مَجَالِسَ يَجِبُ لِكُلِّ مَجْلِسٍ ثَنَاءٌ عَلٰى حِدَةٍ بِاَنْ يَّقُوْلَ عُقَيْبَ الذِّكْرِ تَعَالٰى اَوْ جَلَّ شَانُهٗ اَوْ جَلَّ جَلَالُهٗ وَ عَمَّ نَوَالُهٗ وَ نَحْوَهَا ۔ وَلَوْ تَرَكَهٗ لَا يَقْضِىْ اَىِ التَّارِكُ الثَّنَاءَ لِاَنَّهٗ لَا يَبْقٰى دَيْنًا عَلَيْهِ لٰكِنْ يَكُوْنُ اِثْمًا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ فَيَكْفِىْ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ تَكَرَّرَ فِيْهِ اِسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى ثَنَاءٌ وَاحِدٌ لٰكِنْ يُنْدَبُ التَّكْرَارُ اِذَا تَكَرَّرَ كَالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صفحہ ۳٤۱

হাদীছ শরীফের আলোকে-দরূদ-ছালাম পাঠের ফাযায়েল

আকা ও মাওলা, শাহেন শাহে দো'আলম, নূরে মুজাচ্ছাম, নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের খেদমতে পাকে ছালাত (দরুদ) ছালাম পেশ করার ফযীলত ও ছাওয়াব অন্তহীন। এ সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে এর সবিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা মোটেই সম্ভবপর নয়। এতদ সত্ত্বেও প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামের ভালবাসা ও নেকনজর প্রাপ্তির আশায় এবং রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটি বিশুদ্ধ ও মূল্যবান হাদীছ শরীফের উল্লেখ দেওয়া হচ্ছে ঃ-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ۔ (مسلم ۔ ابو داؤد ۔ ابن حبان فی صحیحہ ۔ الادب المفرد للبخاری)

১। অর্থঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন, যে লোক আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত নাজেল করেন।

(۲) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً ۔ (ترمذی و ابن حبان فی صحیحہ)

২। অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় রাছুল (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ- কেয়ামত দিবসে ঐ লোক আমার নিকট বেশী প্রিয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

(নিকটবর্তী) হবে, যে লোক দুনিয়াতে আমার উপর অধিক পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকে।

(৩) وَعَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىْ رض قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرٰى فِىْ وَجْهِهِ الْبِشْرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرٰى فِىْ وَجْهِكَ الْبِشْرُ ؟ قَالَ اَجَلْ اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ صَلٰوةً كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا ـ (رواه ابن كثير فى تفسيره ـ ج٣، صفحه٥١١ مسند احمد)

৩। অর্থঃ হযরত আবু তালহা আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন ভোরবেলা আল্লাহর প্রিয়নবী (সঃ) কে এরূপ আনন্দিত দেখা যাচ্ছিল যে এর প্রতিক্রিয়া চেহারা মোবারকের মধ্যে ভেসে আসছিল। এ অবস্থা দেখে ছাহাবায়ে কেরাম আবজ করলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ (সঃ) আজ আপনাকে বেশ আনন্দিত দেখা যাচ্ছে। প্রিয়নবী (সঃ) বললেন, হাঁ আমার প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর তরফ থেকে এক আগন্তক (ফেরেশতা) এসে বলে গেলেন, আপনি নবীর (সঃ) উপর আপনার উম্মাতের যে লোক একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ পাক তাকে দশটি পূন্য দান করবেন। তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে এবং প্রতিদান স্বরূপ ঐলোকের উপর অনুরূপ রহমত বর্ষিত হয়।

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيَّاتٍ ـ

(الادب المفرد للبخارى رح)

৪। অর্থঃ হযরত আনছ বিন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয়নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, মহান আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশবার রহমত নাজেল করেন এবং তার দশটি গুনাহ মার্জনা করে দেন। (الادب المفرد للبخارى)

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ ـ (رواه الطبرانى عن الحسن بن على رض) (قول البديع)

৫। অর্থ ঃ আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা যেখানে থাকনা কেন আমার উপর দরুদ পাঠ করেই যাবে। কারণ তোমাদের প্রেরিত দরুদ আমার নিকট অবশ্যই পৌছে থাকে।

٦ـ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِىْ عَشْرًا ـ اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ (رواه الطبرانى/ترغيب)

৬। অর্থঃ হযরত আবুদারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাছুল আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা ও বিকাল বেলা আমার উপর দশবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করবে কেয়ামত দিবসে অবশ্যই সে আমার সুপারিশ লাভ করবে।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فَقَدْ فَتَحَ عَلٰى نَفْسِهِ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ الرَّحْمَةِ وَاَلْقَى اللّٰهُ مَحَبَّتَهُ فِىْ قُلُوْبِ النَّاسِ فَلَا يُبْغِضُهُ اِلَّا مَنْ فِىْ قَلْبِهِ نِفَاقٌ ـ (رواه الحضر عليه السلام) عن النبى صلے الله عليه وسلم (كشف الغمة)

অর্থাৎঃ হযরত নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন, যে লোক صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ (ছাল্লাল্লাহু আলা ছায়্যিদিনা মুহাম্মদ) বলে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে সে যেন নিজের জন্য আল্লাহর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে নিল এবং আল্লাহ পাক লোকদের অন্তরে ঐ লোকের ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন, মুনাফিক ব্যতীত অন্য কেউ তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে পারেনা। (এ-দরূদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ -কে দরূদে খিজরী বলা হয়)

٨ـ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَىَّ زَكٰوةٌ لَكُمْ ـ (كشف الغمة)

অর্থঃ তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করে যাও– কেননা যে লোক আমার উপর দরুদ পাঠ করবে তার উপর অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষন করবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপর এক বর্ণনায় আছে আল্লাহর প্রিয়নবী (সঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ অব্যাহত রাখবে। কেননা, এ দরুদ শরীফ তোমাদের জন্য জাকাত স্বরূপ বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, এ দরুদ শরীফ তোমাদের দেহ-আত্মার পাপ-গুনাহকে পবিত্রকারী হিসেবে জাকাতের মতই। (কাশফুল গুম্মাহ)

٩۔ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رض قَالَ اَلصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْحَقُ لِلْخَطَايَا مِنَ الْمَاءِ لِلنَّارِ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ وَحُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْاَنْفُسِ ۔ وَ فِىْ رِوَايَةٍ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً حُبًّالِىْ وَ شَوْقًا اِلَىٰ اَمْرِ اللّٰهِ حَافِظَيْهِ اَنْ لَا يَكْتُبَا عَلَيْهِ ذَنْبًا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۔

(كشف الغمة)

৯। অর্থঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) নবী আকরাম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, পানি যেভাবে আগুনকে নিভিয়ে ফেলে আল্লাহর প্রিয়নবী (সঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ পাপ-গুনাহকে এর চেয়েও অধিক ভাবে নিঃশেষিত করে দেয়। নবী পাক (সঃ)-এর উপর ছালাম পেশ করা গোলাম আজাদ করা হতেও অধিক উত্তম। নবীয়ে আকরাম (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা কয়েদী মুক্ত করা অপেক্ষা অনেক শ্রেয়।

অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী (সঃ) এরশাদ করেন আমার উপর যে ব্যক্তি ভক্তি ও মুহাব্বত সহকারে একবার মাত্র দরুদ পাঠ করে থাকে (এর বিনিময়ে) আল্লাহ তাআলা রক্ষী ফেরেশতা অর্থাৎ কেরামান-কাতেবীন ফেরেশতা (আঃ) দ্বয়কে তিন দিন পর্যন্ত ঐ লোকের পাপ গুণাহ না লেখার জন্য আদেশ করেন।

١٠۔ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِىْ جُمْعَةٍ فَاِنَّ صَلَاةَ اُمَّتِىْ يُعْرَضُ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ۔ فَمَنْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً كَانَ اَقْرَبُهُمْ مِنِّىْ مَنْزِلَةً ۔ (رواه البيهقى و الترغيب لابن الحجر رح)

১০। অর্থঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন, জুমাআর দিবসে আমার উপর বেশী বেশী দরুদ পাঠ করতে থাকিও। কেননা, আমার উম্মতের দরুদ শরীফসমূহ বিশেষ করে জুমআর দিবসেই আমার

নিকট পেশ করা হয়। অতএব যে লোক আমার প্রতি অধিক পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সে লোক হাশরের দিবসে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী (প্রিয়) হবে।

١١۔ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ عَلَىَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُ ثَمَانِيْنَ عَامًا ۔ (قول البديع/ و فضائل الصلوة)

১১। অর্থঃ হযরত আবু হোরাইরা থেকে বর্ণিত প্রিয়নবী (সঃ) এরশাদ করেন আমার উপর দরুদ পাঠ করার আমলটা পুলসিরাত পার হওয়ার সময় দরুদ পাঠ কারীর জন্য নূর-আলো স্বরূপ হবে। আর যে লোক আমার উপর জুমআর দিবসে (কমপক্ষে) আশিবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে এর বিনিময়ে তার আশি বৎসরের (ছাগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

١٢۔ وَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِاْئَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ مَعَهٗ نُوْرٌلَوْ قُسِّمَ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَوَسِعَهُمْ ۔ (رواه ابو نعيم فى الحلية عن على بن الحسين عن ابيه عن جده رض) (كنز العمال)

১২। অর্থঃ আল্লাহর প্রিয়নবী (সঃ) এরশাদ করেন, যে লোক জুমআর দিবসে আমার উপর একশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে হাশরের ময়দানে সে এমন এক তেজোদিপ্ত নূর সহকারে আগমণ করবে যে, যদি ঐ নূরকে মাখলুকাতের উপর বন্টন করা হয় তাহলে সব কিছুকে বেষ্ঠন করে ফেলবে।

١٣۔ مَا جَلَسَ قَوْمٌ لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا كَاَنَّمَا تَفَرَّقُوْا عَنْ جِيْفَةِ حِمَارٍ ۔ (ذكره الشعرانى رح فى كشف الغمة)

১৩। অর্থঃ যে সব মজলিসে-মাহফিলে-মাহফিল মজলিস ওয়ালারা আল্লাহকে স্মরণ করেনা এবং নবীয়ে আকরম (সঃ) এর উপর দরুদ-ছালামও পাঠ করেনা বরং এ উভয় ব্যতিরিকেই মাহফিল-মজলিস থেকে উঠে চলে যায়– তারা যেন দুর্গন্ধময় মরা পঁচা গাধার উপর থেকেই উঠে গেল। অর্থাৎ যে সব মাহফিলে আল্লাহর জিকির হয় না এবং নবী (দঃ) এর উপর ছালাত-ছালাম ও পাঠ করা হয়না ঐ সব মাহফিলের মান মরা পঁচা গাধার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট ও মন্দ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

١٤۔ عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (ترمذى)

১৪। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যে আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন প্রকৃত কৃপন ঐলোক যার সন্মুখে আমার আলোচনা চলে অথচ সে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করেনা।

١٥۔ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رض قَالَ خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَبْخَلِ النَّاسِ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَذٰلِكَ اَبْخَلُ النَّاسِ ۔ (الترغيب والترهيب)

১৫। অর্থঃ হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামদের কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন, শ্রেষ্ট বখিল কে এব্যাপারে আমি কি তোমাদেরকে জানাবনা ? সকলেই বললেন ইয়া রাছুলাল্লাহ নিশ্চয় জানাবেন। তখন প্রিয়নবী (সঃ) এরশাদ করলেন যার সামনে আমার আলোচনা চলে অথচ সে আমার (নাম শুনেও) আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেনা সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বখিল।

১৬। হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ-

١٦۔ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ كَفَّارَةٌ لَّكُمْ وَزَكَاةٌ فَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ۔ (قول البديع)

অর্থঃ তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করে যাও, কেননা তোমাদের এ দরুদ পাঠ নিশ্চিতভাবে তোমাদের পাপ-গুনার জন্য কাফ্‌ফারা ও জাকাতই বটে; যে কেউ আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে মহান আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাজেল করবেন (ক্বাওলুলবাদী)।

১৭। হযরত ছিদ্দিকে আকরর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি আল্লাহর প্রিয় রাছুল (সঃ) কে এরশাদ করতে শুনেছি–

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ كُنْتُ شَفِيْعَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۔

(رواه ابو حفص بن شاهين فى الترغيب)

অর্থঃ যে লোক আমার উপর দরুদ পাঠ করবে আমি কেয়ামত দিবসে তার জন্য শফাআত (সুপারিশ) কারী হব।

১৮। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্নিত যে, তিনি বলেন–

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ عَنِ السَّمَاءِ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ (كنز العمال)

অর্থঃ প্রতিটি দোআ-মুনাজাত (নেক আমল) মহান আল্লাহর দরবারে বাধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে যতক্ষণ না নবী আকরম (সঃ) ও তাঁর আহ্‌লে বাইতের উপর দরুদ পাঠ করা হয়।

১৯। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ-

١٩۔ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔ (ترمذى)

অর্থঃ যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর তোমরা দরুদ শরীফ পাঠ কর না ততক্ষণ দোআ সমূহ আছমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলানো থাকে।

২০। পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ-

٢٠۔ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهٗ مَادَامَ اِسْمِيْ فِيْ ذٰلِكَ الْكِتَابِ ۔ (تفسير ابن كثير)

অর্থঃ যে ব্যক্তি কোন কিতাবে আমার দরুদ শরীফ লিপিবদ্ধ করবে এবং ঐ কিতাবে যতদিন পর্যন্ত আমার নাম মোবারক লিখা থাকবে ততদিন পর্যন্ত ফেরেস্তাগুলী তার জন্য মাগফিরাতের দোআ পেশ করতে থাকবে।

২১। অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

٢١۔ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلصَّلٰوةُ عَلَيَّ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ ظُلْمَةِ الصِّرَاطِ فَاَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ عَلَيَّ ۔ (كشف الغمة)

অর্থ ঃ আল্লাহর পেয়ারা নবী (সঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামত দিবসের অন্ধকার পুলছিরাতে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠের আমলখানা নূর স্বরূপ হবে। অতএব আমার উপর বেশী বেশী করে দরুদ শরীফ পাঠ করে যাও।

২২। অন্য একটি হাদীছ শরীফে আছে ঃ-

٢٢۔ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ تَعْظِيْمًا لِحَقِّيْ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذٰلِكَ مَلَكًا لَهٗ جَنَاحٌ فِى الْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

فِي الْمَغْرِبِ وَ رِجْلًا فِي تُخُومِ الْاَرْضِ - وَعُنُقُهُ مُلْتَوِى تَحْتَ الْعَرْشِ يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صَلِّ عَلٰى عَبْدِيْ كَمَا صَلّٰى عَلٰى نَبِيِّ فَهُوَ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (كشف الغمة)

٢٣- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوا الصَّلٰوةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ - لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّيْ عَلَيَّ اِلَّا بَلَغَنِيْ صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِيْ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ (جلاء الافهام لابن القيم)

অর্থাৎ হযরত আবুদ্দারদা (র) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

তোমরা জুমআর দিবসে আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করে যেয়ো, কেননা ইহা হচ্ছে উপস্থিতির দিন এদিন ফেরেশতা মন্ডলী উপস্থিত হয়ে থাকেন। আল্লাহর যে কোন বান্দা আমার উপর দরূদ পাঠ করে থাকে তার দরূদ পাঠের আওয়াজ আমার নিকট পৌছে থাকে অর্থাৎ আমি তার দরূদ পাঠের আওয়াজ নিজ কানে শুনে থাকি। সে যেখানেই থাকুকনা কেন!

আবুদ্দরদা (রা) বলেন আমি আল্লাহর প্রিয় নবী (স) এর নিকট জানতে চাইলাম ইয়া রাছূলাল্লাহ! আপনার ইন্তেকালের পরেও কি আপনি আমাদের দরূদ পাঠের আওয়াজ শুনতে পাবেন? প্রতি উত্তরে প্রিয় নবী (স) এরশাদ করেন, ইন্তেকালের পরেও আমি তোমাদের দরূদ পাঠের আওয়াজ শুনতে পাব। যেহেতু আল্লাহ পাক ছুবহানাহু ওয়া তায়ালা মাটির জন্য হযরাত নবী-রাসূল (আ) গণের শরীর (খাওয়া-নষ্ট করে ফেলা)-কে হারাম করে দিয়েছেন। তাই নবী (আ) গণ মৃত্যুর পরেও জিন্দা আছেন।

٢٤- عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوْعًا - صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ وَتَسْلِيْمَكُمْ يَبْلُغُنِيْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ (قول البديع)

অর্থাৎ তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করতে থাক, কেননা তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তোমাদের দরূদ-ছালাম আমার নিকট সুনিশ্চিত পৌছে থাকে।

২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাশর দিবসে মানবকুলের আদি পিতা হযরত বাবা আদম (আ) এর জন্য আরশের নীচে অবস্থানের একটি প্রশস্ত আসন থাকবে, তিনি সুদীর্ঘ খেজুর বৃক্ষের ন্যায় সবুজ রংয়ের কাপড় পরা অবস্থায় সেখানে অবস্থান করবেন। আদম সন্তানদের কাকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর কাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তিনি এর পরিদর্শনে থাকবেন।

এরই মাঝে, বাবা আদম (আ) এর দৃষ্টি প্রিয় নবী (স) এর ঐ উম্মাতের প্রতি পড়বে যাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে বাবা আদম (আ) পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে ডেকে বলতে থাকবেন।

হে আহমদ! হে আহমদ! প্রতি উত্তরে প্রিয় নবী (স) বলবেন, হে মানব জাতির পিতা আমি হাজির আছি। তখন বাবা আদম (আ) বলবেন–

هٰذَا رَجُلٌ مِّنْ اُمَّتِكَ مُنْطَلَقٌ بِهِ اِلَى النَّارِ

এ আপনার উম্মাৎ একে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (এ অবস্থা দেখে আমি) কোমর বেঁধে ফেরেশতাদের পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকব এবং বলতে থাকব; (হে আল্লাহর ফেরেশতামন্ডলী! থাম! থাম! তারা উত্তরে বলবেন! আমরা ফেরেশতা সম্প্রদায় মহান আল্লাহর আদেশ পালনে অতি দৃঢ়মনা, আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন তা অমান্য করতে পারিনা, বরং তিনি যা আদেশ করে থাকেন তাই আমরা পালন করে যাই।

فَاِذَا آيَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَضَ عَلٰى لِحْيَتِهِ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى وَاسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَلَيْسَ قَدْ وَعَدْتَنِيْ اَنْ لَا تُخْزِيَنِيْ فِيْ اُمَّتِيْ فَيَاتِى النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ اَطِيْعُوْا مُحَمَّدًا وَرُدُّوْا هٰذَا الْعَبْدَ اِلَى الْمَقَامِ فَاُخْرِجُ مِنْ حِجْرِيْ بِطَاقَةً بَيْضَاءَ كَالْاَنْمُلَةِ فَاُلْقِيْهَا فِيْ كُفَّةِ الْمِيْزَانِ الْيُمْنٰى وَاَنَا اَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ فَتَرْجَحُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ فَيُنَادٰى سَعِدَ وَسَعِدَ جَدُّهُ وَثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ اِنْطَلِقُوْا بِهِ اِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ يَارُسُلَ رَبِّيْ قِفُوْا حَتّٰى اُكَلِّمَ هٰذَا الْعَبْدَ الْكَرِيْمَ على ربه فَيَقُوْلُ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ مَا اَحْسَنَ وَجْهَكَ وَاَحْسَنَ خلقك فقد اقلتني عثرتي ورحمت عبرتي فيقول انا نبيك محمد

pdf By Syed Mostafa Sakib

وهذه صلاتك التى كنت تصليها على وقد وفتك احوج ما كنت اليها
(قول البديع فى الصلوة على الجيب الشفيع).

অর্থাৎ যখন আল্লাহর প্রিয় নবী (স) তাদের কাছ থেকে প্রায় নৈরাশ হয়ে পড়বেন- তখন দয়ালু নবী নিজের বাম হাত দ্বারা নিজের দাড়ি মোবারক ধরবেন আর ডান হাত দ্বারা আরশমুখী হয়ে আরজ করতে থাকবেন- হে আমার প্রভূ আল্লাহ! আমার উম্মাতের ব্যাপারে আমাকে বেইজ্জত করবেন না বলে আপনি কি আমার সাথে অঙ্গিকার –ওয়াদা করেননি?

তখন প্রভূ আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসবে আমার প্রিয় নবীর কথা শোন! মান্য কর, এ বান্দাকে মীজানে হিসাব-নিকাশের স্থলে পুনরায় নিয়ে যাও।

(অতঃপর তাকে তথায় নিয়ে যাওয়া হবে) তখন আমি আমার পকেট থেকে আঙ্গুলের পরিমাপের একটি সাদা টিকেট বের করে নেব এবং মীজানের ডান পাল্লায় রেখে বলব বিসমিল্লাহ, এতে পাপের চেয়ে ছাওয়াব-পূন্যের বিষয় প্রধান্য পাবে। তখন ঘোষণা করা হবে, সুভাগ্যবান-নেককার খোশ নছীব, তার নেকির পাল্লা ভারী হয়ে পড়েছে, তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও।

তখন ঐ লোক ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলবে! হে আমার প্রভুর কাছেদরা একটু থামুন ! আমি মহান আল্লাহর সম্মানিত এ বান্দার সাথে একটু কথা বলে নিই।

অতঃপর ঐ লোক আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হউক, আপনার পবিত্র নূরানী চেহারা মোবারক কতইনা উজ্জ্বল! আপনার আকৃতি-প্রকৃতি চরিত্র-আচরণ কতইনা সুন্দর। আপনি আমার পাপের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আমার কান্নার মাঝে আপনি অতুলনীয় ভাবে দয়া করেছেন।

আল্লাহর প্রিয় নবী (স) তখন বলবেন- আমি তোমারই (দয়ার ভাণ্ডার) নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, আর আমি তোমার নেকীর পাল্লায় যা রেখেছি তা হচ্ছে, তুমি আমার উপর প্রত্যহ যে দরূদ শরীফ পাঠ করতে উহারই টোকেন,

তোমার এ মহা সংকট-প্রয়োজন মুহূর্তের জন্যই উহাকে আমি হেফাজত করেছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে এভাবে দরুদ ছালাম পাঠের ফযিলত উপকারিতা লিখে শেষ করা সম্ভব নয় সংক্ষেপে বলতে হয় যে, প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের মুবারক খেদমতে দরুদ শরীফের হাদীয়া প্রেরণের ফলে মহান আল্লাহ পাকের রহমত নাজেল হয়। আমলনামা পবিত্র হয়। দরুদ পাঠকারীর মর্যাদা আল্লাহ- রাছুলের দরবারে ও মানুষের নিকট বৃদ্ধি পায়। পাপ, গুনাহ মাফ হয়ে যায়। দরুদ ছালাম পাঠের বরকতে

মহান আল্লাহর রেজামন্দি ও প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের সু-নজর ও সন্তোষ অর্জিত হয়। দরুদ শরীফ পাঠের দ্বারা আমাদের ফরযসমূহ আদায়ের মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি হয় তা মাফ হয়ে যায়।

✪ দরুদ ছালাম পাঠের বদৌলতে মনের চিন্তা-পেরেশানী দুরিভূত হয়। হতাশা ও মানসিক ব্যধী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

✪ ভয়-ভীতি দূর হয়, শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়, জায়েজ মাকছুদ পূর্ণ হয়।

✪ বেশী বেশী দরুদ ছালাম পাঠের বরকতে ঋণ শোধের ব্যবস্থা হয়, প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের যেয়ারত নছীব হয়, ফেরেশতাদের মুহাব্বত ও মারহাবা পাওয়া যায়। অধিক অধিক দরুদ ছালাম পাঠের দ্বারা কেয়ামত দিবসে প্রিয়নবী (সঃ) এর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ হবে, কবর আলোকিত হবে, কবরের আজাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, মৃত্যুকালীন কষ্ট সহজ হবে।.

✪ অতিশয় আদব ও মুহাব্বত সহকারে অধিক অধিক দরুদ ছালাম পাঠের দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বপ্রকার মুছিবত ও বিপদ আপদ থেকে নিঃসন্দেহে মুক্তি পাওয়া যায়।

অধিক সংখ্যায় দরুদশরীফ পাঠের দ্বারা মারাত্মক রোগ-ব্যধী থেকে শেফা (আরোগ্য) লাভ হয়।

✪ বেশী বেশী দরুদশরীফ পাঠের অছিলায় রিজিক ও ধন সম্পদে বরকত হয়। অভাব অভিযোগ, আর্থিক অনটন ও দারিদ্রতা দূরিভূত হয় এবং চাকরিতে পদোন্নতি হয়।

✪ অধিক অধিক দরূদ শরীফ পাঠের বদৌলতে কেয়ামত দিবসে আল্লাহর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের শাফাআত সুপারিশ পাওয়া যাবে। মূলতঃ দরুদ শরীফ নূর সর্বস্বই বটে, তাই দরুদ পাঠ কারীর জন্য পুলছিরাত পার হওয়ার সময় নূরের আধিক্য হবে, এতে নিমিষে পুলছিরাত পার হতে সক্ষম হবে।

✪ প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর বেশী বেশী দরুদশরীফ পাঠ কারী কেয়ামতের কঠিন দিনে প্রিয়নবী (সঃ)-এর পবিত্র হাতে হাউজে কাউছারের শরবত পানে ধন্য হবে, হিসাব কিতাবের মূহুর্তে নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং দোজখ থেকে নাজাতী পাবে। বেহেস্তে প্রবেশের পথ সুগম হবে।

✪ অধিক অধিক দরুদ শরীফ পাঠের দ্বারা অন্তরে আল্লাহ ও রাছুলের অকৃত্রিম প্রেম-মুহাব্বত অর্জিত হয়। স্বপ্নে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দিদার-দর্শন নসীব হয়।

✪ দরুদ ছালাম পাঠের দ্বারা মো'মেনের ঈমানী নূর ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্তর মনে ঈমানী শান্তি ও স্বস্তি আসে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক কথায় বলতে গেলে নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের দরুদ-ছালামই হচ্ছে দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় বরকত, সুভাগ্য ও কল্যাণের উৎস।

অতএব, সত্যিকারের মুমিন ও নবী প্রেমিকের অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হল ঃ- দৈনিক বেশী বেশী করে আল্লাহর হাবীবের উপর দরূদ-ছালাম পাঠ করে যাওয়া। বিশেষ করে দরূদ শরীফের একটি বিশেষ সংখ্যা কে নিজের প্রত্যহিক পাঠের জন্য ওজিফা রূপে নির্ধারিত করে নেওয়া উচিৎ। (মদারেজুন্ নুবুওয়্যত ও জাজ্‌বুল কুলুব" অবলম্বনে লিখিত)।

কয়েকটি মু'তাবার দরুদ শরীফের বর্ণনা ঃ

নূরে মুজাচ্ছাম নবী শাহেনশাহে দোআলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সরাসরি মোবারক জবানে যে সব দরুদ-ছালাম এরশাদ করেছেন, যা বিশুদ্ধ হাদীছ শরীফ সমূহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। দরুদ ছালামের মধ্যে ঐ সবই সর্বোৎকৃষ্ট দরুদ শরীফ হিসাবে স্বীকৃত।

এ জাতীয় দরুদ শরীফের কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল ঃ-

(১) যে দরুদশরীফ খানা নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ এর পরে পাঠ করা হয় এবং একে দরুদে ইব্রাহিমী ও বলা হয় ঃ

(١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى (سَيِّدِنَا) اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ (سَيِّدِنَا) اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى (سَيِّدِنَا) اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ (سَيِّدِنَا) اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

(ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ, হিছনে হাছীন)

(٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ ارْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَّاٰلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

(٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ـ

(٤) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَّ اَبْلِغْهُ الْوَسِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهٗ وَ فِى الْمُقَرَّبِيْنَ مَوَدَّتَهٗ وَ فِى الْاَعْلِيْنَ ذِكْرَهٗ ـ (رواه ابن ابى عاصم بلفظ قلنا يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم اجعل صلاتك الخ ـ (قول البديع)

(٥) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى

(٦) صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارَكَ وَسَلَّمَ

(٧) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَاَحْسِنُوا الصَّلٰوةَ فَاِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَىَّ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَ رَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ يَغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ ـ (اخرجه الديلمى فى مسند الفردوس له هكذا ـ ورواه ابن ابى عاصم كما تقدم فى حديث التشهد)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সন্মানিত পাঠক!

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে উপরে উদ্ধৃত হযরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) কতৃক বর্ণিত হাদীছ শরীফে আল্লাহর প্রিয়নবী (দঃ) এর বাণী ঃ-

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَاَحْسِنُوا الصَّلٰوةَ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَىَّ (قول البديع)

অর্থঃ তোমরা যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে তখন সুন্দরও উত্তম নিয়মে দরুদ পাঠ করবে, কেননা হয়তঃ তোমাদের অবগতি নাই যে, তোমাদের প্রেরিত দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়।

এবং হযরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত ঃ-

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَحْسِنُوا الصَّلٰوةَ عَلَيْهِ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ ـ (كشف الغمة للشعرانى رح ـ جذب القلوب)

অর্থঃ তোমরা যখন প্রিয়নবী (সঃ) এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করবে তখন সুন্দরও উত্তম ভাবে দরুদ পাঠ করে যাবে কেননা হয়তঃ তোমরা জাননা যে এ দরুদ শরীফ সমূহ প্রিয়নবী (সঃ) এর খেদমতে পেশ করা হয়।

এতদুভয় হাদীছশরীফ দ্বারা আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াছাল্লাম দরুদ পাঠ করার বেলায় সুন্দর ও উত্তম রূপ অবলম্বনের আদেশ করেছেন।

সুন্দর ও উত্তম রূপ–পদ্ধতি বলতে কি বুঝান হয়েছে সে সম্পর্কে হাদীছ শরীফ সমূহের ভাষ্যকার আইম্মায়ে মুহাদ্দেছিন কেরাম বলেছেন ঃ "সুন্দর ও উত্তমরূপে' বলতে বুঝানো হয়েছে–

মহান আল্লাহ যাদেরকে উত্তম ভাষাজ্ঞান ও বাকশক্তি দান করেছেন, তারা যেন সুন্দর সুন্দর শব্দ সমূহ সংযোজনে প্রিয়নবী (সঃ) এর উচ্চতর শান-মর্যাদা মাফিক বাক্যাবলীর দ্বারা আল্লাহর নবী (সঃ) এর উপর দরুদপাঠ করে।

এ কারণে উদ্ধৃত হাদীছদ্বয়ের উপর ভিত্তি করে প্রিয় নবী (সঃ) এর আশেকে ছাদেক ছাহাবায়ে ইজাম (রাঃ) গন, আশেকে রাছুল তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন হযরাত (রহ), বিশ্ব বরেণ্য রাছুল প্রেমিক মুহাদ্দেছীন, মুফারেছরীন ইসলামী শরীয়ার মহান ইমামগন, মারফতে ইলাহীয়ার ধারক বাহক আশেকে রাছুল আউলিয়াল্লাহগন, আরবী ভাষাজ্ঞানে বিজ্ঞ রাছুল প্রেমিক সাহিত্যিক দার্শনিকগণ, যুগে যুগে নবীয়ে

আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের শান মর্যাদা উপযোগী সুন্দর সুন্দর, উত্তম এবং উন্নত স্তরের শব্দ সমূহের সংযোজনে উন্নতমানের বাক্য সম্বলিত দরুদ শরীফ সমূহ রচনা করেছেন।

উম্মাতের রচিত এরূপ অনেক দরুদ শরীফ মাকবুল হওয়া সম্পর্কে স্বপ্ন যোগে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সুসংবাদ দান করেছেন, যার সুন্দর বর্ণনা নির্ভর যোগ্য বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এ আলোকে নূরে মুজাচ্ছাম নবী (সঃ) এর মীলাদ পাকের বর্ণনা দানের ফাঁকে ফাঁকে যে সব দরুদ শরীফ বিশেষতঃ صَلٰوةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰه عَلَيْكُمْ ، سَلَامٌ يَا حَبِيْبَ اللّٰه عَلَيْكُمْ ইত্যাদি পড়া হয়।

অনুরূপ কেয়াম তথা দাঁড়িয়ে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কে তাজিম পূর্ণ ছালাত-ছালাম জানানোর সময় যে বাক্যাবলী-

يَا نَبِىْ سَلَامٌ عَلَيْكَ * يَا رَسُوْلْ سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا حَبِيْبْ سَلَامٌ عَلَيْكَ * صَلَوَاتُ اللّٰه عَلَيْكَ

পড়ে-ছালাত ছালাম পেশ করা হয়। এ সকল দরুদ শরীফও রহমতের নবী (সঃ) এর দরবারে মাক্ববুল দরুদ শরীফ হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তই বটে।

তাই বানানো দরুদশরীফ রূপে আখ্যায়িত করতঃ এসকল দরুদ শরীফ কে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঠাট্টা বিদ্রুপাচ্ছলে এগুলো দরুদশরীফ নয় এ কথা বলা যাবেনা। এরূপ বলে এগুলোকে যদি প্রত্যাখ্যান করা হয় তাহলে আল্লাহর প্রিয় নবীর (সঃ) এর পবিত্র জবান নিসৃত দরুদ শরীফগুলো ব্যতীত আরো যে হাজারো রকমের বানানো দরূদসমূহ রয়েছে, সেগুলোকে প্রতিপক্ষের লোকেরা ও অহরহ পাঠ করে থাকে। ঐ সব কেও অগ্রাহ্য এবং তুচ্ছজ্ঞান করা হচ্ছে বলে প্রমাণিত হবে।

কারণ আল্লাহওয়ালা, আশেকেরাছুল, আমলদার, মুহাক্কেক ওলামায়ে কেরাম ও আউলিয়াল্লাহগণ ঐ দরুদশরীফ সমূহ পাঠের মধ্যে স্বপ্ন যোগে আল্লাহর প্রিয়নবী (সঃ) কে অত্যন্ত রাজীও খুশী দেখেছেন।

দরুদ পাঠ কারীর সবার ক্ষেত্রে না হলে ও অনেক কাশ্‌ফ কারামত সম্পন্ন কামেল আউলিয়াল্লাহগন তাজিম-মুহাববতের সাথে উল্লেখিত দরুদশরীফ সমূহ পাঠের সময় মাহফিলের মধ্যে আল্লাহর প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের নূরানী সত্ত্বাকে হাজের (মওজুদ) দেখেছেন।

ঈমানী জ্ঞানে জ্ঞানী ভাইদের জন্য এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট বলে মনে করে এর অধিক বলা হচ্ছেনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ নিম্নে আরও মু'তাবার কয়েকটি দরুদ শরীফের বর্ণনা দেওয়া হল ঃ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি ছালাতান কামিলাতান ওয়া ছাল্লিম ছালামান তাম্মান, আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিনিল্লাজি তানহাল্লু বিহিল উকাদু ওয়া তানফারিজু বিহিল কুরাবু ওয়া তুকযা বিহিল হাওয়াজু ওয়া তুনালু বিহির রাগায়েবু ওয়া হুসনুল খাওয়াতিমি ওয়া ইউসতাসক্বাল গামামু বেওয়াজহিহিল্ কারিমে ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ফি কুল্লি লামহাতিন ও নাফাসিন বে-আদাদি কুল্লি মা'লুমিল্ লাক্।

উক্ত দরুদশরীফ খানা "ছালাতে নারিয়া" নামে সুপরিচিত, এ নামে অভিহিত হওয়ার কারণ হল নির্ধারিত সংখ্যায় উক্ত দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করে দোআ করা হলে আগুনের মত দ্রুত কাজ হয়।

হযরত আল্লামা ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেছেন ব্যক্তিগতভাবে কোন লোক প্রত্যহ একশত বার কিংবা চল্লিশ বার নিয়মিত উক্ত দরুদ শরীফ খানা পাঠ করলে তার সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা, পেরেশানী ও চিন্তা দুরিভূত হয়ে রিজিকে বরকত হবে।

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আছকালানী (রহ) বলেছেন, ৪৪৪৪ বার উক্ত দরুদ শরীফ খানা পাঠ করতঃ দোআ করলে দ্রুত কবুল হয়ে থাকে।

একা বা এগারজন পরহেজগার আলেম-হাফেজ মিলে উক্ত দরুদ পাকের খতম আদায় করলে রোগ ব্যাধী থেকে শেফা পাওয়া যায়। মামলা মোকাদ্দামায় জয়ী হওয়া যায়। পরীক্ষায় পাশ হওয়া যায়, বিপদাপদ দূরিভূত হয়, রুজী রোজগারে বরকত হয় এবং অন্যান্য যাবতীয় নেক মাকছুদ পূর্ণ হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ (وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً مَقْبُوْلَةً صَلٰوةً رَحْمَةً صَلَاةً بَرَكَةً) صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ (وَصَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَمْرَاضِ وَالْاَسْقَامِ وَصَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْهُمُوْمِ وَالْغُمُوْمِ ـ وَصَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَصَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنَ الْحَرَقِ وَالْغَرَقِ وَصَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ

مَوْتِ الْفُجَاءَةِ وَسُوْءِ الْخَاتِمَةِ ـ) وَصَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَعْدَاءِ ، وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

মানাহিজুল্ হাসানাত গ্রন্থে ইমাম ইবনে ফাকেহানী এর গ্রন্থ "ফজরে মুনীরের' উদ্ধৃতি সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, মুছা নামক এক অন্ধ নেককার লোক তাঁর একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- আমি একবার সমুদ্র যাত্রায় ছিলাম ঘটনাক্রমে আমাদের জাহাজখানা ডুবে যাচ্ছিল এরই মাঝে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, এ সময়ে আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আমাকে উল্লেখিত দরুদ শরীফ খানা তালিম দিয়ে আদেশ করলেন তাড়াতাড়ি জাহাজে আরোহীদের কে এ দরুদ শরীফ খানা একহাজার বার পাঠ করতে বল। এতে আমি জাগরিত হয়ে পড়ি। দ্রুত উঠে সবাইকে নিয়ে উক্ত দরুদ শরীফ খানা পাঠ করা আরম্ভ করে দিই।

আল্লাহ-রাছুলের কি শান! মাত্র তিনশত বার উক্ত দরুদ শরীফ খানা পাঠ করার পর পরই আল্লাহর অপার করুণাতে জাহাজ খানা ডুবা হতে রক্ষা পেয়ে যায়।

✪ যে কোন হাজাত মশকিলাত নিয়ে যদি এ দরুদ খানা এক হাজার বার পাঠ করা হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এ দরুদ পাঠের বদৌলতে ঐ হাজত পূর্ণ করে দেন এবং মশ্‌কিল-বিপদ থেকে নাজাতি দান করেন।

✪ দরুদে শেফা ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَّشِفَاءٍ ـ

✪ পরকাল জীবনে নূর ও প্রিয় নবী (সঃ) এর সুপারিশ পাওয়ার আশায় নিম্নের দরুদ শরীফ খানা বেশী বেশী পাঠ করা উত্তম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَدْرِ التَّمَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُوْرِ الظَّلَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الشَّفِيْعِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَنَامِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ বিশেষ মরতবা ওয়ালা দরুদ শরীফ ঃ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً دَائِمَةً كَثِيْرَةً مَقْبُوْلَةً تُؤَدِّىْ بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

✪ নিম্নের দরুদ শরীফ খানা খোদায়ী জ্ঞান ও মারফত লাভের উদ্দেশ্যে বেশী বেশী পাঠ করা উত্তম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ ؟

দরুদে ফতুহাত (উন্নতি লাভের দরুদ শরীফ) ইহা পাঠ করলে রিজিকে অত্যাধিক বরকত হয়। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত পাওয়া যায়। ধন দৌলত ও ঐশ্বর্য অর্জিত হয়ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اَنْوَاعِ الرِّزْقِ وَالْفُتُوْحَاتِ يَابَاسِطَ الَّذِىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ اُبْسُطْ عَلَيْنَا رِزْقًا وَّ اِسعًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِّنْ خَزَائِنِ غَيْبِكَ بِغَيْرِ مِنَّةِ مَخْلُوْقٍ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নামাযের মুস্তাহাব কাজসমূহের বিবরণ

✪ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত জামার আস্তিন বা গায়ে জড়ানো চাদরের ভিতর থেকে বের করে নেওয়া।

✪ পুরুষের দু'পায়ের মধ্যখানে ৪ আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে নামায আদায়ের জন্য দাড়ান। প্রয়োজনে ওজরওয়ালা ও মোটা ধরনের লোকদের জন্য ৪ আঙ্গুলের চেয়েও বেশী ফাঁক করে দাঁড়ানোর অনুমতি রয়েছে। যেমন- "মারাকিউল ফালাহ" গ্রন্থে বলা হয়েছে-

وَيُسَنُّ (تَفْرِيْجُ الْقَدَمَيْنِ فِى الْقِيَامِ قَدْرَ اَرْبَعِ اَصَابِعَ) لِاَنَّهُ اَقْرَبُ اِلَى الْخُشُوْعِ وَالتَّرَاوُحُ اَفْضَلُ مِنْ نَصْبِ الْقَدَمَيْنِ وَ تَفْسِيْرُ التَّرَاوُحِ اَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلٰى قَدَمٍ مَرَّةً وَعَلَى الْاٰخِرِ مَرَّةً لِاَنَّهُ اَيْسَرُ (طحطاوى)

✪ তাহতাবী আলাল্ মারাকিয়িল ফালাহ কিতাবে আরো উল্লেখ করা হয়েছে-

نَصَّ عَلَيْهِ فِىْ كِتَابِ الْاَثَرِ عَنِ الْاِمَامِ وَ لَمْ يَحْكِ فِيْهِ خِلَافٌ وَفِى الظَّهِيْرِيَّةِ وَ رُوِىَ عَنِ الْاِمَامِ التَّرَاوُحُ فِى الصَّلٰوةِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ يَنْصُبَ قَدَمَيْهِ نَصْبًا ـ ثُمَّ هٰذَا التَّحْدِيْدُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ اَمَّا اِذَا كَانَ سَمِنَ اَوْ اَدْرَةٌ وَيَحْتَاجُ اِلَى تَفْرِيْجٍ وَاسِعٍ فَالْاَمْرُ عَلَيْهِ سَهْلٌ ـ (صفحه ١٧٦)

✪ নামাযের দাড়ানো অবস্থায় ছিজদার জায়গায়, রুকু অবস্থায় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের উপর, ছিজদার সময় নাকের উপর বসা অবস্থায় কোলের উপর, ডান দিকের ছালাম ফিরানোর সময় ডান কাঁধের উপর আর বাম দিকে ছালাম ফিরানোর সময় বাম কাঁধের উপর নজর রাখা মুস্তাহাব।

✪ রুকুর অবস্থায় মাথা ও পিঠ বরাবর রাখা মুস্তাহাব।

✪ ছিজদার অবস্থায় হাত ও পায়ের আঙ্গুলি সমূহ কেবলা মুখী রাখা মুস্তাহাব।

✪ নামাযরত অবস্থায় হাই উঠলে মুখের উপর ডান হাতের পিঠ রেখে তা বন্ধ রাখা মুস্তাহাব।

✪ নামাযের মধ্যে কাশি বা হাঁচি আসলে যথাসম্ভব তা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা।

✪ ছিজদার অবস্থায় পুরুষদের রান হতে পেট আলগা রাখা আর মেয়েলোকদের পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখা মুস্তাহাব।

✪ রুকু-ছিজদার তাছবীহসমূহ এক বারের অধিক তথা ৩ বার ৫ বার কিংবা ৭ বার পর্যন্ত পাঠ করা মুস্তাহাব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নামায আদায়ের সাধারণ নিয়ম

ইতিপূর্বে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখিত নামাযের ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলোকে নামাযের যথাস্থানে সাজিয়ে আল্লাহজাল্লা শানুহুর এ শ্রেষ্ঠতম এবাদত-নামায আদায় করার সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী নিম্নে দেওয়া হল ঃ

যখন আল্লাহ তাআলার কোন মুসলিম বান্দা ছালাত তথা নামায আদায়ের জন্য ইচ্ছা করে তখন তার গোছলের প্রয়োজন হলে গোছল করে (ফরয) আর শুধু ওযুর প্রয়োজন হলে ওযু করে (ফরয) অর্থাৎ শারীরিক দৈহিক পবিত্রতার পর পাক-পবিত্র পোষাক পরিধান করতঃ (ফরয) পাক জায়গায় (মাসজিদ হউক কিংবা অন্য কোন জায়গায় হউক (ফরয) কেবলা তথা কাবা শরীফ মুখী হয়ে (ফরয) অতিশয় আদব ও নম্রতা সহকারে দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুলী পরিমাণ ফাঁক রেখে (মুস্তাহাব) দাড়াতে হয় (ফরয)

এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নামায রত অবস্থায় কোন মুসাল্লী নিজের চোখের দৃষ্টি এবং মনের খেয়াল ও ধ্যানকে অন্য কোন দিকে ফিরতে দেবে না।

কেননা ইতিপূর্বে অত্র গ্রন্থের ফাযায়েল অংশে যে হাদীস শরীফখানা উল্লেখ করা হয়েছে-এর ভাষ্য অনুযায়ী এ বিষয়টি নিরেট সত্য যে, বান্দা যখন নামাযের নিয়্যত বেঁধে দাড়ায় তখন মহা-মহিম প্রভু আল্লাহ জাল্লাশানুহু নিজেকে বান্দার সম্মুখে প্রকাশ করেন (মহা-মহিম আল্লাহর তাজাল্লীকে দেখার মত শক্তি আমাদের দৃষ্টি শক্তির মধ্যে না থাকার ফলে আমরা যদিও তা দেখিনা)।

কোন হতভাগ্য নামাযী বান্দা যখন নামায রত অবস্থায় নিজের দৃষ্টি ও খেয়াল-ধ্যান কে এদিক-ওদিক ফিরাতে থাকে, তখন করুণাময় প্রভু আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে লক্ষ্য করে কুদরতী ভাষায় আহবান করতে থাকেন ঃ

হে আমার বান্দা/বান্দী !

আমি স্বয়ং তোমার সামনেই আছি! এতদ্বসত্ত্বেও তুমি আমার দিকে দৃষ্টি-ধ্যানী না হয়ে আমার চেয়ে কোন উত্তম বস্তুর প্রতি তোমার দৃষ্টি ফিরাচ্ছ। ধ্যানী হচ্ছ? বান্দা আমার চেয়ে সুন্দর-উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। বান্দা আমি প্রভুর দিকেই তাকাও, তুমি আমারই ধ্যানী হও, আমার প্রতি মনোনিবেশ কর।

অতএব, নামাযের এ দাড়ান অবস্থায় মুসাল্লী নিজের ছজদা করার জায়গাতেই দৃষ্টি রাখবে (মুস্তাহাব)।

এ অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর স্মরণ ও তার প্রতি চরম তা'জীম-ইজ্জত প্রদর্শন তথা তার বন্দেগী আদায়ের ব্যাপারে অন্তর-মনে অতিশয় একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা সৃষ্টি করতে হয়।

যেহেতু আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ এবাদত আদায়ের জন্য নামাযের বাহ্যিক দর্শনীয় কাজ সমূহ হল নামাযের দেহ তুল্য। আর মন-অন্তরের একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা ও একিভূত ধ্যানই হল নামাযের রূহ (প্রাণ) তুল্য।

তাই এ একাগ্রতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর প্রিয় হাবীব নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন— لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

অর্থাৎ মন—অন্তরের একাগ্রতা একনিষ্ঠতা ব্যতীত নামায (মহান আল্লাহর দরবারে কবুল ও গ্রহণযোগ্য) হয় না।

সুতরাং নামাযে যখন দাড়ান হয়-তখন মনের খেয়াল ধ্যানকে একমাত্র সারা জাহানের রাজাধিরাজ খালেক ও মালিক এবং প্রভু ও মনিবের নির্দিষ্ট স্মরণে নিয়োজিত করতে হয়। প্রভু আল্লাহ পাককে হাজের—নাজের জানতে হয়। এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিতে গিয়েই আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন— تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ (بخارى)

অর্থাৎ, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি এমন ধ্যান-বিশ্বাসে মহান আল্লাহর এবাদত উপাসনা কর, যেন তুমি আল্লাহ রাববুল আলামীনকে দেখতে পাচ্ছ।

আর যদি অত ঘনিষ্ঠ ধ্যান-ধারণা পোষণ করা তোমার দ্বারা সম্ভব না হয় তাহলে এরূপ ধ্যান-ধারণায় নামায আদায় কর, যেন আল্লাহ পাক সুনিশ্চিৎ তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

এরূপ ধ্যান করতে করতে নিজের আমিত্ব ও অস্তিত্বকে মহা-মহীয়ান প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সামনে বিলীন করে দিয়ে একাগ্র মনে পাঠ করতে হয়—

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্‌জাহ্‌তু ওয়াজহীয়া লিল্লাজী ফাতারাছ্ ছামাওয়া- তি ওয়াল্ আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল্ মুশ্‌রিকীন।

অর্থঃ আমি মুখ করলাম (একাগ্রচিত্তে মনোযোগী হলাম) ঐ মহান জাতে পাকের দিকে যিনি সমুদয় আসমান-জমিনের স্রষ্টা এবং আমি মোটেই মুশরিকদের মধ্যে নই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতঃপর অতিশয় দীনতা-হীনতা এবং মনের মধ্যে পূর্ণ বন্দেগীর ভাব নিয়ে মনে মনে কোন্ ওয়াক্তের নামায কোন্ পর্যায়ের নামায তথা ফরয ওয়াজিব সুন্নাত কি নফল ইত্যাদি বিষয় স্থীর করতঃ নামায আদায়ের নিয়্যত (এরাদা-সংকল্প) করতে হয় (ফরয) এবং এর সাথে সাথে মন মুখের একিভূতির উদ্দেশ্যে মুখেও নিয়্যত উচ্চারণ করা উত্তম (মুস্তাহাব)।

আরবী ভাষায় নিয়্যত উচ্চারণ করার বেলায় নিম্ন রূপে বলতে হয়।

যেমন ফজর ওয়াক্তের ফরয নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى (اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ) مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, দু রাকাতী নামায না হয়ে তিন রাকাতী নামায হলে 'রাকা'তাই এর স্থলে 'ছালাছা রাকআতি' এবং চার রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে আরবা আ রাকআতি বলতে হয়।

এছাড়া ফরয নামায না হয়ে ওয়াজিব নামায হলে ফারদুল্লাহি তাআলার পরিবর্তে ওয়াজিবুল্লাহী তা আলা" সুন্নাত হলে সুন্নাতু রাসুলিল্লাহি তাআলা" নাফল হলে "ছালাতিন নফল বলতে হয়।

এভাবে ফজরের নামায না হয়ে যদি অন্য নামায হয় তাহলে ফজরের স্থলে সে ওয়াক্ত বা নামাযের নাম উল্লেখ করতে হয়।

যেমন ঃ ছালাতিজ্ জোহর, ছালাতিল্ আছর, ছালাতিল মাগরিব, ছালাতিল্ এশা, ছালাতিল বিতির, ছালাতিত্ তাহাজ্জুদ, ছালাতিল এশরাক, ছালাতিল আউওয়াবীন, ছালাতিত তাছবীহ, ছালাতি তাহিয়্যাতিল ওযু, ছালাতি তাহিয়্যাতিল মাসজিদ, ছালাতিত তাওয়াফ, ছালাতিল ইস্তেখারা, ও ছালাতিল জানাজাতি ইত্যাদি এভাবে নাম উল্লেখ করতে হয়।

আর জমাত সহকারে নামায আদায় করতে গেলে নিয়্যতের মধ্যে ইমাম সাহেবের বলা উত্তম "আনা ইমামু লিমান্ হাদারা ওয়ামাই ইয়াহ্দুরু" এবং মুক্তাদিগণকে অবশ্যই বলতে হয় "ইকতিদাইতু বিহাজাল্ ইমাম" অর্থাৎ আমি নামাযের আরকান সমূহ আদায়ের বেলায় এ ইমামের অনুসরণের নিয়্যত করলাম।

উপরে উল্লেখিতভাবে নিয়্যতের কাজ সমাপ্ত করে মনে মনে স্বীকার করে যেতে হয় ঃ

হে প্রভূ আল্লাহ !

এ পাপী-অপরাধী দীনহীন বান্দা-আপনার পাক পবিত্র শাহী দরবারে গোলামের বেশে হাজির হয়েছি।

নিয়্যত করার শেষে "কা'বাতিশ্ শরীফাতি" বলার পর পরই ইমাম হলে উচ্চস্বরে এবং মুক্তাদি বা একাকী নামায আদায়কারী হলে চুপে চুপে তাকবীরে তাহরীমা (ফরয) আল্লাহু আকবর (ওয়াজিব) বলে পুরুষ মুসাল্লী হলে দু'হাতের তালু ও আঙ্গুলী সমূহের পেট-মাথা কেবলা মুখী রেখে (মুস্তাহাব) উভয় হাত এতটুকু উপরে উঠাতে হয় (সুন্নাত) যাতে দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর মাথা দ্বারা দু'কানের লতি স্পর্শ করা যায় (মুস্তাহাব)।

অতঃপর পুরুষ নামাযী নাভীর নীচে এবং মেয়ে নামাযী সীনায় বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের কবজী রেখে ডান হাতের শাহাদত মধ্যমা ও অনামিকা এ তিন আঙ্গুলি বাম হাতের কবজির উপর লম্বাভাবে রেখে ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা বাম হাতের কবজীকে জড়িয়ে ধরে হাত বাঁধতে হয় (সুন্নাত)। এবং সাথে সাথে প্রত্যেক প্রকারের মুসাল্লী তথা একাকী নামায আদায়কারী স্ত্রী-পুরুষ আর জমাত সহকারে নামায আদায়কারী ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই চুপে চুপে দোয়ায়ে ছানা (আল্লাহর প্রশংসা সম্বলিত দোয়া) পাঠ করতে হয় (সুন্নাত)।

দোয়ায়ে ছানা ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

বাংলায় উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ ইয়া আল্লাহ ! আপনি অতি পবিত্র, আমি আপনাকে আপনার প্রশংসার সাথে স্মরণ করতেছি। আপনার নাম বরকত ময়। আপনার গৌরব অতি উচ্চে আপনি ছাড়া আর কোন মাবুদ-উপাস্য নাই।

দোয়ায়ে ছানা পাঠ করা শেষ হলে একাকী নামায আদায়কারী এবং জামাত সহকারের নামাযে শুধু ইমামের চুপে চুপে তাআভউজু তথা-আউজু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম [আমি মহান আল্লাহ তাআলার নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি) এবং তাছমীয়া তথা বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম [পরম করুনাময় দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি] পাঠ করতে হয় (সুন্নাত)। অতঃপর ইমাম হলে (ফজরের নামায বিধায়) উচ্চ স্বরে এবং একাকী নামায আদায় কারীদের চুপে চুপে সূরা ফাতেহা (আল্ হামদু সূরা) পাঠ করতে হয় (ওয়াজিব)। এবং সূরা ফাতেহা পাঠ শেষ হওয়া মাত্র এ ইমাম অথবা একাকী নামায আদায়কারী পবিত্র কোরআনের যে কোন সূরা বা আয়াত সমূহ (কমপক্ষে তিনখানা আয়াত) পাঠ করবে (ওয়াজিব)। অতঃপর ইমাম বড় আওয়াজে এবং মুক্তাদি ও একাকী নামায আদায়কারী নিরবে 'তাকবীরে ইন্তেকালীয়া তথা আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে যাবে। (ফরয)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে,

যখন নামায জমাত সহকারে আদায় করা হয় তখন আমাদের হানাফী মাজহাব অনুসারে নামাযের দাড়ানো অবস্থায় শুধুমাত্র ইমাম সাহেবই আউজু বিল্লাহ-বিসমিল্লাহ, আলহামদু সূরা ও এর সাথে নিয়ম মাফিক যে কোন সূরা কেরাত পাঠ করে যাবে।

মুক্তাদীগনকে প্রথম রাকাতের দাড়ানোর শুরুতে দোয়ায়ে ছানাই (সুবহা -নাকা আল্লাহুম্মা --- শেষ পর্যন্ত) পাঠ করতে হয়। এরপর তাদেরকে নীরবই থাকতে হয় এবং ইমাম সাহেব সূরা কেরাত বড় আওয়াজে পড়লে উহা শুনে যেতে হয়। নিজের সূরা কেরাত পাঠ করা লাগে না। তবে কারো কারো মতে যেসব নামাযে ইমাম সূরা-কেরাত নীরবে পাঠ করে, সে ক্ষেত্রে মুক্তাদীগণ উচ্চারণ করে নয়, বরং মন-অন্তরের কল্পনায় সূরা ফাতেহা খানাকে শেষ পর্যন্ত কল্পনা করা উত্তম।

জামায়াতের নামাযে সূরা কেরাত ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় তাসবীহ ও দরূদ-দোয়া ইত্যাদি ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে সমভাবে পাঠ করে যেতে হয়।

রুকু অবস্থায় নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর নিজের দৃষ্টি রাখতে হয় (মুস্তাহাব)। (কোমর ও মাথাকে কাবা শরীফের দিকে বরাবর করে রাখতে হয়।) দু'হাতের তালুর দিক দ্বারা দু'হাটুকে মজবুত করে ধরতে হয় (সুন্নাত)।

শরীরের সম্মানিত অঙ্গ তথা মাথা নত অবস্থায় বিনম্র হৃদয় মন নিয়ে নিম্ন স্বরে "সুবহানা রাববিয়াল আযীম" (অতি পবিত্র আমার মহান প্রতি পালক) এ তাসবীহ তিনবার (৫বার বা ৭ বার) সকলকেই পাঠ করতে হয় (সুন্নাত)।

অতঃপর একাকী নামায আদায়কারী চুপে চুপে এবং জামায়াতের নামাযে শুধু ইমাম সাহেবের উচ্চস্বরে সামিয়াল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্ (মহান আল্লাহ তাআলা শোনেন তার প্রশংসা কারীর প্রশংসা) বলে (সুন্নাত) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাড়িয়ে একাকী নামায আদায়কারীকে এবং জমাতের নামাযে শুধু মুক্তাদীগণকে চুপে চুপে বলতে হয় "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বা রাববানা ওয়া লাকাল হামদ" কিম্বা রাববানা লাকাল হামদ। (হে আল্লাহ ! আপনিই আমাদের প্রভু এবং আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা) (সুন্নাত)।

এরপর ইমাম উচ্চস্বরে এবং মুক্তাদীগণ ও একাকী নামায আদায়কারী চুপে চুপে আল্লাহু আকবর" বলে (সুন্নাত) দেহের সর্ব মহান ও সম্মানী অঙ্গ মাথাকে ভুলুণ্ঠিত করতঃ স্বীয় প্রভু আল্লাহ তাআলার সমীপে নিজের আত্ম মর্যাদাকে লীন করে দেওয়ার প্রধানতম নিদর্শন সিজদায় যেতে হয় (ফরয)।

সিজদা করার সময় প্রথমে দু'হাটুকে জমিনে রেখে দু'হাতের তালুকে এরূপ ফাঁক করে জমিনে বিছাতে হয় (সুন্নাত)। যাতে হাতের আঙ্গুলির মাথা সমূহ কানের লতি পর্যন্ত পৌছে (সুন্নাত) এবং দুহাতের মাঝ খানের খালী জায়গায় কপাল-মাথা রেখে

ছিজদা করা যায়। অতঃপর দুহাতের মাঝখানের ঐখালী জায়গায় কপাল-নাক বিছিয়ে সেজদা করতে হয় (ফরয)।

সিজদারত অবস্থায় পুরুষদের রান থেকে নিজের পেট ও বাহুদ্বয়কে আলগা রাখতে হয়। আর মেয়েলোক সিজদারত অবস্থায় স্বীয় বাহুদ্বয়কে পেটের সাথে মিলিয়ে পাজরের সাথে জড়িয়ে রাখতে হয়। এরপর অতিশয় কাকুতি-মিনতি ও বিনম্র হৃদয় মনে চুপে চুপে 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আলা" (আমার মহান প্রভূ অতি পবিত্র) তিন বার, পাঁচবার কিংবা সাত বার পাঠ করতে হয়। (সুন্নাত)

তাসবীহ পাঠ শেষ হলে জামাতের নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে এবং মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী চুপে চুপে "আল্লাহু আকবর" বলে প্রথমে মাথা অতঃপর দু'হাত জমিন থেকে তোলে ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে আঙ্গুল সমূহের মাথা কেবলার দিকে করে প্রথম সেজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বাম পায়ের বিছানো পাতার উপর ভর দিয়ে বসে এক তাছবীহ বলার মত সময় স্থীর থাকতে হয়। অতঃপর ইমাম উচ্চস্বরে আর মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী চুপে চুপে আল্লাহু আকবর বলে পূর্ব নিয়মে দ্বিতীয় সেজদা করতে হয় (ফরয)।

এ সেজদারত অবস্থায় সুবহা-না রাব্বিয়াল আলা [আমার মহাপ্রভূ অতি পবিত্র] পূর্ব উল্লেখিত সংখ্যায় পাঠ করতঃ পুনরায় পূর্ব নিয়মে সবাই "আল্লাহু আকবর" বলে দ্বিতীয় সেজদা থেকে প্রথমে মাথা অতঃপর দু'হাত উঠিয়ে দু'হাত দু'হাটুর উপর রেখে শক্তভাবে হাটু ধরে দ্বিতীয় রাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সোজা দাড়িয়ে যাবে।

এ দ্বিতীয় রাকাতের শুরুতে জমাতের নামাযে শুধু ইমাম এবং একাকী নামায আদায়কারী চুপে চুপে শুধু 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলে প্রথম রাকাতের ন্যায় শুধু ইমাম বড় স্বরে আর একাকী নামায আদায়কারী নিম্নস্বরে সূরা ফাতেহা ও কোরআন করিমের অন্য কোন পূর্ণ সূরা বা আয়াত সমূহ পাঠ করে যাবে (ফরয)।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, জামায়াতের নামাযে মুক্তাদিগণের আউজু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা ও কেরাত সমূহ পাঠ করতে হয় না বরং ইমামের পাঠের দ্বারা মুক্তাদীর কোরআন পাঠ করার দায়িত্ব ও আদায় হয়ে যায়।

এ দ্বিতীয় রাকাতের কেরাত পাঠ শেষ হলে প্রথম রাকাতের নিয়মে রুকু সেজদা আদায় করতঃ পুরুষ লোককে নিজ ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে ও বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে রেখে উহাতে ভর দিয়ে দুজানু হয়ে বসতে হয় আর স্ত্রীলোকদের উভয় পায়ের পাতা ডান পার্শ্বে ছড়িয়ে নিতম্বের বাম অংশের উপর ভর দিয়ে অতিশয় নম্রতা ও আদবের সাথে বসতে হয় (ইহা শেষ বৈঠক হিসাবে ফরয)।

নামাযী বান্দা এতক্ষণধরে যেমনিভাবে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে হাজের-নাজের জেনে চরম তা'জীম ও প্রশংসা ইত্যাদি নিবেদন করে আসছিল। এখন নিজের এ বসা অবস্থায় ও নিজের একমাত্র মাবুদ ও মনিব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

pdf By Syed Mostafa Sakib

কে স্বীয় বাস্তব বিশ্বাস ধ্যানে হাজের নাজের জেনে মন অন্তরের পূর্ণ ভক্তি শ্রদ্ধা, তাজীম ও একাগ্রতা সহকারে চুপে চুপে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করতে হয় (ওয়াজিব)।

তাশাহ্হুদ

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছছালাওয়াতু ওয়াত্‌তাইয়্যিবাতু আছছালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু, আছছালামু আলাইনা ওয়াআলা ইবাদিল্লাহিছছালিহীনা আশহাদু আল্‌-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাছূলুহু।

অর্থ ঃ সর্বপ্রকার মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক প্রশংসা-এবাদত মহান আল্লাহ তাআলার জন্যই নিবেদিত। হে প্রিয় নবী (দঃ) আপনার উপর আল্লাহর অপরিসীম শান্তি রহমত ও অশেষ বরকত নাজিল হউক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ পাক ছাড়া আর কোন মাবুদ (উপাস্য) নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আল্লাহর (প্রেমাস্পদ) বান্দা ও রাসূল।

এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে,নামাযী তাশাহহুদ এর "আত্ত্যাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ্ছালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু" অংশ পাঠ করার সময় মন-অন্তর দিয়ে প্রভু আল্লাহ পাককে হাজের নাজের জানবে অর্থাৎ এধ্যান-বিশ্বাস রাখবে যেন মুছাল্লী নিজে তার খালেক, রব ও মাবুদ আল্লাহ তাআলার সামনেই আছে এবং সে তার তাহিয়্যাত (মৌখিক যাবতীয় এবাদত সমূহ) ছালাওয়াত (দৈহিক যাবতীয় এবাদত সমূহ) এবং তাইয়্যিবাত (আর্থিক) যাবতীয় এবাদত সমূহ তথা দেহ ও হৃদয় মনের চরম তাজীম এবং ভক্তি শ্রদ্ধার হাদীয়া সমূহ মহান আল্লাহর চরম নৈকট্যের মধ্যে আছে জেনেই নিবেদন করে যাচ্ছে।

এর পর যখন মুছাল্লী আত্ত্যাহিয়্যাতু এর "আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়ইউ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু" অংশ পাঠ করবে তখন সে আল্লাহর হাবীব নবীয়ে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কলব অন্তরের ধ্যানের মধ্যে আনবে এবং আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নুরানী চেহারা মুবারক ও পবিত্র নুরানী ছুরত-শেকল শরীফকে নিজের সামনে ধারণা-ধ্যান করতঃ মন-প্রাণের একান্ত বিনয় নম্রতা ও অতিশয় আদবের সাথে পেশ করে যাবে-

আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান নবীয়্যুউ.......... অর্থাৎ হে প্রিয় নবী! আপনার উপর মহান আল্লাহর পরম ও চরম ছালামতী-শান্তি এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার অপরিসীম রহমত ও বরকত নাজেল হউক (দুররে মোখতার, শামী, আলমগীরী।

অত্র মাছআলার নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণ সমূহ অত্র গ্রন্থের ফাজায়েল খন্ডে ইতিপূর্বে স্ববিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে তাই এখানে আর দীর্ঘায়িত করা হল না।

০ আত্তাহিয়্যাতু এর শেষ পর্য্যায়ে এসে যখন নামাযী আশ্‌হাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু .... শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে তখন আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের আত্মিক মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে বাস্তব স্বীকৃতির নিদর্শন স্বরূপ ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলির মাথা উপরে উঠিয়ে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ উপাস্য নাই - এবং আল্লাহ এক এ বিষয়ে মুছাল্লির ইশারা করা মুস্তাহাব।

০ মাসনাদে আহমদ" নামক প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে ঃ

আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

নামাযের "আত্তাহিয়্যাতু" এর শেষ পর্যায়ে কলেমা শাহাদাত পাঠের সময় শাহাদত আঙ্গুলি দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদের ইশারা করা শয়তানের প্রতি তীর নিক্ষেপের সমতুল্য।

ইশারার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

কলেমায়ে শাহাদত পাঠকালে ইশারার সময় ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলি দ্বয়কে বন্ধ করে নিতে হয় এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথাদ্বয়কে মিলিয়ে গোলক বানাতে হয়, অতঃপর কলেমা শাহাদতের লা-ইলা-হা বলার সময় শাহাদত আঙ্গুলির মাথা কেবলার দিকে ঝুকিয়ে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের ইঙ্গিত স্বরূপ উপরে উঠাতে হয়। আর 'ইল্লাল্লাহু বলার সময় উক্ত আঙ্গুলি নামিয়ে ফেলতে হয়। অতঃপর আঙ্গুলি সমূহকে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় সোজা করে নিতে হয়।

আবার কোন কোন কিতাবের বর্ণনামতে (ইহা প্রথম বৈঠক হলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাড়ানো পর্যন্ত এবং শেষ বৈঠক হলে ছালাম ফিরানো পর্যন্ত) এ গোলক অবস্থায় আঙ্গুলি সমূহকে রেখেই দিতে হয়।

এরপর যদি ইহা তিন কিংবা চার রাকাতী নামায হয় তাহলে তৃতীয় রাকাত আদায়ের জন্য দাড়িয়ে যেতে হয়।

কিন্তু যেহেতু ইহা ফজরের দু'রাকাতী ফরযের নামায, তাই এ ক্ষেত্রে আর না দাড়িয়ে সকল প্রকারের মুসাল্লীকে চুপে চুপে আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিম্নের দরূদ শরীফদ্বয় পাঠ করে যেতে হয় ঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِ نَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ছায়্যিদিনা ইব্রাহিমা ও ওয়ালা আ-লি ছায়্যিদিনা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারিক আলা ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা ছায়্যিদিনা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ছায়্যিদিনা ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

দরূদ শরীফ পড়া শেষ হলে নিম্ন বর্নিত দোয়ায়ে মাসুরা সমূহ হতে যে কোন একটি দোয়া ইমাম-মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী তথা সকল প্রকারের মুসাল্লীকে চুপে চুপে পাঠ করে যেতে হয় ঃ

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رضى الله عنه اَنَّهٗ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِىْ صَلَاتِىْ قَالَ قُلْ۔

অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ)! আমাকে একখানা দোয়া শিখিয়ে দিন যদ্দারা আমি আমার নামাযে দোয়া করতে পারি প্রতি উত্তরে আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ দোয়া খানা পাঠ করতে নির্দেশ দিলেন (বোখারী শরীফ) ঃ

১. দোয়ায়ে মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসী জুলমান কাছীরাও ওয়ালা ইয়াগ্ফিরুজজুনূবা ইল্লা আন্‌তা ফাগ্‌ফিরলী মাগ্‌ফিরাতাম মিন্ ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী ইন্নাকা আনতাল্ গাফূরুর রাহীম।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ। আমি নিজ আত্মার উপর অত্যাধিক জুলুম-অত্যাচার করেছি-একমাত্র আপনিই মহা মার্জনাকারী। অতএব, আপনি নিজ ক্ষমাগুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

২. বা নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়া লিওয়া লিদাইয়া ওয়া লিজামীয়িল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত ওয়াল মুছলিমীনা ওয়াল মুছলিমাত আল আহইয়ায়ি মিনহুম ওয়াল আমওয়াতে বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহিমীন।

৩. কিংবা নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করবে ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ রাব্‌বিজ আলনী মুকীমাচ্ছালাতি ওয়া মিন জুররিয়াতি রাববানা ওয়া তাকাববাল দু'য়ায়ী রাব্‌বানাগ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমূল হিসাব।

উক্ত দোয়া পাঠ করা শেষ হলে প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে ইমাম হলে উচ্চস্বরে এবং মুক্তাদীও একাকী নামায আদায়কারী চুপে চুপে "আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে ছালাম দিতে হয়-অতঃপর বাম দিকে অনুরূপভাবে মুখ ফিরিয়ে ছালাম দিতে হয়। ডান দিকে ছালাম দেওয়ার সময় নিজের দৃষ্টি ডান কাধের উপর এবং বাম দিকে ছালাম দেওয়ার সময় দৃষ্টি বাম কাঁধের উপর রাখতে হয়।

আরও উল্লেখ্য যে, জামাতের নামায হলে ইমাম ডান দিকে ছালাম দেওয়ার সময় ডান দিকের ফেরেস্তা ও মুক্তাদীগণকে ছালাম দেওয়া হচ্ছে মর্মে নিয়্যত করতে হয়, আর বাম দিকে ছালাম দেওয়ার সময় বাম দিকের ফেরেস্তা ও মুছাল্লীগণকে ছালাম দেওয়া হচ্ছে মর্মে নিয়্যত করতে হয়।

জামায়াতে নামাযের মুক্তাদী-মুছাল্লীগণ ডান দিকে ছালাম দেওয়ার সময় ডান দিকের ফেরেস্তাগণ এবং ইমাম সাহেব যদি তার ডান দিকে থাকেন তাহলে ইমাম ও ডান দিকের মুছাল্লীগণকে ছালাম দেওয়া হচ্ছে বলে নিয়্যত করবে। আর বাম দিকে ছালাম দেওয়ার সময় বাম দিকের ফেরেস্তা এবং ইমাম যদি বাম দিকে থাকেন তাহলে ইমাম ও বামদিকের মুসাল্লীগণকে সালাম দেওয়া হচ্ছে বলে নিয়্যত করবে।

একাকী নামায আদায়কারীর ডান দিকে সালাম দেওয়ার সময় ডান দিকের ফেরেস্তাগণকে এবং বাম দিকে ছালাম দেওয়ার সময় বাম দিকের ফেরেস্তাগণকে ছালাম দিচ্ছে বলে নিয়্যতে আনা লাগে। এভাবে দু'দিকে ছালাম দেওয়ার পর নিয়্যতকৃত নামায শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এতো গেল দু'রাকাত বিশিষ্ট নামায আদায়ের নিয়ম, কিন্তু যদি তিন বা চার রাকাত ওয়ালা নামায হয়, তাহলে তাশাহহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি --- থেকে আবদুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত পড়া শেষ হওয়া মাত্রই ইমাম হলে বড় স্বরে আর মুক্তাদীও একাকী নামায আদায়কারী চুপে চুপে 'আল্লাহু আকবর' বলে তৃতীয় রাকাত আদায়ের জন্য দাড়িয়ে যেতে হয় অতঃপর যদি ইহা ফরযের জামাত সহকারের নামায হয় তাহলে শুধু ইমাম চুপে চুপে বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা ফাতেহা পাঠ করে (সুন্নাত) বড় স্বরে আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে চলে যাবে। পূর্ব নিয়মে রুকু সেজদা করে তিন রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায হলে বসে উপরি উল্লেখিত নিয়মে আত্তাহিয়্যাতু-দুরূদ শরীফ ও দোয়া মাছুরা পাঠ করতঃ ডানে-বামে সালাম দিয়ে নামায শেষ করতে হবে।

আর যদি চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায হয় তাহলে তৃতীয় রাকাতের উভয় সিজদা করার পর পূর্ব নিয়মে তাকবীর বলে দাড়িয়ে বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে রুকু সিজদা করতঃ বসে তাশহহুদ-দরূদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাসুরা পাঠ শেষে ডানে-বামে ছালাম দিয়ে নামায সমাপ্ত করবে।

কিন্তু নামায যদি সুন্নাত নামায হয়। যেমন, জোহরের ফরযের পূর্বের চার রাকাতী সুন্নাত নামায। তাহলে পূর্ব বর্ণিত নিয়মে দু'রাকাত নামাযের তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু ...... ওয়া রাসূলুল্লাহু পর্যন্ত) পাঠ শেষ করে তৃতীয় রাকাত আদায়ের জন্য আল্লাহু আকবর বলে দাড়িয়ে শুধু বিসমিল্লাহ ..... পড়ে সূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি সূরা বা কমপক্ষে তিনখানা আয়াত পাঠ শেষ করে পূর্ব নিয়মে রুকু-সেজদা করে পুনঃ ৪র্থ রাকাত আদায়ের জন্য আল্লাহু আকবর বলে দাড়িয়ে যেতে হয়। অতঃপর বিসমিল্লাহ সহকারে সূরা ফাতেহা এবং এর সাথে অন্য যে কোন একটি সূরা কিংবা কয়েক খানা আয়াত (তিন আয়াত বা এর চেয়ে বেশী) পাঠ শেষ করতঃ পূর্ব নিয়মে রুকু-সেজদা করে বসে পড়তে হয় অতঃপর পূর্ব নিয়মে "আত্তাহিয়্যাতু" দরূদ শরীক ও দোয়ায়ে মাছুরা পাঠ করতঃ ডানে-বামে ছালাম দিয়ে নামায সমাপ্ত করতে হয়।

টীকা ঃ

(١) فاذا فرغ من الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم يستغفر لنفسه ولابويه وللمؤمنين والمؤمنات كذا فى الخلاصة (عالمگيريه)

(٢) ويستحب ان يقول المصلى بعد ذكر الصلوة فى اخر الصلوة رب اجعلنى مقيم الصلوة الخ كذا فى التاتارخانيه ناقلا عن الحجة ـ (عالمگيريه)

وللحديث من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمين والمؤمنات فهى خداج (بخرالرئق صفحہ ٣٣)

নবম পরিচ্ছেদ

ছালাম ফিরানোর পরক্ষণের মাছনূন দোয়া ও জিকির

হিছনে হাছীন নামক প্রসিদ্ধ দোয়ার কিতাবে বোখারী ও মুছলিম, আবুদাউদ, নাছায়ী ইত্যাদি হাদীছগ্রন্থ সমূহের বরাতে বর্ণিত আছে–

وَاِذَا سَلَّمَ يَقُوْلُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ / اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

অর্থাৎ যখন মুছাল্লী ফরয নামাযের ছালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে তখন (আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে) নিম্ন বর্ণিত দোয়াখানা পাঠ করবে।

দোয়া

লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকা লাহু লাহুল্ মূল্কু ওয়া লা হুল্ হাম্দু ইউহ্য়ী ওয়া ইয়ূমীতু বিইয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন্ কাদীর।

আল্লাহুম্মা লা-মা-নি–আ–লিমা আ' তাইতা ওয়ালা মূ'তী-লিমা মানা'তা ওয়া লা-ইয়ান্ফাউ জাল্ জাদ্দি মিন্কাল্ জাদ্দু।

নাছায়ী শরীফে উক্ত দোয়ার শুরু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু থেকে----ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদির পর্যন্ত তিনবার পাঠ করার ব্যপারেই বর্ণিত আছে।

নাছায়ী শরীফের অপর এক বর্ণনায় নামাযের ছালাম ফিরানোর পর اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ (আছতাগ ফিরুল্লাহ) তিনবার বলার নির্দেশ রয়েছে।

অপর এক হাদীছের বর্ণনা মতে উক্ত দোয়া ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু.......শায়ইন কাদীরুন এর পর লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্ নি মাতু ওয়া লাহুল্ ফাদ্লু ওয়া লাহুচ্ছানাউল হাছানু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিছীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল্ কাফেরুন পর্যন্ত পাঠ করতে হয়। (মুছলিম শরীফ)

প্রত্যেক ফরয নামাযের ছালাম ফিরানোর পর বিশুদ্ধ হাদীছ শরীফ সমূহের বর্ণনানুযায়ী নিম্নের সংক্ষিপ্ত দোয়া দ্বারা মু'নাজাত করা মুস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ (وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ) حَيِّنَا رَبَّنَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِالسَّلَامِ (وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَالسَّلَامِ) تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ) (مسلم، ترمذى، نسائى، ابوداؤد، ابن ماجه، طبرانى)

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্ তাচ্ছালাম ওয়া মিন কাচ্ছালামা। (ওয়া ইলাইকা এয়ারজি উচ্ছালাম) হাইয়িনা রাব্বানা বিচ্ছালাম ওয়া আদখিলনা দারাচ্ছালাম) তাবা-রাকতা (রাব্বানা ওয়াতা আলাইতা) এয়াজালজালালি ওয়াল্ ইক্রাম। (বিরাহ্ মাতিকা এয়া আর হামার রাহিমীন)

হযরত ইমাম ছাখাভী (রঃ) اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ الشَّفِيْعِ নামক গ্রন্থের واماعقب الصلوة পরিচ্ছেদে এবং হাফিজ ইব্নোল কাইয়েম جَلَاءُ الْاَفْهَامِ গ্রন্থের اَلْمَوَاطِنُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُوْنَ مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ عَقِيْبَ الصَّلٰوةِ পরিচ্ছেদে নামাযের পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা প্রসঙ্গেঁ বর্ণনা করেন যে, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হযরত আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ওমর (রঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন—

كُنْتُ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرِبْنِ مُجَاهِدٍ فَجَاءَ الشِّبْلِىُّ رح فَقَامَ اِلَيْهِ اَبُوْ بَكْرِبْنُ مُجَاهِدٍ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ يَاسَيِّدِىْ تَفْعَلُ هٰذَا بِالشِّبْلِىِّ وَاَنْتَ وَجَمِيْعُ مَنْ بِبَغْدَادَ لَيَتَصَوَّرُ اَنَّهُ مَجْنُوْنٌ فَقَالَ لِىْ فَعَلْتُ بِهٖ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهٖ وَذٰلِكَ اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى الله عليه وسلم فِى الْمَنَامِ وَقَدْ اَقْبَلَ الشِّبْلِىُّ فَقَامَ اِلَيْهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَفْعَلُ هٰذَا بِالشِّبْلِىِّ فَقَالَ هٰذَا يَقْرَأُ بَعْدَ صَلٰوتِهٖ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اِلٰى اٰخِرِهَا . وَيُتْبِعُهَا بِالصَّلٰوةِ عَلَىَّ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةً فَرِيْضَةً اِلَّا وَيَقْرَاُ خَلْفَهَا (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ) اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ وَيَقُوْلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ الشِّبْلِىُّ سَاَلْتُهُ عَمَّا يَذْكُرُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

অর্থাৎ, আমি আবুবকর ইবনে মুজাহিদ (রঃ) যিনি একজন যুগ শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ আল্লাহর ওলি এবং মুহাদ্দিছ ছিলেন তাঁর নিকট ছিলাম। ইত্যবসরে জগত খ্যাত অলিয়াল্লাহ হযরত শিব্লী (রঃ) তাশরীফ আনলেন। এতে হযরত আবু বকর ইবনে মুজাহেদ (রঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উনার সাথে (মুয়ানাকা) করমর্দন করলেন আর উনার দু' চোখে চুমা দিলেন, আমি বললাম এয়া ছায়্যেদী!

আপনার ন্যায় মহান ব্যক্তিত্ব শিবলী (রঃ) (তখনো শিবলী (রঃ) এর কামালিয়াত এর ব্যাপারটা তত সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেনি।) এর সাথে এরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করলেন, অথচ আপনি এবং বাগদাদবাসী সকলেই জানেন যে শিবলী (রঃ) একজন পাগল বই আর কিছুই নন।

তিনি উত্তরে তখন আমাকে বললেন শুনুন! প্রিয় হাবীব, রাহমাতুললিল আলামীন (দঃ)-কে হযরত শিব্লী (রঃ)-এর প্রতি যে ভাবে করতে দেখেছি আমিও উনার প্রতি তদরূপ আচরণ করেছি। আমি আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত শিব্লী (রঃ) আল্লাহর প্রিয় রাছূল (সঃ) এর দরবারে হাজির হলেন এবং প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দাঁড়িয়ে তার দু'চোখে চুমা দিলেন।

আমি আল্লাহর রাছূলের খেদমতে আরজ করলাম এয়া রাছুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়াছাল্লাম! আপনি শিবলির (রঃ) প্রতি কি কারনে এরূপ করলেন?

উত্তরে প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করলেন, সে প্রত্যহ ফরয নামায শেষে "লাকাদ জা-আকুম রাছূলুম মিন্আনফু ছিকুম আয়াত খানা পাঠ করতঃ আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে (অন্য এক রেওয়ায়ত মোতাবেক আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) বললেন, আশি বৎসর যাবৎ সে এ আমলটি করে আসছে—

اَفَلَا اُكْرِمُ مَنْ يَفْعَلُ هٰذَا ؟

(সে লোককে আমি কোন অজুহাতে আদর না করে পারি?)

তাই আমি তাকে এভাবে আদর-স্নেহ দেখিয়েছি। অতপর হযরত শিবলী (রঃ) আসলে এবং আমি তাকে এ আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন হাঁ- আমি এ আমল করে থাকি।

হযরত আবী উমামা (রঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন,

وَمَنْ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . اَللّٰهُمَّ اَعْطِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدَا الْوَسِيْلَةَ وَاجْعَلْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

فِى الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهُ ـ وَفِى الْعَالَمِيْنَ دَرَجَتَهُ وَفِى الْمُقَرَّبِيْنَ داره ـ (رواه الطبرانى فى الكبير والقول البديع)

অর্থাৎ যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর উক্ত দোয়া খানা দ্বারা মুনাজাত ফরিয়াদ করবে, আমার পক্ষ হতে কিয়ামত দিবসে তার জন্য সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। সুতরাং ফরয নামাযের পর যে কোন রকমের দরূদ শরীফ বিশেষ করে সম্বোধনসূচক বাক্য—

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া নবীয়্যাল্লাহ, আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া হাবীবাল্লাহ- দ্বারা প্রিয় নবী (সঃ)-এর উপর দরূদ ছালাম পেশ করা উত্তম।

মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত আছে, যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর (কিংবা প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরজের পরে ছুন্নাত-নফল শেষে) তেত্রিশ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (ছুবহা-নাল্লাহ) তেত্রিশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্হামদু লিল্লাহ) এবং তেত্রিশ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) একশত পুরা হওয়ার জন্য একবার—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উক্ত দোয়াখানা পাঠ করবে তার পাপ-গুনা সমূদ্রের ফেনা পুঞ্জের সম পরিমান হলেও মহান আল্লাহ এ তাছবীহ-তাহমীদের ওয়াছিলায় তা ক্ষমা করে দেবেন।

নামায শেষে দোয়া মুনাজাতের মাছায়েল

আমরা সবাই হলাম বান্দা, আর দয়াময় করুনাময় মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু হলেন আমাদের মহা মহীম খালিক-রব-মালিক-মনিব ও উপাস্য, সমস্ত এবাদত উপাসনা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্ত্বা।

আমাদের ইহ-পরকালীন সার্বিক কল্যাণ, মুক্তি ও শান্তি সব কিছু তারই পবিত্র হাতে, তারই পবিত্র নিয়ন্ত্রনে, আমাদের রুজী-রোজগার, হায়াত-মওত ও ধন-দৌলতের ভান্ডার তারই নিকট সুরক্ষিত।

মহা মহিম মালিক-মাওলা আল্লাহ তাআলা ইহাই চান যে, বান্দা তারই শাহী দরবারে ইহ-পরকালীন সার্বিক মঙ্গল-কল্যাণ-মুক্তি এবং সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আবেদন-নিবেদন করতে থাকুক। কায়মন বাক্যে কাকুতি-মিনতি সহকারে আজেজী-ইনকেছারী (চরম অনুনয় বিনয়) এর সহিত বিগত জীবনের পাপ -নাফরমানির জন্য লজ্জিত-অনুতপ্ত অন্তর-মন নিয়ে কেঁদে-কেঁদে নয়নের জলে বুক ভাসিয়ে আবেগ জড়িত কণ্ঠে প্রভূর করুনা ভিক্ষা করতে থাকুক, প্রার্থনা-মুনাজাত পেশ করে যাক। এতেই প্রভূ খুশী হন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর প্রত্যেক ফরয নামায, অনুরূপ ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামায সমূহের পরের সময়টাই হচ্ছে এ দোয়া-মুনাজাত আল্লাহ্র দরবারে কবুল ও গ্রহণীয় হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সময়।

কারণ তাছবিহ, ছানা কুরআন তেলাওয়াত ও রুকু সিজদা তথা মহান আল্লাহর গুণগান ও পবিত্রতার জিকির করে করে বান্দার মন-মুখ কে পবিত্র করতঃ যখন কোন প্রার্থনা-ফরিয়াদ করা হয় তখন মহান আল্লাহর দরবারে ঐ দোয়া-ফরিয়াদ কবুল না হয়ে পারে না, নিশ্চয় কবুল হয়ে থাকে।

এদিক বিবেচনা করে ইসলামী শরীয়াত প্রত্যেক নামায আদায়ের পরক্ষনে বিশেষতঃ ফরয নামায আদায়ের পর মুহূর্তে দুহাত তোলে আবেগ জড়িত কণ্ঠে পরম করুনাময়, মেহেরবান, ক্ষমাশীল আল্লাহর মহান দরবারে কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া-মুনাজাত করাটাকে মুস্তাহাব করে দিয়েছে।

বান্দা কর্তৃক আদায়কৃত আমালে-ছালেহা সমুহ মহা প্রভূ আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা ও গ্রহণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে দোয়া মুনাজাতই হল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু নামাযের পরে এ কল্যাণকর আমল তথা হাত তোলে দোয়া-মুনাজাত করার বিষয়টি নিয়ে আমাদের এক শ্রেণীর মুফতী-আলেম অনেক অনেক বাড়াবাড়ি করে থাকেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও ইবনুল কাইয়েম এবং এদের অনুসরণে আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা মুফতী-আলেমও এ দোয়া মুনাজাতকে বেদআতরূপে মত-মন্তব্য করে বসেছেন এবং এর দ্বারা সরলমনা মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।

সুতরাং মুসলিম ভাইদের এ বিভ্রান্তির নিরসন কল্পে, এ ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়ে এবং তদ্বানুযায়ি আমল করতঃ পরম করুনাময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ দান উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে দোয়া মুনাজাত করার বৈধতার ব্যাপারে দলিল প্রমান ভিত্তিক এ আলোচনাটুকু পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে ঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়েছেন— اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ বান্দা! তোমরা আমার নিকট দোয়া ফরিয়াদ কর আমি তোমাদের দোয়া-মুনাজাত কবুল করে নেব।

✪ হযরত নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ-

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَاتِ

অর্থাৎ দোয়া-মুনাজাতই হচ্ছে যাবতীয় এবাদত উপাসনা সমূহের সার (মুল)।

✪ হযরত আবু মুছা আশআরী (রঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে,আল্লাহর রাসূল

(দঃ) এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ كَانَتْ لَهُ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ فَلْيَدْعُ بِهَا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَفْرُوْضَةٍ ـ (كنز العمال)

অর্থাৎ যখন কারো কোন হাজত-মাকছুদ মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করতে হয়, তখন সে যেন প্রত্যেক ফরয নামায শেষেই তা আল্লাহর দরবারে পেশ করে।

✪ হযরত আছওয়াদ আমেরী (রঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেনঃ

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى الله عليه وسلم اَلْفَجْرَ فَلَمَّا اِنْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا ـ (مصنف ابن ابى شيبه)

অর্থাৎ আমি (একদা) আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পিছনে ফজরের নামায আদায় করি অতঃপর (আমি দেখেছিয়ে) প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নামাযের ছালাম ফিরানোর পর ফিরে দুহাত উঠিয়ে দোয়া করলেন।

✪ তাফছিরে ইবনে কাছীরের প্রণেতা হাফেজ এমাদুদ্দীন ইবনে কাছির স্বীয় তাফছীর গ্রন্থে আল্লাহর বানী- اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الايه এর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ مُسْتَقْبِلَا الْقِبْلَةِ

অর্থাৎ হুজুর করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নামাযের ছালাম ফিরানোর পর কেবলার দিকে থাকা অবস্থায় হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন।

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيْضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَمَنْ خَتَمَ الْقُرْاٰنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

(رواه الطبرانى فى الكبير)

অর্থাৎ হযরত এরবাজ ইবনে ছারিয়া (রা) হতে বর্ণিত তিনি হযরত নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

প্রত্যেক ফরয নামায আদায়কারী মুছল্লীর নামায আদায় করে নেওয়ার পরক্ষনে দোয়া মুনাজাত অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোরআনুল করীম খতম করার পরক্ষনের দোয়া-মুনাজাতও কবুল হয়ে থাকে।

✪ অন্য একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে—

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِلٰهِىْ وَاِلٰهَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَسْتَجِبْ دَعْوَتِىْ فَاِنِّىْ مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمُنِىْ فِىْ دِيْنِىْ فَاِنِّىْ مُبْتَلًى وَتَنَالُنِىْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّىْ مُذْنِبٌ وَتُنْفِىْ عَنِّى الْفَقْرَ فَاِنِّىْ مُتَمَسْكِنٌ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ ـ (رواه ابن السنى تلميذ النسائ فى عمل اليوم والليله)

অর্থাৎ হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেন যে বান্দা প্রত্যেক নামাযের পর উল্লেখিত

اللهم الهى واله جبرائيل .... فانى متمسكن

পাঠ করতঃ মুনাজাত করবে,মহান আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার হাত খালি ফিরিয়ে দেবেন না বলে নিজেই নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন।

হযরত ছালমান ফার্সী (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে যে,আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেন—

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ـ (رواه احمد وابو داؤد وترمذى وابن ماجه)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অতিশয় সংভ্রমশীল এবং দয়াবান (এ গুণের কারনে) তার কোন বান্দা তারই দরবারে হাত ইঠিয়ে দোয়া প্রার্থনা করতে থাকলে তিনি তাদের ঐ হাতকে নৈরাশ খালী ফিরিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করেন।

✪ হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবীয়ে আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেনঃ

سَلُوْا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْاَلُوْا بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ ـ (ابوداؤد ـ البيهقى ـ احمد)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট হাতের পেট দ্বারা অর্থাৎ, হাতের তালু নিজ চেহারার দিকে রেখেই প্রার্থনা মুনাজাত করবে। হাতের পিঠ দ্বারা মুনাজাত করবেনা এবং দোয়া মুনাজাত শেষ হলে উক্ত হাত দ্বারা মুখ মছেহ্ করে নিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ ইমাম তিবরানী (রঃ) মুজামে কবীর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়ত করেছেনঃ

كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا دَعَا ضَمَّ كَفَّيْهِ وَجَعَلَ بُطُوْنَهُمَا بَلِىْ وَجْهَهٗ ۔

অর্থাৎ হযরত নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দোয়া মুনাজাতের সময় উভয় হাতকে মিলিয়ে নিতেন এবং উভয় হাতের ভিতরের অংশ অর্থাৎ, হাতের তালুদ্বয়কে নিজের চেহারা মোবারকের দিকে রেখেই দোয়া করতেন।

✪ সর্বোপরি ইসলামী বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ বোখারী শরীফে হযরত ইমাম বোখারী (রঃ) দোয়া মুনাজাতের সময় হাত উঠিয়ে মুনাজাত করার সমর্থনে كِتَابُ الدَّعَوَاتِ নামে একটি بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ (পরিচ্ছেদ) নির্ধারণ করেছেন এবং তাতে তিনি নিম্নে বর্ণিত হাদীছ শরীফ সমূহের বর্ণনা দিয়েছেনঃ

১. وَقَالَ اَبُوْمُوْسٰى دَعَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

২. وَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ رض رَفَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

৩. عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ وَشَرِيْكٍ سَمِعَا اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ (بخارى جلد دوم)

উল্লেখিত হাদীছ শরীফ সমূহের সার অর্থ হল আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দোয়া মুনাজাতের সময় হাত তোলতেন।

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে বর্নিত আছেঃ

قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْتَمِعُ مَلَاءٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ اِلَّا اَجَابَهُمُ اللّٰهُ (رواه الطبرانى والحاكم والبيهقى عن حبيب بن سلمة الفهرى رض)

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় নবী (দ) এরশাদ করেন- কোন জামাআত বদ্ধ লোকদের মধ্য হতে কেউ দোয়া মুনাজাত করলে আর অন্যান্যরা আমীন! আমীন!! বলতে থাকলে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহ তাদের এ দোয়া নিশ্চয় কবুল করে নেন।

শ্রদ্ধেয় পাঠক ঃ

সাধারণভাবে কিংবা বিশেষ অবস্থায় যেমন ফরয কিংবা ওয়াজিব সুন্নাত ও নফল ইত্যাদি নামায শেষে হাত উঠিয়ে দোয়া-মুনাজাত করার সমর্থনে উপরে উদ্ধৃত হাদীছ শরীফ সমূহ ব্যতীত আর ও অনেক হাদীছ শরীফ রয়েছে।

একটা বিষয়-তাও আবার কোন ফরয-ওয়াজিব নয় বরং একটি সুন্নাত -মুস্তাহাব বিষয়ের প্রমানের জন্য যে ক্ষেত্রে ২/৩ টি হাদীছই যথেষ্ট সে ক্ষেত্রে এত অধিক সংখ্যক হাদীছ শরীফ থাকা সত্ত্বেও আপত্তি কারীরা কেন অহেতুক এবিষয়ে আপত্তি তোলে আমলের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে চলেছে তা মোটেই বোধগম্য নয়।

যাই হউক উপরে উদ্ধৃত হাদীছ শরীফ সমূহ পাঠে যে কয়েকটি বিষয় জানা গেল এবং দোয়া-মুনাজাত বিষয়টির বৈধতা সর্ম্পকে যা প্রমানিত হল তা নিম্নে পেশ করা হল।

প্রথম ঃ আমরা জানতে পারলাম যে—

নামাযের ছালাম ফিরানোর পরক্ষণে আল্লাহর পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাত মোবারক তোলে যথা নিয়মে দোয়া-মুনাজাত করেছেন। এবং এতে আরও জানাগেল যে,ফরয নামাযের পরক্ষণের দোয়া ফরিয়াদই মহান আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী কবুল হয়ে থাকে।

✪ এও জানা গেল যে,একাকী যেমনি ভাবে হাত উঠিয়ে দোয়া মুনাজাত করা মুস্তাহাব,অনুরূপ ভাবে জামাতবন্দী হয়ে সম্মিলিত ভাবেও সকলের পক্ষ থেকে এক জনের দোয়া-মুনাজাত করে যাওয়া আর অন্যান্যরা আমীন! আমীন! (কবুল করুন, কবুল করুন) বলে যাওয়াটা মুস্তাহাব।

✪ দোয়া-মুনাজাতের সময় উভয় হাতকে মিলিয়ে রাখা এবং দোয়া শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখ-চেহারা মাছেহ করে নেওয়াটা ও মুস্তাহাব।

০ উদ্ধৃত হাদীছ শরীফ সমূহ দ্বারা আরো প্রমানিত হয় যে, দোয়া-মুনাজাত যেমনি ভাবে কেবলা মুখীহয়ে করা মুস্তাহাব অনুরূপ ভাবে মুছাল্লী বা সমবেত লোকদের দিকে ফিরেও দোয়া মুনাজাত করা জায়েজ।

এবার উক্ত মুনাজাতের বিষয়ে হাদীছ শরীফ সমূহের ভাষ্যকার ও ফোকাহায়ে ইজামগণের বক্তব্য কি তা একটু লক্ষ্য করুন ঃ

ছহী বোখারী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আল্লামা আইনী (র) ওমদাতুল কারী গ্রন্থে বলেন-

وَيَدْعُوْ فِى الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ لِاَنَّهٗ لَا صَلٰوةَ بَعْدَهُمَا فَيَجْعَلُ الدُّعَاءَ بَدَلَ الصَّلٰوةِ وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يَدْعُوَ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَالَ فِى التَّوْضِيْحِ اَيْضًا اِذَا

pdf By Syed Mostofa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَرَادَ الْإِمَامُ اَنْ يَنْتَقِلَ فِىْ الْمِحْرَابِ وَيُقْبِلُ عَلٰى النَّاسِ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ جَازَ اَنْ يَنْتَقِلَ كَيْفَ شَاءَ، وَاَمَّا الْاَفْضَلُ فَاَنْ يَجْعَلَ يَمِيْنَهُ اِلَيْهِمْ وَيَسَارَهُ اِلٰى الْمِحْرَابِ وَقِيْلَ عَكْسُهُ وَبِهِ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح صفحه١٢٢، ج٦

ছহি মুসলিম শরীফের অন্যতম ব্যাখ্যাকার এবং অনেক হাদীছ গ্রন্থের প্রণেতা হযরত ইমাম নববী (রঃ) "শরহে মুহাজ্জাব" নামক কিতাবে বলেন—

اَلدُّعَاءُ لِلْإِمَامِ وَالْمَامُوْمِ وَالْمُنْفَرِدِ مُسْتَحَبٌّ عَقْبَ كُلِّ صَلٰوةٍ بِلَا خِلَافٍ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُقْبِلَ عَلٰى النَّاسِ فَيَدْعُوْ۔

অর্থাৎ নামাযের পর ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী সকলের দোয়া-মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এ মাছআলায় কারো মতানৈক্য-দ্বিমত নাই এবং ইমামের কিবলার দিক থেকে মুছাল্লীদের দিকে ফিরে বসে দোয়া-মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

✪ ভারত উপ-মহাদেশের প্রথম মুহাদ্দিছ শেখুদ্ দালাইল হযরত আবদুল-হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) স্বরচিত "একমাল" নামক গ্রন্থে বলেনঃ

وَاِنَّ مِنْهَا الدُّعَاءُ اِثْرَ الصَّلٰوةِ وَاَنْكَرَ الْاِمَامُ اِبْنُ عَرَفَةَ وُجُوْهَ الْخِلَافِ فِىْ ذٰلِكَ وَقَالَ لَا اَعْرِفُ فِيْهِ كَرَاهِيَةً دُعَاءِ الْاِمَامِ عَقْبَ الصَّلٰوةِ وَتَامِيْنَ الْحَاضِرِيْنَ عَلٰى دُعَائِهِ۔

অর্থাৎ, দোয়া কবুল হওয়ার সময় সমূহের মধ্যে নামাযের পরক্ষণের সময় একটি উপযুক্ত সময়। ইমাম ইবনে আরফা এ মাছআলাতে কারো কোন এখতেলাপ দ্বিমত নাই বলে উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে তিনি এও বলেছেন যে, নামাযের শেষে ইমামের মুনাজাত করা আর মুক্তাদীগণের আমীন আমীন বলার মধ্যে কোন কারাহিয়্যাত (দোষ) নাই।

হানাফী মাযহাবের বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব "দুররুল মোখতার" এ নামাযের পর দোয়া-মুনাজাতের সমর্থনে বলা হয়েছে–

وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَسْتَغْفِرَ ثَلٰثًا وَيَقْرَأُ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ وَالْمُعَوِّذَاتِ وَيُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُكَبِّرُ ثَلٰثًا وَثَلٰثِيْنَ وَيُهَلِّلُ تَمَامَ الْمِائَةِ وَيَدْعُوْ وَيَخْتِمُ بِسُبْحَانَ رَبِّكَ الخ ۔ صفحه٢٧٤ ج١

✪ হানাফী মাজহাবের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব "নুরুল ঈজাহ্তে এবং তদ্ব্যাখ্যাগ্রন্থ "মারাকিউল ফলাহ" তে বলা হয়েছে ঃ

(وَيُسْتَحَبُّ لِلْاِمَامِ بَعْدَ سَلَامِهِ اَنْ يَتَحَوَّلَ) ......(وَ) يُسْتَحَبُّ (اَنْ يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ) اَىْ بَعْدَ التَّطَوُّعِ وَعَقْبَ الْفَرْضِ اِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ نَافِلَةٌ يَسْتَقْبِلُ (النَّاسَ) اِنْ شَاءَ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِىْ مُقَابِلِهِ مُصَلٍّ لِمَا فِىْ الصَّحِيْحَيْنِ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا صَلّٰى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (ثُمَّ يَدْعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ) بِالْاَدْعِيَةِ الْمَاثُوْرَةِ الْجَامِعَةِ لِقَوْلِ اَبِىْ اُمَامَةَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلٰوتِ الْمَكْتُوْبَاتِ .... (رَافِعِىْ اَيْدِيْهِمْ) حِذَاءَ الصَّدْرِ وَبُطُوْنُهَا مِمَّا يَلِىَ الْوَجْهَ بِخُشُوْعٍ وَسُكُوْنٍ .... (ثُمَّ يَمْسَحُوْنَ بِهَا) اَىْ بِاَيْدِيْهِمْ (وُجُوْهَهُمْ فِىْ اٰخِرِهِ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا وَفِىْ رِوَايَةٍ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَاللّٰهُ تَعَالٰى الْمُوَفِّقُ صفحه٢١٤

অর্থাৎ ইমামের জন্য সুন্নাত-নফল নামায শেষে অনুরূপ যে যে ফরয নামাযের পর কোন ছুন্নাত-নফল নামায নাই, ঐ সব ফরয নামাযের ছালাম ফিরানোর পর যদি ইমামের সামনে নামায আদায়রত কোন মুছাল্লী না থাকে তাহলে কেবলার দিক হতে মুছাল্লীগণের দিকে ফিরে বসাটা অতঃপর নিজের ও অপরাপর মুসলমানদের জন্য কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দোয়া মুনাজাত দ্বারা সিনা বরাবর উভয় হাত উঠিয়ে অত্যন্ত নম্রতা ও কাকুতি-মিনতি সহকারে মুনাজাত করাটা মুস্তাহাব। অতঃপর উহা দ্বারা মুখ মাছেহ করে নিবে।

✪ শেখ মানছুর ইবনে ইদ্রিস হাম্বলী (র) اقناع নামক কিতাবের শরাহ্তে বলেন–

وَيُسَنُّ ذِكْرُ اللّٰهِ وَالدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ عَقْبَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ ......
وَيَدْعُوْ الْاِمَامُ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ لِحُضُوْرِ الْمَلَائِكَةِ فِيْهِمَا فَيُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى

الدُّعَاءِ فَيَكُوْنُ اَقْرَبَ لِلْاِجَابَةِ ـ وَكَذَا يَدْعُوْ بَعْدَ غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلٰوةِ لِاَنَّ مِنْ اَوْقَاتِ الْاِجَابَةِ اِدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَيَبْدَأُ الدُّعَاءُ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَيَخْتِمُ بِهِ وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَاَوْسَطَهُ (وَقَالَ) وَيُكْرَهُ لِلْاِمَامِ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بَلْ يَسْتَقْبِلُ الْمَامُوْمِيْنَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اَنَّهُ يَنْحَرِفُ اِلَيْهِمْ وَيَبْلُغُ الدَّاعِىْ فِى الدُّعَاءِ وَيُكَرِّرُ ثَلٰثًا .....وَالظَّاهِرُ اَنَّهُمْ لَا يَكْرَهُوْنَ الْجَهْرَ بِالدُّعَاءِ لِقَصْدِ التَّعْلِيْمِ وَالتَّامِيْنِ ـ (সংক্ষিপ্ত)

অর্থাৎ ফরয নামাযের পরে আল্লাহ পাকের জিকির করা, ইস্তেগ্‌ফার তথা আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ........ পাঠ করা এবং দোয়া করা সুন্নাত........ ইমাম ফজর ও আছরের নামাযের পর যেহেতু এ দু'ওয়াক্তে ফেরেস্তাদের আগমন-প্রস্থান হয়ে থাকে এবং এরা দোয়া করার সময় আমীন বলে থাকেন। তাই এই দু সময়ে দোয়া-মুনাজাত করে যাবে। এতে করে এ দু'ওয়াক্তের দোয়া-মুনাজাত অধিক অধিক কবুল হয়ে থাকে।

অনুরূপ এ দু ওয়াক্ত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে ও দোয়া মুনাজাত করে যাবে, (কারণ হাদীছ শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী) ফরয নামাযের পরক্ষণের সময়টা হচ্ছে দোয়া-মুনাজাত কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়।

কবুল হওয়ার নিমিত্তে আল্লাহ তাআলার হাম্দ ছানা দ্বারা দোয়া মুনাজাত শুরু ও শেষ করতে হয়। এবং (কবুল করানোর লক্ষ্যে) দোয়া মুনাজাতের শুরু, মধ্য ও শেষ মূহুর্তে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরুদ-ছালাম পাঠ করতে হয়।

(নামাযের পরক্ষণের) দোয়া মুনাজাতের সময় কেবলা মুখি থাকাটা একধরনের মাকরুহই বটে বরং মুছাল্লীদের দিকেই ফিরে বসতে হয় এবং দোয়া করার সময় অতিশয় কান্নাকাটি অথবা কান্নার ভাব অবলম্বন করতঃপ্রতিটি দোয়াকে তিনবার করে বলে যেতে হয় (এ ক্ষেত্রে এও জানা থাকা দরকার যে) জামাত কিংবা মাজলিসের অন্যান্যরা ইমাম সাহেব বা দোয়াকারী থেকে শুনে কোরআন ও হাদীছের দোয়া সমূহ যেন শিখে নিতে পারে অনুরূপ দোয়া মুনাজাত সমূহ শুনে শ্রবণকারীগণ যেন আমীন! আমীন! বলতে পারে এ দুউদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে দোয়া মুনাজাত করাটা মোটেই মাকরুহ নয় (বরং বৈধ এবং উত্তম)।

শ্রদ্ধেয় পাঠক। শুধু তাই নয় বরং আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতি পক্ষের ইমাম আশরাফ আলী থানবী সাহেব নামায শেষে হাত তোলে মুনাজাত করার ব্যাপারে এমদাদুল ফতোওয়ায় কি বলেছেন একটু লক্ষ্য করুনঃ-

بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنَ الصَّلٰوةِ يَدْعُوْ الْاِمَامُ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ رَافِعِىْ اَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ নামায শেষকরে ইমাম নিজের জন্য এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্য দো হাত উঠিয়ে মুনাজাত করবে।

তিনি অত্র কিতাবে আরও বলেন,

اِنَّ الدُّعَاءَ دُبُرَ الصَّلٰوةِ مَسْنُوْنٌ وَمَشْرُوْعٌ فِى الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ لَمْ يُنْكِرْهُ اِلَّا نَاهِقٌ مَجْنُوْنٌ قَدْ وَصَلَ فِىْ سَبِيْلِ هَوَاهُ وَوَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطَانُ وَاَغْوَاهُ ـ

অর্থাৎ নামায শেষে দোয়া মুনাজাত করা সুন্নাত এবং চার মাজহাবের সম্মিলিত রায় অনুসারে ইহা পুরাই শরীয়াত সম্মত। পাগল, গাধা এবং যে লোক নিজের নফছ দ্বারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে বা যাকে শয়তান কুপ্ররোচনা দিয়েছে এবং বিপথগামী করে ফেলেছে ঐ লোক ছাড়া অন্য কোন মুসলমান নামাযের পর দোয়া মুনাজাতের সুন্নাত হওয়া বিষয়টাকে অস্বীকার করতে পারেনা।

তিনি সত্যই বলেছেন একটি সুন্নাত মুস্তাহাব আমলের স্বপক্ষে শরীয়াতের এতগুলো দলীল প্রমান থাকা সত্ত্বেও এ আমলকে বেদআতরূপে ফতোওয়া দেওয়া কোন ঈমানী বিবেক সম্পন্ন মুফতী কিংবা আলেমের দ্বারা সম্ভব নয় বরং ঈমানী বিবেক হারা লোকের দ্বারাই তা সম্ভবপর হতে পারে।

দোয়া মুনাজাতের কয়েকটি মাছায়েল ঃ

প্রত্যেক ওয়াক্তিয়া ফরয নামাযের পর, জুমআর নামাযের জমাতের পর অনুরূপ রমজানের তারাবীহর নামাযের প্রতি চার রাকাতের পর রমজানের বিতরের জামাত শেষে এবং দু ঈদের খোতবা শেষ করে ইমাম মুক্তাদিগণের সম্মিলিত ভাবে হাত তোলে উচ্চস্বরে আজেজী-ইনকেসারীর সাথে দোয়া মুনাজাত করা মুস্তাহাব। হাদীছ শরীফের মর্মানুসারে একাকী দোয়া মুনাজাতের চেয়ে সকলের সম্মিলিত দোয়াই আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে বেশী বেশী গ্রহনীয়।

যে সব ফরয নামাযের পর সুন্নাত-নফল নামায রয়েছে সে সব ফরয নামাযের পর মুনাজাত সংক্ষিপ্ত হওয়া উত্তম।

✪ ফরয নামাযের পর যেমনি ভাবে দুহাত উঠিয়ে সম্মিলিত ভাবে দোয়া মুনাজাত

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা মুস্তাহাব। অনুরূপ সুন্নাত-ওয়াজিব ও নফল নামায শেষে ইমাম মুক্তাদির সম্মিলিত ভাবে দোয়া মুনাজাত করে যাওয়া মুস্তাহাব।

✪ একাকী নামায আদায় কারী পুরুষ-নারী সকলের জন্য একাকী ভাবে ও দুহাত উঠিয়ে দোয়া-মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

✪ যোহর মাগরিব ও এশা এর ফরয নামাযের পর সংক্ষিপ্ত আকারের মুনাজাত শেষ করতঃ সুন্নাত শুরু না করে দীর্ঘ তাছবীহ-তাহলিল পাঠে মশগুল হওয়া অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে মাকরুহ (গনিয়া, আমলগীরী)।

✪ তাই ফরযের পর সুন্নাত-নফল ইত্যাদি নামায সমাপ্ত করেই মাছনুন তাছবীহ তাহ লিল পাঠে মাশগুল হওয়া উত্তম এবং তাছবীহ ইত্যাদি পাঠান্তে ইমাম মুক্তাদীগণকে নিয়ে দুহাত উঠিয়ে অতিশয় কাকুতি মিনতি এবং নম্রতা সহকারে পরম করুনাময় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে বিশ্ব মুসলিমের জন্য উপস্থিত মুছাল্লিও, নিজের ইহ-পরকালীন সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির জন্য ফরিয়াদ-মুনাজাত পেশ করে যাওয়া উত্তম।

✪ ওয়াক্তিয়া নামায ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় নামায় যেমনঃ দুঈদের নামায তাহাজ্জুদের নামায, শবে বরাত ও শবে কদরের নামায তথা প্রত্যেক নফল নামাযের পরেও মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

✪ যে কোন ভাষায় দোয়া-মুনাজাত করা যায়। তবে কোরআন পাকের প্রার্থনা মূলক আয়াত এবং হাদীছ শরীফে বর্ণিত দোয়া সমূহ পাঠ করতঃ আরবী ভাষায় দোয়া করলে তা আল্লাহ পাকের নিকট বেশী পছন্দনীয় হয়।

✪ মুনাজাতের সময় দু'হাতকে পাশা পাশি মিলিয়ে হাতের তালুদ্বয় নিজের চেহারার দিকে করে সীনা পর্যন্ত হাত উঠানো মুস্তাহাব।-

✪ মুনাজাতের শুরুতে আল্লাহর হামদ-ছানা (প্রশংসা গুণগান) করা এবং মুনাজাতের শুরু, মধ্য ও শেষে নবী আকরম (দঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

✪ দোয়ার সময় আকাশের দিকে চাওয়া মাকরূহ।

পাঠক মন্ডলী,

দোয়া মুনাজাতে হাত উঠানোর প্রসঙ্গে একটা পশ্ন আসতে পারে যে, মাসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মাসজিদ হতে বাহির হওয়া কালে, নিদ্রা যাওয়ার সময়, নিদ্রা হতে উঠার কালে, ওযুর মধ্যেও পায়খানা প্রস্রাবের জন্য প্রবেশ বের হওয়া কালে, ঘর হতে বের হওয়ার সময় ও ঘরে প্রবেশের সময় তথা অনুরূপ অন্যান্য সময়ের দোয়া সমূহ পাঠ করার কালে তো হাত উঠাতে হয় না।

কিন্তু নামাযের পর এবং আযানের পর ও অন্যান্য কতেক সময়ের দোয়া করার বেলায় হাত উঠাতে হয় কেন?

এর উত্তরে হাদীছ শাস্ত্রের অন্যতম ভাষ্যকার হযরত ইমাম ইবনে হাজর (রঃ) এর বক্তব্যটিই পাঠক সমাজের খেদমতে তুলে ধরা হচ্ছে, তিনি বলেন—

اَلْمُرَادُ بِاسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْاَيْدِىْ لِلدُّعَاءِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ فَالْمُرَادُ اِذَا قَرَأَ اَلْفَاظَ الدُّعَاءِ بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ وَطَلَبِ الْحَاجَةِ كَمَا هُوَ دَأْبُ الدَّاعِىْ وَاَمَّا اِذَا ذَكَرَ بَعْضَ الْاَدْعِيَةِ الْمَاثُوْرَةِ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ وَالْاِسْتِنَانِ بِسُنَّةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِىْ اَدْعِيَةِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالنَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ وَدُخُوْلِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوْجِ عَنْهُ وَدُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوْجِ عَنْهُ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ وَالْقِيَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ وَدُخُوْلِ السُّوْقِ وَاَمْثَالِ ذٰلِكَ عَلٰى مَابَسَطَهُ عُلَمَاءُ هٰذَا الْفَنِّ كَمَا فِىْ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِاِبْنِ السُّنِّىِّ وَالْاَذْكَارِ لِلنَّوَوِىِّ رح فلا.

সারমর্ম ঃ প্রত্যেক দোয়ার জন্য হাত উঠানো মুস্তাহাব এর মর্ম এযে, যখন কোন দোয়াকে ফরিয়াদ-প্রার্থনা এবং স্বীয় হাজত-মাকছুদ চাওয়ার নিয়্যতে পাঠ করা হয় তখনই দোয়া পাঠের সময় হাত উঠাতে হয়, কারণ এরূপ হাত পাতাটাই হলো ভিক্ষাকারী-প্রার্থনাকারীর নিয়ম।

আর যখন দোয়া সমূহকে শুধুমাত্র আল্লাহর জিকর ও নিরেট স্মরণের নিয়্যতে এবং নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ছুন্নাত আদায়ের নিয়্যতেই পড়া হয় তখন হাত উঠাতে হয়না। যেমন সকাল, বিকাল, নিদ্রা-জাগরন, পায়খানায় প্রবেশ-বাহির, মসজিদে প্রবেশ, মসজিদ থেকে বের হওয়া এবং ওযু করার সময়ের দোয়া, মাহফিল-মাজলিশ থেকে উঠার সময় ও বাজারে প্রবেশ করার সময়ে যে দোয়া সমূহ পাঠ করা হয় তখন হাত উঠান হয়না।এ বিষয়টি পূর্বেকার মুহাক্কেক আলেমগণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং হযরত ইবনুছ্ছনী (রঃ) এর আমলুল ইয়াউ-মে ওয়াল লাইল' নামক গ্রন্থে অনুরূপ মুসলিম শরীফের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার ইমাম নববী (রঃ)-এর আল-আজকার' নামক গ্রন্থে আরও সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মোটকথা, যখন আল্লাহর দরবারে কিছু চাওয়া পাওয়া এবং প্রার্থনাকরার নিয়্যতেই কোন দোয়া পাঠকরা হয় তখন চাওয়া-মাঙ্গার সাধারন নিয়ম মাফিক হাদীছ শরীফে বর্ণিত তারীকা অনুযায়ী হাত উঠানোটাই মুস্তাহাব, আর যখন দোয়া পাঠ করাটা কোন প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর জিকির-স্মরণের উদ্দেশ্যেই হয় তখন ঐ সব দোয়া পাঠ করার সময় হাত উঠাতে হয়না বরং মৌখিক উচ্চারনটাই যথেষ্ট।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ ভিত্তিতে নামাযের পরক্ষণেও যেহেতু নামাযী বান্দা নিজের আদায় কৃত নামায কে গ্রহণীয় করা, তদুপরি ইহকালীন-পরকালীন সার্বিক কল্যান মঙ্গল কামনা করেই দোয়া করে থাকে।

অতএব উক্ত প্রকারের দোয়াতে হাত উঠানোটাই উত্তম। এ পার্থক্যটা বুঝে নিতে পারলে ঐরূপ বিভ্রান্তিকর ও অবান্তর প্রশ্নাবলী উত্থাপন করার আর কোন কারণ থাকবেনা নিশ্চয়।

দোয়া-মুনাজাতের নিয়মাবলী ও কোরআন-হাদীসের কিছু দোয়া-মুনাজাত

পবিত্র হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী দোয়া-মুনাজাত আরম্ভ করার সময় প্রথমে মহান আল্লাহর হামদ-ছানা মূলক কলেমা-অতঃপর নবীকরিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ-ছালাম পাঠ করতঃ দোয়া-মুনাজাত শুরু করা মুস্তাহাব।

দোয়া করার সময় দু'হাত দু'স্কন্ধ বরাবর উঠানো এবং দু'হাতের তালু চেহারার দিকে রাখা মুস্তাহাব।

অত্যন্ত আজেযী-ইনকেছারী তথা অত্যধিক কাকুতি-মিনতি ও বিনয়-নম্রতার সাথে দোয়া করে যেতে হয়।

প্রতিটি দোয়া পাঠের শেষে আমীন! আমীন! (কবুল করুন! কবুল করুন) বলা মুস্তাহাব।

দোয়া-মুনাজাতের মাঝে নিজের কৃত অতীত পাপ-অপরাধের জন্য অনুতাপ-অনুশোচনা সহকারে দয়াময় প্রভুর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে যাওয়া জরুরী।

দোয়া মুনাজাত করার সময় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে "নিশ্চয় কবুল হবে" এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা চাই।

দোয়া--মুনাজাত শেষে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করতঃ দোয়া সমাপ্ত করে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাছেহ করা মুস্তাহাব।

দোয়া-মুনাজাতের শুরু ও শেষের একটা নমুনা নিম্নে পেশ করা হলা ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً دَائِمَةً كَثِيْرَةً مَّقْبُوْلَةً وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

অতঃপর কোরআন করিম ও হাদীস পাক হতে এবং নিজের জানা অন্যান্য দোয়া-মুনাজাত সমূহ দ্বারা মুনাজাত করে যেতে হয়।

যে কোন ভাষায় নিজের হাজত-মাকছুদ রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করা যায়। আরবী ভাষাটা আল্লাহ-রাছুলের কাছে প্রিয় ভাষা রূপে বিবেচিত হওয়ায় এ ভাষায় মুনাজাত করাটা বেশী উত্তম।

সবশেষে এভাবে বলে সমাপ্ত করা উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ دُعَاءَنَا بِحُرْمَةِ ذَاتِكَ الْقَدِيْمِ وَبِحُرْمَةِ قُرْاٰنِكَ الْعَظِيْمِ وَبِجَاهِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ وَخَلِيْلِكَ شَفِيْعِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ وَزِيْنَةِ فَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۔ بِفَضْلِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ / اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اٰخِرَ كَلَامِنَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ / تَقَبَّلْ دُعَاءَنَا بِحُرْمَةِ الْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

কোরআন করিমে উল্লেখিত মুনাজাতসমূহ ঃ

(১) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা জালামনা আন্‌ফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগ্‌ফির্‌লানা ওয় তার্‌হাম্‌না লানাকূনান্না মিনাল খাছিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা (পাপ-অপরাধ করে) নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের মার্জনা-ক্ষমা না করেন এবং দয়া-করুণা না করেন, তাহলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।

(২) رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া হাছানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাছানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার।

pdf By Syed Mostofa Sakib

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন ও আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

(৩) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্‌ফির্ ওয়ারহাম্ ওয়া আন্‌তা খাইরুর রাহিমীন। অর্থ ঃ প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুণ ও দয়া করুন। আপনিই তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۔ وَاعْفُ عَنَّا ۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা-তুওয়া-খিজনা ইন্ নাছীনা-আওআখ্ তা'না রাব্বানাওয়া লা তাহ্‌মিল্ আলাইনা ইছরান্ কামা হামাল্‌তা হু আলাল্ লাজীনা মিন কাবলিনা-রাব্বানা ওয়া লা-তুহাম্‌মিল না মালা-তাকাতা লানা বিহি-ওয়াফু আন্না-ওয়াগ্‌ফির্ লানা ওয়ার্ হাম্‌না আন্‌তা মাওলানা ফান্‌ছুর্‌না আলাল্ কাওমিল্ কাফেরীন।

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۔ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ফাগ্‌ফিরলানা জুনুবানা ওয়া কাফ্‌ফির আন্না ছায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মাআল্ আব্‌রারি। রাব্বানা ওয়া আ-তিনা মা ওয়াদ্‌তানা আলা রুছূলিকা ওয়া লা-তুখ্‌জিনা এয়াওমাল্ কিয়ামতি ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীয়াদ।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা-তুজিগ্ কুলুবানা বা'দা ইজ্ হাদাইতানা ওয়া হাব লানা-মিল্ লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ হা-বু।

رَبِّ اِنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বী ইন্নী মাচ্ছা নিয়াদ্ দুররু ওয়া আন্‌তা আর্‌হামুর রাহিমীন।

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বী লা-তাজ্‌রনী ফরদাও ওয়া আন্‌তা খাইরুল ওয়ারিছীনা।

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বী আনজিল্‌নী-মুনজালান মুবারাকান ওয়া আন্‌তা খাইরুল মুনজিলীনা।

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আউজুবিকা মিন্ হামাজা-তিশ্ শায়া-তীনা ওয়া আউজুবিকা রাব্বি আই ইয়াহ্‌দুরুনা।

(رَبِّ) اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۔

উচ্চারণ ঃ (রাব্বি) ইন্নি মাগ্‌লুবুন ফান্‌তাছির।

(اَللّٰهُمَّ) اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা ওয়ালিয়্যী ফিদ্‌দুন্‌য়া ওয়াল্ আখিরাতী তাওয়াফ্‌ফানী মুছলিমায়ো ওয়াল্ হিক্‌নী বিচ্ছালেহীন।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বিজ্ আল্‌নী মুকীমাচ্ছালাতি ওয় মিন্ জুররিয়্যাতি রাব্‌বানা ওয়াতাকাব্‌বাল দোয়ায়ী রাব্‌বানাগ্‌ফিরলী ওয়া লি ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসাবি। রাব্বির্ হাম্ হুমা কামা রাব্বা ইয়া নী ছাগীরা।

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আ-তিনা মিন্‌লাদুন্‌কা রাহ্‌মাতাঁও ওয়া হাইয়্যী লানা মিন্ আম্‌রি না রাশাদা।

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাছ্‌রিফ্ আন্না আযাবা জাহান্নামা ইন্না আযাবাহা কা-না গারা-মা।

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ইন্নানা আ-মান্না ফাগ্‌ফির্ লানা জুনুবানা ওয়া কিনা আজাবান্নারি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা-তাজ্আল্ না ফিত্নাতাল্ লিল্ কাওমিজ্ জালিমীনা-ওয়া নাজ্জিনা বিরাহ্মাতিকা মিনাল্ কাওমিল্ কা-ফিরীনা।

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আলাইকা তাওয়াক্কাল্না ওয়া ইলাইকা আনাব্না ওয়া ইলাইকাল্ মাছীর।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়া ইছরা-ফানা ফী আম্রিনা ওয়া ছাব্বিত্ আক্দা-মানা ওয়ান্ছুর্না আলাল্ কাওমিল্ কাফেরীন।

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতমিম্লানা-নূরানা-ওয়াগফির লানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লাতাজ্ আলনা ফিত্না তাল্ লিল্লাজীনা কাফারু ওয়াগ্ ফির্লানা রাব্বানা ইন্নাকা আন্তাল্ আজীজুল্ হাকীম।

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বী আও জিয়্নী আন আশকুরা নে'মাতাকাল্ লাতী আন্আম্তা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন্ আ'মাল ছা-লিহান তারদা-হু ওয়া আদ্খিল্নী বিরাহ মাতিকা ফী ইবা-দিকাচ্ছালেহীন।

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বী আওজীয়্নী আন আশকুরা নে'মাতাকাল্ লাতী আন্আম্তা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছালিহান্ তারদা-হু ওয়াছলিহ্লী ফী জুররিয়্যাতি ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুছলিমীন।

إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْ إِلَى اللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা আশ্কু বাচ্ছী ওয় হুজনী ইলাল্লাহ।

(رَبِّ) اِجْعَلْنِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا -

উচ্চারণ ঃ (রাব্বী) ইজ্আল্নী মিল্লাদুন্কা ছুল্তা-নান্ নাছীরা

হাদীছ শরীফে বর্ণিত দোয়া-মুনাজাতসমূহ ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ-তি নাফ্ছী তাক্ওয়া-হা ওয় জাক্কিহা আন্তা খাইরুম মান্ জাক্কা-হা আন্তা ওয়ালিয়্যুহা ওয় মাওলা-হা।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) فِيْ أَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা ঈমা-নাল্ লা-ইয়ারতাদ্দু ওয়া নাঈমাল্ লা ইয়ান্ ফাদু ওয়া মুরা-ফাকাতা নাবীয়্যিনা মুহাম্মদিন (দঃ) ফী আ'লা দারাজাতিল্ জান্নাতি জান্নাতিল্ খুল্দি।

اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহছিন্ আ-কিবাতানা ফিল্ উমূরি কুল্লিহা ওয়া আজির্না মিন্ খিজ্য়িদ দুন্য়া ওয় আজাবিল্ আখিরাতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল্ হালিমুল্ করীম ছুবহা-নাল্লাহি রাব্বিল আরশিল্ আজীম আল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাছ্আলুকা মাওজিবাতি রাহ্মাতিকা ওয়া আজা-য়িমা মাগ্ফিরাতিকা ওয়াল গানিমাতা মিন্ কুল্লি বিররিন্ ওয়াচ্ছালা-মাতা মিন্ কুল্লি ইছ্মিন্ আল্লাহুম্মা লা-তাদা'লানা জান্বান্ ইল্লা গাফার্তাহু ওয়া লা-হাম্মান্ ইল্লা ফার্রাজ্তাহু ওয়া লা-দাইনান্ ইল্লা-কাদাইতাহু ওয়ালা হা-জাতাম্ মিন্ হাওয়াইজিদ্দুনইয়া ওয়াল্ আ-খিরাতি ইল্লা কাদাইতাহা ইয়া আরহামার্ রা-হিমীন।

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা তাক্তুল্না বিগাদাবিকা ওয়া লা-তুহ্লিক্না বিআজাবিকা ওয়া আ-ফিনা কাব্লা জালিকা।

اَللّٰهُمَّ أَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আইন্না-আলা জিক্রিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুছ্নি এবা-দাতিকা।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাফ্ তাহ লানা আব্ওয়া-বা রাহ্মাতিকা ওয়া ছাহ্হিল্ লানা আবওয়া-বা রিজ্কিকা।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ وَإِلَيْكَ مَآبِيْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছালা-তি ওয়া নুছুকি ওয়া মাহইয়া-ইয়া ওয়া মামাতি ওয় ইলাইকা মাআ-বী ওয়া লাকা রাব্বী তুরাছী।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِيْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজআল্ হুব্বাকা আহাব্বাল্ আশ্ ইয়ায়ী ইলাইয়া ওয়াজ আল্ খাশ্ ইয়াতাকা আখ্ ওয়াফাল্ আশ্ ইয়ায়ী ইন্দী।

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مُسْلِمًا وَأَمِتْنِيْ مُسْلِمًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহ্ইয়িনী মুছ্লিমান্ ওয় আমিত্নী মুসলিমান্।

-ঃ সাধারণ মুনাজাতসমূহ ঃ-

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَتُوْبُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَتَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ الْمَقْبُوْلِيْنَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْخَاسِرِيْنَ الْمَتْرُوْدِيْنَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمَرْزُوْقِيْنَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمَحْرُوْمِيْنَ .

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمِنْ غَضَبِكَ وَمِنْ قَهْرِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ حَيٰوةً طَوِيْلَةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً .

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ الْأَمْنَ وَالْأَمَانَ وَالْحِفْظَةَ وَالسَّلَامَةَ وَالشِّفَاءَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فَإِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ .

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا
ذَاكِرًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّعِلْمًا نَافِعًا وَّفَهْمًا كَامِلًا وَّرِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا
طَيِّبًا مُّبَارَكًا وَّعُمْرًا طَوِيْلًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ قَبْلَ
الْمَوْتِ وَالرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالثَّبَاتَ عَلَى الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَهَوِّنْ
عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ
وَنَسْئَلُكَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِسُوْءِ اَعْمَالِنَا وَاعْفُ عَنَّا ذُنُوْبَنَا وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا
وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَا تُسَلِّطْ
عَلَيْنَا بِذُنُوْبِ الْغَضَبِ وَالْقَهْرِ وَالْاَمْرَاضِ الشَّدِيْدِ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا
مَوْتَ الْفُجَاءَةِ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوْبِنَا النَّدَامَةَ وَالذِّلَّةَ وَالْخَسَارَةَ وَالْغُرْبَةَ
وَالْمَسْكَنَةَ وَالْفَقْرَ. يَا غَفُوْرُ يَا رَحْمٰنُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا اٰمَنَّا بِنَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ نَرَهُ
فَمَتِّعْنَا اللّٰهُمَّ فِى الدَّارَيْنِ بِرُؤْيَتِهِ وَثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى مَحَبَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا
عَلٰى سُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهِ النَّاجِيَةِ وَاحْشُرْنَا فِىْ حِزْبِهِ الْمُفْلِحِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِنَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
اِلَيْكَ اِذْ هُوَ اَوْجَهُ الشُّفَعَاءِ اِلَيْكَ وَنَتَوَسَّلُ بِهِ اِلَيْكَ اِذْ هُوَ اَقْرَبُ الْوَسَائِلِ
اِلَيْكَ/اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فِى الدُّنْيَا رُؤْيَتَهُ وَفِى الْاٰخِرَةِ شَفَاعَتَهُ. يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

দশম পরিচ্ছেদ

নামায ভঙ্গের কারণসমূহের বর্ণনা

নিম্ন বর্ণিত কারণ সমূহ পাওয়া গেলে নামায ভেঙ্গে যায় ঃ

১। নামায আদায় অবস্থায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়,ভুলে কিংবা সজ্ঞানে কথা বার্তা বললে- (মারাকিউল ফালাহ)।

২। নামাযরত অবস্থায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কাকেও ছালাম দিলে ও ছালামের উত্তর দান করলে, (মারাকিউল ফালাহ)।

৩। নামায আদায়ের অবস্থায় বাহির হতে চনাবুটের চেয়ে ও ক্ষুদ্র পরিমান কোন দ্রব্য গিলে ফেললে।

৪। দু'দাতের মাঝখানে আটকানো পান-সুপারি অথবা খাদ্য কনার বুট পরিমান বা তদপেক্ষা বেশী গিলে ফেললে।

৫। পানি জাতীয় কোন কিছু পান করে নিলে, বৃষ্টির পানি ক্রমশঃ মুখ দিয়ে প্রবেশ করতঃ পেটের মধ্যে গিয়ে পৌছালে। (মারাকিউল ফালাহ)

৬। কারো ডাক দেওয়া বা জিজ্ঞাসা করার প্রতি উত্তরে কোন শব্দ বলে ফেললে।

৭। নামাযরত অবস্থায় অন্য লোকের হাঁচির উত্তরে "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বললে।

৮। কোন দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহি ---বলে দিলে।

৯। কোন সুসংবাদ শুনে আল হামদু লিল্লাহ---- বললে।

১০। আশ্চর্যজনক সংবাদ শুনে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ - কিংবা ছুবহানাল্লাহ বললে।

১১। নামাযে কোরআন শরীফ দেখে দেখে সূরা কেরাত পাঠ করলে।

১২। বই-পুস্তক সাইন বোর্ড, পোষ্টার কিংবা অন্য কোন প্রকারের লেখা নজরে পড়ার পর তা মুখের দ্বারা পড়ে নিলে।

১৩। নামায পড়ার সময় স্ত্রী-পুরুষের জন্য শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরয ঐ ছতরের এক অঙ্গের এক চতুর্থাংশ পরিমান জায়গা অনাবৃত হয়ে পড়লে এবং তিন বার ছুবহানাল্লাহ পড়ার পরিমান সময় ধরে তা অনাবৃত থাকলে

১৪। বিনা ওজরে কেবলার দিক হতে সীনা অন্য দিকে ঘুরালে (দোররুল মোখতার)

১৫। নামাযরত অবস্থায় স্ত্রীলোকের শিশুকে দুগ্ধ পান করালে।

১৬। জামাতের নামাযে মুক্তাদী ইমাম হতে সামনের দিকে এগিয়ে দাড়ালে।

১৭। নিজ নামাযের ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুলের জন্য লোকমা দিলে, এমনি ভাবে নিজ নামাযের মুক্তাদী ব্যতীত ইমামের অপর কারো দেওয়া লুকমা গ্রহণ করলে।

১৮। নাপাক জায়গায় সিজদা করলে।

১৯। উভয় পা একই সঙ্গে মুছাল্লা বা নামাযের জায়গা তথা মাটি হতে আলগা করে নিলে বা আলগা হয়ে গেলে (আলমগীরী)।

২০। ফজরের নামায আদায় অবস্থায় সূর্য উদয় হয়ে পড়লে।

২১। নামাযের মধ্যে বেহুশ হয়ে পড়লে।

২২। নামাযের মধ্যে পাগল হয়ে গেলে। উল্লেখিত কারণসমূহ পাওয়া গেলে নামায ভেঙ্গে যাবে।

২৩। এক ওয়াক্তের নামায আরম্ভ করার পর ভুলক্রমে অন্য ওয়াক্ত ধারনা করতঃ ছালাম ফিরিয়ে দিলে নামায বাতেল হয়ে যায়। যেমন কেউ জোহরের ফরয নামায পড়তে শুরু করার পর জুমার নামায ধারণা করতঃ দুরাকাতের পর ছালাম ফিরিয়ে বসল, এতে নামায বাতেল হয়ে যাবে।

এমনিভাবে এশার ফরয নামায শুরু করতঃ তারাবীহ মনে করে দু'রাকাতের পর ছালাম ফিরিয়ে দিলে নামায বাতেল হয়ে যাবে। মুকিম লোক নিজেকে মুছাফির ধারনায় এরুপ দু'রাকাতের পর ছালাম ফিরিয়ে নিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। এবং ঐ নামায পুনরায় আদায় করে দিতে হবে। (আলমগীরী)

২৪। নামাযরত অবস্থায় যদি কেউ মাটির উপর কিংবা দেওয়াল, বোর্ড বা অন্য কিছুর উপর এভাবে লিখে যাতে লিখার চিহ্ন প্রকাশ পায় তাহলে নামায বাতেল হয়ে যাবে। আর যদি বাতাস (শুন্যে) এর উপর কিংবা শরীরের উপর এমনিভাবে লিখে যে তাতে অক্ষরের চিহ্ন না পড়ে তাহলে নামায বাতেল হবে না।

২৫। নামাযরত অবস্থায় কেউ যদি মাথায় কিংবা দাড়িতে তৈল লাগায় কিংবা গোলাব পানি ইত্যাদি দেয়, চোখে সুরমা লাগায় অথবা শরীরে আতর লাগায় তাহলে নামায বাতেল হয়ে যাবে (খোলাছাতুল ফতোওয়া)।

২৬। নামাযে থাকা অবস্থায় পুরুষলোক মাথায় পাগড়ি বাঁধলে ও স্ত্রীলোক মাথায় খেমার তথা পাতলা রুমাল বাঁধলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৭। কোন নামাযী নামাযরত অবস্থায় যদি বাহিরের কোন লোকের হুকুম-নির্দেশে কোন কাজ করে তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৮। নামাযরত অবস্থায় আমলে কাছীর করলে নামায বাতেল হয়ে যায়।

আমলে কাছীর এর সংজ্ঞা সর্ম্পকে কয়েকটি মত পাওয়া যায়ঃ

(১) নামাযরত অবস্থায় মুছাল্লি যদি এমন ধরনের কোন কাজ করে বসে যাতে অন্য লোক তাকে এ কাজ করতে দেখে ধারনা করে বসে যে, এলোক নামাযেরত নাই বরং নামাযের বাহিরেই রয়েছে মুছাল্লির এধরনের কাজ কর্মকে আমলে কাছীর বলা হয়।

কারো কারো মতে যে কাজটি করতে গেলে উভয় হাত ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এমনি ধরনের কোন কাজ নামাযরত অবস্থায় কোন মুছাল্লি যদি করে থাকে তাহলে উহাকেই আমলে কাছীর বলা হয়। যেমনঃ পাগড়ী বাধা, পায়জামা পরিধান করা ইত্যাদি।

✪ তায়াম্মুম করতঃ নামায আরম্ভ করার পর পানি পাওয়া গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

✪ কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ অবস্থায় নামায আরম্ভ করার পর লজ্জাস্থান ঢাকার মত কিছু পাওয়া গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়।

✪ নামাযরত অবস্থায় যদি একহাতে চাদর গায়ে দেয় কিংবা কোন হালকা জিনিষ একহাত দ্বারা উঠায় এমনি ভাবে কোন কাপড় রুমাল ইত্যাদি কাধের উপর উঠিয়ে নেয় বা টুপি উঠিয়ে মাথায় দেয় তাহলে নামায বাতেল হবে না।

(খোলাছাতুল ফতোওয়া)

✪ কোন নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কেউ হাটা চলা করলে নামায নষ্ট হয়না। তবে এতে হাটা চলাকারী লোকই গুনাহগার হবে। (আলমগীরী, মারাকিউল ফালাহ)

প্রকাশ থাকে যে বিনা প্রয়োজনে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে হাটা-চলাকরা মারাত্মক গুনাহের কাজ।

হুজুর পুরনুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেনঃ

لَوْيَعْلَمُ الْمَارُّبَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ يَقِفُ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهٗ مِنْ اَنْ يَمُرَّبَيْنَ يَدَيْهِ (هدايه)

অর্থাৎ মুছাল্লীর সম্মুখ দিয়ে হাটা চলাকরা কিরূপ মারাত্মক পাপের কাজ তা যদি চলাচলকারী জানতে পারত তাহলে প্রয়োজন বোধে চলাচলকারী চল্লিশ (দিন বা বৎসর) অপেক্ষা করাটাকে উত্তম রূপে বেছে নিত, তবুও নামাযীর সম্মুখ দিয়ে সে চলাচল করতনা।

✪ নামাযী ব্যক্তি যদি এরূপ জায়গায় নামাযে দাঁড়ায়-যাতে অন্যান্য লোকের নামাযীর সম্মুখ দিয়ে চলাচল না করে অন্য পথে চলাচল করার মত জায়গা পথ থাকে এরূপ অবস্থায় যদি মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে চলাচল করে তাহলে কেবল চলাচলকারীই গুনাহগার হবে।

✪ কিন্তু কোন মুছাল্লী যদি এমনভাবে নামাযে দাঁড়ায় যাতে অন্যান্য লোকের মুছাল্লীর সম্মুখ দিয়ে চলাচলকরা ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর না থাকে তখন চলাচলকারী মোটেই গুনাহগার হবেনা বরং মুছাল্লী নিজেই গুনাহগার হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ তাই নামায আদায়ের জন্য মসজিদ কিংবা অন্যত্র এমন ভাবে দাঁড়ানো উচিৎ যাতে নামাযে গমনকারী মুছাল্লি কিংবা অন্যান্য বাহিরের লোকদের হাটাচলায় কোন প্রকারের অসুবিধা বা বাধার সৃষ্টি না হয়।

মাঠ কিংবা খোলা জায়গায় নামায আদায় করতে ইচ্ছা করলে সামনে একটি কাঠ-লাঠি ইত্যাদি ছুতরা (বৃদ্ধা আঙ্গুলসম মোটা এক হাত লম্বা) রূপে গেড়ে দিবে।

✪ ওজর বশতঃ একান্ত প্রয়োজনে যেমন কারও হঠাৎ পায়খানা পেশাবের বেগহয়ে পড়লে অথবা হঠাৎ কোন রোগ বিপদ দেখা দিলে এবং তার যাওয়ার জন্য কোন পথ না থাকলে তখন নামাযীর সম্মুখ দিয়ে চলাচলকরার অনুমতি রয়েছে অন্যথায় নয়।

নামাযের মধ্যে মাক্‌রূহ কাজসমূহ

১। নামাযরত অবস্থায় শরীর জামা-কাপড় অথবা দাড়ি নিয়ে খেলা করা মাকরূহ।

২। চাদর-শাল-রুমাল এবং জামা-কোট-জাম্পার ও আবা-কাবা ইত্যাদি কাপড় সমূহকে নিয়মমত পরিধান না করে অর্থাৎ চাদর, শাল ও রুমালকে শরীর কিংবা গলায় প্যাঁচ দিয়ে সাধারণতঃ যেভাবে পরিধান করা হয় সেভাবে প্যাচ না দিয়ে নামাযরত অবস্থায় মাথা বা কাঁধের উপর রেখে এর উভয় পাশে উক্ত রুমাল কিংবা চাদরের দু'দিক ঝুলিয়ে দেয়া মাক্‌রূহ।

এমনিভাবে কোন ওজর ব্যতীত জামা-জাম্পার, কোট ও আবা-কাবা ইত্যাদির হাতের মধ্যে মুছাল্লির হাত ঢুকিয়ে সাধারণ নিয়মে যেভাবে পরিধান করা হয় সেভাবে পরিধান না করে তথা এসবের হাতের মধ্যে হাত না ঢুকিয়ে মাথা বা কাঁধের উপর এর উভয়পার্শ্ব ঝুলিয়ে দিয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ।[১]

৩। টুপী না পরে মাথার মধ্যভাগ তথা তালু খালি রেখে চতুর্দিকে রুমাল বা পাগড়ি পেঁচিয়ে নামায আদায় করা মাক্‌রূহ (আলমগীরী)।

৪। সিনা কেবলার দিকে ঠিক রেখে ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরিয়ে দেখা মাকরূহ (দোররে মোখতার, শামী)।

টীকা ঃ

(১) و يكره ايضا ان يسدل ثوبه اى يرسله من غير ان يلبسه و هو اى السدل ان يضعه اى الثوب على كتفه و يرسل اطرافه على عضدهما او على صدره و فى القدورى شرح مختصر الكرخى هو ان يجعل الثوب على رأسه او كتفه و يرسل اطرافه من جوانبه ـ (شرح منيه)

৫। নামাযরত অবস্থায় এদিক ওদিক সিনা ও চেহারা না ফিরিয়ে আড়চোখে তাকান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এরূপ দেখা মোবাহ। কেউ বলেছেন মাক্‌রূহে তান্‌জিহী (হেদায়া)।

৬। আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখা মাকরূহ।

৭। পরিধেয় জামা-কোর্তার বোতাম খোলা রেখে নামায আদায় করা মাকরূহে তানজিহী।

৮। শুধু জামা কিংবা শুধু পরণের লুঙ্গি বা পায়জামা– প্যান্ট পরিধান করেই নামায আদায় করা মাকরূহ (তাহতাবী)।

৯। হাতের কুনুই উলঙ্গ থাকে এ ধরনের হাফ্‌গেঞ্জি বা হাফজামা পরিধান করে নামায আদায় করা মাকরূহ। কনুইর নিম্নভাগ পর্যন্ত ঢাকা গেলে তখন মাকরূহ হবে না (শামী)।

১০। বাহুদ্বয়ের আস্তিন গুটিয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ, আস্তিন টেনে হাত ঢেকে নিতে হয় (মারাকিউল ফলাহ্)।

১১। ধুলাবালি লাগার ভয়ে জামা-কাপড় টেনে নেয়া বা টেনে রাখা মাকরূহ।

১২। খালী মাথায় নামায আদায় করা মাকরূহ।

১৩। পরিষ্কার ও ভাল কাপড় থাকা সত্ত্বেও যেরূপ ময়লাযুক্ত পোশাক পরিধান করে সমাজে যেতে লজ্জাবোধ করা হয় ঐরূপ ময়লা কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা মাক্‌রূহ।

১৪। রুকু-ছিজ্‌দা করার সময় তাড়াহুড়া করা মাক্‌রূহ।

১৫। ছিজদায় যাওয়ার কালে বিনা ওজরে জমিনে হাঁটু রাখার আগে হাত রাখা মাক্‌রূহ।

১৬। ছিজদা হতে দাঁড়ানোর সময় হাত উঠানোর আগে হাঁটু তুলে নেয়া মাকরূহে তানজিহ (আলমগীরী)।

(و) يكره (سدله) تكبرا وتهاونا و بالعذر لا يكره (قوله و يكره سدله) اى سدل المصلى ثوبه و هى فى اللغة الارخاء والارسال و فى الشرع الارسال بدون لبس معتاد هذا اذا كان بغيرعذر واما بالعذر كبرد و حر شديدن فلا يكره ....

(قوله ولا كراهة فى السدل) قال ابن امير الحاج فى السدل هذا كله عند عدم العذر و عدم التكبر فان كان لعذر من غيرتكبر فلا كراهة مطلقا وان كان مع العذر متكبرا او للتكبر فقط كره مطلقا (طحطاوى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৭। আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় কুকুরের ন্যায় বসা মাকরূহ।

১৮। কপালে ধুলা-বালি লাগলে নামাযরত অবস্থায় তা মুছে নেয়া মাকরূহ।

১৯। নামাযরত অবস্থায় শরীরের লজ্জাস্থানে হাত দেওয়া মাকরূহ।

২০। সম্মুখে, ডানে-বামে কিংবা মাথার উপর কোন প্রাণীর ছবি রেখে নামায আদায় করা মাকরূহ।

২১। জীব-জন্তুর ছবির উপর ছিজ্‌দা করা মাকরূহ, এমনিভাবে কোন জন্তুর ছবি সম্বলিত কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা মাকরূহ।

২২। মুখোমুখি বা কোন লোকের সামনা-সামনি হয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ। নামায আরম্ভ করার পর কোন লোক মুছাল্লির দিকে ফিরে বসলে এরূপ বসাকারীরই গুনাহ্ হবে।

২৩। নামাযরত অবস্থায় ইশারায় কারো ছালামের জবাব দেওয়া মাকরূহ।

২৪। নামাযরত অবস্থায় মশা-মাছি, ছারপোকা ও পিপিলিকা ইত্যাদি মারা মাকরূহ।

২৫। হাতের কড়ায় রাকাত ও তাছবীহ সমূহের হিসাব রাখা মাকরূহ।

২৬। নামাযরত অবস্থায় শরীরের ঘাম ইত্যাদি মুছা মাকরূহ।

২৭। মুক্তাদী হতে আলাদা কোন উচ্চস্থানে ইমামের একা দাঁড়ান মাকরূহ।

✪ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মাছজিদের ভিতরের পশ্চিমের দেওয়ালের মূল সীমানা অতিক্রম করতঃ ইমামের একা (মাছজিদের) মেহরাবে দাঁড়িয়ে জমাতের নামায আদায় করা মাকরূহ। তবে মাছজিদের সীমানার মধ্যে পা রেখে দাঁড়িয়ে ছাজদা ইত্যাদি মেহরাবে করলে তখন মাকরূহ হবে না।

যেমন মারাকিউল ফলাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে–

(و) يُكْرَهُ (قِيَامُ الْإِمَامِ) بِجُمْلَتِهِ (فِي الْمِحْرَابِ) لَا قِيَامُهُ خَارِجَهُ وَ سُجُوْدُهُ فِيْهِ سُمِّيَ مِحْرَابًا لِأَنَّهُ يُحَارِبُ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ بِالْقِيَامِ إِلَيْهِ. وَالْكَرَاهَةُ لِاشْتِبَاهِ الْحَالِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِذَا ضَاقَ مَكَانٌ فَلَا كَرَاهَةَ صفحه ٢٤٤

তাহ্তাবী গ্রন্থে বলা হয়েছে–

وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ التَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ يَخُصُّوْنَ إِمَامَهُمْ بِمَكَانٍ وَحْدَهُ وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ مَكْرُوْهٌ. صفحه ٢٤٤

✪ বাহরুর রায়েক গ্রন্থে সার সংক্ষেপে মন্তব্য স্বরূপ বলা হয়েছে–

فَالْحَاصِلُ أَنَّ مُقْتَضَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَرَاهَةُ قِيَامِهِ فِي الْمِحْرَابِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اِشْتَبَهَ حَالُ الْإِمَامِ أَوْ لَا. وَ سَوَاءٌ كَانَ الْمِحْرَابُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا وَ إِنَّمَا لَمْ يُكْرَهْ سُجُوْدُهُ فِي الْمِحْرَابِ إِذَا كَانَ قَدَمَاهُ خَارِجَهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْقَدَمِ فِي مَكَانِ الصَّلٰوةِ. صفحه ٢٦ ج ٢

অনুরূপভাবে মাসজিদে প্রত্যেক ওয়াক্তের প্রথম জমাত আদায় করার সময় ইমাম কর্তৃক মাসজিদের মেহ্‌রাবের সম্পূর্ণ অংশকে বাদ দিয়ে নামায আদায় করাকেও অনেক ফোকাহায়ে কেরাম মাকরূহ বলেছেন।

যেমন– ফাতোওয়ায়ে শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে –

(قَوْلُهُ وَ يَقِفُ وَسَطًا) قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ وَ فِي مَبْسُوْطِ بَكْرٍ. اَلسُّنَّةُ أَنْ يَقُوْمَ فِي الْمِحْرَابِ لِيَعْتَدِلَ الطَّرَفَانِ. وَ لَوْ قَامَ فِي أَحَدِ جَانِبَيِ الصَّفِّ يُكْرَهُ. وَ لَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ الصَّيْفِيُّ بِجَنْبِ الشَّتْوِيِّ وَامْتَلَأَ الْمَسْجِدُ يَقُوْمُ الْإِمَامُ فِي جَانِبِ الْحَائِطِ لِيَسْتَوِيَ الْقَوْمُ مِنْ جَانِبَيْهِ وَالْأَصَحُّ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رض أَنَّهُ قَالَ. أَكْرَهُ أَنْ يَقُوْمَ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ أَوْ فِي زَاوِيَةٍ أَوْ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى سَارِيَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ الْأُمَّةِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ "تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَ سُدُّوا الْخَلَلَ".

مَطْلَبٌ فِي كَرَاهَةِ قِيَامِ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْمِحْرَابِ.

(تنبيه) يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ إِلَى سَارِيَةٍ كَرَاهَةُ قِيَامِ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْمِحْرَابِ. وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ قَبْلَهُ اَلسُّنَّةُ أَنْ يَقُوْمَ فِي الْمِحْرَابِ وَ كَذَا قَوْلُهُ فِي مَوْضَعٍ أُخَرَ. اَلسُّنَّةُ أَنْ يَقُوْمَ الْإِمَامُ إِزَاءَ وَسْطِ الصَّفِّ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَحَارِيْبَ مَا نُصِبَتِ الْأَوْسَطَ الْمَسْجِدِ وَ هِيَ قَدْ عُيِّنَتْ لِمَقَامِ الْإِمَامِ اه وَالظَّاهِرُ أَنَّ هٰذَا فِي الْإِمَامِ الرَّاتِبِ لِجَمَاعَةٍ كَثِيْرَةٍ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَدَمُ قِيَامِهِ فِي الْوَسْطِ. فَلَوْ لَمْ يَلْزَمْ ذٰلِكَ لَا يُكْرَهُ تَأَمَّلْ. صفحه ٥٦٨، ج ١

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরে উল্লেখিত উভয় অবস্থা মাকরূহ হওয়ার কারণে- কোণ প্রকারের ওজর-অসুবিধার কারণ বিদ্যমান না থাকলে মাসজিদে নিয়মিত প্রত্যেক ওয়াক্তের প্রথম জামাআত আদায়ের সময় মেহরাবকে সামনে নিয়ে তৎসংলগ্ন বাহির অংশে উভয় পা রেখে দাড়িয়ে নামাযের ছজদা ও বৈঠক ইত্যাদি মেহরাবের মধ্যেই আদায় করে যাওয়াটা ইমামের উচিৎ।

এরদ্বারা ফোকাহয়ে কেরাম-"ইমামের সম্পূর্ণ রূপে মেহরাবের মধ্যে দাড়িয়ে নামায আদায় করাটাকে যে মাকরূহ বলেছেন, এর থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অপর দিকে মেহরাবকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে মাসজিদের প্রত্যেক ওয়াক্তের প্রথম জমাতের নামায আদায় করাটাকেও যে ফোকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে মাক্রূপ বলা হয়েছে-এর থেকেও বাঁচা যাবে।

✪ তবে ওজর- জরুরাতের কোণ ইল্লাত কারণ বিদ্যমান থাকলে অর্থাৎ মাসজিদে কিংবা জামাত আদায়ের স্থানে এরূপ কোন ওজর- যদ্বারা মাসজিদ কিংবা নামাযের কাতারের ডান-বাম সমান-সমান রেখে ঠিক মাঝখানে ইমামের দাড়ানোর সুযোগ-সুবিধা না থাকলে তখন মেহরাব তথা মাসজিদের কিংবা নামাযের কাতারের মাঝ বরাবর অগ্রবর্তীতে না দাড়িয়ে সম্ভব-সুবিধা অনুসারে ডান দিকে মুসাল্লীর সংখ্যা কিছু বেশী থাকে মত অবস্থায় দাড়িয়ে ইমামের জমাতের নামায আদায় করা মাকরূহ নয়। যেমন- تَاتَارْخَانِيَّةْ নামাক ফতোওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে وَيُكْرَهُ اَنْ يَقُوْمَ فِىْ غَيْرِ الْمِحْرَابِ اِلَّا لِضَرُوْرَةٍ اه তদুপরি اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ সূত্রের ভিত্তিতে ও জায়েজ প্রমাণিত হয়।

✪ এক্ষেত্রে এও উল্লেখ্য যে, গরমের মওসুমে বর্তমানকালের বিদ্যুৎ বিহীন অথবা বৈদ্যুতিক সমস্যাকবলিত এলাকায় অধিক গরম ইত্যাদির ন্যায় ওজরের কারণে মূল মাসজিদের মেহরাবকে বাদ দিয়ে ১/২ কাতার পিছনে সরে এসে কিংবা মূল মাসজিদের ভিতরের সম্পূর্ণ অংশকে বাদ দিয়ে মাছজিদের صحن (ছেহেন) বারিন্দায় এসে ভীতরের মেহরাব সোজা ইমামের দাড়িয়ে মাসজিদের প্রথম জমাত আদায় করা মাকরূহ নয় বরং জায়েজ।

এ বিষয়ে আরো অধিক সঠিক ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে সমকালীন বিশ্বের মূল্যবান ফতোওয়া সমূহের ১/২ খানা উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হল ঃ

✪ এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল্ জমাতের মহান ইমাম, বিশ্ব বরেন্য মহান মূজাদ্দেদ, ফকীহ্ সম্রাট ইমাম আহমদ রেজাখান (রঃ) ফতোওয়ায়ে রেজভীয়া গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৩১৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ

امام کیلئے سنت متوارثہ کہ زمانہ اقدس رسالت صلعم سے ابتک معہود ہے وسط مسجد میں قیام ہے کہ صف پوری ہو تو امام وسط صف

میں ہو اور یہی جگہ محراب حقیقی و متوارث ہے محراب صوری کی کہ طاق نما ایک خلا وسط دیوار قبلہ میں بنانا حادث ہے -

اسی محراب حقیقی کی علامت ہے یہ علامت اگر غلطی سے غیر وسط میں بنائی جائے اسکا اتباع نہ ہوگا بلکہ مراعات توسط ضروری ہوگی کہ اتباع سنت وانتفاء کراہت وامتثال ارشاد حدیث توسطوا الامام ہو جس مسجد میں مسقف حصہ نہو وہاں یہ محراب صوری ہوتی ہی نہین جیسے افضل المساجد مسجد الحرام شریف اور اسمیں ہر مسجد کا صحن داخل ہے کہ باختلاف موسم مسجد مستقل ہے فقہائے کرام درجہ مسقفہ کو مسجد شتوی کہتے ہیں اور غیر مسقف کو مسجد صیفی جب انکے وسط متطابق نہ ہو تو ہر مسجد کیلئے اسکا اپنا وسط معتبر ہے .... در مختار میں ہے "یصف الامام و یقف وسطا" درایہ شرح ہدایہ میں ہے .... السنة ان یقوم الامام ازاء وسط الصف الاتری ان المحاریب ما نصبت الاوسطا لمسجد وہی قد عینت لمقام الامام مبسوط امام بکر خواہر زادہ میں ہے لو قام فی احد جانبی الصف یکرہ ولو کان المسجد الصیفی بجنب الشتوی وامتلأ المسجد یقوم الامام فی جانب الحائط لیستوی القوم من جانبیہ الخ -

✪ উক্ত ফাতাওয়া গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৩৬২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ

فی المواقع سنت متوارثہ یہی ہے کہ امام وسط مسجد میں کھڑا ہو اور صف اسطرح ہو کہ امام وسط صف میں رہے محراب کا نشان اسی غرض کیلئے وسط مسجد میں بنایا جاتا ہے اور اسمیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر امام ایک کنارے کیطرف جھکا ہوا کھڑا ہو تو اگر جماعت زائد ہے فی الحال امام وسط صف میں نہوگا اور ارشاد حدیث توسطوا الامام کا خلاف ہوگا اور اگر ابھی جماعت قلیل ہے تو ائندہ ایسا ہونے کا اندیشہ ہے لاجرم خود امام مذہب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نص ہے کہ گوشہ میں کھڑا ہونا مکروہ ہے کنارہ مسجد میں کھڑا ہونا مکروہ ہے کہ حدیث کا ارشاد ہے امام کو وسط میں رکھو یہ طاق جیسے اب عرف میں محراب کہتے ہیں حادث ہے زمانہ اقدس صہ و زمانہ خلفائے

pdf By Syed Mostafa Sakib

راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں نہ تھا محراب حقیقی وہی صدر مقام اسکا مسجد میں قریب حد قبلہ ہے یہ محراب صوری اسکی علامت ہے جس مسجد کے دو حصے ہوں ایک مسقف دوسرا صحن جیسا کہ اب اکثر مساجد یونہیں وہ دو مسجدیں ہیں مسقف مسجد شتوی ہے یعنی جاڑوں کی مسجد اور صحن مسجد صیفی یعنی گرمیوں کی مسجد ہر مسجد کیلئے وہ محراب حقیقی موجود ہے اگر چہ محراب صوری صرف مسجد شتوی میں ہوتی ہے اعتبار اسی محراب حقیقی کا ہے یہاں تک کہ اگر محراب صوری وسط مسجد میں نہو۔ یا جانب مسجد بنا دینے سے اب وسط میں نہ رہے۔

تو امام اس میں نہ کھڑا ہو بلکہ محراب حقیقی میں کہ وسط مسجد ہے اور جب یہ حکم عام ہے جملہ مساجد کو شامل اور صحن مسجد بھی ایک مسجد ہے تو وہ بھی یقینا اس حکم منصوص میں خود داخل ہے نہ کہ یہاں کسی قیاس کی حاجت صحن مسجد میں جو جگہ قریب حد قبلہ وسط میں ہے وہ خود محراب حقیقی ہے خواہ محراب صوری کے محاذی ہو یا نہ ہو یا سرے سے اس مسجد میں محراب صوری نہ بنی ہو اس محراب خقیقی میں امام کا کھڑا ہونا سنت ہے بشرط جماعت اولی لیکن جماعت ثانیہ کیلئے اسی مقام سے داھنے یا بائیں ہٹ کر امامت کرنی نافی کراھت ہے معراج الدرایۃ شرح ھدایۃ میں ہے فی مبسوط بکر

السنة ان يقوم فى المحراب ليعتدل الطرفان و لو قام فى احد جانبى الصف يكره و لو كان المسجد الصيفى بجنب الشتوى وامتلأ المسجد يقوم الامام فى جانب الحائط ليستوى القوم من جانيبه والاصح ما روى عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه انه قال اكره ان يقوم بين السارتين او فى زاوية او فى ناحية المسجد او الى سارية لانه خلاف عمل الامة قال صلى الله عليه وسلم توسطوا الامام وسدوا الخلل..........

✪ امداد الفتاوى গ্রন্থে থানভী সাহেব বলেন--

فى رد المحتار (تنبيه) يفهم من قوله او الى سارية كراهة قيام الامام فى غير المحراب و يؤيده قوله قبله السنة ان يقوم فى المحراب و كذا قوله فى موضع اخر السنة ان يقوم فى المحراب و كذا قوله وسط الصف۔ الا ترى ان المحاريب ما نصبت الاوسط المساجد و هى قد عينت لمقام الامام ھ۔ والظاهر ان هذا فى الامام الراتب لجماعة كثيرة اھ۔ لئلا يلزم عدم قيامه فى لوسط فلو لم يلزم ذلك لا يكره تامل۔

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ محاذی محراب صحن میں کھڑا ہونا بلا کراہت جائز ہے بلکہ عبارت اخیرہ سے تو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر محراب کےمخاذی بھی نہ ہو مگر صف کا وسط ہو تب بھی جائز ہے پس معلوم ہوا کہ قول فقہاء میں محراب سے مراد وسط مساجد یا وسط صف ہے اب گرمی کا تبدل مکان کیلئے عذر ہونا محتاج استفسار نہ رھا اور اس باب میں کوئے حدیث فعلی مرفوع نظر سے نہیں گزری البتّہ قولی حدیث ابو داؤد میں ہے توسطوا الامام وسدوا الخلل اس سے بھی تائید حکم مذکور ہوتی ہے صفحہ۲۷۵ جـ۱

উক্ত امداد الفتاوى গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২৮৩ পৃঃ বলা হয়েছে ঃ

(۱) رد المحتار جلد۱ ، صفحہ۵۹۳و صـ۵۹٤ میں اول معراج سے السنة ان يقوم فى المحراب اور اسکی علت یہ بیان فرسائی ہے ليعتدل الطرفان۔ اسکی بعد امام صاحب کا قول نقل کیا ہے ۔ اكر· ان يقوم بين السارتين او فى زاوية او فى ناحية المسجد او الى سارية ؛نه خلاف عمل الامة اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے ۔ توسطوا الامام اسکے بعد اسکی تائید اس طرح کی ہے الا ترى ان المحاريب ما نصبت الاوسط المساجد وهى قد عينت لمقام الامام اس سبب سے ظاھر ہے کہ مقصود محراب نہیں بلکہ توسط امام ہے اور ترک محراب سے جبکہ ایک ناحیہ زاویہ میں ہو توسط کا ترک لازم

pdf By Syed Mostafa Sakib

اتا ہے یہی وجہ ہے کہ کراہت میں بین السارتین و قیام فی زاویۃ وقیام فی ناحیۃ کا ذکر کیا قیام فی الصحن کا ذکر نہیں کیا کیونکہ قیام فی الصحن مستلزم ترک توسط کو نہیں ہے چنانچہ اسکے بعد تصریح کر دی ۔ والظاهر ان هذا فی الامام الراتب لجماعة کثیرة لئلا یلزم عدم قیامه فی الوسط فلو لم یلتزم ذلك لا یکره تامل .... اور اگر کسی کو رد المحتار کی اس عبارت سے شبہ واقع ہو ۔ و فی التاتار خانیه و یکره ان یقوم فی غیر المحراب الا لضرورة اه ۔ مقتضاه ان الامام لو ترك المحراب و قام فی غیره یکره و لوکان قیامه وسط الصف لانه خلاف عمل الامة ۔ اسکاجواب یہ ہے کہ غیر محراب سے مراد غیر وسط مسجد ہے چنانچہ اس سے اوپر کی عبارت اسکا قرینہ ہے

السنة ان یقوم الامام بازاء وسط الصف الا تری ان المحاریب ما نصبت الاوسط المسجد و هی قد عینت لمقام الامام ص۶۷۵، ج۱

২৮। খোলা জায়গায় সামনে কোন ছুতরা (আড়াল) না দিয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ।

২৯। পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায আদায় করা মাকরূহ।

৩০। অতি নরম বিছানা তোষকের উপর নামায আদায় করা মাকরূহ।

৩১। জ্বলন্ত চুলা, অগ্নিকুণ্ড ইত্যাদি সামনে রেখে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহ্‌রীমি।

৩২। আলোর প্রয়োজনে প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি, হারিকেন, লণ্ঠন ও চেরাগ ইত্যাদি নামাযীর সামনে থাকলে মাকরূহ হবে না।

৩৩। পুরুষ লোকের ছিজ্‌দার সময় দু'বাহু মাটিতে বিছিয়ে রাখা মাকরূহ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জামাত সহকারে নামায আদায়ের ফাযায়েল ও মাছায়েল

একাকী ফরয নামায আদায় করার চেয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করার ফযীলত ও মর্যাদা অনেক অনেক বেশী।

আল্লাহর প্রিয়নবী (স)-এর অসংখ্য হাদীছ শরীফে জামাতের সাথে নামায আদায় করার ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে, প্রিয় নবী (স)-এর অগণিত হাদীছ পাকে জামাতের নামাযের ইহ-পরকালীন উপকারিতা ও কল্যাণের বর্ণনা রয়েছে।

সুতরাং বিনা ওজরে কারো নামাযের জামাত তরক করা মোটেই উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুজুর করিম (স) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهٖ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى (ابو داود)

অর্থাৎ যে লোক এরূপ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় আযান শুনতে পেল যে, কোন সঠিক ওজর অপারগতা তাকে নামাযের জামাতে হাজির হওয়ার বেলায় বাঁধার সৃষ্টি করলনা তবুও (এমতবস্থায়) যদি সে নামাযের জামাতে শরিক না হয়ে একাকীভাবে নামায আদায় করে থাকে তাহলে উক্ত মুছাল্লির নামায কখনও আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।

উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর প্রিয় নবী (স) এর খেদমতে আরজ করলেন ইয়া রাছূলাল্লাহ (স) ওজর বলতে কি বুঝায়?

হুজুর পুরনূর (স) এরশাদ করলেন– ওজর বলতে (পথে-ঘাটে শত্রুর) ভয়ভীতি ও রোগ ব্যাধিকে বুঝায়।

হযরত আবু হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় রাছূল (স) এরশাদ করেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِىْ فَيَجْمَعُوْا لِىْ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِىَ قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِىْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَاُحْرِقُهَا عَلَيْهِمْ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ আমার ইচ্ছা হয় যে, কয়েকজন যুবককে আমার জন্য অনেক পরিমাণ কাঠ খড়ি একত্র করতে বলি। অতঃপর যারা বিনা ওজরে নিজ নিজ বাড়ীঘরে একাকী নামায আদায় করে (কিন্তু জামাতে আসে না) আমি গিয়ে তাদের ঘরবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিই। বিনা ওজরে জামাত তরক করা কত মারাত্মক অপরাধ তা হাদীছ শরীফ পাঠে বুঝে নিতে পারেন।

✪ জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা পুরুষদের জন্য ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং কারো কারো মতে ওয়াজিব। [হেদায়া]

✪ হুজুর পুরনুর হযরত নবী করিম (দঃ)-এর যুগে মহিলাদের জামাতে হাজির হওয়ার নিয়ম চালু থাকলেও ইছলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর শাসনামলে যুগের অবস্থা ও পরিবেশ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের আম জামাতে হাজির হওয়ার বিষয়টি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তাই বর্তমান কালে মহিলাদের আম জামাতে হাজির হওয়া মাকরূহে তাহরীমী, পাঁচ ওয়াক্তীয়া ফরয নামাযের জামাতে হউক কিংবা ঈদ-জুমআ ইত্যাদি নামাযের জামাতে হউক, রাতে হউক বা দিনে হউক, বৃদ্ধা মহিলা হউক, কিংবা যুবতী হউক মুতাআখ্‌খেরীন আইম্মায়ে মুজ্‌তাহেদিনের বিশুদ্ধ মতানুসারে প্রত্যেক প্রকারের মহিলাদের জন্য সর্বসাধারণের জামাতে হাজির হওয়া মাকরূহে তাহরীমী।

✪ ওজর অপারগতাবশতঃ কেউ মছজিদের জামাতে হাজির হতে না পারলে স্বীয় পরিবার তথা নিজ স্ত্রী-কন্যা, নিজেরই মা-বোন, খালা-ফুফী ইত্যাদি মুহরেম মহিলাদেরকে নিয়ে ঘরে পর্দার সাথে জামাতে নামায আদায় করা জায়েয। এবং এতে জামাতের ফযীলতও পাওয়া যাবে। [শামী, বাহরুর রায়েক]

✪ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নিজের স্ত্রীকে নিয়ে জামাতে নামায আদায় করেছেন।

✪ প্রিয় নবী (দঃ) মসজিদসমূহের ফজিলতের তারতম্য বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ করেন ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهٖ بِصَلٰوةٍ وَ صَلٰوتُهٗ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَّ عِشْرِيْنَ صَلٰوةً وَ صَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُجْمَعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِأَةِ صَلٰوةٍ وَ صَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِىْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِأَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ (ابن ماجه باب ماجاء فى الصلوة فى المسجد الجامع)

অর্থাৎ উক্ত পবিত্র হাদীছ শরীফের মর্মানুসারে জানা যায় যে, মহল্লার মছজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করলে এক রাকাতের বিনিময়ে (পঁচিশ কিংবা সাতাশ গুণ) ছাওয়াব পাওয়া যায়।

জামে মছজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করলে এক রাকাতের বিনিময়ে পাঁচশত রাকাত নামায আদায়ের ছাওয়াব পাওয়া যায়। পবিত্র মছজিদে নববী (স) শরীফ এবং বায়তুল মুকাদ্দাছে জামাতের সাথে নামায আদায় করলে এক রাকাতের বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায়। আর আল্লাহর পবিত্র ঘর মাছজিদুল হারামে জামাতের সাথে নামায আদায় করলে এক রাকাত নামাযের বিনিময়ে এক লক্ষ রাকাত নামাযের ছাওয়াব পাওয়া যায়।

জামায়াতে নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে ঃ

(ক) ইমাম ও মুক্তাদির নামায এক হওয়া অর্থাৎ ইমাম যোহরের নামাযের নিয়ত করলে মুক্তাদিরও যোহরের নামাযের নিয়্যত করা লাগবে। ইমাম যোহরের নামাযের নিয়ত করল আর সে ক্ষেত্রে মুক্তাদী ভিন্ন ওয়াক্ত যথা আছরের নামায আদায়ের নিয়ত করলে মুক্তাদীর নামায আদায় হবে না।

অনুরূপভাবে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারী মুক্তাদীর ইক্‌তেদা করা শুদ্ধ নয়।

(খ) ইমাম ও মুকতাদির নামায আদায়ের স্থান এক ও সংযুক্ত হওয়া লাগবে। অর্থাৎ ইমাম ও মুক্তাদির মাঝখানে স্বাচ্ছন্দ্যে এক কাতার মুছাল্লী দাঁড়াতে পারে-এতখানি পরিমাণ জায়গার চেয়ে বেশী ব্যবধান থাকতে পারবে না।

এসূত্রে ইমাম ও মুক্তাদির মাঝখানে সড়ক, বড় গলি, পুকুর, খাল কিংবা দু'কাতার লোক স্বাচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারে মত জায়গার ব্যবধান থাকলে মুক্তাদির নামায আদায় হবে না। মূল মছজিদের ভিতর খালি জায়গা না থাকলে মছজিদের ছাদে দাঁড়িয়েও জামাতে নামায আদায় করা জায়েয, কেননা মছজিদের ছাদ মছজিদেরই অন্তর্ভুক্ত, তবে মূল মছজিদের ভিতরে খালি জায়গা রেখে ছাদে কিংবা দোতলা-তেতলায় জামাতে নামায আদায় করা মাকরূহ [দোররে মুখতার]।

(গ) ইমামের নামায আদায় সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে মুক্তাদিগণের অবগতি থাকা শর্ত। অর্থাৎ ইমাম রুকু-ছিজদা, উঠা-বসা ইত্যাদি কাজগুলোর কখন কোনটি করছেন তা সম্পর্কে মুক্তাদিগণের পুরাপুরি অবগতি থাকতে হবে।

মুক্তাদী ও ইমাম এ উভয়ের মাঝখানে যদি এমন ধরনের আড়াল পড়ে যায়, যার ফলে ইমামের নামায আদায় সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পর্কে বুঝতে না পারে এবং মুকাব্বের ইত্যাদির মাধ্যমে এ সম্পর্কে অবগত করানোর কোন ব্যবস্থাও করা না হয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে মুক্তাদিগণের ইক্তেদা শুদ্ধ হবে না এবং মুক্তাদিগণের নামাযও আদায় হবে না।

(গ) জামাতের নামাযের জন্য দাঁড়ানোর বেলায় ইমাম ও মুক্তাদী সমানে সমানে দাঁড়ান যায় তবে কোনক্রমেই ইমামের চেয়ে মুক্তাদীগণের এগিয়ে দাঁড়ান জায়েয নাই। যদি ইমামের চেয়ে মুক্তাদী সামনের দিকে এগিয়ে দাঁড়ায় তাহলে জামাতে নামায শুদ্ধ হবে না। তাই এ বিষয়ে সতর্কতার জন্য সর্বদা মুক্তাদিগণের ইমামের কিছু পিছনেই দাড়ান উচিত।

(ঘ) মুক্তাদিগণের মান ইমামের মানের সমান হওয়া বা ইমামের মানের চেয়ে কিছু কম হওয়া শর্ত।

যেমন— ইমাম নাবালেগ, মুক্তাদী বালেগ, ইমাম মা'যুর আর মুক্তাদীগণ ওজরমুক্ত, ইমাম কোরআন— কেরাত না জানা মূর্খ লোক, আর মুক্তাদীগণ কুরআন কেরাত জানা লোক, ইমাম নফল নামায আদায়কারী আর মুক্তাদীগণ ফরয আদায়কারী— এসব ক্ষেত্রে মুক্তাদির মান ইমামের মানের চেয়ে উন্নত। সুতরাং উল্লিখিত অবস্থায় এ ইমামের পিছনে উল্লেখিত মুক্তাদিগণের নামায শুদ্ধ হবে না।

যেসব ওজর- অপারগতার কারণে ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় না করে মাঝে— মধ্যে একাকী ঘরে বাসস্থানে আদায় করার অনুমতি রয়েছে উহা নিম্নরূপ ঃ

(ক) কারো নিকট ছতর ঢাকার পরিমাণ কাপড়ের অভাব থাকলে।

(খ) জামাতের স্থানে যাওয়া আসার রাস্তা শত্রু-জালেম ও বাঘ-ভাল্লুক ইত্যাদির আক্রমণের বিপদ থেকে মুক্ত না হলে।

(গ) ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তির খানা-পানি প্রস্তুত থাকা অবস্থায়।

(ঘ) পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির প্রবল চাপ সৃষ্টির অবস্থায়।

(ঙ) মুছাফিরী অবস্থায় সঙ্গীরা ফেলে চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে।

(চ) সময় নির্ধারিত গাড়ী সমুহ ছেড়ে দেওয়ার আশংকা থাকলে।

(ছ) অন্ধ হওয়া কিংবা অন্য কোন রোগের দরুন মাযুর হয়ে পড়লে।

(জ) অতি অন্ধকারবশতঃ রাস্তা-পথ দেখা না গেলে।

(ঝ) অতি বৃষ্টি, বরফ বর্ষণ ও পথ-ঘাট অতিরিক্ত কাদাযুক্ত হওয়ার ফলে বিশেষ ক্ষতির আশংকা থাকলে।

(ট) শরীয়াতের কোন জরুরী মাছআলা-মাছায়েল তালাশে ব্যস্ত থাকলে।

(ঠ) আল্লাহর ওয়াস্তে শরীয়াতের মাছ্আলা-মাছায়েল শিক্ষাদান ও শরয়ী কিতাবাদী লেখার মধ্যে ব্যস্ত থাকলে জামাত তরকের জন্য গুনাহগার হবেন না। (হাশিয়ায়ে তাহতাবী)

✪ পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের জামাত ইমাম ছাড়া শুধু মাত্র একজন লোককে নিয়ে কায়েম করা যায়। কিন্তু জুমআ ও ঈদের নামাযে ইমাম বাদে আরও কমপক্ষে তিনজন লোকের কমে জামাত কায়েম করা যায় না।

✪ নফল আদায়কারী ইমামের পিছনে ফরয আদায়কারী মুক্তাদির ইক্তেদা করা নাজায়েয। কিন্তু ফরয আদায়কারী ইমামের পিছনে (ফজর ও আছর ব্যতীত অন্যান্য ওয়াক্তের নামাযে) নফলের নিয়তে মুক্তাদির এক্তেদা করা জায়েয।

✪ ওয়াক্তিয়া নামাযে মুকিম ইমামের পিছনে মুছাফির মুক্তাদির নামায আদায় করা জায়েয। তবে ঐ সময়ে ইমামের তাবেদারী করতে গিয়ে মুছাফির মুছাল্লী ২ রাকাত কছরের স্থলে চার রাকাতই আদায় করবে।

অনুরূপ মুছাফির ইমামের পিছনে মুকিম মুক্তাদির নামায আদায় করাও জায়েয, তবে সেক্ষেত্রে যোহর আছর ও এশা-এতিন ওয়াক্তের নামাযের ২ রাকাত শেষে মুছাফির ইমাম ছালাম ফিরিয়ে নিলে মুকিম মুক্তাদিগণ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং এ দাঁড়ান অবস্থায় সূরা ফাতেহা পাঠ না করে- উহা পাঠ করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে উভয় রাকাত নামায যথা নিয়মে আদায় করে যাবে।

✪ মুক্তাদিগণের জন্য "ইক্তেদাইতু বিহাযাল্ ইমাম" (এ ইমামের পিছনে নামায আদায়ের নিয়ত করলাম) বলে নিয়ত করা শর্ত। কিন্তু ইমামের জন্য মুক্তাদিগণের নিয়ত করা শর্ত নয়, বরং করাটা উত্তম।

✪ মুছাল্লির সংখ্যা অনুপাতে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা ইমামের কর্তব্য। বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত উচ্চরবে তাকবীর বলা ঠিক নয়,

✪ ঘটনাক্রমে ইমামের পূর্বে কোন মুক্তাদী রুকু-ছিজ্দা হতে মাথা উঠিয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ রুকু ছিজ্দাতে চলে যেতে হয়, নতুবা মাকরূহের গুনাহ হবে।

✪ কয়েকজনের একই নামায কাযা হয়ে গেলে তা সকলে মিলে জামাতের সাথেই আদায় করা উচিত (দোররুল মুখতার)।

✪ জামাত আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর যারা এসে জামাতে শামিল হয়/ দোয়ায়ে ছানা না পড়ে) ইমামের কেরাত শোনা তাদের জন্য উত্তম। (শামী) কিন্তু ইমামের চুপে চুপে কেরাত পাঠ অবস্থায় কেউ এসে যদি জামাতে শরিক হয় তাহলে ছানা পড়ে নেয়া যায়। (আলমগীরী)

✪ মাত্র একজন লোককে নিয়ে জামাত কায়েম করলে সে লোক ইমামের ডান পার্শ্বে একটু পিছনে দাঁড়াবে। একজন মুক্তাদী ইমামের বাম পাশে কিংবা সোজা পিছনে দাঁড়ান মাকরূহ।

✪ দু'জন মুক্তাদী হলে ইমামের সোজা পিছনে দাঁড়াবে, জায়গার সংকুলান থাকা অবস্থায় একজন ইমামের ডান পাশে আর একজন বাম পাশে দাঁড়ান মাকরূহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ যদি একজন মুক্তাদী ইমামের ডান পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় জামাত শুরু করা হয় অতঃপর আর একজন মুক্তাদী এসে জামাতে শরিক হয়, তখন সামনে জায়গার সংকুলান হলে ইমাম এক কদম সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে। অথবা প্রথম মুক্তাদী দ্বিতীয় মুক্তাদীকে নিয়ে পিছনের দিকে সরে দাঁড়াবে, কিংবা দ্বিতীয় মুক্তাদী নামাযের নিয়ত করতঃ প্রথম মুক্তাদীকে পিছনে টেনে এনে একসাথে উভয়জন দাঁড়াবে।

জামাতের নামাযের কাতার সমূহ সোজা হওয়া একান্ত জরুরী। কেননা, হুজুর (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ নামাযের কাতার বাঁকা হলে তোমাদের অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে।

সামনের কাতারে জায়গা খালি রেখে তৎপরবর্তী কাতারে দাঁড়ান মাকরূহ।

এছাড়া প্রথম কাতার পূর্ণ হওয়ার পরই দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াবে। কারণ প্রথম কাতারে দাঁড়ালে বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাতারের মর্যাদা।

তদুপরি পবিত্র হাদীছ শরীফের মাধ্যমে জানা যায়– জামাতের নামাযে আল্লাহ তাআলা যে বিশেষ রহমত নাজেল করে থাকেন– তা সর্বপ্রথম ইমামের উপর, অতঃপর ইমাম বরাবর পিছনের কাতারের লোকের উপর যথাক্রমে বর্ষিত হয়ে থাকে।

✪ বাহ্রুর রায়েক গ্রন্থে বর্ণিত আছে–

وَفِى الْقُنْيَةِ وَالْقِيَامُ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ اَفْضَلُ مِنَ الثَّانِى وَفِى الثَّانِى اَفْضَلُ مِنَ الثَّالِثِ هٰكَذَا لِاَنَّهُ رُوِىَ فِى الْاَخْبَارِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَنْزَلَ الرَّحْمَةَ عَلَى الْجَمَاعَةِ يُنْزِلُهَا اَوَّلًا عَلَى الْاِمَامِ ثُمَّ تَتَجَاوَزُ عَنْهُ اِلٰى مَنْ بِحِذَائِهِ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ اِلَى الْمَيَامِنِ ثُمَّ اِلَى الْمَيَاسِرِ ثُمَّ اِلَى الصَّفِّ الثَّانِى وَرُوِىَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ يُكْتَبُ لِلَّذِى خَلْفَ الْاِمَامِ بِحِذَائِهِ مِائَةُ صَلَاةٍ وَلِلَّذِى فِى الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ صَلَاةً وَلِلَّذِى فِى الْجَانِبِ الْاَيْسَرِ خَمْسُوْنَ صَلَاةً وَلِلَّذِى فِى سَائِرِ الصُّفُوْفِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً ـ صفحه ٣٥٤

✪ কাতারে দু'জনের মাঝখানে ফাঁক রাখা উচিত নয়– এতে শয়তান চলাচল

করতঃ মুছাল্লীদের অন্তরে ওয়াছওয়াছা সৃষ্টি করার প্রচেষ্ট চালায়। সুতরাং একজন অপর জনের দেহের সাথে মিশে দাঁড়ান উত্তম। [আলমগীরি]

বাহ্রুর রায়েক গ্রন্থে বর্ণিত আছে–

وَرَوٰى اَبُوْ دَاؤُدَ وَالْاِمَامُ اَحْمَدُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض اَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِخْوَانِكُمْ لَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ ـ صفحه٣٥٣ ج ١

✪ জামাত আরম্ভ হয়ে যাবার পর কোন মুছাল্লী এসে দেখতে পেল যে, তার সামনের কাতারের কোথাও দাঁড়াবার মত খালি জায়গা নাই এবং দু'জন একত্রিত হয়ে আর একটি নতুন কাতার সৃষ্টি করার জন্য অন্য কোন লোকও নাই। এমতাবস্থায় সে লোক প্রথমে নিয়ত করে নিবে, অতঃপর সামনের কাতার হতে একজন নামাযরত মুছাল্লীকে পিছনে টেনে এনে দু'জন হয়ে কাতার করতঃ দাড়াবে. কারণ একা দাঁড়িয়ে কাতার করা মাকরূহ।

তবে হাঁ, সামনের কাতারের লোকের মাছআলা জানা না থাকায় তাকে টানার পর সে পিছনে, সরে না আসলে কিংবা সামনের কাতারের লোককে পিছনে টানতে গিয়ে কোন রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকা থাকলে এমতবস্থায় একা পিছনে দাঁড়িয়ে কাতার করা মাকরূহ নহে।

✪ যখন জামাত বড় হয় এবং ইমামের উচ্চরবের তাকবীরের আওয়াজও পিছনের মুক্তাদীগণ শুনতে না পায় তখন মুক্তাদীগণের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে।

আবশ্যক হলে এরূপ মুকাববের হওয়া বৈধ; বর্তমানে মাইকযোগে নামায আদায়ের দ্বারা এ মুকাব্বেরের কাজ সেরে নেয়া হয়। এরপরেও মুকাব্বের হিসাবে নির্ধারিত কোন লোক থাকাটা উত্তম।

✪ কোন লোক একাকী ফরয নামায আদায় করে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় একই নামাযের জামাআত আরম্ভ হয়ে গেলে এ ক্ষেত্রে সে দ্বিতীয় রাকাতের ছিজ্দা না করা পর্যন্ত সময়ে উক্ত নামায ভেঙ্গে দিয়ে তাকে জামাতে শামিল হয়ে যেতে হয়। আর তার নামায যদি সুন্নাত–নফল নামায হয়ে থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি দু'রাকাত পুরা করতঃ ছালাম ফিরিয়ে জামাতে শামিল হয়ে যাবে।

✪ কোন মুছাল্লী মাসজিদে প্রথম দিকে এসে প্রথম কাতারে জায়গা নিয়ে বসার পর যদি কোন বুজুর্গ আলেমে দ্বীন অথবা নিজের চেয়ে বয়সে বড় কোন নেক্কার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুরুব্বী এসে পড়েন তখন এ বসা লোক আগতদের প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে প্রথম কাতারে নিজের স্থানে ওনাদেরকে জায়গা দান করে নিজে পিছনে সরে পড়া জায়েজ। এতে উভয়ের ছাওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়।

যেমন- مِنْحَةُ الْخَالِقِ حَاشِيَةُ بَحْرِ الرَّائِقِ গ্রন্থে বলা হয়েছে-

وَ فِىْ حَاشِيَتِهَا لِلسَّيِّدِ الْحَمَوِىْ عَنِ الْمُضْمَرَاتِ نَقْلًا عَنِ النِّصَابِ
وَاِنْ سَبَقَ اَحَدٌ بِالدُّخُوْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ مَكَانَهُ فِىْ الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَدَخَلَ رَجُلٌ
اَكْبَرُ مِنْهُ سِنًّا اَوْ اَهْلُ الْعِلْمِ يَنْبَغِىْ اَنْ يَتَأَخَّرَ وَ يُقَدِّمَهُ تَعْظِيْمًا اهـ قَالَ
فَهٰذَا مُفِيْدٌ لِجَوَازِ الْاِيْثَارِ فِىْ الْقُرَبِ عَمَلًا بِعُمُوْمِ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَ يُؤْثِرُوْنَ
عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - صـ ٣٥٤

✪ বর্তমানে কোথাও কোথাও একামত বলা শুরু করার সাথে সাথেই যে দাড়িয়ে যেতে দেখা যায় ইহা ছুন্নাতের বিপরীত নিয়ম।

✪ জমাতের নামাযে মোয়াজ্জেন সাহেব একামত বলা শুরু করলে কাতার বন্দী হয়ে বসা মুছাল্লীবৃন্দ কখন দাড়াবেন? এ নিয়ে আমাদের দেশে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জমাতের প্রতিপক্ষের লোকেরা একামত বলা আরম্ভ করার সাথে সাথে-দাড়িয়ে যান, দাঁড়িয়ে যান- বলে সকলকে দাড় করিয়ে দিয়ে এক রকমের হৈ-হল্লা শুরু করে দেয়।

তাই এ বিষয়ে পবিত্র হাদীছ- ফেকাহ্‌র সঠিক সিদ্ধান্ত খানা পাঠকমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে-

✪ এ প্রসঙ্গে বোখারী শরীফের

مَتٰى يَقُوْمُ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْاِمَامَ عِنْدَ الْاِقَامَةِ

পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীছ শরীফ-

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ

অর্থ- আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন- যখন মোয়াজ্জেন নামাযের জমাতের জন্য একামত বলে- তখন (হুজুরা শরীফ থেকে আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে না)-এর ব্যাখ্যায় "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

وَقَالَ مَالِكٌ رح فِىْ الْمُوَطَّا - لَمْ اَسْمَعْ فِىْ قِيَامِ النَّاسِ حِيْنَ تُقَامُ
الصَّلٰوةُ بِحَدٍّ مَحْدُوْدٍ اِلَّا اَنِّىْ اَرٰى ذٰلِكَ عَلٰى طَاقَةِ النَّاسِ - فَاِنَّ مِنْهُمُ
الثَّقِيْلَ وَالْخَفِيْفَ - وَ ذَهَبَ الْاَكْثَرُوْنَ اِلٰى اَنَّهُمْ اِذَا كَانَ الْاِمَامُ مَعَهُمْ فِىْ
الْمَسْجِدِ لَمْ يَقُوْمُوْا حَتّٰى تَفْرُغَ

وَعَنْ اَنَسٍ رض كَانَ يَقُوْمُ اِذَاقَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
وَ غَيْرُهُ........وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رض يَقُوْمُوْنَ اِذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَاِذَا
قَالَ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ كَبَّرَ الْاِمَامُ وَاَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنِ الْاِمَامُ فِىْ الْمَسْجِدِ
مَذْهَبُ الْجُمْهُوْرِ اِلٰى اَنَّهُمْ لَا يَقُوْمُوْنَ حَتّٰى يَرَوْهُ - صفحہ١٢ ج٢

✪ উক্ত হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী (র) "ওমদাতুল কারী" গ্রন্থে বলেনঃ

وَ كَانَ اَنَسٌ رضى الله تعالى عنه يَقُوْمُ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ
الصَّلٰوةُ وَ كَبَّرَ الْاِمَامُ .... وَ ذَهَبَتْ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ اِلٰى اَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ
حَتّٰى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاِقَامَةِ وَ فِىْ الْمُصَنَّفِ كَرِهَ هِشَامٌ يَعْنِىْ ابْنَ عُرْوَةَ
اَنْ يَقُوْمَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ .... وَ مَذْهَبُ الشَّافِعِىْ
رح وَ طَائِفَةٍ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اَنْ لَا يَقُوْمَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاِقَامَةِ وَ هُوَ
قَوْلُ اَبِىْ يُوْسُفَ رح .... وَ قَالَ زُفَرُ رح اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ
الصَّلٰوةُ مَرَّةً قَامُوْا وَاِذَا قَالَ ثَانِيًا اِفْتَتَحُوْا وَ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٌ
رحمهما الله تعالى - يَقُوْمُوْنَ فِىْ الصَّفِّ اِذْ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ فَاِذَا
قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ كَبَّرَ الْاِمَامُ -

(উভয় উদ্ধৃতির অনুবাদ)

অর্থাৎ, হযরত ইমাম মালেক (র) মুয়াত্ত্বা গ্রন্থে বলেন ঃ যখন নামাযের জমাত শুরু করার জন্য একামত বলা হয় তখন সমবেত মুছাল্লীবৃন্দ কখন দাঁড়াবে? এ ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সীমা সম্পর্কে কোন হাদীছ আমার গোচরিভূত হয়নি -

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার মতে এটা মুছাল্লীগণের শক্তি (অবস্থা) এর উপরই নির্ভরশীল। কেননা, তাদের মধ্যে ভারী এবং হালকা উভয় প্রকারের লোক রয়েছে।

অধিকাংশ মুজতাহিদ আইম্মায়ে কেরাম ও ফোকাহায়ে ইজাম এ মত পোষণ করেন যে, যখন ইমাম মুসাল্লিগণের সাথে মাসজিদে উপস্থিত থাকেন তখন একামত শেষ না করা পর্যন্ত নামাযের জন্য দাঁড়াবে না এবং ইমাম নামায আরম্ভ করবে না।

বিশিষ্ট খাদেমে রাসূল প্রিয় নবী (দঃ) এর প্রাণ প্রিয় ছাহাবী হযরত আনাছ (রাঃ) মোয়াজ্জেন 'কাদ কা মাতিচ্ছালাত' বললেই নামাযের জন্য দাঁড়াতেন।

হযরত ইবনে উরওয়া (রাঃ) এর মতে "কাদ্-কা-মাতিচ্ছালাত" বলার পূর্বে দাঁড়ান মাকরূহ।

শাফেয়ী মাযহাব ও অন্যান্য একদল ফোকাহায়ে কেরামের মতে, একামত বলা শেষ হলেই মুছাল্লিগণের নামাযের জন্য দাঁড়ান মুস্তাহাব. আমাদের ইমাম আবূ ইউছুফ (র) ও এরূপ মত পোষণ করেন।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে, যখন মোয়াজ্জেন "হাইয়া আলাচ্ছালাত" বলবে তখন মুছাল্লীগণ নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং যখন "কাদ্কা-মাতিচ্ছালাত" বলবে তখন ইমাম নামায আরম্ভ করবেন।

✪ "শরহে বেকায়া" গ্রন্থে বলা হয়েছে–

وَيَقُوْمُ الْاِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ وَ يَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ . ج ١

✪ হানাফী মাযহাবের মহান ইমাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র) كتاب الاثار গ্রন্থে বলেছেন যে, আমাদের ইমাম আযম আবূ হানিফা (র) হযরত ইব্রাহীম নাখ্য়ী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন– যখন মোয়াজ্জেন "হাইয়া আলাল্ ফালাহ" বলবে তখনই উপস্থিত মুছাল্লীগণ দাঁড়িয়ে যাবে এবং যখন মোয়াজ্জেন قد قامت الصلوة বলবে তখনই ইমাম নামায আরম্ভ করে দিবে। উক্ত হাদীছ শরীফ খানা বর্ণনা করার পর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন– এক্ষেত্রে যদি ইমাম একামত বলা সমাপ্ত হওয়ার পরই নামায আরম্ভ করেন এতে ও কোন অসুবিধা নাই।

অনুরূপ "মুয়াত্ত্বায়ে ইমাম মুহাম্মদ (র)" গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে,

يَنْبَغِىْ لِلْقَوْمِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَنْ يَقُوْمُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ فَيَصُفُّوْا وَ سَوُّوا الصُّفُوْفَ وَ يُحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ فَاِذَا اَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ الْاِمَامُ وَ هُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رحمه الله .

অর্থাৎ, মোয়াজ্জেন যখন হাইয়া আলাল্ ফালাহ বলে তখনই নামাযের জন্য উপস্থিত মুছাল্লীগণের দাঁড়ানো উচিৎ অতপর কাতার করবে এবং কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাতার সোজা করে নিবে। মোয়াজ্জেন যখন "কাদকা-মাতিচ্ছালাত" বলবে তখনই ইমাম নামায শুরু করে দিবে এবং ইহাই ইমাম আযম (র) -এর মাযহাব।

উপরোল্লেখিত তথ্যভিত্তিক আলোচনার আলোকে প্রমাণিত হল যে, মোয়াজ্জেনের একমত বলা আরম্ভ করার সাথে সাথে ইমাম ও মুছাল্লীগণের দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি কোন মুজতাহিদ ইমাম ও ফোকাহায়ে কেরামগণের গ্রহণীয় বিধান নয়। বিশেষতঃ আমরা যে হানাফী মাযহাবের অনুসারী আমাদের আইম্মায়ে কেরামগণের মতে, "হাইয়া আলাচ্ছালাত" কিংবা "হাইয়া আলাল্ ফালাহ" বলার সময়েই ইমাম ও মুছাল্লীগণের দাঁড়াতে হয় এবং আমাদের মাযহাবের গ্রহণীয় মতানুসারে একামত বলা শেষ হলেই ইমামের নমায আরম্ভ করতে হয়।

সার্বিক দিক বিবেচনায় ইহাই হচ্ছে শরীয়ত সম্মত সঠিক সিদ্ধান্ত।

জামায়াতের নামাযের মুক্তাদীর প্রকারভেদ ঃ

জামায়াতের নামাযের মুক্তাদী (মুছাল্লী) চার প্রকার ঃ (১) মুদ্‌রেক (২) লাহেক (৩) মাছবূক ও (৪) মাছবূক-লাহেক।

১. **মুদরেকঃ** ঐ মুক্তাদীকে বলা হয়– যিনি জামাতের নামাযে শুরু তথা তাকবীরে তাহরীমা হতে শেষ তথা ছালাম ফিরানো পর্যন্ত ইমামের সাথেই নামায আদায় করে থাকেন।

এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যিনি ১ম রাকাতের রুকুতেই জামাতে এসে শরিক হয়ে থাকেন তাকেও মুদ্রেক রূপে গণ্য করা হয়।

২. **লাহেক ঃ** যে মুছাল্লী জামাতের নামাযে শুরু থেকে ইমামের সাথে নামাযে শরিক থাকেন কিন্তু ১/২ রাকাত বা ততোধিক রাকাত নামায আদায় করার পর কোন ওজর বশতঃ যেমন নামাযরত অবস্থায় তাকে তন্দ্রা-নিদ্রা, অমনোযোগিতা ও অলসতা ইত্যাদি পেয়ে বসায় বা লোকজনের বেশী ভীড়ের কারণে ইমামের সাথে নামাযের কতকাংশ আদায় করতে না পারায়, এমনিভাবে নামাযরত অবস্থায় কারও ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে পুনঃ ওযু করে আসার ফাঁকে জামাতের নামাযের কতক রুকন (কাজ) যে মুক্তাদী থেকে ছুটে যায়, ঐ ধরনের মুক্তাদীকে শরীয়তের পরিভাষায় লাহেক মুক্তাদী বলা হয়।

৩। **মাছবুকঃ** জামাতের নামাযে ইমামের ১/২ বা ততোধিক রাকাত নামায আদায় হয়ে যাওয়ার পর যে মুছাল্লী এসে ইমামের সাথে জামাতের নামাযে শরিক হন তাকে মাছবূক মুক্তাদী বলা হয়।

৪। **মাছবুক-লাহেক ঃ** যে মুছাল্লী জামাতের নামাযের কিছু অংশ যেমন– ১ম

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাকাত আদায় হয়ে যাওয়ার পর ২য় রাকাতে এসে শরিক হন এবং ইমামের সাথে ২/১ রাকাত নামায আদায় করার পর ঘটনাক্রমে তার ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়া কিংবা লাহেকের বর্ণনায় উল্লিখিত কারণসমূহ উপস্থিত হয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইমামের সাথের নামাযের কিছু অংশ তার থেকে ছুটে বসে- এ ধরনের মুছাল্লীকে মাছবুক লাহেক মুক্তাদী বলা হয়।

লাহেক মুক্তাদির নামায আদায় করার নিয়ম ঃ

ইমামের সাথে জামাতে নামায আদায়রত অবস্থায় ওযু ভঙ্গের কোন কারণ ঘটায় মুক্তাদির ওযু নষ্ট হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ জামাতের কাতার থেকে নাকে হাত দিয়ে বের হয়ে এসে কারো সাথে কোন প্রকারের কথাবার্তা না বলে তাড়াতাড়ি ওযু করে নেবে, ওযু করতঃ ফিরে আসার পর তখনও যদি উক্ত জামাত চালু থাকে তাহলে ঐ লোক তখন আপাততঃ ইমামের সাথে জামাতে শামিল না হয়ে জমাতের নামাযের যে কতেকাংশ সে পায়নি প্রথমে একাকী উহা আদায় করে নিবে।

তবে আদায় করার ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে নামায পড়লে যেরূপ মুক্তাদিকে কেরাত পড়তে হয় না-তদ্রূপ এ লাহেক মুছাল্লী তার উক্ত ছুটে যাওয়া নামায আদায় করা কালেও কিরাআত পড়বে না, বরং কেরাত পাঠ পরিমাণ সময় নিরব দাঁড়িয়ে থাকবে মাত্র, অতঃপর রুকু ছিজদা ও বৈঠক এবং তাছবীহ- দোয়া ইত্যাদি আদায় করতঃ নামাযের ঐ ছুটে যাওয়া অংশ আদায় করে নিবে।

অতঃপর যদি দেখতে পায় যে, তখনও জামাতের নামায জারী রয়েছে, তাহলে উক্ত জমাতে শরীক হয়ে ইমামের সাথে যথানিয়মে নামায শেষ করে নিবে।

আর তখন যদি জামাত শেষ হয়ে যায় তাহলে পূর্ব নিয়মে নামাযের বাকী অংশ নিজে নিজে আদায় করতঃ নামায সমাপ্ত করবে।

এক্ষেত্রে এটাও উল্লেখ্য যে, যদি উক্ত লাহেক মুক্তাদী ওযু করে আসার পর কিংবা নামাযরত অবস্থায় নিদ্রা হতে জাগরিত হওয়ার পর ফাঁকে ছুটে যাওয়া নামাযের কাজগুলো প্রথমে আদায় না করে- ওযু করে আসার পরক্ষণেই ইমামের সাথে যোগ দিয়ে নিয়ম মাফিক চলমান নামায জামাতের সাথে আদায় করে যায় এবং ইমামের ছালাম ফিরানোর পরই ফাঁকে ছুটে যাওয়া নামাযের ঐ বাকী কাজগুলো লাহেক মুক্তাদির নামাযের পূর্বোল্লেখিত নিয়মে তথা (কেরাত-ছূরা পাঠ করা ছাড়া) আদায় করতঃ নামায শেষ করে নেয় তাঁহলেও লাহেক মুক্তাদির নামায আদায় হয়ে গিয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হবে।

কিন্তু লাহেক মুক্তাদির জন্য নির্ধারিত তারতীবের বিপরীত হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে, (দুররে মুখতার, শামী)।

সুতরাং লাহেক মুক্তাদির নামায আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত নিয়মটিই মেনে নেওয়া উচিৎ।

লাহেক মুক্তাদির নামায আদায়ের মাছআলা জানা না থাকলে নামায আদায়রত অবস্থায় ওযু ভঙ্গ হওয়া বা উল্লিখিত অন্যান্য কারণসমূহ পাওয়া গেলে ছালাম ফিরিয়ে নামায ভঙ্গ করে ফেলবে এবং পুনঃ ওযু করে নতুনভাবে নিয়ত করতঃ নামায আদায় করে নিবে।

মাছবুক মুক্তাদির নামায আদায় করার নিয়ম ঃ

যে কোন ওয়াক্তের নামাযের জামাত শুরু হয়ে যাওয়ার পর মাছবূক মুক্তাদী ইমামকে প্রথম রাকাতে দাঁড়ান অবস্থায় পেলে কিংবা ইমামের ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলে রুকু হতে মাথা উত্তোলণের পূর্বে অন্ততঃ একবার রুকুর তাছবীহ সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" পাঠ করতে পারার মত সময় থাকতে রুকুতে গিয়ে ইমামের সাথে শরিক হতে পারলে মুক্তাদী ঐ প্রথম রাকাত তথা পূর্ণ নামায ইমামের সাথে পেয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হবে।

যোহর-আছর ও এশার (চারি রাকাত বিশিষ্ট) নামাযের মধ্যে মাছবুক ব্যক্তি যদি এক রাকাত না পেয়ে থাকে তাহলে ইমামের সঙ্গে শেষ বৈঠকে বসে এরূপ ভাবে "তাশাহ্হুদ" পাঠ করে যাবে যাতে তাশাহ্হুদ পাঠ করতে করতে ইমাম ছালাম ফিরানোর কাছাকাছিতে পৌছে যান, তাশাহ্হুদ পাঠের পর মাছবুক মুক্তাদী ইমামের সাথে দরুদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাছুরা ইত্যাদি পড়বে না। [কাজীখান, ফাতহুল কাদীর]।

আর মাছবুক মুক্তাদি যদি ইমামের ছালাম ফিরানোর অনেক আগেই তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করে নেয়, তাহলে তাশাহ্হুদ পাঠের পর এ বসা অবস্থায় শুধু বার বার আশাহ্াদু-আল্ লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমা পড়তে থাকবে। [আলমগীরী]

অতঃপর ইমাম উভয় দিকে ছালাম ফিরিয়ে নিলে মাছবুক মুক্তাদি তাকবীর "আল্লাহু আকবর" বলে উঠে দাঁড়াবে এবং দোয়া ছানা আউজুবিল্লাহ-বিছমিল্লাহ পাঠ করতঃ ছূরা ফাতেহা এবং অন্য যে কোন ছূরা-কেরাত পড়ে নেবে রুকু সিজদা ও নামাযের অন্যান্য আহ্কাম যথা নিয়মে সমাধা করতঃ ছালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

মাছবূক মুক্তাদী যদি জামাতে এসে দু'রাকাত নামায না পেয়ে থাকে তাহলে ইমামের ছালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলে দাড়িয়ে বাকী দু'রাকাতের ১ম রাকাতে দোয়া ছানা অতঃপর আউযুবিল্লাহ-বিছমিল্লাহ পাঠ করতঃ ছূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি ছূরা কেরাত পড়ে রুকু ছিজ্দা দিয়ে আদায় করবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে শুধু বিছমিল্লাহ সহকারে ছূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি ছূরা-কেরাত পড়ে যথানিয়মে নামায আদায় করে নেবে।

✪ আর মাছবূক মুক্তাদী যদি তিন রাকাত নামাযই না পেয়ে থাকে তাহলে ইমামের ছালাম ফিরিয়ে নেওয়ার পর দাঁড়িয়ে ১ম রাকাতে দোয়া ছানা এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

আউজুবিল্লাহ-বিছমিল্লাহ সহকারে ছূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন একটি ছূরা কেরাত পড়বে অতঃপর যথানিয়মে রুকু-ছিজদা আদায় করে বসে পড়বে ও এ বসা অবস্থায় তাশাহহুদ পাঠ করতঃ পুনঃ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে- অতঃপর বিছমিল্লাহ সহকারে ছূরা ফাতেহা এবং অন্য যে কোন একটি ছূরা কেরাত পড়ে যথা নিয়মে রুকু-ছিজদা আদায় করতঃ চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাতে শুধু বিছমিল্লাহ সহকারে ছূরা ফাতেহা পাঠান্তে রুকু ছিজদা আদায় করতঃ শেষ বৈঠকে বসে যথানিয়মে নামায শেষ করবে।

✪ কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, তিন রাকাত নামায ছুটে যাওয়া মাছবূক মুক্তাদী ইমাম ছালাম ফিরিয়ে নেওয়ার পর দাড়িয়ে যাবে এবং পূর্ব নিয়মে ১ম রাকাতে দোয়া ছানা ও আউজুবিল্লাহ-বিছমিল্লাহ সহকারে ছূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন ছূরা কেরাত পাঠ করে রুকু-ছিজদা করার পর না বসে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং এতেও বিছমিল্লাহ সহকারে ছূরা ফাতেহা ও অন্য যে কোন ছূরা-কেরাত পাঠ শেষে যথানিয়মে রুকু-ছিজদা দেওয়ার পর বসে তাশাহহুদ পাঠ করেই চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াবে এবং তাতে শুধু বিছমিল্লাহ সহকারে ছূরা ফাতেহা পাঠ করতঃ রুকু ছজদা দিয়ে নিয়ম মাফিক শেষ বৈঠকে বসে তাশাহহুদ, দরূদ ও দোয়া পাঠান্তে ছালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

উপরোক্ত বর্ণনা মতে জানা গেল যে, তিন রাকাত ছুটে যাওয়া মাছবূক মুক্তাদী দু'টি নিয়মে তার বকেয়া রাকাতগুলো আদায় করে নিতে পারবে।

✪ মাছবূক মুক্তাদী যদি ইমামকে শেষ রাকাতের ছিজ্‌দা দেওয়া কিংবা শেষ বৈঠকে বসে তাশাহহুদ ইত্যাদি পাঠরত অবস্থায় পায় তাহলে ইমামের ছালাম ফিরানোর পর এ মাছবূক মুক্তাদী দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ নামায একাকী পড়ার নিয়মে আদায় করে নিবে।

✪ যদি কোন মাছবূক মুক্তাদী ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে বসে ইমামের সাথে হউক কিংবা ইমামের আগে ভুলবশতঃ ছালাম ফিরিয়ে নেয়, তজ্জন্য তাকে ছাহু-ছিজ্‌দা করা লাগবে না।

✪ কিন্তু ইমামের ছালাম ফিরিয়ে নেওয়ার পরেই যদি ভুলক্রমে মুক্তাদীও ছালাম ফিরিয়ে নেয় তাহলে তার ছাহু ছিজ্‌দা করা লাগবে।

✪ আর এ ক্ষেত্রে যদি ইমামের সাথে ছালাম ফিরানোকে সঠিক বিবেচনা করতঃ ছালাম ফিরিয়ে থাকে তাহলে নামায ফাছেদ হয়ে যাবে।

মাছবূক-লাহেক মুক্তাদির নামায আদায়ের নিয়ম ঃ

এ ধরনের মুছাল্লী ওযুর কাজ সেরে এসে সর্বাগ্রে ইমামের সাথে ছুটে যাওয়া নামাযের ঐ অংশটুকু উপরের লাহেক মুক্তাদির নামায আদায়ের নিয়মে আদায় করবে-

ঐ অংশ আদায় করার পর জামাতে শরিক হওয়ার আগে নামাযের যে কয় রাকাত অনাদায়ী রয়ে গিয়েছিল সেগুলো মাছবূক মুক্তাদির নিয়মে আদায় করতঃ নামায শেষ করবে।

নামাযরত অবস্থায় হাদছ্ (ওযু ভঙ্গ) হওয়া ও "বেনা" করার আহকাম

একাকী নামায আদায়কারীর নামাযরত অবস্থায় কোন কারনে হাদছ্ তথা ওযু ভঙ্গ হলে পুনঃ ওযু করে নূতনভাবে নিয়ত করতঃ পুরা নামায পূর্ণর্বার আদায় করাটাই উত্তম, তবে "বেনা" করাও জায়েয।

✪ নামাযের যে কাজ আদায় কালে ওযু ভঙ্গ হয়ে যায় সে অবস্থায় গিয়ে ওযু করে এসে নূতন ভাবে ঐ নামাযের জন্য নিয়ত না করে পূর্বেকৃত নিয়তের উপর ভিত্তি করে পুনঃ এ ছুটে যাওয়া কাজ থেকে নামায আদায় করে যাওয়াটাকে "বেনা" করা বলা হয়।

✪ নামাযরত অবস্থায় যদি ওযু ভঙ্গ হওয়াটা আল্লাহর তরফের তথা নিজের ইচ্ছায় নয় বরং স্বাভাবিক নিয়মে পেশাব-পায়খানার বেগ হয়ে বসে বা বায়ূবের হয়ে পড়ে কিংবা নাক দিয়ে রক্তস্রাব শুরু হয়ে যায় অথবা মুখ ভরে বমি হতে থাকে ও ক্ষতস্থান থেকে আপনা-আপনি রক্ত বের হতে থাকে-তাহলে পুনঃ ওযু করে এসে পূর্বে নিয়তকৃত নামাযের উপর বেনা করতঃ নামাযের ছুটে যাওয়া অংশ সমূহ আদায় করে নেওয়া যায়। (আলমগীরী)

✪ আর ওযু যদি অপরের কারণে ভঙ্গ হয়ে থাকে যেমন- কারও ঢিল পাথর কিংবা গুলি নিক্ষেপ করার কারণে অথবা আঘাত করার ফলে, অনুরূপ ভাবে কারো ক্ষতস্থানে অপর কারো ধাক্কা লেগে রক্তপাত ঘটার কারণে ওযু ভঙ্গ হলে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে পুনঃ ওযু করতঃ নূতন ভাবে নিয়ত করেই পুনরায় নামায আদায় করা লাগবে। তখন "বেনা" করা জায়েজ হবে না।

(আলমগীরী)

✪ নামাযরত অবস্থায় কোন মুছাল্লী যদি স্বেচ্ছায় ওযু ভঙ্গের কোন কাজ যেমন- পেশাব-পায়খানা করে বসে, বায়ু বের করে দেয়, অথবা নাক দিয়ে রক্ত বের করতঃ ওযু নষ্ট করে দেয়, তাহলে নামায ফাছেদ (নষ্ট) হয়ে যায়। এ অবস্থায়ও পূর্বের নামাযে বেনা করা জায়েয নাই।

✪ অনুরূপ নামাযরত অবস্থায় যদি গোছল ওয়াজিব হওয়ার কোন ব্যাপার ঘটে তখনও "বেনা" করা নাজায়েয ; বরং তখন গোছল বা তায়াম্মুম করে নতুনভাবে নিয়ত করতঃ পূর্বে নিয়তকৃত ঐ নামায আদায় করে দেওয়া জরুরী। (আলমগীরী)

✪ মুক্তাদীর হাদছ্ হওয়ায় পুনঃ ওযু করে আসার পরেও যদি ইমাম নামাযে মশগুল থাকে তাহলে সে ইমামের কাছাকাছি কাতারে এসে ইমামের ইক্তেদা করবে। আর যদি ইমাম নামায সমাপ্ত করে ফেলেন তাহলে মুক্তাদি যথাস্থানে ফিরে না এসে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যেখানে জায়গা পায় সেখানে দাঁড়িয়েই বাকী নামায আদায় করে নেবে।

✪ ওযু ভঙ্গ হওয়া মাত্রই ওযু করার জন্য সকলকে চলে যেতে হবে। যদি ওযু ভঙ্গ হওয়ার পর এক রোকন আদায় করার পরিমাণ সময় বিলম্ব করা হয় তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন ওযু করতঃ নতুন নিয়তে নামায আদায় করে দেওয়া লাগবে।

[আলমগীরি]

জামাতের নামাযে ইমাম সাহেবের হাদছ্ (ওযু ভঙ্গ) হওয়া এবং তাঁর খালীফা (স্থলাভিসিক্ত) নির্ধারণ করার মাছায়েলঃ

✪ জামাতের নামাযে ইমামের হাদছ্ (ওযু ভঙ্গ) হলে মুক্তাদীগণের থেকে এরূপ একজন লোককে নিজের খলীফা (স্থলাভিসিক্ত) বানিয়ে বাকী নামাযের ইমামতী করার জন্য দায়িত্ব দেবেন-যিনি নামায শুরু হওয়ার সময় থেকে তথা উক্ত ইমামের সাথে প্রথম রাকাত থেকেই নামাযে শামিল রয়েছে এবং সাথে সাথে ঐ লোকের ইমাম হওয়ার যোগ্যতাও রয়েছে।

✪ এভাবে মুক্তাদীগণ থেকে একজন নামাযের মাছআলা জাননে ওয়ালা যোগ্য লোককে কথাবর্তা বলার মাধ্যমে নয় বরং সম্পূর্ণ ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে সামনে ইমামের স্থানে বাড়িয়ে দিয়ে ইমাম মাথা নীচু করে নাকে হাত রেখে ওযু করার জন্য পিছনে সরে আসবেন।

অতঃপর ইমাম ওযু করতঃ ফিরে এসে যদি দেখতে পান যে, ঐ খলীফা (স্থলাভিসিক্ত লোক) নামায শেষ করে নিয়েছেন তখন পূর্বতন ইমাম সাহেব মুন্‌ফারিদ তথা একাকী নামায আদায়কারীর ন্যায় নামায আদায় করবেন।

আর যদি স্থলাভিসিক্ত লোক (খলীফা) নামায থেকে ফারিগ না হয়ে নামায আদায়রত থাকেন তাহলে ঐ নামাযের প্রথম ইমাম তারই স্থলাভিসিক্ত লোকের ইক্তেদা করতঃ লাহেক মুছাল্লির নিয়মে নামায আদায় করবেন।

ওযু ভঙ্গ হওয়ার পর ইমাম ওযু করার জন্য যাওয়ার সময় নামাযের কোন অবস্থায় হাদছ্ হয়েছে এবং ইমামের স্থলাভিসিক্ত লোককে কোনখান থেকে নামায আদায় করে যেতে হবে এসব কিছু সম্ভবমত ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চেষ্টা করা লাগবে।

ইমামের রুকু করার আগে হাদছ্ হলে হাঁটুর উপরে হাত রেখে ইশারা করতঃ খলীফাকে রুকু হতে নামায আদায় করে যাওয়ার জন্য বুঝিয়ে যাবেন।

যদি ছাজদা করার পূর্বে তাঁর হাদছ্ হয় তাহলে কপালে হাত রেখে বুঝাতে চেষ্টা করবেন, কির্‌আত পাঠ করা বাকী থাকলে মুখে হাত রেখে ইশারা করবেন, যদি ইমামের এক রাকাত নামায বাকী থাকে তাহলে এক আঙ্গুল উঠিয়ে, দুরাকাত বাকী থাকলে দুটো আঙ্গুল উঠিয়ে এবং তিন রাকাত বাকী থাকলে তিন আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করবেন।

মুসলিম মহিলাগণের জমাত সহকারে নামায আদায় উদ্দেশ্যে মাসজিদে গমণ প্রসঙ্গ

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পেয়ারা হাবীব রহমাতুল লিল আলামীন, শাফীউল মুজনেবীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পূত পবিত্র সোনালী যুগে মুসলিম মা-বোনদের যারা বয়স্কা ছিলেন উনারা পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে অত্যন্ত সাদা-সিদে পোষাকাদী পরিহিত অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমা-ঈদের জমাতে নূরানী নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সাথে মাসজিদে এসে নামায আদায় করতেন।

এভাবে মহিলাগণকে জুমা-জমাতে শরিক হতে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) কর্তৃক অনুমতি দেওয়ার কারণ হচ্ছে—

নূরে ইলাহিয়ার মহা প্রস্রবণ, মারফতে খোদার মহাসিন্ধু ঐশ্বরিক ফয়য-রহমত ও আকর্ষণের মহা ভাণ্ডার, নবী-রাসূল আলাইহিমুচ্ছালামগণের মহা সম্রাট, নূরানী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বশরীরে বিদ্যমান থাকায় তখনকার সকল নারী ও পুরুষ ছাহাবায়ে কেরামগণ সরাসরী প্রিয় নবী (দঃ) এর পূত-পবিত্র পরশ মনির চেয়ে কোটি গুণ অধিক আকর্ষণীয় মহান চরিত্রের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের ঈমান আকীদা হয়েছিল পরিপূর্ণ ও পাকাপোক্ত এবং তাদের চরিত্র হয়ে পড়েছিল পরিশুদ্ধ, পূত-পবিত্র ও নির্মল। তদুপরি সেকেন্ড মিনিটের মধ্যে গোপন হউক প্রকাশ্য হউক যে কোন বিষয়ে, ওহি তথা খোদায়ী ঐশীর্বাতা অবতীর্ণ হয়ে মানুষের অন্তর কোটায় লুকায়িত অভিপ্রায় কল্পনা ও ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়ার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় এবং মহান আল্লাহ তাআলা যে মহা নবী সম্রাটকে মানুষের মন-অন্তরের গোপন ভেদ, কল্পনা, পরিকল্পনা ও কুমতলব ইত্যাদি জেনে ফেলার আধ্যাত্ম শক্তি দান করেছেন স্বয়ং তিনি তৎকালের মানব সমাজে স্বশরীরে বিদ্যমান থাকায় নামায আদায়ের জন্য একত্রে মহিলা পুরুষদের সমবেত হওয়ার দ্বারা কোন রকমের যৌন ফিৎনা-ফাসাদ তথা যৌন কেলেংকারী সৃষ্টি হওয়ার বলতে গেলে সুযোগই ছিলনা।

কারণ পূত-পবিত্র নূরানী নবী (দঃ) এর ফয়জ বরকতের চুম্বুক আকর্ষণে সর্বস্তরের পুরুষ-মহিলাগণের বাহ্যিক ও মন-অন্তরের একাগ্র দৃষ্টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূরানী জাত পাকের প্রতিই সর্বদা বিমোহিত ও নিবদ্ধ থাকত, সমবেত পুরুষ-মহিলা ছাহাবায়ে কেরামগণের মন-অন্তর আল্লাহ-রাসূলের অকৃত্রিম প্রেম-মুহাব্বতের ধ্যানে-আকর্ষণে বিভোর থাকত।

তাই যৌন লালসা নিয়ে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে পরস্পরের প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়ার কিংবা কারো মনে কোনরূপ কুচিন্তা-কল্পনা উদয় হওয়ার বলতে গেলে কোন প্রকারের অবকাশ-সম্ভাবনাই ছিল না।

pdf By Syed Mostofa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

তখনকার বিরাজমান ঐ পুত-পবিত্র পরিবেশের আলোকে নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর দাসীগণ তথা মুসলিম মহিলাদেরকে আল্লাহর মাসজিদে গমণে বাঁধা দিও না।

[অত্র হাদীস শরীফ খানা ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে।]

অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরো এরশাদ করেন–

اِذَا اسْتَاْذَنَتْ اَحَدَكُمْ اِمْرَاَتُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا ـ (مسلم شريف صفحه۱۸۳)

অর্থাৎ যখনই তোমাদের কারো মহিলা মাসজিদে গমণ করতে অনুমতি চায় তখন তাকে তোমরা বাঁধা দিওনা।

মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত আছে–

اِذَا اسْتَاْذَنَكُمْ نِسَاءُكُمْ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَاْذَنُوْا لَهُنَّ. صفحه۱۸۳ ·

কিন্তু নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যৌন ফিৎনা সৃষ্টির ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন, তাই তিনি মহিলাদেরকে লাগামহীন যথেচ্ছ ভাবে অবাধে পর্দাহীন অবস্থায় মাসজিদে গমণের অনুমতি দেন নি বরং মাসজিদে গমণের ক্ষেত্রে অনেক শর্তাবলী আরোপ করেছেন।

যেমন নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسُّ طِيْبًا (مسلم شريف)

অর্থাৎ তোমাদের মহিলাগণের যারা মাসজিদে থাকে তারা মোটেই আতর-সুগন্ধী লাগাবেনা (যেন সুগন্ধী পুরুষদেরকে তাদের প্রতি আকর্ষণ না করে।)

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

اَيُّهَا النَّاسُ اِنْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِى الْمَسَاجِدِ فَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يُلْعَنُوْا حَتّٰى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّيْنَةَ وَ تَبَخْتَرُوْا فِى الْمَسَاجِدُ (فتح القدير) رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدِهِ فِى

التَّمْهِيْدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها ترفعه)

অর্থাৎ হে আমার প্রাণ প্রিয় ছাহাবারা! তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে রং বেরং এর রকমারী পোষাক অলংকারাদী পরিধান করে পুরুষেরা আকর্ষিত হয় মত নিজেদের রূপ সৌন্দর্যের প্রকাশ দিয়ে আকর্ষনীয় ভাব-ভঙ্গিমা অবলম্বন করতঃ (হেলে-দুলে রূপের বাহার দেখিয়ে) মাসজিদে গমন করা থেকে বারণ করবে। কারণ বণি- ইসরাঈলের মহিলারা রং বেরং এর রকমারী পোষাক-অলংকারাদী পরিধান করে এবং (পুরুষদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে) নিজেদের রূপ-সৌন্দর্যের প্রকাশ পাবার ভাব ভঙ্গিমা অবলম্বন করতঃ নেচে-দুলে রূপের বাহার দেখিয়ে মাসজিদ তথা গির্জাসমূহে তাদের গমণের কারণে ইয়াহুদী-খৃষ্টান সম্প্রদায় মালউন- অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে।

(এজাতীয় আরো অনেক শর্তাবলীর বর্ণনা সম্পর্কিত হাদীছ শরীফ রয়েছে।)

মোটকথা উল্লেখিত বাণী সমুহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াছাল্লামের আমলে মহিলাদের জন্য কুরআন- হাদীসে নির্ধারিত পর্দা সহকারে সাজ-সজ্জাহীন ও সুগন্ধীবিহীন অবস্থায় অত্যন্ত সাদা সিদে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, নিষ্কলুষ ও পাক-পবিত্র মন-অন্তর নিয়েই তখনকার মহিলাগণ মাসজিদে আসতেন।

আল্লাহর পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামগণ থেকে শারিরীক ভাবে আড়াল হয়ে যাওয়ার পর ও ইসলামের প্রথম রাষ্ট্র নায়ক খালীফাতুর রাসূল (দঃ) হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর শাসনামল পর্যন্ত এ পবিত্র সুশৃংখল-শান্ত পরিবেশ পুরাপুরিভাবে বিরাজমান ছিল।

অতঃপর ইসলামের দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক হযরত ওমর ফারুকে আযম (রাঃ)-এর শাসনামলে ইসলামী সম্রাজ্যের এলাকা-পরিধির বিস্তৃতি লাভের ফলে ক্রমশঃ মাসজিদ সমূহে এ ধরণের নও মুসলিমদের সমাবেশ ঘটতে শুরু করে যারা সরাসরি নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র নূরানী দর্শন ও পূত-পবিত্র আকর্ষণ পূর্ণ ছোহবত-সংস্রবে আসার সুযোগ পায়নি।

মুসলমান বেশ ধারী মুনাফেকরা তো প্রকৃত মুসলিমদের পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে সর্বদা উঠেপড়ে লেগেই ছিল।

দূরদর্শী মহান রাষ্ট্র নায়ক হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) সমকালীন মুসলিম সমাজের পবিত্র পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে দেখে এবং ক্রমশঃ সমসাময়িক মহিলাদের মধ্যে পুরুষদের মোহিত ও আকর্ষিত করে তোলার মত রকমারী পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবহার শুরু হতে দেখায়, মাসজিদ সমূহে নামায আদায়ের সুবাদে পুরুষ মহিলাদের এ অবাধ মেলা মেশার সুযোগে মহান আল্লাহর পবিত্র ঘর মাসজিদ সমূহে ফিস্‌ক ফুজুরী তথা অশ্লীল ক্রিয়া-কর্মে জড়িয়ে পড়ার আশংকা অনুভব করতঃ হযরত নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের অন্তীম কালীন বাণী–

قال النبى صلى الله عليه وسلم صلاتها فى قعر بيتها افضل من صلاتها فى صحن دارها وصلاتها فى صحن دارها افضل من صلاتها فى مسجدها و بيوتهن خير لهن ـ

[অর্থাৎ আল্লাহর নবী (দঃ) এরশাদ করেন–

মেয়ে লোকদের জন্য গৃহাভ্যন্তরে নামায আদায় করা ঘরের আঙ্গিনায় নামায আদায় করার চেয়ে উত্তম আর ঘরের আঙ্গিনায় নামায আদায় করাটা মাসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার চাইতে উত্তম, সর্বদা এদের গৃহাভ্যন্তরই এদের জন্য উত্তম]

এর মূল্যায়ন করতে যেয়ে, তদুপরি মা-বোনদের ইজ্জত-আবরুর প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণের মহৎ উদ্দেশ্যে পরিণামদর্শী মহান রাষ্ট্রনায়ক মহিলাদের সাধারণভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমা-ঈদের জমাতে হাজির হওয়াটাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। তিনি এ সংস্কারমূলক বিধান জারী করে দিয়ে শ্বাসত ইসলামের এবাদত উপাসনার শান্ত ও পূত পবিত্র পরিবেশকে অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা ও যৌন উচ্ছৃখলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে অঙ্কুরেই রক্ষার ব্যবস্থা করেন। মহান আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আল্লাইহ ওয়া ছাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদীস বাণী–

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

অর্থাৎ হে আমার প্রিয় উম্মাৎগণ! তোমাদের জন্য আমার ছুন্নাত তথা বাতলানো জীবন পদ্ধতি ও আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের ছুন্নাত তথা তাদের অনুসৃত নীতি ও বিধানের মান্য ও অনুসরণ করা জরুরী।

এর ভিত্তিতে তৎযুগে জীবিত অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাবেয়ীনগণ (রঃ) ফিৎনা সৃষ্টির ইল্লাত (কারণ) কে সামনে রেখে ফারুকে আযম (রাঃ) এর ঘোষিত নীতিকে একবাক্যে মেনে নেন।

যেমন বিশ্ব খ্যাত ফেকাহ গ্রন্থ হেদায়া কিতাবের শরাহ "এনায়াতে আছে–

ولقد نهى عمر رضى الله تعالى عنه ـ النساء عن الخروج الى المساجد ـ فشكون الى عائشة رضى الله عنها فقالت ـ لو علم النبى صلى الله عليه وسلم ما علم عمر رضى الله تعالى عنه مااذن لكن فى الخروج ـ صفحه ٣٦٥

বোখারী শরীফের خروج النساء الى المساجد পরিচ্ছেদে হযরত আয়শা ছিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

قالت لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل صفحه ١٢٠ ج

অনুরূপ উক্ত হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনি (রাঃ) বলেন–

(قوله ما احدثت النساء) اى ما احدثت من الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها (قلت) لوشا هدت عائشة رضى الله عنها ما احدثت النساء هذا الزمان من انواع البدع والمنكرات كانت اشد انكارا ولاسيما نساء مصر فان فيهن بدعا لاتوصف ومنكرات لا تمنع ـ منها ثيابهن من انواع الحرير المنسوجة الخ ..... ومنها مشيهن فى الاسواق فى ثياب فاخرة وهن متبخرات متعطرات مائلات متزاحمات مع الرجال مكشوفات الوجوه فى غالب الاوقات ...... وغيرذلك من الاوصاف الكثيرة الخارجة عن قواعد الشريعة ـ فانظر الى ما قالت الصديقة رضى الله تعالى عنها من قولها ـ لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء ـ وليس بين هذا القول وبين وفاة النبى ﷺ الامدة يسيرة على ان نساء ذلك الزمان ما احدثن جزأ من الف جزء مما احدثت نساء هذ الزمان ـ

মুসলিম শরীফে ও হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأ ما احدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل ـ صفحه ١٨٣ ج

উপরে উদ্ধৃত হাদীস শরীফ সমূহে হযরত ওমর ফারুকে আযম (রাঃ) এর শাসনামলে এসে ফিৎনা তথা যৌন কেলেংকারী ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশংকাকে কারণ (ইল্লাত) হিসাবে সাব্যস্থ করতঃ মহিলাদেরকে জমাতে নামায আদায়ের জন্য মাসজিদে গমণ করতে বাঁধা প্রদান প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে এবং উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়শা ছিদ্দীকা (রাঃ) কোরআন হাদীস ভিত্তিক ঐ বাঁধা প্রদানের ইজ্‌তেহাদী সিদ্ধান্ত খানা সঠিক হয়েছে মর্মে তাগিদ সহকারে সমর্থন দান করেছেন,

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের অনুমতি প্রদান সম্বলিত হাদীছ ও হযরত ওমর ফরুকে আযম (রাঃ) এর বাঁধা প্রদান সম্বলিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের পরবর্তী মাযহাব চতুষ্টয়ের আইম্মায়ে মুজতাহেদীন গণের মধ্যে উক্ত মাছআলাটি নিয়ে কিছুটা এখতেলাফ মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

যেমন اَلْفِقْهُ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

١۔ اَلْحَنَفِيَّةُ قَالُوْا ۔ اَلْاَفْضَلُ اَنْ تُصَلِّىَ الْمَرْاَةُ فِىْ بَيْتِهَا ظُهْرًا سَوَاءً كَانَتْ عَجُوْزًا اَوْشَابَّةً لِاَنَّ الْجَمَاعَةَ لَمْ تَشْرَعْ فِىْ حَقِّهَا ۔

অর্থাৎ হানফী মাযহাব অনুসারে উত্তম হচ্ছে মেয়ে লোকদের জন্য জোহর এর নামায ঘরেই আদায় করা বয়সকা হউক বা যুবতী মেয়ে হউক- উভয়ের জন্যই একই হুকুম কারণ মহিলাদের জন্য জামাআতকে মাশরূ শরীয়ত সম্মত করা হয়নি।

٢۔ اَلْمَالِكِيَّةُ قَالُوْا ۔ اِنْ كَانَتِ الْمَرْاَةُ عَجُوْزًا اِنْقَطَعَ مِنْهَا ارب الرِّجَال جَازَ لَهَا اَنْ تَحْضُرَ الْجُمْعَةَ وَالْاَكْرَهُ لَهَا ذٰلِكَ ۔ فَاِنْ كَانَتْ شَابَّةً وَخِيْفَ مِنْ حُضُوْرِهَا الْاِفْتِنَانُ بِهَا فِىْ طَرِيْقِهَا اَوْ فِىْ الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْحُضُوْرُ دَفْعًا لِلْفَسَادِ ۔

অর্থাৎ মালেকী মাযহাব অনুসারে যে বৃদ্ধা মহিলা এ পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার যৌন স্পৃহা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে পুরুষের প্রয়োজনীয়তা অনুভূতি তার মাঝে না থাকে একমাত্র এজাতীয় বৃদ্ধা মহিলাই জুমা-জামাতে যেতে পারবে। অন্যথায় নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মাসজিদে গমণ করা তাদের জন্য মাকরূহ।

আর মহিলা যদি যুবতী পর্যায়ের হয় এবং তাকে নিয়ে মাসজিদে যাওয়ার পথে কিংবা মাসজিদেই যৌন কেলেংকারী সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে এ পর্যায়ের মহিলাদের জন্য মাসজিদে গমন করা হারাম, ফিৎনা ফাসাদ প্রতিহত করার লক্ষ্যেই এ হুকুম।

٣۔ اَلشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا ۔ يُكْرَهُ لِلْمَرْاَةِ حُضُوْرًا لِجَمَاعَةٍ مُطْلَقًا فِىْ

الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا اِنْ كَانَتْ مُشْتَهَاةً وَلَوْ كَانَتْ فِىْ ثِيَابِ رِثَّةٍ ۔ وَمِثْلُهَا غَيْرُ الْمُشْتَهَاةِ اِنْ تَزَيَّنَتْ اَوْ تَطَيَّبَ ۔ فَاِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا وَخَرَجَتْ فِىْ اَثْوَابٍ رِثَّةٍ وَلَمْ تَضَعْ عَلَيْهَا رَائِحَةً عَطْرِيَّةً وَلَمْ يَكُنْ لِلرِّجَالِ فِيْهَا غَرْضٌ ۔ فَاِنَّهُ يَصِحُّ لَهَا اَنْ تَحْضُرَ الْجُمْعَةَ بِدُوْنِ كَرَاهَةٍ ۔ عَلٰى اَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ مَشْرُوْطٌ شَرْطَيْنِ ۔

١۔ اَلْاَوَّلُ اَنْ يَأْذَنَ لَهَا وَلِيُّهَا بِالْحُضُوْرِ ۔ سَوَاءٌ كَانَتْ شَابَّةً اَوْعَجُوْزًا فَاِنْ لَمْ يَأْذَنْ حَرُمَ عَلَيْهَا ۔

٢۔ اَلثَّانِىْ اَنْ لَا يَخْشٰى مِنْ ذِهَابِهَا لِلْجَمَاعَةِ اِفْتِتَانُ اَحَدٍ بِهَا ۔ وَاِلَّا حَرُمَ عَلَيْهَا الذِّهَابُ ۔

অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে مُشْتَهَاةٌ তথা যৌনাকর্ষনীয়া যৌন অনুভূতি সম্পন্ন ও সহবাস উপযোগী দর্শনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ জুমা-জামাতে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে মাসজিদে গমন করা মাকরূহ, অনুরূপভাবে যৌনাকর্ষনীয়া তথা যৌন চাহিদা-অনুভূতিহীনা মহিলাদের জন্যেও রং বেরং এর পোষাক অলংকারাদী পরিধান করতঃ এবং আতর সুগন্ধী লাগিয়ে মাসজিদে যাওয়া মাকরূহ, আর বৃদ্ধা মহিলারা যখন পুরুষদের নিকট যৌনাকর্ষনীয়া নয়রূপে এবং যৌন প্রয়োজন বহির্ভূত রূপে বিবেচিত হয় এ পর্যায়ের মহিলার জন্য সুগন্ধী বিহীন অবস্থায় দর্শনীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেও জুমা-জমাত আদায়ের জন্য মাসজিদে গমন করা মাকরূহ নয়। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেক মহিলাকে দু'টিশর্ত পালন করে যেতে হবে।

প্রথমতঃ যুবতী হউক, কিংবা বৃদ্ধা হউক প্রত্যেক প্রকারের মহিলাকে তার বৈধ অভিভাবকের অনুমতি নিয়েই জুমা-জামাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যেতে হবে। অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে মহিলাদের মাসজিদে জামাত আদায়ের জন্য যাওয়া হারাম।

দ্বিতীয়তঃ মাসজিদে আসা-যাওয়ার পথ যৌন-ফিৎনা মুক্ত হতে হবে। যৌন ফিৎনা তথা কেলেংকারী মুক্ত না হলে মহিলাদের জন্য নামাযের জমাত আদায় উদ্দেশ্যে মাসজিদে গমন করা হারাম।

٤ ۔ اَلْحَنَابِلَةُ قَالُوْا ۔ يُبَاحُ لِمَرْأَةٍ اَنْ تَحْضُرَ صَلٰوةَ الْجُمْعَةِ بِشَرْطٍ اَنْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

تَكُوْنَ غَيْرَ حَسَنَاءَ. اَمَّا اِنْ كَانَتْ حَسَنَاءَ فَاِنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا الْحُضُوْرُ مُطْلَقًا - (الفقه على المذاهب الاربعه صفحه٣٨٤ جـ١

অর্থাৎ হাম্বলী মাযহাব অনুসারে অসুন্দর মেয়ে লোকদের জন্য জুমা-জমাতে হাজির হওয়া মুবাহ, আর সুন্দরী মহিলাদের জন্য জুমা- জমাতে শরিক হওয়া মাকরূহ।

উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, আল্লাহর পবিত্র ঘর মাসজিদে গিয়ে মুসলিম মহিলাগণের নামাযের জমাতে ও জুমা-ঈদে শরিক হওয়ার ব্যাপারে কোরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামের মাজহাব চতুষ্ঠয়ের পক্ষ থেকে অবশ্যই কিছু না কিছু শরায়েত আরোপ করা হয়েছে।

নামায আদায় উদ্দেশ্যে মহিলাদের অবাধে বিনা শর্তে মাসজিদে গমনের ব্যাপারে ইসলামের মাযহাব চতুষ্ঠয়ের কোনটির পক্ষ থেকেই অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এখন এ বিষয়ে আমাদের হানাফী মাযহাবের আইম্মায়ে কেরামগণের গবেষণালব্ধ ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সমূহ কিছুটা সবিস্তারে নিম্নে পেশ করা হচ্ছে ঃ

(ক) নামাযের জমাতে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে যুবতী মহিলাগণের মাসজিদে গমন করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। এ বিষয়ের উপর আমাদের হানাফী মাযহাবের আইম্মায়ে মুতাকাদ্দেমীন (পূর্ববর্তী ইমাম) ও আইম্মায়ে মুতাখ্খেরীন (পরবর্তী ইমাম)গণ ঐক্যমত পোষণ করেন।

আমাদের মায্হাবের প্রবর্তক হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) বয়সকা-বৃদ্ধা মহিলাদেরকে ফজর, মাগরিব ও এশা- এ তিন ওয়াক্ত নামাযের জমাতে শরিক হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর জোহর আছরে শরিক হওয়ার অনুমতি দেননি।

অপর পক্ষে-

আমাদের হানাফী মাযহাবের অপর ইমামদ্বয় হযরত ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে বয়সকা- মহিলাগণের জন্য প্রতি ওয়াক্তের জমাতে শরীক হওয়ার অনুমতি রয়েছে।

(খ) আমাদের হানাফী মাযহাবের আইম্মায়ে মুতাখ্খেরীন (পরবর্তী ইমাম) গণের মতে- যুবতী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রকারের মহিলাদের জন্য যে কোন প্রকারের নামাযের জমাতে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে মাসজিদে গমন করা মাকরূহ।

উক্ত মন্তব্যের সমর্থনে নির্ভরযোগ্য ফেকাহ্ ফতোওয়া গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি সমূহ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে। যেমন ঃ

✪ হানফী মাযহাবের সুপ্রশিদ্ধ ফেকাহ গ্রন্থ হেদায়াতে বলা হয়েছে-

(وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُوْرُ الْجَمَاعَاتِ) يَعْنِىْ الشَّوَابَّ مِنْهُنَّ لِمَا فِيْهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (وَلَا بَأْسَ لِلْعَجُوْزِ اَنْ تَخْرُجَ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رحمه الله تعالى عليه (وَقَالَا يَخْرُجْنَ فِىْ الصَّلٰوةِ كُلِّهَا) لِاَنَّهُ لَا فِتْنَةَ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ اِلَيْهَا فَلَا يُكْرَهُ كَمَا فِىْ الْعِيْدِ وَلَهُ اِنَّ فَرْطَ الشَّبْقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ غَيْرَ اَنَّ الْفُسَّاقَ اِنْتِشَارُهُمْ فِىْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ - اَمَّا فِىْ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ فَهُمْ نَائِمُوْنَ وَفِى الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُوْلُوْنَ - وَالْجَبَّانَةُ مُتَّسِعَةٌ فَيُمْكِنُهَا الْاِعْتِزَالُ عَنِ الرِّجَالِ فَلَا يُكْرَهُ -

✪ হেদায়ার শরাহ " এনায়া" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ-

(وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُوْرُ الْجَمَاعَاتِ) كَانَتِ النِّسَاءُ يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوْجَ اِلَى الصَّلَوَاتِ ثُمَّ لَمَّا صَارَسَبَبًا لِلْوُقُوْعِ فِىْ الْفِتْنَةِ مُنِعْنَ عَنْ ذٰلِكَ ..... وَلَقَدْ نَهٰى عُمَرُ النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَشَكَوْنَ اِلٰى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَقَالَتْ - لَوْ عَلِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَا عَلِمَ عُمَرُ رضى الله عنه مَا اَذِنَ لَكُنَّ فِىْ الْخُرُوْجِ - فَاحْتَجَّ بِهِ عُلَمَاؤُنَا وَمَنَعُوْا الشَّوَابَّ عَنِ الْخُرُوْجِ مُطْلَقًا وَاَمَّا الْعَجَائِزُ ...... فَمَنَعَهُنَّ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رضى الله عنه عَنِ الْخُرُوْجِ فِىْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ دُوْنَ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاَجَازَا فِىْ الصَّلٰوةِ كُلِّهَا لِاِنْتِفَاءِ الْفِتْنَةِ بِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِىْ الْعَجَائِزِ ...... وَالْفَتْوٰى الْيَوْمَ عَلٰى كَرَاهَةِ حُضُوْرِهِنَّ فِىْ الصَّلٰوةِ كُلِّهَا لِظُهُوْرِ الْفَسَادِ (عناية شرح هداية صفحه٦٦. ٣٦٥ جـ١

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ হেদায়ার শরাহ "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ-

بَلْ عَمَّمَ الْمُتَاخِّرُوْنَ الْمَنْعَ لِلْعَجَائِزِ وَالشَّوَابِّ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ فِىْ سَائِرِ الْاَوْقَاتِ ـ فتح القدير صفحہ ٣١٦ ج ١

✪ নির্ভরযোগ্য ফতোয়া গ্রন্থ بحرالرائق এ বলা হয়েছে ঃ-

(وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ) لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتُهَا فِىْ قَعْرِ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ صَحْنِ دَارِهَا وَصَلَاتُهَا فِىْ صَحْنِ دَارِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ مَسْجِدِهَا وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ وَلِاَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ الْفِتْنَةَ مِنْ خُرُوْجِهِنَّ اَطْلَقَهُ فَشَمَلَ الشَّابَّةَ وَالْعَجُوْزَ وَالصَّلٰوةَ النَّهَارِيَّةَ وَاللَّيْلِيَّةَ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِى الْكَافِىْ وَالْفَتْوٰى الْيَوْمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا لِظُهُوْرِ الْفَسَادِ وَمَتٰى كُرِهَ حُضُوْرُ الْمَسْجِدِ لِلصَّلٰوةِ فَلِاَنْ يُكْرَهَ حُضُوْرُ مَجَالِسِ الْوَعْظِ خُصُوْصًا عِنْدَ هٰؤُلَاءِ الْجُهَّالِ الَّذِيْنَ تَحَلَّوْا بِحِلْيَةِ الْعُلَمَاءِ اَوْلٰى ذَكَرَهُ فَخْرُ الْاِسْلَامِ صفحہ ٣٥٩ ج ١

✪ مَجْمَعُ الْاَنْهُرِ فِىْ شَرْحِ مُلْتَقَى الْاَبْحُرِ নামক প্রসিদ্ধ ফেকাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে-

(وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ) فِىْ كُلِّ الصَّلٰوةِ نَهَارِيَّةً اَوْ لَيْلِيَّةً لِقَوْلِهِ عليه الصلوة والسلام صَلَاتُهَا فِىْ قَعْرِ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ صَحْنِ دَارِهَا وَصَلَاتُهَا فِىْ صَحْنِ دَارِهَا اَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدِهَا بُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ وَلِاَنَّهُ لَا تُؤْمَنُ الْفِتْنَةُ مِنْ خُرُوْجِهِنَّ (اِلَّا لِلْعَجُوْزِ فِى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ) وَكَذَا الْعِيْدَيْنِ لِنَوْمِ الْفُسَّاقِ فِى الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَاشْتِغَالِهِمْ بِالْاَكْلِ فِى الْمَغْرِبِ وَاتِّسَاعِ الْجَبَّانَةِ فِى الْعِيْدَيْنِ

فَيُمْكِنُهَا اَلْاِعْتِزَالُ عَنِ الرِّجَالِ هٰذَا عِنْدَ الْاِمَامِ وَقِيْلَ الْمَغْرِبُ كَالظُّهْرِ وَالْجُمُعَةُ كَالْعِيْدَيْنِ (وَجَوَّزَا) اَىْ اَبُوْ يُوْسُفَ رح مُحَمَّدٌ رح (حُضُوْرَهَا) اَىْ الْعَجُوْزِ فِى الْكُلِّ لِاِنْعِدَامِ الْفِتْنَةِ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِيْهِنَّ لٰكِنَّ هٰذَا الْخِلَافُ فِىْ زَمَانِهِمْ وَاَمَّا فِىْ زَمَانِنَا فَيُمْنَعْنَ عَنْ حُضُوْرِ الْجَمَاعَاتِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَقَيَّدَ بِالْعَجُوْزِ لِاَنَّ الشَّابَّةَ لَيْسَ لَهَا الْحُضُوْرُ اِتِّفَاقًا ـ وَالشَّابَّةُ مِنْ خَمْسَ عَشَرَةَ اِلٰى تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَالْعَجُوْزُ مِنْ خَمْسِيْنَ اِلٰى اٰخِرِ الْعُمْرِ (فصل الجماعات صفحہ ٥٥)

✪ طَحْطَاوِىْ عَلَى الْمَرَاقِى الْفَلَاحِ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(قَوْلُهُ وَلَا يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِىْ مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ بَيْتِهَا اه ـ فَالْاَفْضَلُ لَهَا كَانَ اسْتِرْلَهَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا كَالتَّرَاوِيْحِ (قَوْلُهُ وَالْمُخَالَفَةُ) اَىْ مُخَالَفَةُ الْاَمْرِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَهُنَّ بِالْقَرَارِ فِى الْبُيُوْتِ فَقَالَ تَعَالٰى وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم ـ بُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ لَوْكُنَّ يَعْلَمْنَ ـ صفحہ ٢٠٥

✪ بدائع الصنائع গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُبَاحُ لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ الْخُرُوْجُ اِلَى الْجَمَاعَاتِ بِدَلِيْلِ مَارُوِىَ عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه اَنَّهُ نَهَى الشَّوَابَّ مِنْهُنَّ الْخُرُوْجَ وَلِاَنَّ خُرُوْجَهُنَّ اِلَى الْجَمَاعَاتِ سَبَبُ الْفِتْنَةِ وَالْفِتْنَةُ حَرَامٌ وَمَا اَدّٰى اِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ ـ صفحہ ١٥٧

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ দুররে মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَيُكْرَهُ حُضُوْرُ هُنَّ الْجَمَاعَاتِ وَلَوْ لِجُمْعَةٍ وَعِيْدٍ وَوَعْظٍ مُطْلَقًا وَلَوْ عَجُوْزًا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ .

মহিলা ইমাম হয়ে শুধুমাত্র মহিলাদের কে নিয়ে জমাত সহকারে নামায আদায় প্রসঙ্গ

মহিলাদের থেকে কেউ ইমাম হয়ে পুরুষ ব্যতীত তারা নিজেরা নিজেরা জমাতের সাথে নামায আদায় করতে পারে কিনা, এটা ও একটু অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

✪ হেদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ وَحْدِ هُنَّ الْجَمَاعَةُ) لاَنَّهَا لاَ تَخْلُوْ عَنْ اِرْتِكَابِ مُحَرَّمٍ وَهُوَ قِيَامُ الْاِمَامِ وَسْطَ الصَّفِّ فَيُكْرَهُ كَالْعُرَاةِ صفحہ٣٥٢ .

অর্থাৎ মহিলা ইমাম হয়ে মহিলাদের কে নিয়ে পৃথকভাবে জমাতের সাথে নামায আদায় করাটা মাকরূহ। কারণ এরূপে মহিলাদের জমাতের সহিত নামায আদায় করতে গেলে একটি مُحَرَّمٌ (মাহ্‌রম) তথা নিষিদ্ধ কাজ করে যেতে হয়। আর ঐ নিষিদ্ধ কাজটি হচ্ছে (ইমাম মুক্তাদীগণের প্রথম কাতার থেকে সামনে অগ্রবর্তী হয়ে না দাড়িয়ে) ইমামের প্রথম কাতারের মাঝখানে দাড়ানো।

এদের এ মাছআলাখানা উলঙ্গ লোকদের জমাতে নামায আদায়ের মাছআলার মতই।

✪ হেদায়া গ্রন্থের ব্যাখ্যায় "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(قَوْلُهُ لِاَنَّهَا لاَ تَخْلُوْ الخ) صَرِيْحٌ فِىْ اَنَّ تَرْكَ التَّقَدُّمِ لِاِمَامِ الرِّجَالِ مُحَرَّمٌ كَذَا صَرَّحَ الشَّارِحُ وَسَمَّاهُ فِى الْكَافِىْ مَكْرُوْهًا وَهُوَ الْحَقُّ . اَىْ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ لِاَنَّ مُقْتَضَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّقَدُّمِ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم بِلاَ تَرْكِ الْوُجُوْبِ فَلِعَدَمِهِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيْمِ فَاِسْمُ الْمُحَرَّمِ مَجَازٌ .... وَاسْتَلْزَمَ مَاذُكِرَ اَنَّ جَمَاعَةَ النِّسَاءِ تُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ .

صفحہ٣٥٢ جـ١ .

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট বিধান যে, পুরুষ ইমামের প্রথম কাতারের সামনে অগ্রবর্তী হয়ে

দাড়ানটাকে তরক করা অর্থাৎ না দাড়ানটা হারাম।

এরূপ অগ্রবর্তী হয়ে না দাড়ানকে "কাফী" নামাক গ্রন্থে (হারাম না বলে) মাকরূহ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এরূপ না দাড়ানটাকে হারাম না বলে মাকরূহ বলাটাই সঠিক। অর্থাৎ জমাতের নামাযে ইমামের অগ্রবর্তী হয়ে না দাড়ানটা মাকরূহে তাহরীমী।

কেননা আল্লাহর মহান রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র জিন্দেগীতে জমাতের ইমামতী করার বেলায় সর্বদা এরূপ অগ্রবর্তী হয়ে দাড়িয়েছেন।

অনুরূপভাবে সামনে অগ্রবর্তী হয়ে দাড়ানোর উপর প্রিয় নবী (দঃ) এর مواظبة এর কারণে কাজটি ইসলামী শরীয়াতে ওয়াজিব রূপে পালনীয় একটি বিধান। (অথচ মহিলা ইমাম হলে এ ওয়াজিব কাজটি তরক করে তাকে সামনের কাতারের মাঝখানে দাড়াতে হয়) আর শরীয়াতের اصول (সূত্র) মতে ওয়াজিব তরক করা মাকরূহে তাহ্‌রীমী। তবে হেদায়া গ্রন্থে- একাজটিকে مجازا (রূপকার্থে) محرم (হারাম) বলা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত সূত্রমতে মেয়ে লোককে ইমাম বানিয়ে পৃথকভাবে মেয়ে লোকদের জমাতে নামায আদায় করাটা মাকরূহে তাহরীমী রূপে প্রমাণিত হয়।

✪ হেদায়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি খানার ব্যাখ্যায় "এনায়া গ্রন্থে" বলা হয়েছে ঃ

(وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ اَنْ يُصَلِّيْنَ جَمَاعَةً لِاَنَّهُنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاَ يَخْلُوْنَ عَنْ اِرْتِكَابِ مُحَرَّمٍ) اَىْ مَكْرُوْهٍ لِاَنَّ اِمَامَ مُتَهُنَّ اِمَّا اَنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْقَوْمِ اَوْ تَقِفُ وَسْطَهُنَّ وَفِى الْاَوَّلِ زِيَادَةُ الْكَشْفِ وَهِىَ مَكْرُوْهَةٌ وَفِى الثَّانِىْ تَرْكُ الْاِمَامِ مَقَامَهُ وَهُوَ مَكْرُوْهٌ وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ وَتَرْكُ مَاهُوَ سُنَّةٌ اَوْلٰى مِنْ اِرْتِكَابِ مَكْرُوْهٍ وَصَارَ حَالُهُنَّ كَحَالِ الْعُرَاةِ فِىْ اَنَّهُمْ اِذَا اَرَادُوْا الصَّلٰوةَ بِجَمَاعَةٍ وَقَفَ الْاِمَامُ وَسْطَهُمْ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهُ عَلٰى عَوْرَتِهِ فَاِنَّهُ مَكْرُوْهٌ وَيُتْرَكُ السُّنَّةُ لِاَجْلِهِ / .... وَفِىْ اَنَّ الْاَ فْضَلَ لِكُلِّ مِّنَ النِّسَاءِ وَالْعُرَاةِ اَنْ يُصَلِّىَ وَحْدَهُ خَلاَ اَنَّ الْعُرَاةَ يُصَلِّىْ كُلٌّ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا اقَا عِدا بِاِيْمَاءٍ دُوْنَ النِّسَاءِ . صفحہ٣٥٣ جـ١

অর্থাৎ মহিলাদের পৃথকভাবে জমাতের সাথে নামায আদায় করা মাকরূহ। কেননা এতে ওদের একটি হারাম তথা মাকরূহ কাজ করে যেতে হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণ মেয়ে লোক ইমাম হলে হয়তঃ (ঐ মহিলা ইমাম) পুরুষ ইমামের ন্যায় প্রথম কাতারের সামনে অগ্রবর্তী হয়ে দাড়াবে অথবা অগ্রবর্তী হয়ে না দাড়িয়ে প্রথম কাতারের মাঝখানে দাড়াবে।

অগ্রবর্তী হয়ে দাড়ানোর ফলে (মেয়ে লোক বিধায়) মহিলা ইমামের ছতর আবৃতাঙ্গ বেশী বেশী লোক সম্মুখে প্রকাশ পেয়ে বসার আশংকা রয়েছে, যা মাকরূহই বটে। আর অগ্রবর্তী হয়ে না দাড়িয়ে সামনের কাতারের মাঝখানে দাড়ানোর দ্বারা শরীয়াতের নিয়ম মাফিক ইমামের যে স্থানে দাড়ানোটা شارع علیه الصلوة والسلام তথা শরীয়াত প্রবর্তনকারী আল্লাহর মহান রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের فعل مواظبة দ্বারা ওয়াজিব রূপে সার্বস্থ্য তা তরক করা প্রমাণিত হয়।

আর ওয়াজিব তরক করা শরীয়াতে মাকরূহ তাহ্রীমী রূপে গণ্য, অপর দিকে জমাতে নামায আদায় করা ছুন্নাত। মাকরূহে তাহ্রীমীতে লিপ্ত হয়ে ছুন্নাত আদায় করার চেয়ে না করাটাই উত্তম।

মহিলা ইমাম হয়ে জমাতে নামায আদায় করার এ মাছআলা খানা উলঙ্গ-বস্ত্রহীন পুরুষ লোকদের একত্রিত হয়ে বস্ত্রহীন কোন একজন লোককে ইমাম বানিয়ে জামাতে নামায আদায় করার মাছআলার মতই ব্যাপার।

অর্থাৎ বস্ত্রহীন উলঙ্গ একদল পুরুষ লোক যদি তাদের একজন (উলঙ্গ) লোককে ইমাম বানিয়ে জমাতের সাথে নামায আদায় করতে চায়, সে ক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধান হচ্ছে, ঐ লোকদের ঐ উলঙ্গ ইমাম প্রথম কাতারের সামনে অগ্রবর্তী হয়ে না দাড়িয়ে তাকে প্রথম কাতারের মাঝখানেই থাকতে হবে। যাতে ইমামের পিছনের মুক্তাদীগণের নজর দৃষ্টি উলঙ্গ ইমামের লজ্জাস্থানের প্রতি না পড়ে বসে।

কারণ কারো ছতরের (লজ্জা স্থানের) প্রতিনজর দেওয়া মাকরূহ তথা হারাম। একটি ছুন্নাত কাজ তথা জমাতে নামায আদায় করতে যেয়ে এরূপ হারাম (মাকরূহ) কাজ করতে হয় বিধায় এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক্ষেত্রে ছুন্নাত তরফ করা তথা জমাতের সাথে নামায আদায় না করাটাই ওদের জন্য উচিৎ।

মহিলা এবং উলঙ্গ এ উভয় দলের জন্য সর্বোত্তম বিধান হচ্ছে, একা একাই এদের নামায আদায় করে যাওয়া..........। তবে এক্ষেত্রে উলঙ্গ পুরুষ লোক ও স্ত্রী লোকদের নামায আদায়ের নিয়মে কিছু পার্থক্য রয়েছে। উলঙ্গ ব্যক্তি সাধারণ নিয়মের বিপরীত বসা অবস্থায় ইশারায় রুকু ছজদা দিয়েই নামায আদায় করে যাবে। আর মহিলা যথা নিয়মে রুকু ছজদা দিয়েই নামায আদায় করে যাবে।

✪ অনুরূপ বাহ্রুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে–

(قَوْلُهُ وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ) أَيْ وَكُرِهَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو

عَنْ اِرْتِكَابِ مُحَرَّمٍ وَهُوَ قِيَامُ الْاِمَامِ وَسْطَ الصَّفِّ وَتُكْرَهُ كَا لْعَرَاةِ كَذَا فِيْ الْهِدَايَةِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيْمٍ لِاَنَّ التَّقَدُّمَ وَاجِبٌ عَلٰى الْاِمَامِ لِلْمُوَاظَبَةِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَرْكُ الْوَاجِبِ مُوْجِبٌ لِكَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْاِثْمِ -

✪ "মারাকিউল ফলাহ"র ব্যাখ্যা গ্রন্থ "তাহ্তাবী"তে বলা হয়েছে ঃ

(وَ) كُرِهَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ) تَحْرِيْمًا لِلُزُوْمِ اَحَدِ الْمَحْظُوْرَيْنِ قِيَامُ الْاِمَامِ فِيْ الصَّفِّ الْاَوَّلِ وَهُوَ مَكْرُوْهٌ اَوْ تَقَدُّمُ الْاِمَامِ وَهُوَ اَيْضًا مَكْرُوْهٌ فِيْ حَقِّهِنَّ -

✪ দুররে মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَيُكْرَهُ تَحْرِيْمًا جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَلَوْ فِيْ التَّرَاوِيْحِ

✪ بداية المجتهد গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

اَلْمَسْئَلَةُ الرَّابِعَةُ - اِخْتَلَفُوْا فِيْ اِمَامَةِ الْمَرْأَةِ - فَالْجُمْهُوْرُ عَلٰى اَنَّهٗ لَايَجُوْزُ اَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ وَاخْتَلَفُوْا فِيْ اِمَامَتِهَا النِّسَاءَ فَاَجَازَ الشَّافِعِيُّ رح وَمَنَعَ ذٰلِكَ مَالِكٌ رح .... وَاِنَّمَا اتَّفَقَ الْجُمْهُوْرُ عَلٰى مَنْعِهَا اَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ لِاَنَّهٗ لَوْ كَانَ جَائِزٌ لَنُقِلَ ذٰلِكَ عَنِ الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَلِاَنَّهٗ اَيْضًا كَمَا كَانَتْ سُنَّتُهُنَّ فِيْ الصَّلٰوةِ اَلنَّاسَ خَيْرٌ مِنَ الرِّجَالِ الْعِلْمِ اَنَّهٗ لَيْسَ يَجُوْزُ لِمَنْ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهٖ عليه الصلوة والسلام اَخِّرُوْهُنَّ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ -

✪ اَلْفِقْهُ عَلٰى الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ شُرُوْطِ الْاِمَامَةِ اَلذُّكُوْرَةُ فَلَا تَصِحُّ اِمَامَةُ النِّسَاءِ وَاَمَّا مَةُ الْخُنْثٰى الْمُشْكِلِ اِذَا كَانَ الْمُقْتَدٰى بِهٖ نِسَاءً فَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُوْرَةُ فِيْ اِمَامَتِهِنَّ بَلْ يَصِحُّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ اِمَامًا لِاِمْرَاَةٍ مِثْلِهَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَوِ الْخُنْثٰى بِاتِّفَاقِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ ـ وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ ـ فَانْظُرْ مَذْهَبَهُمْ تَحْتَ الْخَطِّ (٣)

(٣) اَلْمَالِكِيَّةُ قَالُوْا لَايَصِحُّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثٰى الْمُشْكِلُ اِمَامًا لِرِجَالٍ اَوْنِسَاءٍ لَافِىْ فَرْضٍ وَلَا فِىْ نَفْلٍ فَالذُّكُوْرَةُ شَرْطٌ فِى الْاِمَامِ مُطْلَقًا ـ صفحه٤٠٩ ج ١.

✪ "ফতোওয়ায়ে আলমগীরির" মধ্যে বলা হয়েছে ঃ

وَيُكْرَهُ اِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فِىْ كُلِّهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ اِلَّا فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ هٰكَذَا فِى النِّهَايَةِ ـ فَاِنْ فَعَلْنَ وَقَفَ الْاِمَامُ وَسْطَهُنَّ وَبِقِيَامِهَا وَسْطَهُنَّ لَا تَزُوْلُ الْكَرَاهَةُ وَاِنْ تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِنَّ اِمَامُهُنَّ لَاتَفْسُدُ صَلَاتُهُنَّ هٰكَذَا فِىْ جَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وَصَلَاتُهُنَّ فُرَادٰى اَفْضَلُ هٰكَذَا فِى الْخُلَاصَةِ صفحه٨٥ جـ١.

উপরের উদ্ধৃতি সমূহ মহিলাদের পৃথকভাবে জমাত কায়েম করা মাক্‌রূহ হওয়াটাকেই প্রমাণিত করে।

অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন তাই করা হল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাযা নামায আদায়ের মাছায়েল

কোন ফরয কিংবা ওয়াজিব এবাদত সমূহকে তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আদায় করে দেওয়া হলে একে শরীয়াতের পরিভাষায় اداء (আদা) বলা হয়। আর এ প্রকারের এবাদতের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরই যদি এসবকে আদায়করা হয় তাহলে একে শরীয়াতের পরিভাষায় قضاء (কাযা) বলা হয়।

✪ যেমন আছরের নির্ধারিত সময়ের ভিতর আছরের নামায আদায় করে দিলে একে "আদা" বলা হবে আর আছরের সময় চলে যাবার পরই আছরের নামায পড়া হলে তাকে 'কাযা' বলা হবে।

✪ নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করার অর্থ হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের ভিতর অন্ততঃ পক্ষে আল্লাহু আকবর এ তাকবীর তাহ্‌রীমা বলে নামায শুরু করে নেওয়া, নির্ধারিত সময়ের ভিতর তাকবীর বলে নিয়্যত বেধে নেওয়ার পরই ঐ নিয়্যতকৃত নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গিয়ে অন্য নামাযের ওয়াক্ত চলে আসলেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে একে "আদাই বলা হবে, কাযা বলা হবে না।

কিন্তু তিনটি নামায এর ব্যতিক্রম। তা হচ্ছে—

(১) ফজরের নামায, (২) জুম্‌আর নামায ও (৩) দু'ঈদের নামায।

এ তিনটি নামাযের—নিয়্যত করতঃ তাকবীর তাহ্‌রীমা বলা হতে আরম্ভ করে নামাযের ছালাম ফিরান পর্যন্ত নামাযের সব কাজ তার নির্ধারিত ওয়াক্তের ভিতরই সম্পন্ন করে নিতে হবে— এ তিন পর্য্যায়ের নামাযকে ওয়াক্তের মধ্যেই আরম্ভ করার পর আদায় করতে তার নির্ধারিত ওয়াক্ত অতিক্রম করতঃ পরবর্তী ওয়াক্তে গিয়েই যদি শেষ করা হয় তাহলে এসব নামায বাতিল হয়ে যাবে।

যেমন ঃ সূর্য উদয় হওয়ার আগেই ফজরের নামায আরম্ভ করতঃ পুরা নামায শেষ করার আগেই যদি সূর্য উদিত হয়ে পড়ে তাহলে এ নিয়্যতকৃত নামায বাতেল হয়ে যাবে। সূর্য পুরা পুরি উদয় হওয়ার পর পুনঃ নূতন নিয়্যত করতঃ ফজরের ঐ নামাযকে আদায় করে দেওয়া লাগবে। অনুরূপ জুম্‌আর নামায জোহরের ওয়াক্তের ভিতর আরম্ভ করার পর আদায় করতে করতে যদি আছরের ওয়াক্ত চলে আসে— তাহলে জুম্‌আর নামায বাতিল হয়ে যাবে। তৎপরিবর্তে সেদিনের জোহরের কাযাই আদায় করে দেওয়া লাগবে। এমনি ভাবে দ্বি-প্রহরের আগে ঈদের নামায আরম্ভ করার পর আদায় করতে করতে যদি দ্বি-প্রহর হয়ে যায়, তাহলে ঈদের নামায বাতেল হয়ে যাবে। তবে ঈদের নামাযের কাযা আদায় করা লাগবেনা (শামী)।

✪ বিনা ওজরে নির্ধারিত ওয়াক্ত-সময়ে নামায আদায় না করা কবীরাহ্‌ গুনাহ্‌।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ বিশেষ কোন ওজর-কারণ বশতঃ ঘটনাক্রমে ফরয কিংবা ওয়াজিব নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে না পারলে পরক্ষণে খুব সহসা উক্ত নামায অবশ্যই আদায় করে দিতে হয়। (আলমগীরী ইত্যাদি)

কাযা আদায়ের সাথে সাথে এ অপরাধের জন্য খাটি অন্তরে তৌবা করতঃ মহান রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যেতে হয়, কাযা না পড়ে শুধু মৌখিক তৌবায় নামায কাযা করার অপরাধ এবং ঐ কাযা নামায মাফ হয়ে যায় না বরং নামায নিজ জিম্মায় থেকেই যায়। ফরয নামাযের কাযা আদায় করা ফরয, ওয়াজিব নামাযের কাযা আদায় করা ওয়াজিব এবং ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ নামাযের কাযা আদায় করা ছুন্নাত। (দুররে মোখতার)

✪ হারাম ওয়াক্ত ব্যতীত দিবা-রাতের সর্বক্ষণই কাযা নামায আদায়ের সময় (দুররে মোখতার ইত্যাদি)।

✪ বালেগ হওয়ার মূহুর্ত হতে পরবর্তী জীবনে যে লোকের মাত্র এক থেকে উর্দ্ধে পাঁচ ওয়াক্ত নামায "কাযা" হয়েছে– এ পাঁচ ওয়াক্ত ব্যতীত -এর বেশী নামায তার জিম্মায় কাযা হিসাবে নাই– এধরণের লোককে শরীয়াতের পরিভাষায় "ছাহেবে তারতীব" বলা হয়।

✪ এ প্রকারের "ছাহেবে তারতীব মুছাল্লী" কে তারতীব (ধারাবাহিকতা) তথা আগের ওয়াক্তের নামায আগে এবং পরের ওয়াক্তের নামায পরে অর্থাৎ প্রথমে ফজরের ফরয, অতঃপর যোহরের ফরয এরপর যথাক্রমে আছর, মাগরিব ও এশা'র ফরযের ছুটে যাওয়া নামায গুলো আদায় করে দিয়েই-পরে উপস্থিত ওয়াক্তের নামায পড়তে হয়।

মোটকথা কারো জীবনে মাত্র এক হতে পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত নামায ছুটে গেলে প্রথমে এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ধারাবাহিক ভাবে কাযা আদায় করে দিতে হয় নতুবা ঐ লোকের উপস্থিত ওয়াক্তের নামায আদায় করা শুদ্ধ হয় না।

✪ কিন্তু যে লোকের জীবনে একাধিকক্রমে পাঁচ ওয়াক্তের অধিক তথা ছয়-সাত-আট কিংবা ততোধিক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে পড়ে।

তার জন্য "তারতীব" অর্থাৎ ধারাবাহিকতার নিয়ম পালন করা জরুরী নয়, বরং সেলোক ঐ ছুটে যাওয়া নামায সমূহের কাযা আদায় না করেও উপস্থিত ওয়াক্তের নামায আদায় করে নিতে পারবে। পরে সুযোগ-সময় মত উক্ত ছুটে যাওয়া কাযা নামায গুলো আদায় করে নিবে।

সংক্ষেপ কথা হচ্ছে "ছাহেবে তারতীব" ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ লোকদের কাযা নামায আদায়ের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ওয়াক্ত নাই।

উল্লেখ্য যে, তাহাজ্জুদ, এশরাক ও আওয়াবীন ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ছুন্নাত-নফল ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ নফল নামায পড়ার চেয়ে নিজের অতীত জীবনের ফরয, ওয়াজিব নামাযের কাযা আদায় করে দেওয়াই উত্তম। (আলমগীরী)

✪ সাধারণতঃ ছুন্নাত নামাযের কাযা আদায় করা জরুরী নয়। কিন্তু ইতি পূর্বে ও বলা হয়েছে যে, ফজরের নামায কাযা হয়ে পড়লে উহা যদি ঐদিন দ্বিপ্রহরের আগেই আদায় করা হয় তখনিই শুধু ফজরের ফরযের সাথে ছুন্নাত দু'রাকাতের ও কাযা আদায় করা লাগে।

✪ এমনিভাবে কোন লোক ফজরের ফরয নামাযে জম'াত শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি জমা'তে শামিল হয়ে যাওয়ার কারণে যদি ফরযের আগের ছুন্নাত দু'রাকা'ত নামায আদায় করতে না পারে কিংবা কোন মুছাল্লী ফজর ওয়াক্তের এরূপ শেষ মূহুর্তে ফজরের নামায আদায় করার প্রস্তুতি নিলযে, যদি এমূহুর্তে ছুন্নাত দু'রাকা'ত আদায় করতে যায় তাহলে সূর্য উদিত হয়ে পড়বে এ কারণে সে সহসা ফরয দু'রাকা'তই মাত্র আদায় করে নিল– এ উভয় প্রকারের মুছাল্লী যদি ঐ ছুটে যাওয়া ছুন্নাত দু'রাকা'ত আদায় করতে চায় তাহলে আমাদের ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে সেদিন সূর্য উদয়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই আদায় করে নিতে পারবে। অনুরূপ ভাবে কেউ যদি তাড়াতাড়ি যোহরের ফরযের জমা'তে শামিল হয়ে যাওয়ার কারণে ফরযের পূর্বেকার চারিরাকা'ত ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহর নামায ফরযের আগে আদায় করতে না পারে– তাহলে জমা'ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা আদায় করে নিবে। যে সব ওয়াক্তের নামাযে বড় স্বরে ছুরা কেরাত পড়া লাগে (যেমন-মাগরিব, এশা ও ফজর)। কারো এসব ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে পড়লে কাযা আদায়কালে বড় স্বরে ছুরা-কেরাত পাঠ করা উত্তম ওয়াজিব নহে।

✪ কিন্তু যে সব ওয়াক্তের নামাযে ছুরা-কেরাত চুপে চুপে পড়া লাগে (যেমন-যোহর ও আছর)। কারো এ দু'ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে পড়লে কাযা আদায় কালে চুপে চুপে ছুরা-কেরাত পাঠ করা ওয়াজিব।

✪ যে নামায যেভাবে কাযা হয়েছে সে নামাযের কাযা ও সেভাবে আদায় করা লাগে। যেমন– ছফর-ভ্রমণ অবস্থায় নামায কাযা হলে ঐ নামায মুকিম অবস্থায় আদায় করার সময় চার রাকা'তী ফরয নামায কে দু'রাকা'ত (কছর) করেই কাযা আদায় করা লাগে।

✪ এমনিভাবে মুকিম অবস্থার কাযা নামায ছফরের অবস্থায় কাযা আদায় করতে গেলে চার রাকা'ত বরাবরই কাযা দিতে হয়।

✪ ওয়াক্ত-সময় থাকতে নামায পড়া আরম্ভ করার পর যদি নামায আদায়ের মাঝখানে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে ঐ নামায আদায় হয়ে যাবে। কাযার মধ্যে গণ্য হয়ে পড়বে না ফজর, জুমা ও ঈদের নামায ব্যতীত।

✪ মৃত্যু রোগে পতিত হয়ে যদি ইশারায় ও নামায আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে ঐ সময়ের নামায সমূহের কাফ্ফারা দেওয়া লাগবে না, এর পূর্বের কাযা নামায সমূহেরই শুধু কাফ্ফারা দেওয়া লাগবে। (মারাকিউল ফলাহ্)

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে লোকের নামায কাযা রয়ে গিয়েছে এবং জীবনের শেষ সময়ে ও তার কাযা আদায় করতে পারেনি এমতাবস্থায় মৃত্যু মুহূর্ত এসে পৌছলে উক্ত কাযা নামায সমূহের ফিদ্‌ইয়া [কাফ্‌ফারা] দেওয়ার জন্য ওয়ারিশদের ওছিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব। (হেদায়া, শামী)

✪ এরূপ ওছিয়্যত করে থাকলে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দ্বারা তার নামাযের কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়ারিশ গণের জন্য ওয়াজিব।

✪ যদি অছিয়্যত করে যায় কিন্তু মৃতব্যক্তির কোন ধন-সম্পদ না থাকে সেক্ষেত্রে ওয়ারিশগণের নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে যদি কাফ্‌ফারা আদায় করে দেওয়া হয় তাহলে তারা বিশেষ নেকী পাবে।

✪ যারা সব সময় তাহাজ্জুদের নামায আদায়ে অভ্যস্থ তাদের তাহাজ্জুদের নামায তরক হয়ে গেলে দিনের বেলায় তাহাজ্জুদ পরিমাণ নামায আদায় করে নেওয়া তাদের জন্য উত্তম। কেননা রাতে হযরত নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কোন ওজরবশতঃ তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে না পারলে তিনি তা দিনের বেলা আদায় করে দিতেন।

✪ পাগল হয়ে যাওয়ার কারণে যে লোকের নামায কাযা হয়ে পড়ে-পাগলামী দূরিভূত হয়ে সুস্থ হওয়ার পর তাকে তার উক্ত ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় করা লাগেনা। (আলমগীরী)

✪ অনুরূপ কোন লোক বেহুশ-অজ্ঞান হয়ে পড়ল কিংবা এমন মারাত্মক ধরণের কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে বসল যে, ইশারায় ও সে লোক নামায আদায়ের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল, এ অবস্থায় ৬ (ছয়) ওয়াক্ত তথা একদিন একরাতের বেশী সময়ের নামায কাযা হয়ে বসল, অতঃপর ঐ বেহুশ লোকের হুশ জ্ঞান ফিরে আসল অথবা ঐ রুগ্ন ব্যক্তির রোগ আরোগ্য হয়ে পড়ল। সেক্ষেত্রে এ উভয়কে বেহুশীও রুগ্ন অবস্থার ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় করে দেওয়া লাগবেনা। (আলমগীরী)।

✪ ফিদ্‌ইয়া আদায়ের নিয়মঃ- প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য একজনের ফিতরা পরিমাণ গম, আটা বা এর মূল্য গরীব-মিছকীনদেরকে দান করা -অথবা এক এক ওয়াক্ত ফরয নামাযের জন্য একজন মিছকীনকে দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে আহার করাতে হয়।

আমাদের হানাফী মাযহাবের মতানুসারে নামাযের ফিদ্‌ইয়ার হিসাবের মধ্যে বিতিরের নামাযকেও পুরা এক ওয়াক্ত গণ্য করতঃ দৈনিক মোট ছয় ওয়াক্ত নামাযের কাফ্‌ফারার হিসাব করা লাগে (শামী)।

ওমরী কাযা আদায়ের বর্ণনা ঃ

বালেগ হওয়ার মূহূর্ত হতে জীবনের যেদিন থেকে নিয়মিত নামায পড়া শুরু করা হয় এ উভয় সময়ের মাঝখানে যত ওয়াক্তের নামায অনাদায়ী থাকে উহাকে "ওমরী কাযা" বলা হয়।

✪ এ ওমরী কাযা আদায় করার সময় কোন্ দিনের কাযা নামায তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হলে এভাবে নিয়্যত করে ওমরী কাযা নামায আদায় করে যেতে হয়।

"আমার দায়িত্বে ফজর/ যোহর/আছর/মাগরিব/ ও এশা ওয়াক্তের যত ফরয নামায অনাদায়ী রয়েছে- উহা হতে ফজরের/ যোহরের/ আছরের/ মাগরিবের ও / এশার এক ওয়াক্তের ফরয নামাযের কাযা আদায় করার নিয়্যত করলাম।

এ বলে নিয়্যত করতঃ সর্বদা "ওমরী কাযা নামায আদায় করে যাবে। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে,

✪ মাগরিবের নামাযের ওমরী কাযা আদায় কালে তৃতীয় রাকাতের উভয় ছজদা আদায়ের পর বসে তাশাহহুদ পাঠ করতঃ পুনঃ দাড়িয়ে যেতে হয় এবং এ চতুর্থ রাকাতে ছুরা ফাতেহার সাথে অন্য ছুরা বা আয়াত মিলিয়ে পাঠ করতঃ যথা নিয়মে রুকু ছজদা করে নামায শেষ করতে হয়।

✪ অনুরূপ ভাবে বিতিরের ওমরী কাযা আদায়কালে তৃতীয় রাকাতের কেরাত পাঠ শেষ করে নিয়মমত কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠিয়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর বলে পুনঃ হাত বেধে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করে নিতে হয়, অতঃপর রুকু-ছাজদা আদায় করে বসে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করতঃ পুনঃ চতুর্থ রাকাত নামায আদায়ের জন্য দাড়িয়ে যেতে হয় এবং এ দাড়ানো অবস্থায় ছুরা ফাতেহা ও অন্য কোন একটি ছুরা মিলিয়ে পাঠ করতঃ যথা নিয়মে রুকু-ছিজদা দিয়ে চতুর্থ রাকাত নামায শেষ করতে হয়।

কারণ ওমরী কাযার নামায সমূহকে কাযার নিয়্যতে আদায় করা হলেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে এসব নামায কে নফল রূপেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে- তাই এদু'প্রকারের নামাযে অতিরিক্ত আরো এক রাকাত মিলিয়ে চার রাকাত পূর্ণ করতঃ আদায়ের বিধান দেওয়া হয়েছে।

টীকা ঃ

وَفِى الْعَتَابِيَّةِ عَنْ اَبِىْ نَصْرٍ رحمه الله فِيْمَنْ يَقْضِىْ صَلَوَاتِ عُمْرِهٖ مِنْ غَيْرِ اِنْ فَاتَهُ شَئٌ يُرِيْدُ الْاِحْتِيَاطَ فَاِنْ كَانَ لِاَجْلِ النُّقْصَانِ وَالْكَرَاهَةِ فَحَسَنٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ لِذٰلِكَ لَا يَفْعَلُ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهٗ يَجُوْزُ اِلَّا بَعْدَ صَلَاتَا الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَثِيْرٌ مِنَ السَّلَفِ لِشُبْهَةٍ كَذَا فِى الْمُضْمَرَاتِ ـ وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَاتِ كُلِّهَا اَلْفَاتِحَةَ مَعَ السُّوْرَةِ كَذَا فِىْ الظَّهِيْرِيَّةْ وَفِى الْفَتَاوٰى رَجُلٌ يَقْضِىْ الْفَوَائِتَ فَاِنَّهٗ يَقْضِىْ الْوِتْرَ وَاِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ اَنَّهٗ هَلْ بَقِىَ عَلَيْهِ وِتْرٌ اَوْ لَمْ يَبْقَ فَاِنَّهٗ يُصَلِّىْ ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ وَيَقْنُتُ ثُمَّ يَقْعُدُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَةً اُخْرٰى فَاِنْ كَانَ وِتْرًا فَقَدْ اَدَّاهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ صَلَّى التَّطَوُّعَ اَرْبَعًا وَلَا يَضُرُّ الْقُنُوْتُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ অধ্যায়

জুম্‌আর নামাযের ফাজায়েল ও মাছায়েল

জুম্‌আর দিবসের নামকরণ ও ফাজায়েল ঃ

جُمْعَةٌ (জুম্‌আ) শব্দটি جمع মূল থেকে নির্গত। এর অর্থ একত্রিত করা, يَوْمٌ অর্থ–দিন, يَوْمُ الْجُمْعَةِ অর্থ–একত্রিত করার দিবস। সাপ্তাহান্তে এ জুমআর দিবসে মুসলিমেরা আল্লাহর বিশেষ এবাদত-প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সমবেত হয় বলে একে "ইয়াওমূল জুম্‌তা" বলা হয়।

এ জুম্‌আর দিবসটি মুসলিম মিল্লাতের জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান।

ইহা মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদ তথা আনন্দ-খুশির দিন, এ দিবসকে গরীব মুসলমানদের জন্য হজ্জ সমতুল্য বলা হয়েছে। যেমন তাহ্‌তাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض مَرْفُوْعًا اَلْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِيْنِ وَ فِىْ رِوَايَةٍ حَجُّ الْفُقَرَاءِ (باب الجمعة)

সুতরাং ইহা মুসলিম মিল্লাতের জন্য সাপ্তাহিক মহা মিলনের দিন।

টীকার বাকী অংশ ঃ

فِى التَّطَوُّعِ - (عالمگيريه) وَمَا نُقِلَ اَنَّ الْاِمَامَ قَضٰى صَلَاةَ عُمْرِهٖ فَاِنْ صَحَّ نَقُوْلُ كَانَ يُصَلِّىْ الْمَغْرِبَ وَالْوِتْرَ اَرْبَعًا بِثَلَاثِ قَعْدَاتٍ - (در المختار) وَ ثَانِيًا اَنَّهٗ لَوْ صَحَّ نَقُوْلُ اَنَّهٗ كَانَ يُصَلِّىْ الْمَغْرِبَ وَالْوِتْرَ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بِثَلَاثِ قَعْدَاتٍ كَمَا نَقَلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَنْ مَالِ الْفَتَاوٰى اَىْ وَ يَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ اِعَادَةُ الصَّلٰوةِ لِمُجَرَّدِ تَوَهُّمِ الْفَسَادِ غَيْرَ مَكْرُوْهٍ وَ يَكُوْنُ النَّهْىُ مَحْمُوْلًا عَلٰى غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ لٰكِنْ لَمَّا كَانَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى هٰذَا مُحْتَمَلَةً لِوُقُوْعِهَا نَفْلًا وَالتَّنَفُّلُ بِالثَّلَاثِ مَكْرُوْهٌ نَقُوْلُ اَنَّهٗ كَانَ يَضُمُّ اِلَى الْمَغْرِبِ وَ الْوِتْرِ رَكْعَةً فَعَلٰى اِحْتِمَالِ صِحَّةِ مَا كَانَ صَلَّاهُ اَوَّلًا تَقَعُ هٰذِهِ الصَّلٰوةُ نَفْلًا وَ زِيَادَةُ الْقَعْدَةِ عَلٰى رَاْسِ الثَّالِثَةِ لَا تُبْطِلُهَا وَ عَلٰى اِحْتِمَالِ فَسَادِهٖ تَقَعُ هٰذِهٖ فَرْضًا مُقْتَضِيًا وَزِيَادَةُ رَكْعَةٍ عَلَيْهَا لَا تُبْطِلُهَا

(شامى، جـ٢، صفحـ٣٨٠، باب الوتر والنفل)

প্রতি সাপ্তাহান্তে এলাকার মুছলিমেরা মাছজিদ তথা মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে সমবেত হয়ে সম্মিলিত ভাবে মহিয়ান গরিয়ান প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রতি যেন শ্রেষ্ঠতম পন্থায় চরম তা'জীম ও ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং প্রশংসা ও গুনগান প্রকাশ মূলক এবাদত "নামাজ" আদায় করতে পারে, ঐ মহান জাতে পাকের যেন জিকির ও তাছবীহ পাঠ করতে পারে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে, বিশেষতঃ মুসলিমেরা সাপ্তাহান্তে এক জায়গায় সমবেত হয়ে যেন ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার দাবী পূরণে অর্থাৎ একে অপরের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নিয়ে সহমর্মিতা, সমবেদনা, ও আন্তরিকতা মূলক ভাবের আদান প্রদান করতে পারে-

সর্বোপরি বিশ্ব মুসলিমের শান্তি, সুখ-সমৃদ্ধি, নিরপত্তা তথা সার্বিক মঙ্গল কল্যানের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সম্মিলিত ভাবে প্রার্থনা-ফরিয়াদ করে যেতে পারে এতোদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ পাক ছুবহানাহু ওয়া তা আলা জুমআর এ পবিত্র দিবসটি মুসলিম সমাজ কে দান করেছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো জুমআর সে মহান শিক্ষা থেকে আমরা অনেক দুরে সরে গিয়েছি।

আল্লাহর প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একদা জুমআর খোতবা (ভাষন) দিতে গিয়ে বলেন–

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهٗ طِيْبٌ فَلَا يَضُرُّهٗ اَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ - (ابن ماجه)

অর্থাৎঃ হে মুসলিমেরা শোন! ইহা এমন একটি মহান দিন যাকে আল্লাহ তাআলা (আমাদের জন্য) ঈদ স্বরূপ সাব্যস্থ করে দিয়েছেন সুতরাং তোমরা এ দিবস এর পবিত্রতা রক্ষার্থে গোছল করবে, যদি ব্যবস্থা থাকে তাহলে আতর সুগন্ধী লাগাবে, এবং নিশ্চয় মিছওয়াক করবে।

✪ হাদীছ শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী জুমআর দিন মৃত মোমেনগণের রূহ্ উর্দ্ধজগৎ থেকে দুনিয়াতে এসে নিজ ছেলে-সন্তান, পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদের নিকট ঈছালে ছাওয়াব তথা তাদের জন্য ছাওয়াব-পূণ্য পৌছানের অনুরোধ জানাতে থাকে (শরহুছ্ছুদুর লিছ্ছুয়ূতী রঃ)। তাই এ সব বিবেচনায় দিন সমূহের মধ্যে এ জুম্‌আর দিন টি হচ্ছে একটি অত্যাধিক মর্যাদা পূর্ণ ও গুরুত্ব বহ দিন।

✪ আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ–

اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ - (مشكوة)

অর্থাৎ ঃ মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দৃষ্টিতে দিনসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব মহান দিন হচ্ছে জুমআর দিন। এ দিনের অনেক ঐতিহ্য রয়েছে ঃ-

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ আল্লাহর প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ-

فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ فِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ـ

অর্থাৎ, জুমআর দিবসে মানব জাতির আদি পিতা বাবা আদম (আঃ) পয়দা হন, ঐ দিনেই তাকে বেহেস্তের অধিবাসী করা হয়, আবার ঐদিনেই তাকে বেহেস্ত থেকে দুনিয়াতে পাঠান হয়, সর্বোপরি ঐ দিবসেই কেয়ামত তথা মহা প্রলয় অনুষ্ঠিত হবে (মুসলিম শরীফ)।

✪ হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) থেকে বর্নিত- তিনি বলেন জুমআর রাতের ফাযীলত শবে কদরের চেয়েও বেশি এবং তা এ কারণেই যে, এ জুমআর রাতেই সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর মাহবুব নবী, রাহমাতুল লিল্ আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূর মোবারক মাতৃগর্ভে স্থানান্তরিত হয়। এভাবে এ পবিত্র রাতটি সমগ্র মাখলুকাতের জন্য এত অধিক কল্যাণ বহন করে আনে যে, যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর নাই। (আশইয়্যাতুল লুমআত)।

✪ হযরত আবুদদারদা (রা) থেকে বর্নিত তিনি বলেন আল্লাহর প্রিয় নবী(দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ- জুমআর দিবসে তোমরা আমার প্রতি বেশি করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। কারণ উহা উপস্থিতির দিবস, উহাতে ফেরেস্তারা আল্লাহর অশেষ রহমত সহকারে উপস্থিত হয়ে থাকেন। তোমাদের যে কেউ আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে। নিশ্চয় উহা আমার খেদমতে পেশ করা হয় যতক্ষণ না সে দরূদ পাঠ শেষ করে। বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এয়া রাছূলাল্লাহ (দঃ)! মৃত্যুর পরেও কি পেশ করা হবে ? আল্লাহর রাছূল এরশাদ করলেন, মৃত্যুর পরেও অতঃপর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নবী (আঃ)-দের পবিত্র শরীর খাওয়াকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন, সুতরাং মৃত্যুর পরও আল্লাহর নবীগণ জিন্দাই আছেন। জীবিতদের ন্যায় তাদের কে রিজিক দেওয়া হয় (ইবনে মাজা)।

✪ আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অন্য এক হাদিছে এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُّسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ (متفق عليه)

অর্থাৎ ঃ জুম্আর দিবসে এরূপ একটি পবিত্র সময় রয়েছে যে সময়ে কোন মুছলমান দোয়া-মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে যাই চান তাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাকে দিয়ে থাকেন।

✪ অপর একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ; আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেন ঃ-

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَاقُدِّرَ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَ فَضْلُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ـ (مسلم)

অর্থাৎ যে মুসলমান জুম্আর দিবসে গোছল করে জুম্আর নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করতঃ তার পক্ষে যতদূর সম্ভব ছুন্নাত নফল সমূহ আদায় করে থাকে অতঃপর ইমাম খুতবা আরম্ভ করার পর যতক্ষণ না সমাপ্ত করেন এলোক ততক্ষণ পর্যন্ত নিরবতা অবলম্বন করে। এরপর ইমামের সাথে সে জুম্আর (ফরয) নামায আদায় করে থাকে। এতে জুম্আ ও পরবর্তী জুম্আর মধ্যকার সময়ের তার যাবতীয় পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অধিকন্ত আর ও তিন দিনের (মুসলিম)।

✪ পবিত্র হাদীছে আর ও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরও এরশাদ করেন ঃ

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْا الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَ مِثْلُ الْمُهَجِّرِ كَمِثْلِ الَّذِىْ يُهْدِىْ بُدْنَةً كَالَّذِىْ يُهْدِىْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ ـ (بخارى شريف)

সার অর্থ ঃ জুম্আবারে জুম্আর নামাযের সময় হলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফেরেস্তামণ্ডলী মাছজিদের দরজায় দাড়িয়ে আগত মুছাল্লীগণের মধ্য হতে যিনি আগে আসেন, তার নাম আগে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন ঐ দিন জুম্আর নামায আদায়ের জন্য প্রথমে যে লোক মসজিদে হাজির হন তার নামে একটি উট্ কোরবানী করার ছাওয়াব লিখা হয়।

অতঃপর যিনি আসেন তার নামে একটি গরু কোরবানী করার পরিমান ছাওয়াব লিখা হয়। এরপর যিনি আসেন তার নামে একটি ছাগল (ভেড়া, দুম্বা) কোরবানী করার ছাওয়াব লিপি বদ্ধ করা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতঃপর যারা আসেন তারা যথাক্রমে আল্লাহর ওয়াস্তে মোরগ ও ডিম দান করার সমান ছাওয়াব পান, শেষ পর্যন্ত ইমাম যখন খুতবা পাঠের জন্য দাড়িয়ে যান তখন ফেরেস্তাগণ খাতা-পত্র বন্ধ করে খুতবা শুনার দিকে মনোযুগী হন। (বোখারী-মুসলিম)

জুম্‌আর নামায তরক করার পরিণতি

✪ জুম্‌আর নামায তরক করার পরিনতি অত্যন্ত ভয়াবহ। হুজুর পুরনূর নবী য়ে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন।ঃ

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَا يُمْحَىْ وَلَا يُبَدَّلُ (مشكوة)

অর্থাৎ ঃ যে ব্যক্তি, বিনা ওজরে জুম্‌আর নামায আদায় করেনা তার নাম মুনাফিক রূপে এমন একটি দপ্তরে লিখা হয় যা কখনও রহিত হবেনা এবং তাকে কখন ও পরিবর্তন করাও হবেনা।

✪ জুম্‌আ বারে নিম্নের শরায়েত সমূহ পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে জোহরের নামাযের স্থলে জুম্‌আর দুরাকা'ত নামায আদায় করা ফরয।

✪ জুম্‌আর নামাযের ব্যাপারে দু'ধরনের শর্তাবলী রয়েছে ঃ

১. জুম্‌আর নামায ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ

২. জুমআর নামায ছহি শুদ্ধ হওয়ার শর্ত সমূহ ঃ

জুমুয়ার নামায ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ ঃ

(১) **মুছলমান হওয়া ঃ**

(২) **হুশ-জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া ঃ** তাই কোন পাগল মাতাল ও বেহুশ লোকের উপর জুমআর নামায আদায় করা ফরয নয়। (দোররে মোখ্‌তার)

(৩) **বালেগ হওয়া ঃ** নাবালেগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছেলের উপর জুম্‌আর নামায আদায় করা ফরয (জরুরী) নয়। (দুর্‌রে মোখ্‌তার)।

(৪) **পুরুষ হওয়া ঃ** মেয়ে লোকদের জন্য জুমআর নামায আদায় করা ফরয নয় (আলমগীরী, শামী)।

(৫) **মুকীম হওয়া ঃ** স্থায়ী বসবাসের স্থানে থাকা। মুছাফির তথা নিজের স্থায়ী বসবাস স্থান থেকে ৪৮/৫৬ মাইলের দুরবর্তী কোন জায়গায় ১৫ দিনের চেয়ে কম অবস্থান করার নিয়্যতকারী অস্থায়ী প্রবাসী লোকের উপর জুম্‌আর নামায ফরয নয়।

(৬) **সুস্থ ও রোগ মুক্ত হওয়া ঃ** রোগ ব্যাধীতে কাতর কিংবা এমন বয়স্ক লোক যিনি চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন এ ধরনের লোকদের জন্য জুম্‌আর নামায আদায় করা ফরয নয় (আলমগীরী, দুর্‌রে মোখতার)।

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে হযরত ইবনে মাছউদ থেকে বর্ণিত আছে ঃ-

إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحْرِقُ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ (مسلم)

অর্থাৎ ঃ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একদা জুম্‌আর নামায তরক কারীদের সম্পর্কে বলেন যে, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার স্থলে (নামাযের ইমামতী করার জন্য) অন্য কাকেও ইমাম নিযুক্ত করে দিই আর আমি যারা জুম্‌আর নামায আদায় করতে আসেনি তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের বাড়ীঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই।

(৭) **আজাদ (স্বাধীন) হওয়া ঃ** সুতরাং ক্রীতদাসের উপর জুম্‌আ ফরয নয়। (আলমগীরী)।

(৮) **দু'পা ও দু'চোখ সুস্থ হওয়া ঃ-** সুতরাং অন্ধলোক ও উভয় পা কর্তিত পঙ্গুঁ লোকদের উপর জুম্‌আর নামায ফরয নয়। (মারকিউল ফলাহ)

(৯) **অবরুদ্ধ না হওয়া বরং মুক্ত হওয়া ঃ-** সুতরাং কারাগারে বন্দি কিংবা অন্য কোন ভাবে অবরুদ্ধ লোকদের উপর জুম্‌আর নামায ফরয নয় (দুর্‌রে মুখতার)।

(১০) **নিরাপদ হওয়াঃ-** পথে শত্রু কিংবা অত্যাচারী সরকারের ধরপাকড়ের ভয়, তদুপরি ডাকাত-হাইজাকারদের ভীষণ উৎপাতের মারাত্মক ভয় কালীণ বিশেষ সময়ে (সাময়িক ভাবে) জুম্‌আর নামায আদায় করা জরুরী নয় (মারাকিউল ফলাহ, দুর্‌রে মোখতার)।

(১১) **ভীষণ বৃষ্টি ও ঝড়-তুফানের অবস্থায় ঃ** অত্যাধিক বৃষ্টি বাদলের দরুন রাস্তা-ঘাট বন্যা কবলিত ও প্লাবিত হয়ে যাওয়ায় এবং অত্যাধিক কাদাযুক্ত হয়ে পড়ায় চলাচলের মোটেই সুযোগ না থাকলে, মছজিদ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য কোন যান বাহনের ব্যবস্থা ও না থাকলে,অনুরূপভাবে বরফ ও শীলা বর্ষণ তদুপরি ঝড়-তুফানের মত মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যায় মূহুর্তে সাময়িক ভাবে জুম্‌আর নামায আদায় করা জরুরী নয়।

✪ যাদের উপর জুম্‌আর নামায ফরয নয় তাদের স্ব-স্ব এলাকায় জুম্‌আর নামায হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে একাকী বিনা আজান একামতে জোহরের নামায আদায় করে নিতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাঁ উল্লেখিত মুছলিম লোকদের মধ্যহতে কেউ যদি স্বইচ্ছায় জুমুআর নামায আদায় করে নেয় তাহলে উহা তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী)।

এ সমস্ত লোকদের কে পুনঃ সেদিনের জোহরের নামায আদায় করা লাগবে না।

বরং "বাহরুর রায়েক" নামক ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে উপরুল্লেখিত লোকদের জন্য (মহিলা ব্যতীত) জোহরের নামাযের চেয়ে জুমুআর নামায আদায় করাটাকেই উত্তম বলা হয়েছে।

◆ জুমুআর নামায ছহি-শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

(১) শহর, নগর হওয়া কিংবা

(২) উপ-শহর হওয়া।

উল্লেখ্য যে, আমাদের বাংলাদেশের গ্রাম্য এলাকা সমূহও শহর কিংবা উপ-শহরের পর্যায়ে গণ্য হওয়ায় এদেশের অধিকাংশ জায়গায় জুমুআ আদায় করা জরুরী।

(৩) জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়া ঃ সুতরাং যোহরের নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে জুমআর নামায আদায় করে নিলে তা আদায় হবেনা।

এমনিভাবে যোহরের সময় চলে যাওয়ার পর জুমআর নামায আদায় করলে তাও আদায় হবেনা (মারাকিউল ফলাহ্)।

(৪) ইসলামী সরকার প্রধান বা তার প্রতিনিধি কিংবা সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্ম কর্তাদের কারও উপস্থিতি কিংবা অনুমতির দরকার।

(৫) কোন দেশে ইসলামী সরকার না থাকলে তদঞ্চলের বড় আলেম মুফ্তী সাহেবানদের অন্ততঃ ১ম বারে কারও উপস্থিতি পাওয়া গেলে জুমুআ আদায় করা শুদ্ধ হবে।

بِلَادٌ عَلَيْهَا وُلَاةُ كُفَّارٍ يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِيْنَ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ (عالمكيرية)

(৬) এমনিভাবে সরকার প্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির অনুমতি নেওয়া কষ্ট কর হলে স্থানীয় মুসলিমেরা মিলে একজন উপযুক্ত ইমাম নিযুক্ত করতঃ জুমুআ কায়েম করে নেওয়ার ব্যাপারে শরীয়াতে অনুমতি রয়েছে।

وَلَوْ تَعَذَّرَ الْاِسْتِيْذَانُ عَنِ الْإِمَامِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّيْ بِهِمُ الْجُمُعَةَ جَازَ كَذَا فِي التَّهْذِيْبِ (عالمكيرية)

"হাদীকাতুন্ নাদিয়া শরহে তারীকাতুল মুহাম্মাদীয়া" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ-

اِذَا خَلَا الزَّمَانُ مِنْ سُلْطَانٍ ذِيْ كِفَايَةٍ فَالْأُمُوْرُ مَوْكُوْلَةٌ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَيَلْزَمُ الْأُمَّةَ الرُّجُوْعُ إِلَيْهِمْ وَيَصِيْرُوْنَ وُلَاةً. فَإِذَا عَسُرَ جَمْعُهُمْ عَلَى وَاحِدٍ اسْتَقَلَّ كُلُّ قُطْرٍ بِاتِّبَاعِ عُلَمَائِهِ

(৫) খুতবা প্রদান করা ঃ

✪ খুতবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়াবলী শর্তরূপে পালন করে যেতে হবেঃ

(১) জোহরের নিদ্দিষ্ট ওয়াক্তের ভিতরই খুতবা প্রদান করতে হবে। জোহরের সময় হওয়ার আগে কিংবা জোহরের সময় চলে যাওয়ার পর খুতবা দিলে জুমুআর নামায শুদ্ধ হবেনা (আলমগীরী)।

(২) ফরয নামাযের আগেই খুতবা দেওয়া শর্ত, ফরয দু'রাকাতের পরে খুতবা দিলে নামায আদায় হবে না।

وَ شَرْطُ الشَّيْءِ سَابِقٌ عَلَيْهِ وَ قَدْ كَانَتِ الْخُطْبَةُ فِيْ صَدْرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ كَخُطْبَةِ الْعِيْدِ. ثُمَّ نُسِخَ وَ جُعِلَتْ قَبْلَهَا. فَفِيْ مَرَاسِيْلِ أَبِيْ دَاؤُدَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. حَتّٰى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ هُوَ يَخْطُبُ وَ قَدْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ دَحْيَةَ قَدِمَ بِتِجَارَتِهِ وَ كَانَ دَحْيَةُ إِذَا قَدِمَ تَلَقَّاهُ أَهْلُهُ بِالدُّفُوْفِ فَخَرَجَ النَّاسُ لَمْ يَظُنُّوْا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيْ تَرْكِ الْخُطْبَةِ شَيْءٌ. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ قَائِمًا الْآيَةَ. فَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ أَخَّرَ الصَّلٰوةَ. (طحطاوى/عمدة القارى شرح البخارى)

(৩) কমপক্ষে এত সংখ্যক মুছাল্লির সামনে খুতবা দেওয়া শর্ত যত সংখ্যক মুছাল্লিদের কে নিয়ে জুমুআর নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হয়।

(৪) এতদুর বড় আওয়াজে খুতবা পাঠ করা শর্ত যাতে নিকটবর্তী লোকগণ শুনতে পান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) খুতবা অবশ্যই আরবী ভাষায় দিতে হবে অন্য কোন ভাষায় খুতবা দিলে নামায শুদ্ধ হবে না। পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া জরুরী। আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুতবা দেওয়া নাজায়েজ।

(৬) উপস্থিত মুছাল্লিবৃন্দের জন্য ইমাম কর্তৃক প্রদত্ত খুতবা নিরবে শ্রবন করা ওয়াজিব। খুতবা প্রদান কালে যাবতীয় নামায, তাছবীহ্-তাহলীল ও দোয়া-দরূদ ইত্যাদি আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী।

✪ খুতবা দানের সময় নিম্নের নিয়মগুলো পালন করা ছুন্নাত ঃ

(১) পাক পবিত্র ও ওযু অবস্থায় খুত্‌বা প্রদান করা।

(২) দু'টি খুতবা প্রদান করা।

(৩) প্রথম খুতবা দেওয়ার পূর্বে খাতীবের মিম্বারে বসা।

(৪) মুয়াজ্জিনের আযান বলা শেষ হলেই মিম্বারে দাড়িয়ে খুতবা প্রদান করা।

(৫) উপস্থিত মুছাল্লী (শ্রোতাবৃন্দ)-কে নিজের সামনে রেখেই খুতবা দেওয়া।

(৬) আমাদের দেশের মাছজিদ সমূহের মেহরাবের উত্তর পার্শ্বেই মিম্বার হওয়া উত্তম।

(৭) প্রথম খুতবা শেষ করতঃ বসেই পুনরাই দ্বিতীয় খুতবা শুরু করা।

(৮) খুতবা শুনার জন্য উপস্থিত মুছাল্লীগণের ইমাম সাহেবের দিকে মুখ করে নামাযের তাশাহ্হুদ আত্তাহিয়্যাতু পাঠের ন্যায় দু'জানু হয়ে বসা।

(৯) খুতবার শুরুতে আউজুবিল্লাহ - ও বিছমিল্লাহ পাঠ করা মুস্তাহাব।

(১০) আল্লাহর হাম্‌দ-ছানা তথা গুণ-গান ও প্রশংসা সহকারে খুত্‌বা শুরু করা-

(১১) কোরআন করিমের আয়াত ও হাদীছ শরীফ দ্বারা ওয়াজ-নাছীহত করা,

(১২) নবী করিম (সঃ)-এর উপর দরূদ-ছালাম পাঠ করা।

৬ নং শর্ত ঃ জুম্‌আর নামায ছহী শুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে জামাআতঃ

✪ জুমআর নামায জামাআতের সাথে আদায় করা ফরয। জমাআত ব্যতীত একাকী জুম্‌আর নামায আদায় করা শুদ্ধ নয়।

✪ ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে জুম্‌আ ফরয হয়েছে এরূপ তিনজন লোককে নিয়েই জুমআর জামাত আদায় করতে হয়। সুতরাং ইমাম ব্যতীত দু'জন বালেগ মুছাল্লী ও একজন নাবালেগ কিংবা মহিলা মুছাল্লীকে নিয়ে জামাআত করে থাকলে জুমআর জামাআত আদায় হবেনা।(আলমগীরী, শামী, ফাতহুল কাদীর)

৭ নং শর্ত ঃ "ইজ্‌নে আম" (সর্বসাধারণের জন্য অনুমতি) অর্থাৎ যে স্থানে বা যে মছজিদে জুমআর নামায আদায় করা হবে সে স্থানে জুমআর নামাযের মুহূর্তে সর্ব সাধারণ মুছলমানের বিনা বাধায় প্রবেশের অনুমতি থাকা চাই। তদুপরি প্রকাশ্যেই জুম্‌আর নামায আদায় করা লাগে।

এ হিসাবে যেখানে সর্ব সাধারণ মুছলমানের জন্য জুম্‌আর ওয়াক্তে অবাধে আসা-যাওয়া করার অনুমতি সুযোগ থাকবে না, সে ধরনের সংরক্ষিত এলাকায় জুমআর নামায আদায় করা হলে তা শুদ্ধ হবে না।

(শামী, আলমগীরী, মারাকিউল ফলাহ)

✪ জুম্‌আর নামায আদায়ের জন্য জুম্‌আবারে গোছল করা ছুন্নাত।

✪ জুমআর নামাযের প্রথম আযান হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরী-তথা পার্থিব অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে জুম্‌আর নামায আদায়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। কারণ এ প্রথম আযান হওয়ার সাথে সাথে নামাযের আনুষঙ্গিক কাজ-কর্ম ব্যতীত অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ কর্ম কোরআন করিমের নির্দেশ অনুসারে হারাম হয়ে যায়।

✪ ফোকাহায়ে কেরাম গণের মতানুসারে জুম্‌আর নামায আদায়ের জন্য পাক পরিষ্কার জামা কাপড় পরিধান করা, সম্ভবমত আতর সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। (আলমগীরী)।

✪ অতঃপর যদি ঘরেই ওযু করা হয় তাহলে প্রত্যেক ওযুর পর "তাহিয়্যাতুল ওযুর' যে দুরাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব এ জুমাবারে ও ঘরেই উক্ত নামায পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

এরপর তাড়া তাড়ি মছজিদে গমন করে তাহিয়্যাতুল মাছজিদের' দু'রাকা'ত নফল নামায আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব।

আর যদি মাছজিদেই ওযু করা হয় তাহলে ওযু করার পর মাছজিদে প্রবেশ করত তাহিয়্যাতুল মাছজিদের দু'রাকা'ত নফল নামায আদায় করে নিতে হয়। এতে তাহিয়্যাতুল ওযুর নামাযের ছাওয়াব ও পাওয়া যাবে।

(ফাতাওয়া ও মাছায়েল, ইস. ফাউণ্ডেশন)

✪ ফরয ও ছুন্নাত মিলিয়ে জুম্‌আর নামায সর্বমোট ১২ রাকা'ত।

খুত্‌বা ও ফরযের পূর্বে ৪ রাকা'ত ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্, খুতবার পর ২ রাকা'ত ফরয। ফরযের পর পুনঃ ৪ রাকা ত ছুন্নাতে মুয়াক্‌কাদাহ অতঃপর পুনঃ ২ রাকা'ত ছুন্নাত।

মোট এ ১২ রাকা'ত নামায আদায় করে যেতে হয়।

অতঃপর ইচ্ছা হলে ২/৪ রাকাত সাধারণ নফল নামায পড়া যায়।

✪ এক্ষেত্রে এ বিষয়টি ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জুমআর ফরয নামায শেষ করার পর মোট কয় রাকাত নামায-ছুন্নাত হিসাবে আদায় করালাগে এনিয়ে আমাদের মাজ্‌হাবের আইম্মায়ে কেরামগণের মধ্যে কিছুটা এখ্‌তেলাপ পরিলক্ষিত হলেও মোট (৪ রাকাত + ২ রাকাত) ছয় রাকাত নামায আদায় করাটাই উচিৎ। কেননা ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এর মতে এ সম্পর্কিত বর্ণিত সব হাদিছ শরীফ সমূহের উপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমল করতে গেলে মোট ছয় রাকাত ছুন্নাত নামাযই আদায় করা লাগে। আমাদের হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত ইমাম তাহাবী (রঃ) ছয় রাকাতের হাদিছ সমূহ কেই অগ্রাধিকার ও প্রধান্য দিয়েছেন (তাহাবী শরীফ)।

✪ এ প্রসঙ্গে মুনিয়াতুল মুছাল্লী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

اَلْاَفْضَلُ عِنْدَنَا اَنْ يُصَلِّىَ اَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ

✪ গুনিয়া কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ-

اَلْاَفْضَلُ اَنْ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ لِلْخُرُوْجِ عَنِ الْخِلَافِ

সুতরাং জুম্‌আর ফরযের পর মোট ছয় রাকাত ছুন্নাতই পড়া লাগবে।

✪ জুম্‌আর নামাযের নিয়্যতসমূহ ঃ

(১) ফরযের পূর্বের ৪ রাকাত ছুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلَ الْجُمْعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহী তাআলা আরবা আ রাকাআতি ছালাতি কাব্‌লিল জুম্‌আতি ছুন্নাতু রাছুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি "আল্লাহু আকবর"।

(২) দু'রাকাত ফরযের নিয়্যত ঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمْعَةِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকা'তাই ছালাতিল জুমআতি ফারদুল্লাহি তাআলা মুতা ওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কাবাতিশ্ শারীফাতি "আল্লাহু আকবর"।

(৩) ফরযের পরের চার রাকাত ছুন্নাতের নিয়্যত ঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা আর্‌বাআ রাকা'আতি ছালাতি বাদিল জুম্‌আতি ছুন্নাতু রাছুল্লিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি "আল্লাহু আকবর"।

(৪) অতঃপর দু'রাকাত ছুন্নাতে যায়েদার নিয়্যত ঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةَ الْوَقْتِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকা'তাই ছালাতি ছুন্নাতিল ওয়াক্‌তি ছুন্নাতু রাছূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

(৫) ২ রাকাত নফল নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ

জুম্‌আর নামায আদায়ের ধারাবাহিক নিয়ম ঃ

✪ "তাহিয়্যাতুল' মাছজিদের দু'রাকাত নফল নামায আদায় করার পর চার রাকাত "কাব্‌লাল্ জুম্‌আর" ছুন্নাতে মুয়াক্কাদার নামায আদায় করে নিয়ে ইমাম সাহেবের খুতবা শুরু করার আগ পর্যন্ত সময়ে বসে বসে নিরবে তাছ্বীহ-তাহ্‌লীল, জিকির আজকার ও দোয়া দরূদ ইত্যাদি পাঠে মশগুল থাকা উত্তম।

✪ ইমাম মসজিদে এসে খোতবা দেওয়ার আগে মিম্বারের ডানে কোন খাচ কামরা (مخدع) নির্মিত থাকলে তথায় আর না থাকলে মাসজিদের ডান দিকে কিংবা ডান কোণায় ইমামের বসাটাই ছুন্নাত। খোতবা প্রদানের পূর্বে মেহরাবের মধ্যে ইমামের ছুন্নাত নামায ইত্যাদি আদায় করাটা মাকরূহ।

وَالسُّنَّةُ اَنْ يَكُوْنَ جُلُوْسُ الْاِمَامِ فِىْ مُخْدَعِهٖ عَنْ يَمِيْنِ الْمِنْبَرِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِىْ جِهَتِهٖ اَوْ نَاحِيَتِهٖ - وَتُكْرَهُ صَلَاتُهٗ فِى الْمِحْرَابِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

(بحر الرائق جـ٢، صفحـ١٤٩)

(قَوْلُهٗ عَنْ يَمِيْنِ الْمِنْبَرِ) قَالَ فِى الْبَحْرِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِىْ جِهَتِهٖ اَوْ نَاحِيَتِهٖ وَتُكْرَهُ صَلَاتُهٗ فِى الْمِحْرَابِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ (شامى)

✪ ইমাম সাহেব মিম্বারে বসার পর দ্বিতীয় আযান শুরু হলে অন্যান্য নামাযের আযানের ন্যায় এ আযানের ও চুপে চুপে যথারীতি ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই উত্তর দিয়ে যাবেন এবং নিরবে আযান শেষের নির্ধারিত ছুন্নাতী দোয়া পাঠ করতঃ মুনাজাত করবেন। এর দলীল-প্রমান আযান প্রসঙ্গের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতঃপর ইমাম সাহেব দাড়িয়ে যথানিয়মে প্রথম খুতবা প্রদান করবেন। দু'জানু হয়ে বসে পূর্ণ একাগ্রতা ও মনযোগ সহকারে উপস্থিত মুছাল্লীগণের খুতবা শোনা ওয়াজিব। মুক্তাদিগণ ইমাম হতে দূরে থাকার দরুন খুতবার আওয়াজ শুনতে নাপেলেও খুতবা দানের সময় নিরব থাকা সকলের উপর ওয়াজিব (শামী)।

✪ যে সমস্ত কাজ নামাযের মধ্যে হারাম যেমন– কথাবার্তা বলা, পানাহার করা,ছালাম দেওয়া, ছালামের উত্তর দান ইত্যাদি বিষয় খুতবা শুনার সময় মুক্তাদিগণের জন্যও হারাম। এমনকি খুতবা শুরু হলে নামায-কলমা, জিকির আজকার ও দোয়া-দরূদ পড়াও সম্পূর্ণ নিষেধ।

কাকেও অন্যায়-অনিয়ম করতে দেখলে হাত বা মাথার ইশারায় নিষেধ করতে হয়। মুখে শব্দ করে নিষেধ করা নাজায়েজ। (দুররে মুক্তার)।

✪ খুতবা শেষ হলে সহসা একামত বলে জুমআর দু'রাকাত ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করে নিতে হয়।

✪ খুতবা শেষ হলে নামায আরম্ভ করতে অধিক বিলম্ব করা মাকরূহ। অত্যাধিক দেরী করে ফেললে পুণঃ খুতবা দেওয়া লাগবে (দুররুল মুখতার)।

✪ দু'রাকাত ফরয নামায জামাত সহকারে আদায় করতঃ ছালাম ফিরানোর পর নিজেদের জন্য এবং সারা বিশ্ব মুসলিমের কল্যাণের জন্য মুছাল্লীগণকে নিয়ে দু'হাত উঠিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে ইমামের দোয়া-মুনাজাত করে যাওয়া উত্তম।

কারণ দোয়া-ফরিয়াদ কবুল হওয়ার সময় সমূহের মধ্যে জুম্‌আর ফরয নামাযের পরক্ষণের এ সময়টা অন্যতম। একতঃ প্রতিটি ফরয নামাযের পরক্ষণের সময়টি দোয়া-মুনাজাত কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়। এছাড়া যেহেতু জুমআর দিবসে যে কোন নেক্ দোয়া-ফরিয়াদ কবুল হওয়ার একটা সুনির্ধারিত সময়ের কথা হাদীস শরীফে যে বর্ণিত হয়েছে– খোতবা ও নামায আদায়ের জন্য মাছজিদে ইমাম সাহেবের আগমন হতে যাবতীয় নামায শেষ করা পর্যন্তের সময়টিই হচ্ছে–ঐ মাকবুল সময়। অনেক মুহাদ্দেছীন, মুফাচ্ছেরীন ও ফোকাহায়ে কেরামগণের ইহায় অভিমত, যা বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ওমদাতুল ক্বারী গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাহতাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

قِيْلَ هِىَ مِنْ وَقْتِ خُرُوْجِ الْإِمَامِ اِلَى الْمِنْبَرِ اِلٰى فَرَاغِ الصَّلٰوةِ -

✪ এরপর চার রাকাত বা'দাল জুম্‌আর ছুন্নাতে মুয়াক্কাদার নামায আদায় করে নিতে হয়, অতঃপর আরো দু'রাকাত ছুন্নাত নামায পড়ে নিতে হবে।

সবশেষে ইচ্ছা হলে আরো ২/৪ রাকাত সাধারণ নফল নামায আদায় করে নেওয়া যায়। অতঃপর রছম হিসাবে নয় বরং আল্লাহ তায়ালার দরবারে বেশী বেশী দোয়া-ফরিয়াদের ফজীলতের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে উপস্থিত সমস্ত মুছাল্লীদের কে নিয়ে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর ভক্তি-ভালবাসা সহকারে ছালাত-ছালাম পাঠ করতঃ দু'হাত তুলে ইমামের শেষ মুনাজাত করা কল্যাণকর।

মাছজিদের আহকাম (বিধি-বিধান)

✪ মাছজিদ (مسجد) মানে ছজদা করার স্থান, শরীয়াতের পরিভাষায় ঐ স্থানকে মাছজিদ বলা হয়, "যাকে নামায প্রভৃতি এবাদত আদায়ের জন্য তার বৈধ মালিক "এ স্থানটিকে আমি মাছজিদ করে দিলাম" বলে মাছজিদের জন্য চিহ্নিত ও নির্ধারিত করে দেয়, সাথে সাথে মালিক ঐ স্থানে যাওয়া আসার রাস্তা ও পৃথক করে দেয় এবং সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে তথায় নামায আদায় করার অনুমতিও দিয়ে দেয়।[১]

✪ আল্লাহর জমিনে মাছজিদের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান আর কোন স্থান নাই। এ পৃথিবীর মাঝে একমাত্র মাছজিদকেই আল্লাহর পবিত্র ঘর রূপে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মাছজিদকে "জান্নাতের বাগান" রূপে অভিহিত করেছেন।

✪ স্রষ্টা ও মাবুদ মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ স্থান হল এই মাছজিদ, যদিও মাছজিদে শুধু নামাযই আদায় করা হয় কিন্তু মূলতঃ এই মাছজিদই ইসলামের যাবতীয় কার্যক্রম এবং ইসলামী সাংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র, আল্লাহর অপরিসীম রহমত বর্ষণ ও বিতরণের কেন্দ্র ভাণ্ডার।

সুতরাং মাছজিদের মর্যাদা-মাহাত্ম্য ও বিধি-বিধান সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

✪ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাছউদ (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ-

"পৃথিবীর বুকে মাছজিদ সমূহই হচ্ছে আল্লাহর পবিত্র ঘর" যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে রূহানী দীদার-সাক্ষাতের নিয়্যতে মাছজিদে হাজির হন– স্বয়ং আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে সন্মানিত করার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে থাকেন (তিবরানী)

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ মাছজিদ সমূহ হচ্ছে আখেরাতের বাজার, তাই যে লোক মাছজিদে যান তিনি মহান আল্লাহ তাআলার মেহ্‌মান রূপেই গণ্য হন। (আল্লাহর পক্ষ থেকে এবান্দার) গুনাহ মাফ হওয়াটাই তার অতিথিয়েতা আর (বান্দার) সম্মান-সম্ভ্রম(বৃদ্ধি) তার (পক্ষ থেকে) উপহার (স্বরূপ) হাকেম।

টীকা ঃ (১)

وَهُوَ اِصْطِلَاحًا اَلْاَرْضُ اَلَّتِىْ جَعَلَهَا الْمَالِكُ مَسْجِدًا بِقَوْلِهٖ جَعَلْتُ مَسْجِدًا وَ اَفْرَدَ طَرِيْقَهٗ وَاَذِنَ بِالصَّلٰوةِ فِيْهِ - (قواعد الفقه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ পবিত্র হাদিছ শরীফে হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর প্রিয় রাছূল (দঃ) এরশাদ করেন ঃ-

أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ۔ (مسلم)

অর্থাৎ পৃথিবীর স্থান সমূহের মধ্যে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে মাছজিদ সমূহই হল সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান আর ঘৃণিত স্থান হল বাজার-মার্কেট সমূহ।

✪ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন−

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله وما رياض الجنة قال المساجد قيل وما الرتع يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ۔

অর্থাৎ যখন তোমরা জান্নাত কাননে উপস্থিত হও তখন তার ফল সমূহ খুশী মনে ভোগ করো। প্রিয় নবী (দঃ) এর বাণী শুনে উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জানতে চাইলেন, এয়া রাছূলাল্লাহ (দঃ)! দুনিয়াতে আবার জান্নাতের বাগান কোনটি? প্রতি উত্তরে প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেন− আল্লাহর ঘর মাছজিদ সমূহই হল পৃথিবীতে "জান্নাতের বাগান"। পুনঃ জানতে চাওয়া হয়, এয়া রাছূলাল্লাহ (দঃ) এর ফল ভক্ষণ করার মানে কি? প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, ফলভোগ করা মানে (আল্লাহর ঘর মাছজিদে বসে বসে) নিম্নের তাছবীহ−

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ۔

পাঠ করতে থাকা,

✪ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদিছে আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন,

কেয়ামত দিবসে মাছজিদ সমূহ ছাড়া বাদ বাকী সমস্ত জমিন ফানা (বিলিন) হয়ে যাবে। আর এই মাছজিদ সমূহ একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়ে একস্থানে অবস্থান করবে অর্থাৎ মাছজিদ গুলো ফানা হবেনা (তিবরানী, কানজুল ওম্মাল)।

✪ অপর একটি হাদীছে হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর প্রিয় নবী (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক মাছজিদের সাথে ভালোবাসা রাখে আল্লাহ তায়ালা ও তার সাথে ভালোবাসা রাখেন (তিবরানী)।

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, কিয়ামত দিবসে যখন আসমান জমিন, পাহাড় পর্বত প্রভৃতি ধূনিত তুলার ন্যায় উড়ে যাবে তখন "মাছজিদ সমূহ এদের মূল

ও আদি মাছজিদ কা'বাতুল মুকাররামার সাথে মিলিত হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। (মিশকাতুল আনোওয়ার)

✪ মাছজিদের নির্মাণ ও আবাদ রাখা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন করিমে বলা হয়েছে− إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الخ

অর্থাৎ আল্লাহর মাছজিদ সমূহকে তারাই নির্মাণ করে যায় (আবাদ রাখে, রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে) যারা মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে।

অর্থাৎ মাছজিদের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণই হচ্ছে ঈমানদারীর অন্যতম চিহ্ন ও পরিচিতি।

✪ পবিত্র হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে। প্রিয় নবী (স) এরশাদ করেছেন ঃ

من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ۔ (بخاري)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে আল্লাহর ঘর মাছজিদ নির্মাণ করবে− এর বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে ঘর-প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

আল্লাহর ঘর মাছজিদ নির্মাণ করা এবং একে যাবতীয় সাহায্য-সহযোগীতা ও নামায আদায়ের মাধ্যমে আবাদ রাখা কত অধিক ফাযীলত ও মরতবার কাজ তা সহজেই অনুমেয়।

✪ হালাল ও বৈধ পথে উপার্জিত অর্থ সম্পদ দ্বারাই মাছজিদ নির্মাণ ও মাছজিদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা একান্ত দরকার, অন্যথায় তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

✪ সূদ, ঘুষ, চুরি কিংবা অন্য যে কোন অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ দ্বারা মাছজিদ নির্মাণ করা কিংবা ঐ জাতীয় অর্থ মাছজিদে ব্যয় করা নাজায়েজ, করলেও ছাওয়াব পাওয়া যাবেনা।

✪ কোন অমুসলিমের পয়সা মাছজিদের জন্য খরচ করা উচিৎ নয়। কোন অমুসলিম যদি মনের একান্ত আগ্রহ ও ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে মাছজিদে চাঁদা দিতে চায় তাহলে তার পয়সাগুলো প্রথমে কোন একজন বিশ্বস্থ মুসলমানকেই দান করে দিবে, অতঃপর ঐ মুসলমান উক্ত টাকা সমূহ মাছজিদকে দান করে দিবে।

✪ হাদীছ শরীফের মর্মানুযায়ী ছাওয়াব-পূণ্যের দিক বিবেচনায় মক্কা শরীফে অবস্থিত "মাছ্জিদুল্ হারাম" এর মরতবাই সবচেয়ে বেশী।

হাদীছ শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী মাছজিদুল হারাম শরীফে এক রাকাত নামায আদায়ের বিনিময়ে এক লক্ষ রাকাতের সমতুল্য ছাওয়াব পাওয়া যায়। এরপর মদীনায়ে মুনাওয়ারায় অবস্থিত মাছজিদে নববী (দঃ) শরীফের মরতবা অন্যান্য সব

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাছজিদ থেকেই অধিক। এতে একরাকাত নামায আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সমতূল্য ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

অতঃপর ফেলিস্তিনে অবস্থিত "মাছজিদুল আক্‌ছা" তথা বায়তুল মুকাদ্দাছ মাছজিদের ফযীলত অন্যান্য মাছজিদের তুলনায় বেশী। এতেও এক রাকাত নামায আদায়ের দ্বারা পঞ্চাশ হাজার, কোন কোন হাদীছ শরীফের ভাষ্যমতে পচিঁশ হাজার রাকাতের ছাওয়াব পাওয়া যায়।

অতঃপর মদীনা শরীফে অবস্থিত মাছজিদে 'কো'বা শরীফ এর মরতাবা পৃথিবীর অন্যান্য মাছজিদের চাইতে বেশী এরপর প্রাচীন পুরাতন মাছজিদের মর্যাদা নূতন মাছজিদের তুলনায় অধিক অতঃপর শহরের প্রত্যেক জামে মাছজিদের ফযীলতই সব চেয়ে অধিক। এতে এক রাকাত নামায আদায় করলে পাঁচশত রাকাত নামাযের সমতূল্য ছাওয়াব পাওয়া যায়।

অতঃপর নিজ মহল্লার মাছজিদের মরতবাই বেশী, যদি নিজ মহল্লায় দু'খানা মাছজিদ থাকে একটি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত, অপরটি হাল জমানায় প্রতিষ্ঠিত, এক্ষেত্রে পুরাতন মাছজিদের মরতবাই বেশী, আর উভয় মাছজিদ যদি পুরাতন হয় তাহলে নিজেদের নিকটবর্তী মাছজিদের মরতাবাই বেশী।[১]

পৃথিবীর সকল মাছজিদই ফাযিলত-মর্যাদার অধিকারী। তবে জামহুর তথা অধিকাংশ আইম্মায়ে কেরামগণের মতে পৃথিবীর সকল মাছজিদের মধ্যে মক্কা মুকাররামাস্থ মাছজিদুল হারামের মরতাবা-মর্যাদাই সবচেয়ে বেশী। দুনিয়ার বুকে ইহাই প্রথম মাছজিদ, সমস্ত মাছজিদের আগে একেই তৈয়ার করা হয়, এভিত্তিতে সকল মাছজিদের ইহাই মূল এবং কেবলা।

টীকা ঃ

اَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَام ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْمَدِيْنَة ثُمَّ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدَس ثُمَّ مَسْجِدُ قُبَاء ثُمَّ الاَقْدَم فَالاَقْدَم ثُمَّ الاَعْظَم وَ ذَكَرَ فِيْ قَاضِىْ خَانْ وَصَاحِب مُنْيَة الْمُفْتِىْ وَ غَيْرُهُمَا ۔ اَنَّ الاَقْدَم اَفْضَل وَاِنْ اِسْتَوَيَا فِىْ الْقَدْم فَبِالاَقْرَب اَفْضَلْ ۔ (شرح منيه)

و مسجد استاذه لِدَرْسِه اَوْسِمَاعِ اَخْبَار اَفْضَلَ بِالْاِتِّفَاق اگر در محلتى دو مسجد باشد پس نمازدر قديم افضل است واگر ہر دو قديم باشد پس در اقرب (مخزن الفتاوى)

যদিও ছাওয়াবের দিক বিবেচনায় "মাছজিদে নববী" শরীফের চাইতে "মাছজিদুল হারাম" শরীফের মর্যাদা বেশী তথাপি অপরাপর দিক বিবেচনায় মাছজিদে নববী শরীফের মর্যাদাই অধিক।

হযরত ইমাম মালেক (রঃ) এবং অন্যান্য আরো অনেক আইম্মায়ে কেরাম, ফোকাহায়ে ইজাম, মুহাদ্দেছীন কেরাম এবং মুফাচ্ছেরীণ ইজাম (রঃ) এর মতে আল্লাহর পেয়ারা রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কর্তৃক মদীনায়ে মুনাওয়ারাতে প্রতিষ্ঠিত মাছজীদে নববী শরীফের মর্যাদা মরতবাই পৃথিবীর সব-মাছজিদ এমন কি "মাছজিদুল হারাম" এর চাইতেও বেশী। (তানজিমুল আশতাত্)

কারণ প্রথমতঃ "মাছজিদে নববী শরীফ" তৈয়ার করার পর আল্লাহর মাহবুব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মর্যাদা সব মাছজিদের চেয়ে বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে বিশেষভাবে ফরিয়াদ পেশ করেছেন। আল্লাহর প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দোয়া আল্লাহর মহান দরবার থেকে রদ হয়নি বরং মহান আল্লাহ নিজের মাহবুব নবী পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ফরিয়াদ কবুল করতঃ সব মাছজিদের উপর মাছজিদে নববী শরীফের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তানজীমুল আশতাত পুস্তিকায় বলা হয়েছে–

وبعد از تسليم گفته شود كه افضليت منحصر در مضاعفت ثواب نيست / گومضاعفت ثواب نماز در مسجد حرام بيشتر از مسجد نبوى باشد و لكن انواع كرامات و بركات و فتوح و فيوض و منافع تو مخصوص مدينة مطهره است در فضيلت ان كا فيست / كما فى البيضاوى واشعة اللمعات و غيره ذلك ـ (تنظيم الاشتات)

দ্বিতীয়তঃ যদিও "মাছজিদুল হারাম শরীফ" ইসলামের প্রথম প্রকাশ স্থল, কিন্তু এ নিরেট সত্যকে সকলেরই এক বাক্যে স্বীকার করে নিতে হবে যে, ইসলামের স্বীকৃতি, পূর্ণাঙ্গতা, স্থীতীশীলতা ও ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারতা অর্জন একমাত্র, "মাছজিদে নববী (দঃ) এর মাধ্যমেই হয়েছে –এ কারণে এর মর্যাদাই সব মাছজিদের চাইতে অধিক।

তৃতীয়তঃ মাক্কা শরীফের "মাছজিদুল হারাম" হযরত ইব্রাহীম খলীল (আঃ) এরই নামায আদায়ের স্থান। পক্ষান্তরে মদীনায়ে মুনাওয়ারার "মাছজিদে নববী (দঃ) শরীফ" সৃষ্টির সেরা, নিখিলের নবী, রাহমাতুল লিল্ আলামীন, নবী সম্রাট, হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামেরই নামায আদায়ের স্থান। এ আলোকে এ মাছজিদে নববী শরীফই আফজাল (সর্বোত্তম) হওয়া স্বাভাবিক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থতঃ সর্বোপরি "মাছজিদুল হারাম শরীফ" হযরত আদম ও হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এরই গড়া আর "মাছজিদে নববী শরীফ" স্বয়ং মহীয়ান গরীয়ান খালেক আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হাবীব (প্রেমাস্পদ), নূরে ইলাহীর প্রথম বিন্দু, নবীকুলের মহান সম্রাট, হযরত মুহাম্মদ (চরম ও পরম প্রশংসিত সত্বা) ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূরানী হাতেই গড়া, সুতরাং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে এরই মর্যাদা বেশী হওয়া যুক্তি যুক্ত। (তানজীমুল আশতাত)।

তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাছজিদে নববী শরীফের যে অংশের সাথে আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূরানী জিছিম মোবারকের সম্পৃক্ততা রয়েছে ঐ অংশ মাছজিদে হারাম শরীফ এবং "কা'বাতুল মুয়াজ্জামা" থেকেও যে আফজল এবং শ্রেষ্ঠ-এ বিষয়টিকে জমহুর আইম্মায়ে ইসলাম এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন,

এমনকি ইসলামের অনেক হক্কানী রাব্বানী মহা মনীষীগণের মতে নূরে মুজাচ্ছাম নবী (দঃ) এর নূরানী জিসিম মোবারক রাওজায়ে মুনাওয়ারার যে অংশে অবস্থিত আছে সে অংশটি আরশে মুআল্লার চাইতে ও উত্তম।

✪ দূররে মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَمَكَّةُ اَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الرَّاجِحِ اِلَّا مَا ضَمَّ اَعْضَائَهُ الشَّرِيْفَةُ صلى الله عليه وسلم فَاِنَّهُ اَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتّٰى مِنَ الْكَعْبَةِ وَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ ـ (در مختار)

✪ শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(قوله الا الخ) قَالَ فِى اللُّبَابِ ـ وَالْخِلَافُ فِيْمَا عَدَا مَوْضِعِ الْقَبْرِ الْمُقَدَّسِ فَمَا ضَمَّ اَعْضَاءَهُ الشَّرِيْفَةَ فَهُوَ اَفْضَلُ بِقَاعِ الْاَرْضِ بِالْاِجْمَاعِ اهـ قَالَ شَارِحُهُ وَكَذَا اَىْ الْخِلَافُ فِىْ غَيْرِ الْبَيْتِ ـ فَاِنَّ الْكَعْبَةَ اَفْضَلُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مَاعَدَا الضَّرِيْحِ الْاَقْدَسِ وَكَذَا الضَّرِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِى عَيَاضُ وَغَيْرُهُ الْاِجْمَاعَ عَلٰى تَفْضِيْلِهِ حَتّٰى عَلَى الْكَعْبَةِ وَ اَنَّ الْخِلَافَ فِيْمَا عَدَاهُ وَ نَقَلَ ابْنُ عَقِيْلِ الْحَنْبَلِيِّ اَنَّ تِلْكَ الْبُقْعَةِ اَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ و قَدْ وَافَقَهُ السَّادَةُ الْبَكْرِيُّوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ (شامى)

✪ 'শেফা' ও তদ্বব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا خِلَافَ اَنْ مَوْضَعَ قَبْرِهِ اَفْضَلُ بِقَاعِ الْاَرْضِ (الشفا لقاضى عياض) (وَلَاخِلَافَ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْمُحَدِّثِيْنَ فِىْ اَنْ مَوْضَعَ قَبْرِهِ اَىْ الْمَوْضَعَ الَّذِىْ قَبْرُهُ

فِيْهِ ﷺ وضم جسده الشَّرِيْف (اَفْضَلُ مِنْ) سَائِرِ (بِقَاعِ الْاَرْضِ) كُلِّهَا بَلْ هِىَ اَفْضَلُ مِنَ السَّمٰوَاتِ وَالْعَرْشِ وَالْكَعْبَةِ كَمَا نَقَلَهُ السُّبْكِىُّ رحمه الله تعالى لِشَرْفِهِ صلى الله عليه وسلم وَ عُلُوِّ قَدْرِهِ ....

وَقَالَ القرافى فِى الْقَوَاعِدِ لِلتَّفْضِيْلِ .... وَوَافَقَهُ السُّبْكِىُّ رحمة الله فَقَالَ الْاِجْمَاعَ عَلٰى اَنْ قَبْرَهُ صلى الله عليه وسلم اَفْضَلُ الْبِقَاعِ وَ هُوَ مُسْتَثْنٰى مِنْ تَفْضِيْلِ مَكَّةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ .... وَ قَالَ اِبْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اَلتَّفْضِيْلُ يَكُوْنُ لِاُمُوْرٍ غَيْرِ الْعَمَلِ فَقَبْرَهُ صلى الله عليه وسلم اَفْضَلُ الْاَمْكِنَةِ لِتَجَلِّى اللّٰهِ لَهُ بِمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَاحَاجَةَ اِلٰى مَا قِيْلَ اَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَىٌّ فِىْ قَبْرِهِ لَهُ اَعْمَالٌ فِيْهِ مُضَاعَفَةً ...... وَ هٰهُنَا بَحْثٌ وَهُوَ اَنَّ الْبُقْعَةَ الَّتِىْ ضَمَّتْ الْجَسَدَ الْعَظِيْمَ اِذَا كَانَ اَفْضَلَ مِنْ سَائِرِ الْبِقَاعِ يَلْزَمُ اَنْ يَكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ اَفْضَلَ مِنْ مَكَّةَ بِلَا نِزَاعٍ لِاَنَّ الْمَدِيْنَةَ هِىَ تِلْكَ الْبُقْعَةُ مَعَ زِيَادَةٍ ـ وَ زِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ عَلٰى هٰذَا بَلْ نَقُوْلُ الْمَدِيْنَةَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ ﷺ اِلَيْهَا وَاِقَامَتُهُ بِهَا تَفْضُلُ مَكَّةُ حِيْنَئِذٍ لِاَنَّ شَرْفَ الْمَكَانِ بِالْمَكِيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْرِيْرِ الْخِلَافِ حَتّٰى يُقَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيْلُ وَ فِىْ كَلَامِ شَيْخِنَا اِبْنِ قَاسِمٍ مَا يَقْتَضِىْ مَا تَقَدَّرُ اَنْ اَفْضَلَ الْبُقْعَةِ الَّتِىْ ضَمَّتْ اَعْضَائَهُ ﷺ ثَابِتٌ قَبْلَ دَفْنِهِ فِيْهَا وَقَبْلَ مَوْتِهِ بَلْ وَ قَبْلَ هِجْرَتِهِ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ تَفْضِيْلُهَا عَلَى الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ اِنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَ دَفْنِهِ فِيْهَا لِشَرْفِهَا بِهِ لَا قَبْلَهُ لِاَنَّهَا حِيْنَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا اِلَّا اَنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْكَعْبَةِ مُجَرَّدٌ فَلَا يَزِيْدُ عَلٰى بَقِيَّةِ اَجْزَائِهَا اِلَّا اَنْ يُقَالَ اَعْدَادُهَا لِدَفْنِهِ ﷺ فِيْهَا اِقْتَضٰى مَزِيَّتُهَا عَلٰى بَقِيَّةِ الْاَجْزَاءِ قَبْلَ دَفْنِهِ فِيْهَا اَيْضًا (نسيم الرياض شرح شفا لقاضى عياض) ص ٥٣٠ جـ ٣

pdf By Syed Mostafa Sakib

(وَلَا خِلَافَ) اَىْ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْاَمْصَارِ (اَنَّ مَوْضَعَ قَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم اَفْضَلُ بُقَاعِ الْاَرْضِ) اَىْ بِشَرْفِ قَدْرِهِ وَكَرْمِهِ عِنْدَ رَبِّهِ ـ

(شرح شفا لملا على القارى)

উক্ত মতামতের উপর হয়তঃ কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের দেহ শরীফ সম্পৃক্ত রওজা মোবারকের সে পবিত্র জমি মহান স্রষ্টা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পবিত্র আরশ থেকে কিভাবে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হতে পারে ?

উত্তরে বলতে হয় যে, নবী প্রেমিক আইম্মায়ে কেরামের উল্লেখিত মতামতটা শুনতে যদিও বেমানান মনে হয় কিন্তু রহস্যটা নিয়ে একটু ঈমানী দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করলে নিশ্চয় ইন্‌শাআল্লাহ্ তাআলা বুঝে আসার কথা।

পাঠক! আরশের ব্যাপারে সাধারণত ঃ অনেক মুসলমানের এ ধারণা রয়েছে যে, এ আরশই হচ্ছে মহান আল্লাহর অবস্থান ও উপবেশন করার স্থান [নাউজুবিল্লাহি মিনহা],

আর রাওজায়ে মুনাওয়ারা হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ)-এর অবস্থান করার স্থান।

এদের এ ধারণা মতে মহান খালেক ও মালিক আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অবস্থান ও উপবেশন করার স্থান আরশ-আল্লাহর সৃষ্টি ও উপাসক নবীর আসন -উপবেশনের স্থান তথা রওজা মোবারকের স্থানের চেয়ে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হতে হবে এবং এটাই যুক্তির দাবী, কারণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্য সর্বজনবিধিত।

পাঠক মন্ডলী!

উল্লেখিত ধারণা-বিশ্বাসটা যদি ও শ্রুতি মধুর মনে হয়, কিন্তু মূলত ঃ ইহা একটি ঈমানী ভুল ধারনাই বটে।

কারণ সঠিক ইসলামী ধারণা-বিশ্বাস হচ্ছে, মহান আল্লাহর পবিত্র জ্বাত-সত্বা মোটেই আমরা সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় কোন দেহ শরীর বিশিষ্ট সত্ত্বা নয়।

তাই মহান আল্লাহ সম্পর্কে বসা আসন পাতা, অবস্থান ও উপবেশন করার কোন ধারণাই কোন ঈমানদার করতে পারে না। কারণ ইহা শিরিকী ধারণা। আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআলা ঐ স্থান বড় হউক, ছোট হউক কোন নিদ্দিষ্ট স্থানে আসন পেতে বসা, অবস্থান করা কিংবা উপবেশন করার বিষয় ও গুণাগুণ থেকে সম্পূর্ণ পুতঃ পবিত্র ও মুক্ত।

মহান আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা, আর আরশ হচ্ছে সৃষ্টি এবং এ আরশ বিশাল আকৃতির সৃষ্ট বস্তু হলেও সৃষ্টি হিসাবে এর একটা সীমানা আছে, এমনিভাবে এর রয়েছে পরিধি, দৈর্ঘ, প্রস্থ ও চৌহাদ্দী, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরশ একটি সসীম বস্তু, অপরদিকে আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা আলার জ্বাত-সত্ত্বা হচ্ছে অসীম।

এ হিসেবে আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা আলার আরশ বলতে-সেখানে আল্লাহর পাক জাত উপবেশন করেন ও অবস্থান করেন বলে বিশ্বাস ধারণা করা হলে -এর দ্বারা মহান আল্লাহর অসীম সত্বা সসীম হয়ে পড়াটাকে লাজেম করে। (নাউজু বিল্লাহ্) এবং আল্লাহর মহান অসীম সত্বা কে সসীম অংশ বেষ্টন করে নেয় বলেই প্রমানিত হয়। যা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব, তদুপরি ইহা ইসলামের একমাত্র সত্যপন্থীদল আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদী উছুল তথা ঈমানের মূল (বিশ্বাস যোগ্য) নীতি সমূহের ও সম্পূর্ণ পরিপন্থী ধারনা-বিশ্বাস। তাই ইহা অবশ্যই সকলের জন্য পরিত্যাজ্য।

মহান আল্লাহর অসীম জ্বাত-সত্বা কে সসীম আরশ যে বেষ্টন করতে পারেনা, প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র মে'রাজে গমনকালে "আরশের স্বীকার উক্তিই" এর উৎকৃষ্ট প্রমান। আরশ আল্লাহর প্রিয়নবী (দঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিল, হে আল্লাহর হাবীব মুহাম্মদ (দঃ)! মানুষ যে বলে থাকে আমি আরশ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআলার মহান জাত-সত্ত্বাকে বহন করে থাকি এবং আমি আরশের মধ্যেই তিনি (আল্লাহ) সমহ'ন ও আমিই তাঁর তুলানাহীন মহান জাত সত্তাকে বেষ্টন করে আছি "এ একটি অসম্ভব ব্যাপার ও গোমরাহী" মূলক ধারণা বিশ্বাস বই আর কিছুই নয়।

✪ এ প্রসঙ্গে اَلْمَوَاهِبُ اللَّدُنِّيَّةُ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَلَمَّا انْتَهٰى اِلَى الْعَرْشِ تَمَسَّكَ الْعَرْشُ بِاَذْيَالِهِ وَنَادَاهُ بِلِسَانِ حَالِهِ ـ يَامُحَمَّدُ صلعم اَنْتَ فِىْ صَفَاءِ وَقْتِكَ اٰمِنًامِنْ مَقْتِكَ اُشْهِدُكَ جَمَالَ اَحَدِيَّتِهِ وَاَطَّلِعُكَ عَلٰى جَلَالِ صَمَدِيَّتِهِ وَاَنَا الظَّمْاٰنُ اِلَيْهِ اللَّهْفَانُ عَلَيْهِ الْمُتَحَيِّرُ فِيْهِ لَا اَدْرِىْ مِنْ اَىِّ وَجْهٍ اٰتِيْهِ جَعَلَنِىْ اَعْظَمَ خَلْقِهِ فَكُنْتُ اَعْظَمَهُمْ مِنْهُ هَيْبَةً وَاَكْثَرَهُمْ فِيْهِ حَيْرَةً وَاَشَدَّهُمْ مِنْهُ خَوْفًا ـ يَا مُحَمَّدُ خَلَقَنِىْ فَكُنْتُ اَرْعَدُ لِهَيْبَةِ جَلَالِهِ فَكُتِبَ عَلٰى قَائِمَتِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ فَازْدَدْتُ لِهَيْبَةِ اِسْمِهِ ارْتِعَادًا وَارْتِعَاشًا ـ فَكُتِبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَسَكَنَ لِذٰلِكَ قَلْقِىْ وَهَدَأَ رَوْعِىْ فَكَانَ اِسْمُكَ نُفَاحًا لِقَلْبِىْ وَطُمَانِيْنَةً لِسِرِّىْ فَهٰذِهٖ بَرَكَةُ كِتَابَةِ اِسْمِكَ عَلَىَّ فَكَيْفَ اِذَا وَقَعَ جَمِيْلُ نَظْرِكَ عَلَىَّ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ الْمُرْسَلُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ـ وَلَا بُدَّ لِىْ مِنْ نَصِيْبٍ مِنْ هٰذِهِ الرَّحْمَةِ وَنَصِيْبِىْ يَا حَبِيْبِىْ اَنْ تَشْهَدَ لِىْ بِالْبَرَاءَةِ مِمَّا نَسَبَهُ اَهْلُ الزُّوْرِ اِلَىَّ وَتَقَوَّلَهُ اَهْلُ الْغُرُوْرِ عَلَىَّ زَعَمُوْا اَنِّىْ اَسَعُ مَنْ لَا مِثْلَ لَهُ وَاُحِيْطُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِمَنْ لَا كَيْفِيَّةَ لَهُ يَامُحَمَّدُ ص مَنْ لَا حَدَّ لِذَاتِهِ وَلَا عَدَّ لِصِفَاتِهِ كَيْفَ يَكُوْنُ مُفْتَقِرًا اِلَيَّ وَمَحْمُوْلًا عَلَيَّ ؟ اِذَا كَانَ الرَّحْمٰنُ اِسْمُهُ وَالْاِسْتِوَاءُ صِفَتُهُ وَصِفَتُهُ مُتَّصِلَةٌ بِذَاتِهِ فَكَيْفَ يَتَّصِلُ بِيْ اَوْ يَنْفَصِلُ عَنِّيْ ؟

يَا مُحَمَّدُ وَعِزَّتِهِ لَسْتُ بِالْقَرِيْبِ مِنْهُ وَصْلًا وَلَا بِالْبَعِيْدِ عَنْهُ فَصْلًا وَلَا بِالْمَطِيْقِ لَهُ حَمْلًا اَوْجَدَنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً وَفَضْلًا وَلَوْ مَحَقَنِيْ لَكَانَ حَقًّا مِنْهُ وَعَدْلًا يَا مُحَمَّدُ ص اَنَا مَحْمُوْلُ قُدْرَتِهِ وَمَعْمُوْلُ حِكْمَتِهِ/المواهب اللدنيه للقسطلانى رح مع شرح الزرقانى جلد٦ صفحه ١٠٦

“আরশ মহান আল্লাহর অতি আশ্চর্য জনক, অদ্ভুত কারুকার্য মণ্ডিত, সুনিপুনতায় ভরপুর, সুন্দরতম এক বিশাল আকৃতির রহস্যময় সৃষ্টি।

এ আরশ কে মহান আল্লাহর আরশ (আসন) রূপে আখ্যায়িত করে কি বুঝাতে চেয়েছেন, তার সঠিক তত্ত্ব ও রহস্য একমাত্র মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক এবং তাঁর মহান রাছূল (দঃ) ই ভাল জানেন।

✪ উপমা স্বরূপ বলা যায় কাবা শরীফ ও বিশ্বের অন্যান্য মছজিদ সমূহকে “আল্লাহর ঘর” বলা হয়। সাধারণত: ঘর বলতে প্রত্যেকের বসবাসের স্থানকেই বুঝায়, অথচ আল্লাহর ঘর বলতে মহান আল্লাহর বসবাসের স্থান রূপে কোন মুসলমানই ধারণা পোষন করেন না। কারণ মহান আল্লাহর জাত-সত্ত্বা স্থান, কাল-পাত্রের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। অতএব, যেমনি ভাবে মসজিদ সমূহ মহান আল্লাহর বসবাস থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা এসব কে আল্লাহর ঘর বলে থাকি। অনুরূপ আরশ ও আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআলার উপবেশণ থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একে আল্লাহর আরশ (আসন) বলা হয়।

✪ যেমনি ভাবে মহা কৌশলী-শিল্পী আল্লাহ তার সর্ব আদি, সর্বাধিক প্রিয়, সৃষ্টির সেরা, নবী আকরম (দঃ) কে “নূরুল্লাহ (আল্লাহরনূর) এবং হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর শ্রেষ্টতম প্রেমাস্পদ) বলে কি বুঝাতে চেয়েছেন, তা একমাত্র আল্লাহ পাক এবং তাঁর মহান রাছূলই ভাল জানেন। কত জ্ঞানী-গুণী আশেক-প্রেমিক অনুসন্ধানী মহামনীষী-গণ যুগ যুগ ধরে চিন্তা গবেষণা করে হাকীকাতে মুহাম্মাদীয়া (দঃ) এর তত্ত্ব ও রহস্য উদঘাটন সাধনায় নিজেদের মূল্যবান জীবন কে উৎসর্গ করে দিয়েছেন তার কোন শুমার নাই।

কিন্তু কোন গবেষক মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, ফাকীহ, মাআরফতে ইলাহিয়ার মহান ইমাম অনুসন্ধানী একথা বলে যেতে পারেননি যে, আমি হাকীকাতে মুহাম্মাদীয়া(দঃ) এর তত্ত্ব ও রহস্য পরিপূর্ণ ভাবে উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি।

সহজ ভাবে আমাদের এটাই বিশ্বাস করতে হবে যে, আরশ মুয়াল্লা মহান আল্লাহর এক রহস্যময় সৃষ্টি। তার আরশ সম্পর্কে তিনি এবং তাঁর প্রিয় রাছূল (দঃ)ই অবগত রয়েছেন এবং এ আরশ বিপুল ইজ্জত সম্মানের অধিকারী।

অনুরূপ ভাবে আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের হাকীকাতকেই সৃষ্টির সূচনাতে নিজের নূর মোবারক হতে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং এ নূর মোবারক দ্বারাই পরবর্তীতে মহান আল্লাহ আরশ, কুরছী, লাওহ, কলম, আছমান-জমিন, দোজখ-বেহেস্ত, ফেরেস্তা ও মানব-দানব তথা সব কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন এবং ইসলামী বিশ্বের সকল যুগের সকল আইম্মায়ে হক্কানীগণ এব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর পরে আল্লাহর এ বিশাল সৃষ্টি রাজ্যের মধ্যে আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামই সব চাইতে অধিক সম্মানী এবং ইজ্জত ও ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র, এ ভিত্তিতে আরশের চাইতে ও আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূরানী সত্ত্বা আফ্‌জল তথা অধিক শ্রেষ্ঠ হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মহান আল্লাহ প্রিয় নবী (দঃ)-কে বলেছেন “হাবীবুল্লাহ” (আল্লাহর প্রেমাস্পদ, প্রিয়তম বন্ধু) আর আরশ সম্পর্কে বলা হয়েছে “আরশুল্লাহ” আল্লাহর আসন, কারো নিকট আসনের মূল্যবেশী হয়ে থাকে নাকি বন্ধু (প্রেমাস্পদ) এর মূল্য ও সম্মানই বেশী হয়ে থাকে তা নিজেদের ঈমানী বিবেক দ্বারাই সাব্যস্থ করে নিবেন আশা করি।

কোন স্থান বা গৃহ শরয়ী মাছজিদ রূপে গণ্য হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া শর্ত।

✪ ওয়াক্‌ফকারী তার নিজস্ব মালিকানাধীন কোন সুনিদিষ্ট জায়গার ব্যাপারে جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا (لِلّٰهِ تَعَالٰى) (এইস্থান কে আমি (আল্লাহর) মাছজিদ ঘোষণা করলাম) বাক্য দ্বারা ওয়াক্‌ফ করে দিলেন, অতঃপর তার অনুমতি সাপেক্ষে “ইজ্‌নে আম” তথা এবাদতের জন্য মুসলিম সর্ব সাধারণের প্রবেশাধিকার প্রদানের সাথে উক্ত জায়গায় জমাত সহকারে পাঞ্জেগানা নামায ও জুমা আদায় করা হলে, শরীয়াতের বিধান মতে উহা চিরকালের জন্য মাছজিদে পরিণত হয়ে যায়। কেয়ামত পর্যন্ত ঐ স্থান মাছজিদ রূপেই থাকবে, একে আর অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করা যাবেনা।

এভাবে কালের আবর্তে কোন সময় কোন মাছজিদ নষ্ট ও অনাবাদী হয়ে খালী জায়গায় পরিণত হয়ে পড়লেও উক্ত জায়গায় মাছজিদ নির্মাণ ছাড়া পার্থিব কোন কাজে তা ব্যবহার করা যাবেনা বরং ঘেরাও দিয়ে একে সংরক্ষিত পবিত্র স্থান হিসাবে রেখে দিতে হবে।

✪ কোন মাছজিদ যদি ভেঙ্গেঁ যাওয়া ও অনাবাদী হয়ে পড়ার কারণে নামায আদায় করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে অথবা অত্র এলাকা মুসলিম জনশূন্য হয়ে যাওয়ার কারণে মাছজিদের আবশ্যকতা না থাকে তথাপিও ঐ মাসজিদ কেয়ামত পর্যন্ত মাসজিদ রূপেই থেকে যাবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হবেনা(বাহরুর রায়েক, শামী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ ভাবে তথায় কোন লোকের বসতি না থাকলে যদ্দারা ভবিষ্যতে ঐ মাছজিদ আবাদ হতে পারে তবুও অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে ঐ অবস্থায় ও উক্ত মাছজিদের আসবাব পত্র স্থানান্তরিত করা জায়েজ নাই বরং মাসজিদ খানা পুনরায় আবাদ করে নেওয়ার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া স্থানীয় মুসলিমদের জন্য একান্ত ফরয (বাহরুর রায়েক্)।

✪ হযরত ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ)-এর মতে ওয়াকফের ব্যাপারে মৌখিক ঘোষনাই যথেষ্ট অর্থাৎ মৌখিক ওয়াক্‌ফ ঘোষনার দ্বারা ওয়াক্‌ফ কারীর মালীকানা রহিত হয়ে মহান আল্লাহর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। ঐ ওয়াক্‌ফ কৃত জায়গা ইত্যাদি মুতাওয়াল্লীর পক্ষ থেকে হস্তান্তর করা শর্ত নয়।

আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে মৌখিক ঘোষনার সাথে সাথে হস্তান্তর করে দেওয়া এবং হস্তগত করা শর্ত, তাই মৌখিক ঘোষণার সাথে জমাত সহকারে নামাজ আদায় করাটা ও পাওয়া যেতে হবে, তখনই সেটা মাছজিদে রূপান্তরিত হয়ে পড়বে।[১]

✪ কোন লোক যদি এভাবে মাছজিদ নির্মাণ করে থাকে যার ভূগর্ভস্থ তলা অথবা তার উপরে নির্মিত ঘর নিজের (ব্যবহারের) জন্য রেখে দেয় এবং মাছজিদের দরজা রাস্তার দিকে করে দেয় ও স্বীয় মালিকানা থেকে মাছজিদের অংশটুকু পৃথক করে দেয় তবুও তা মাসজিদ হিসাবে পরিগণিত হবে না কিন্তু যদি নীচের তলা নিজের জন্য নয়; বরং মাছজিদের প্রয়োজনে নির্মাণ করা হয়। তাহলে নীচ তলা এবং উপর তলাসহ সমস্ত স্থান-ই মাছজিদে পরিগণিত হয়ে যাবে (হিদায়া)।

✪ কোন মাছজিদের নীচ তলায় যদি দোকান ইত্যাদি করা হয়, আর উক্ত দোকান গুলো মাছজিদের জনই ওয়াক্‌ফকৃত হয় এবং এ দোকান গুলোর আয় সমূহ মাছজিদের কাজেই ব্যয় করা হয়, তখনই শুধু উপরের তলায় মাছজিদ ও নীচের তলায় দোকান করা জায়েজ রয়েছে। (আদাবুল মাছাজিদ)

✪ মাছজিদেরই প্রয়োজনে ইমাম মুয়াজ্জিনের বাসস্থান মাছজিদের উপরে বা পার্শ্বে নির্মাণ করা জায়েজ।

টীকা ঃ

اِخْتَلَفَ فِىْ شَرَائِطِ صَيْرُوْرَةِ الْمَكَانِ مَسْجِدًا ـ فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح يَكْفِىْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهٖ جَعَلْتُهٗ مَسْجِدًا لِاَنَّ التَّسْلِيْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلُزُوْمِ الْوَقْفِ عِنْدَهٗ وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح لَا بُدَّ مِنْ اَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ بِجَمَاعَةٍ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ يَكْفِىْ صَلٰوةُ وَاحِدٍ (شرح وقاية) اَنَّ الصَّلٰوةَ فِىْ الْمَسْجِدِ وَالدَّفْنَ فِى الْمَقْبَرَةِ تَسْلِيْمٌ فَاِنَّ تَسْلِيْمَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهٖ (حاشية شرح وقاية)

✪ স্মরণাতীত কাল থেকে কোন একটা জায়গায় জুমা-জমাত চলতে থাকলে উক্ত জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত হওয়ার ব্যাপারে স্বাক্ষ্য প্রমানের অস্তিত্ব না থাকলেও কিংবা রেজিষ্ট্রার্ড দলিল ও কাগজ পত্রাদি পাওয়া না গেলেও তা ওয়াক্‌ফকৃত বলেই বিবেচিত হবে।

✪ মাছজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত কোন নির্মাণ সামগ্রী, আসবাবপত্র, কার্পেট, জায় নামায, চাটাই, মাদুরা, মাইক, বাতি ও অন্যান্য সামগ্রীর উপর কারো ব্যক্তিগত অধিকার থাকেনা বরং সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলারই হয়ে যায়।

একারণে এসব কিছু মাছজিদের বাইরে নিয়ে গিয়ে অন্য কোন সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত এমনকি ধর্মীয় কাজে হউক তাতে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম।

তবে মাছজিদের খরচাদী নির্বাহ করার জন্য ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে খরিদকৃত বা নির্ধারিত আসবাব পত্র বা অন্য সামগ্রী ভাড়ায় দেওয়া জায়েজ।

✪ মাছজিদে ব্যবহৃত ইট, সুরকী, টিন বা কাঠ ইত্যাদি অতি পবিত্র রূপে গণ্য। তাই পুরাতন কোন মাছজিদে ব্যবহৃত এসব আসবাব সামগ্রী মাছজিদেরই কোন কাজে পাক জায়গাতে লাগানো উচিৎ, যদি একান্ত প্রয়োজনে বিক্রি করা লাগে তাহলে ক্রেতাকে জানিয়ে দিতে হবে যে, এসব আসবাব পত্র কোন নাপাক জায়গায় বা কাজে যেন ব্যবহার করা না হয় বা লাগানো না হয়। অন্যথায় সবাই গুনাহগার হবে।

✪ মাছজিদের সাধারণ ঝাড়ু দেওয়া ধূলা বালি পবিত্রই বটে, প্রত্যহ পরিষ্কারের পর এগুলোকে কোন পাক জায়গায় ফেলা উচিৎ, নাপাক জায়গায় ফেলা উচিৎ নয়, তবে সুনির্দিষ্ট ভাবে নাপাকী লাগতে দেখলে ভিন্ন কথা।

✪ যে কোন মাছজিদের মওজুদ অর্থ ও সম্পদ সমূহ সে মাছজিদের প্রয়োজনেই ব্যয় করা জরুরী, অন্যকোন স্থানের জন্য এমনকি অন্য কোন মাছজিদের জন্য ও ব্যয়করা নাজায়েজ, কেউ যদি ব্যয় করে বসে এজন্য ঐলোকই দায়ী এবং গুনাহগার হবে। কেননা এক ওয়াক্‌ফের টাকা-পয়সা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অন্য ওয়াক্‌ফের জন্য, এক মাছজিদের টাকা পয়সা ও সম্পদ অন্য মাছজিদের জন্য ব্যয় করা নাজায়েজ।

✪ কোন মাছজিদের ওয়াক্‌ফ ফান্ডে যদি বিপুল অর্থ সম্পদ জমা থাকে যা সেই মাছজিদের জন্য বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবেনা বলে প্রবল বিশ্বাস হয়। আর এ অর্থ সম্পদ ব্যয় না করলে তা অপচয় কিংবা অবৈধ দখলে চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় শুধু মাত্র তখনই ওয়াক্‌ফ কর্তৃপক্ষ কিংবা সরকারী প্রশাসনিক প্রধানের ফয়সালা অনুমতি ক্রমে নিকটতম অন্য কোন মাছজিদের প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা জায়িজ হবে (আলমগীরী)।

✪ মাসজিদের নগদ অর্থ প্রত্যেকের জন্য আমানত স্বরূপ। সুতরাং ঐ অর্থ দ্বারা কোন প্রকারের ব্যবসা বাণিজ্য করা নাজায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ মাছজিদের আসবাব পত্র অন্য কাউকেও ব্যবহারের জন্য ধার হিসাবে দেওয়া জায়েজ নাই। দিলে গুনাহ্গার হবে।

✪ দুনিয়ার মাছজিদ সমূহ হচ্ছে নিলিখ বিশ্বের মহীয়ান গরীয়ান স্রষ্টা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর আলীশান দরবার। এ মহান দরবারের সঠিক মর্যাদা বোধ আমাদের সকলের অন্তরে যথাযতভাবে থাকাটা আবশ্যক।

তাই এতে প্রবেশের ব্যাপারে কিছু আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকারঃ

✪ যখনই নামায আদায় কিংবা অন্য কোন এবাদত অথবা দ্বীনী কাজে কোন মাছজিদে প্রবেশের এরাদা করা হয় তখন গোছলের প্রয়োজন হলে গোছল করে নিতে হয়। কারণ জুনুবী তথা গোছল ফরয হওয়া অবস্থায় গোছল না করে মাছজিদে প্রবেশ করা হারাম।

✪ ওযু না থাকলে ওযু করে নিতে হয়। অতঃপর পাক পরিষ্কার পোশাক পরে সম্ভবমত আতর-সুগন্ধী লাগিয়ে ধীরস্থীর, নম্র ও ভক্তি ভরা গতিতেই মাছজিদের দিকে যেতে হয়।

✪ মাছজিদের দিকে যাওয়ার কালে যত কদম বেশী পড়বে ততই লাভ, কারণ প্রতিটি কদম-পদক্ষেপের বিনিময়ে দশটি করে ছাওয়াব পূণ্য লেখা হয়।

আল্লাহর প্রিয় রাছূল (দঃ) এর বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত যায়েদ বিন্ ছাবেত (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর নবী(দঃ) এর সাথে নামায আদায় উদ্দেশ্যে মাছজিদে গমণ করতাম। (আমি দেখেছি) পথ চলাকালে প্রিয় নবী (দঃ) ধীরে ধীরে চলতেন।

অপর এক হাদীছ শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবু উমামা (রাঃ) অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) কে বললেন, আমি মাছজিদে যাওয়ার বেলায় কেন ছোট ছোট কদম দিয়ে চলি তা-কি তোমরা লক্ষ্য করেছ?

এর কারণ হচ্ছে এ যে, বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের সন্ধানে ও নামাযের প্রস্তুতির মধ্যে মশগুল থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে নামায রত হিসাবে গণ্য করা হয় (তিবরানী)।

✪ অতঃপর মাছজিদের দরজায় পৌছলে হাদীছ শরীফে বর্ণিত নিম্নের দোয়া খানা-

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ/ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ বিছমিল্লাহি ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাছূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী জুনুবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আব্‌ওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।

পাঠ করতঃ প্রথমে ডান পা দিয়ে মাছজিদ তথা আল্লাহর শাহী দরবারে প্রবেশ করা ছুন্নাত।

✪ মাছজিদ থেকে বের হওয়া কালে নিম্নের দোয়া খানা

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ/ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ۔

উচ্চারণঃ- বিছমিল্লাহি ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাছূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জুনূবী ওয়াফ্ তাহ্‌লী আবওয়াবা ফাদ্‌লিকা পাঠ করত ঃ প্রথমে বাম পা দিয়ে মাছজিদ থেকে বের হওয়া ছুন্নাত।[১]

✪ অন্য এক হাদিছ শরীফে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কোন লোক মাছজিদে প্রবেশ করে তখন তাকে এ দোয়া খানা পাঠ করতে হয় ঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিকা)
আর যখন মাছজিদ থেকে বের হয় তখন তাকে এ দোয়াখানা পাঠ করতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (رواه مسلم)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকা মিন ফাদ্‌লিকা)

০ অপর একটি হাদীছে পাকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল (দঃ) মাছজিদে প্রবেশ করার মুহূর্তে এ দোয়া খানা পাঠ করতেন ঃ-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

আউজু বিল্লাহিল আজীম বিওয়াজ্‌হিহিল্ কারীম ওয়া ছুল্‌তানিহিল কাদীমি মিনাশ্ শায় তানির রাজীমি।

অতঃপর প্রিয় নবী (দঃ) বলেন, যখন কোন লোক এ দোয়াখানা পাঠ করে নেয়, তখন শয়তান বলে থাকে যে, এলোক আমার থেকে সারা দিনের জন্য নিজেকে রক্ষা করে নিল। (আবু দাউদ)।

টীকা ঃ

كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا قَالَتْ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَذَا اِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ بَدَلَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ۔ (مشكوة شريف)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ মাছজিদে প্রবেশ করার পর ফজর ও মাগরিবের ওয়াক্ত না হয়ে অন্য কোন ওয়াক্ত হলে প্রথমে দু'রাকাত "তাহিয়্যাতুল মাছজিদের' নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব। ফজর ও মাগরিবের আগে নফল নামায আদায় করা যাবেনা। এর পরই যথানিয়মে ওয়াক্তিয়া নামায বা অন্য কোন এবাদত কিংবা দ্বীনী কাজ আদায় করে যেতে হয়।

✪ মাছজিদে বসা থাকা অবস্থায় তাছবীহ্-তাহলীল, জিকির-আজকার ও দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে যাওয়াই উত্তম। এতে বিপুল ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

✪ মাছজিদে বসে দুনিয়াবী কোন কথাবার্তা বলা ও আলাপ-আলোচনা করা নিষেধ।

✪ পবিত্র হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

মাছজিদে বসে দুনিয়াবী আলাপ আলোচনা এবাদতের ছাওয়াব কে এ ভাবে নষ্ট করে দেয় যেভাবে আগুন-কাঠকে জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেয় (ফাত্হুল কাদীর)।

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

যে ব্যক্তি মাছজিদে বসে পার্থিব আলাপ আলোচনায় লিপ্ত হয় তার চল্লিশ দিনের নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। (আল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের)

◆ **মাছজিদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ঃ**

✪ মাছজিদ সমূহ হচ্ছে এ দুনিয়ায় মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ জাল্লা শানুহূর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল ও পবিত্রতম দরবার। এ গুরুত্বকে উপলব্ধি করত ঃ মাছজিদ কে অন্তর দিয়ে ভাল বাসা, সর্বাধিক পর্য্যায়ে একে ইজ্জত কদর করা, মাছজিদের আভ্যন্তরীন ও আশ পাশের বাহ্যিক পরিবেশ কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মাছজিদের সার্বিক রক্ষণা বেক্ষণের ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্ট থাকাটা প্রতিটি মো'মেনের ঈমানী দায়িত্ব।

✪ একারণে আল্লাহর মহান রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর দরবার-এ মাছজিদ সমূহ কে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ও তাতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহারের নির্দেশ দান করে গেছেন।

✪ হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা(রাঃ) বলেন ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَاَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ (رواه احمد)

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) আমাদের কে মহল্লায় মহল্লায় মাছজিদ প্রতিষ্ঠার আদেশ দান করেছেন এবং মাছজিদ সমূহ কে পরিষ্কার ও সুগন্ধময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূরানী হাতেই মাঝে মধ্যে মাছজিদ পরিষ্কার করতেন।

হযরত এয়াকুব ইবনে জায়েদ (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম (দঃ) খেজুর বৃক্ষের ডাল দ্বারা নিজ হাতে মাছজিদের ধূলা বালি পরিষ্কার করতেন। (মুছান্নফে ইবনে আবী শায়বা)

✪ একদা ফারুকে আজম (রঃ) মদীনা মুনাওয়ারার "কোবা' পল্লীতে অবস্থিত মাছজিদে ঘোড়ায় চড়ে গমন করলেন এবং প্রবেশ করা মাত্র তিনি "এয়ারকা' নামক এক ব্যক্তিকে বললেন আমাকে একটি খোরমা গাছের ডাল এনে দাও, এয়ারকা একটি ডাল এনে দিলে তিনি কোমর বেধেই মাছজিদে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করলেন। মাছজিদ পরিষ্কার করা কত অধিক পুণ্যের কাজ এতেই বুঝে নেওয়া যায়।

✪ কাঁচা পিয়াজ, রসুন, মূলা ইত্যাদি খেয়ে মুখ পরিষ্কার না করে আল্লাহর ঘর মাছজিদে আসা মাকরূহ। অনুরূপ ভাবে বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, চুরুট ও গাজা ইত্যাদি পান করতঃ মুখ পরিষ্কার না করে অর্থাৎ মুখের যে কোন দুর্গন্ধ পরিষ্কার না করে মাছজিদে আসা মাকরূহ। কারণ এতে মাছজিদে অবস্থানরত রহমতের ফেরেস্তাদের কষ্ট হয়।

✪ অনুরূপ ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় পোশাক পরে মাছজিদে আসাটাও মাকরূহ।

✪ যার শরীর কিংবা পোশাকে নাপাকী রয়েছে এমন ধরনের লোক উক্ত নাপাকী অবস্থায় মাছজিদে গমন করা হারাম।

এমনকি জুতা সেন্ডেলে লাগা নাপাকী ময়লা কে ধূয়ে মুছে পাক, পরিষ্কার না করে মাছজিদে নিয়ে যাওয়া হারাম।

✪ দুর্গন্ধময় তৈল দ্বারা মাছজিদে বাতি জ্বালানো মাকরূহ। তাই অনেক অনেক ফোকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কেরসিন তৈল দ্বারা হারিকেন ল্যাম্প ও চেরাগ বাতি জ্বালানোর ব্যাপারেও আপত্তি রয়েছে।

মাছজিদের বাহিরে জুতা-সেন্ডেল রাখার জন্য যদি কোন নিরাপদ ব্যবস্থা থাকে তা হলে সেখাইনেই জুতা সেন্ডেল রাখতে হবে। জুতা সেন্ডেল মাছজিদে ঢুকাতে নেই। কিন্তু মাছজিদের বাইরে যদি জুতা-সেন্ডেল রাখার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে জুতা-সেন্ডেলে কোন ভিজা মারাত্মক নাপাকী ময়লা লেগে থাকলে তা ধূয়ে নিয়েই মাছজিদে ঢুকাতে হবে। আর যদি কোন মারাত্মক নাপাকী ময়লা না থাকে তা হলে জুতা সেন্ডেলের ধূলা বালি ভাল করে ঝেড়ে উভয় জুতা সেন্ডেলের তলায় তলায় মিলিয়েই মাছজিদে ঢুকাতে হয়।

✪ মাছজিদে জুতা সেন্ডেল রাখার ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরাম দুটি পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন ঃ প্রথমতঃ জুতা এমনিভাবে রাখতে হয় যাতে নিজের কিংবা অন্য কোন নামাযীর সিজদা করার সামনে না পড়ে।

একটি হাদীছ শরীফের মর্মে জানা যায় যে, জুতা দু'পায়ের মাঝখানেই রাখবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে জুতা নিজের সামনে (কাপড় বদ্ধ করেই) রাখতে হবে।[১]

মাছজিদের আভ্যন্তরে ওযুকরা, কুলিকরা নাজায়েজ, যদিও ব্যবহৃত পানি কোন পাত্রে জমা রাখা হয়।

✪ মাছজিদে কফ-থুথু ইত্যাদি ফেলা হারাম। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কফ থুথু ফেলার জন্য পিকদান বা অন্য কোন পাত্র ঢাক্‌না দিয়ে রেখে তাতে কফ থুথু ফেলা জায়েজ। অথবা পৃথক রুমাল কিংবা কাপড় খণ্ডে বা টয়লেট পেপারে কফ-থুথু জড়িয়ে নেওয়া জায়েজ।

পাগল, মস্তিষ্ক বিকৃত লোকদের কে মাছজিদে ঢুকতে দিতে নাই, অবুঝ শিশুদের কেও মাছজিদে ঢুকাতে হলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ কারণ এরা মাছজিদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারবেনা।

✪ স্বর উচ্চ করা তথা অত্যাধিক বড় আওয়াজে মাছজিদে কথা বার্তা বলা এবং মাছজিদে যে কোন প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ করা হারাম।

✪ শরীয়াতে অপরাধী সাব্যস্থ কোন অপরাধীর শরয়ী শাস্তি মাছজিদে প্রয়োগ করা কিংবা সাধারণ অপরাধীদের বিচার শাস্তি কার্যকর করা, খোলা তরবারী নিয়ে, অথবা আধুনিক অস্ত্র সমূহ ও দা-ছোরা নিয়ে মাছজিদে অস্ত্র বাজী করা সম্পূর্ণ হারাম।[২]

টীকা ঃ

(১) اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُوْنَ عَنْ عَيْنِ غَيْرِهِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى يَسَارِ اَحَدِكُمْ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ـ

(رواه ابو داؤد عن ابى هريرة رض)

وَيَجُوْزُ اَنْ يَحْمِلَ نَعْلَهُ فِى الصَّلٰوةِ اِنْ خَافَ ضَاعَهُ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ مَانِعَةٌ ـ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَضَعَ نَعْلَهُ فِى الصَّلٰوةِ قُدَّامَهُ لِئَلَّا يَشْغَلَ قَلْبَهُ بِهِ ـ

(شرح منيه)

(২) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ وَاتَّخِذُوْا عَلٰى اَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَ حمروا فِى الْجُمَعِ رواه عبد الرزاق (شرح منيه)

জানাযার সাথে যাওয়ার সময় কলেমায়ে তাইয়েবা কিংবা অন্যান্য জিকির ইত্যাদি মধ্যম স্বরে করে যাওয়া জায়েজ তবে, বেশী চিল্লা চিল্লি ও হায় হোল্লাহ করা ঠিক নয়।

সঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে অত্যাধিক বড় আওয়াজে নয় বরং মৃদস্বরে জানাযার সাথে গমণকারীদের কলেমায়ে শাহাদৎ পাঠ করে যাওয়া, ছুরা এয়াছীন শরীফ পাঠ করা কিংবা অন্যান্য কলেমা ও জিকির দোয়া পাঠ করে যাওয়া শরীয়াত মতে জায়েজ

চট্টগ্রামের ছুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নিম্নের জিকির খানাই বেশী পাঠ করা হয় ঃ اَللّٰهُ رَبِّىْ وَمُحَمَّدٌ نَبِيِّىْ (আল্লাহু রাব্বী– মুহাম্মাদুন্ নবীয়্যী)

এটা মূলতঃ মৃত লোকের কবরের (হাদীছ শরীফে উল্লেখিত) ছাওয়ালের জবাবই বটে, ইহা পাঠের দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের প্রশ্নের জবাবই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। ফলাফলে কল্যাণ ছাড়া ক্ষতি নাই।

সুতরাং ইহা নাজায়েজ হওয়ার কোন দলীল ও কারণ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জানাযার নামায আদায়ের মাছায়েল

মুছলমান মৃত ব্যক্তিকে গোছল দেওয়ার পর কাফন পরিয়ে তার জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে যে নামায পড়া হয় শরীয়াতের পরিভাষায় একে "ছালাতুল্ জানাযাহ্" তথা জানাযার নামায বলা হয়।

✪ জানাযার নামায ফরযে কিফায়াহ। আত্মীয় স্বজন বা মহল্লার যে কোন একজন **লোকও যদি ইহা আদায় করে দেয় তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং বাকী সবাই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবেন। আর যদি কেউ ইহা আদায় না করেন তাহলে সবাই গুনাহ্‌গার হবেন (শামী, আলমগীরী, তাহ্‌তাবী)।**

✪ **স্মরণ রাখা উচিত যে, এ ফরযে কেফায়াহকে কেউ অস্বীকার করলে বা এটাকে** তুচ্ছ জ্ঞান করলে সে কাফের হয়ে যাবে (বদায়ে, তাহ্‌তাবী)। আরও স্মরণ রাখা দরকার যে, এক মুছলমানের উপর অপর মুছলমান ভায়ের (আল্লাহ-রাছূল কর্তৃক নির্ধারিত করে দেওয়া) যে কয়েকটি বিশেষ হক রয়েছে তন্মধ্যে মৃত মুছলমানের জানাযার নামাযে শরিক হওয়াটা একটি প্রধান হক (দাবী)।

✪ এর ফযীলতে আল্লাহর প্রিয় নবী (স) এরশাদ করেন ঃ

যে ব্যক্তি কোন মৃত মুছলমানের জানাযার নামাযে শরিক হয়, সে এক "কীরাত" তথা ওহুদ পাহাড়ের সমান অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ ছাওয়াবের অধিকারী হয়, আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করতঃ লাশের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত গমন করতঃ দাফন কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করে সে দু'কীরাত পরিমাণ ছাওয়াব পায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারলে সকলেরই উহাতে শরিক হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

✪ অন্যান্য নামায ছহী শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে সব শর্তাবলী পালন করা আবশ্যক জানাযার নামায আদায় করার বেলায় ও এসব শর্তাবলী পালন করা আবশ্যক। তবে দু'টি মাত্র বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে ঃ-

(ক) অন্যান্য নামাযের জামাত চলে যাওয়ার আশংকা থাকলেও তায়াম্মুম করে নামাযের জমাতে শরিক হওয়া যায় না বরং ওযু করেই শরিক হতে হয়। কিন্তু জানাযার নামাযের জামাত না পাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তায়াম্মুম করতঃ জানাযায় শরিক হওয়া যায় এবং (খ) লাশ সামনে উপস্থিত থাকা।

ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্যে নয়টি শর্ত রয়েছে ঃ

১। মৃত লোক এবং জানাযার নামায আদায়কারী উভয়েই মুছলমান হওয়া আবশ্যক।

২। শরীর পাক হওয়া ঃ মুরদার এবং নামায আদায়কারী উভয়ের শরীর পাক পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক (বাহরুর রায়েক, আলমগীরী)।

৩। মৃত লোকের কাফন ও নামায আদায়কারীর পোষাক পাক পরিষ্কার হওয়া শর্ত। বাহির থেকে এক দেরহাম পরিমাণ নাপাকী মুরদারের কাফনে লাগলে তখন ঐ কাফন সহকারে মৃতলোকের জানাযার নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। কিন্তু ঐ পরিমাণ নাপাকী মৃত লোকের নিজ শরীর থেকে বের হয়ে কাফনে লাগলে তখন ঐ অবস্থায়ও জানাযার নামায আদায় করা জায়েয। (বাহরুর রায়েক, দোররুল মোখতার)

৪। মুরদার রাখার জায়গা এবং জানাযার নামায আদায়কারী মুছাল্লির দাঁড়াবার জায়গা পাক-পবিত্র হওয়া শর্ত। মৃতের লাশ যদি খাটের উপর থাকে তাহলে খাটের নিচের জমি নাপাক হলেও চলে। মুরদারের খাট রাখার জন্য পাক স্থানের অভাবে এরূপ রাখাতে অসুবিধা নাই। কিন্তু পাক-পবিত্র স্থান থাকা সত্ত্বেও এরূপ নাপাক জায়গায় লাশের খাট রাখা উচিত নয়। (বাহরুর রায়েক, শামী, তাহতাবী)

৫। জানাযার নামায আদায়কারী মুছাল্লী এবং মুরদারের ছতর ঢাকা থাকা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত (বাহরুর রায়েক, জামেউর রুমুজ)।

৬। মৃত লোকের লাশ জানাযার নামায আদায়ের সময় সকলের সম্মুখে হাজির থাকা শর্ত। জমিনে হউক কিংবা খাট ইত্যাদির উপর হউক ইমামের বরাবর সম্মুখে কেবলার দিকে লাশকে রাখতে হয়। লাশ ডানে বামে বা পিছনে থাকলে নামায শুদ্ধ হয় না। এছাড়া ইমাম ও মৃত দেহের মাঝখানে কোন আড়াল থাকতে পারবে না। আড়াল থাকলে তখন ঐ মৃতলোকের জানাযার নামায শুদ্ধ হবে না। তদুপরি কোন

গাড়ী অথবা যান বাহনের উপর লাশ রেখে জানাযার নামায আদায় করা শুদ্ধ নয়। (দুররে মোখতার, বাহরুর রায়েক)

৭। যিনি জানাযা নামাযের ইমামতি করবেন তার বালেগ হওয়া শর্ত। নাবালেগ ছেলে ইমামতী করার অযোগ্য (দুররে মোখতার)।

৮। ইমামের কেব্‌লামুখী হয়ে মৃত ব্যক্তির ঠিক সিনা বরাবর দাঁড়ানো শর্ত (জামেউর রুমুজ)

৯। জানাযার নামায আদায় করার জন্য নিয়্যত করা শর্ত। নিয়্যত একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে করতে হয়। (জামেউর রুমুজ)।

✪ এ ক্ষেত্রে এও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, জানাযার নামায আদায়ের জন্য জমাত শর্ত নয়। (আলমগীরী)

✪ যে কোন একজন লোকই জানাযার নামায আদায় করে দিলে আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু অধিক সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে জামাত সহকারে জানাযার নামায আদায় করতঃ মহান আল্লাহর দরবারে মৃত মুসলমান ভায়ের জন্য দোয়া করা উত্তম, উহা শীঘ্রই কবুল হয়ে থাকে।

জানাযার নামায আদায় করার স্থান

খোলা ময়দানে, চাষাবাদের বড় বিলে, বাড়ী-ঘরের আঙ্গিনায় কিংবা যে স্থানকে জানাযার নামায আদায়ের জন্য র্নিধারিত রাখা হয়েছে তথায় জানাযার নামায আদায় করা যায়।

✪ অপরের মালিকানাধীন জমিতে-ময়দানে মালিকের বিনা অনুমতিতে জানাযার নামায আদায় করা মাকরূহ।

✪ মাসজিদে জানাযার নামায আদায় প্রসঙ্গ ঃ

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ تُقَامُ فِيْهِ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوْهَةٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ وَالْقَوْمُ فِىْ الْمَسْجِدِ اَوْ كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالْقَوْمُ فِىْ الْمَسْجِدِ اَوْكَانَ الْاِمَامُ مَعَ بَعْضِ الْقَوْمِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالْقَوْمُ الْبَاقِىْ فِىْ الْمَسْجِدِ اَوْ الْمَيِّتُ فِىْ الْمَسْجِدِ وَالْاِمَامُ وَالْقَوْمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِى الْخُلَاصَةِ

অনুরূপভাবে "রাহরুর রায়েক" ফতোওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

(قَوْلُهُ وَلَا فِى الْمَسْجِدِ) لِحَدِيْثِ اَبِىْ دَاؤُدَ مرفوعًا مَنْ صَلَّى عَلٰى

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَيِّتٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا اَجْرَ لَهُ وفى رواية فلا شئَ له اطلقه فشمل ماذا كان الميت الخ . . . .

উভয় উদ্ধৃতির সারমর্ম হচ্ছে যে মাসজিদে জামাত কায়েম হয়ে থাকে ঐ ধরনের মাসজিদে জানাযার নামায আদায় করা মাকরূহ- কারণ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে" যে লোক মাসজিদে জানাযার নামায আদায় করে থাকে তার জন্য কোন ধরনের ছাওয়াব-পূন্য নাই। অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে "তার জন্য কিছুই নাই"

এক্ষেত্রে মৃত লোকের লাশ ও মুসাল্লী বৃন্দের মাসজিদের ভিতরে থাকা কিংবা লাশ মাসজিদের বাইরে আর মুসাল্লীগন ভিতরে থাকা অথবা ইমাম ও কিছু মুক্তাদি মাসজিদের বাইরে থাকা আর বাকী মুক্তাদীগন ভিতরে থাকা, অনুরূপ ভাবে লাশ মাসজিদের ভিতরে থাকা এবং ইমাম ও মুক্তাদীগন বাইরে থাকার ফলে মাকরূহ হওয়ার হুকুমের মধ্যে কোন তারতম্য নাই অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মাকরূহের হুকুম বলবৎ থাকবে।।

✪ মাকরূহ বলতে কারো কারো মতে মাকরূহে তাহরীমীই উদ্দেশ্যে, অপর কতেকের মতে মাকরূহে তানজিহীই উদ্দেশ্য।

যেমন দূররে মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ-

(وكرهت تحريمًا) وقيل (تنزيهًا فى مسجد جماعة هو) اى المَيِّتُ (فيه) وحده اومع القوم (واختلف فى الخارجة) عن المسجد وحده اومع بعض القوم (والمُخْتَارُ الكَرَاهَةُ) مُطْلَقًا خلاصه . بناءً على اَنّ المسجدَ انما بُنِىَ للمكتوبة وتو ابعها كَنَا فِلَةٍ وذِكْرٍ وتَدْرِيْس عِلْمٍ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِاِ طْلَاقِ . .

✪ শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(قوله وقيل تنزيها) رَجَّحَهُ الْمُحَقِّقُ اِبْنُ الْهُمَامِ . . . . فرجح القولَ الاوَّلَ لِاِ طْلَاقِ الْمَنْعِ فى قول محمد رح فى موطئه . لا يُصَلّى على جنازةٍ فى مسجد . وقال الامامُ الطحاوىُ النهىُ عنها وكَرَاهِيَّتُها قولُ ابى حنيفةَ رح ومحمدٍ رح وهو قولُ ابى يوسف ايضًا . . . . . .

(قوله فى مسجد جماعة) اى المسجد الجامع ومسجد المَحَلَّةِ قهستانى . . . . (قوله مطلقا) اى فى جميع الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا فِى الْفَتْحِ عن الخلاصه وفى مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ سواءٌ كَانَ الْمَيِّتُ فِيْهِ اوخارجه هو ظاهرالرِّ وايةِ / وفى رواية لَايُكْرَهُ اذا كان المَيِّتُ خارجَ المسجد (قوله بناءٌ على اَنَّ الْمَسْجِدَ الخ) اَمَّا اِذَاعَلَّلْنَا بِخَوْفِ تَلْوِيْثِ المسجدِ فلا يُكْرَهُ اذا كانت المَيِّتُ خارجَ المسجد وحده او مع بعضِ القومِ احدٌ قال فى شرح المنية وَالَيْهِ مَالَ فى المَبْسُوْطِ وَالْمُحِيْطِ وعليه الْعَمَلُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ اَوْقلت بل ذكرَ فى غايةِ البيان والعناية اَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِيْهَا بِالْاِتِّفَاقِ لٰكِنْ رَدَّهُ فى البحر . وَاَجَابَ فِى النَّهْرِ بِحَمْلِ الْاِتِّفَاقِ عَلٰى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ فى حَقِّ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ . (صفحه٢٢٥)

✪ বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وظاهرُ كلامِ المصنِّفِ اَنّ الكراهةَ تَحْرِيْمِيَّةٌ لانه عَطَفَهُ عَلٰى مَالاَ يَجُوْزُ من الصلوة راكبًا وهى اِحْدٰى الرِّوَايَتَيْنِ مع اَنّ فيه اِيْهَامًا لِاَنَّ فِى الْمَعْطُوْفِ عليه لم تَصِحّ الصَّلوةُ اصلاً وفى المعطوف هِىَ صحيحةٌ والاُخْرٰى انها تَنْزِيْهِيَّةٌ ورجحه فى فتح الْقَدِيْرِ بان الحديثَ ليس نَهْيًا غير مَصْرُوْفٍ ولا قُرِنَ الْفِعلُ بِوَعِيْدٍ بِظَنِّىْ بل سَلْبُ الْاَجْرِ وَسَلْبُ الاجر لاَيَسْتَلْزِمُ ثُبُوْتَ اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ لِجَوَازِ الْاِ بَاحَةِ ثم قَرَّر تقريرًا حاصلُهُ انه لاَ خِلَافَ بَيْنَنَا وبين الشافعى على هٰذه الرواية لانه يقول بِالْجَوَازِ فى المسجدِ لٰكِن الْاَفْضَلَ خارجُهُ وهو معنى كراهةِ التَّنْزِيْهِ وبِهِ يحصلُ الْجَمْعُ بينَ الاحاديث اه لٰكِنْ تَتَرَجَّحُ كراهةُ التَّحْرِيْمِ

بالرواية الاخرى التى رواها الطيالسى كما فى الفتاوى القاسمية
من صلى على ميت فى المسجد فلا صلاة له صفحه ١٨٧ ج ٢

✪ মসজিদের বাইরে জানাযার নামায আদায় করার কোন জায়গা না থাকলে ভারী বৃষ্টি, ঝড়-তুফান ও বন্যা ইত্যাদির ন্যায় গ্রহণ যোগ্য ওজর বশত ঃ মাসজিদে জানাযার নামায আদায় করা মাকরূহ নয়। বরং তখন জায়েজ।

✪ যেমন ফতোওয়ায়ে আলমগীরীর মধ্যে বলা হয়েছে

ولا يكره بعذر المطر ونحوه هكذا فى الكافى صفحه ١٦٥

✪ ফতোওয়ায়ে শামী গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ-

(تتمه) انما تكره فى المسجد بلا عذر فان كان فلا - ومن الاعذار المطر كما فى الخانية والاعتكاف كما فى المبسوط كذا فى الحليه وغيرها -

والظاهر ان المراد اعتكاف الولى ونحوه ممن له حق التقدم ولغيره الصلوة معه تبعا له - والا لزم ان لا يصليها غيره وهو بعيد/ لان اثم الا دخال والصلوة ارتفع بالعذر تامل - وانظر هل يقال ان من العذر ما جرت به العادة فى بلادنا من الصلوة عليها فى المسجد لتعذر غيره او تعسره بسبب اندراس المواضع التى كانت يصلى عليها فيها - فمن حضرها فى المسجد ان لم يصل عليها مع الناس لا يمكنه الصلوة عليها فى غيره - ولزم ان لا يصلى فى عمره على جنازة نعم قد توضع فى بعض المواضع خارج المسجد فى الشارع فيصلى عليها ويلزم منه فسادها من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعلهم المتنجسة مع انا قدمنا كراهتها فى الشارع واذا ضاق الا مر اتسع / فينبغى الافتاء بالقول بكراهة

التنزيه الذى هو خلاف الاولى كما اختاره المحقق ابن الهمام - واذا كان ما ذكرناه عذرا فلا كراهة اصلا والله تعالى اعلم صفحه ٦٧ـ ٢٢٦

আল্লামা শামী (রঃ) এর উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রমানিত হয় যে-

✪ বৃষ্টি ইত্যাদি ওজরের কারণে মাসজিদে জানাযার নামায আদায় করা মাকরূহ নয়।

✪ যে অলি(অভিভাবক) এর অনুমতি ও নামায আদায় করা ব্যাতিরেক অন্য কারো জন্য যে মৃত লোকের জানাযার নামায আদায় করা যায়না তিনি যদি মাসজিদে এতেকাফরত থাকেন তখন ঐ মাসজিদের ভিতর ঐ মৃত লোকের জানাযার নামায আদায় করা মাকরূহ নয়।

✪ যে শহরে ঘনবসতি হওয়ার দরুণ জানাযার নামায আদায় করার মত কোন জায়গা না থাকার কারনে তথায় মাসজিদের ভিতরই জানাযার নামায পড়ার রেওয়াজ চালু হয়ে পড়েছে- ঐ সব শহরে মাসজিদের ভিতর জানাযার নামায আদায় করাটা "খেলাফে আওলা" তথা মাকরূহ তানযিহী রূপে সাব্যস্থ হবে।

জানাযার নামায আদায়ের সময় ঃ

জানাযার নামায আদায় করার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ওয়াক্ত নাই। বরং জানাযা যখন উপস্থিত হয় উহাই জানাযার নামায আদায় করার সময়। তিনটি সময়ে জানাযার নামায আদায় করা মাকরূহঃ

(ক) সূর্য উদিত হওয়ার সময় (খ) সূর্য ঠিক মাথার উপর স্থির হওয়ার সময় (ঘ) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়।

কেননা এ তিনটি সময়ে নামায আদায় করতে ও মৃত লোকদের দাফন করতে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের হাদীছ শরীফে নিষেধ করা হয়েছে, যেমনঃ

عن عقبة ابن عامر رضى الله عنه قال ثلاثة اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلى فيها وان نقبر موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف للغروب حتى تغرب (رواه مسلم) والمراد بقوله "ان نقبر" صلاة الجنازة اذ الدفن غير مكروه فكنى بها عنها للملازمة بينهما وقد فسر

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِالسُّنَّةِ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى مَوْتَانَا عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ الخ ـ مراقى الفلاح صفحہ ١٢٤

তাই এতে বুঝা যায় মারকিউল ফলাহ গ্রন্থকারের মুতানাসারে উল্লেখিত তিনটি সময়ে কোন মৃতব্যক্তির জানাযা এসে উপস্থিত হলে তাৎক্ষনিক ভাবে এর নামায আদায় করা মাকরূহ বরং একটু বিলম্ব করতঃ মাকরূহ সময় অতিক্রমের পরই জানাযার নামায আদায় করতে হবে।

কিন্তু طحطا وی علی مراقی الفلاح তে বলা হয়েছে–

وَفِي الْبَحْرِ عَنِ التُّحْفَةِ الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ حَضَرَتْ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ وَإِلَّا يُؤَخِّرُهَا بَلْ فِي الْإِيضَاحِ وَالتَّبْيِينِ التَّاخِيرُ مَكْرُوهٌ لِقَوْلِهِ عـ ثَلَاثٌ لَا يُؤَخِّرُونَ جَنَازَةٌ أَتَتْ وَدَيْنٌ وَجَدْتَ مَا يَقْضِيهِ وَبِكْرٌ وُجِدَ لَهَا كُفْءٌ ـ

অর্থাৎ বাহরুর রায়েক গ্রন্থে তোহফা গ্রন্থের বরাতে বলা হয়েছে বিলম্বনাকরে ঐ মুহূর্তে জানাযার নামায আদায় করে নেওয়া উত্তম, বরং কানজুদ্দাকায়েকের শরাহ তাবঈনুল হাকায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে– এ মুহূর্তে বিলম্বকরা মাকরূহ -কেননা প্রিয় নবী (দঃ) তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করতে নিষেধ করেছেন–

(১) জানাযা যখন হাজীর হয় তখন নামায আদায় করতে(দেরী করবেনা)

(২) ঋন শোধের উপায় যখন হয়ে থাকে তখন ঋণ শোধ করতে দেরী করবেনা এবং

(৩) বিবাহের উপযুক্ত মহিলার জন্য যখন তার উপযুক্ত কোন পাত্র পাওয়া যায় তখন বিবাহের কাজ সমাধা করতে কাল বিলম্ব করবেনা।

✪ আর যদি কোন জানাযা মাকরূহ সময়ের আগেই হাযির হয়ে থাকে কিন্তু ঠিক সময়ে নামায আদায় না করে বিলম্বকরতঃ মাকরূহ সময়ে পৌছিয়ে উক্ত জানাযার নামায আদায় করা হয় তাহলে উক্ত নামায শুদ্ধ হবেনা বরং পুনরায় তা আদায় করে যেতে হবে ।

✪ যদি কোন মৃত মুসলমানের লাশের উপর কেউ জানাযার নামায আদায় না করে বা গোসল না দিয়ে দফন করে ফেলা হয়- তাহলে কবর খনন করতঃ লাশ উঠাতে হবে না বরং এক মতানুসারে তিন দিনের ভিতরে তার কবরের উপরই তার জানাযা আদায় করা যাবে।

অপর এক মতানুসারে তিন দিনের কোন সীমাবদ্ধতা নাই বরং বিশুদ্ধ মতানুযায়ী যতদিন পর্যন্ত লাশপর্চে-ফেটে গলে যায়নি বলে ধারণা করা হবে ততদিনের ভিতর কবরের উপরই তার জানাযার নামায আদায় করার সুযোগ থাকবে।

◆ **জানাযার নামাযের ফরয ২টি ঃ**

(১) ইমাম, মুক্তাদী সকলেরই চারটি তাক্‌বীর (আল্লাহু আকবর) বলা এবং

(২) দাঁড়িয়ে জানাযার নামায আদায় করা।[১]

সুতরাং বিনা ওজরে কেউ না দাঁড়িয়ে বসে বসে জানাযার নামায পড়লে শুদ্ধ হবে না। জানাযার নামায আদায় করা কালে রুকু ছজদা করা লাগেনা।

◆ **জানাযার নামাযের ওয়াজিব ২টি ঃ**

(১) উক্ত নামায যে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে আদায় করা হচ্ছে– এ বিষয়ে– نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالَى বলে নিয়্যত করতঃ অত্র নামায আদায় করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার নিয়্যতেই উক্ত নামায আদায় করা।

যেমন– দূররে মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(وَمُصَلِّي الْجَنَازَةِ يَنْوِي الصَّلٰوةَ لِلّٰهِ تعالى و) يَنْوِي أَيْضًا (الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ) لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أُصَلِّي لِلّٰهِ دَاعِيًا لِلْمَيِّتِ (وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ) ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى (يَقُولُ نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ) الْإِمَامُ وَأَفَادَ فِي الْأَشْبَاهِ بَحْثًا أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْمَيِّتَ الذَّكَرَ فَبَانَ أَنَّهُ أُنْثَى أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَجُزْ صفحہ ٤٢٣ / بحث النية جـ١

শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

(قوله لانه الواجب عليه) كذا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْبحر والنهر ـ وَوَجْهُهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ حَيْثُ قَالُوا ـ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ أَرْكَانَهَا الدُّعَاءُ وَالْقِيَامُ وَالتَّكْبِيرُ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ حَقِيقَتَهَا

টীকা ঃ

(১) واركانها التكبيرات والقيام (نور الايضاح) ـ وذكر في الغاية ان الاربع تكبيرات قائمة مقام الاربع ركعات ـ (طحطاوى) ـ (وركنها) شيئان (التكبيرات) الاربع (والقيام) فلم تجز قاعدا لاعذر) (درالمختار)

pdf By Syed Mostafa Sakib

هِىَ الدُّعَاءُ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْهَا اهـ وَفِى النَّتْف هِىَ فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيفَةَ رح واصحابِهِ رح دعاءٌ عَلى الحَقِيْقَةِ وَلَيْسَتْ بِصلاةٍ لانه لا قراءةَ فيها ولا ركوعَ ولاسجودَ اهـ ـ فحيث كان حقيقتُها الدعاءُ كان وجوبُها باعتبارِ الدعاءِ فيها وان قلنا اَنَّهٗ ليس بِرُكْنٍ فيها على ما اخْتَارَهٗ فى البحرِ وغيرِهِ كما سَيَاتِىْ فى الجَنَائِزِ و حينَئِذٍ فالضَّمِيْرُ فى قولِهِ لانه الواجبُ يَعُوْدُ عَلى الدُّعَاءِ ـ

اما على القولِ بالرُّكْنِيَّةِ فظاهرٌ ـ وانما خصَّ من بينِ سائرِ اركانِهَا لانه المقصودُ منها واما على القول بالسُّنِّيَّةِ فلِاَنَّ المرادَ بالدعاءِ ماهيةُ الصلوةِ لا نفسُ الدعاءِ الموجودُ فيها ـ

لما عُلِمَتْ مِنْ اَنَّ حقيقتَهَا الدعاءُ لِاَنَّ المصلىَ شَافِعٌ للميتِ ـ فهو داعٍ لهٗ بنفسِ هٰذه الصلوةِ واِنْ لم يَتَلَفَّظْ بالدُّعَاءِ ـ فَكَاَنَّهٗ قيل لِاَنَّ الصلوةَ هى الوَاجِبَةُ عليه ـ هٰكذا يَنْبَغِىْ حَلُّ هٰذا المَحَلِّ فَافْهَمْ ـ (قوله فيقول الخ) بَيَانٌ لِلنِّيَّةِ الْكَامِلَةِ اهـ صفحہ ٤٢٣ جـ١ بحث النية

اَقُوْلُ وَتَقَدَّمَ فِىْ بَابِ شروطِ الصلوةِ اَنَّ المصلى يَنْوِىْ مع الصلوةِ لِلّٰهِ تعالى الدعاءَ لِلْمَيِّتِ وَعَلَّلَهُ الشارحُ هُنَاكَ بِاَنَّهُ الواجبُ عليه وَنَقَلْنَاهُ هناك عن الزيلعي والبحر والنهر ـ فَهٰذا مُؤَيِّدٌ لِمَا اخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ شامى صفحہ ٢١٠، جـ٢ باب صلوة الجنازة ـ

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ মৃত ব্যক্তির জন্য এ "দোয়া করাটা কে সুন্নাতই বলেছেন। কিন্তু ফাতহুল কাদীরের প্রণেতা আল্লামা ইব্‌নুল হুমাম (র) এ দোয়া করাটাকে রুকন্-রূপে উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে দূররে মোখতার গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা আলাউদ্দিন হাস্‌কাপী (র) ও আল্লামা শামী (র) দোয়া করাটা ওয়াজিব হওয়ার মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (দূররে মোখতার, শামী)।

◆ জানাযার নামাযের সুন্নাত ২টি ঃ

(১) দোয়া ছানা পাঠ করা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা। (২) নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা।

✪ ইসলামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, তার প্রতিনিধি কিংবা রাষ্টের কাজী তথা বিচারপতিগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের কেউ উপস্থিত না থাকলে স্থানীয় জামে মাছজিদের ইমাম সাহেবেই জানাযার নামাযের ইমামতী করার বেশী হকদার-যদি মৃত ব্যক্তির অলি (অভিভাবক) এর চেয়ে ইমাম অধিক যোগ্য হয়ে থাকেন, কিন্তু যদি অলি ইমামের চেয়ে বেশী উপযুক্ত হয়ে থাকেন, সে ক্ষেত্রে অলিই জানাযার নামাযের ইমামতী করার বেশী হকদার রূপে বিবেচিত হবেন।

✪ মৃত ব্যক্তির প্রথম অলি (অভিভাবক) হচ্ছেন- তার পিতা, অতঃপর তার ছেলে, ছেলে একাধিক হলে সে ক্ষেত্রে যিনি সবার বড় ছেলে তিনিই অলি হবেন। অতঃপর পৌত্র-প্রপৌত্র, অতঃপর দাদা-পরদাদা, অতঃপর আপন ভাই, এরপর পিতার শরিক ভাই, অতঃপর আপন ভায়ের পুত্র, তারপর চাচা- প্রমুখ।

একই পর্যায়ে যদি একাধিক অলি থাকেন সে ক্ষেত্রে যার বয়স বেশী সে অগ্রগণ্য হবেন।

✪ মৃত ব্যক্তির অলি (অভিভাবক) নিজে নামাযের ইমামতী না করে অন্য কোন অধিক যোগ্য আলেমে দ্বীন কে ইমামতী করার জন্য অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার রাখেন (দুররে মোখতার)।

✪ একাধিক অলি থাকা অবস্থায় সকল অলি (অভিভাবকগণ) সম্মত হয়ে অন্য কাওকেও ইমামতী করার জন্য মনোণিত করে নেওয়া জায়েয (আলমগীরী)।

✪ অলির চেয়ে ক্ষমতাবানরা ব্যতীত যদি অন্য কোন লোক অলির (অভিভাবকের) অনুমতি ছাড়া জানাযার নামায পড়িয়ে দেন এবং অলি ঐ জমাতে শরীক না থাকেন- তখন অলি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে পুনঃ দ্বিতীয় বার জানাযার নামায পড়াতে পারবেন।

✪ যে কোন মুছলমান- চাই সে নেক্‌কার হউক কিংবা বদকার হউক, মুছলিমরূপে স্বীকৃত হলেই-এর জানাযার নামায আদায় করা লাগবে।

لِقَوْلِهِ عليه الصلوة والسلام صَلُّوْا عَلٰى كُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ ـ (طحطاوى).

✪ কিন্তু যে মুছলমান স্বেচ্ছায় অস্ত্রাঘাতে, নিজ গলায় রশি ইত্যাদি দ্বারা স্বেচ্ছায় ফাঁস খেয়ে, নিজেই নিজের গলা টিপে বা বিষপানে আত্মহত্যা করতঃ মৃত্যুবরণ করে থাকে আমাদের মযহাবের ইমাম হযরত আবু ইউছুফ (র)-এর মতানুসারে এ ধরনের লোকদের জানাযার নামায পড়া জায়েয নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে ইমাম আযম আবু হানিফা(র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে উক্ত আত্মহত্যাকারী মুছলমানের জানাযার নামায পড়া জায়েজ এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত। তবে বেশী প্রচার-প্রসার না করে চুপে চাপে নামায পড়ে নেওয়াই উচিত।[১]

✪ পাগল নয় এমন লোক স্বেচ্ছায় নিজেকে আগুনে জ্বালিয়ে আত্মহত্যাকারীর নামাযে জানাযা না পড়াই উচিৎ।

✪ যদি কোন অপরাধের বিচারে কারও ফাঁসী হয়, তাহলে তাকে যথারীতি গোছল দিয়ে তার জানাযার নামায আদায় করা লাগবে।

✪ জারজ সন্তান ও তার মাতার মৃত্যু হলে গোছল ও জানাযার নামায উভয়টাই লাগবে (তরিকুল ইসলাম)।

✪ প্রসিদ্ধ ডাকাত ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হলে তার জানাযা আদায় করা, এমনি ভাবে গলাটিপে টিপে মানুষ হত্যাকারী, পথিকদের মালামাল লুণ্ঠণকারী হাইজাকার, ও পিতা মাতার হত্যাকারী সন্তানের জানাযার নামায আদায় করা নাজায়েয (শামী, মারাকিউল ফলাহ)।

✪ একই সময়ে একাধিক মুরদার জানাযার নামযের জন্যে উপস্থিত হলে সে ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথক ভাবে কিংবা একত্রে সকলের জানাযার নামায পড়াতে পারেন। তবে পৃথক পৃথক ভাবে জানাযার নামায পড়ানোটাই উত্তম।

✪ এক্ষেত্রে যে লোক বেশী ধর্মপ্রাণ তার জানাযার নামাযই আগে পড়ানো উচিত।

✪ আর একসাথে সকলের জানাযার নামায পড়াতে চাইলে সব চেয়ে বেশী ধার্মিক ব্যক্তির লাশকে ইমামের সম্মুখে রেখে বাকী লাশগুলোকে যথাক্রমে এমনভাবে পাশাপাশি রেখে যেতে হয়, যাতে সব লাশের সিনা এক বরাবর থাকে।

টীকা ঃ

ومن قتل نفسه عمدا يصلى عليه عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وهو الاصح كذا فى التبيين (علمگيريه، شامى) صلوا على كل بر وفاجر (وقاتل نفسه) عمدا لا لشدة وجع (يغسل و يصلى عليه) عند ابى حنيفة و محمد رح وهو الاصح لانه مؤمن مذنب (مراقى الفلاح)

জানাযার নামায আদায়ের ছুন্নাতী তরীকা

✪ জানাযার নামায স্থলে লাশ বহন করে এনে কেবলার দিকে উপস্থিত সকল মুছাল্লিগণের সামনে উত্তর দিকে লাশের মাথা রেখে উত্তর দক্ষিণ সোজা করে লাশ রাখতে হয়।

✪ অতঃপর ইমাম সাহেবকে মৃত দেহের সিনা বরাবর হয়ে দাঁড়াতে হয়। মুছাল্লীগণকে ইমামের পিছনে নামাযের ন্যায় যথানিয়মে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়াতে হয়। নামাযের ন্যায় এর কাতারসমূহকেও সোজা করে নিতে হয়।

✪ লোকসংখ্যা অনুসারে বেজোড় অর্থাৎ তিন, পাঁচ, সাত কিংবা নয় কাতার করে দাড়ানো মুস্তাহাব। তিনের চেয়ে কমে কাতার করা ঠিক নয়।

✪ ইমামের এতদূর পিছনে মুক্তাদীগণের দাঁড়িয়ে কাতার করা মুস্তাহাব যতদূর পিছনে অন্যান্য নামাযে দাঁড়াতে হয়।

অতঃপর সকল মুছল্লিগণকে নিম্নরূপে নিয়ত করে নিতে হয় ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا (لِهٰذِهٖ) اَلْمَيِّتِ (اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ) مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উওয়াদ্দীয়া আরবাআ তাক্বিরাতি ছালাতিল্ জানাযাতি ফারযিল্ কিফায়াতি আছ্ছানাউ লিল্লাহি তাআলা ওয়াচ্ছালাতু আলান্নাবিয়্যি ওয়াদ্দুআউ লিহাজাল্ মাইয়িতি (লিহাজিহিল্ মাইয়িতি) ইকতিদাইতু বিহাজাল্ ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

এভাবে বলে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে এবং মুক্তাদীগণ চুপে চুপে "তাকবীর" আল্লাহু আকবর' বলে অন্যান্য নামাযের ন্যায় দু'হাত দু'কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে নাভীর নিচে বাঁধতে হয়।

মৃতলোক মহিলা হলে নিয়্যতে لِهٰذَا الْمَيِّتِ (লিহাজাল্মাইয়্যেতের স্থলে) لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ (লিহাজিহিল্ মাইয়্যেতে) বলতে হয়।

অতঃপর সবাইকে নিম্নের দোয়ায়ে ছানাটি পাঠ করে যেতে হয় ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

উচ্চারণ ঃ ছুব্হা-নাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারা-কাছ্মুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়ালা-ইলাহা গাইরুকা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ ছানা পাঠ করার পর ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে আর মুক্তাদীগণ চুপে চুপে হাত না উঠিয়ে ২য় তাকবীর "আল্লাহু আকবর" বলে যাবেন এবং নামাযের শেষ বৈঠকে যে দরূদ শরীফ দু'খানা পড়া লাগে এখানেও তা পড়ে যেতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পুনঃ ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে এবং মুক্তাদীগণ নিরবে হাত না উঠিয়ে ৩য় বার তাকবীর "আল্লাহু আকবর" বলে উভয়কে নিম্নের সাবালেগের দোয়া খানা পাঠ করে যেতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ (وَمَنْ تَوَفَّيْتَهَا مِنَّا فَتَوَفَّهَا) عَلَى الْاِيْمَانِ ـ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (هَا) وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (هَا) ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্ লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয় শাহিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উন্‌ছা-না আল্লাহুম্মা মান্ আহ্‌ইয়াইতাহু ফা আহ্‌য়িহী আলাল্ ইছলাম ওয়া মানতাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতা-ওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান্ (ওয়ামান্ তাওয়াফ্‌ফাইতাহা মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহা) আলাল ঈমান। আল্লাহুম্মা লা তুহার্‌রিম্‌না আজ্‌রাহু(হা) ওয়ালা তাফাতিন্না বা'দাহু (হা)

অথবা নিম্নের দোয়াখানা পাঠ করবে ঃ

اللهم اغفرله (لها) وارحمه (ها) وعافه (ها) واعف عنه (ها) واكرم نزله (ها) ووسع مدخله (ها) واغسله (ها) بالماء والثلج والبرد ونقه (ها) من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس وابدله (ها) دارا خيرا من داره (ها) واهلاخيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه (ها) وادخله (ها) الجنة واعذه (ها) من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب النار ـ

✪ মৃত নাবালেগ পুরুষ শিশু হলে তৃতীয় তাকবীর বলার পর উপরে উল্লিখিত দোয়া সমূহের স্থলে নিম্নের দোয়াখানা পাঠ করতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্‌আল্‌হু লানা ফারতান ওয়াজ্‌আল্‌হু লানা আজরাও ওয়া জুখ্‌রান্ ওয়াজ্ আলহু লানা শাফেআও ওয়া মুশাফ্‌ফাআ।

✪ মৃত নাবালেগ মেয়ে শিশু হলে উপরে উল্লিখিত দোয়াখানা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতঃ নিম্নরূপে পড়তে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু ম্মাজ্‌আল্‌হা লানা ফারতাও য়াঁওয়াজ্ আলহা লানা আজরাও ওয়া জুখ্‌রাও ওয়াজআলহা লানা শাফিআতাঁও ওয়া মুশাফ্‌ফাআতান্।

✪ এভাবে ৩য় তাকবীরের পরে দোয়া পাঠ করতঃ ইমাম সাহেবকে উচ্চস্বরে এবং মুকতদীগণকে চুপে চুপে ৪র্থ তাকবীর "আল্লাহু আকবর" বলতে হয়।

চতুর্থ তাকবীর বলার পর আইম্মায়ে কেরাম্‌গণের প্রকাশ্য বর্ণনা অনুযায়ী কোন দোয়া ইত্যাদি পাঠ করার কথা উল্লেখ নাই। কিন্তু আমাদের কতেক মাশায়েখে ইজাম থেকে বর্ণিত আছে যে, চতুর্থ তাকবীর বলার পর নিম্নের যে কোন একটি দোয়া পড়া উত্তম। (ফাতহুল কাদীর, এনায়া).

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقِنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ

অথবা,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

অতঃপর প্রথমে ডানে এবং এর পর বামে "আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতু-ল্লাহ" বলে অন্যান্য নামাযের ন্যায় ছালাম ফিরাতে হয়। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, জানাযার নামাযের উক্ত দোয়াসমূহ কারো জানা না থাকলে নিম্নের দোয়াখানা পড়ে নিবে। (গায়তুল আওতার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَوْ الِدَيْنَا وَلَهُ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ـ

✪ যদি এও জানা না থাকে তাহলে সে লোক দোয়ার স্থলে ছুরা ফাতেহা আল্হামদু ছুরা দোয়ার নিয়্যতে পড়ে নিবে। (আলমগীরী, দুররুল মুখতার)

যদি কোন লোকের ছুরা ফাতেহা ও জানা না থাকে তাহলে শুধু তাকবীর "আল্লাহু আকবর" বলে নামায আদায় করে যাবে। [মালাবুদ্দা মিন্হুর হাশিয়া ও মুজাহেরে হক]

✪ যে সব কারণে অন্যান্য নামায ভঙ্গ হয় ঐ সব কারণে জানাযার নামায ও ভঙ্গ হয়ে থাকে।

✪ জানাযার নামায শেষে লোকেরা নামাযের কাতার ভেঙ্গে ছএভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর সংক্ষিপ্ত ভাবে মৃত লোকের মাগ্ফেরাত কামনা করতঃ দোয়া মুনাজাত করা জায়েয। (ফতোওয়ায়ে রেজভীয়া)

কারও কারও মতে দাঁড়ান থেকে বসে গিয়েই দোয়া করা উচিত।

কেননা আল্লামা আইনী (র) বোখারী শরীফের শরাহ "ওম্দাতুল ক্বারী গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে;

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَمَارِه وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَا لَمَّا اَلْتَقَى النَّاسُ بِمُوْتَةَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَكَشَفَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَهُوَ يَنْظُرُ اِلَى مَعْرِكَتِهِمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رض فَمَضٰى حَتّٰى اَسْتُشْهِدَ وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لَهُ وَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَسْعٰى ثُمَّ اَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ رض فَمَضٰى حَتّٰى اَسْتُشْهِدَ وَصَلّٰى عَلَيْهِ وَدَعَالَهُ وَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لَهُ وَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ يَطِيْرُ فِيْهَا بِجَنَاحَيْهِ حَيْثُ شَاءَ/...... قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ ذٰلِكَ مَخْصُوْصٌ بِهِ (صلعم) عُمْدَةُ الْقَارِىْ صفحه ٢٢ ج ٨

অর্থাৎ হযরত আব্দুল জাব্বার ইবনে ওমারা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (র) বর্ণনা করেন ঃ

যখন ইতিহাস খ্যাত মূতার যুদ্ধ শুরু হয় তখন আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মিম্বারে তাশরিফ রাখেন মদীনা মুনাওয়ারা ও শাম দেশের

✪ মাছজিদকে চলাচলের রাস্তা বানানো হারাম, ওযু খানায় যাওয়ার জন্য মাছজিদের বাহির দিয়ে যাওয়া-আসার পথ রাস্তা-থাকা সত্ত্বেও মাছজিদের ভিতর দিয়ে বিনা ওযুতে যাওয়া নিষেধ।

মাছজিদের বাহির দিকে ওযু খানায় যাওয়ার পথ না থাকলে তখনই এ ওজর বশতঃ মাছজিদের ভিতর দিয়ে ওযু খানায় যাওয়া জায়েজ।

✪ মাছজিদে বসে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। শুধুমাত্র এতেকাফে বসা কোন ব্যবসায়ী লোকের জন্য দ্রব্য সামগ্রী বিহীন মৌখিক ভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করা বৈধ।[1]

✪ এতেকাফকারী ব্যতীত অন্য লোকদের জন্য মাছজিদে বসে পান আহার করা মাকরূহ, পান আহারের একান্ত প্রয়োজন হলে এ'তেকাফের নিয়ত করত : কিছুক্ষণ তাছবীহ-তাহলীল ও জিকির-আজকার করে তথা এবাদতের পরই পান আহার করা যায়। এ'তেকাফকারী ব্যতীত অন্যান্য লোকদের জন্য মাছজিদে শয়ন করা মাকরূহ। (আলমগীরী)

✪ মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শ্রেষ্ঠতম এবাদত নামায আদায়ের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মাছজিদ সমূহের প্রতিষ্ঠা হলে ও ইসলামের অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রমের জন্য মাছজিদসমূহই হল উপযুক্ত স্থান।

তাই নিয়মিত নামায ছাড়াও মহান আল্লাহর তাছবীহ-তাহ্লীল-তেলাওয়াতে কোরআন, আল্লাহর মহান জিকির ও প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ-ছালাম পাঠ করার জন্য মাছজিদই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম স্থান।

তদুপরি কোরআনে করিম এর পবিত্র তালিম, দ্বীনী এলম ও মাছ্আলা মাছায়েল সমূহের শিক্ষা দান, ওয়াজ-নাছীহাত ও জিকরে মীলাদে রাসূল(দঃ)-এর জন্যও ইহা সর্বোত্তম স্থান।

সর্বোপরী মহান আল্লাহর মান-মর্যাদা এবং তার প্রিয় নবী (সাঃ) এর শান-মান ও আদর্শের জিকির আলোচনার ক্ষেত্রেও ইহা অন্যতম স্থান।

কিন্তু অনেক ভায়েরা নিজেদের অজ্ঞতা বশতঃ মাছজিদে জিক্‌রে মীলাদ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মাজলিস অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অহেতুক আপত্তি তোলেন।

টীকা ঃ

(١) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِصَالٌ لَا تَنْبَغِىْ فِى الْمَسْجِدِ ـ لَا يَتَّخِذُ طَرِيْقًا وَلَا يُشْهَرُ فِيْهِ بِسَلَاحٍ وَلَا يُقْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ وَلَا يُنْشَرُ فِيْهِ نَبْلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيْهِ بِلَحْمٍ وَلَا يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ وَلَا يُتَّخَذُ سُوْقًا ـ ابن ماجه ـ(شرح منيه)

আমাদের সকলের জানা থাকা দরকার যে, মহান আল্লাহর পবিত্র জিকির স্মরণের জন্যই মাছজিদ সমূহের বুনিয়াদ। আর অধিকাংশ আইম্মায়ে দ্বীন ও ওলামায়ে হাক্কানী রাব্বানী গণের সর্বসম্মত মত যে, নবী (দঃ) এর জিকির মহান আল্লাহর জিকিরেরই নামান্তর, তাই নবী পাকের যে কোন বিষয়ের জিকির মূলতঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহুরই জিকির।

আল্লাহ পাক ছুব্‌হানাহু ওয়া তাআলা যখন প্রিয় নবী (দঃ) এর শানে ورفعنا لك ذكرك (হে প্রিয়! আপনার জিকির কে আমি সুউচ্চ ও মহীয়ান গরীয়ান করে দিয়েছি) আয়াত খানা নাজিল করেন। এর পরক্ষণেই হযরত জিব্রায়িল (আঃ) কে প্রিয় রাসূল (দঃ) এর খেদমতে পাঠিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَتَدْرِىْ كَيْفَ رَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ

অর্থাৎ হে প্রিয়! আমি আপনার জিকির কে কিভাবে মহানত্ব দান করেছি তা কি আপনার জানা আছে ? উত্তরে প্রিয় নবী (দঃ) আরজ করেন হে প্রভূ! এ ব্যাপারে আপনিই ভাল জানেন।

উত্তরে মহান আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِىْ فَمَنْ ذَكَرَكَ فَقَدْ ذَكَرَنِىْ ـ (شفا لقاضى عياض)

অর্থাৎ আমি আপনার জিকিরকে আমার জিকির রূপেই নির্ধারন করেছি, সুতরাং যে লোক আপনার জিকির করল, সে নিশ্চয় হে প্রিয় নবী (দঃ)! আমারই জিকির করল।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃত্যু সম্পর্কিত মাছায়েল

মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তির আহ্‌কাম ঃ

স্মরণ রাখার যোগ্য যে কোন মুমূর্ষ লোকের (ক) পদদ্বয় শক্তিহীন হয়ে ঝুলে পড়া (খ) নাসিকার অগ্রভাগ টেরা হয়ে যাওঁয়া (গ) কপাট দ্বয় বসে যাওয়া (ঙ) মুখমন্ডল লম্বাকৃতি ধারণ করা এবং (চ) হাতের তালু শূন্য হয়ে বসে যাওয়া কারও কারও মতে কানের লতি ঝুলে পড়া ইত্যাদি সব লক্ষণ কে মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ বুঝে নিতে হবে।

এ অবস্থায় রোগীকে আস্তে আস্তে কলেমায়ে তৈয়্যবা ও কালেমায়ে শাহাদৎ পড়াতে হয়। অথবা রুগীর পাশে বসে নিজে একটু বড় আওয়াজে কলেমাদ্বয় পাঠ করে যেতে হয়, যেন রোগী তা শুনে নিজেও আগ্রহ বোধ করত ঃ পড়তে চেষ্টা করেন।

যদি মৃত্যু যন্ত্রণার কারণে রুগী পড়তে না পারে তাহলে তাকে কলেমা ইত্যাদি পড়ার জন্যে জোর দেওয়া উচিৎ নয়।

এভাবে কলেমার তল্‌কীন (শিক্ষা -স্মরণ করিয়ে) দেওয়া আমাদের হানফী মাজহাব অনুসারে মোস্তাহাব।

কেননা, হাদীছ পাকের মধ্যে উল্লেখ আছে ঃ

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (ابو داؤد-احمد)

অর্থাৎ যে ব্যক্তির জীবনের শেষ বাক্য কলেমায়ে তৈয়্যাবাহ্ –

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ হয়ে থাকে, সে বেহেস্তে প্রবেশ করবেই।

এভাবে মৃত্যুমুখে পতিত লোকের শিয়রে বসে ছূরায়ে এয়াছীন শরীফ এবং ছুরা রা'আদ পাঠ করা ও উত্তম।

আল্লাহর প্রিয় নবী এরশাদ করেনঃ-

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَءُ عِنْدَ رَأْسِهٖ يٰسٓ اِلَّا هَوَّنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (احمد)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত লোকের শিয়রে বসে ছুরা এয়াছিন পাঠ হলে এর বদৌলতে আল্লাহ তা আলা তার মৃত্যু যন্ত্রনা কে সহজ করে দেন।

✪ হাদীছ শরীফের মাধ্যমে জানা যায় যে, মৃত্যু যাত্রীর বাম পাশে বসে "ছৈয়েদুল ইস্তেগফার" পাঠ করা ও বিশেষ উপকারী, এর বদৌলতে শয়তান তার বাম পার্শ্বে বসে যে, ঈমান নষ্ট করার চক্রান্ত-চেষ্টা চালায় তা থেকে রুগী রক্ষা পায়।

✪ বিশুদ্ধ মতানুসারে মুসলমানের মৃত্যুকালীন তওবা কবুল হয়। কিন্তু কাফেরের মৃত্যুকালীন ঈমান আনায়ন কবুল হয় না। অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত কাফেরের ঈমান আনায়নের দ্বারা কাফেরকে মুসলমান রূপে গন্য করা যাবে না।

✪ মৃত লোকের চোখ বন্ধ করার সময় নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করা উত্তম।

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ. (عالمگیری)

✪ মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির পরিবার বর্গের মধ্যে যে লোক অত্যন্ত দয়ালু- সে লোকই মৃত ব্যক্তির চোখের পাতাদ্বয় আস্তে আস্তে নম্রভাবে বন্ধ করে দিবে চিবুক জড়িয়ে মাথার সাথে রুমাল দ্বারা বেধে দিবে- যেন মুখ হা করে না থাকে। অতঃপর আস্তে আস্তে হাত পায়ের গিরা ও আঙ্গুলী সমূহ মালিশ করত ঃ সোজা করে দিবে। অনুরূপভাবে আঙ্গুলীসমূহ মুষ্টিবদ্ধ থাকলে খুলে সোজা করে দিবে। এরপর পরিধানের কাপড় বদলিয়ে অন্য একটি পরিষ্কার চাদর ইত্যাদি দ্বারা পুরা শরীর ঢেকে দিয়ে কোন উচু জায়গা তক্তা বা খাটের উপর উত্তর দিকে মাথা দিয়ে সোজাভাবে শোয়ায়ে রাখা মুস্তাহাব (আলমগীরী)।

✪ মৃত ব্যক্তির পেট যাতে ফেপে না যায় তার জন্যে লৌহ খন্ড অথবা নরমমাটি পেটের উপর দিয়ে রাখাটা মুস্তাহাব (আলমগীরী)।

✪ যেহেতু মুসলমান মৃতলোকের জানাযার নামায আদায় করা নিকটস্থ ও দূরবর্তী সকল আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের উপর ফরজে কেফায়া, তাই ওদের সকলের নিকট মৃত্যু সংবাদ পৌছানো মুস্তাহাব (আলমগীরী)।

✪ শহর-নগরের মধ্যে জন সাধারণ এর নিকট মৃত্যু সংবাদ প্রচার করাকে কেউ কেউ মাকরূহ বললেও ছহীহ্ মতানুসারে উহাতে দোষের কিছুই নেই। (আলমগীরী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মৃত লোকের গোছলের মাছায়েল

মৃত মুছলমানকে গোছল দেওয়া ফরজে কেফায়া, যে কোন লোক গোছলের কাজ সমাধা করে দিলে বাকী লোকেরা এ দায়-দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাবে, আর কেউ যদি এ গোছলের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে এলাকা-মহল্লার সকলেই গুণাহগার হবে।

✪ তাহ্তাবী কিতাবে বর্ণিতে আছে ঃ

اَلْاَصْلُ فِىْ مَشْرُوْعِيَّةِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ الْمَلَائِكَةُ اٰدَمَ ع. اَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهٗ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَنَّهٗ قَالَ كَانَ اٰدَمُ ع رَجُلًا اَشْقَرَ طِوَالًا كَاَنَّهٗ نَخْلَةٌ سُحُوْقٌ. فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ بِحَنُوْطِهٖ وَكَفَنِهٖ مِنَ الْجَنَّةِ فَلَمَّا مَاتَ ع غَسَلُوْهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوْا فِى الثَّالِثَةِ كَافُوْرًا وَكَفَّنُوْهُ فِىْ وِتْرٍ مِنَ الثِّيَابِ وَحَفَرُوْا لَهٗ لَحْدًا وَصَلُّوْا عَلَيْهِ وَقَالُوْا يَا بَنِىْ اٰدَمَ هٰذِهٖ سُنَّتُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ فَكَذَا كُمْ فَافْعَلُوْا. صفحه ٣٧٤

অর্থাৎ ফেরেস্তাদের হযরত আদম (আঃ)-কে (সর্বপ্রথম) গোছল দেওয়াটাই হচ্ছে- মৃতলোকের জন্যে গোছল ফরয হওয়ার দলিলের উৎস মূল।

হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত হাকেম (রঃ) শুদ্ধ প্রমাণে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেনঃ- হযরত আদম (আঃ) অতিশয় লম্বা প্রকৃতির লোক ছিলেন। যখন তাঁর ইন্তেকাল মূহুর্ত উপস্থিত হল তখন (হযরত জিব্রায়িল (আঃ) এর নেতৃত্বে) ফেরেস্তারা বেহেস্তী আতর-কাপড় সহ তাঁর নিকট আসেন-অতঃপর তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন ফেরেস্তারা বড়ই (কুল) পাতা সিদ্ধ গরম পানি দ্বারা হযরত আদম (আঃ) কে তিন বার পানি ঢেলে গোছল দেন গোছলের তৃতীয়বারের পানিতে তারা কাফুর মিশ্রিত করেন- অতঃপর তিন কাপড়ে তাকে কাফন পরান- পরিশেষে (বগলী) কবর (খোদাই করতঃ জানাযার নামায আদায় করে তাঁর দাফন কার্য্য সমাধা করেন।

বিদায়ের কালে ফেরেস্তারা হযরত আদম (আঃ) এর ছেলে সন্তানদের বলে যান, ইহাই হচ্ছে মৃত লোকের গোছল, কাফন, জানাযা ও দাফনের পদ্ধতি অতএব

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনারা এ সুন্নাত আপনাদের মধ্যে চালু রাখবেন। হেদায়াহ কিতাবের শরাহ্ "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে ও প্রায় এরকমই বর্ণিত আছে।

✪ পুরুষ লোককে পুরুষে এবং মহিলাকে মহিলাই গোছল দেবে, কিন্তু, ছোট শিশুকে যে কোন কেউ গোছল দিতে পারবে।

✪ পুরুষ মৃতলোককে গোছল করানোর জন্যে পুরুষলোক পাওয়া না গেলে তার কোন মোহরেম স্ত্রীলোক সে পুরুষ মুরদারকে শুধু তায়াম্মুম করিয়ে দেবে, যদি এরূপ কোন মহিলাও পাওয়া না যায় তাহলে যে কোন মেয়েলোক নিজ হাতে কাপড় জড়িয়ে তাকে তায়াম্মুম্ করিয়ে দেবে (দোঃ মোখতার)।

✪ এমনিভাবে যদি কোন মৃত স্ত্রীলোককে গোছল করানোর জন্যে কোন মেয়েলোক পাওয়া না যায় ঐ অবস্থায় ও উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে যে কোন পুরুষ লোক ঐ মৃত স্ত্রীলোকটিকে তায়াম্মুম করিয়ে দিতে পারবে।

✪ গোছলদানকারী মেয়েলোক হলে তাকে হায়েজ নেফাছ এবং জনাবতের নাপাকী হতে আর গোছলদানকারী পুরুষ হলে জনাবতের (স্ত্রী সহবাসজনিত) নাপাকী হতে পাক পবিত্র হওয়া আবশ্যক। উল্লেখিত প্রকারের লোকেরা মুরদারকে গোছল দেওয়া নিষেধ।

আরও উল্লেখ্য যে, গোছল দানের জন্য কোন পুরুষ লোক পাওয়া না গেলে মৃত স্বামীকে তার স্বীয় স্ত্রী গোছল করাতে পারবে। অনেকের মতে পুরুষ লোক পাওয়া গেলেও স্বীয় স্ত্রী স্বামীকে গোছল করাতে পারবে, কিন্তু স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে গোছল দিতে পারবেনা। এমনকি স্পর্শ ও করতে পারবে না, শুধুমাত্র এক নজর দেখতে পারবে।

وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا مِنْ غُسْلِهَا وَمَسِّهَا لَا مِنَ النَّظَرِ اِلَيْهَا عَلَى الْاَصَحِّ (در المختار)

✪ যেমন বিশ্বখ্যাত নির্ভরযোগ্য ফেকাহ্ ফতোওয়া গন্থ بدائع الصنائع এবং طحطاوى على المراقى الفلاح -এর মধ্যে বলা হয়েছে-

اَلْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا لِحِلِّ مَسِّهِ وَالنَّظَرِ اِلَيْهِ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ اه .... وَالْاَصْلُ فِىْ تَغْسِيْلِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مَا رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لَوِ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ اَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِلَّا نِسَائُهُ وَمَعْنٰى ذٰلِكَ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً وَقْتَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِاِبَاحَةِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ

لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ وَرُوِىَ اَنَّ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رضى الله عنه اَوْصٰى اِلٰى اِمْرَاَتِهٖ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنْ تَغْسِلَهُ بَعْدَ وَفَاتِهٖ وَهٰكَذَا فَعَلَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىْ رضى الله عنه وَلِاَنَّ اِبَاحَةَ الْغُسْلِ مُسْتَفَادَةٌ بِالنِّكَاحِ فَتَبْقٰى مَا بَقِىَ النِّكَاحُ وَالنِّكَاحُ بَاقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ اِلٰى وَقْتِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (قوله لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ) بِانْعِدَامِ مَحَلِّهٖ فَصَارَ الزَّوْجُ اَجْنَبِيًّا فَلَا يَحِلُّ لَهٗ غُسْلُهَا . (بدائع جـ١، صفحـ٣٠٤/ طحطاوى صفحـ٣٧٦)

✪ তবে হাঁ যখন স্ত্রীকে গোছল দেওয়ার মত কোন মেয়ে লোক পাওয়া না যায়- শুধুমাত্র তখনই স্বামী নিজ স্ত্রীকে তায়াম্মুম করিয়ে দিতে পারবে। (তাহ্তাবী)

✪ ছফরে কারও মৃত্যু ঘটলে এবং গোছল দেওয়ার জন্যে পাক পবিত্র পানি পাওয়া না গেলে মুরদার কে শুধু তায়াম্মুম করিয়ে দিতে হয়।

✪ কোন সন্তান জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়ে পরক্ষণেই যদি মারা যায় তাহলে তার নাম রেখে গোছল দিতে হয়। এবং কাফন পরিয়ে জানাযার নামায পড়েই তাকে দাফন করতে হয় (আলমগীরী)।

✪ আর কোন সন্তান মৃত অবস্থায় পূর্ণ অবয়ব সহকারে ভূমিষ্ট হলে বিশুদ্ধ মতানুসারে তারও নাম রেখে গোছল দিয়ে কাপড় জড়িয়ে বিনা জানাযায় দাফন করে দিতে হয়, এ ধরনের ছেলে মেয়েকে ছুন্নাত মোতাবিক গোছল ও দেওয়া লাগেনা, কাফন ও দিতে হয়না। বরং সাধারণ ভাবে গোছল ও কাফন দিলে সারে।

০ আমাদের হানফী-মাজহাবের মতানুসারে উক্ত মৃত সন্তান-সন্ততিগণ দুনিয়াতে রূহপ্রাপ্ত হয়ে থাকুক কিংবা নাই থাকুক তারা কেয়ামতের দিন জীবিত হবে এবং স্বীয় পিতা-মাতার জন্যে তারা আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবে।

০ পবিত্র হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে; হযরত নবীয়ে আকরম (দঃ) এরশাদ করেন ঃ বিচার দিবসে ঐ সমস্ত ছেলে মেয়েরা বেহেস্তের দরওয়াজায় দাড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহ! যে পর্যন্ত আমার পিতা-মাতাকে বেহেস্তে না দিবেন সেই পর্যন্ত আমি ও বেহেস্তে প্রবেশ করবনা। তাই এদের নাম রাখা ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা লাগে।

০ যদি কোন মৃতলোক এরূপে ফুলে যায় যে, তাকে হাতে ধরে গোছল করানো সম্ভব না হয়- তাহলে শুধু পানি ঢেলে দিয়ে হাত না লাগিয়ে গোছল দিয়ে দিতে হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ কোন লোক পানিতে ডুবে মরলেও তাকে পানি থেকে উঠিয়ে পুনঃ গোছল দিতে হয়। হাঁ পানি থেকে উঠানোর সময়ে যদি গোছলের নিয়তে তিনবার নাড়া-চড়া দিয়ে উঠান হয়-তাহলে সুন্নাতী গোছল আদায় হয়ে যায়, পুন ঃ গোছল দেওয়া লাগেনা।

✪ স্ত্রী-সহবাস জনিত বা অন্য কোন কারণে গোছল ফরজ হওয়া অবস্থায় কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোকের ইন্তেকাল হলে কিংবা কোন মেয়েলোক হায়েজ-নেফাছ অবস্থায় ইন্তেকাল করলেও শুধু একবার গোছল দেওয়াই যথেষ্ট, ২বার গোছল দেওয়ার প্রয়োজন নেই (দুররে মুখতার)। তবে এদেরকে গোছল দেওয়ার সময় এদের নাক ও মুখে ভিজা কাপড় দ্বারা পানি পৌছিয়ে দিতে হয়।

✪ মৃতলোকের গোছলের জন্যে বরই (কুল) পাতা সহকারে পানি সিদ্ধ করে নেওয়া মুস্তাহাব। বরই পাতা পাওয়া না গেলে শুধু পানিকেই গরম করে নিলে হয় (আলমগীরী)।

গোছল দেওয়ার নিয়ম

✪ গোছল প্রদানকারী নিজে অজু অবস্থায় থেকে মুরদার কে গোছল দেওয়া আফজল, ঘটনাক্রমে বিনা অজুতে মুরদার কে গোছল দিয়ে দিলে ও হয়ে যাবে।

✪ মুরদারকে গোছল প্রদানকারী গোছল দেওয়া কালে غُفْرَانَكَ يَا رَحْمٰنُ (গুফ্রানাকা এয়া রাহমানু) বলতে বলতে গোছলের কাজ সমাধা করে নিবে। (তাহতাবী) স্মরণ রাখবে যে, মৃত মুসলমানকে গোছল দেওয়া অত্যাধিক ছাওয়াবের কাজ, কেননা, হযরত ইবনে শাহীন (র) -এর الجنائز নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবীয়ে আকরম (দঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেনঃ

يَا عَلِى غَسِّلِ الْمَوْتٰى فَاِنَّهُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُفِرَ لَهُ سَبْعُوْنَ مَغْفِرَةً لَوْ تُسِمَتْ مَغْفِرَةٌ مِنْهَا عَلٰى جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ لَوَسِعَتْهُمْ قُلْتُ مَا يَقُوْلُ مَنْ يَغْسِلُ قَالَ يَقُوْلُ غُفْرَانَكَ يَا رَحْمٰنُ ـ (طحطاوى على المراقى الفلاح)

অর্থাৎ হে আলী! মৃতলোকদের গোছল দিও। কেননা, যে লোক মৃত ব্যক্তিকে গোছল দেয় তাকে সত্তরবার মাফ করে দেওয়া হয়, যদি তার একবারের মাফ-ক্ষমাকে সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাহলে সবটীকে পরিবেষ্টিত করে ফেলবে। তিনি আল্লাহর প্রিয়নবী (দঃ) এর নিকট জানতে চাইলেন (হে আল্লাহর রাছূল! মৃত লোককে গোছল দেওয়ার সময় গোছলদানকারী কি বলবে? উত্তরে আল্লাহর রাছূল (দঃ) এরশাদ করলেন সে বলবে- غُفْرَانَكَ يَا رَحْمٰنُ (গুফরানাকা এয়ারাহমানু)

ওয়ারিশগণের মধ্যে যেলোক বেশী ঘনিষ্ট মুরদারকে ঐলোকেরাই গোসল দেওয়া মুস্তাহাব, গোসলের নিয়ম পদ্ধতি তার জানা না থাকলে অন্য কোন দ্বীনদার পরহেজগার মুসলমান ব্যক্তি দ্বারা গোছল করানো মুস্তাহাব।

যিনি মৃত ব্যক্তিকে গোছল দেবেন, তিনি প্রথমে নিজে অযু করে নেবেন, যে খাটিয়া কিংবা তক্তায় রেখে গোসল দেওয়া হবে গোসল দেওয়ার ঐ খাটিয়া-তক্তার চর্তুর্দিকে খুশবু লোবান বাতির বেজোড় সংখ্যক বার ধোঁয়া দেওয়া উত্তম।

গোসলের স্থানের চারিদিকে পর্দা-ঘেরাও এর ব্যবস্থা করে নেওয়া জরুরী। ইমাম নাখয়ী (র)-এর মতে গোসলের জায়গার উপরেও পর্দা টাঙ্গিয়ে দেওয়া উত্তম তবে আবদ্ধ ঘরে/রুমে গোসল দিলে এভাবে পৃথক পর্দা টাঙ্গানোর প্রয়োজন নেই। গোসল দানের স্থানে গোসল দানকারীরও তার সহযোগিতাকারীরা ব্যতীরেকে অন্য কারো প্রবেশ না করাই মুস্তাহাব।

✪ প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর শোয়ায়ে তার নাভী হতে হাটু পর্যন্ত কাপড় দ্বারা ঢেকে নিবে। গোছলের সময় যেন নাক, মুখ ও কানের ভিতর দিয়ে পানি প্রবেশ করতে না পারে তজ্জন্যে ঐ সব স্থান তুলা দ্বারা বন্ধ করে দিতে হয়।

✪ পায়খানা-পেশাবের জায়গায় (ময়লা থাকুক বা নাই থাকুক) উক্তস্থানদ্বয় এক খন্ড কাপড় দ্বারা কুলুখ করে পরে পানি দ্বারা ভাল করে পরিস্কার করে দিতে হয়, ঐসব লজ্জাস্থান পরিস্কার করা এবং ধৌত করার সময় গোছলদানকারী নিজের হাতে একখানা কাপড় জড়িয়ে নিবে। কারণ খালি হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা হারাম, তদুপরি লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও সম্পূর্ণ হারাম।

✪ অতঃপর বরই (কুল) পাতা সিদ্ধ গরম পানি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে অযু করিয়ে দেওয়া লাগে, জীবিত লোককে যেমনিভাবে ডান দিক থেকে অযুর কাজ শুরু করে যেতে হয়-মুরদার লোককে ও তেমনি ভাবে ডান দিক থেকে অযু করিয়ে দেওয়া লাগে, সাধারণ ভাবে অযু করানোর সময় কুলি করাতে হয়না- নাকের ভিতর পানিও দেওয়া লাগেনা, তবে সম্ভব হলে ভিজা কাপড় দ্বারা মুখের দন্তপাটিদ্বয় ও উহার গোড়া এবং মুখ গহবর ও নাসিকার ছিদ্র পথ পরিস্কার করতঃ মূছে দিতে পারলে খুবই ভাল হয়,

কিন্তু মৃত হায়েজ-নেফাছ ওয়ালী মেয়ে লোক হলে কিংবা স্ত্রী অথবা পুরুষলোক গোছল ফরজ হওয়া অবস্থায় মারা গেলে উল্লেখিত নিয়মে ভিজা কাপড় দ্বারা মুখ ও নাসিকার ভিতর অংশ মূছে দেওয়া জরুরী।

✪ প্রথমে মুখ তারপর দু'হাত দু'কনুই পর্যন্ত ধৌত করে দিতে হয়। এরপর মাথা মোছাহ করাতে হয়, পরিশেষে উভয় পা ধূয়ে দিতে হয়। মাথা ও দাড়ি সাবান দ্বারা ধুয়ে দেওয়া ভাল। সারা শরীরেও সাবান দেওয়া যায়। অতঃপর বাম করটে শোয়ায়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ডান পাশে মাথা হতে পা পর্যন্ত এমনভাবে পানি ঢালতে হয় যাতে খাটিয়ার সাথে লাগানো শরীরের অংশেও পানি পৌছে। এরপর ডান কাত করে শোয়ায়ে বাম পাশে মাথা হতে পা পর্যন্ত পূর্ব নিয়মে পানি ঢালতে হয়।

প্রত্যেক করটে তিনবার করে পানি ঢালা ছুন্নাত। পানি ঢালার সময় প্রথম ও দ্বিতীয়বার বরই পাতা সিদ্ধ পানি এবং তৃতীয়বার কাফুর মিশানো পানি ঢেলে শরীর ধৌত করবে।

অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে একটু বসাতে হয়-বসিয়ে আস্তে আস্তে পেট মালিশ করতে থাকবে। এতে কোন প্রকারের নাপাকী বের হলে তা ভাল করে ধুয়ে দিতে হয় এবং একারণে পুনঃ অযু-গোছল করানো লাগে না। এর পরে মুরদারের শরীর থেকে কোন প্রকারের ময়লা বের হলেও পুনঃ অযু গোছল দেওয়া লাগে না। কারণ ওযু-গোছল দেওয়ার পর মুরদারের শরীর থেকে পুনঃ ময়লা বের হলেও জীবিত লোকদের ন্যায় এর দ্বারা তার পূর্বের অযু-গোছল নষ্ট হয়ে যায় না। শুধু মাত্র ময়লাগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে ঐ জায়গাটা মাছেহ্ করে দিলেই সারে।

✪ গোছল দেওয়া শেষ হলে শুকনা কাপড় দ্বারা মুরদারের শরীরকে ভাল করে মুছে দিবে। কিন্তু দাড়িও মাথায় চিরুনী ব্যবহার করা যায়না।

অতঃপর কোন পাক-পবিত্র বিছানা বা খাটে পূর্ণ শরীর কাপড় দ্বারা আবৃত করে উত্তরদিকে মাথা দিয়ে কেবলা মূখী করতঃ শোয়ায়ে রাখবে। মৃতলাশের উপর আতর-সুগন্ধি ছিটিয়ে দেবে, লোবানের ধোঁয়া দেবে।

✪ গোছল দেওয়ার আগে লাশের পাশে বসে কোরআন করিম তেলাওয়াত করা মাকরূহ।

শরহে মুনিয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে–

وَيُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عِنْدَهُ حَتّٰى يُغْسَلَ . صفحـ۱۲۲

হায়েজওয়ালী মহিলারও গোছল ফরজ হওয়া অবস্থায় লাশের পাশে বসা জায়েজ–

وَلَا بَأْسَ بِجُلُوْسِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ عِنْدَ الْمَيِّتِ اِنْتَهٰى .
(شَرح مَنية صفحـ۱۲۲)

✪ যদি গোছলের পরক্ষণেই কাফন পরানো হয় তাহলে কাফন পরানোর পর-আর যদি কাফন পরাতে দেরী করা হয় তাহলে উপরিউল্লেখিত আবৃত অবস্থায় লাশের মাথার দিকে বসে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে থাকবে– এবং অন্যান্য দিকে বসে তাছবীহ তাহলীল পাঠ করত ঃ মৃতব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করতে থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফন পরানোর মাছায়েল

মুছলমান মৃতলোককে কাফন পরানো ফরজে কেফায়া।

পুরুষ মৃত লোককে (১) লেফাফা (বড়চাদর) (২) ইজার (ছোট চাদর) ও (৩) কামিছ–এ তিন কাপড় দ্বারা এবং স্ত্রীমৃতলোককে (১) লেফাফা (বড়চাদর) ২) ইজার (ছোটচাদর) (৩) কামিছ (৪) ছিনাবন্দ ও (৫) ছেরবন্দ-এ পাঁচ কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া ছুন্নাত।

✪ পুরুষকে তিন কাপড়ের, স্থলে দু'কাপড় অর্থাৎ লেফাফা ও ইজার এবং মেয়ে লোককে পাঁচ কাপড়েরর স্থলে তিন কাপড় অর্থাৎ (১) লেফাফা ইজার ও ছেরবন্দ দ্বারা কাফন দেওয়া জায়েজ, এর চেয়ে ও কম কাপড়ে কাপন দেওয়া মাকরূহ তবে ঠেকাবশতঃ জায়েজ আছে।

বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী ছেলে মেয়েদের জন্যে ও এ হুকুম, শিশু কেও ছুন্নাত অনুযায়ী কাফন দেওয়া উত্তম (শামী)।

কামিছ ঃ মুরদার এর বুক ও পিঠের উভয় দিকে গলা হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হয় মত কাপড় মেপে নিয়ে ঠিক মাঝখানে অনায়াসে মাথা ঢুকানো যায়মত কিছুটা কেটে দিয়ে বুকের দিক সামান্য (ছিড়ে) ফেটে দিতে হয়।

✪ লেফাফা (বড় চাদর) ঃ এতুটুকু লম্বা হওয়া আবশ্যক যাতে মাথা ওপায়ের উভয় দিকে গিরা দেওয়া যায়

✪ ইজার (ছোট চাদর) ঃ ইহাও প্রায় লেফাফার মতই, তবে লেফাফার চেয়ে ইজার ২/১ ইঞ্চি খাট হলেও চলে, যত পরিমাণ কাপড় হলে মূর্দারের এ পাশ ওপাশ মোড়ানো যায়-লেফাফা এবং ইজার এর ততটুকু প্রস্থ দিতে হয়।

✪ ছিনাবন্ধ ঃ মেয়ে লোকদের স্তনদ্বয় হতে রান পর্যন্ত লম্বা দেওয়া যায়মত পরিমাণের কাপড় প্রয়োজন। কারও কারও মতে নাভী পর্যন্ত লম্বা দেওয়া যায়মত দৈর্ঘের কাপড় হলেও চলে। অনুমানিক তিন হাত লম্বা হলেই হয়, ইহা দ্বারা মুরদারের স্তনদ্বয় ও ছিনা হতে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত প্রস্থে পৌছিয়ে দিতে হয়।

✪ ছেরবন্ধ ঃ ইহার দৈর্ঘ আড়াই হাত এবং প্রস্থ এক/দেড়হাত হতে হয়, কতেক ওলামায়ে কেরামদের মতে যতটুকু কাপড়ে মাথা ঢাকা যায় ততদূর দৈর্ঘ-প্রস্থ দিতে হয়।

✪ নূতন বা/ পুরাতন উভয় প্রকারের পাক-পবিত্র কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া যায় কিন্তু পুরাতন কাপড় ধোয়া-পরিষ্কার হতে হয় (আলমগীরী)।

✪ সাদা কাপড় দ্বারায় কাফন দেওয়া সবচেয়ে উত্তম, যেহেতু নবীয়ে পাক(দঃ) মৃত লোকদেরকে সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়াটাকে উত্তম বলেছেন।

হলুদ, জরদা ও লাল রং ইত্যাদি কাপড় এবং রেশমী কাপড় দ্বারা পুরুষ লোককে কাফন দেওয়া হারাম। সাদাকাপড়ের অভাবে এমনিভাবে সূতী বস্ত্রের অভাবে উক্ত সব কাপড় দ্বারা প্রয়োজন বোধে কাফন দেওয়া যায়। কিন্তু মেয়ে লোকদের কে উক্ত প্রকারের কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া জায়েজ, তবে তাদেরকেও সাদা সুতির কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়াটাই সবচেয়ে উত্তম।

◆ **কাফন পরানোর নিয়ম ঃ**

কাফনের কাপড় গুলোকে সর্ব প্রথম লোবাণের ধূয়া, কাফুর ও আতর গোলাপ ইত্যাদি ছিটিয়ে সুগন্ধময় করে নিতে হয়।

মুরদার পুরুষ হলে খাট বা বিছানার উপর প্রথমে লম্বা ভাবে লেফাফা (বড় চাদর) এবং উহার উপর ইজার (ছোট চাদর) বিছাতে হয়। এ উভয়ের উপর কামিছের নীচের অংশ বিছাতে হয় এবং কামিছের উপরের অংশটাকে গুটিয়ে মাথার কাছে রেখে দিতে, হয়। অতঃপর লাশটাকে কয়েকজন লোকে বহন করে এনে কামিছের মাঝখানের ভিতর দিয়ে লাশের মাথা ঢুকিয়ে কামিছের ঘুছানো উপরের অংশটা পা পর্যন্ত টেনে দিতে হয়।

অতঃপর লাশের পর্দাস্থান আবৃত পূর্বের কাপড় খানা এমন কৌশলে বের করে নিতে হয় যাতে মুরদার উলঙ্গ হয়ে নাযায়।

এরপর মুরদারের শরীরের সিজদার স্থান সমূহ যেমন-কপাল, নাসিকা, হাটুদ্বয়, হাতের তালু ও আঙ্গুলী, পায়ের তলাও পায়ের আঙ্গুলির অগ্রভাগে কাফুর মালিশ করতে হয়, সাথে সাথে সম্ভব মত জাফরান, মিশক-আম্বর ও অন্যান্য আতর জাতীয় সুঘ্রাণ সমূহ ব্যবহার করা ও উত্তম।

মৃতকে কামিছ পরানোর পর উল্লেখিত নিয়মে আতর খুশবু মালিশ করত ঃ বিনা কালিতে শাহাদত আঙ্গুলি দ্বারা কপালে শুধু "বিছমিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম এবং বুকে কলেমায়ে তৈয়্যাবাহ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ ও বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম লিখে দেওয়া উত্তম, এর বদৌলতে মূর্দারের উপর কবর আজাব সহজতর হওয়ার আশা করা যায় (জাদুল আখিরাত)

অতঃপর ইজারের (ছোট চাদরের) বাম পাশের বিছানো অংশকে ডানদিকে টেনে মুরদারের শরীরে মুড়িয়ে দিতে হয়, এরপর ইজারের ডান পার্শের বিছানো অংশকে বামদিকে টেনে বাম দিক থেকে উঠানো ইজারের কাপড়ের উপর দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া লাগে।

এরপর লেফাফার (বড় চাদরের) বাম পার্শের বিছানো অংশকে ডান দিকে টেনে মুরদারের শরীরে মুড়িয়ে দিতে হয়, অতঃপর ডানদিকে বিছানো লেফাফার অংশটাকে উঠিয়ে বাম দিকে এনে বামদিক থেকে উঠানো লেফাফার কাপড়ের উপর দিয়ে জড়িয়ে দিতে হয়।

✪ মৃত ব্যক্তি যদি আমলওয়ালা, প্রশীদ্ধ হক্কানী আলেমে দ্বীন ও হক্কানী পীর-মাশায়েখ জাতীয় লোক হন, তখন কাফন পরানোর সময় উনার মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেওয়া উত্তম।

✪ যেমন ফতোওয়ায়ে আলমগীরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

وَلَيْسَ فِى الْكَفَنِ عِمَامَةٌ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِى الْفَتَاوٰى اِسْتَحْسَنَهَا الْمُتَاخِّرُوْنَ لِمَنْ كَانَ عَالِمًا وَيُجْعَلُ ذَنَبُهَا عَلٰى وَجْهِهٖ بِخِلَافِ حَالِ الْحَيٰوةِ كذا فى الجوهرة النيرة ـ صفحـ ١٦٠

✪ মারাকিউল ফালাহ গ্রন্থে আছে-

(وَتُكْرَهُ الْعِمَامَةُ فِى الْاَصَحِّ) لِاَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِى كَفَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحْسَنَهَا بَعْضُهُمْ لِمَارُوِىَ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُعَمِّمُهٗ وَيُجْعَلُ الْعَذَبَةُ عَلٰى وَجْهِهٖ ـ

✪ তাহতাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

(قَوْلُهٗ وَاسْتَحْسَنَهَا بَعْضُهُمْ) وَهُمُ الْمُتَاخِّرُوْنَ وَخَصَّهٗ فِى الظَّهِيْرِيَّةِ بِالْعُلَمَاءِ وَالْاَشْرَافِ دُوْنَ الْاَوْسَطِ كَمَا فِى النَّهْرِ وَغَيْرِهٖ صفحـ ٣٨٠

✪ শরহে মুনিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

(قَوْلُهٗ اَوْ عِمَامَتَه) نُقِلَ عَنِ الدُّرِّ وَالدِّرَايَةِ وَاسْتَحْسَنَ الْعِمَامَةَ الْمُتَاخِّرُوْنَ لِلْعُلَمَاءِ وَالْاَشْرَافِ صفحـ ٥٤٨

◆ **মেয়েলোকদের কাফন পরানোর নিয়ম হচ্ছে ঃ**

খাটে প্রথমে ছিনাবন্ধ খানা প্রস্থের দিক করে বিছাতে হয় অতঃপর লেফাফা (বড় চাদর) খানা এর উপরে বিছাতে হয়, এর পর এ লেফাফার উপরে ইজার (ছোট চাদর) খানা বিছাতে হয়।

অতঃপর চর্তুদিকে পর্দা করে পুরুষের কামিছ পরানোর পূর্বে বর্ণিত নিয়মে মহিলা মুরদার কেও কামিছ পরাতে হয়। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উক্ত মহিলা মৃতলোকের শরীর ঢাকা-পূর্বের কাপড় খানা এরূপ কৌশলে লাশ থেকে বের করে নিতে হয় যাতে মহিলা মুরদারের শরীর উলঙ্গ হয়ে না যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ এরপর মাথার চুলগুলোকে দু'ভাগ করত ঃ মাথার দু'দিকের কাঁধের উপর দিয়ে এনে ছিনায় কামিছের উপর রাখতে হয়। অতঃপর "ছুরবন্ধের" কাপড়ের মধ্যম অংশ দ্বারা পুরা মাথা মুড়িয়ে (ঢেকে) এর দু'পাশের ঝুলানো দু'অংশ কাপড় দ্বারা দু'কাধে রাখা চুলগুলো ঢেকে কাপড়ের মাথা দু'খানা স্তনদ্বয় ও পেটের উপর রাখতে হয়।

✪ এরপর পুরুষ মুরদার কে কাফন পরানোর পূর্বে বর্ণিত নিয়মে মেয়ে মুরদার কেও প্রথমে ইজার অতঃপর লেফাফার বিছানো অংশদ্বয়কে জড়িয়ে দিতে হয়।

সবশেষে "ছিনাবন্ধ এর বাম দিকের বিছানো অংশটা উঠিয়ে ডানদিকে টেনে জড়িয়ে দেবে অতঃপর ছিনাবন্ধের ডানদিকের বিছানো অংশটা উঠিয়ে বাম দিকের উঠানো অংশের উপর জড়িয়ে দেবে।

✪ কাপড় জড়ানোর কাজ শেষ হলে মুরদারের মাথা ও পায়ের উভয় দিকের কাপড়ে, প্রয়োজনে লাশের মাঝখানে ও টুকরা কাপড় দ্বারা সাময়িক ভাবে বেধে দেওয়া ভাল যাতে করে কাফন খুলে যেতে না পারে।

✪ কাফন পরানোর পর কোন কারণে যদি জানাযার নামায আদায়ে বিলম্ব করতে হয়, তাহলে লাশকে অবহেলায় ফেলে রাখা কিংবা তার লাশকে ঘিরে বসে আজে বাজে গল্প- আলাপের চেয়ে তার মাথার দিকে কোরআন পাক তেলাওয়াত করা এবং অন্যান্য দিকে তাছবীহ-তাহলীল পাঠ করা উত্তম।

অতঃপর যখন লাশকে জানাযার নামাযের জন্যে নিয়ে যাবে তখন কমপক্ষে খাটের চার কোনকে চারজন লোক কাধে তোলে বহন করে নিয়ে যাওয়া ছুন্নাত।

১। খাট বহনকারীগণের ডানপাশের আগের পিছনের উভয়জনই তাদের ডান কাধেই খাট বহন করবে আর বাম পাশের আগের পিছনের উভয়জনেই তাদের বাম কাধে খাট বহন করবে।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা দ্বীনদার ও পরহেজগার তারই প্রথম মুরদার এর খাট খানা উঠানো মুস্তাহাব।

✪ খাট খানা কাঁধে উঠানোর সময় "বিছমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাছুলিল্লাহি" বলাও মুস্তাহাব।

✪ লাশ বোঝাই খাটখানা ঘর বাড়ী থেকে বের করার সময় প্রথমে মাথার দিকই বের করতে হয়। এমনিভাবে মাথার দিক সামনে রেখেই লাশকে জানাযার নামাযের জায়গায় কিংবা কবরস্থানে দফন করার জন্যে নিয়ে যেতে হয়।

✪ মৃতলোকের লাশ জানাযা নামাযের উদ্দেশ্যে বহন করে নিয়ে যাওয়ার শুরুতে মন্‌জিল করা মুস্তাহাব (আলমগীরী/ বাহরুর রায়েক)

✪ যেহেতু হুজুর পূরনূর (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এরূপ মনজিল করে চল্লিশ কদম হাটবে, আল্লাহ তাআলা তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

◆ **মনযিল করার নিয়ম ঃ**

লাশ কাঁধে নিয়ে দশ কদম হাটার পর খাট কাঁধে রাখা অবস্থায় লাশ বহনকারীগণের ডান পাশের সম্মূখ কোণের লোকটি ডান পাশের পিছন কোণে চলে আসবে, ডানপাশের পিছন কোণের লোকটি বাম পাশের পিছনের কোণে চলে যাবে। বাম পাশের পিছন কোণের লোকটি বাম পাশের সামনের কোণে চলে যাবে, বাম পাশের সম্মূখ কোণের লোকটি ডান পাশের সামনের কোণে চলে আসবে।

প্রতি দশ কদম চলার পর থেমে বহনকারীগণ সামনের ডান দিকের লোক পিছনে নেমে কোণ পরিবর্তন করে যাবে, এভাবে চারবার থেমে চারবার ঘুরলে প্রথমে যে লোক যে স্থানে ছিল সে লোক পুনঃ তার প্রথম স্থানেই এসে পৌছবে।[১]

✪ বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত মুরদার কে নেওয়ার পথে নামানো ঠিক নয়।

✪ মুরদারের খাট শুধুমাত্র দু'জনে কাঁধে বহন করে নেওয়া মাকরূহ, কিন্তু বিশেষ কোন কারণ দেখা দিলে দু'জনের কাঁধে করে নেওয়া মাকরূহ নয়।

✪ মুরদারের পাছে পাছে পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম। সবলোক মুরদারের সামনে চলা মাকরূহ, কিছু সামনে কিছু পিছনে হলে অসুবিধা নেই তবে মুরদারের আগে আগে যাওয়ার চেয়ে পিছে পিছে যাওয়াটাই সবচেয়ে উত্তম।

✪ লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে কলেমায়ে তৈয়্যেবা– কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করা বা এ জাতীয় অন্য কোন জিকির করা কিংবা কোরআন তেলাওয়াত করাকে কেউ কেউ মাকরূহে তানজীহ্ বললেও নিরবে মনে মনে পড়াটাকে সবাই জায়েজ বলেছেন।

টীকা ঃ

وسن فی حمل الجنازة اربعة من الرجال فیکره ان یکون الحامل اقل من ذلك وان یحمل علی الدابة والظهر لعدم الاکرام واللام للعهد ای جنازة الکبیر فلو کان صغیرا جاز حمل الواحد ـ وان یبدأ الحامل فیضع مقدمها ای مقدم الجنازة علی یمینه ثم یضع مؤخرها علی یمینه ثم یضع مقدمها علی یساره ثم مؤخرها علی یساره فیتم الحمل من الجوانب الاربع و ینبغی ان یحملها من کل جانب عشرخطوات لقوله علیه السلام من حمل جنازة اربعین خطوة کفرت عنه اربعین کبیرة (ملتقی الابحر) و یمشی فی کل جانب عشر خطوات فیحصل اربعین خطوة قال علیه السلام من حمل جنازة اربعین خطوة کفرت عنه اربعین کبیرة کما فی المنح ـ (الدرر علی الغرر)

✪ نصب الراية নামক কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْشِىْ خَلْفَ الْجَنَازَةِ اِلَّاقَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُبْدِيًا وَرَاجِعًا ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রঃ) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন ঃ মুরদারের পিছে পিছে চলাকালে হুজুর পূরনূর (দঃ) থেকে শুধু কলেমায়ে তৈয়্যেবাহ পড়তেই শুনা গিয়েছে, এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় কলেমায়ে তৈয়্যেবার জিকির করা জায়েজ।

আলমগীরী কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ فَاِنْ اَرَادَ اَنْ يَذْكُرَ اللّٰهَ يَذْكُرُ فِىْ نَفْسِهٖ

অর্থাৎ, লাশ নিয়ে যাওয়ার সাথে আল্লাহর জিকির করতে চাইলে মনে মনে নিরবেই জিকির করবে।

"আল-হাদীকাতুন নাদীয়া" কিতাবে হযরত আল্লামা ইমাম শা'রানী (রঃ) এর মত বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ-

لَكِن بَعْضُ الْمَشَائِخِ جَوَّزُوا الذِّكْرَ الْجَهْرِى وَرَفْعَ الصَّوْتِ با لتَّعْظِيْمِ قُدَّامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا لِتَلْقِيْنِ الْمَيِّتِ وَالْاَمْوَاتِ وَالْاَحْيَاءِ وَتَنْبِيْهِ الْغَفْلَةِ وَالظُّلْمَةِ وَزَطَالَةِ صَدَاءِ الْقُلُوْبِ وَ قَسْوَتِهَا بِحُبِّ الدُّنْيَاوَرِيَاسَتِهَا۔

✪ لواقع الانوار القدسية "নামক কিতাবে ইমাম শা'রানী (রঃ) হযরত আলী আল্ খাওয়াছ (রাঃ) এর মত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

وَكَانَ سَيِّدِىْ عَلِىُّ الْخَوَاصِّ رضى الله تعالى عنه يَقُوْلُ : اِذَا عُلِمَ مِنَ الْمَاشِيْنَ مَعَ الْجَنَازَةِ اَنَّهُمْ لَا يَتْرُكُوْنَ اللَّغْوَ فِى الْجَنَازَةِ وَيَشْتَغِلُوْنَ بِاَحْوَالِ الدُّنْيَا فَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّاْمُرَهُمْ بِقَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهٖ ـ بحوالۂ جاء الحق

অর্থাৎঃ হযরত আলী আলখাওয়াছ (রহঃ) বলেন, যখন অবস্থা পরিদৃষ্ট হয় যে, জানাযার সাথে গমনকারী লোকেরা অহেতুক গল্প-গুজব পরিত্যাগ করছে না এবং পার্থিব ধান্দায় লিপ্ত রয়েছে তখন একান্ত উচিত যে, তাদেরকে কলেমায়ে তৈয়্যবা পড়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া। কেননা সে অবস্থায় কলেমা না পড়ার চেয়ে পড়াটাই উত্তম। এভাবে আরও অনেক দলিল প্রমাণ এর স্বপক্ষে রয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয়-

মধ্যকার দুরুত্বের ব্যবধান প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জন্য অপসারিত করা হয় যার ফলে আল্লাহর নবী (স) স্বচক্ষে যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করে যাচ্ছিলেন এবং দেখে দেখে বর্ণনা দিয়ে যাচিছলেন যে, এখন আমার প্রিয় ছাহাবী যায়েদ বিন হারেছা ইসলামের ঝান্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, অতঃপর তিনি বললেন যায়েদ শাহাদাত বরণ করেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এর পরক্ষণেই আল্লাহর নবী (স) উনার জানাযার নামায আদায় করলেন অতঃপর বিশেষভাবে দোয়া মুনাজাত করলেন সাথে সাথে সকলকে আদেশ করলেন তোমরা ও তার জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা কর। এরপরই নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম শুভ সংবাদ দান করলেন যে, জায়েদ (রা) জান্নাতে প্রবশে করেছে এবং তথায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অতঃপর পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পুনরায় বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, এমাত্র জাফর তাইয়্যার ইসলামী ঝান্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, এরিই মাঝে আল্লাহর নবী (স) সংবাদ দান করলেন যে, সেও শাহাদাত বরণ করেছেন– এ বলে নবী করিম (স) তার জানাযার নামায আদায় করলেন এবং নামাযের পরক্ষণেই দোয়া মুনাজাত করলেন এবং উপস্থিত সকলকে তার উদ্দেশ্যে ইস্তেগফার করে যাওয়ার জন্য আদেশ করলেন, এরই মাঝে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) শুভ সংবাদ দিলেন যে, সে ও জান্নাতে প্রবেশ করেছে। বেহেস্তের বিভিন্ন স্থানে সে মনের আনন্দে ডানা মেলে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে।

পাঠকমন্ডলী !

উপরে উদ্ধৃত হাদীছ শরীফ খানায় দেখতে পেলেন যে, উক্ত মহান শহীদ ছাহাবায়ে কেরাম দ্বয়ের জন্য আল্লাহর পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জানাযার নামায আদায়ের পর বিশেষ ভাবে দোয়া-মুনাজাত করেছেন।

সুতরাং অত্র হাদীস শরীফ খানা দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে জানাযার নামাযের পর দোয়া-মুনাজাত করা বৈধ প্রমাণিত হল।

এছাড়া আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় যে জানাযার নামায আদায়ের দ্বারা মৃত মুসলমানের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক ফরয করে দেওয়া "দোয়া করার হক" আদায় করা হলেও এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য বেশী বেশী ও বার বার কল্যাণ ও মাগফেরাতের দোয়া করে যাওয়ার যে নফল হক সর্বকালের জন্য রয়েছে -এর প্রয়োজনীয়তা জানাযার নামায আদায়ের দ্বারা শেষ হয়ে যায়নি।

এক্ষেত্রে নিজেরই কল্যাণার্থে বেশী বেশী স্মরণ রাখা দরকার যে, মৃত্যুর পূর্বের চেয়ে মৃত্যুর পর মানুষের পরকালীণ বিপদ-সংকট বেড়েই যায়– তাই ঐ সময়কার সংকট বিপদে জীবিত মো'মেন বান্দাগণই নেক আমল সমূহকরতঃ ছাওয়াব রাছানী ও দোয়া মুনাজাতের দ্বারা মৃত ব্যক্তির কল্যাণ করতে পারে। আর এর দ্বারা মৃত লোকেরা অধিক হারে উপকৃত হয়ে থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছহী মুসলিম শরীফে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে প্রিয় নবী (স) এরশাদ করেছেন – مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ

অর্থাৎ তোমাদের যার নিকট তার অপর মুসলমান ভায়ের উপকার–কল্যাণ করার সামর্থ্য-সুযোগ রয়েছে সে যেন তার উপকার কল্যাণ করে যায়।

এ মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছুন্নী মুসলমানেরা

তাদের আপন জনদের মৃত্যুর পর বিবিধ শরীয়াত সমর্থিত তারীকা অবলম্বনে মৃত মুসলমানদের মাগ্‌ফেরাত-কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে থাকে, এর মধ্যে জানাযার নামাযের পরক্ষণে মাগ্‌ফেরাত কামনা করে দোয়া-মুনাজাত করাও একটি।

তদুপরি আমাদের দেশের ছুন্নী মুসলমানেরা নিজেদের মৃত আপনজনদের জানাযার নামায শেষে আল্লাহর পবিত্র কোরআন, কিছু নগদ টাকা পয়সা, কাপড়, চাউল ইত্যাদি আল্লাহর ওয়াস্তে দান করতঃ কিংবা আদায় কৃত খতমে কোরআন ও খতমে তাহ্‌লীল ইত্যাদিকে ওয়াছিলা রূপে অবলম্বন করত ঃ দোয়া-মুনাজাত করে থাকে।

এটা মূলতঃ মৃত ব্যক্তির জন্য অতীব কল্যাণকর একটি উত্তম আমল।

কারণ পবিত্র হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে

تَصَدَّقُوْا لِمَوْتَاكُمْ قَبْلَ الدَّفْنِ لَعَلَّ اللّٰهُ يُنْجِيْهِ بِذٰلِكَ (زاد الاخرة)

অর্থাৎ তোমাদের মৃতলোকদের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে তাদের দাফন করার আগে কিছু দান-ছদকা করে যেয়ো, কারণ এর অছিলায় আল্লাহ তায়ালার আজাব-শাস্তি থেকে তাদের নাজাতী (মুক্তি) প্রাপ্তির আশা করা যায়।

আর দানের মধ্যে কোরআন করিম কে আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার চেয়ে উত্তম দান আর কিছুই হতে পারে না।

সুতরাং জানাযার নামায শেষে কিছু দান-ছদকা করতঃ মৃতলোকের জন্য মাগফেরাত কামনা করে দোয়া-মুনাজাত করে যাওয়ার ব্যাপারে বাঁধা প্রদান করা উচিত নয়।

কাযা নামায-রোযার কাফফারা-ফিদ্‌য়া আদায়ে উদাসিনতা ঃ

এটা সকলেরই জানা বিষয় যে, আমাদের অনেক মৃত আপনজনদের ফরয-ওয়াজিব নামায ও রোজা সমূহ অনাদায়ীই থেকে যায়, ইচ্ছাকৃত বা অবহেলা জনিত কারণে তারা জীবদ্দশায় এসব কাযা নামায রোজা আদায় করে না দেওয়ার কারণে মৃত্যুর পর ভীষণ আজাব–শাস্তির মধ্যে পতিত হওয়ার পুরাপুরিই সম্ভাবনা থেকে যায়।

আর একথা সর্বজন বিধিত যে, মৃত্যুর পর ঐসব অনাদায়ী নামায রোযা আদায় করে দেওয়ার আর কোন সুযোগ অবকাশ কারো জন্য থাকেনা। কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষের আমল করার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এতদসত্ত্বেও পরম করুণাময় মহান আল্লাহ মো'মেন বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বীয় ঈমানদার বান্দাকে পরকালীন আজাব-শাস্তি থেকে মুক্তিদানের মানসে মৃতব্যক্তির জীবিত ওয়ারিশান কর্তৃক মৃতজনের কাযা নামায-রোযার কাফ্‌ফারা ফিদ্‌য়া দানে আপন মৃত জনকে আজাব মুক্ত করার একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা দান করেছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল যে, মৃত ব্যক্তির ঐ অনাদায়ী বিভিন্ন ফরয-ওয়াজিব নামায-রোজা ইত্যাদির আল্লাহ রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত করে দেওয়া কাফ্‌ফারা আদায়ের প্রতি আমাদের পক্ষ হতে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়না। গরীব অক্ষম মৃত মুসলমান ও তার গরীব অস্বচ্ছল ওয়ারিশানের জন্য ওজরখাহী করার একটা অবকাশ থাকতে পারে,

কিন্তু যে সব মুসলমান লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি নগদ টাকা এবং ধন-সম্পদ রেখে মৃত্যু বরণ করে থাকেন–আর তার জিম্মায় অসংখ্য ফরয ওয়াজিব নামায রোযা অনাদায়ী থেকে যায়,

এজাতীয় লোকদের ওয়ারিশানগণকে দেখা যায় যে, তারা হাজার /লক্ষ টাকা ব্যয় করে মহা ধুম-ধামের সাথে নিজের মৃত আম্মা-আব্বা ও দাদা-দাদী প্রমুখের যেয়াফত-মেজবানীর ব্যবস্থা করে থাকেন, অথচ যে কাফফারা-ফিদ্‌য়া আদায়ের বিধিখানা স্বয়ং আল্লাহ-রাসূল (স) ই দান করেছেন ছেলে-সন্তান ও অন্যান্য ওয়ারিশান তা আদায় করেনা বরং উহার প্রতি উদাসিন তাই প্রর্দশন করে থাকেন।

ইসলামের একমাত্র গ্রহণীয় সত্যপন্থীদল আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জামাতের মাছলাক অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফেরাতের জন্য ফাতেহা, খতমে কোরআন, খতমে তাহ্‌লীল ও নফল দান-ছদকা ইত্যাদির ন্যায় যেয়াফত-মেজবানী ও একটি উত্তম নেক আমল রূপে স্বীকৃত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব পুর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে-মৃতব্যক্তির ফরয-ওয়াজিব নামায রোযা-কাযা তথা অনাদায়ী থাকলে শরীয়াতের নির্ধারিত পরিমানে এর কাফ্‌ফারা-ফিদ্‌য়া আদায়ের ব্যাপারে স্বয়ং মৃত লোকের অছিয়্যত করে যাওয়া এবং ওয়ারিশ গণ ও তা আদায়ে স্বচেষ্ট থাকা। এর পরই যেয়াফত–মেজবানী ইত্যাদি ও ইছালে ছাওয়াব সম্পর্কিত অন্যান্য আমল সমূহ অবশ্যই মৃতলোকের মাগ্‌ফেরাতের জন্য কল্যাণকারী আমল রূপে গণ্য হবে।

ঈদুল ফিতরের ফিৎরা আদায়ের বেলায় যে হার শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত, কাযা নামায রোযার কাফ্‌ফারা স্বরূপ আদায়ের বেলায় ও সে একই হার নির্ধারিত।

পবিত্র হাদীস–ফেকাহ্‌র সিদ্ধান্ত অনুসারে এক ফিৎরার পরিমাণ হচ্ছে অর্ধ ছা' গম অর্থাৎ একসের সারে বার ছটাক–সতর্কতার জন্য পরিপুর্ণ দুসের গম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একদিনে পাঁচ ওয়াক্ত, ফরয নামায ও এক ওয়াক্ত বিতিরের ওয়াজিব নামায-মোট ছয় নামাযের জন্য দৈনিক কাফ্ফারা আসে বার সের গম, একমাসের নামাযের জন্য কাফ্ফারা আসে প্রায় ৯ (নয়) মন-গম। এবং এক বৎসরের জন্য আসে প্রায় ১০৮ মন গম।

মৃতব্যক্তি, যদি সামর্থবান, সম্পদশালী ও ধনী হয়ে থাকেন তাহলে উল্লেখিত নিয়মে তার ওয়ারিশগণ তারই রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অনাদায়ী ফরয ও ওয়াজিব নামায রোযার সর্বমোট হিসাব বের করত ঃ গম কিংবা এর মুল্যমানের নগদ টাকা ফকির মিছকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন।

আর মৃতব্যক্তি নিজে সামর্থ্যবান ধনী না হলেও তার ছেলে সন্তানেরা যদি সামর্থবান ধনীক শ্রেণীর হয়ে থাকে- সে ক্ষেত্রে তাদের ও উচিত মৃত মা-বাবার মাগফেরাতের জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে উপরুক্ত নিয়মে হিসাব করে মোট পরিমাণ বের করতঃ কাফ্ফারা হিসাবে দান করে যাওয়া।

কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি নিজে এবং তার আওলাদগণের কেও ধনী পর্যায়ের না হয়ে অস্বচ্ছল পর্যায়ের হয়ে থাকে-

এক্ষেত্রে মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরামগণের কোরআন-হাদীস ভিত্তিক গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত হচ্ছে-

মৃতব্যক্তির ওয়ারিশগণ আপন মৃতজনের মাগফেরাত নাজাতির নিয়্যতে নিজ নিজ সামর্থানুসারে যত ওয়াক্ত নামাযের কাফ্ফারা আদায় করা তাদের দ্বারা সম্ভব হয় সে পরিমাণ গম বা এর সমমূল্যের টাকা নিবে।

(যেমন কারো ওয়ারিশগণ তাদের মৃত আপনজনের এক মাসের কাযা নামাযের কাফফারা-ফিদ্য়া বাবৎ নয়মন-গম কিংবা এর সমমূল্যের নগদ টাকার ব্যবস্থা করল, অতঃপর এ টাকা কোন এক ফকির-মিছকিনকে কাফ্ফারা স্বরূপ দিয়ে দেবে। ঐ ফকির লোক উক্ত গম বা টাকা গুলো পুনঃদাতা লোকটিকে হেবা তথা দান করে দিবে। দাতাব্যক্তি ঐটাকা পুনঃ ঐমিছকিন লোকটিকে মৃতজনের নামাযের কাফ্ফারা হিসাবে দান করে দিবে, এভাবে উক্ত টাকা একে অপরকে বারবার দিবে ও নিবে। এতে প্রত্যেক বারের আদান প্রদানের দ্বারা এক এক মাসের নামাযের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

এরূপে ১২ বার আদান-প্রদান করলে এক বৎসরের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। এ নিয়মে মাস/ বৎসরের কাফ্ফারা দাতা ও মিছকিন লোকটি নিজেদের পরস্পরের মধ্যে পুনঃপুন আদান-প্রদান করতঃ হিসাব কৃত সম্পূর্ণ কাফ্ফারা আদায় করে যাবে। নামাযের কাফ্ফারা আদায় করার পর এ নিয়মে অনাদায়ী কাযা রোযা সমূহের কাফ্ফারা ও আদায় করা যায়।

এতে আশা করা যায় দয়াময় প্রভূ আল্লাহ তায়ালা চাহেন তো ঐ মৃত লোকটির কাযা নামায-রোযার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

ইহাই হচ্ছে গরীব-মিছকিন লোকদের কাযা নামায রোযার কাফ্ফারা আদায়ের শরীয়াত কর্তৃক বাতলানো "হিলা" তথা নিয়ম একে শরীয়াতের পরিভাষায় "এসকাত" ও বলা হয়।

ফতোয়ায়ে কাযীখান, বাহ্রুর রায়েক, শামী ও আলমগীরী প্রভৃতি গন্থে অনুরূপ হিলা মূলক পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশের ছুন্নী মুসলমানেরা মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায শেষে আল্লাহর পবিত্র কোরআন এবং কিছু নগদ টাকা-পয়সা ও চাউল ইত্যাদি আল্লাহর ওয়াস্তে দান-ছদকা করতঃ মৃতব্যক্তির জন্য মাগফেরাতের দোয়া-মুনাজাত করে থাকেন-এটা নিঃসন্দেহে মৃতব্যক্তির পরকালীণ নাজাতের জন্য অত্যন্ত কল্যানকর একটি উত্তম আমল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, জানাযার নামায শেষে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল-সক্ষম ধনী আওলাদগণের পক্ষ থেকে একখানা কোরআন শরীফ ও শ/দু'শ টাকা হাঁতে রেখে বলা হয়ে থাকে এমৃত ব্যক্তির জীবনের ফরয-ওয়াজিব নামায ও রোযা ইত্যাদির যা যা কাযা অর্থাৎ অনাদায়ী রয়ে গেছে আনুমানিক ৩০/৪০ বৎসরের হিসাবে এর কাফ্ফারা আসে এত টাকা, (আনুমানিক ৮০ /৯০ হাজার টাকা) অত্র কোরআন করিমের হাদীয়া উক্ত ৮০/৯০ হাজার টাকা ধার্য করতঃ এ মৃত লোকের জীবনের ফরয ওয়াজিব নামায/ রোযার কাফ্ফারা স্বরূপ এ কোরআন শরীফ খানা দান করা হচ্ছে- কেউ নেওয়ার আছেন কি? তখন কোন একজন লোক এসে আমি নেওয়ার আছি বলে এটাকে নিয়ে যান।

এ জাতীয় হীলা মূলক কাফ্ফারা আদায় দ্বারা শরীয়াত নির্ধারিত প্রকৃত কাফ্ফারা আদায়ের গুরুত্বপুর্ণ মহা জিম্মাদারী কে স্বচ্ছল/ধনী ছেলে-সন্তান প্রমুখ ওয়ারিশগণকে এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। আর মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া লক্ষ লক্ষ টাকাও ধন সম্পদ অনায়াসে ভোগ করতে থাকেন।

ইসলামী শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী প্রকৃত পক্ষে এরূপ ছাদকা দ্বারা কোন মৃত লোকের ফরয/ ওয়াজিব নামায / রোযার কাফ্ফারা মোটেই আদায় হয়না।

হাঁ আল্লাহর পবিত্র কোরআন ছাদ্কা করার ছাওয়াবটাই মাত্র সে পেয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উপ-মহাদেশের আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহান ইমাম, যুগশ্রেষ্ঠ মুজ্তাহিদ ফকীহ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান (র) জগতখ্যাত স্বীয় ফতোওয়া গ্রন্থে বলেন-

قران مجید کسی مسلمان کو دے کراسکا ثواب میت مسلم کو پہنچانا

pdf By Syed Mostafa Sakib

جائزہے / کفارے کے عوض میں قران مجید کی جو حیلہ یہاں عوام میں رائج ہے محض باطل اور بے سود ہے فتاوی رضویہ صفحہ۱۶۱/۲۰٤

অর্থাৎ একখানা পবিত্র কোরআন মাজিদ কোন মুসলমানকে দান করে এর ছাওয়াব মৃত মুসলমানের (রূহে) পৌছানো শরীয়াত সম্মতই বটে।

(পুরা জীবনের নামায/ রোযার) কাফ্ফারা স্বরূপ একখানা কোরআন শরীফ দান করে (প্রকৃত কাফ্ফারা আদায় করা থেকে) রেহাই পাওয়ার যে হীলা মূলক রেওয়াজ আম জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত রয়েছে ইহা নিরেট বাতেল (অগ্রহনীয়) পদ্ধতি এবং ফলহীন একটি প্রথা।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অপর মহা মনিষি, হাকীমুল উম্মাৎ হযরতুল আল্লামা মুফতী আহমদ এয়ার খান নাঈমী (র) স্বীয় প্রখ্যাত গ্রন্থ "জাআল হক্কে" বলেন–

پنجاب میں جوعام طورپرمروج ہے کہ مسجد سے قران پاک کانسخہ منگا یا اس پر ایك روپیہ رکھا اور چند لوگوں نے اسکو ھاتہ لگایا پھر مسجد میں واپس کردیا اس سے نمازوں کا فدیہ ادانہ ہوگا۔ بعض لوگ یہ کھتے ہیں کہ قران کی کوئی قیمت ہی نہیں لہذ اجب قران شریف کا نسخہ خیرات کر دیا سب نمازون کا فدیہ ادا ہو گیا مگریہ غلط ہے کیونکہ اسمیں اعتبار تو قران کے کاغذ لکھائی چھپائی کا ہے اگر دور پیہ کا یہ نسخہ ہے تودورو پہ کی خیرات کا ثواب ملیگا ورنہ پھروہ مالدا رجن پر ہزار روپیہ سالانہ زکوۃ واجب ہوتی ہے وہ کیوں اتنا خرچ کریں صرف ایك قران پاك کا نسخہ خیرات کردیا کریں غرضیکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہیں ہے طریقہ صحیح نہ ہونکے یہ معنی ہیں کہ اس سے اسقاط کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔ نہ کہ حرام ہے بلادلیل کسی شئ کوصرف اپنی رائے سے حرام کہنا تو فضلائے دیوبندھی کا کام ہے بقدر خیرات ثواب مل جائیگا جاء الحق صفحہ۳۸۳ - ۳۷٤

✪ নামায আদায়ের পর কাতার না ভেঙ্গে ঐ কাতারবদ্ধ অবস্থায় দোয়া করা অনুরূপ ভাবে দোয়া-মুনাজাতের জন্য দীর্ঘ ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা দোয়া মুনাজাতকে অতিশয় লম্বা করতঃ দাফন কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ঠিক নয়। কতেক ফোকাহায়ে কেরাম এসব কারণেই জানাযার নামাযের পর দোয়া-মুনাজাত করাকে মাকরূহ (তানজীহ) বলেছেন।

✪ একজন লোক ইমামের প্রথম তাকবীর বলার পর জানাযার নামাযে এসে উপস্থিত হল। সে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীর বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইমাম দ্বিতীয় তাকবীর বলার সাথে সাথে সেও তাকবীর বলে জানাযার নামাযে শামিল হয়ে পড়বে। ইমাম নামাযের ছালাম ফিরিয়ে নিলে ঐ লোক লাশখানি মাটি থেকে উঠানোর পূর্বেই তাড়াতাড়ি বাকী তাকবীর বলে নামায শেষ করবে।

✪ এমনিভাবে কেউ ইমামের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় তাকবীর বলার পর উপস্থিত হলে ইমামের পুনঃ তাকবীর বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকবে। ইমামের তাকবীর বলার সাথে সাথে সেও তাকবীর বলে নামাযে শামিল হয়ে পড়বে। ইমামের ছালাম ফিরানোর পর ঐ লোক বাকী তাকবীরগুলো বলে নামায সমাপ্ত করবে।

ইমামের ৪র্থ তাকবীর বলার পর ছালাম ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্বে কেউ উপস্থিত হলে বিশুদ্ধ মতানুসারে তাড়াতাড়ি নিজে নিজে তাকবীর বলে নামাযে শরীক হয়ে যাবে। এবং মৃতদেহ মাটি থেকে উঠিয়ে নেওয়ার আগেই অবশিষ্ট তিন তাকবীর তাড়াতাড়ি বলে নিবে। ইহাতে কোন দোয়া-দরূদ পাঠ করা লাগবেনা (শামী)।

জানাযার নামাযের জামাত না পাওয়ার আশংকা দেখা দিলে তায়াম্মুম করত ঃ জানাযার নামাযে শরিক হওয়া যায়।

বার বার জানাযার নামায আদায় প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যে কোন মৃত মুসলিম পুরুষ-নারীর জন্য শুধুমাত্র একবারই জানাযার নামায আদায় করা ফরযে কেফায়া,

অতএব, প্রথমবার জানাযার নামায আদায়ের দ্বারা উক্ত ফরযে কেফায়ার হক আদায় হয়ে যাওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার জানাযার নামায আদায় করার আর কোন প্রয়োজন থাকেনা।

দ্বিতীয়বার /তৃতীয়বার জানাযার নামায আদায় করাটাকে নফল হিসাবে গণ্য করে আদায় করাযেত যদি শরীয়াতে জানাযার নামায কে নফল হিসাবে আদায় করার বৈধতা থাকত। কিন্তু যেহেতু নফল হিসাবে জানাযার নামায আদায় করা শরীয়াত কর্তৃক অনুমোদিত নয় সুতরাং দ্বিতীয়বার/ তৃতীয়বার অর্থাৎ বার বার জানাযার নামায আদায় করা যায় না। যেমন– غُنْيَةٌ شَرْحِ مُنْيَةٍ গ্রন্থে বলা হয়েছে–

تَكْرَارُ الصَّلٰوةِ عَلٰى مَيِّتٍ وَّاحِدٍ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ

✪ طحطاوى গ্রন্থে বলা হয়েছে–

سُقُوْطُ فَرْضِهَا بِوَاحِدٍ فَلَوْ اُعَادُ وَاتَكَرَّرَتْ وَلَمْ تُشْرَعْ مُكَرَّرَةً

অর্থাৎ জানায়ার নামাযের ফরযিয়্যাত যে কোন একজন মুসলমানের নামায পড়ার দ্বারা আদায় হয়ে যায়,

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর যদি অন্যান্যরা জানাযার নামায আদায় করতে যায় তাহলে তা বারবার জানাযার নামায আদায়ের পর্যায়ে পড়ে-অথচ শরীয়াতে জানাযার নামায বার বার আদায়ের বিধান নাই।

✪ جَامِعُ الرُّمُوْز গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ لَايُصَلّٰى عَلٰى مَيِّتٍ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

অর্থাৎ কোন মৃত্যব্যক্তির মাত্র একবারই জানাযার নামায আদায় করা হবে।

✪ كبيرى على منية المصلى গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

اَلْفَرْضُ يَتَأَدّٰى بِالْاَوَّلِ وَالتَّنَفُّلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوْعٍ (زادفى التبيين) وَلِهٰذَا لَايُصَلّٰى عَلَيْهِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مَرَّةً

অর্থাৎ জানাযার নামাযের প্রথম জমাতের দ্বারা ফরযে কেফায়ার হক আদায় হয়ে যায় (নফল হিসাবে দ্বিতীয়বার আদায় করার অবকাশ নাই)। কারণ নফল হিসাবে জানাযার নামায আদায় করা শরীয়ত সম্মত নয়। তাবয়ীন গ্রন্থে বলা হয়েছে একারণে যে লোক একবার কোন মৃত লোকের জানাযা আদায় করে নিয়েছে সে লোক পুনরায় ঐ মৃত লোকের জানাযার নামায পড়তে পারবে না।

✪ الكافى নামক প্রখ্যাত ফেকাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে–

حَقُّ الْمَيِّتِ يَتَأَدّٰى بِالْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِالصَّلٰوةِ الْاُوْلٰى فَلَوْفَعَلَهُ الْفَرِيْقُ الثَّانِىْ لَكَانَ نَفْلًا وَذَاغَيْرُ مَشْرُوْعٍ ـ

অর্থাৎ জানাযার প্রথম জমাতের দ্বারা মৃতব্যক্তির হক আদায় হয়ে যায় এবং মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়া হিসাবে যে দায়িত্ব জিম্মায় ছিল প্রথমবারের জানাযার নামায আদায়ের দ্বারা সবাই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে পড়ে।

অতঃপর যদি দ্বিতীয় দল পুনরায় জানাযার নামায আদায় করতে যায়-তা নফল হিসাবে গণ্য হওয়ার কথা, অথচ জানাযার নামায কে নফল রূপে আদায় করা শরীয়ত সম্মত নয়।

✪ তবে এ ক্ষেত্রে আরো উলেখ্য যে, মৃত লোকের অলি (শরীয়াত কতৃক স্বীকৃত অভিভাবক)-এর নামায আদায় করার আগে অন্য কোন লোক বা দল যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে জানাযার নামায আদায় করে নেয় এবং সেক্ষেত্রে অভিভাবক যদি চায়–তাহলে ঐ মৃত লোকের পূর্নবার জানাযার নামায আদায় করা তার জন্য জায়েজ।

আমাদের সমাজে ও যে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায আদায় করার ইচ্ছা থাকে সেক্ষেত্রে অভিভাবক কে ১ম বারের জানাযার নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়। মূল অভিভাক কে বাদ রেখে অন্যান্য লোকেরাই জানাযায় নামায

আদায় করে থাকে। দ্বিতীয় বার জানাযার নামায আদায় করা জায়েজ হওয়ার এটা একটা বৈধ (حيلة) পন্থা।

কিন্তু মূল অলি (অভিভাবক) জানাযার নামায আদায় করে ফেললে অপরাপর লোকদের জন্য জানাযার নামায আদায় করার আর কোন অবকাশ থাকেনা।

✪ যেমন হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ صَلّٰى غَيْرُ الْوَلِىِّ اَوِ السُّلْطَانِ اَعَادَ الْوَلِىُّ يَعْنِىْ اِنْ شَاءَ لِاَنَّ الْحَقَّ لِلْاَوْلِيَاءِ (وَاِنْ صَلَّى الْوَلِىُّ لَمْ يَجُزْ لِاَحَدٍ اَنْ يُّصَلِّىَ بَعْدَهُ لِاَنَّ الْفَرْضَ يَتَأَدّٰى بِالْاَوَّلِ وَالتَّنَفُّلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوْعٍ ـ (صفحه ١٢٠ ، ج٢)

✪ এমনিভাবে দুররে মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে–

فَاِنْ صَلّٰى غَيْرُهُ اَىِ الْوَلِىِّ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّقَدُّمِ عَلَى الْوَلِىِّ وَلَمْ يُتَابِعْهُ الْوَلِىُّ اَعَادَ الْوَلِىُّ وَلَوْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنْ شَاءَ لِاَجْلِ حَقِّهٖ لَا لِاِ سْقَاطِ الْفَرْضِ ـ

✪ اَلْمَبْسُوْطُ لِلْاِمَامِ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ سَرْخَسِىْ গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

لَا تُعَادُ الصَّلٰوةُ عَلَى الْمَيِّتِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْوَلِىُّ هُوَ الَّذِىْ حَضَرَ فَاِنَّ الْحَقَّ لَهُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهٖ وَلَا يَةُ اِسْقَاطِ حَقِّهٖ ـ

✪ شَرْحُ مُنْيَةٍ لِاِ بْرَاهِيْمَ الْحَلَبِىْ গন্থে আছে ঃ

اِنْ صَلّٰى عَلَيْهِ الْوَلِىُّ لَمْ يَجُزْ لِاَحَدٍ اَنْ يُّصَلِّىَ بَعْدَهُ ـ

বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে–

صَلَّى الْوَلِىُّ ثُمَّ جَاءَ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ اِلَّا عَادَةُ

উদ্ধৃতি সমূহের সারসংক্ষেপ মর্ম হচ্ছেঃ (কোন মৃত লোকের দু'বার জানাযার নামায পড়া যায় না) হ্যঁা-যদি মূল অলি -(অভিভাবক) ব্যতীত অন্যান্যরা নামায আদায় করে নেওয়ার পর অলি (অভিভাবক) হাজির হয়ে নামায আদায় করতে চায়-তাহলে দ্বিতীয় বার ঐ মৃত লোকের জানাযার নামায আদায় করা শরীয়ত কতৃক বৈধ। কারণ এ ক্ষেত্রে মূল হক অধিকার তারই, অপর কেউ তার এ অধিকার রহিত করতে পারেনা।

✪ আর যদি মূল অভিভাবক নামায আদায় করে নেয় তাহলে অন্যান্যদের জন্য পুনরায় জানাযার নামায আদায় করার আর সুযোগ থাকে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গায়েবানা জানাযার নামায আদায় প্রসঙ্গ

আমাদের হানাফী ও মালেকী মাজহাব অনুসারে গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা জায়েজ নাই।

কারণ এ উভয় মাজহাব মতে জানাযার নামায ছহি শুদ্ধ হওয়ার জন্য মৃত লোকের লাশ (মরদেহ) নামায আদায়কারী মুসল্লিদের সামনে থাকাটা জরুরী।

অতএব মৃত লোকের লাশ (মরদেহ) মুসল্লীদের সামনে বিদ্যমান না থাকলে গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা যায়না।

কারণ আল্লাহর মহান রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের পবিত্র যুগে মদীনা মুনাওয়ার নিকট বা দূরে অনেক ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের ইন্তেকাল কিংবা শহিদ হওয়ার সংবাদ পেয়ারা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নিকট পৌছলে ও তিনি ২/৩ টি বাদে উনাদের গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেননি।

এভাবে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর যুগেও কেউ কারো গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেননি।

আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ২/৩ বার গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেছেন

এ মর্মে হাদীস শরীফ সমূহে যার বর্ণনা পাওয়া যায় এ সর্ম্পকে সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ

ঐ সব জানাযার নামায কে গায়েবানা জানাযার নামায বলা মূলতঃ শুদ্ধই নয় কেননা ঐ ২/৩ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহ মৃতের লাশ কে তার প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দেখতে পান মত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

নিম্নে উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কিত হাদীছ শরীফ সমূহের পর্য্যালোচনা করা হচ্ছেঃ-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا (بخارى شريف)

অর্থাৎ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে হাবশের বর্তমান সুদানের রাজা নাজাশী (রাঃ) যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিনই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উনার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেন এবং ময়দানে গিয়ে উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরামদের কে নিয়ে কাতার বন্দী হয়ে চার তাকবীর সহকারে উনার জানাযার নামায আদায় করেন।

যে সমস্ত আইমমায়ে কেরাম গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা বৈধ মনে করেন উনারা উক্ত ঘটনা কে তাদের দাবীর সমর্থনে দলিল হিসাবে পেশ করে থাকেন। তাই এ ক্ষেত্রে একটু গভির দৃষ্টি সহকারে ঘটনাটির পর্য্যালোচনা করলে তাদের সিদ্ধান্ত সমূহ সঠিক নয় রূপেই প্রমাণিত হবে।

সন্মানিত পাঠক!

একটু লক্ষ্যকরুন, এ প্রসঙ্গে পবিত্র হাদীসে উল্লেখিত ঘটনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা আইনী বোখারী শরীফের শরাহ গ্রন্থে বলেন ঃ-

اِنَّ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ سَرِيْرُهُ فَرَاٰهُ فَتَكُوْنُ الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ كَمَيِّتٍ رَاٰهُ الْاِمَامُ وَلَا يَرَاهُ الْمَاْمُوْمُ.

(فَاِنْ قُلْتَ) هٰذَا يَحْتَاجُ اِلٰى نَقْلٍ بَيِّنَةٍ وَلَا يَكْتَفِىْ فِيْهِ بِمُجَرَّدِ الْاِحْتِمَالِ (قلت) وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلٰى ذٰلِكَ فَرَوٰى اِبْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهِ مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِىَّ تُوُفِّىَ فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَهُمْ يَظُنُّوْنَ اَنَّ جَنَازَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

অর্থাৎ নাজাশীর লাশ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল আল্লাহর রাছুল (দঃ) এর নামায উক্ত লাশের উপরই আদায় করা হয়েছিল ঐ মৃত লাশের ন্যায় যাকে ইমাম দেখেন কিন্তু মুক্তাদীরা দেখেনা।

এর সমর্থনে অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদীছ রয়েছে। আল্লামা ইবনে হিব্বান (রঃ) উনার হাদীছ গ্রন্থে উক্ত হাদীস টি বর্ণনা করেছেন- হযরত ইমরান বিন হোছাইন থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর নবী (দঃ) বললেনঃ------

তোমাদের ভাই নাজাশী ইন্তেকাল করেছেন, তোমরা তার জানাযার নামায আদায় কর অতঃপর প্রিয় রাছুল (দঃ) জানাযার ইমামতির জন্য দাড়িয়ে গেলেন, ছাহাবায়ে কেরামগনও প্রিয় নবী (দঃ) এর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালেন। উনাদের সকলের বিশ্বাস ছিল যে, নাজাশীর লাশ (মরদেহ) নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সম্মুখে রয়েছে।

আসলে নাজাশির মরদেহের উপস্থিতী একমাত্র পেয়ারা নবীই (দঃ) প্রত্যক্ষ করেছিলেন। (তিরমিযী)

নাজাশীর লাশকে যে, নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম প্রত্যক্ষ করেছিলে-এর আরো সমর্থন পাওয়া যায় বিশ্ব খ্যাত ইমাম আল্লামা واحدى رحمة الله عليه (ওয়াহেদী) এর اسباب النزول গ্রন্থে-উক্ত গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেনঃ-

كُشِفَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَرِيْرِ النَّجَاشِيِّ حَتَّى رَاٰهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ -

অর্থাৎ বাদশাহ নাজাশীর লাশ (মরদেহ) এবং আল্লাহর পেয়ারা রাছুল (দঃ) এর মধ্যবর্তী সব অন্তরায় অপসারিত করে দেওয়া হয়েছিল যদ্দরুন রাছুল আকরম (দঃ) তার লাশ স্বচক্ষে দেখে দেখেই তার জানাযার নামায পড়েন।

(২) হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে,

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوْكَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَائِيْلُ عليه الصلوة والسلام فَقَالَ اِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيَّ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ اَتُحِبُّ اَنْ تَطْوِيَ لَكَ الْاَرْضَ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ عَلَى الْاَرْضِ وَرَفَعَ لَهُ سَرِيْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيْ كُلِّ صَفٍّ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجِبْرَئِيْلَ عليه السلام بِمَ اَدْرَكَ هٰذَا قَالَ بِحُبِّهِ سُوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقِرَاءَتَهُ اِيَّاهَا جَائِيًا وَذَاهِبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا اَوْ عَلٰى كُلِّ حَالٍ -

অর্থাৎ হযরত আবু উমামা (রঃ) বলেনঃ-

আমরা আল্লাহর প্রিয় রাছুলের (দঃ) সাথে তবুকে অবস্থান করতেছিলাম। এ অবস্থায় নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নিকট হযরত জিব্রায়ীল (আঃ) হাজির হয়ে বললেন- এয়া রাসূলাল্লাহ! মুআবিয়া ইবনে মুআবিয়া মুযানী (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারাতে ইন্তেকাল করেছেন- আপনি তাঁর জানাযার নামায আদায় করতে চাইলে আমি আপনার জন্য জমিনকে সংকুচিত করে দিচ্ছি। উত্তরে প্রিয় নবী (ছঃ) বললেন হ্যাঁ, তখন হযরত জিব্রায়ীল (আঃ) তার ডানা জমিনে মেরে জমিনকে সংকুচিত করে দিয়ে মুআবিয়া মুযনীর (রাঃ) লাশ কে (নবী করিম (দঃ) এর সামনে) তুলে ধরলেন। নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া ছাল্লাম ঐ লাশকে নিজের সামনে দেখে দেখে তার জানাযার নামায আদায় করে নিলেন। অত্র নামাযে আল্লাহর নবী (দঃ) এর পেছনে দু'কাতার ফেরেশতা ও ছিল। প্রত্যেক কাতারের ফেরেশতা সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। অতপর ফিরে আসলেন।

এ বিষয়ে নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জিব্রায়ীল (আঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন- মাআবীয়া মুযানী এরূপ মার্যদা কিসের মাধ্যমে অর্জন করেছেন? উত্তরে জিব্রায়ীল (আঃ) বললেন- ছুরা কুল্‌হুয়াল্লাহকে অত্যাধিক ভালবাসা ও পাঠ করার কারণে তিনি আসা যাওয়া উঠা বসা সর্বাবস্থায় ছুরা এখলাছ পাঠরত থাকতেন।

৩. এমনিভাবে মুতার যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী দু'জন বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত জায়েদ বিন হারেছা (রাঃ) ও জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ)-এর গায়েবানা জানাযার নামায আদায়ের ঘটনা ও রয়েছে।

উপরে উদ্ধৃত তিনটি ঘটনা প্রমাণ করে যে, উক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলা মৃতের লাশ কে নবীকরিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সামনে করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং মৃত ব্যাক্তির লাশ সামনে উপস্থিত থাকা সত্বেও একে গায়েবানা জানাযার নামায রূপে অভিহিত করা মোটেই সঠিক নয়।

তদুপরি উল্লেখিত তিনটি ঘটনার এভাবে জানাযার নামায আদায় করাটার ব্যাপারে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে নবীকরিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জন্য বিশেষ অনুমতি ছিল।

তাই উক্ত ঘটনা এয়ের উপর ভিত্তি করে অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আমল করা অর্থ্যৎ গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করার মোটেই অবকাশ অনুমতি নাই।

✪ গায়েবানা জানাযা আদায় সর্ম্পকে ফতোওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنَ الشُّرُوْطِ حُضُوْرُ الْمَيِّتِ وَوَضْعُهُ وَكَوْنُهُ اَمَامَ الْمُصَلِّيْ فَلَا تَصِحُّ عَلٰى غَائِبٍ -

অর্থাৎ জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মৃত ব্যাক্তির লাশ (মরদেহ) নামায আদায়কারীদের সামনে উপস্থিত (বিদ্যমান) থাকা। একারণে গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা জায়েজ নাই।

✪ দূরের মোক্তার ফতোওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে-

وَشَرْطُهَا اَيْضًا حُضُوْرُهُ (وَوَضْعُهُ) وَكَوْنُهُ هُوَ اَوْ اَكْثَرُهُ (اَمَامَ الْمُصَلِّيْ) ...... فَلَا تَصِحُّ عَلٰى غَائِبٍ -

✪ এ প্রসঙ্গে ফতোওয়ায়ে শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে-

اَوْلَاَنَّهُ رُفِعَ سَرِيْرُهُ حَتّٰى رَاٰهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِحَضْرَتِهِ فَتَكُوْنُ صَلٰوةُ مَنْ خَلْفَهُ عَلٰى مَيِّتٍ يَرَاهُ الْاِمَامُ وَبِحَضْرَتِهِ دُوْنَ الْمَأْمُوْمِيْنَ وَهٰذَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ - ج ٢ صفحه ٢٠٩

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ এমনিভাবে হেদায়ার শরাহ্‌ "ফাতহুল কাদীর" গ্রন্থে ও মুনিয়াতুল মুছাল্লীর শরাহ্‌ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

وَشَرْطُ صِحَّتِهَا إِسْلَامُ الْمَيِّتِ وَطَهَارَتُهُ وَوَضْعُهُ أَمَامَ الْمُصَلِّيْ . فَلِهٰذَا لَاتَجُوْزُ عَلٰى غَائِبٍ .... وَأَمَّا صَلَاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّجَاشِيْ كَانَ امالاَنَّهُ رُفِعَ سَرِيْرُهُ لَهُ حَتّٰى رَاٰهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِحَضْرَتِهِ فَتَكُوْنُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ عَلٰى مَيِّتٍ يَرَاهُ الْاِمَامُ وَبِحَضْرَتِهِ دُوْنَ الْمَامُوْمِيْنَ وَهٰذَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ. فَتْحُ الْقَدِيْرِ صفحـ١١٧ جـ٢، شَرْحُ مُنْيَةِ الْمُصَلِّيْ صفحة ٦٢٩

✪ طحطاوى على مراقى الفلاح গ্রন্থে বলা হয়েছে–

(وَ) الثَّالِثُ (تَقَدُّمُهُ) اَمَامَ الْقَوْمِ (وَ) الرَّابِعُ (حُضُوْرُهُ اَوْحُضُوْرُ اَكْثَرِ بَدَنِهِ اَوْنِصْفَهُ مَعَ رَاْسِهِ) وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّجَاشِيْ كَانَتْ بِمَشْهَدِهِ كَرَامَةً لَهُ وَمُعْجِزَةً لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ كَانَتْ بِمَشْهَدِهِ) اَيْ بِمَشْهَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اَيْ بِمَكَانٍ رَاٰهُ وَشَاهَدَهُ فِيْهِ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ سَرِيْرُهُ حَتّٰى رَاٰهُ بِحَضْرَتِهِ. فَتَكُوْنُ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ عَلٰى مَيِّتٍ يَرَاهُ الْاِمَامُ دُوْنَ الْمَامُوْمِيْنَ وَهٰذَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ. صفحـ٣٨٤

✪ তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে- মৃত ব্যক্তির লাশ কোন জায়গায় উপস্থিত না থাকলে ও তথাকার মুসলমানেরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে মুসলিমমৃত ব্যক্তির মাগফেরাত কামনা করতঃ দোয়া-মুনাজাত করা জায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
কবর খনন করার নিয়ম

কবর খনন করার শরীয়ত সম্মত দু'টি নিয়ম রয়েছে ঃ

(১) লাহাদ (বগলী) কবর (২) শাক্ক (সিন্দুকী) কবর।

মূলতঃ বগলী কবর খনন করাই ছুন্নাত, কিন্তু যে জায়গার মাটি নরম সেখানে বগলী কবর তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে পড়ার আশংকা রয়েছে বিধায় তথায় সিন্দুকী কবর করাই মুছতাহ্‌ছান (ভাল) (বাহ্‌রুর রায়েক)।

মৃত দেহের দৈর্ঘের মাপের ভিত্তিতে যাতে দাফনকারীগণ কবরে নেমে দাড়িয়ে মৃত দেহকে কবরের একেবারে নীচের অংশে নামিয়ে ঢুকাতে পারে সেই পরিমাপে কবর খনন করতে হয়।

সাধারণত ঃ দৈর্ঘ যত পরিমাপে করতে হয় প্রস্থ এবং গভীরতা তার অর্ধেক মাপে করতে হয়। তবে এ ক্ষেত্রে আইম্মায়ে কেরামগণের সঠিক মতানুসারে কবরকে সিনা পরিমাণ গভীর করাই উত্তম (আলমগীরী)।

লাহাদ (বগলী) কবর ঃ প্রথমে মৃত দেহের দৈর্ঘের পরিমাপের চেয়ে একটু বেশী দীর্ঘ (লম্বা) করে এবং ঐ দৈর্ঘের অর্ধেক পরিমাণ প্রস্থ দিয়ে সীনা পরিমাণ গভীর করতঃ কবর খনন করে নিতে হয়। অতঃপর ঐ খননকৃত কবরের পশ্চিমের দেওয়ালের ভিতরে উপরের মাটি ঠিক রেখে নীচের সমতলের সঙ্গে মিলিয়ে পশ্চিম দিকে একটু ঢালু করতঃ মৃত দেহের দৈর্ঘ প্রস্থের মাপে এমন ভাবে পুনঃ খনন করতে হয় যাতে স্বাচ্ছন্দে মৃত দেহকে উহার ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।

শাক্ক (সিন্দুকী) কবর ঃ সিন্দুকী কবর খননের বেলায় প্রথমে মৃত দেহের দৈর্ঘের পরিমাপের চেয়ে সামান্য বেশী দৈর্ঘ করতঃ এবং দৈর্ঘের অর্ধেক পরিমাণ প্রস্থ ও গভীর করে সমান খাড়া করে কবর খনন করে নিতে হয়, অতঃপর উহার নীচের সমতল তলার ঠিক মাঝখানে উত্তর-দক্ষিণ লম্বাভাবে মৃতদেহ পরিমাণ দৈর্ঘ প্রস্থ বিশিষ্ট দু'পাশে হাশিয়া (পাড়) রেখে এক হাত প্রয়োজনে সোয়া হাত নীচ করতঃ পুনঃ (ক্ষুদ্র) কবর-খনন করা লাগে। একেবারে নীচের তলা খানা একটু কেবলার দিকে ঢালু করে খনন করা উত্তম-যাতে সুন্নাতী তারিকা অনুযায়ী মৃত দেহকে সহজে কেবলামুখী করে রাখা যায়। কারণ মৃত দেহের চেহারা ও সিনাকে কেবলার দিকে করে কবরে রাখা সুন্নাত (শামী)।

এতদূর গভীর করে কবর খনন করার উপকারিতা হল প্রথমতঃ এতে মৃত দেহের দূর্গন্ধ উপরে উঠতে পারবেনা, দ্বিতীয়তঃ কোন হিংস্র প্রাণী মৃত দেহখানাকে কবর থেকে উঠিয়ে ফেলতে পারবেনা।

দাফনের নিয়ম

✪ দাফনের পূর্বে খনন কৃত কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির তিন চার জন পরহেজগার নিকটতম আত্মীয় নেমে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে অতঃপর উপরের লাশ বহনকারী লোকেরা লাশকে উত্তর দিকে মাথা করে উত্তর দক্ষিণ (লম্বা) সোজা অবস্থায় কবরের পশ্চিম দিকস্থ পাড় দিয়ে নামিয়ে কবরে দাড়ানো লোকদের হাতে দেবে। এর পর শক্তভাবে লাশকে ধারণ করে আস্তে আস্তে বগলী কবর হলে পশ্চিম দিকের খনন কৃত বগলের ভিতর আর সিন্দুকী কবর হলে কবরের নীচের ছোট কবরের তলায় লাশকে শোয়ায়ে দেবে। লাশ কবরে রাখার সময় সবাই বলবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص

উচ্চারণ ঃ বিছমিল্লাহি ওয়া ফী ছাবীলিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাছুলিল্লাহ (স)।

✪ অপর এক হাদীছ শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে যে, দোয়া খানা নিম্নরূপেই পুনঃ পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (شرح الصدور)

উচ্চারণ ঃ বিছমিল্লাহি ওয়া ফী ছাবীলিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাছুলিল্লাহি আল্লাহুম্মা আজিরহু মিন্ আযাবিল কাবরি ওয়া মিন আযাবিন্ নারি, ওয়া মিন্ শাররিশ্ শায়তানির রাজীম।

✪ অপর এক হাদীছ পাকের বর্ণনামতে–দোয়াখানা এভাবেই পাঠ করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِفْسَحْ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَوِّرْلَهٗ فِيْهِ وَاَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (شرح الصدور للسيوطى صفحه ٢٥)

উচ্চারণ ঃ বিছমিল্লাহি ওয়াফী ছাবীলিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইফ্ছাহ্ ফী কাবারিহি ওয়া নাভভীর্ লাহু ফীহি, ওয়া আল্হিক্হু বিনাবিয়্যীহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম।

✪ মৃতব্যক্তির মাথা উত্তর দিকে দিয়ে একটু ডান করটে কেবলামুখী করে কবরে রাখাই সুন্নাত। কবরে রাখার পর কাপড়ের গিরাগুলোখুলে দিতে হয়।

✪ স্ত্রী লোকদের লাশ কবরে নামাবার পূর্বে কবরের চর্তুদিকে এমনভাবে পর্দা আড়াল করে নেয়া জরুরী যাতে বেগানা পুরুষ লোকেরা তার লাশকে দেখতে না পায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ মেয়েলোকদের নিজ ছেলে, পিতা, চাচা, দাদা, নানা, মামা নিজ ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র, বোনের পুত্র, নিজের নাতি ইত্যাদি তথা যাদের সাথে বৈবাহিক সর্ম্পক করা হারাম এমন নিকট আত্মীয় স্বজনরাই মেয়ে লোকদের মৃত দেহকে কবরে নামাতে হয়।

✪ নিকট আত্মীয় স্বজন না থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনরাই কবরে নামাবে। দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনও পাওয়া না গেলে পরহেজগার, খোদাভীরু সাধারণ মুসলমানরাই মেয়ে লোকদের লাশ কবরে নামাবে।

✪ এ ক্ষেত্রে স্বরণ যোগ্য যে, লিখিত সূরা ইয়াছিন শরীফ আহাদ নামা ও কলেমা ইত্যাদি কবরে রাখা জায়েয। তবে এসব পবিত্র লেখাগুলো কবরের ভিতরের পশ্চিমের কেবলার দিকের দেওয়ালে ঘর করে কিংবা উক্ত দেওয়ালের সাথে ভাল করে কাটা ইত্যাদি গেথে আটকিয়ে দিতে হয়। যাতে মৃত লাশের পচা গলাতে গিয়ে না পড়ে।

✪ মৃতলোকের কাফনে কালি দ্বারা কিছু লিখে দেওয়া ঠিক নয়, কারণ পরে লাশ পঁচে গেলে ঐ সব পবিত্র লেখা গুলো নাপাকীতে পতিত হয়ে "আল্লাহ ও রাসূলের নামের বেতাজিমী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আজাবের কারণ, সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

✪ অতঃপর বগলী কবর হলে বগলের মুখে একটু কাত করে করে আর সিন্দুকী কবর হলে নীচের ক্ষুদ্র কবরের দু'পার্শ্বস্থ পারের উপর শক্ত কাঠ বা বাঁশ ইত্যাদি বিছিয়ে দিয়ে ভাল ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়।

✪ মাটি অতিশয় নরম হলে নীচের দিক খোলা রেখে কাঠের বাক্সেও কবর দেওয়া জায়েজ।

✪ মৃত্যুর পূর্বেই যদি কেউ নিজের জন্য কবর তৈয়ার করে রাখে তাতে কোন অসুবিধা নেই বরং এতে ছাওয়াবই পাওয়া যাবে। (আলমগীরী)

✪ ফোকাহায়ে কোরামগণের মতে মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে মুশরিকদের গোরস্থানে অথবা কোন মুশরিক মৃতব্যক্তিকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা নাজায়েয। বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা।

✪ একটি কবরে একজন মাইয়্যেতকেই দফন করার নিয়ম, কিন্তু প্রয়োজন দেখা দিলে তখন একই কবরে একাধিক লাশ দাফন করা জায়েয। (আলমগীরী)

✪ একাধিক লোককে একই কবরে দাফন করতে হলে দু পদ্ধতিতে কবর খনন করা যায়।

প্রথমত ঃ পার্শ্বের দিকের পরিমাপকে বৃদ্ধি করে কবর খনন করা।

দ্বিতীয়তঃ লম্বায় দীর্ঘ করে কবর খনন করা।

✪ পার্শ্বের দিকের পরিমাপ বাড়িয়ে কবর খনন করা হলে তখন দাফনের সময় সকলের মাথাকে এক সমানে রেখে পরস্পরকে পাশাপাশি ভাবে শোয়ায়ে দাফন করতে হয়।

✪ আর লম্বায় দীর্ঘ করে কবর খনন করা হলে একজনের পায়ের পরে অন্য জনের মাথা রেখেই দাফন করতে হয় উভয় পদ্ধতিতেই দু'লাশের মাঝখানে অল্প মাটি উঁচু করে দিয়ে ব্যবধান করা লাগে।

✪ দাফনের মুহূর্তে উপস্থিত সকলের তিন তিন মুষ্টি মাটি দেওয়া এবং মাথার দিক থেকে মাটি দেওয়াটা আরম্ভ করা মুস্তাহাব।

✪ নিম্নের আয়াতে কোরআনীকে তিন অংশ করে পাঠ করতঃ তিনবার মাটি দেওয়া মুস্তাহাব।

✪ এ হিসাবে প্রথম বার প্রত্যেক লোক দু'হাতের মুষ্টি ভরে মাটি নিয়ে مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ (মিন্হা খালাক্না-কুম) (এবং এ মাটি দ্বারাই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি) বলে মৃতলোকের মাথার দিক থেকে মাটি দিয়ে যেতে হয়।

দ্বিতীয় বার মাটি নিয়ে وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (ওয়া-ফীহা নুঈদুকুম) (এবং এ মাটির ভিতরই তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে নেব) পাঠ করতঃ মাঝখানে মাটি দিতে হয়।

তৃতীয় বার মাটি নিয়ে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তা-রাতান্ উখ্রা) (হাশর দিবসে এ মাটি থেকেই আমি তোমাদের পুনরায় উঠাব) পড়ে লাশের পায়ের দিকে মাটি দিতে হয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ প্রথমবার মাটি দেয়ার সময় বলতে হয়ঃ اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ (আল্লাহুম্মা জা-ফাল্ আরদা আন্ জান্ বাইহি) হে প্রভু আল্লাহ! আপনার এ বান্দার দু'পার্শ্ব থেকে মাটিকে পৃথক করে রাখুন।

দ্বিতীয় বার মাটি দেওয়ার সময় বলতে হয় ঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ (আল্লাহুম্মাফ্তাহ্ আব্ওয়াবাচ্ছামায়ে লিরূহিহী) হে প্রভু আল্লাহ্! তার রূহের জন্য আসমানের দরজা সমূহ খুলে দিন।

তৃতীয় বার মাটি দেওয়ার সময় বলতে হয় ঃ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ —ওয়া আবদিল্হু দারান্ খাইরাম্ মিন দারিহী। (হে প্রভু) আপনার এ বান্দার গৃহ অর্থাৎ কবরকে এর চেয়ে উত্তম গৃহ দ্বারা অর্থাৎ জান্নাত দ্বারা পরিবর্তন করে দিন (শারহুছ্ছুদূর)।

উভয় প্রকারের দোয়াই হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে বিধায় এ উভয় প্রকারের

দোয়াকে মিলিয়ে পড়ে নেওয়াই উত্তম।[১]

অতঃপর ঢালাওভাবে মাটি ফেলে পুরা কবর ভর্তি করে দেওয়া লাগে। মাটি একটু টাইট করে দেওয়া ভাল। এমনিভাবে মাটি দেওয়ার কাজ শেষ হলে কবরের উপরিভাগ উঠের পিঠ কিংবা মাছের পিঠের ন্যায় তে-শিরা করে দেওয়া এবং অর্ধ হাত উঁচু করা মুস্তাহাব।

এরপর কবরের উপর কোন তাজা গাছের বিশেষতঃ খেজুর গাছের কাঁচা ডাল পুতে দেওয়া মুস্তাহাব।

✪ পবিত্র হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, এ ডালখানা যতদিন তাজা থাকবে ততদিন মৃতের জন্য উহার তাছবীহ্ পাঠ আজাব সহজতর হওয়ার উপায় হিসাবে গণ্য হবে।

টীকা

(١) (قَوْلُهٗ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ ثَلَاثًا) لِمَا فِىْ اِبْنِ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ ثُمَّ اَتَى الْقَبْرَ فَحَثٰى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ ثَلَاثًا ـ (شرح منيه) ـ قال فى الجوهرة ويقول فى الحثية الاولى منها خلقناكم وفى الثانية ـ وفيها نعيدكم ـ وفى الثالثة ـ ومنها نخرجكم تارة اخرى ـ وقيل يقول فى الاول ـ اللهم جاف الارض جنبيه و فى الثانيه ـ اللهم افتح ابواب السماء لروحه ـ وفى الثالثة ـ اللهم زوجه من الحور العين وللمرأة اللهم ادخلها الجنة برحمتك (شامى) ـ واخرج ابن ابى شيبه عن قتادة ان انسا رض دفن ابناله فقال اللهم جاف الارض عن جنبيه وافتح ابواب السماء لروحه ـ وابدله دارا خيرا من داره ـ (شرح الصدور) صفح ١٠٤

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
তাল্কিনের মাছায়েল

কবরে কলেমা তালকীন করা ঃ

✪ এমনিভাবে মাটির কাজ পুরা সমাপ্ত হলে কবরের মাথার দিক থেকে শুরু করে পায়ের দিক পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত দোয়াখানা পাঠ করতঃ পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব (আলমগীরী)[১]

দোয়া ঃ سَقَا اللّٰهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ

(ছাকাল্লাহু ছারাহু ওয়া জাআলাল্ জান্নাতা মাছওয়াহু)

✪ মাটি দেওয়ার কাজ শেষ হওয়ার পর যেয়ারতের নিয়তে নির্দিষ্ট দোয়ায়ে ছালাম পাঠ করত মাথার দিকে ছূরা বাকারার শুরু– আলিফ-লাম-মীম হতে-- মুফ্লিহুন পর্যন্ত এবং মৃতের পায়ের দিকে ছূরা বাকারার শেষের অংশ "আমানার রাছূলু -- ওয়ানছুরনা আলাল্ কাওমিল্ কাফিরীন" পর্যন্ত এবং ছূরা এখলাছ এগারবার, ছূরা ফাতিহা তিনবার ও কয়েক বার দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ সংক্ষিপ্তভাবে এর ছাওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পাকে বখশে দিয়ে সবাই যখন অতদূর চলে আসবে–যতদূর থেকে কারো হাঁটা-চলার আওয়াজ শুনা যায় ও গতি অনুভব করা যায়। তখন একজন উপযুক্ত অভিজ্ঞ, পরহেজগার আল্লাহ ওয়ালা আলেম সাহেব দ্বারা তালকীন করানো মুস্তাহাব।

✪ "তালকীন" অর্থাৎ কবরস্থ মৃত ব্যক্তিকে কলেমা ও মুনকির-নাকীর ফেরেশতা দ্বয়ের ছাওয়ালের জবাব ইত্যাদি শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বৈধতার দলিল, রূপে উল্লেখ্য যে–

সুপ্রসিদ্ধ ফতোওয়ার কিতাব "তাহ্তাবী শরীফে উল্লেখ আছে ঃ

وَتَلْقِيْنُهُ بَعْدَ الدَّفْنِ حَسَنٌ وَاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيَّةُ لِمَا رَوَى عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَلْيَقُمْ اَحَدُكُمْ عَلٰى رَأْسِ الْقَبْرِ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ . فَاِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيْبُ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ .

টীকা ঃ

(১) بَلْ يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ مَنْدُوْبًا لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَهُ بِقَبْرِ سَعِيْدٍ رض وَقَبْرِ وَلَدِ اِبْرَاهِيْمَ رض وَاَمَرَ بِهِ فِىْ قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ رض (طحطاوى)

فَاِنَّهُ يَسْتَوِىْ قَاعِدًا . ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ اَرْشِدْنَا يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُوْنَ . فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ . وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا فَاِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَتَاَخَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقُوْلُ اِنْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ هٰذَا وَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ وَيَكُوْنُ اللّٰهُ حَجِيْجَهُمَا عَنْهُ . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . فَاِنْ لَمْ يَعْرِفْ اُمَّهُ قَالَ يَنْسُبُهُ اِلٰى اُمِّهِ حَوَّاءَ ع .

○ এমনিভাবে "তালকীন" সম্পর্কে ইমাম ছাঈদ বিন মানছূর যিনি হযরত ইমাম মালেক(র)-এর শাগরিদ এবং হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর উস্তাদ। তিনি স্বীয় হাদীছ গ্রন্থ "আছুনান" এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন ঃ

اِذَا سُوِّىَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (وَقُلْ) يَا فُلَانُ رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَنَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم .

✪ "দুরতের মুখতার" নামক ফতওয়ার কিতাবে جَوْهَرَةُ النَّيِّرَةُ নামক কিতাবের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ اِنَّهُ مَشْرُوْعٌ عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ

✪ ফতোওয়ায়ে শামী এর মধ্যে তাল্কীন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اَمَّا عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ فَالْحَدِيْثُ اَىْ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) مَحْمُوْلٌ عَلٰى حَقِيْقَتِهِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحْيِيْهِ عَلٰى مَا جَاءَتْ بِهِ الْاٰثَارُ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَنَّهُ اَمَرَ بِالتَّلْقِيْنِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَقُوْلُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ اُذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِىْ كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا .

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ "হেদায়ার" ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল কাদীর কিতাবে দীর্ঘ আলোচনার পর বলা হয়েছে–

وَقَدْ يُخْتَارُ الشَّقُّ الْاَوَّلُ وَالْاِحْتِيَاجُ اِلَيْهِ فِىْ حَقِّ التَّذْكِيْرِ لِتَثْبِيْتِ الْجَنَانِ لِلسُّوَالِ فَنَفْىُ الْفَائِدَةِ مُطْلَقًا مَمْنُوْعٌ ـ

✪ "হেদায়ার" ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আল বেনায়া" কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ

كَيْفَ لَا يَفْعَلُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَنَّهُ اَمَرَ بِالتَّلْقِيْنِ بَعْدَ الدَّفْنِ ـ

✪ ফাতওয়ায়ে "কাজীখান" এর মধ্যে উল্লেখ আছে ঃ

اِنْ كَانَ التَّلْقِيْنُ لَا يَنْتَفِعُ لَا يَضُرُّ اَيْضًا فَيَجُوْزُ ـ

✪ নূরুল ঈজা কিতাবে উল্লেখ আছে– تَلْقِيْنُهُ فِى الْقَبْرِ مَشْرُوْعٌ

তাহ্‌তাবী তথা মারাকিউল ফালাহ কিতাবের হাশিয়ায় উল্লেখ রয়েছে ঃ

كَيْفَ لَا يَفْعَلُ مَعَ اَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيْهِ بَلْ فِيْهِ نَفْعٌ لِلْمَيِّتِ ـ

তালকীন করার নিয়ম ঃ

তালকীনকারী ব্যক্তি কবরের কেবলার দিকে গিয়ে কবরস্থ লোকের চেহারা ও নিজের চেহারাকে সামনাসামনি করতঃ নিজের বাম বাহুকে কেবলার দিকে ও ডান বাহুকে কবরস্থ লোকের দিকে করে বসতে হয় অতঃপর নিম্নবর্ণিত নিয়মে দোয়া পাঠ করত ঃ তালকীন করতে হয়।

মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে يَاعَبْدَ اللّٰهِ এবং মেয়ে মানুষ হলে يَااَمَةَ اللّٰهِ বলে প্রত্যেক মৃতের স্ব-স্ব নাম ও মায়ের নাম (জানা থাকলে) বলা লাগে। মায়ের নাম জানা না থাকলে আদম জাতির মা- হযরত হাওয়া (আ) এর নাম নিয়ে তালকীন করতে হয়।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও ফেকাহ-ফতোওয়ার গ্রন্থ সমূহে উল্লিখিত তালকীনের কয়েকটি নিয়ম নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

১। يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِبْنَ / يَا اَمَةَ اللّٰهِ بِنْتَ মৃত লোকের নাম ও তার মায়ের নাম বা حَوَّاءَ عَلَيْهَا السَّلَامُ -এর নাম উল্লেখ করতঃ বলতে হয় ঃ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْكَرِيْمَانِ لَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَاِذَا سَاَلَكَ مَنْ رَبُّكَ ؟ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ ـ وَاِذَا سَاَلَكَ مَا دِيْنُكَ؟ قُلْ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ ـ وَاِذَا سَاَلَكَ مَنْ نَبِيُّكَ ؟ قُلْ نَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم/ اَوْ مَا تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ؟ قُلْ هٰذَا نَبِيِّىْ وَشَفِيْعِىْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ وَقُلْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا ـ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ـ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ (هَا) بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ـ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ (شرح الصدور)

২। মৃত ব্যক্তির নাম .... يَا

মায়ের নাম .... اِبْنُ / بِنْتَ

اُذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِىْ كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ .... شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَاَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَاَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا ـ (شامى)

৩। يَا .... اِبْنُ / بِنْتَ .... اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا (طحطاوى شرح الصدور) ـ

✪ এর সাথে নিচের বাক্যসমূহকেও মিলিয়ে নেওয়া উত্তম ঃ

ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ـ اِرْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ .

وَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَيْنِ الَّذَيْنِ اَتَيَاكَ اَوْ يَاْتِيَانِكَ اِنَّمَا هُوَ عَبْدَانِ لِلّٰهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَاشْهَدْ اَنْ رَبَّكَ اللّٰهُ وَدِيْنَكَ اْلاِسْلَامُ وَنَبِيَّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

✪ মৃত মেয়েলোক হলে–

وَاعْلَمِىْ اَنَّ هٰذَيْنِ الَّذَيْنِ اَتَيَاكِ اَوْ يَاْتِيَانِكِ اِنَّمَا هُوَ عَبْدَانِ لِلّٰهِ لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ وَاشْهَدِىْ اَنَّ رَبَّكِ اللّٰهُ وَدِيْنَكِ اْلاِسْلَامُ وَنَبِيَّكِ مُحَمَّدٌ ﷺ ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكِ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

✪ তালকীনের পর মুনাজাত করার সময় অন্যান্য দোয়াসমূহের সাথে নিম্নের দোয়াগুলো পাঠ করা উত্তম ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنَّا وَلَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا وَقَدْ اَجْلَسْتَهُ لِتَسْاَلَهُ اَللّٰهُمَّ فَثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْاٰخِرَةِ كَمَا ثَبَّتَّهُ فِى الدُّنْيَا اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَاَلْحِقْهُ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ . (شرح الصدور)

اَللّٰهُمَّ نَزَلَ بِكَ صَاحِبُنَا وَخَلَفَ الدُّنْيَا خَلْفَ ظَهْرِهِ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ عِنْدَ الْمَسْاَلَةِ مَنْطِقَةً وَلَا تَبْتَلِهِ فِىْ قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ . (شرح الصدور)

اَللّٰهُمَّ اَنَّ فُلَانَ .... اِبْنَ .... فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَلَّ فِىْ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত ও মুনাজাত

তালকীন করা শেষ হলে কবরের পাশে বসে ছূরা ইয়াছীন শরীফ, ছূরা মুলক (তাবারাকাল্লাযী) এবং কোরআন করিমের অন্যান্য ছূরা ও আয়াতসমূহ পাঠকরতঃ মৃত মুছলমানের মাগফিরাত কামনা করা মুস্তাহাব।

✪ এ প্রসঙ্গে ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে ঃ

وَيُسْتَحَبُّ اِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ اَنْ يَجْلِسُوْا سَاعَةً عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الْفِرَاغِ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا يَتْلُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَدْعُوْنَ لِلْمَيِّتِ كَذَا فِىْ جَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ .

অর্থাৎ দাফনের পর কবরের পাশে এতটুকু সময় অবস্থান করতঃ কোরআন করিম তেলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব যতটুকু সময়ের মধ্যে একটি উট জবাই করে গোস্ত বন্টনের কাজ শেষ করা যায়।

◆ এমনিভাবে "তাহ্তাবী" কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ

اِذَا فَرَغُوْا مِنْ دَفْنِهِ يُسْتَحَبُّ الْجُلُوْسُ عِنْدَ قَبْرِهِ بِقَدْرِ مَا يُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهُ يَتْلُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَدْعُوْنَ لِلْمَيِّتِ فَقَدْ وَرَدَ اَنَّهُ يَسْتَاْنِسُ بِهِمْ وَيَنْتَفِعُ بِهِ وَعَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ . وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ . (رواه ابو داود والحاكم والبيهقى)

অর্থাৎ যখন দাফনের কাজ সমাপ্ত হয় তখন একটি উট জবেহ করতঃ উহার গোশত বন্টন করে নিতে যত সময় লাগে তত পরিমাণ সময় কবরের পাশে বসে কোরআন করিম তেলাওয়াত করতঃ মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। হাদীছ শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, এর দ্বারা মৃতব্যক্তি মনের শান্তি পায়।

হযরত ওছমান যিন্ নূরাইন (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন যখন আল্লাহর প্রিয় রাছূল (স) কোন মুছলমানের লাশ দাফন করা হতে অবসর হতেন, তখন তিনি (স) ঐ কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন এবং বলতেন যে, তামরা তোমাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈমানী ভাইয়ের মাগফিরাত কামনা করতঃ দোয়া করতে থাক এবং স্বীয় ঈমান আকিদার দাবীর উপর সে স্থির থাকতে পারার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে চল। কেননা, সে এখনই মো'নকের নাকীর ফেরেশতা দ্বয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। (আবু দাউদ)

✪ আল্লামা ছুয়ূতী (র) "শারহুছ্ছুদূর" কিতাবে উল্লেখ করেন ঃ

وَيُسْتَحَبُّ الْوُقُوْفُ بَعْدَ الدَّفْنِ قَلِيْلاً وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ مُسْتَقْبِلاً وَجْهَهَا بِالثَّبَاتِ فَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ مِنَّا وَلَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا ـ وَقَدْ اَجْلَسْتَهُ لِتَسْاَلَهُ اَللّٰهُمَّ فَثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْاٰخِرَةِ كَمَا ثَبَّتَّهُ فِي الدُّنْيَا ـ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَاَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ

◆ উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ আছে যে ঃ

اَلْوُقُوْفُ عَلَى الْقَبْرِ وَسُؤَالُ التَّثْبِيْتِ فِيْ وَقْتِ الدَّفْنِ مَدَدٌ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ لِاَنَّ الصَّلَاةَ لِجَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَالْعَسْكَرِ لَهُ قَدْ اِجْتَمَعُوْا بِبَابِ الْمَلِكِ يَشْفَعُوْنَ لَهُ وَالْوُقُوْفُ عَلَى الْقَبْرِ وَسُؤَالُ التَّثْبِيْتِ مَدَدٌ لِلْعَسْكَرِ وَذٰلِكَ سَاعَةٌ يَشْتَغِلُ الْمَيِّتُ لِاَنَّهُ يَسْتَقْبِلُهُ هَوْلُ الْمُطَّلَعِ وَسُؤَالُ الْفَتَّانَيْنِ ـ

✪ এমনি ভাবে দাফনের পর থেকে কমপক্ষে চার/পাঁচ দিবস পর্যন্ত কবরের পাশে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থাও একটি উত্তম আমল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত এরূপ ব্যবস্থা করে যেতে পারলে মুরদারের জন্য আরও অধিক উপকারী। নিজের আত্মীয় স্বজনেরা বিনা পারিশ্রমিকে এর ব্যবস্থা করাটা অধিক কল্যাণকর। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে পরহেজগার আলেম হাফেজগণ দ্বারাও এর ব্যবস্থা করা জায়েয। তবে তা যদি তেলাওয়ত কারীদের নিয়্যত মাকছুদ নিরেট পয়সা উপার্জন না হয়ে একজন মুসলমান ভায়ের মাগফিরাত ও ক্যর্লাণ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। বরং তখনই এ তেলাওয়াতের দ্বারা উপকৃত হবে।

এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, মৃতব্যক্তির মাগফিরাত এবং পরকালীন নাজাতী ও শান্তির নিয়তে কবরের পাশে বসে কোরআন করিম তেলাওয়াত করা, তাছবীহ তাহলীল ও দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করাকে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক না জায়েয বলে থাকে।

এ প্রসঙ্গে দৃঢ়তার সাথে বলতে হয় যে, মূলতঃ যে কোন সময়ে হউক মুসলমান মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত ও নাজাতির উদ্দেশ্যে কবরের পাশে বসে উক্ত ছাওয়াবের কাজসমূহ করা জায়েয বরং মুস্তাহাবই বটে।

✪ ফতোওয়ায়ে আলমগীরীর মধ্যে উল্লেখ আছে ঃ

قِرَاةُ الْقُرْاٰنِ عِنْدَ الْقُبُوْرِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله تعالى لَا تُكْرَهُ وَمَشَائِخُنَا رحمهم الله تعالى اَخَذُوْا بِقَوْلِهِ وَهَلْ يَنْتَفِعُ وَالْمُخْتَارُ اَنَّهُ يَنْتَفِعُ هٰكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ

✪ মৃত্যুর ১ম দিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত, নাজাতি ও শান্তির উদ্দেশ্যে দান-ছদকা করে যাওয়া, শুধু গরীব মিছকিনদের খানা-পিনা প্রদান করা একটি উত্তম আমল।

✪ শরহে ছুদূর কিতাবে আল্লামা ইমাম ছুয়ূতী (র) হযরত ইমাম আহমদ (র) ও আবু নাঈম ইসপাহানী (র)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক বলেন ঃ

اِنَّ الْمَوْتٰى يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ سَبْعًا ـ فَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْاَيَّامَ ـ

✪ হাশিয়ায়ে তাহতাবী কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَفِيْ شِرْعَةِ الْاِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ اَنْ يَتَصَدَّقَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ لَهُ قَبْلَ مُضِيِّ اللَّيْلَةِ الْاُوْلٰى بِشَيْءٍ مِمَّا تَيَسَّرَ لَهُ وَاِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَهْدِ ثَوَابَهُمَا لَهُ قَالَ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ اِلٰى سَبْعَةِ اَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مِمَّا تَيَسَّرَ ـ

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : وَاِنِ اتَّخَذَ الطَّعَامَ لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا ـ

وَفِي الْخَانِيَّةِ ـ وَاِنِ اتَّخَذَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيْرٌ فَلَا يَتَّخِذُ ذٰلِكَ مِنَ التَّرِكَةِ ـ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃত লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে কোরআন ও হাদীছের বর্ণনা মতে তখন থেকে তার ভাল কিংবা মন্দ কোন প্রকারের আমল (কাজ) করার আর কোন সুযোগ থাকে না বরং ঐ লোকের জন্য আমলের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

আল্লাহর প্রিয় নবী রহমাতুল্ লিল্ আলামীন (স) এরশাদ করেন ঃ

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ الخ

অর্থাৎ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় (সংক্ষিপ্ত) (ছাদ্‌কায়ে জারীয়া কিংবা ছায়্যিআত জারীয়া ব্যতীত)।

মৃতব্যক্তি তখন থেকে সম্পূর্ণ জীবিত লোকদেরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আমরা তাদের স্মরণ করছি কি-না ? তাদের জন্য কোন ছওয়াব পুণ্যের হাদিয়া পাঠাচ্ছি কি-না? অধির আগ্রহে তারা জীবিতদের সাওয়াব প্রেরণের দিকে চেয়ে থাকে।

✪ হযরত ইব্‌নে আব্বাছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

ما الْمَيِّتُ فِيْ قَبْرِهٖ اِلَّا شِبْهُ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهٗ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ وَلَدٍ اَوْ صَدِيْقٍ ثِقَةٍ ـ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ (شرح الصدور)

অর্থাৎ মৃত লোক কবরের জীবনে ঐ বিপদগ্রস্ত লোকেরই ন্যায় যে ব্যক্তি কোন নদী বা সাগরের মাঝখানে ডুবো ডুবো অবস্থায় হাবুডুবু খাচ্ছে এবং সে কুলের লোকদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতঃ আর্তনাদ করছে -

তদ্রূপ মৃত ব্যক্তিও আর্তনাদ করে ডেকে ডেকে বলছে ঃ

ওহে আমার ছেলে-মেয়ে, আম্মা-আব্বা, ভাই-বন্ধুগণ! আমাকে সাহায্য কর- আল্লাহর শাস্তির মহা সাগর থেকে উদ্ধার কর। সে তার জীবন্ত মা-বাবা, ছেলে-সন্তান ও তার ভাই-বন্ধুদের থেকে মাগফেরাতের দোয়াপ্রাপ্তির আশায় অধির ভাবে অপেক্ষমান থাকে। যখন সে জীবিত আপনজনদের তরফ থেকে ছওয়াবের হাদীয়া এবং আজাব শাস্তি মাফ করার ব্যাপারে প্রার্থনার ফলাফল নিজের উপর দেখতে পায় তখন ঐ ছওয়াবের হাদীয়া তার নিকট দুনিয়ার সমস্ত কিছু থেকে অধিক মূল্যবান রূপে বিবেচিত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শ্রদ্ধেয় পাঠক!

এতে প্রমাণিত হল যে, সাধারণ মৃত মুসলমানেরা পরকালের জীবনে কত অসহায় ও বিপদ সংকুল অবস্থায় আছেন, তারা জীবিত মুসলিম আত্মীয় স্বজনের প্রতি কত বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে আছেন!

০ বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দেছ ও মনীষী আল্লামা ইমাম সুয়ূতী (র) স্বীয় "শারহুছ্ছুদূর" গ্রন্থে হযরত শেখ ইব্‌নুল হাছান বিন্ আলীর বরাতে উল্লেখ করেছেন- হযরত আবু হোরাইরা (রা) আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবী (স) এরশাদ করেন ঃ

হে আমার উম্মাতেরা !

আমার মৃত উম্মাতদের জন্য তোমরা হাদীয়া প্রেরণ করে যেও-ইহা শুনে আমরা জানার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, ইয়া রাছূলাল্লাহ (স) ! আমরা তাদের জন্য কিরূপে হাদীয়া তোহ্‌ফা পাঠাতে পারি! (যেহেতু পার্থিব কোন বস্তু দ্বারা তাদের কোন প্রয়োজনতো মিটতে পারে না)।

উত্তরে আল্লাহর প্রিয় রাছূল (স) এরশাদ করেন- শুন! মৃত মোমিন বান্দাদের রূহ (আত্মা) সমূহ জুমআর রাতে আকাশ তথা তাদের স্ব-স্ব অবাসস্থল থেকে পৃথিবীতে এসে নিজেদের আপনজনদেরকে অত্যন্ত ব্যথিত মনে করুন সুরে ডেকে ডেকে বলতে থাকে- "হে আমার ঘরের বসবাসকারী প্রাণের মা-বাবারা! আদরের ছেলে-মেয়েরা ! ভাই-বন্ধুরা, স্ত্রী-পরিজনেরা! আমার প্রতি দয়া কর, মেহেরবানী কর! আমাদের কিছু দাও! এতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতিও করুনা করবেন। আমাদের কথা স্মরণ কর, আমাদেরকে ভুলে যেও না।"

প্রাণের মা-বাবারা! / আদরের ছেলে-মেয়েরা !! / স্ত্রী-পরিজনেরা, ভাই-বন্ধুরা!!!

আমরা খোদায়ী কারাগারে বন্দী, অত্যন্ত দুঃখ-শাস্তির মধ্যেই আমরা আছি! মৃত্যুবরণ করতঃ আমাদের ন্যায় পরকালের কারাগারের বন্দী জীবনে প্রবেশ করার পূর্বেই আমাদের দুঃখের প্রতি ব্যথিত হয়ে মেহেরবানী করুণার দৃষ্টি দান কর। আমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে যাও।

আমাদের পরকালীন জীবনের মাগফিরাত কল্যাণ ও মুক্তির জন্য তোমাদের দান-ছদ্‌কা, তাছবীহ্-তাহলিল, দরূদ শরীফ, নামায, রোজা ও কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি জারী রেখো। মহান আল্লাহ তোমাদের উপরও করুণা করবেন।

হায়! অনুশোচনা ! ওহে আল্লাহর বান্দারা ! তোমরা আমাদের ফরিয়াদ শোন!

তোমরা কি জাননা ? এ ঘর, এ বাড়ী, এ প্রাসাদ, এ ধন-সম্পদ যা আজ তোমরা ভোগ করে চলেছ, ইতিপূর্বে এসব তো আমাদেরই ছিল! আমরাই এর মালিক ছিলাম। আমরা এসব ধন-সম্পদের বিশেষ অংশ আল্লাহর রাস্তায় দান না করার ফলে তা আজ আমাদের এ বিপদের কারণ হয়েছে। এসব আমাদের হয়েও আজ তোমরাই ভোগ করছ।

আমরা এর কিছুই পাচ্ছিনা, অথচ এ ধন-সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে যে অন্যায় করে এসেছি এর খোদায়ী সাজা আমরাই ভোগ করে চলেছি, আর তোমরা এর স্বাদই ভোগ করে যাচ্ছ।

অতঃপর আল্লাহর প্রিয় হাবীব রাহ্‌মাতুল্ লিল্ আলামীন দয়াল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন!

প্রত্যেক রূহ (আত্মা) এভাবে হাজার হাজার বার নিজেদের রেখে যাওয়া নারী পুরুষ সকল আপনজনদের ডেকে ডেকে বলছে!

আমাদের প্রতি দয়া কর। টাকা দিয়ে, রুটি দিয়ে, নামায পড়ে, জিকির করে দরূদ পড়ে আমাদের প্রতি করুণা কর। এ সুদীর্ঘ হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী হযরত আবু হোরাইরা (রা) বলেন, আল্লাহর প্রিয় রাছুল (স) দয়ালু নবী এ সুদীর্ঘ হাদীছ এরশাদ করার পর অঝোর নয়নে নিজেও কাঁদলেন আমাদেরকেও কাঁদালেন। (শারহুচছুদুর)

তাই আমাদের পরম ও চরম হিতৈষী স্নেহাশিষ আম্মাজান, আব্বাজান, নানা-নানী, দাদা,-দাদী, ভাই-বন্ধু, মামা-খালা, সাহায্যকারী, শ্বশুর-শ্বাশুরী, পরম হিতৈষী উস্তাদ-শিক্ষকমণ্ডলী, হিতাকাংখী কল্যাণকামী যারাই আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে পরকালের বন্দিশালায় কারারুদ্ধ হয়ে পড়েছেন-তাদের মাগফিরাতের জন্য, পরকালীন শান্তি ও মুক্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের ছওয়াব পুণ্যের কাজ করে, দান ছদ্‌কা করে, নামায পড়ে, দরূদ পড়ে, কোরআন পাক তেলাওয়াত করে তাদের রূহে পাকে তাদের নামে ছওয়াব পৌছানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

যেয়ারত

উপরে উল্লেখিত আমাদের সকল আপনজনদের ও হকদারদের স্মরণ করার এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনাকরতঃ তাদের পরকালীন জীবনের শান্তির ব্যবস্থা করার নিমিত্ত্ব কোরআন হাদীছ সম্মত ও ইসলামী শরীয়াত সমর্থিত বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে যিয়ারত করাটাই হচ্ছে সর্বোত্তম ছুন্নাতী পদ্ধতি।

আল্লাহর প্রিয় হাবীব দয়ার ভান্ডার নবী (স) আমাদের জন্য এ যিয়ারত করাকে সুন্নাত করে দিয়েছেন ঃ

✪ হযরত ইবনে বুরাইদা (র) নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا (مسلم)

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় রাছূল (স) এরশাদ করেন ঃ আমি নবী (ইতিপূর্বে ইছলামের প্রাথমিক অবস্থায়) কবর যিয়ারত করা হতে তোমাদেরকে সাময়িক ভাবে বারণ করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে (এখন থেকে) কবর যেয়ারত করার জন্য আদেশ করছি। অতএব তোমরা এখন থেকে যেয়ারত করে যেয়ো।

✪ হযরত ছাওবান (র) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَاجْعَلُوْا زِيَارَتَكُمْ لَهَا صَلَاةً عَلَيْهِمْ وَاسْتِغْفَارًا لَّهُمْ (اخرج الطبرانى ـ شرح الصدور)

অর্থাৎ আমি বিবিধ কারণে কবর যেয়ারত করা হতে তোমাদেরকে বারণ করেছি। এখন তোমাদেরকে আদেশ করছি-তোমরা এখন থেকে নিয়মিত যেয়ারত করে যেয়ো এবং তোমাদের এ যেয়ারত করাটাকে তাদের পরকালীন শান্তির উপায় ও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনার অছিলা স্বরূপ গ্রহণ কর।

✪ زيارة (যেয়ারত) শব্দের অর্থ দীদার-দর্শন ও সাক্ষাৎ-মুলাকাত করা,

ইসলামী পরিভাষায় ইন্তেকাল প্রাপ্ত নবী-রাছূল (আ), ছাহাবায়ে কেরাম, অলিয়াল্লাহ, ছালেহীন এবং আপন-পর তথা সর্ব সাধারণ মুসলমানদের কবরে গিয়ে রূহানীভাবে সকলের সাথে সাক্ষাৎ দর্শন করা, কবরস্থ লোকের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা-মাফিক তাদের থেকে ফয়জ -বরকত হাসিল করা, উনাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা এবং সাধারণ মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার নামই হচ্ছে যেয়ারত।

✪ হাদীছ শরীফ সমূহের ভাষ্য অনুযায়ী কবর যেয়ারত করা ছুন্নাত, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন যেয়ারত করা অবশ্য কর্তব্য। সুযোগ সম্ভব হলে প্রত্যহ যেয়ারত করা উত্তম। হাদীছ শরীফের মর্মানুসারে জুম্‌আর দিনই যেয়ারত করার জন্য উত্তম দিন।

✪ কবর যেয়ারতের দ্বারা যেয়ারতকারী যেমনি ভাবে উপকৃত হন অনুরূপভাবে যাদের কবর যেয়ারত করা হয় ঐ সব কবরবাসীরা ও অত্যধিকভাবে উপকৃত হন।

✪ মহিলাদের জন্য কবর যেয়ারত করা কোন কোন ফোকাহায়ে কেরামের মতে মাকরূহ হলেও অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে সব ধরনের মহিলাদের জন্য কবর যেয়ারত করা মাকরূহ নয় বরং যুবতী মহিলা ও পর্দাহীন মহিলাদের জন্যই মাত্র কবর যেয়ারত করা মাকরূহ, কারণ তাদের দ্বারা ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

বয়স্ক-বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য পর্দা সহকারে কবর যেয়ারত করা জায়েয।

✪ সর্বদা শরীয়াত সম্মত তারীকায় যেয়ারত করা জরুরী।

✪ মাথা-কপাল ঝুঁকিয়ে কবরে চুমু খাওয়া, কবরে তওয়াফ করা এবং কবরে ছিজ্‌দা করা হারাম।

✪ কবরে তাজা ফুল দেয়া, আতর-গোলাপ ছিটানো জায়েয কারণ এ ফুল যতক্ষণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাজা থাকে ততক্ষণ তাছবীহ পাঠে রত থাকে বিধায় এর দ্বারা মৃত লোকের উপকার হয়।[১]

✪ বিনা প্রয়োজনে কবরে বাতি জ্বালিয়ে অপচয় করা নাজায়েয। বিশেষ প্রয়োজনে যেয়ারতকারীদের সুবিধার্থে প্রয়োজন মাফিক বাতি জ্বালানো জায়েয।

✪ সর্বজনস্বীকৃত আউলিয়ায়ে কেরাম, জ্ঞানেগুণে ও আমলে প্রসিদ্ধ ওলামায়ে ছালেহীন গনের শান মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ লোকদের নিকট প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাদের কবরে পাকা-কাঁচা গৃহনির্মাণ করা, বা পূর্বের নির্মিতগৃহে উনাদেরকে দাফন করা শরীয়াত মতে জায়িয, এবং দ্বীনদারী ও দ্বীনী জ্ঞানগুণে প্রসিদ্ধ অলিয়াল্লাহও আলেম ওলামাগণের কবরের উপর গিলাফ দেওয়াও জায়েয।[২]

✪ তবে মাজার কেন্দ্রিক শিরিক বেদ্‌আত ও শরীয়াত গর্হিত আচার-আচরণ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয। কারণ বর্তমানে মুসলিম সমাজে কবর-মাজারকে কেন্দ্র করে শির্‌ক-বেদআত হতে শুরু করে শরীয়াত বিরোধী অনেক কাজ ও আচার-আচরণ চালু হয়ে পড়েছে। ঈমান-ইছলামের হেফাজতের জন্য এ ব্যাপারে সুন্নী মুছলমানদের বিশেষ ভাবে সর্তক হওয়া উচিত।

টীকা ঃ (১)

(١) ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً .... قَالَ فِى الْمِرْقَاةِ وَ مِنْ ثَمَّ اَفْتٰى بَعْضُ الْاَئِمَّةِ مِنْ مُتَاَخِّرِىْ اَصْحَابِنَا بِاَنْ مَا اُعْتِيْدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيْدِ سُنَّةٌ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَوَضْعُ الْوُرُوْدِ وَالرَّيَاحِيْنَ عَلَى الْقُبُوْرِ حَسَنٌ ـ(عالمگیری، كتاب الكراهيه باب زيارة القبور)

وَيُؤْخَذُ مِنْ ذٰلِكَ وَ مِنَ الْحَدِيْثِ (طحطاوى على المراقى الفلاح) نُدِبَ وَضْعُ ذٰلِكَ لِلْاِتْبَاعِ وَ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا اُعْتِيْدَ فِىْ زَمَانِنَا مِنْ وَضْعِ اَغْصَانِ الْاٰسِ نَحْوِهٖ ـ

(٢) وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ ـ وَ قِيْلَ لَا بَأْسَ بِهٖ وَ هُوَ الْمُخْتَارُ) كَمَا فِىْ كَرَاهَةِ السِّرَاجِيَّةِ وَ فِىْ جَنَائِزِهَا ـ (در المختار)

(قَوْلُهٗ وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ) .... وَ فِى الْاَحْكَامِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوٰى ـ و قِيْلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ ـ (شامى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম যখন খোৎবা দেওয়ার জন্য দাড়াবেন (কারো কারো মতে মিম্বরে আরোহন করবেন) তখন থেকে খোৎবা শেষকরা পর্যন্ত সময়ে যে কোন প্রকারের ছুন্নাত ও নফল নামায আরম্ভ করতঃ আদায় করা মাকরূহ। (শামী, গায়াতুল আওতার ইত্যাদি)

আর খোৎবা দানের সময় কাযা নামায আদায় করা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান হল, যে লোকের জীবনের এ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের বেশী কোন কাযা নামায নাই– যাকে শরীয়াতের পরিভাষায় "ছাহেবে তারতিব" বলা হয়, এ জাতীয় মুছাল্লির তারতিব রক্ষা করার জন্য খোৎবা দানের সময়েও কাযা নামায আদায় করে নেওয়ার অনুমতি রয়েছে।

কিন্ত সাধারণ মুছাল্লিদের জন্য খোৎবা দানের সময়ে কাযা নামায আদায় করাও মাকরূহ। (দুররে মোখতার)

উল্লেখ্য যে, যদি কোন লোক তাহাজ্জুদ নামায ছোবহে কাজেব অর্থাৎ ছোবহে ছাদেক হওয়ার আগে আরম্ভ করতঃ এক রাকাত আদায় করা অবস্থায় ছোবহে ছাদেক হয়ে যায় এবং বাকী এক রাকাত ছোবহে ছাদেক তথা ফজরের ওয়াক্তের মধ্যেই আদায় করে তাহলে উহা তাহাজ্জুদের নামাযের মধ্যেই গন্য হবে এবং মাকরূহও হবেনা। কেননা ইহা অনিচ্ছায় হয়ে পড়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে করে নাই।

(শামী, জাওহারাতুন নাইয়ারা)

মেরু অঞ্চলের নামাযের হুকুম

ভূগোলবিদগণের প্রদত্ত বিবরনী অনুযায়ী জানা যায় যে, পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরু অঞ্চলে এরূপ কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে দিবা-রাতের আবর্তন অন্যান্য অঞ্চলের নিয়ম মাফিক নয়, মেরু অঞ্চলে বৎসরে একটানা ছয় মাস দিন ও ছয়মাস রাত হয়ে থাকে, আর মেরুর নিকটবর্তী কোন কোন অঞ্চলে দিন-রাতের আবর্তন এমনভাবে হয়ে থাকে যে, সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর আকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়ার আগেই ছুব্‌হে ছাদিকের উদয় ঘটে, অর্থাৎ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয়েপড়ে, যদ্বরুন ঐসব অঞ্চলে এশা ও বিতির নামাযের ওয়াক্তই পাওয়া যায় না। অনুরূপ কোন কোন জায়গায় সূর্য মোটেই অস্ত যায়না। যেহেতু ইসলামী শরীয়াতে নামাযের ওয়াক্ত-সময়সূচী সূর্যের আবর্তন ও গতির ভিত্তিতে নিরূপিত হয়ে থাকে, ঐ কারণে ঐসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য নামাযের ওয়াক্ত নির্ণয় করার ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় ইসলামের মুজ্‌তাহিদ ফকীহগণের মধ্যে ইখতেলাফ হয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে হানাফী ফোকাহায়ে কেরামগণ থেকে দু'টি অভিমত পাওয়া যায় ঃ-

✪ একদল ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে, মেরু অঞ্চলের যে যে এলাকায় যে যে ওয়াক্তের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, সেখানে সে ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরয নয়,

কানজুদ্ দাকায়েক, দুরর ও মুল্তাকাল্ আবহোর নামক ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থত্রয়ের মুছান্নিফগণ নামাযের ওয়াক্ত পাওয়া না গেলে নামায আদায় করা ফরয নয়, স্ব-স্ব গ্রন্থে এমতটিরই বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মতে আর যেখানে নামাযের ওয়াক্তসমূহ দেরীতে আসে সেখানে সে ওয়াক্তের নামায দীর্ঘ বিলম্বিত সময়ের পরেই ফরয হবে।

এর হেতু হল, নামায ফরয হওয়ার কারণ হল ওয়াক্ত হওয়া; সুতরাং যেখানে সে ছবব-কারণ পাওয়া যাবেনা- সেখানে (مسبب) মুছাব্বাব অর্থাৎ নামায ফরয হবে না।

ছাইফুচ্ছুন্নাহ আল্লামা বাক্কালী (র) এ অবস্থায় এশা'র নামায ঐ অঞ্চলের লোকদের পড়া লাগবেনা বলেই ফতোয়া দেন, এরপর ইমাম শামসুল আইম্মা হালুয়ানীও উনার মতকেই সমর্থন করেন। আল্লামা বাক্কালী নিজের মতের পক্ষে যুক্তি স্বরূপ বলেন- যেরূপ কোন লোকের দু'হাত-দু'পা না থাকলে তারজন্য হাত-পা ধোয়ার ফরয ব্যতিরেকে ওযু সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, অনুরূপ যে অঞ্চলে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত থাকে সে অঞ্চলে পূর্ণ একবছরে মাত্র একদিনের নামায তথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয হবে।

✪ আর যে অঞ্চলে সন্ধ্যার লালিমা অস্তমিত হওয়ার আগেই পুনঃ ছুবহে-ছাদেক তথা ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে পড়ে- সে সব অঞ্চলে এশা ও বিতিরের নামাযের ওয়াক্ত পাওয়া না যাওয়ার কারণে এশা'ও বিতিরের নামায ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ আদায় করা লাগবে না।

✪ অপর একদল হানফী ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ন্যায় মেরু অঞ্চলের অধিবাসীদের উপরও প্রত্যহ পূর্ণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে যাওয়া ফরয।

সূর্যের আবর্তনের ব্যতিক্রমের কারণে যেখানে ওয়াক্তের ব্যাপারে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে অর্থাৎ নিয়ম মাফিক (নামাযের) ওয়াক্তের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। সেসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিকটবর্তী অঞ্চল যেখানে স্বাভাবিক ভাবে পাঁচ ওয়াক্তের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, সেখানকার নামাযের সময়সূচী অনুযায়ী এ মেরু অঞ্চলের অধিবাসীগণকেও দৈনিক নামায আদায় করে যেতে হবে।

✪ বিশ্ব বরেন্য মুহাক্কেক ও মুজ্তাহিদ ফকীহ্ কামাল উদ্দিন ইবনুল হুমাম (রঃ) এমতটিকেই গ্রহণ করেন এবং দুররুল মোখতার গ্রন্থের মুছান্নিফ আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকপী (রঃ) এমতই বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেন। ওয়াহ্বানিয়া গ্রন্থের শারেহ আল্লামা ইব্নে শাখ্না (রঃ) ও এর অনুসরন করেন, এ মতের উপরই বর্তমান মুফতীগণের ফতোয়া।

উক্তমতের অনুসারী ফোকাহায়ে কেরামগণ দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীছ দ্বারা নিজেদের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত নাওয়াছ ইব্নে ছাম্আন্ (র) বলেনঃ

ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ وَلَبْثَهُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ. قُلْنَا فَذَالِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ يَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلٰوةُ يَوْمٍ قَالَ لَا قَدِّرُوْا لَهُ قَدْرَهُ.

অর্থাৎ (একদা) আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দাজ্জাল, এবং পৃথিবীতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেন, (এবং বলেন) ঐ চল্লিশ দিনের একটা দিন হবে এক বছরের সমান, আর একটা দিন হবে এক মাসের সমান, অপর একটি দিন হবে এক জুমা তথা এক সপ্তাহের সমান -বাকী অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের সাধারণ দিন গুলোর সমানই হবে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এ সময় জনৈক ছাহাবী আল্লাহর প্রিয়নবী (স) কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যখন তার একদিন এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে তখন ঐ পূরা এক বছরের সমান সময়ের একদিনে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করাটা কি যথেষ্ট হবে? উত্তরে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ না -সারা বৎসরে মিলে শুধু একদিনের নামায আদায় করা যথেষ্ট হবে না।

তবে তোমাদেরকে তা অনুমান করতঃ নির্ধারণ করে নিতে হবে, অর্থাৎ এক বছরের সমান ঐ দিনটিকে ২৪ ঘন্টার একদিন ধরে ভাগ ভাগ করে নিতে হবে এবং সে মোতাবেক প্রতি চব্বিশ ঘন্টা অন্তর অন্তর পাচ ওয়াক্ত হিসেবে মোট পূর্ণ এক বছরের নামাযই আদায় করে যেতে হবে।

✪ মুহাক্কিক, সম্রাট হযরত ইব্নুল হুমাম্ (র) বলেন, একথা সকলেরই জানা আছে যে, মে'রাজের রাতে মহান আল্লাহ্তাআলা প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের মারফত বান্দাদের উপর মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয করেছেন, পৃথিবীর সব দেশের ও সব অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য এ হুকুম-আদেশ একও অভিন্ন, এক্ষেত্রে মেরু ও অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে না।

✪ নামায ফরয হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলার এ-নির্দেশই মূল কারণ, ওয়াক্ত মূল কারণ নয়, বরং ওয়াক্ত হল ঐ ফরয আদায়ের সময় মাত্র, সুতরাং مَحَلِّ فَرْض -কে عَدَمُ السَّبَبِ রূপে মেনে নেওয়া ঠিক নয়।[১]

টীকা : ১

(١) ومن لا يوجد عند هم وقت العشاء كما قيل يطلع الفجر قبل غيوبة الشفق عند هم افتى البقالى رح بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب وهو

সারসংক্ষেপ কথা হচ্ছে ঃ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে ও মৌসুমের পার্থক্যের দরুণ পৃথিবীর সকল স্থানে দিন-রাত এক সমান হয় না, কোথাও কোথাও দিন ছোট হয়ে তের ঘন্টা পর্যন্ত হয়ে থাকে আবার কোথাও কোথাও দিন বড় হয়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে তদুপরি মেরু এলাকায় মাসের পর মাস একটানা দিন ও একটানা রাত চলতে থাকে।

তাই যে সমস্ত এলাকায় ২৪ ঘন্টার বেশী বা একটানা দিন রাত হয়ে থাকে ঐ সকল এলাকার বাসিন্দাগণ তাদের নিকটতম দেশ বা অঞ্চলে যেখানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে দিন রাত হয়ে থাকে ঐ দেশের সময়কে ষ্টান্ডার্ড সময় ধরে সে অনুযায়ী নামায আদায় করে যেতে হবে।[২]

টীকার বাকী অংশ ঃ

مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ـ وانكر الحلوا نى ثم وافقه وافتى الامام البرهان الكبير بوجوبها ـ ولا يرتاب متامل فى ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلى الذى جعل علا مة على الوجوب الخفى الثابت فى نفس الامر وجواز تعدذ المعرفات للشئ ـ فانتفاء الوقت انتفاء المعرف وانتفاء الدليل على شى لا يستلزم انتفاء لجواز دليل اخر وقد وجد ـ وهو ما تو اطأت اخبار الاسراء من فرض الله تعالى الصلوة خمسا بعد ما امروا اولا بخمسين ثم استقر الامر على الخمس شرعا عاما لاهل الا فاق لا تفصيل فيه بين اهل قطر وقطر ـ وما روى ذكر الدجال رسول الله عليه وسلم ـ قلنا ما لبثه فى الارض ـ قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر و يوم كجمعة قال لا اقدروا له رواه مسلم فقد اوجب اكثر من ثلثمأة عصر قبل صيروره الظل مثلا اومثلين وقس عليه ـ فاستفد نا ان الواجب فى نفس الامر خمس على العموم غير ان توز يعها على تلك الاوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب ـ وكذا قال صلى الله عليه وسلم ـ خمس ضلوات كتبهن الله على العباد ـ ثم هل ينوى القضاء ـ الصحيح انه لا ينوى القضاء لفقد وقت الاداء ومن افتى لوجوب العشاء يجب على قوله الوتر ايضا (فتح القدير جـ١ ، صفحـ٢٢٤)

টীকার বাকী অংশ ঃ

(قوله ومن لم يجد وقتها لم يجبا) اى العشاء والوتر كما لوكان فى بلد يطلع فيه الفجر قبل ان يغيب الشفق كبلغار فى اقصر ليالى السنة فيما حكا ه معجم صاحب البلدان لعدم السبب وافتى به البقالى كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المر فقين وافتى بعضهم بوجوبها واختاره المحقق فى فتح القدير بثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلى..... الخ (بحر الرائق ج صفحه٢٤٧)

(وفاقد وقتهما) كبلغار فان فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق فى اربعينية الشتاء

(مكلف بهما فيقدر لهما) ولا ينوى القضاء لفقد وقت الاداء به افتى البرهان الكبير واختاره الكمال وتبعه ابن الشحنه فى الغازه فصححه فزعم المصنف انه المذهب (وقيل لا) يكلف لعدم سببهما وبه جزم فى الكنز والدرر والملتقى وبه افتى البقالى ووافقه الحلوانى والمر غينانى ورجحه الشرنبلالى والحلبى (درالمختار)

والحاصل انهما قولا ن مصححان ـ ويتايد القول بالوجوب بانه قال به امام مجتهد وهو الا مام الشافعى كما نقله فى الحلية عن المتولى عنه .... قال الرملى فى شرح المنهاج ـ ويجرى ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة اه قال فى امداد الفتاح قلت ـ وكذلك يقدر لجميع الاجال كالصوم والزكاة والحج والعدة واجال البيع والسلم والاجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الاربعة بحسب مايكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا فى كتب الا ئمة الشافعية ونحن نقول مثله اذ اصل التقدير مقول به اجماعا فى الصلوة اهـ ـ (شامى ج ا ـ صفحه ٣٦٥)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আযান ও ইকামত

আযান শব্দের অর্থ اَلْاِعْلَامُ (আল্ই'লাম) অর্থাৎ অবগত-অবহিত করা ও ঘোষণা করা ইত্যাদি। যে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ বাক্য দ্বারা বিশেষ বিশেষ সময়ে মুসলিম জনসাধারণকে নামায আদায়ের ব্যাপারে অবগত করা হয় ও নামায আদায়ের প্রতি আহবান করা হয় একে শরীয়াতের পরিভাষায় আযান বলা হয়।[১]

যদিও একটি সুনির্দিষ্ট এবাদত, নামাযের সাথেই আযানের সম্পর্ক, তথাপি ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্যহ এ আযানের মাধ্যমেই আল্লাহর এ বিশাল দুনিয়ার শহরে, নগরে, গ্রামে-গঞ্জে এমনকি পাহাড়ের চুড়ায় তথা সর্বত্রই মহীয়ান গরীয়ান মহা-মহিম প্রভু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মহত্বের ও একত্ববাদের ঘোষণা ধ্বনিত হচ্ছে। নিখিলের নবী আল্লাহর হাবীব রহমাতুললিল আলামীন (দঃ) এর রেছালতের সুমধুরসুর ধ্বনিত হচ্ছে। মূলতঃ এ আযান ইসলাম ও মুসলিমের গৌরব এবং ঐতিহ্যের প্রতিক, ইসলামী সাংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

ইহা শয়তান তথা আল্লাহ দ্রোহী নাস্তিক মালউনদের জন্য এটমের চেয়েও মারাত্মক।

তাই যেমনিভাবে শয়তান এ আযানের আওয়াজকে মোটেই সইতে পারে না বরং আযানের সুর ধ্বনি বেজে উঠার সাথে সাথে সে দ্রুত পালিয়ে যায়। তেমনি ভাবে মানুষের মাঝেও এমন কিছু মানব রূপী শয়তান রয়েছে যারা এ আযানের আওয়াজকে মোটেই সহ্য করতে পারে না।

প্রত্যহ নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক মোমেনকে যে মহান আল্লাহর জিকির- এবাদত তথা নামায আদায় করে যেতে হয়, ঐ সুনির্ধারিত সময় সমাগত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণকে সতর্ক ও অবগত করনের উদ্দেশ্যেই শরীয়াতে আযান প্রবর্তিত হয়।

প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হিজরী সনেই আযানের প্রবর্তন হয়।

টীকা ঃ ১
اَلْاَذَانُ هُوَ الْاِعْلَامُ بِاَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ فِىْ اَوْقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ لِاِحْضَارِ النَّاسِ لِلصَّلٰوةِ الْمَفْرُوْضَةِ ـ
هُوَ اِعْلَامٌ مَخْصُوْصٌ عَلٰى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ بِاَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ (در مختار)

✪ আযানের ফাযায়েল ঃ

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, এ লোকের চেয়ে কার বাণীই উত্তম যে আল্লাহ জাল্লা শানুর প্রতি আহবান করে এবং আমলে ছালেহ করে ও বলে যে, আমি নিশ্চয়ই মুসলমানদেরই একজন।

✪ হযরত আনছ (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন আযান বলা হয় তখন আসমানের (রহমতের) দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং যখন একামতের ওয়াক্ত হয় তখন কোন দোয়া করলে তা রদ হয় না। (رواه ابو الشيخ)

✪ অপর এক হাদীস শরীফে এসেছে, রাসুল পাক (স) এরশাদ করেন ঃ

كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اُذِّنَ فِىْ قَرْيَةٍ اٰمَنَهَا اللّٰهُ مِنْ عَذَابِهٖ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ـ (كشف الغمة)

অর্থাৎ যে জনপদে (এলাকায়) আযান দেওয়া হয় আল্লাহ তাআলা ঐ এলাকাকে ঐ দিনের জন্য আজাব থেকে নিরাপদ রাখেন।

✪ অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী আকরাম (স) এরশাদ করেন,

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَايَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءَ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَايَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى (بخارى)

অর্থাৎ যখন আযান হতে থাকে তখন শয়তান বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে যেন আযানের আওয়াজ শুনতে না পায়। আযান শেষ হলে আবার সে ফিরে আসে। যখন ইকামত বলা হয় পুনঃ সে পালিয়ে যায়। ইকামত শেষ হলে সে পুনরায় এসে নামাযরত লোকদের মনে নানা ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। যে সব বিষয় স্মরণে থাকে না ঐ সব স্মরণ করাতে থাকে এতে শেষ পর্যন্ত কত রাকাত নামায পড়া হয়েছে মুসাল্লী তা পর্যন্ত ভুলে বসে। (বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড)

✪ হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ কেয়ামতের দিন মোয়াজ্জেনদের গরদান বেশী উচু হবে অর্থাৎ তারা অত্যধিক সম্মানী হবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ অন্য একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةٌ لَا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَلَا يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ وَهُمْ عَلٰى كَثِيْبٍ مِّنْ مِسْكٍ حَتّٰى يُفْرَغَ حِسَابُ الْخَلَائِقِ - رَجُلٌ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَاَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ - وَدَاعٍ يَدْعُوْ اِلَى الصَّلٰوةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَعَبْدٌ اَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهٖ وَفِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيْهِ (رواه الطبرانى فتح القدير)

অর্থাৎ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তিন শ্রেণীর লোক কেয়ামতের মহা সংকট দিবসের ভয়-ভীতির মধ্যে পড়বেনা এবং তাদের হিসাব-নিকাশও নেওয়া হবেনা। বরং ভীষণ চিন্তা-ভীতির দিবসেও এরা (পানাহারের) আনন্দে মশগুল থাকবে। এরই মাঝে মাখলুকের হিসাব-নিকাশের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এদের এক শ্রেণী হচ্ছেন (ঐ সমস্ত আলেম) যারা একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে আল্লাহর কোরআন তথা কোরআন-ছুন্নাহর এলম শিক্ষা করেন অতঃপর কওম তথা মুছাল্লীদের সন্তুষ্টি রেখে ইমামতির দায়িত্ব পালন করে যান।

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে, ওরা (মোয়াজ্জেনেরা) যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আযান দিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর নামাযের দিকে আহবান জানিয়ে থাকেন। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে ওরা যারা তাদের প্রভু আল্লাহ তাআলার হক (নামায, রোজা ইত্যাদি) সঠিক ভাবে আদায় করেছেন সাথে সাথে তার দুনিয়ার মনিবের দেওয়া দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন করে গিয়েছেন। (তিরবানী -ফাতহুল কাদীর)

অপর একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহর নবী (দঃ) এরশাদ করেন-

لِلْاِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى مَعَهُمَا - (كشف الغمه)

অর্থাৎ ইমাম-মোয়াজ্জেন যাদের কে নিয়ে জমাত সহকারে নামায আদায় করে থাকেন তাদের প্রত্যেকে (ব্যক্তিগত ভাবে) যত ছাওয়াব পাবে ঐ সকল মুছাল্লিদের ছাওয়াবের সমপরিমান ছাওয়াব ইমাম-মোয়াজ্জেন একাই পাবেন।

হাদীছ শরীফে আরও উল্লেখ আছে ঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এক মাত্র ছাওয়াবের আশায় পাঁচ ওয়াক্ত (নামাজের জন্য) আযান দেয় তার অতীতের গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায় এবং যে লোক ঈমান সহকারে একমাত্র ছাওয়াবের আশায় নিজের সাথী সঙ্গীদের (মুছাল্লীদের) ইমামতির দায়িত্ব পালন করে থাকে তার অতীতের গুনাহ সমূহও মাফ করে দেওয়া হয়। (বায়হাকী)

আযানের মাছায়েল ঃ

প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং জুমআ বারে যোহরের স্থলে জুমআর নামাযের জন্য নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর পুরুষ মুসলমানদের উপর আযান দেওয়া ছুন্নাতে মুয়াককাদাহ কেফায়া, আর কারো কারো মতে ওয়াজিবে কেফায়া।

অপর এক শ্রেণী ফোকাহায়ে কেরামের মতে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করার জন্যই আযান দেওয়া ছুন্নাত।[১]

যে কোন একজন লোক আযান দিয়ে দিলে যত দূরের লোকেরা উক্ত আযান শুনতে পায় তাদের প্রত্যেকেই ছুন্নাতে মুয়াককাদা কিংবা ওয়াজিব আদায়ের দায় দায়িত্ব হতে মুক্তি পাবে। আর কেহ যদি আযান না দেয় তাহলে সবাই গুনাহগার হবে।

এমনি ভাবে মহল্লা, গ্রাম বা শহর বাসীর সকলেই যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে আযান একামত বলা পরিহার করে বসে এমতাবস্থায় সবাইতো গুনাহগার হবেই বরং হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর মতানুসারে এধরনের ইচ্ছাকৃত ভাবে আযান একামত তরককারিদের সাঙ্গে (প্রয়োজনে) জেহাদ করতে হবে। যেহেতু আযান হচ্ছে شعار الاسلام واعلام الدين (ইসলামের নিদর্শন ও দ্বীনের প্রতীক)·

আমাদের হানাফী মাজহাব অনুযায়ী নিয়ম হল প্রত্যেক ফরয নামায তা ঠিক ওয়াক্তের ভিতরে আদায় করা হউক বা কাযা আদায় করা হউক, জমাত সহকারে আদায় করা হউক কিংবা একাকী ঘরে পড়া হউক এসব ক্ষেত্রে আযান ও একামত বলতে হয়। (আলমগীরী গায়াতুল আওতার)

ঘরে একাকী নামায আদায়কারীর জন্য মহল্লার মাসজীদের আযানই যথেষ্ট। তবে একাকী নামায আদায় করার বেলায় একামত বলেই নামায আদায় করা উত্তম। অনুরূপ ঘরে জমাত সহকারে নামায আদায়ের জন্য আযান দেওয়া উত্তম। একামত বলা জরুরী।

টীকা ঃ

اَلْاَذَانُ سُنَّةٌ فِىْ قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ...... وَقَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا وَاجِبٌ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رح (شرح منية) هُمَا سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ اَدَاءً وَقَضَاءً (سنن للفرائض) اى سَنَّ الْاَذَانُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ قَوِيَّةٌ قَرِيْبَةٌ مِنَ الْوَاجِبِ حَتّٰى اَطْلَقَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْوُجُوْبَ وَلِهٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رح لَوِ اجْتَمَعَ اَهْلُ بَلَدٍ عَلٰى تَرْكِهٖ قَاتَلْنَاهُمْ عَلَيْهِ وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رح يُحْبَسُوْنَ وَيُضْرَبُوْنَ (بحر الرائق) لِاَنَّ الْاَذَانَ مِنْ اَعْلَامِ الدِّيْنِ (شرح منية)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযান ও একামতের বাক্যসমূহ শুদ্ধ রূপে জানা ব্যক্তি(১) আযান একামত (২) ও নামাযের মছায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞ পরহেজগার (৩) বয়ঃপ্রাপ্ত (৪) সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন (৫) পুরুষ লোকের (৬) ওযুর সাথে (৭) কেবলা মুখী হয়ে (৮) উচ্চস্থানে (৯) দাড়িয়ে (১০) উভয় কানের ছিদ্র পথে শাহাদত আঙ্গুলী প্রবেশ করিয়ে (১১) শুদ্ধ ভাবে (১২) আযানের বাক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতঃ (১৩) উচ্চ ও সুমিষ্ট স্বরে (১৪) আযান দেওয়া সুন্নাত (বদায়ে উচ্ছানায়ে, দুররে মোখতার)

✪ এক বাক্য উচ্চারণ করার পর শ্রোতা যেন এর জাওয়াব দিতে পারে, দু-বাক্য উচ্চারণের মাঝ খানে এতটুকু সময় বিলম্ব করে আযান দেওয়া সুন্নাত।

✪ নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দিয়ে দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দেওয়া জরুরী (আলমগীরী)

✪ গোছল ফরয হয়েছে অবস্থায় গোছল না করে আযান দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী (আলমগীরী)। এ ক্ষেত্রে পাক পবিত্র হয়ে পুনরায় আযান দেওয়া লাগবে। (শামী, বাইরুর রায়েক)

✪ স্ত্রী লোকদের আযান ও একামত বলা মাকরূহে তাহরীমী। এদের দেওয়া আযান পুরুষ কর্তৃক দোহরায়ে দিতে হবে। (বাহরুর রায়েক, শামী, তাহতাবী)

✪ অবুঝ ছেলে, পাগল ও নেশাগ্রস্থ মাতালদের আযান মাকরূহ এবং এক্ষেত্রেও পুনরায় আযান দেওয়া জরুরী। তদুপরি হেটে হেটে কিংবা বসে বসে আযান দেওয়াও মাকরূহ (বাহরুর রায়েক)। তবে নাবালেগ ছেলে বুদ্ধিমান হলে তার দেওয়া আযান মাকরূহ নহে। (আলমগীরী)

✪ বিনা ওযুতে আযান দেওয়া মুস্তাহাবের খেলাফ। তবে ঘটনাক্রমে বিনা ওযুতে আযান দিয়ে দিলে পুনঃ আযান দোহরানো লাগবে না। (আলমগীরী)

✪ মুছাফেরের একা নামায আদায় করার বেলায় আযান-একামত উভয়টা তরক করা মাকরূহ! শুধু আযান তরক করলে মাকরূহ হবে না। (জামেরউ রুমুজ)

✪ যে মাসজিদে ইমাম মুয়াজ্জেন নির্ধারিত আছেন ঐ ধরনের মাসজিদে আযান একামতসহ জামাত সহকারে একবার জামাত হয়ে থাকলে পরে আগত মুছাল্লীদের পুনঃ আযান-একামত দিয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ। কিন্তু এ জাতীয় মাসজিদে কতেক অজানা মুসাল্লি এসে নিজেরা আযান বলে নামায আদায় করে নেওয়ার পর প্রত্যেক দিনের ন্যায় নির্ধারিত সময়ে ইমাম-মোয়াজ্জেন ও নিয়মিত মুছাল্লিবৃন্দ এসে জমাতে নামায আদায় করার বেলায় পুনঃ আযান একামত বলেই জমাত আদায় করা মুস্তাহাব। (আলমগীরী)

✪ যে মসজিদে ইমাম-মোয়াজ্জেন নির্ধারিত নাই ঐ সব মাসজিদে পৃথক পৃথক আযান- একামত বলে জমাত আদায় করা মাকরূহ নহে। ঘরে বা অন্যত্র কাযা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে জামায়াতের সাথে আদায় করা হউক কিংবা একাকী আদায় করা হউক একটু নিম্নস্বরে আযান ও একামত বলা সুন্নাত (গায়াতুল আওতার)। কিন্তু মাসজিদে কাযা নামাজ আদায় করার বেলায় আযান একামত বলবে না। (শামী)

✪ নামায ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে আযান দেওয়া মস্তাহাব ঃ

১। সন্তান জন্ম নেওয়ার পর গোছল দিয়ে তার কানে আজন দেওয়া মুস্তাহাব।

২। অধিক চিন্তাক্লিষ্ট ব্যক্তির কানে।

৩। ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত ব্যক্তির কানে।

৫। দুষ্ট জ্বিনের উৎপীড়ন অবস্থায়।

৬। নির্জন মাঠে বা জায়গায় পথ হারিয়ে গেলে।

৭। প্রবল ঝড়-তুফান ভুমীকম্প চলাকালে ৫/৭ জন মিলে আযান দেওয়া মুস্তাহাব। (শামী)

৮। জ্বিন-ভুতের উপদ্রব থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ঘর-বাড়ী বন্ধ করার বেলায়ও আযান দেওয়া জায়েজ।

আযান দেওয়ার নিয়ম

নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর মোয়াযযিনকে ওযু অবস্থায় উচু স্থানে কেবলা মুখী হয়ে দাড়াতে হয়। অতপর বাধ্যবাধকতা স্বরূপ নয় বরং ঐচ্ছিক ভাবে ঈমান ও নবী প্রেমের তাড়নায় যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আল্লাহ রাছুলের সন্তোষ ও ভালবাসা অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রিয় নবী শাফিউল মুজনেবীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লমের উপর-

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া ছায়্যিদী এয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া ছায়্যিদী এয়া নাবীয়াল্লাহ,আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া ছায়্যিদীএয়া হাবীবাল্লাহ, আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া রাহমাতাল লিল আলামীন আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া শাফীয়াল মুজনেবীন। উক্ত নিয়মে ছালাত-ছালাম (দরূদ) পেশ করা উত্তম।[১]

টীকা ঃ

(وتسن الصلوة) اىْ غَيْرُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ بَعْدَ الْاذَانِ (على النبى صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْاقَامَةِ عَلٰى مَا قَالَهُ النَّوَوِىُّ رح فِىْ شَرْحِ الْوَسِيْطِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ابْنُ زِيَاد وَقَالَ اَمَّا قَبْلَ الْاذَانِ فَلَمْ اَرَ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا وَقَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ الْبَكْرِىُّ رح (اَنَّهَا) اَىْ الصَّلٰوةُ عَلٰى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تسن قبلهما) اَىْ الْاذَانِ وَالْاقَامَةِ ـ (اعانة الطالبين صفحه ٢٨٠ جـ١)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর ২/৩ মিনিট নিরবতা পালন করে আযানের বাক্যাবলী ও ছালাত ছালামের মাঝখানে কিছুটা ফাঁক সৃষ্টি করা দরকার। যাতে দরূদ ছালামের বাক্যগুলো আযানের বাক্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে না যায়।

বিরতির পর উভয় হাতের শাহাদত আঙ্গুলিদ্বয়কে দু'কানের ছিদ্রপথে রেখে উচ্চ আওয়াজে সুমিষ্টস্বরে আযানের সুনির্ধারিত বাক্যগুলো শুদ্ধভাবে ধীরস্থীরতার সাথে সপষ্টরূপে উচ্চারণ করতঃ আযান দিতেহয়।

✪ আযানের বাক্য 'হাইয়া আলাচ্ছালাহ' বলার সময় ডান দিকে মুখ ফিরাতে হয়। অনুরূপ 'হাইয়া আলাল্ ফালাহ' বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরাতে হয়।

আযান ও উহার জাওয়াবের নির্ধারিত বাক্যসমূহ ঃ-

আযানের শুরুতে সর্ব প্রথম মুয়াযযিন সাহেব কে বলতে হয়,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর)

এর জবাবে শ্রোতাগণকে মৃদুস্বরে এ একই বাক্য বলে যেতে হয়–

২য় বার মুয়াযযিনকে বলতে হয়,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর-আল্লাহু আকবর)

এর জবাবে শ্রোতাগণকে মৃদু স্বরে একই বাক্য বলে যেতে হয়।

৩য় বার মুয়াযযিন কে বলতে হয়,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশহাদু আললা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

এরজবাবে শ্রোতাগণকে মৃদ স্বরে একই বাক্য বলে যেতে হয়।

৪র্থ বার মুয়াযযিনকে বলতে হয়,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশহাদু আললা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

এর জবাবে শ্রোতাগণকে মৃদুস্বরে একই বাক্য বলে যেতে হয়।

৫মবার মুয়াযাযিনকে বলতে হয়ঃ-

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ)

এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, শ্রোতাগন মুয়াযযিনের مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ) বাক্যাংশ শুনার সাথে সাথে প্রিয় নবী (দ:)-এর প্রতি তা'জীম ও মুহাব্বত প্রদর্শনার্থে অতি নম্রতা ও আদবের সাথে নিজের দুহাতের বৃদ্ধাঙ্গালিদ্বয়ের নখে মুখ দ্বারা চুমু দিয়ে–

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ছাল্লাল্লাহু আলাইকা এয়া রাছুলাল্লাহ)

বলে নিজের চোখে লাগাবে, ইহা একটি মুস্তাহাব আমল।

মুয়াযযিনের উক্ত শাহাদত কলেমা বলার মধ্যেই শ্রোতাগণ চুমু দানের আমল শেষ করে মুয়াযযিনের অনুরূপ শ্রোতাগণ কেও পুনরায় এ একই বাক্য আশ্হা দুআন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ্ বলতে হয়।

৬ষ্ঠ বার মুয়াযযিনকে বলতে হয়–

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ)

আর শ্রোতাগণ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ) বাক্য শুনার সাথে সাথে পূর্ব নিয়মে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে চুমু দিয়ে قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (কুররাতু আইনি বিকা এয়া রাছুলাল্লাহ) বলে দু'চোখে লাগাতে হয় অতঃপর বলতে হয়,

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

(আল্লাহুম্মা মাততি'নী বিছছাম্য়ী ওয়াল বাছারি)

অতপর মুয়াযযিনের অনুরূপ শ্রোতাগণকেও পুনরায় একই বাক্য 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ' বলতে হয়।

৭ম বারে মুয়াযযিনকে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়—

حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাচ্ছালাহ)

এর উত্তরে শ্রোতাগণকে বলতে হয়,

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاْ لَمْ يَكُنْ

লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ মা'শা আল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন।

৮ম বারও মুয়াযযিনকে অনুরূপ ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে পুনরায় বলতে হয়,

حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাচ্ছালাহ)

শ্রোতাগণকে উত্তরে পূর্বে উল্লেখিত ঐ একই বাক্য বলতে হয়।

৯ম বার মুয়াযযিনকে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়,

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ)

এবং শ্রোতাগণকে উত্তরে ঐ .... لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা.....) শেষ পর্যন্ত বলতে হয়।

১০ম বারও মুয়াযযিনকে অনুরূপ বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হয়,

حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং শ্রোতাগণকে উত্তরে এ লা-হাওলা শেষ পর্যন্ত বলতে হয়।

একাদশ বারে মুয়াযযিনকে বলতে হয়ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লহু আকবর আল্লাহু আকবর)

শ্রোতাগনকে উত্তরে এ একই বাক্য বলতে হয়।

দ্বাদশ বারে মুয়াযযিনকে বলতে হয়—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ)

আর শ্রোতাগণকেও উত্তরে এ একই কালেমা বলতে হয়।

উল্লেখ্য যে, মুয়াযযিনকে শুধু মাত্র ফযর ওয়াক্তের আযানে হাইয়া আলাল ফলাহ" দ্বিতীয় বার বলা শেষ করে অতঃপর–

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম)

একে একে দুবার বলতে হয় এবং শ্রোতাগণকে প্রতিবার উত্তরে—

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ

(ছাদাকতা ওয়া বাররতা ওয়া বিলহাককি, নাত্বাকতা) –বলতে হয়।

আযান শেষের দোয়া ও দরূদ শরীফ ঃ

যখন আযান বলা শেষ হয় তখন ছহীহ হাদীছ শরীফের নির্দেশ অনুসারে মুয়ায্যিন সাহেবের এবং শ্রোতামণ্ডলী সকলেরই আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা অতপর হাদীছ শরীফে বর্ণিত নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করতঃ হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা ছুন্নাতঃ-

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ -

দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

আল্লাহুম্মা রাব্বা হা জিহিদ্দা ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াচ্ছালাতিল্ কা-য়িমাতি আ-তি ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদানিল্ ওয়াছীলাতা ওয়াল্ ফাদীলাতা ওয়াদ দারাজাতার্ রাফীআতা ওয়াব্ আছহু মাকামাম্ মাহ্মুদানি ল্লাযী ওয়া আদ্তাহু ওয়াজ্ আল্না ফী শাফা আতিহি ইয়াও মাল্ কিয়ামাতি (ওয়ারজুক্না শফা-আতাহু ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি) ইন্নাকা লা- তুখ্লিফুল্ মীয়াদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! পরিপূর্ণ আহবান ও অনুষ্ঠিতব্য নামাযের মহান মালিক! ছর ওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে ওয়াছিলা নামক সম্মানের সর্বোচ্চ স্থান, সর্বোত্তম মর্যাদা ও সুমহান সম্মান দান করুন এবং মাকামে মাহমুদ তথা হাশর দিবসে শাফয়াত করার চরম প্রশংসিত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করুন, যার অঙ্গিকার আপনি তাকে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তার শাফায়াত-সুপারিশের মধ্যে শামিল করে নিন,নিশ্চয় আপনি কখনো ওয়াদা- প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

মুছলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছ পাকে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ ....فَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ -

অর্থাৎ যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনতে পাবে তখন মুয়ায্যিন যা বলবে প্রতি উত্তরে তোমরাও অনুরূপ কালেমা গুলো বলে যাবে, অতপর তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার রহমত (করুনা) বর্ষণ করে থাকেন। এরপর তোমরা দোয়ায়ে ওয়াছিলা তথা আযানের দোয়া পাঠ করবে ----আর যে (আমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ দোয়া পাঠ করবে তার জন্য অমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আযান শেষের দোয়া পাঠের বেলায় বর্তমানে আমাদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য দেখা যায়।

আযানের দোয়ার শেষে 'ওয়ারজুক্না শাফায়াতাহু ইয়াওমাল্ কিয়ামাহ' বাক্য খানা ইতিপূর্বে বিনা দ্বিধায় সবাই বললেও এখন এটা বলার ব্যাপার নিয়ে এক শ্রেণীর লোক প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে দিয়েছে যে, উল্লেখিত বাক্য খানা হাদীছে নাই সুতরাং উহা বলা যাবে না।

সন্মানিত পাঠক, এ প্রসঙ্গে আপনাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, ইসলামী জগতের সর্বমান্য ফেকাহ ৷াস্ত্রের অন্যতম কিতাব হেদায়ার ব্যাখ্যগ্রন্থ

pdf By Syed Mostafa Sakib

'ফাতহুল কাদীর' এ আল্লামা কামাল উদ্দিন ইবনুল হুমাম (রাঃ) আযান শেষের 'দোয়া' প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত দোয়া সমূহের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মনীষী ইমাম তিবরানী (রঃ) এর 'মো'জামুল কাবীর' নামক হাদীছ গ্রন্থের বরাতে একটি হাদীছ শরীফের উল্লেখ দেন ঃ

وَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيْلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ـ

অর্থাৎ হুজুর পুরনুর (দ:) এরশাদ করেছেন—

"যে কেউ আযান শুনে পাঠ করবে, আশহাদু আল্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শরীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু আল্লাহুম্মা ছাল্লী আলা মোহাম্মাদিন ওয়া বাল্লিগহু দারাজাতাল্ ওয়াছিলাতি ইন্দাকা ওয়াজ্ আল্‌না ফী শাফা আতিহী ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি। তার জন্য (আমার) শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে পড়বে।"

✪ মুনিয়তুল মুছাল্লি কিতাবের শরাহ غُنْيَة الْمُسْتَمْلِى গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

✪ এমনিভাবে হাদীছ শাস্ত্রের অপর প্রসিদ্ধ মনীষী হযরত ইমাম ছাখাভী (র:) اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ الشَّفِيْعِ নামক কিতাবের اَلصَّلٰوةُ بَعْدَ الْاَذَانِ পরিচ্ছদে বর্ণনা করেন—

اَخْرَجَهُ ابْنُ عَاصِمٍ وَالطَّبْرَانِىُّ فِى الدُّعَاءِ وَالْكَبِيْرِ وَالْاَوْسَطِ وَلَفْظُهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ / قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هٰذَا عِنْدَ النِّدَاءِ جَعَلَهُ اللّٰهُ فِىْ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনো আছেম (রাঃ) এবং আল্লামা হযরত ইমাম তিবরানী স্বীয় কিতাব যথাক্রমে আদদোয়া আল্‌মুজামুল্ কবীর' এবং আল্ মুজামুল্ আওছত্ এর মধ্যে বর্ণনা করেনঃ হুজুর (দঃ) যখন আযান শুনতেন তখন বলতেন, আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-জিহ্‌িদদাওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াচ্ছালাতিল ক-য়িমাতি, ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়ারাছুলিকা ওয়াজ আল্‌না ফী শাফাআতিহি ইয়াওমাল্ কিয়ামাতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন ব্যক্তি উপরোক্ত পরিমাণ দূরবর্তী স্থানে রেল, স্টিমার, মোটরগাড়ী, কিংবা বিমান ইত্যাদি আধুনিক যান বাহনে করে অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ তিন দিনের পথ এক আধ-ঘন্টা তথা স্বল্প সময়ের মধ্যে পৌছে গেলেও সে লোক মুছাফির রূপে গণ্য হয়ে পড়বে।

মুছাফির এর জন্য হুকুম হল ঃ যোহর, আছর এবং এশা, এ তিন ওয়াক্তের ফরয নামায সমূহ মুছাফির লোক চার-রাকাতের স্থলে কছর করত ঃ দু'রাকাত করেই আদায় করে যাবে।

আর এভাবে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায সমূহ কে দু'রাকাত করে আদায় করাটাকে শরীয়াতের পরিভাষায় কছর বলা হয়।

✪ قصر (কছর) আরবী শব্দ, আভিধানিক অর্থে কোন কিছুকে হ্রাস করা সংকোচন করা, সীমাবদ্ধ করে নেওয়া, সুউচ্চ অট্টালিকার অর্থে ও কছর শব্দের ব্যবহার হয়।

✪ ছফর-ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। পবিত্র হাদীছে একে এক প্রকারের আযাব বলা হয়েছে, করুণাময় আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি তাঁর করুণা প্রকাশ করতে গিয়ে কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ছফর অবস্থায় কছর অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে দু'রাকাত করে আদায় করার বিধান দান করেছেন।

মুছাফির ব্যক্তির জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায কে দু'রাকাত করে আদায় করার বিধান মহান আল্লাহর এক বিশেষ দান, চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায কে মুছাফেরী অবস্থায় দু'রাকাত করে পড়া ফরয অর্থাৎ আবশ্যিক বিধান। ঐচ্ছিক বিধান নয়, আল্লাহর এ হুকুম পালন না করলে নামায শুদ্ধ হবেনা এবং কছর না পড়লে গুনাহগার হবে।

✪ তিন রাকাত কিংবা দু'রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযের কছর হয়না। অনুরূপ ওয়াজিব এবং সুন্নাত নামাযের ও কছর হয়না কাজেই মাগরিব ও ফজরের ফরয এবং বিতরের ওয়াজিব নামাযের কছর পড়া জায়েজ নাই (শামী, তাহতাবী)। গ্রহণ যোগ্য মতানুসারে মুছাফির এর শান্ত, নিরাপদ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছুন্নাত নামায ইত্যাদি অবশ্যই আদায় করে যাওয়া উচিৎ। আর সময় না থাকলে অথবা পরিস্থিতি অস্বাভাবিক থাকলে তখন সুন্নাত পরিত্যাগ করা জায়েজ (আলমগীরী)।

✪ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতানুসারে মুছাফির ব্যক্তি যে ক্ষেত্রে নিজ শহরের মহল্লা কিংবা গ্রামের সীমানা অতিক্রম করবে এবং শহরের আবাসিক এলাকা ছেড়ে যাবে তখন থেকেই কছর পড়া শুরু করবে। শহর তলীর সাথে সংযুক্ত মহল্লা সমূহ শহর হিসাবে গণ্য। বিচ্ছিন্ন মহল্লা শহরের মধ্যে গণ্য নয় (আলমগীরী)। মোট কথা শহরের আবাসিক এলাকার ভিতরে থাকতে কছর পড়া শুরু করবেনা।

ছফর-ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নিজ শহরের আবাসিক এলাকায় প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত কছর রূপেই নামায আদায় করে যাবে।

✪ মুছাফির লোক নিজের থানা কিংবা আবাসিক এলাকায় ফিরে না আসা পর্যন্ত কছর নামায আদায় করে যাবে। এমনি ভাবে বসবাস যোগ্য কোন স্থানে পনর বা ততোর্ধ দিন অবস্থান করার যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়্যত-এরাদা না করবে ততদিন সে কছর নামাযই পড়ে যাবে (শামী)।

✪ কোন লোক কোন জায়গায় বছরের পর বছর এ নিয়্যতে অবস্থান করে চলেছে যে, কাজ শেষ হলেই চলে যাবে। একসাথে পনর (১৫) দিন থাকার কখনো নিয়ত করেনি, তাহলে ঐ লোক সেখানে সর্বদা কছর নামাযই আদায় করে যাবে। (আলমগীরী)।

✪ মুছাফির ব্যক্তি কোন শহর কিংবা অন্য স্থানে চাকরী, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্যকোন কারণে অবস্থান করতঃ আজ চলে যাব, কাল চলে যাব– এভাবে করতে করতে বছর কাটিয়ে দেয়, এধরনের লোক মুছাফির রূপেই গণ্য হবে এবং সর্বদা তাকে কছর নামাযই পড়ে যেতে হবে।

✪ যে সমস্ত লোক স্থায়ী নিবাস স্থল থেকে মুছাফেরীর পরিমাণ দূরত্বে গিয়ে স্থায়ীভাবে চাকরীরত আছে এবং মাঝে মধ্যে সপ্তাহ পর, মাঝে মধ্যে ১৫ দিন অন্তর স্থায়ী বাড়ীতে আসা যাওয়া করে। চাকরির স্থলে সর্বদা ১৫ দিন থাকার নিয়্যত করে নেওয়াই তাদের জন্য উচিৎ। তাতে আর তাদের বেলায় মুছাফির না মুকীম এরূপ সন্দেহ সৃষ্টির সমস্যা থাকেনা। ১৫ দিন থাকার নিয়্যত করে নেওয়ার পর সপ্তাহ শেষে স্থায়ী বাড়ী কিংবা অস্থায়ী নিবাস স্থলে ও সে মুছাফিরের পর্যায়ে পড়বেনা।

✪ কিন্তু যারা মুছাফেরীর দূরত্বে চাকরীরত রয়েছে এবং প্রত্যহ দৈনিক নিয়মিত স্থায়ী বাড়ী হতে আসা যাওয়া করেই চাকরীর দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এরা কিভাবে নামায আদায় করে যাবে এনিয়ে ওলামা সমাজে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ঃ

একদল ওলামার মতে এরূপ লোকদের জন্য স্থায়ী বাড়ী ও স্থায়ী চাকরীর ক্ষেত্র –উভয় স্থানকে ওয়াতনে আছলী (স্থায়ী নিবাস) গণ্য করে নিতে হবে এবং তাদেরকে মুছাফির নয় বরং মুকীম (স্থায়ী বাসিন্দা) বিবেচনা করত ঃ উভয় স্থলে পুরা নামায আদায় করে যাওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হবে।

অপর একদল ওলামার মতে এধরণের লোক চাকরীর স্থলে মুছাফির রূপে বিবেচিত হয়ে সর্বদা (চাকরীর স্থলে) কছর নামাযই পড়ে যাবে।

এছাড়া এরা সর্বদা মুকীম ইমামের পীছনে জমাত সহকারে পূর্ণ নামায আদায় করে গেলে আর সমস্যা থাকেনা।

✪ মানুষের ওয়াতান (আবাস স্থল) তিন প্রকার ঃ

(১) ওয়াতানে আছলী (স্থায়ী আবাস স্থল) ;

(২) ওয়াতানে ইকামত অস্থায়ী ভাবে ১৫ দিন বা ততোধিক কাল অবস্থানের আবাসস্থল ও

(৩) ওয়তানে ছুকুনাত ঃ সাময়ীকভাবে অর্থাৎ ১৫ দিনের কম অবস্থানের আবাস স্থল।

এ সূত্রে কোন লোক যদি তার পরিবার পরিজন ও মাল পত্র নিয়ে তার আছলী ওয়াতান তথা স্থায়ী আবাসস্থল ছেড়ে অন্য কোন স্থানে বসবাস করে আর প্রথমোক্ত স্থানে তার ঘর বাড়ী ও জায়গা জমি থেকে যায় তাহলে তার প্রথমোক্ত স্থান তার জন্য প্রথম ওয়াতানে আছলী হিসাবে বহাল থাকবে (আলমগীরী)। কিন্তু কোন মহিলা বিবাহের পর তিন দিনের পথ চলার দূরত্বে অবস্থিত তার শ্বশুরালয়ে যদি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে সে ক্ষেত্রে তার পিত্রালয় তার জন্য আছলী ওয়াতান হিসাবে বহাল থাকবেনা, এবং পিত্রালয়ে যদি ১৫ দিনের কম সময় থাকার নিয়্যতে বেড়াবার জন্য আসে তাহলে তখন তাকে কছরের নামাযই আদায় করে যেতে হবে কারণ সে তার পিত্রালয়ের জন্য শরীয়াতের দৃষ্টিতে একজন মুছাফির হিসাবেই গণ্য।

আর যদি পনর দিন কিংবা ততোধিক সময় থাকার জন্যই আসে তখন সে পূর্ণ নামায আদায় করে যাবে।

আর বিবাহিত মেয়ে লোক যদি বিবাহের পরও নিজ পিত্রালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে এবং তার শ্বশুরালয় তার পিত্রালয় থেকে ছফরের দূরত্বের সমান কিংবা আরো বেশী দূরত্বে অবস্থিত হয়, তাহলে সে মহিলা যদি পনর দিনের কম সময় থাকার নিয়্যতে তাঁর শ্বশুরালয়ে গমণ করে তখন ঐ মহিলা কে সে ক্ষেত্রে শ্বশুরালয়ে কছর নামাযই পড়ে যেতে হবে, কারণ তখন সে তার শ্বশুরালয়ের জন্য একজন মুছাফিরই বটে (আলমগীরী, বাহারে শরীয়ত, ইমদাদুল ফতোওয়া)

✪ এ প্রসঙ্গে আমাদের কে স্মরণ রাখতে হবে যে, ওয়াতানে একামত তথা অস্থায়ী বাসস্থান দ্বারা ওয়াতানে আছলী তথা স্থায়ী বাসস্থানের অধিকার বাতিল তথা রহিত হয়না কিন্তু ওয়াতানে আছলী দ্বারা ওয়াতানে একামত বাতিল হয়ে পড়ে (আলমগীরী)।

✪ যখন কোন মুছাফির লোক মুকীম (স্থায়ী বসবাসকারী) ইমামের পিছনে ইক্তিদা করে অর্থাৎ নামায আদায় করে তখন ইমামের তাবেদারী জরুরী হওয়ার কারণে এ মুছাফীর লোককেও চার রাকাত পুরা আদায় করা লাগবে, কিন্তু ঐ নামায যদি কোন কারণে ফাছেদ হয়ে যায় এবং পরে একাকী আদায় করে তাহলে দু'রাকাতই আদায় করে যাবে (শামী)।

✪ আর ইমাম মুছাফির হলে এবং মুক্তাদিগণ মুকিম হলে (প্রবাসী নাহলে) ইমাম দু'রাকাত শেষ করে ছালাম ফিরিয়ে নেবেন। অতঃপর মুকিম মুক্তাদীগণ দাড়িয়ে এ শেষের দু'রাকাতে কিরাত না পড়ে অর্থাৎ, ছুরা ফাতেহা পাঠ করতে যতক্ষণ সময় লাগে অতক্ষণ নিরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর অন্যান্য সব কিছু যথা নিয়মে আদায় করত : বাকী নামায পূর্ণ আদায় করে নিবে। (হিদায়া)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ ইমাম মুছাফির হলে ইমাম দু'রাকাত শেষ করে নেওয়ার পর নিজে কিংবা অন্য কোন মুছাফির মুক্তাদীর বলে দেওয়া উচিৎ যে মুকীম মুক্তাদীগণ আপনারা আপনাদের নামাযের বাকী অংশ পুরা করে নিন।

✪ মুছাফির লোক ওয়াক্তের ভিতর কছর হিসাবে নামায আদায় কালে নামাযের ভিতর ইকামত তথা ১৫ দিন কিংবা তার চেয়ে বেশী থাকার নিয়্যত করে ফেললে তখন ঐ মুছাফির মুছাল্লী আর মুছাফির থাকবেনা বরং সে মুকীম হয়ে পড়াতে সে পূর্ণ চার রাকাত নামাযই আদায় করে নিবে।

✪ কোন মুছাফির লোক তার ওয়াতানে আছলীতে (স্থায়ী নিবাসে) ফিরে আসার সাথে সাথে কিংবা তার ওয়াতানে ইকামতে পনর দিন কিংবা এর অধিক দিন থাকার নিয়্যত করে নেওয়ার সাথে সাথে তার কছর পড়ার হুকুম রহিত হয়ে যায়। (আল ফিকহ্ আলাল্ মাযাহিবিল্ আরবায়া)

✪ ছফর অবস্থার কাযা নামায মুকীম অবস্থায় কাযা হিসাবে আদায় করতে গেলে তা কছর রূপেই আদায় করা লাগবে। আর একামতের অবস্থায় কাযা নামায মুছাফিরির অবস্থায় আদায় করতে গেলে তা পূর্ণ চার রাকাতই আদায় করা লাগবে (শামী)।

অসুস্থ লোকের নামায আদায়ের মাছায়েল

বিশুদ্ধ মতানুসারে যে অসুস্থ লোক দাড়াতে গেলে তার রোগ বৃদ্ধি পায় ও অনিষ্টের আশংকা হয়। তখন ঐ ধরণের রুগীর জন্যই বসে বসে নামায আদায় করা জায়েজ (বাহ্রুর রায়েক আলমগীরী)।

কেউ দাড়াতে গেলে যদি মাথা ঘুরে পড়ে যায়, বা শরীরের কোথাও অসহনীয় ব্যাথা বেদনা শুরু হয়ে যায়, অথবা পেশাব বের হয়ে পড়ে, কিংবা ক্ষতস্থান থেকে রক্ত, পুঁজ বের হতে থাকে তাহলে এরূপ লোক না দাড়িয়ে বসে বসেই যথা নিয়মে রুকু ছিজ্দা সহকারে নামায আদায় করে যাবে। (দুররুল মোখতার, আলমগীরী; তাব্য়ীনুল হকায়েক ও শামী)

✪ কোন লোক নামাযের পূর্ণ সময় দাড়িয়ে থাকতে না পারলে ও যদি কিছুক্ষণ সময় দাড়িয়ে থাকতে পারে– এ জাতীয় লোক যতটুকু সময় দাড়াতে পারে ততটুকু সময় দাড়ান তার জন্য ফরয।

যেমন ঃ কোন লোক শুধু আল্লাহু আকবর তথা "তাকবীরে তাহরীমা" বলার পরিমাণ সময় দাড়িয়ে থাকার পর আর দাড়াতে পারেনা এ অবস্থায় ঐ লোক দাড়িয়ে "আল্লাহু আকবর" বলে নামায আরম্ভ করতঃ বসে পড়বে। ঐ লোকের জন্য বসা অবস্থায় তাকবীর তাহরীমা বলা না জায়েজ।

✪ এমনিভাবে ছুরা ফাতিহা পাঠ আরম্ভ করতঃ দু'এক আয়াত পাঠ করার পর যদি আর দাড়াতে না পারে ঐ অবস্থায় সে বসে পড়বে। মোট কথা হল যতটুকু সময় দাড়ান সম্ভব হয়, ততটুকু সময় দাড়ানো অবস্থায় থেকেই নামায আদায় করে যেতে হবে। (আলমগীরী)

✪ অসুস্থতার কারণে যদি কোন মুছাল্লীর এ অবস্থা হয় যে, ঘরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে কিন্তু হেটে মাছজিদে যাওয়ার পর এত শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, আর দাড়িয়ে নামায আদায় করতে পারেনা–এরূপ অসুস্থ লোক ঘরেই দাড়িয়ে নামায আদায় করে যাবে। মাছজিদে যেতে হবেনা। কারণ মাছজিদে গিয়ে নামায আদায় করা ফরয নয় কিন্তু দাড়িয়ে নামায আদায় করা ফরয।

✪ দাড়িয়ে নামায আরম্ভ করার পর এমন কোন রোগ দেখা দিল–যাতে আর দাড়িয়ে নামায আদায় করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। তখন সে বসেই রুকু ছিজদা করতঃ নামায আদায় করে যাবে। বসে বসে নামায আদায় করতেও অক্ষম হয়ে পড়লে শোয়া অবস্থায় ইশারা করত ঃ রুকু-ছিজদা দিয়ে নামায আদায় করে যাবে।

✪ যে লোক দাঁড়াতে ও রুকু-ছেজদা করতে অক্ষম, সে লোক যদি বসতে পারে তাহলে বসা অবস্থায় ইশারায় রুকু-ছিজদা আদায় করতঃ নামায পড়ে নিবে (আলমগীরী)।

এ ক্ষেত্রে রুকুর জন্য মাথা ঝুকানোর তুলনায় ছিজদার জন্য মাথা কে কিছুটা বেশী ঝুকাতে হবে উভয়ের জন্য সমান-সমান মাথা ঝুকালে নামায শুদ্ধ হবে না (বাহ্রুর রায়েক)।

✪ ইশারা করতঃ রুকু-ছিজদা করার বেলায়-সামনে ছাজদার জায়গায় বালিশ কিংবা অন্য কোন উচু বস্তু রেখে মোটেই মাথা না ঝুকিয়ে ঐ উচু বস্তু সমূহের উপরই যদি রুকু ছাজদা করা হয়-তাহলে নামায আদায় হবে না। হাঁ-যদি মাথা ঝুকিয়েই ঐ সব বস্তুর উপর ইশারায় রুকু-ছাজ্দা করে নামায আদায় করা হয় তা হলে নামায হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

✪ অসুস্থতাবশতঃ যে লোক ইশারায় রুকু-ছজ্দা করতঃ নামায আদায় করে থাকে-তার নামাযে কোন ভুলের কারণে ছাহু-ছজ্দা ওয়াজিব হলে উক্ত ছাহু-ছজদা এবং কোরআন করিম তেলাওয়াত কালীন ছজ্দা সমূহ ও সে লোক ইশারা করতঃ আদায় করবে। (আলমগীরী)

✪ যে লোকের কপালে কোন আঘাত বা ফোঁড়া ইত্যাদির কারণে মাটিতে কপাল রেখে ছজদা আদায় করা সম্ভব না হয়-কিন্তু নাক মাটিতে রাখতে সক্ষম হয়, সে লোককে মাটিতে নাক রেখেই ছাজদা করত ঃ নামায আদায় করে যেতে হবে। ইশারায় ছজদা করতঃ নামায করলে তার নামায শুদ্ধ হবে না।

শুয়ে শুয়ে নামায আদায় করার নিয়ম

শুয়ে শুয়ে নামায আদায় করারও দুটি নিয়ম রয়েছে–

একতঃ কিব্লার দিকে পা দিয়ে চিৎ হয়ে শুতে হয়, যদি হাটুদ্বয় উচু করে রাখার শক্তি থাকে তাহলে হাটুদ্বয়কে উপরমুখী করে রাখাই উত্তম। কেননা, এতে প্রয়োজনে কিব্লার দিকে পা বাড়ানো টা পাওয়া যায়না। এ অবস্থায় মাথার নীচে বালিশ দ্বারা কেবলা মুখী করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ অনুরূপ চিৎ হয়ে না শুয়ে ডান বা বাম কাতে কিবলার দিকে মুখ রেখে শুয়েও নামায আদায় করাটা জায়েজ আছে।

✪ যদি অসুস্থ লোক শুয়ে মাথার ইশারায় ও নামায পড়ার ক্ষমতা না রাখে তাহলে তখন তার উপর নামায ফরয নয়। চক্ষু দ্বারা ইশারা করে বা ভ্রু নেড়ে বা মনে মনে নামায আদায় করা ছহী নয়। (মারাকিউল ফলাহ)।

✪ কোন লোক যদি একদিন এক রাতের কম সময় বেহুশ থেকে পুনঃহুশ-জ্ঞান ফিরে পায় অর্থাৎ ছয় ওয়াক্ত, নামাযের কম সময় বেহুশ থাকে তাহলে ঐ অসুস্থ লোকের উপর উক্ত নামায সমূহের কাযা আদায় করে দেওয়া ফরয। – আর যদি একদিন একরাত তথা ২৪ ঘন্টার বেশী অর্থাৎ ছয়ওয়াক্তের বেশী সময় বেহুশ থাকে তা হলে এ সব নামাযের কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয় (শামী) যদি কেউ একাধারে বেহুঁশ থাকে– সে ক্ষেত্রেও উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য হবে।

✪ অসুস্থ অবস্থায় যে সব নামায কাযা হয়ে থাকে সুস্থ হওয়ার পর এগুলোর কাযা আদায় করাটা সুস্থ ব্যক্তির নামাযের মতই করা লাগবে। অনুরূপভাবে- সুস্থ অবস্থার কাযা নামায অসুস্থ অবস্থায় আদায় করতে গেলে বসে বা শুয়ে যেভাবে পারা যায় সে ভাবেই আদায় করে যাবে।

✪ কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি এমত দূর্বল হয়ে পড়ে যে, সে নামাযের রাকাত, রুকু-ছাজদা ইত্যাদির কোন কিছুই মনে রাখতে পারে না– তা হলে তখন সে লোক আপাততঃ নামায পড়বেনা বরং পরবর্তী সময়ে সুস্থতাও স্বাভাবিকতা ফিরে আসার পর উক্ত নামায সমূহের কাযা আদায় করে নিবে।

✪ হাঁ এমতাবস্থায় এ অসুস্থ লোকটিকে অন্য কোন লোক নামাযের যাবতীয় নিয়ম-কানুন ও দোয়া-দরূদ বাতলিয়ে দিলে লোকটি যদি যথা নিয়মে নামায আদায় করে নিতে পারে– তবে সেভাবে বাতলিয়ে দিয়ে নামায আদায় করিয়ে নিবে। এবং শরীয়াতের দৃষ্টিতে তা শুদ্ধরূপে আদায় ও হয়ে যাবে। কারণ মূলত ঃ ইহা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছেনা বরং স্মরণ করিয়েই দেওয়া হচ্ছে। (শামী)

✪ এভাবে যদি কোন বৃদ্ধ ও বয়স্ক লোক বয়সের আধিক্যের কারণে নামাযের যাবতীয় নিয়ম কানুন স্মরণ রাখতে না পারে সেক্ষেত্রেও যদি ঐ বৃদ্ধকে বাতলিয়ে দেওয়ার মত অভিজ্ঞ লোক থাকে তাহলে নিয়ম মত তাকে বাতলিয়ে যাবে এবং বাতলানো অনুযায়ী বৃদ্ধ লোকটি নামায আদায় করে নিলে শরীয়াত অনুযায়ী তার নামায ও শুদ্ধ হয়ে যাবে।

✪ যদি কোন অসুস্থ লোক বসে বসে নামায পড়া অবস্থায় দাড়ানোর ক্ষমতা ফিরে পায় তাহলে বাকী নামায সে দাড়িয়েই শেষ করে নিবে ইহাই ইমাম আযম (রঃ) ও ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এর মাজহাব।

কিন্তু কোন লোক যদি শুয়ে শুয়ে ইশারায় রুকু ছাজদা দিয়ে নামাযরত অবস্থায় বসার কিংবা দাড়ানোর ক্ষমতা ফিরে পায় তাহলে ঐ লোক এ নিয়্যত ভেঙে দিয়ে নূতন নিয়্যত করতঃ পুনরায় বসে বা দাড়িয়ে যথা নিয়মে রুকু ছাজদা করতঃ তাকে নামায আদায় করে যেতে হবে। (বাহ্রুর রায়েক)

✪ যদি কোন অসুস্থ লোক অপরের সাহায্য ছাড়া কিবলামুখী হতে না পারে। তাহলে তাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে কেবলামুখী হয়ে নামায আদায় করে যেতে হবে। অন্য কেউ থাকা সত্ত্বেও যদি তার সাহায্য না চেয়ে কেব্লার বিপরিত দিকে ফিরে নামায পড়ে- সে অবস্থায় তার নামায হবে না। যদি বেকলার দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কোন লোক পাওয়া না যায় তা হলে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা হলে যেদিকে রয়েছে সেদিকে ফিরেই নামায পড়ে নিলে আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

✪ রোগীর বিছানা যদি নাপাক হয় এবং সে নিজে যদি বিছানা বদলাতে না পারে সে সময় অপরের সাহায্য নিয়ে বিছানা বদলাতে হবে। কাছে লোকজন থাকা সত্বেও যদি বিছানা বদলিয়ে দিতে না বলে নাপাক বিছানায় নামায পড়ে নিলে উহা আদায় হবেনা। যদি বিছানা বদলিয়ে দেওয়ার মত কেউ না থাকে তখন সে নাপাক বিছানায় নামায পড়ে নিতে পারবে। পরবর্তীতে তা পুনঃ কাযা পড়ে দিতে হবে না। আর যদি বিছানা বদলানো রোগীর জন্য কষ্টদায়ক হয়, তাহলে সাহায্যকারী থাকলেও বিছানা বদলাতে হবে না। যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই নামায আদায় করে নিলে হয়ে যাবে [আলমগীরী]।

যানবাহনে নামায আদায়ের মাছায়েল

মানুষের বিবিধ প্রয়োজনে একস্থান হতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করা তথা যাওয়াআসা করা লাগে। এ ভ্রমণ পথে নামাযের ওয়াক্ত হলে অনেক সময় যানবাহন থেকে নেমে মাছজিদ কিংবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে নামায আদায় করা সম্ভব হয়না– তাই কোন জায়গায় যাওয়া-আসাকালে যানবাহনে থেকে নামায আদায় করার ব্যাপারে শরীয়াতের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন রকমের যানবাহন রয়েছে। স্থলপথের জন্য বাস-মটর ও রেল ইত্যাদি রয়েছে আকাশ পথের জন্য রয়েছে হেলিকপ্টার, বিমান ও রকেট, আর নৌপথ চলাচলের জন্য রয়েছে নৌকা, লঞ্চ, ষ্টিমার ও বড় বড় জাহাজ ইত্যাদি।

◆ যানবাহনে নামায আদায়ের নিয়মাবলী ঃ

মোটর, বাস, রেল ও নৌকা ভ্রমণের সময় নামাযের সময় এসে পৌছলে চালককে বলে যানটি থামানো সম্ভব হলে থামিয়ে অবতরণ করত ঃ নামায আদায় করে নিতে হয়, কিন্তু চালক পথিমধ্যে যানবাহনটির বিরতি দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে এবং নির্দিষ্ট বিরতিস্থলে পৌছার পর নামায আদায় করতে গেলে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে যানবাহনের ভিতরেই নামায আদায় করে নিতে হয়, বিমানের অভ্যন্তরেও নামায আদায়করা জায়েজ।

বিশেষ কোন ওযর-অক্ষমতা না থাকলে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করে যেতে হবে। প্রয়োজনবোধে দাড়ানোর জন্য কোন কিছুর উপর ভর করা যাবে। (শামী)। বিনা ওযরে বসে বসে নামায আদায় করা যাবে না।

প্রত্যেক যানবাহনে নামায আরম্ভ করার সময় কেবলার সঠিক দিক নির্ধারণ পূর্বক

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেবলার দিকে হয়ে নামায আরম্ভ করা লাগবে, এবং নামায আদায়রত অবস্থায় যানবাহন ঘুরে যাওয়ার সাথে সাথে নামায আদায় কারীকে ও ঘুরে ঘুরে কেবলা ঠিক রেখেই নামায আদায় করে যেতে হবে, নতুবা নামায শুদ্ধভাবে আদায় হবেনা। (নূরুল ইজা)

◆ রেল গাড়ীতে নামায আদায়ের নিয়ম ঃ

রেলগাড়ি ষ্টেশনে পৌছতে পৌছতে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে চলন্ত গাড়ীতেই নামায আদায় করে নেওয়া যাবে।

চলন্ত ট্রেনেও কেবলা মুখী হয়ে দাড়িয়ে নামায আদায় করে যেতে হবে। অত্যাধিক ঝাকুনির কারণে পড়ে যাওয়া বা মাথা চক্কর দেওয়ার আশংকা থাকলে অথবা স্থানের সংকীর্ণতা ও ভিড়ের কারণে দাড়িয়ে রুকু ছাজদা সহ নামায আদায় করা সম্ভব না হলে তখন বসে বসে রুকু ছাজদা দিয়েই নামায আদায় করে নিতে হবে, বসাও সম্ভব না হলে ইশারায় নামায আদায় করে যাবে কিন্তু পরে এ নামায পুনরায় আদায় করে দেওয়া লাগবে।

ট্রেনে ওযুর জন্য পানি পাওয়া না গেলে অপর দিকে ষ্টেশনে পৌছে ওযু করতঃ নামায আদায় করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করেই নামায আদায় করে যাবে।

নামাযরত অবস্থায় ট্রেনের দিক পরিবর্তন হলে নামাযী ও গাড়ীর সাথে সাথে ঘুরে ঘুরে নিজের কিব্‌লার দিক ঠিক রেখে নামায আদায় করে যেতে হবে। নামায আদায়কারী যদি গাড়ির দিক পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত না হয় কিংবা নামায শেষ করার পর জানতে পারে যে কিবলার দিক ভুল হয়ে গিয়েছে তাহলে সে ক্ষেত্রে নামায শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। [আলমগীরী]

◆ নৌকা-ষ্টিমারও সামুদ্রিক জাহাজে নামায আদায়ের নিয়ম ঃ

চলন্ত নৌকা লঞ্চ ও জাহাজে কেবলা ঠিক করত ঃ নামায আরম্ভ করা জরুরী, নামাযরত অবস্থায় নৌকার দিক পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে মুছাল্লীও ঘুরে ঘুরে নিজের চেহারাকে কিব্‌লামুখী করে নিতে হবে। নতুবা নামায আদায় হবেনা।

যে নৌকায় বা ষ্টিমারে দাড়িয়ে নামায আদায় করা যায়-তাতে দাড়িয়েই নামায আদায় করে যেতে হবে। কারণ বিনাওযরে চলতি নৌকা ষ্টিমারে বসে বসে নামায পড়লে তা আদায় হবে না। [মারাকিউল ফলাহ, তাহ্‌তাবী]

হাঁ-দাড়িয়ে নামায আদায় করতে গেলে যদি মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে বসে বসেও নামায আদায় করার অনুমতি আছে।

নদী-খালের পাড়ে বা তীরে নোঙ্গর করা বাঁধা নৌকায় অবস্থাভেদে দাড়িয়ে বা বসে নামায আদায়করা জায়েজ- [বাহরুর রায়েক, ফাতহুল কাদীর, হেদায়া, তাহতাবী]।

তবে নৌকা যদি মাটির সাথে লাগানো থাকে তখন তাতে দাড়িয়েই নামায আদায় করা লাগবে, বসে বসে নামায আদায় করা জায়েজ নাই (নুরুল ইজা দুরারুল হেকম)।

◆ মোটর-কার ও বাস এর ভিতর নামায আদায়ের হুকুম ঃ

বাসগাড়ীতে নামায আদায় করা মোটেই সুবিধাজনক নয় তা ওয়াক্ত হলে চালককে বলে বাস থামিয়ে বাস থেকে নেমে কোন সুবিধাজনক স্থানেই নামায আদায় করা জরুরী, হাঁ চালক যদি নাফরমান হয় এবং সে পথিমধ্যে কোন মাছজিদের পাশে বা স্থানে বাস থামাতে রাজি না হয়, কিংবা বাস থেকে নেমে নামায পড়তে গেলে নিজের মালামাল চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তখন সিটে বসে বসে ওয়াক্তমতে ইশারায় নামায আদায় করে নিতে হয়- তবে বাস থেকে নেমে ঐ নামায অবশ্যই পুনরায় আদায় করে দেওয়া লাগবে। (সমকালীন ফতোওয়া গ্রন্থসমূহ)

◆ উড়োজাহাজে নামায আদায় করার নিয়ম ঃ

ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে উড়ন্ত জাহাজেও নামায পড়া জায়েজ, উড়ন্ত বিমানে দাড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম হলে- দাড়িয়েই নামায আদায় করে যেতে হয়- দাড়িয়ে পড়তে সক্ষম নাহলে সে বসেই আদায় করে যাবে। অন্যান্য যানবাহনের ন্যায় বিমানে নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও কেব্‌লামুখী হওয়া জরুরী, কিব্‌লার দিক সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই নামায আরম্ভ করতে হবে। বিমানের দিক পরিবর্তন হয়েছে বলে জানতে পারলে মুছাল্লীও নিজের দিক পরিবর্তন করে নিয়ে কেব্‌লামুখী হয়ে যাবে।

✪ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে দাড়িয়ে কিব্‌লামুখী হয়ে রুকু ছাজদা-সহ যথা নিয়মে নামায আদায় করতে সক্ষম না হলেও সে মূহুর্তে যেভাবে সম্ভব ইশারা করে হলেও নামায আদায় করে নিতে হবে, তবে এ আদায় কৃত নামায পুনঃ আদায় করে দেওয়া লাগবে। কোন কারণবশতঃ কেব্‌লা ঠিক রাখা না গেলে অনুমান করতঃ নামায আদায় করে নিবে।

উড়ন্ত জাহাজে পানি পাওয়া না গেলে এবং ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে ওযু-গোছলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করেই নামায আদায় করে যাবে।

মাগরিবের নামায আদায় করে নেওয়ার পর বিমানে আরোহন করতঃ পশ্চিম দিকে দ্রুত গতিতে যেতে থাকলে যদি পুনঃ সূর্য দেখা যায় তাহলে পুনঃ মাগরিবের নামায আদায় করা লাগবেনা, পূর্বে আদায়কৃত নামাযই তার জন্য যথেষ্ট।

(মা'রিফুচ্ছুনান ও আহছানুল ফতোওয়া)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিতিরের নামাযের মাছায়েল

"বিত্‌রুন" শব্দের আভিধানিক অর্থ "বেজোড়" এ নামায তিন রাকাত বিশিষ্ট তথা বেজোড় হওয়ার কারণে একে বিতিরের নামায বলা হয়।

প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের জমানা থেকেই এ নামায বিতিরের (বেজোড়) নামায হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

◆ **বিতিরের নামাযের হুকুম ঃ** আমাদের ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ) এর মাজহাব অনুসারে বিতিরের নামায ওয়াজিব।

✪ এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আমলের দিক বিবেচনায় বিতিরের নামায ফরয নামাযেরই মত।

✪ এ'তেকাদের দিক বিবেচনায় বিতিরের নামায ওয়াজিব আর ছাবেত হওয়ার (দলিলের) দিক বিবেচনায় বিতিরের নামায ছুন্নাত স্তরের।

✪ আমলের দিক বিবেচনায় ফরয হওয়ার অর্থ- ফরয নামায তরক করলে যে ধরণের পাপ গুনাহ হয়ে থাকে বিতিরের নামায তরক করলেও অনুরূপ গুনাহ হয়ে থাকে। ফরয নামায সময় মত আদায় করতে না পারলে যেভাবে অন্য সময়ে কাযা আদায় করতে হয়। অনুরূপ এ বিতিরের ও সেরূপ কাযা আদায় করতে হবে।

✪ ফরয নামায জিম্মায় রেখে মারা গেলে যেরূপ কাফ্‌ফারা দেওয়া লাগে অনুরূপ বিতিরের নামায জিম্মায় রেখে মারা গেলেও কাফ্‌ফার দেওয়া লাগে। এসব বিবেচনায় আমলের দিক থেকে বিতিরের নামায ফরয নামাযের সমতূল্য।

✪ আর ইতেকাদ-বিশ্বাসের দিক বিবেচনায় ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এ নামায কে ফরয রূপে ধারণা বিশ্বাস না করে ওয়াজিব রূপেই বিশ্বাস করে যেতে হয়।

✪ ছবুতের (দলিল প্রমাণের) দিক বিবেচনায় ছুন্নাত হওয়ার অর্থ আল্লাহর প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের হাদীছ বানী ও প্রিয়নবী (দঃ) এর আমলের দ্বারায় এ বিতিরের নামায আদায় করার বিষয়টা প্রমাণিত। এ হিসাবে ছবুত এর দিক বিবেচনায় ছুন্নাত বলা হয়েছে (গায়াতুল আওতার)।

✪ কোন কারণ বশতঃ বিতিরের নামায না পড়লে এর কাযা আদায় করা ওয়াজিব। কাযা আদায় করার সময় সাধারণ নামাযের নিয়্যতে আদায় করলে হবে না ; বরং বিতিরেরই নিয়্যত করা লাগবে। বিতিরের কাযা আদায়ের সময় ও তৃতীয় রাকাতে দু'আ কুনূত পড়া লাগবে। (আলমগীরী)

◆ **বিতিরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত ঃ** এশার ওয়াক্ত শুরু হওয়া থেকে ছুবহে ছাদেক হওয়ার আগ পর্যন্ত বিতিরের নামায আদায় করার সময়। তবে আদায়ের ক্ষেত্রে এশা'র নামায আগে আর বিতিরের নামায কে পরে আদায় করা লাগে।

◆ **মুস্তাহাব সময় ঃ** তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যে লোকের রাত জাগরণের পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস আছে এরূপ লোকের জন্য তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের পর রাতের শেষ অংশেই বিতিরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব। কিন্তু যদি শেষরাতে কারো জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে এশার নামায আদায়ের পর পরই বিতিরের নামায পড়ে নেওয়া জরুরী।

✪ বিতিরের নামায যেহেতু ওয়াজিব -তাই বিনা ওজরে বসে বসে আদায় করা নাজায়েজ।

✪ বিতিরের নামায মোট তিন রাকা'আত, বিতিরের নামাযের প্রত্যেক রাকাতেই যথা নিয়মে ছুরা ফাতেহার সাথে ওয়াজিব পরিমান অন্য সূরা-কেরাত পড়ে নিতে হয়।

✪ বিতিরের নামাযের তৃতীয় রাকা'ত তথা শেষ রাকা'আতের কেরাত পাঠ শেষ করে আল্লাহু আকবর (তাকবীর) বলে কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠিয়ে পুনঃ হাত বেঁধে দোয়া কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব।

✪ দোয়ায়ে কুনূত পাঠের পর দরূদ শরীফ পাঠ করে নেওয়া ছুন্নাত। (দূররুল মোখতার, শামী, তাহতাবী, বাহ্‌রুর রায়েক (২য় খণ্ড) মারাকিউল ফলাহ)

✪ শুধু মাত্র রমজান মাসেই বিতিরের নামায জমাআতের সাথে আদায় করাটা উত্তম এবং এ ব্যাপারে সকল ফোকাহায়ে কেরামগণ একমত। কোন কারণবশতঃ একা একা বিতিরের নামায আদায় করাও জায়েজ।

✪ রমজান মাস ব্যতীত অন্যান্য সময়ে বিতিরের নামায জামাত সহকারে পড়া মাকরূহ। (আলমগীরী, বাহ্‌রুর রায়েক, ওমদাতুল ফিকাহ)।

✪ রমজান মাসে জামাতে বিতিরের নামায আদায় করার সময় কোন মাছবূক মুক্তাদী শেষ রাকাতে এসে জামাতে শামিল হয়ে থাকলে সে ইমামের সাথেই দোয়ায়ে কূনূত পাঠ করে নিবে। বাকী দু'রাকাত একাএকা আদায় করার সময় পুনঃ দোয়ায়ে কূনূত পাঠ করা লাগবেনা! (ফাতহুল কাদীর)।

◆ **বিতিরের নামায আদায়ের নিয়ম ঃ**

বিতিরের নামাযকে মাগরিবের নামাযের ন্যায় তিন রাকাতই আদায় করা লাগে।

✪ তবে মাগরিবের নামায আর বিতিরের নামাযের মধ্যে ১ম পার্থক্য হল- বিতিরের নামাযে সুন্নাত নফল নামাযের ন্যায় এর প্রত্যেক রাকাত তথা ১ম, ২য় ও ৩য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য যে কোন ছুরা বা আয়াত মিলিয়ে নিতে হয়। কিন্তু মাগরিবের নামাযের তৃতীয় রাকাতে শুধু মাত্র ছুরা ফাতেহা পাঠ করা লাগে, এর সাথে অন্য কোন ছুরা মিলাতে হয় না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পার্থক্য হল– বিতিরের নামাযের ৩য় রাকাতের কেরাত শেষ করে তাকবীর তাহরীমার ন্যায় কান পর্যন্ত দু'হাত উঠিয়ে তাকবীর– আল্লাহু আকবর বলতে হয়।

অতঃপর পুনঃ উভয় হাত নাভীর নিচে বেঁধে নিতে হয়। এরপর দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করতে হয়।

◆ দোয়া-কুনূত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّىْ وَ نَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়ানাস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নূ'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্‌কালু আলাইকা ওয়া নুছনি আলাইকাল খাইরা ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ ওয়নাত্‌রুকু মাঁই ইয়াফ্‌জুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লি ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছআ ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখ্‌শা আজাবাকা ইন্না আজা-বাকা বিল্‌ কুফ্‌ফারি মুল্‌হিক্‌।

✪ যাদের দোয়ায়ে কুনূত মুখস্থ জানা না থাকে তারা যথা শীঘ্র সম্ভব তা মুখস্থ করে নিবে। মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা মুখস্থ করার মত অবস্থা যাদের নাই তারা দোয়ায়ে কুনূতের স্থলে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

(রাব্‌বানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাছানাতাঁও ওয়াফিল আখেরাতি হাছানাতাঁও ওয়া কিনা আজাবান্‌নারি) পাঠ করে যাবে।

উক্ত দোয়াও যদি জানা না থাকে তাহলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (আল্লাহুম্মাগফিরলী) –তিন বার পাঠ করে যাবে। তাও যদি জানা না থাকে তাহলে يَا رَبِّ (এয়ারাব্‌বু) তিন বার বলতে হবে।

দোয়ায়ে কুনূত পাঠ শেষ করার পর দরূদ শরীফ পাঠ করে নিতে হয়। অতঃপর অন্যান্য কাজ যথা নিয়মে পালন করত ঃ বিতিরের নামায শেষ করা লাগে।

✪ বিতিরের নামাযের ছালাম ফিরানোর পর তিন বার–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ

(ছুব্‌হানাল মালিকিল্‌ কুদ্দুছি রাব্‌বুল্‌ মালাইকাতি ওয়ার রুহি)

—পাঠ করা মুস্তাহাব। (মিরকাত, নাছায়ী, দারুকুতনী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দু'ঈদের ফাজায়েল ও মাছায়েল

ঈ'দের নামকরণ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ

ঈদ (عِيْدٌ) একটি আরবী শব্দ, এর পারিভাষিক অর্থ খুশী-আনন্দ ও উৎসব ইত্যাদি। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্ব-স্ব জাতীয় আনন্দোৎসব পালনের নিমিত্বে কয়েকটি দিন নির্দ্দিষ্ট রয়েছে।

আর ইছলাম যেহেতু স্বয়ং স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলা কর্তৃক একমাত্র মনোনিত ধর্ম, তাই ইসলামের অনুসারী বিশ্ব মুছলিমের জন্য কয়েকটি মহান দিন বিশেষ করে দু'টি দিনকে স্বয়ং আল্লাহ পাক ঈদ তথা আনন্দ উৎসবের দিবস হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেনঃ- এর একটি হচ্ছে ঈদুল ফিত্‌র, অপরটি হচ্ছে ঈদুল আজ্‌হা।

ঈদুল ফিতর ঃ ঈদ অর্থ উৎসব, আর ফিতর অর্থ স্বাভাবিকতা, এ হিসাবে ঈদুল ফিতর মানে স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তনের উৎসব।

মুমিন ব্যক্তির আকীদায় আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন একমাত্র সর্ব শক্তিমান খালেক (স্রষ্টা) মাবুদ (উপাস্য) ও রব (লালন -পালন কর্তা) এবং নিখিল বিশ্বের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণকারি মহা সত্ত্বা, এ বিষয়াবলীর আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমল তথা কার্যত ঃ এর প্রকাশ -প্রমাণের দ্বারাই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

এ আলোকে স্বীয় মালিক, মনিব আল্লাহ পাকের পরম সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে মুসলিমদের রমজান মোবারকের রোজাসমূহ আদায় করতঃ চরম আত্মশুদ্ধির অনুশীলন ও সংযম সাধনার মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ একটি মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ণ ঃ স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার মূহুর্তে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আনন্দ–উৎসব পালনের সুযোগ দান করা হয়েছে একেই ঈদুল ফিত্‌র বলা হয়।

এ ছাড়া ইসলামই হচ্ছে জীবন ও জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তব ভিত্তিক একমাত্র বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম।

এই আলোকে ইসলাম মানুষের মনস্তাত্বিক অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করেই স্বীয় অনুশাসন গুলো মানব সমাজ কে ইপহার দিয়েছে। এক ঘেঁয়ে নিরস জীবন কোন মানুষেরই কাম্য নয়। তাই মানব মনের ঐ ঐকান্তিক স্বাভাবিক চাহিদার প্রতি

সুবিবেচনার সাথে দৃষ্টি রেখেই মানব ধর্ম ইসলাম-মুসলিমের জন্য বৎসরে দুটি মহোৎসবের প্রবর্তণ করেছে। যাকে আমরা ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আজ্‌হা হিসাবে জানি।

ঈদুল আজ্‌হা ঃ ঈদ অর্থ খুশী, আধ্‌হা- অর্থ কোরবানী (উৎসর্গীকরণ)। সারা বিশ্বের মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) নিজের সব চেয়ে প্রিয় সন্তানকে মহান আল্লাহর একনিষ্ট প্রেমে কোরবানীর (উৎসর্গীকরণ) এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে মহা মাহিম প্রভূ আল্লাহ অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে "খলিল উল্লাহ" তথা মহান আল্লাহর বন্দেগী সূত্রের পরম বন্ধু হিসাবে ঘোষনা দেন, আর সন্তানের বিনিময়ে পশু কোরবানি করার নিয়ম বিধান প্রবর্তন করে তার সন্তুষ্টি অর্জনের সূযোগ করে দেন, আমরা উম্মাতে মুহাম্মাদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত ইব্রাহিম খলিল (আঃ) এর রূহানী সন্তান হিসাবে আল্লাহ তাআলারই আদেশে এবং তারই পরম সন্তুষ্টি অর্জনার্থে সে পশু কোরবানীর ছুন্নাত বিধান পালন করে থাকি।

সে পূণ্যময়ী উৎসর্গী করণের স্মৃতি বিজড়িত পশু কোরবানী (উৎর্সগীকরণ) এর দিবসটিকেই ঈদুর আজ্‌হা তথা উৎসর্গ করণের আনন্দ দিবস বলা হয়।

এভাবে এ দু'টো দিবসে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর বান্দাদের কে শরীয়াতের সীমায় রয়ে আনন্দ করার সুযোগ দান করেছেন এবং এ উভয় আনন্দ দিবসের শুরুতে আল্লাহর পূণ্যময়ী স্মরণ ও তাঁর প্রতি শুকরীয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ দু'দুরাকাত ঈদের নামায ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে ঈদের নামাযের বিধান দেওয়া হয়। অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈদের নামায আদায়ের বিধান নাযিল হওয়ার পর থেকে বিদায় মূহুর্ত পর্যন্ত প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ঈদের নামায আদায় করা বাদ দেননি, অনুরূপভাবে খোলা ফায়ে রাশেদীন (রঃ) গণের কেউ জীবনের কখনো ইহা তরক করেননি। যদ্বারা এ উভয় ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণিত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এ নামায তরক করা গুনাহ (তাহতাবী)। পবিত্র কোরআন করিমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এরশাদ করেনঃ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ

অর্থাৎ, যেন তোমরা রোজা আদায়ের সংখ্যা অর্থাৎ মাস পূর্ণ করে যাও এবং যেন তোমরা মহান আল্লাহর তাকবীর বলতে থাক অর্থাৎ আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করতে থাক তোমাদের কে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে।

হযরাত মুফাচ্ছেরীন কেরাম গণের মতে অত্র আয়াতে করিমায় রোজা আদায় শেষে তাকবীর বলা অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের মাধ্যমেই তাকবীর বলার কথা বলা হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (سورة الكوثر)

হে প্রিয় রাছূল! আপনি আপনার প্রভূর জন্য নামায আদায় করুন ও কোরবানী করুন।

অত্র আয়াত দ্বারা ঈদুল আজহার দিবসে ঈদের নামায আদায় করা ও কোরবানী করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

দু'ঈদের দিন ও তার আগের রাতের ফাযিলত মর্যাদা অপরিসীম।

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে পাঁচটি রাতে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সুসংবাদ দান করেছেন ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আজহার রাত এর অন্যতম।

ঈদের ফাজায়েল

প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ-

ঈদুল ফিতরের দিন মহান আল্লাহ মুসলিম রোজাদারদের ব্যাপারে নিজ গৌরবের প্রকাশ দিয়ে ফেরেস্তাদের নিকট জানতে চান–

হে আমার ফেরেস্তারা! তোমরা বলতো দেখি ! কারো উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলে সে যদি পুরাপুরি উহা পালন করে সে ক্ষেত্রে তাকে কিরূপ প্রতিদান দেওয়া উচিৎ? উত্তরে ফেরেস্তারা আরজ করেন (হে প্রভূ!) তাকে এর পুরাপুরি (اجر) পরিতোষিকই দেওয়া উচিৎ।

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন "আমি আমার বান্দা-বাঁন্দীদের উপর যে কাজের (রোজা আদায়ের) দায়িত্ব দিয়েছিলাম তারা তা যথাযথভাবে আদায় করেছে"।

অতঃপর যখন মুসলিমেরা দলে দলে তাকবির বলা অবস্থায় ঈদগাহে রওয়ানা হয় তখন আল্লাহ পাক বলেন আমার ইজ্জতের শপথ আমার শান শওকত ও প্রতাপ প্রতি পত্তির শপথ! আমি তাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করব। অতপর তিনি (রোজাদার) বান্দাদের ডেকে ডেকে বলেন ওহে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি, তোমাদের পাপ সমূহকে পূণ্যে পরিণত করে দিয়েছি, এবার তোমরা স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যাও, তখন তারা নিষ্পাপ অবস্থায় ও বিপুল ছাওয়াবের মালিক হয়ে স্ব-স্ব গৃহে ফিরে আসে (বায়হাকী শরীফ)।

অপর একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ- ঈদুল ফিতরের দিন সকাল বেলা ফেরেস্তা মণ্ডলী রাস্তায় রাস্তায় দাড়িয়ে যান এবং (রোজাদার) মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন। হে মুসলিমেরা!

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমরা দয়ালু প্রভূর দিকে এগিয়ে আস! উত্তম প্রতিদান ও বিপুল পূণ্য অর্জণের জন্য এগিয়ে আস! তোমাদের কে রাতের বেলায় নামায আদায়ের জন্য আদেশ করা হলে সে আদেশ মেনে তোমরা নামায আদায় করেছ। তোমাদের দিন গুলোতে রোযা রাখতে বলা হলে তোমরা ঐ নির্দেশ মেনে দিনের বেলায় রোযা রেখেছ। গরীব দুঃখীজনদের পানাহার দানের মাধ্যমে (যেন) তোমরা তোমাদের নিজ প্রভূকেই পানাহার করিয়েছ, এখন (ঈদের) নামায আদায়ের মাধ্যমে তোমরা এ সব এবাদতের প্রতিদান পুরস্কার গ্রহণ কর।

ঈদের নামায আদায়ের সাথে সাথে ফেরেস্তা মণ্ডলীর মাঝ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে যান, হে নামায আদায় কারীরা শোন! তোমাদের মহান রাব্বুল আলামীন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, এখন তোমরা গুনাহ মাফ অবস্থায় তোমাদের নিজ নিজ আবাস স্থলে ফিরে যাও।

আরো শোন! এ (ঈদের) দিনটি হচ্ছে পুরস্কার প্রদানের দিন। আকাশে এ দিনের নামকরণ করা হয়েছে "পুরস্কারের দিন" (তাবরানী)।

✪ হযরত মা'জইবনে জাবাল(রঃ) থেকে বর্ণিত, যে লোক (বৎসরের) পাঁচটি (বিশেষ বিশেষ) রাতে এবাদত আদায়ের মাধ্যমে রাত জাগরণ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

উহা হল ঃ জিলহজ্জ মাসের অষ্টম, নবম ও দশম রাত (ঈদুল আজ্হার রাত)। ঈদুল ফিতরের রাত, শা'বান মাসের পনর তারিখের রাত অর্থাৎ বরাতের রাত (ইস্পাহানী)।

পাঠক মণ্ডলী,

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ঈদের দিনে শরীয়ত সম্মত পন্থায় খুশী আনন্দ করার হক-দাবী ন্যায় সঙ্গতভাবে শুধু মাত্র ওদেরই রয়েছে যারা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, বিশেষভাবে মাহে রমজান মোবারকের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করে থাকে। সঠিকভাবে রোজা-নামায আদায় করে থাকে। আর যারা মাহে রমজানের প্রধান দাবী রোজা-নামায আদায় তো দূরের কথা অন্ততঃ এ মোবারক মাসের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারেও বিবেকের তাগিদ অনুভব করেনা। রোজাদার মুসলমান ভাইদের সামনে দিনের বেলা প্রকাশ্যে খানা-পিনা করতে সামান্যটুকু লজ্জা-সম্ভ্রম বোধও করেনা এবং অন্যান্য যাবতীয় পাপ-অন্যায় হতেও আত্মরক্ষা করে চলেনা তাদের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া এ আনন্দ-খুশীতে অংশ গ্রহনের কোন হক নাই। সারা রমজান মাস প্রভূ আল্লাহর নাফরমানীতে কাটিয়ে ঈদের দিন আল্লাহর অনুগত নামায রোজা আদায় কারী বান্দাদের জন্য দেওয়া আনন্দ-খুশীতে শরীক হওয়াটা সত্যই লজ্জাকর ব্যাপার। আল্লাহ জাল্লা শানুহু অবুঝদের সৎবুঝ ও হেদায়ত দান করুন আমীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

◆ পবিত্র ঈদ দিবসে প্রত্যেক মুসলিমের করনীয় মুস্তাহাব কাজসমূহ ঃ

১। অতি ভোরে নিদ্রা থেকে উঠে পড়া।

২। নিজ মহল্লার মাছজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করা।

৩। মিছওয়াক করা, গোসল করা।

৪। সাধ্যানুসারে উত্তম পোশাকাদী পরিধান করা।

৫। আতর খুশবু লাগানো।

৬। যেহেতু এ উৎসব আল্লাহ তাআলারই বিশেষ দান সে কারণে এ উপলক্ষে আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করা।

৭। ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বে ছাদকায়ে ফিতর আদায় করে দেওয়া।

৮। ঐদিন সামর্থ অনুসারে বেশি বেশি দান -ছদকা করা।

৯। ঈদুল ফিতরের দিন নামাযে যাওয়ার পূর্বে কিছু নাশ্তা করা, তা বেজোড় সংখ্যার খেজুর কিংবা মিষ্টি জাতীয় কিছু হওয়া মুস্তাহাব।

১০। ঈদুল আজহার দিবসে ঈদের নামাযের আগে কিছু না খাওয়া মুস্তাহাব বরং নামাযের পর যথাশীঘ্র সম্ভব পশু কোরবানী করত ঃ এর গোস্ত দ্বারা ঐ দিন প্রথম আহার গ্রহণ করাই মুস্তাহাব।

১১। সকাল সকাল ঈদগাহে গমন করা।

১২। কোন ওজর না থাকলে পায়ে হেটে ঈদের নামায আদায় করার জন্য যাওয়া।

১৩। ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে আসা।

১৪। ঈদুল ফিতরের দিবসে ঈদের নামায আদায়ের জন্য যাওয়ার পথে চুপে চুপে তাকবীর বলে যাওয়া আর ঈদুল আজহার দিবসে বড় আওয়াজে তাকবীর বলে বলে যাওয়া মুস্তাহাব।

১৫। হাদীছ শরীফে আল্লাহর নবী এরশাদ করেছেন ঃ যখন জিলহাজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হয় সে প্রথম রাত থেকে তোমাদের মধ্যে যারা কোরবানী করার এরাদা রাখে তারা যেন কোরবানী করা পর্যন্ত সময়ে নিজের চুল, নখ ও শরীরের অন্যান্য পশমাদি না কাটে (মুসলিম শরীফ)। পশু জবেহ করার পরই নখ-চুল ও পশম ইত্যাদি পরিষ্কার করা মুস্তাহাব।

তারিখ ঃ

✪ মাহে রমজান শেষে শাওয়াল মাসের ১ম তারিখে ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করা এবং ১০ই জিলহাজ্জ ঈদুল আজহার নামায আদায় করা ওয়াজিব।

বিশেষ কোন গ্রহণ যোগ্য ওযর ব্যতীত ঈদের নামায পরের দিন আদায় করা জায়েজ নাই (আলমগীরী)।

হাঁ ওযর বশতঃ ঈদুল ফিতরের নামায শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ আদায় করা না হলে পরদিন অর্থাৎ ২রা শাওয়াল তারিখে আদায় করা যাবে। এর পর আর আদায় করা যাবেনা।

আর ঈদুল আজহার নামায ১০ই জিলহাজ্জ তারিখে আদায় করা না হলে উহা ১১ তারিখ, সেদিন ও সম্ভব না হলে ১২ই জিলহাজ্জ পর্যন্ত পড়া যাবে। ১২ই জিল হাজ্জের পর আর পড়া যাবেনা।

সময় ঃ

✪ সূর্য কম পক্ষে একনেজা অর্থাৎ ১২ বিঘত (৩ গজ -৬ হাত) উপরে উঠার পর অর্থাৎ উদয়ের ২২/ ২৪ মিনিট পর হতে দ্বি-প্রহরের আগ পর্যন্ত দু'ঈদের নামায আদায়ের পূর্ণ সময়। (আলমগীরী) দ্বি-প্রহর হয়ে পড়লে আর ঈদের নামায আদায় করা যাবেনা।

ঈদুল আজ্হার নামায সূর্য পুরাপুরি উদয়ের পর একটু সকাল সকাল আদায় করে নেওয়া আর ঈদুল ফিতরের নামায কিছু বিলম্ব করে আদায় করা উত্তম। কারণ ঈদুল আজহার নামায শেষ করে কোরবানী দিতে হয়, সে কারণে ঈদুল আজ্হার নামায সূর্য পুরা পুরি উদয়ের পরেই তাড়াতাড়ি আদায় করে নেওয়া উত্তম। (আলমগীরী)।

স্থান ঃ

✪ ঈদগাহেই ঈদের নামায আদায় করা উত্তম। তবে প্রয়োজন (ওজর) বশত ঃ মাছজি'দে ঈদের নামায আদায় করে নিলেও আদায় হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদির, শামী, শরহে মুনিয়া)।।

দু'ঈদের নামায আদায়ের নিয়ম

✪ পূর্বেও বলা হয়েছে যে, এ উভয় নামায মোট দু'দু'রাকাত করে আদায় করা এবং উভয় নামাযে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।

আরবী নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ (صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْاَضْحٰى) مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى (اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ) مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই ছালাতিল ঈদিল ফিত্র (ঈদিল্ আদ্হা) মাআ ছিত্তাতি তাকবীরাতে ওয়াজি বিল্লাহি তাআলা ইক্তিদাইতু বিহা-জাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

✪ নিয়্যত করার পর অন্যান্য নামাযের ন্যায় "আল্লাহু আকবর" দ্বারা তাকবীরে তাহরিমা বলে উভয় হাত বাঁধতে হয়। অতঃপর দোয়ায়ে ছানা ছুব্হানাকা শেষ পর্যন্ত পাঠ করে নিতে হয়। এরপর ইমাম সাহেব কে বড় আওয়াজে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে একে একে তিন বার "আল্লাহু আকবর" তাকবীর বলে যেতে হয়, মুক্তাদীগণ ও চুপে চুপে ইমাম সাহেবের সাথে সাথে কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠিয়ে একে একে তিন বার তাকবীর বলে যাবে। ইমামকে প্রত্যেকটি তাকবীরের পর তিনবার "ছুব্হানাল্লাহ পাঠ করতে পারার পরিমাণ সময় অপেক্ষা করত ঃ পরবর্তী তাকবীর বলে যেতে হয়। প্রত্যেককেই প্রথম ও দ্বিতীয় বার তাকবীর বলার পর উভয় হাত সোজা ঝুলিয়ে রাখতে হয়। তৃতীয় তাকবীরের পর পুনঃ হাত বেঁধে নিতে হয়।

অতঃপর ইমাম চুপে চুপে পূর্ণ আউযুবিল্লাহ ও "বিছমিল্লাহ" পাঠ করতঃ বড় আওয়াজে পুরা ছূরা ফাতেহা ও যথা নিয়মে অন্য কোন ছূরা কিংবা কয়েকখানা আয়াতে করীমা পাঠ করে যাবেন।

ইমাম কেরাত শেষ করে অন্য সব জমাতের নামাযের ন্যায় যথা নিয়মে রুকু-ছজদা করে নিয়ে তাকবীর বলে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাড়াবেন, অতঃপর ইমাম চুপে চুপে পুরা "বিছ্মিল্লাহ" পড়ে যথা নিয়মে ছূরা ফাতেহা ও অন্য কোন ছূরা কিংবা আয়াত সমূহ বড় আওয়াজে পাঠ করে নেবেন। এরপর প্রথম রাকাতের নিয়মে ইমাম বড় আওয়াজে ও মুক্তাদীগণ চুপে চুপে পরপর তিনবার তাকবীর "আল্লাহু আকবর" বলে যাবেন। এরপর হাত ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় ইমাম চতুর্থ বার তাকবীর বলে রুকূতে যাবেন এবং দু'ছজদা ও বৈঠক ইত্যাদি যথা নিয়মে আদায় করে নামায শেষ করবেন।

যদি ইহা ঈদুল আজ্হার নামায হয় তাহলে ছালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদী সবাইকে "তাকবীরে তাশ্রিক" বলে যেতে হয়। অতঃপর ইমাম মিম্বরে উঠে না বসে মুক্তাদীগণের দিকে মুখ করে ১ম খোৎবা দিয়ে যাবেন।

✪ ঈদুল ফিত্র এর প্রথম খুতবা শুরু করার সময় নয় বার চুপে চুপে ইমামের তাকবীর বলে যাওয়া এবং দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাতবার চুপে চুপে তাকবীর বলে যাওয়া মুস্তাহাব। (শামী)।

✪ ঈদুল আজ্হার প্রথম ও দ্বিতীয় খুতবার শুরুতেই উল্লেখিত পরিমাণ তাকবীর ইমামের বড় আওয়াজে বলে যাওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু মুক্তাদীগণ ও ইমামের সাথে সাথে উক্ত তাকবীর মনে মনে বলে যাবে। মুখে উচ্চারণ করত ঃ আওয়াজ করে বলবেনা। (শামী), অতঃপর ইমাম শরীয়াতের নিয়ম মাফিক প্রথম খুতবা দিয়ে শেষ করত ঃ মাঝে জুম্আর খুতবার নিয়মে মিম্বারে বসে পড়বেন। তিন তাছবীহ্ পরিমাণ সময় বসে পুন ঃ দ্বিতীয় খুতবা দানের জন্য দাড়িয়ে সাতবার তাকবীর বলা শেষ করে খুতবা দিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ খুত্বা শেষ করে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর যথা নিয়মে ছালাত-ছালাম পাঠ করত ঃ সমস্ত মুছাল্লীদের নিয়ে বিশ্ব মুসলিমের ও নিজেদের জন্য ইহ পরকালীন শান্তি, মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া-মুনাজাত করে যাবেন।

ঈদের নামায সম্পর্কিত বিবিধ মাছআলা

✪ যে সব শর্তাবলী পাওয়া গেলে নামায ফরয হয় সে সব শর্তাবলী পাওয়া গেলে ঈদের নামায ও ওয়াজিব হয়। যাদের জন্য জুম্আ ফরয নয় তাদের জন্য ঈদের নামায ও ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ যাদের উপর জুম্আর নামায ফরয হয় ঐ লোকদের উপর ঈদের নামায ও আদায় করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

✪ জুম্আর নামাযের খুতবার সাথে ঈদের নামাযের খুতবার অনেক মিল রয়েছে, তাই জুমআর খুতবার মধ্যে যা কিছু ছুন্নাত, ঈদের খুতবার মধ্যেও সেগুলো ছুন্নাত, জুম্আর খুতবার ব্যাপারে যা কিছু মাকরূহ ঈদের খুতবার ব্যাপারেও তা মাকরূহ।

তবে কয়েকটি বিষয়ে উভয়ে খুতবার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ঃ-

(ক) জুম্আর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুতবা দান করা শর্তের মধ্যে গণ্য। সুতরাং খুত্বা ব্যতীত জুম্আর নামায আদায় করা হলে নামায আদায় হবেনা। পক্ষান্তরে ঈদের নামাযের জন্য খোতবা দেওয়া ছুন্নাত।

(খ) জুম্আর নামাযের খুত্বা জুম্আর নামাযের আগেই দেওয়াটা শর্ত, আর ঈদের নামাযের খুতবা নামাযের পরে দেওয়াটাই ছুন্নাত (হেদায়া)।

(গ) জুম্আর নামাযে মুয়ায্যিনের আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত ইমামের জন্য মিম্বরে বসে অপেক্ষা করা ছুন্নাত। কিন্তু ঈদের নামাযে যেহেতু আযান দেওয়া হয় না সে কারণে ঈদের খুতবার পূর্বে ইমামের মিম্বরে বসা ছুন্নাত নয়। বরং না বসাই ছুন্নাত (শামী)।

✪ ঈদের নামাযের জন্য আযান ও দিতে হয় না এবং একামতও বলতে হয়না (খানিয়া)

✪ জুমআর দিনে ঈদ হলে, ঈদ ও জুম্আর উভয় নামাযই আদায় করা লাগবে (কবিরী)।

✪ ঈদের জমাত শুরু হয়ে যাওয়ার পর কোন মুক্তাদী এসে যদি ইমাম কে রুকুতে পায়-তখন সে তাড়া তাড়ি নিয়্যত বেধে নিয়ে চিন্তা করে দেখবে যে,তাকবীর তিনটি বলে নিয়ে ইমাম কে রুকু অবস্থায় পাবে কিনা ? যদি তাকবীর বলে ইমাম কে রুকুতে পাওয়া যাবে বলে তার বিশ্বাস হয় তা হলে সে তাড়া তাড়ি দাড়ানো অবস্থাতেই প্রথম রাকাতের অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি বলে নিবে, অতঃপর ইমামের সাথে গিয়ে রুকুতে শরীক হবে। আর যদি অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি বলা সম্ভব না হয় তাহলে তাড়াতাড়ি তাকবীরে তাহরীমা বলে রুকুতে চলে যাবে। এবং রুকু

অবস্থায় হাত না উঠিয়ে রুকুর তাছবীহ্ "ছুব্হানা রাব্বিয়াল আযীম" বাদ দিয়েই ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি বলে নিবে।

আর যদি মুক্তাদির তিন তাক্বীর বলার আগেই ইমাম রুকু থেকে দাড়িয়ে যান তাহলে ঐ মুক্তাদীকে ইমামের অনুসরণ করতে গিয়ে সাথে সাথে দাড়িয়ে যেতে হবে এ ক্ষেত্রে বাকী তাকবীর গুলো আর বলা লাগবেনা।

যেমন শামী গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

اما لو ادركه راكعا فان غلب على ظنه ادراكه فى الركوع كبر قائما برای نفسه ثم ركع والا ركع وكبر فى ركوعه ....

✪ المستملى شرح منية المصلى গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

لوادرك الامام راكعا كبر للاحرام ثم ياتى بالتكبيرات للعيد انه ظن انه يدركه فى الركوع لان محل التكبيرات القيام ...... وان خاف ان لا يدرك الركوع مع الامام ركع وكبر فى ركوعه وعن ابى يوسف رح يترك التكبير ويسبح تسبيح الركوع لان التكبير فات عن محله والتسبيح فى محله ولهما ان التكبير واجب والتسبيح سنة والوجوب يرجع الى الذات ..... والترجيح بالذات اقوى ..... واذا رفع الا مام راسه سقط عنه ما بقى من التكبيرات فلا يتمها لان المتابعة تقع فرضا والتكبير واجب ـ

وان رفع الامام راسه سقط عن المقتدى مابقى من التكبيرات لان ان اتى به فى الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب ـ (مراقى الفلاح)

✪ ইমাম রুকুহতে দাড়িয়ে যাওয়ার পরই যদি কোন মুক্তাদী এসে জমাতে শামিল হয় তখন সে শুধু তাকবীরে তাহরিমা আল্লাহু আকবর বলেই জমাতে শামিল হয়ে যাবে। অতিরিক্ত তিন তাকবীর সে মূহুর্তে বলবেনা, বরং ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকা'ত যথা নিয়মে আদায় করে নিয়ে নিজের ছুটে যাওয়া ১ম রাকাত শুরু করার সময় ঐ অতিরিক্ত তিনটি তাক্বীর ও বলে নিতে হবে। (আলমগীরী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ ইমাম যদি প্রথম রাক্আতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলতে ভুলেযান এবং তাকবীর না বলে কেরা'ত পড়া শুরু করে দেন তাহলে কেরাত শেষ করার পর দ্বিতীয় রাকাতের ন্যায় রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই ঐ ছুটে যাওয়া অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি বলে যাবেন।

আর যদি ইমাম দ্বিতীয় রাকাতের অতিরিক্ত তাকবীর ৩ টি ভুল বশত ঃ কেরাতের পর দাড়ান অবস্থায় না বলে রুকুতে চলে যান তাহলে তিনি রুকুতেই হাত না উঠিয়ে ঐ ছুটে যাওয়া তাকবীর তিনটি বলে নিবেন।

✪ অন্য সব নামাযে যে সব কারণে ছাহু ছিজদা ওয়াজিব হয়, ঈদের নামাযেও সে সব কারণে ছাহু ছিজদা ওয়াজিব হয়ে। বরং ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর গুলোর যে কোন একটি তাকবীর ভুলে বাদ পড়ে গেলেও ছাহু ছাজদা ওয়াজিব হয়। তবে ঈদ ও জুমআর বড় জমাতে মুছাল্লীর সংখ্যাধিক্যের কারণে ছাহু ছাজদা না করাই উত্তম। কেননা বড় জমাতে ছাহু ছিজ্দা করতে গেলে মুছাল্লীগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু মুছাল্লীর সংখ্যা যদি কম হয় তখন ছাহু ছাজদা দিয়ে দিতে পারবে (উমদাতুল ফিকাহ্)।

◆ **তাক্বীরে তাশরীক এর আহ্কাম ঃ**

মাহে জিলহাজ্জের ৯ তারিখ ফজরের নামাযের পর থেকে ১৩ তারিখের আছরের নামাযের পর পর্যন্ত মোট এ পাঁচ দিনের প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে যে তাকবীর পাঠ করা হয় একে তাকবীরে তাশরিক বলা হয় এবং এ মোট পাঁচ দিন কে "আইয়ামে তাশরিক" বলা হয়।

◆ **তাকবীরে তাশরিক নিম্নরূপ ঃ**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আক্বর, আল্লাহু আকবর, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল্ হাম্দ।

✪ তাকবীর তাশরিক আরম্ভ হওয়ার ইতিহাস।

মহান আল্লাহর আদেশ পালনার্থে হযরত ছায়্যীদুনা ইব্রাহীম খলীল(আঃ) যখন ছুরি হাতে নিয়ে নিজের প্রান প্রিয় সন্তান হযরত ইছমায়ীল (আঃ) কে কোরবানী করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, ঠিক সে মূহূর্তে হযরত জিব্রায়িল (আঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশে একটি বেহেস্তী দুম্বা নিয়ে আসছিলেন এবং জবেহ করে ফেলেন নাকি এ ভয়ে অস্থির হয়ে তাই আকাশ থেকেই বড় আওয়াজে তাকবীর আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর বলে বলে আসতে লাগলেন। হযরত জিব্রায়ীল (আঃ) এর এ তাকবীর ধ্বনী শুনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও বলে উঠলেন "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।

এদিকে হযরত ইছমায়ীল (আঃ) শোয়া অবস্থায় ইনাদের আওয়াজ শুনে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন "আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল্ হামদ। (শামী-এনায়া)।

হযরত ইমাম আবু ইউছুফ (রঃ) ও হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে ফরয আদায় কারী প্রত্যেক মুছাল্লীর জন্য "তাক্বীরে তাশরিক" বলে যাওয়া ওয়াজিব। সুতরাং প্রত্যেক পুরুষ, মহিলা, মুকীম-মুছাফীর, ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী নামায আদায় কারী প্রত্যেকেই ফরয নামাযের ছালাম ফিরানোর পরক্ষণে পুরুষেরা বড় আওয়াজে এবং মহিলারা নীরবে ৯ই জিলহাজ্জের ফজরের নামায থেকে ১৩ই জিল হাজ্জের আছরের নামাযের পর পর্যন্ত প্রত্যহ এ তাক্বীর তাশরীক বলে যাবে।

✪ জুম্আর ফরয নামাযের পরেও তাকবীর তাশরীক বলা ওয়াজিব।

✪ ঈদের নামাযের ছালাম ফিরানোর পরে ও তাকবীর বলা ওয়াজিব।

মাছবুক ও লাহেক মুছাল্লীর উপরও তাকবীর বলা ওয়াজিব। ইমামের ছালাম ফিরানোর পর এদের নিজ নিজ বাকী নামায শেষ করে ছালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলে নিবে।

✪ ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে গেলে মুক্তাদীগণ তাকবীর বলা আরম্ভ করে দিবে।

✪ যদি আইয়ামে তাশরীকের (তারিখ সমূহের) কোন এক বা একাধিক নামায কাযা হয়ে যায় এবং তাশরীকের দিন সমূহের মধ্যে জমাতে বা একাকী ঐ নামায কাযা আদায় করা হয় তা হলে তাকবীরে তাশরীক বলে যাওয়া ওয়াজিব।

✪ কিন্তু তাশরীকের দিন সমূহের কোন কাযা নামায যদি উক্ত তারিখ সমূহ চলে যাওয়ার পর কাযা আদায় করা হয় তাহলে উক্ত তাকবীর তাশরীক বলা ওয়াজিব নয়।

✪ হযরাত আইম্মায়ে কেরামের মতে, একবার তাক্বীর তাশরীক বলা ওয়াজিব, আর এরচেয়ে বেশী বার বলা উত্তম (দুররুল মোখতার)। তবে কারো কারো মতে তিনবারও তাকবীর বলা যায় (শামী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম অধ্যায়

বিভিন্ন সুন্নাত-নফল নামায সমূহের বর্ণনা

শ্রদ্ধেয় পাঠক মণ্ডলী

এ প্রসঙ্গে আমাদের সকলের জানা থাকা দরকার যে ইসলামে ফরয এবাদতের ন্যায় নফল এবাদতের গুরুত্ব এবং উপকারিতা ও অপরিসীম, ফরয এবাদত আদায়ের দ্বারা আল্লাহর বান্দারা মৌলিকভাবে আল্লাহর স্বাভাবিক প্রিয়জন বিশ্বস্থ বান্দারূপে এবং নবী আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রিয় উম্মাত রূপে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হন, আর নফল এবাদতের দ্বারা বান্দা ক্রমশ ঃ আল্লাহ-রাসূলের কুরবাত-নৈকট্য লাভে ধন্য হন।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَأَلَنِىْ لَاُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ (بخارى شريف)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– যে লোক আমার আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আমি আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। বান্দা যে সব এবাদত ও নেক আমলের দ্বারা আমার নৈকট্য তালাশ করে তন্মধ্যেআমি যা আমার বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছি –ঐ ফরয এবাদত সমূহ আদায় করাটাই হচ্ছে আমার প্রিয় ভাজন হওয়ার অন্যতম পন্থা।

ফরয সমূহ আদায়ের পর বান্দা নফল আদায়ের দ্বারা ক্রমশঃ আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এভাবে আমার নিকটবর্তী হতে হতে সে এমন পর্য্যায়ে পৌছে যায় যে, আমি স্বপ্রনোদিত হয়েই তাকে ভালবাসতে থাকি। এভাবে যখন সে আমার একান্ত প্রিয় ভাজন- অলি তথা বন্দেগী সূত্রের বন্ধু রূপে হয়ে পড়ে, তখন তাঁর মধ্য দিয়েই আমি আল্লাহর কুদরতী শক্তি প্রকাশ পেতে থাকে, ঐ সময় আমি তার শ্রবণ শক্তি হয়ে

যাই যদ্বারা সে শুনে। আমি তার দৃষ্টি শক্তি হয়ে পড়ি, যদ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যদ্বারা সে ধরে। আমার বিশেষ কুদরতী শক্তি দ্বারা তার পা পরিচালিত হয়।

অর্থাৎ সে লোক আমার অলি রূপে স্বীকৃতি লাভ করায় তার মাধ্যমে কেরামত সমূহ প্রকাশ পেতে থাকে।

সুতরাং ঈমানদার আল্লাহ-রাসূলের প্রত্যেক আশেক বান্দাদের উচিৎ– সর্বাগ্রে মহান আল্লাহর ফরয নামায সমূহ সঠিকভাবে আদায় করে যাওয়া, অতঃপর ছুন্নাত নামায সমূহ এবং নির্ধারিত নফলও অধিক অধিক পরিমাণে সাধারণ নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে মহা প্রভূ আল্লাহ পাকের পরম সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা এবং আল্লাহ রাসূলের প্রিয়ভাজন হওয়া।

সুন্নাত ও নফল নামাযসমূহ আদায়ের স্থান ঃ

ফতোওয়ায়ে আলমগীরী গ্রন্থে বলা হয়েছে–

اَلْاَفْضَلُ فِى السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ اَلْمَنْزِلُ لِقَوْلِهٖ ء صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ الْمَنْزِلِ اَفْضَلُ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ـ

فَاَمَّا السُّنَنُ الَّتِىْ بَعْدَ الْفَرَائِضِ فَيَاْتِىْ بِهَا فِىْ الْمَسْجِدِ فِىْ مَكَانٍ صَلّٰى فِيْهِ فَرْضَهٗ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَتَخَطّٰى خَطْوَةً ـ وَالْاِمَامُ يَتَاَخَّرُ عَنْ مَكَانٍ صَلّٰى فِيْهِ فَرْضَهٗ لَا مُحَالَةَ كَذَا فِى الْكَافِىْ ـ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِىُّ اَلْاَفْضَلُ اَنْ يُؤَدِّىْ كُلَّهٗ فِى الْبَيْتِ اِلَّا التَّرَاوِيْحَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجْعَلُ ذٰلِكَ اَحْيَانًا فِى الْبَيْتِ / وَالصَّحِيْحُ اَنَّ كُلَّ ذٰلِكَ سَوَاءٌ فَلَا تَخْتَصُّ الْفَضِيْلَةُ بِوَجْهٍ ه دُوْنَ وَجْهٍ وَلٰكِنَّ الْاَفْضَلَ مَايَكُوْنُ اَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ وَاَجْمَعَ لِلْاِخْلَاصِ وَالْخُشُوْعِ كَذَافِى النِّهَايَةِ ـ صفحه ١١٣

অর্থাৎ সুন্নাত নফল নামায সমূহ ঘরে আদায় করাটাই উত্তম, কেননা আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন– ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় নামায ঘরে আদায় করা উত্তম। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে ফরযের পরের ছুন্নাত নফল নামায সমূহ মাসজিদের ফরয আদায় করার স্থান থেকে কিছু এদিক ওদিক সরে গিয়ে আদায়করা ভাল। (স্থান সংকুলানহলে) ইমাম ইমামতী করার স্থান থেকে একটু সরে গিয়েই সুন্নাত নফল আদায় করবে। ইমাম হালওয়ানী (র) বলেছেন– তারাবীহ ব্যতীত প্রত্যেক সুন্নাত নফল নামাযই ঘরে আদায় করাটা উত্তম, কারো কারো মতে এসব সমজিদে আদায় করলেও মাঝে মধ্যে ঘরে পড়াটা উচিৎ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হচ্ছেঃ যেস্থানে অন্তরের একাগ্রতা বেশী সৃষ্টি হয় এবং রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সেখানেই সুন্নাত আদায় করা উত্তম (উহা ঘর হউক কিংবা মাসজিদ হউক)

✪ শরহে মুনিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে–

وَاَمَّا السُّنَنُ الَّتِىْ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ فَاِنَّهُ اِنْ تَطَوَّعَ بِهَا فِى الْمَسْجِدِ فَحَسَنٌ وَتَطَوُّعُهُ بِهَا فِي الْبَيْتِ اَفْضَلُ وَهٰذَا غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِمَابَعْدَ الْفَرِيْضَةِ بَلْ جَمِيْعُ النَّوَافِلِ اَمَاعَدَا التَّرَاوِيْحِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ اَلْاَفْضَلُ فِيْهَا اَلْمَنْزِلُ ـ لِمَارُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ جَمِيْعَ السُّنَنِ وَالْوِتْرَ فِى الْبَيْتِ عَلٰى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ .... وَفِىْ شَرْحِ الْاٰثَارِيَاْتِيْ بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِى الْمَسْجِدِ وَمَاسَوَاهُمَالَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُصَلِّىَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَعْضِ وَالْبَعْضُ يَقُوْلُ التَّطَوُّعُ فِى الْمَسْجِدِ حَسَنٌ وَفِى الْبَيْتِ اَحْسَنُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رح وَبِهِ اَفْتٰى الْفَقِيْهُ اَبُوْجَعْفَرٍ رح قَالَ اَنْ لَايَخْشٰى اَنْ يَشْغَلَ عَنْهَا اِذَا رَجَعَ فَالْاَفْضَلُ فِى الْبَيْتِ صفحہ ٤٤٩ ـ

অর্থাৎ ফরযের পরের ছুন্নাত সমূহ মাসজিদে আদায় করাও ভাল– আর ঘরে আদায় করাটা অধিক ভাল, কেননা হাদীছ শরীফে প্রত্যেক প্রকারের নফল নামায কে ঘরে আদায় করা উত্তম বলা হয়েছে, شرح الاثار গন্থে বলা হয়েছে, কতেক ফোকাহায়ে কেরামের মতে জোহরের ফরযের পরের দু'রাকাত ছুন্নাত নামায ও মাগরিবের ফরযের পরের দু'রাকাত সুন্নাত নামায মাসজিদেই আদায় করে যাবে। এছাড়া অন্যান্য নফল নামায মাসজিদে আদায় করা উচিৎ নয়। অপর কতেক ফোকাহায়ে কেরামের মতে মাসজিদে সুন্নাত-নফল নামায আদায় করা উত্তম এবং ঘরে আদায় করা বেশী উত্তম। যেরূপ অত্র মনিয়াতুল মুছাল্লীগন্থের প্রণেতা বলেছেন। এর উপরই ফতোয়া দিয়েছেন ফকীহ আবু জাফর (র)।

আর যদি ঘরে গিয়ে অন্য কাজ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ার অশংকা না থাকে তাহলে ছুন্নাত-নফল নামায সমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করাটাই উত্তম। (কিন্তু যদি অন্য কাজ কর্মে লিপ্ত হয়ে ছুন্নাত-নফল নামায বাদ পড়ার আশংকা থাকে তাহলে–সেক্ষেত্রে মাসজিদেই উহা আদায় করে নেওয়া উত্তম)।

✪ দুররে মোখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে–

وَالْاَفْضَلُ فِى النَّفْلِ غَيْرُ التَّرَاوِيْحِ اَلْمَنْزِلُ اِلَّالِخَوْفٍ شُغْلٍ عَنْهَا وَالْاَصَحُّ اَفْضَلِيَّةُ مَاكَانَ اَخْشَعَ وَاَخْلَصَ ـ

✪ ফতোওয়ায়ে শামী গ্রন্থে বলা হয়েছে–

(قوله والافضل فى النفل الخ) شَمَلَ مَابَعْدَ الْفَرِيْضَةِ وَمَا قَبْلَهَا لِحَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ عَلَيْكُمُ الصَّلٰوةُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ..... وَحَيْثُ كَانَ هٰذَا اَفْضَلُ يُرَاعىٰ مَالَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ خَوْفُ شُغْلٍ عَنْهَا لَوْ ذَهَبَ لِبَيْتِهِ اَوْ كَانَ فِىْ بَيْتِهِ مَا يُشْغِلُ بَالَهُ وَيُقَلِّلُ خُشُوْعَهُ فَيُصَلِّيْهَا حِيْنَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ لِاَنَّ اِعْتِبَارَ الْخُشُوْعِ اَرْجَحُ ـ صفحہ ٢٢ جـ٢

উভয় উদ্ধৃতির সারমর্ম হচ্ছে– তারাবীহ ব্যতীত ফরযের আগের হউক কিংবা পরের হউক প্রত্যেক প্রকারের ছুন্নাত-নফল নামায সমূহ হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী ঘরে আদায় করাটা উত্তম।

তবে এক্ষেত্রে মুজ্তাহিদ ফোকাহায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ঃ ঘরে গিয়ে ছুন্নাত নফল নামায আদায় করতে গেলে যদি কোন প্রকারের বাঁধা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে ছুন্নাত-নফল আদায় করতে না পারার সম্ভাবনা থাকে কিংবা ঘরে গেলে অন্তর-মনের একাগ্রতা একনিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ হয় তখন মাসজিদের মধ্যেই সুন্নাত নফল ইত্যাদি নামায আদায় করে নিবে। কেননা নামায (কবুল হওয়া) এর ব্যাপারে খুশু-খুজু তথা মনের একাগ্রতা-একনিষ্ঠতার বিষয়টি অধিক অগ্রগণ্য রূপে বিবেচিত।

জমাত সহকারে নফল নামায আদায় প্রসঙ্গ ঃ

উল্লেখ্য যে সাধারণ নফল নামায, তাহাজ্জুদের নামায, লাইলাতুল বরাআত ও লাইলাতুল কদর ইত্যাদির নফল নামায সমূহ জমাআত সহকারে আদায় করা যায় কিনা? এ নিয়ে ফোকাহায়ে কেরামগণের মধ্যে কিছুটা এখতেলাফ–মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

✪ যেমন ইসলামী বিশ্বের সুপ্রশিদ্ধ ফোকাহ্গ্রন্থ "বাহ্রুর রায়েক" এবং ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে–

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَاَصْلُ هٰذَا اَنَّ التَّطَوُّعَ بِالْجَمَاعَةِ اِذَاكَانَ عَلٰى سَبِيْلِ التَّدَاعِىْ يُكْرَهُ وَفِى الْاَصْلِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيْدِ رح ـ اَمَّا اِذَا صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَاِقَامَةٍ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ لَايُكْرَهُ ـ وَقَالَ شَمْسُ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَانِىْ رح اِنْ كَانَ سِوٰى الْاِمَامِ ثَلَاثَةً لَا يُكْرَهُ بِالْاِتِّفَاقِ وَفِى الْاَرْبَعِ اِخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ يُكْرَهُ كَذَافِىْ شَرْحِ الْمُنِيَّةِ هٰكَذَا فِى الْخُلَاصَةِ بَحْرُالرَّائِقِ

صفحه٣٤٥ عالمگيريه

অর্থাৎ অত্র মাছআলা সম্পর্কে শরীয়াতের اصل তথা মৌলিক সূত্র হচ্ছে تداعى তথা পরস্পর কে আহ্বান ডাকা-ডাকি করার মাধ্যমে নফল নামায জামাতের সাথে আদায় করা মাকরূহ।

আল্লামা ছাদরুশ শাহীদ (র) স্বীয় গ্রন্থে বলেন, যাদি تداعى আহ্বান ডাকা-ডাকি করার শরীয়াতের পদ্ধতি তথা আযান-একামত ব্যতিরেকে মাসজিদের এক পার্শ্বেই জামাতের সাথে নফল নামায আদায় করা হয় তাহলে মাকরূহ হবেনা।

অপর পক্ষে হযরত ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন– যদি ইমাম ব্যতীত তিনজন মুক্তাদী নিয়ে জমাতের সাথে নফল নামায আদায় করা হয় তাহলে বিল ইত্তেফাক মাকরূহ হবে না, কিন্তু যদি চারজন মুক্তাদি কে নিয়ে জামাতের সাথে নফল নামায আদায় করা হয় এতে এখতেলাফ-মতভেদ রয়েছে। অধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে তখন মাকরূহ হবে। (শরহে মুনিয়া ও খোলাছা নামক গ্রন্থদ্বয়ে এরূপই বর্ণিত আছে)

✪ ইসলামী বিধানের অন্যতম গ্রন্থ "দুরল মোখতার" এ বলা হয়েছে।

(وَلَايُصَلِّىْ الْوِتْرَوَ) لَا (التَّطَوُّعَ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ) اَىْ يُكْرَهُ ذٰلِكَ عَلٰى سَبِيْلِ التَّدَاعِىْ ـ

উক্ত বক্তব্যের বিশ্লেষণে বিশ্বখ্যাত ফতোওয়া গ্রন্থ 'শামী'তে বলা হয়েছে ঃ

(قوله اى يكره ذلك) اَشَارَ اِلٰى مَا قَالُوْا مِنْ اَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِ الْقُدُوْرِىْ فِىْ مُخْتَصَرِهٖ لَا يَجُوْزُ الْكَرَاهَةُ لَا عَدَمُ اَصْلِ الْجَوَازِ ـ لٰكِنَّ فِىْ الْخُلَاصَةِ عَنِ الْقُدُوْرِىْ اَنَّهُ لَايُكْرَهُ وَاَيَّدَهُ فِى الْحِلْيَةِ بِمَا اَخْرَجَهُ الطَّحَاوِىْ عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ رض قَالَ دَفَنَّا اَبَابَكْرٍ رضى الله

تعالى عنه لَيْلًا فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه اِنِّىْ لَمْ اُوْتِرْ فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى بِنَا ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ ـ ثُمَّ قَالَ وَيُمْكِنُ اَنْ يُقَالَ الظَّاهِرُ اَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيْهِ غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ ثُمَّ اِنْ كَانَ ذَالِكَ اَحْيَانًا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رضى الله عنه كَانَ مُبَاحًا غَيْرُ مَكْرُوْهٍ ـ وَاِنْ كَانَ عَلٰى سَبِيْلِ الْمُوَاظَبَةِ كَانَ بِدْعَةً مَكْرُوْهَةً لِاَنَّهُ خِلَافُ الْمُتَوَارِثِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُوْرِىْ فِىْ مُخْتَصَرِهٖ ـ وَمَاذَكَرَهُ فِىْ غَيْرِ مُخْتَصَرِهٖ يُحْمَلُ عَلَى الْاَوَّلِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اهـ ـ

قُلْتَ ـ وَيُؤَيِّدُهُ اَيْضًا مَافِي الْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهٖ ـ اِنَّ الْجَمَاعَةَ فِىْ التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ اِلَّا فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ اهـ ـ فَاِنَّ نَفْىَ السُّنِّيَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْكَرَاهَةَ نَعَمْ اِنْ كَانَ مَعَ الْمُوَاظَبَةِ كَانَ بِدْعَةً فَيُكْرَهُ وَفِيْ حَاشِيَةِ الْبَحْرِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِىِّ عِلَلُ الْكَرَاهَةِ فِى الضِّيَاءِ وَ النِّهَايَةِ بِاَنَّ الْوِتْرَنَفْلٌ مِنْ وَجْهٍ حَتّٰى وَجَبَتِ الْقِرَاةُ فِى جَمِيْعِهَا ـ وَتُؤَدّٰى بِغَيْرِ اَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَالنَّفْلَ بِالْجَمَاعَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لِاَنَّهُ لَمْ تَفْعَلْهُ الصَّحَابَةُ فِىْ غَيْرِرَمَضَانَ اهـ ـ وَهُوَ كَالصَّرِيْحِ فِىْ اَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ تَاَمَّلْ ـ شامى ج ٢ صفحه٤٩

আল্লামা শামী (র) এর উদ্ধৃত বর্ণনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে নফল নামায জমাতে আদায় করা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল না হলেও নিশ্চয় উহা জায়েয (মুবাহ) পর্যায়ের একটি আমল-যা তিনি হযরত ওমর ফারুকে আযম (র) এর কৃত আমল দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

আর যারা একে মাকরূহ বলেছেন এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন।

وَهُوَ كَالصَّرِيْحِ فِىْ اَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ تَاَمَّلْ ـ

অর্থাৎ এ আমলটিকে কতেক ফোকাহায়ে কেরামের বক্তব্যানুসারে মাকরূহ মেনে নিলে ও তা প্রকৃত পক্ষে মাকরূহে তাহরীমী পর্যায়ে পড়েনা বরং মাকরূহে তানজীহ পর্যায়েই পড়ে, আপনারা ও এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্বখ্যাত বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থদ্বয় বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে যৎসামান্য ভাষাগত পার্থক্য সহকারে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ انكرت بَصَرِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِىَ الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اٰتِىَ مَسْجِدَهُمْ فَاُصَلِّىْ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَاْتِيْنِىْ فَتُصَلِّىْ فِيْ بَيْتِىْ فَاَتَّخِذَهٗ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاَبُوْبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاَذِنْتُ لَهٗ فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرْتُ لَهٗ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ الخ بخارى صفحہ٦، جـ١ مسلم شريف جـ١

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ইবনে (শেহাব জুহ্‌রী (র) বলেন যে, হযরত মাহমুদ ইব্‌নে রবীউল আনছারী (র) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে–বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বিশিষ্ট আনসারী ছাহাবী হযরত ইত্‌বান ইবনে মালেক (র) একদা আল্লাহর নবী (স) এর খেদমত শরীফে হাজির হয়ে আরজ করলেন–ইয়া রাসুলাল্লাহ (স) আমি অন্ধ হয়ে পড়েছি, আমি আমার গোত্রীয় লোকদের নামাযের ইমামতীর দায়িত্ব পালন করে থাকি। যখন বৃষ্টি বাদল হয় তখন আমার ও মাসজিদের মাঝখানে পানির স্রোত বয়ে যায়, যদ্দরুন আমি লোকদের ইমামতী করার জন্য মাসজিদে যেতে পারিনা, ইয়া রাসূলল্লাহ (স) !

আপনার পবিত্র খেদমতে আমার একান্ত আরজী এযে, কোন এক সময়ে আমার ঘরে আপনি তাশরীফ এনে ঘরের কোন এক জায়গায় নামায আদায় করতঃ ঐ জায়গাকে বরকতময় করে দিলে আপনার পাক জাতের নামায আদায় করার ঐ স্থানটিকে আমি ঘরোয়া মাসজিদ রূপে আমার নামায আদায়ের স্থান বানিয়ে নেব।

এর প্রতি উত্তরে আল্লাহর প্রিয় রাসূল (স) এরশাদ করেন-ইনশাআল্লাহ তায়ালা (অনতিবিলম্বে) আমি এরূপ করব।

হযরত ইতবান (র) বলেন, পরদিন সকাল বেলা সূর্য কিছু উপরে উঠার পর আল্লাহর প্রিয় নবী (স) হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা) সঃ আমার ঘরে তাশরীফ আনেন।

আল্লাহর প্রিয় হাবীব (স) তাশ্‌রীফ আনা মাত্র না বসেই আমাকে লক্ষ্য করে বললেন! তোমার ঘরের কোনস্থানটিকে "তোমার নামায আদায়ের স্থান তথা (ঘরোওয়া এবদাতখানা) বানাতে তুমি আগ্রহী?

আমি ঘরের এক পার্শ্বকে দেখিয়ে দিলাম। অতঃপর নবী আকরাম (স) "আল্লাহু আকবার" তাকবীরে তাহরিমা বলেই নামায আরম্ভ করে দিলেন, আমরা সবাই ও প্রিয় নবী (স) এর পেছনে কাতার বদ্ধ হয়ে ইকতেদা করতঃ নামাযে দাড়িয়ে গেলাম।

আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম দু'রাকাত নামায আদায় করতঃ ছালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে দিলেন।

(ইহা কোন প্রকারের ফরয-ওয়াজিব নামায ছিল না বরং নিরেট নফল নামাযই ছিল)।

মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম নববী (র) উক্ত হাদীছ শরীফের উপর ভিত্তি করে বলেন– وَفِيْهِ جَوَازُ صَلٰوةِ النَّفْلِ جَمَاعَةً অর্থাৎ অত্র হাদীস শরীফ দ্বারা নফল নামায জমাত সহকারে আদায় করা জায়েয প্রমাণিত হয়।

বোখারী শরীফের সর্বমান্য ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানী (র) উক্ত হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করে বলেন–

هٰذَا الْحَدِيْثُ دَلِيْلٌ عَلٰى جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِى النَّوَافِلِ۔

অর্থাৎ বর্ণিত হাদীছ শরীফ খানা নফল নামায জমাত সহকারে আদায় করার ব্যাপারে দলীল রূপে গণ্য, এছাড়া এ বিষয়ে আরো কয়েকখানা নির্ভর যোগ্য মুল্যবান উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হচ্ছে ;

নফল নামায জমাত সহকারে আদায় করা জায়েজ হওয়া সম্পর্কে দলিলসহকারে বিস্তারিত আলোচনা করেন—

الحاشية الدرر على الغرر গ্রন্থের প্রণেতা বিশ্ব বরেণ্য ফকীহ্‌ আল- বাহ্‌রুল কামিল হযরতুল আল্লামা আবদুল হালীম (র) তিনি বলেন—

(قَوْلُهٗ اِنَّ التَّطَوُّعَ بِالْجَمَاعَةِ اِنَّمَا) الخ وَكَذَا الْوِتْرُ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ اِنَّمَا يُكْرَهُ الخ۔ كَمَا فِى الْبَحْرِ وَشَرْحِ الْمَقْدِسِىْ وَهُوَ مَرًّا

pdf By Syed Mostafa Sakib

دُ الْمُصَنِّفِ اَيْضًا مِنْ ذِكْرِ هٰذَا النَّقْلِ هٰهُنَا كَمَا لَايَخْفٰى (قوله وعن شمس الائمة الخ) صَرَّحَ بِاسْمِهٖ لما اَنَّ مَاذَكَرَهٗ عَنْ دِرَايَةٍ لَا عَنْ رِوَايَةٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِاَنَّهٗ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الْمَسَائِلِ الَّتِىْ لَارِوَايَةَ فِيْهَا عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ وَلٰكِنْ يُخَالِفُهٗ اِطْلَاقَ رِوَايَةِ جَوَازِ وَحْدَةِ الْمُقْتَدِىْ وَكَثْرَتِهٖ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَافِىْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ نَقَلَهُ الْبُخَارِىْ فِىْ صَحِيْحِهٖ اَنَّهٗ عليه الصلوة والسلام تَنَفَّلَ رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ وَقَعَتْ صُفُوْفٌ خَلْفَهٗ مُقْتَدِيْنَ بِهٖ عليه السلام وَلَمْ يُنْكِرْهُمْ ـ وَاَنَّ شَمْسَ الْاَئِمَّةِ قَدْ اِعْتَرَضَ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَلٰى رِوَايَةِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ عَلٰى مَاسَيَجِئُ فِىْ كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ فِىْ مَسْئَلَةِ التَّخَتُّمِ بِالْحَجَرِ وَالثَّيْبِ مَعَ اَنَّ الصَّحِيْحَ اَلْعَمَلَ بِالرِّوَايَةِ لَا بِالدِّرَايَةِ عَلٰى مَا سَيَجِئُ تَحْقِيْقُهٗ فِىْ كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ فَظَهَرَ اَنْ لَا عَمَلَ بِهٰذِهِ الدِّرَايَةِ اَيْضًا مِنْ ذٰلِكَ وَوَقَعَتْ بِالتَّنَفُّلِ فِىْ لَيْلَةِ الرَّغَائِبِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْقَدْرِ سَلَفًا وَخَلَفًا لِوُجُوْدِ الْاَثَرِ فِيْهَا وَوُجُوْدِ رِوَايَةِ جَوَازِ جَمَاعَةِ التَّنَفُّلِ مُطْلَقًا هٰذَا ـ

(قَوْلُهٗ اِنَّمَا يُكْرَهُ اِذَا كَانَ عَلٰى سَبِيْلِ التَّدَاعِىْ) هٰذَا تَفَقُّهٌ مِنْ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ وَاَرَادَ التَّدَاعِىَ الْجَمَّ الْغَفِيْرَ وَاِنْ لَكَ حُكْمَ كَرَاهَةِ اقْتِدَاءِ اَرْبَعَةٍ لِاَنَّهَا اَدْنَاهُ وَفَسَّرَ الْمُتَاَخِّرُوْنَ بِالْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ اِذْلَا خِلَافَ وَلَاخِفَاءَ فِىْ كَرَاهَةِ جَمَاعَةِ التَّنَفُّلِ بِاسْتِبْدَاءِ اَذَانٍ وَاِقَامَةٍ لَهَا ـ وَاَيْضًا هٰذَا التَّفْسِيْرُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَعْنَاهُ اللُّغْوِىْ لِاَنَّ الدَّعْوَةَ اِلَى الصَّلٰوةِ اِنَّمَا تَكُوْنُ بِالْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ كَمَا فِى الْفَرْضِ وَعَلَيْهِ مَانَقَلَهٗ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالْمِنَحِ عَنْ صَدْرِ الشَّهِيْدِ اَنَّ الْقَوْمَ اِذَا صَلَّوْا النَّفْلَ بِالْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَاِقَامَةٍ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُكْرَهُ وَهٰكَذَا صَرَّحَ بِهٖ اَيْضًا جَمَالُ الدِّيْنِ الْاَقْسَرَائِىْ فِىْ تَفْسِيْرِهِ الشَّرِيْفِ وَيَدُلُّ عَلٰى هٰذَا الْاِعْتِبَارِ مَارُوِىَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

فِى الْبُخَارِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اَتٰى بِمَنْزِلِ اِبْنِ مَالِكٍ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىْ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهٗ مَكَانًا فَكَبَّرَ عليه السلام وَصَفَفْنَا خَلْفَهٗ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْكِرْمَانِىْ فِى الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلٰى جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّوَافِلِ اِنْتَهٰى ـ

ولايذهب عليك انه قد وجدجم الغفير ولم يكن اذان واقامة ولافضل بين نفل ونفل صرح به فى العمادية وشرح النقاية لابى المكارم ـ فَظَهَرَ اَنَّ مَافِى الْمُحِيْطِ السَّرَخْسِىْ لَا يُكْرَهُ الْاِقْتِدَاءُ بِالْاِمَامِ فِى النَّوَافِلِ مُطْلَقًا نَحْوَالْقَدْرِ وَالرَّغَائِبِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ونحوذٰلِكَ لِاَنَّ مَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ مُبْنٰى هٰذَا عَلٰى ذٰلِكَ انتهى ـ وَلَا سِيَّمَا لِكُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ هٰذِهِ اللَّيَالِىْ فَضِيْلَةٌ فَيَكُوْنُ الْعِبَادَةُ فِيْهَا اَفْضَلَ اَمَّا فَضِيْلَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْبَرَاءَةِ فَظَاهِرَةٌ وَاَمَّا فَضِيْلَةُ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ فَاِنَّ النُّطْفَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ ﷺ وَقَعَتْ فِيْ رَحِمِ اُمِّهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ ذٰلِكَ اُسْتُحِبَّ صَلَاةُ الرَّغَائِبِ فِيْهَا شُكْرًا لِمَامَنَّ اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْنَا مِنْ وُجُوْدِ اَجَلِّ الْاَنْبِيَاءِ وَاَكْرَمِ الْاَصْفِيَاءِ وَاعْتَبَرَ السَّلَفُ الصَّالِحُوْنَ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فِىْ هٰذِهِ اللَّيَالِىْ عَلَى الْاِحْيَاءِ وَغَيْرِهٖ وَاَوْرَدُوا الْخَبَرَ وَالْاَثَرَ فِىْ حَقِّهَا وَضُعْفُهُ رِوَايَةٍ لَايَضُرُّ فِىْ بَابِ الْعِبَادَاتِ وَمِنْ ذٰلِكَ اَنَّ مَنْ كَانَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ فِى الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ اَفْتَوْا بِجَوَازِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ بِالْجَمَاعَةِ وَصَلَّوْا مِنْ غَيْرِ تلعتم بَلْ عَدُّوْهَا بَرَكَةً لِاَنْفُسِهِمْ فَظَهَرَ اَنَّ مَنْ مَنَعَ عَنْ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ بِالْجَمَاعَةِ فَقَدْ اَسَاءُوْا اِجْتَرَاُ عَلٰى تَضْلِيْلِ الْاَسْلَافِ الْكِرَامِ وَالْاَخْلَافِ الْفِخَامِ فَعَلَى الْوُلَاةِ مَنْعُ الْمَانِعِيْنَ وَتَعْذِيْرُ الْمُعَانِدِيْنَ عَصَمَنَا اللّٰهُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَوَفَّقَنَا وَحَشَرَنَا مَعَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ ـ

بَابُ الْوِتْرِ وَالنَّوَافِلِ حَاشِيَةُ الدُّرَرِ عَلَى الْغُرَرِ لِلْبَحْرِ الْكَامِلِ اللمولى عبد الحليم ج اصفحه ٨٢/٨٣

✪ বিশ্ব বরেণ্য মুফাচ্ছিরে কোরআন আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (র) তদীয় গ্রন্থ "তাফছীরে রুহুল বয়ানে" সূরা কদর শরীফের তাফছীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

وَصَلٰوةُ التَّطَوُّعِ بِالْجَمَاعَةِ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لَوْصَلُّوْا بِغَيْرِ تَدَاعٍ وَهُوَ الْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ كَمَا فِي الْفَرَائِضِ صَرَّحَ بِذٰلِكَ كَثِيْرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ فِيْ شَرْحِ النِّقَايَةِ وَغَيْرِهِ وَفِيْ الْمُحِيْطِ لَايُكْرَهُ اِلَّا قْتِدَاءُ بِالْاِمَامِ فِيْ النَّوَافِلِ مُطْلَقًا نَحْوُ الْقَدْرِ وَالرَّغَائِبِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَنَحْوِ ذٰلِكَ لِاَنَّ مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ فَلَا تَلْتَفِتْ اِلٰى قَوْلِ مَنْ لَامَذَاقَ لَهُمْ مِنَ الطَّاعِنِيْنَ فَاِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعِنِّيْنِ لَايَعْرِفُوْنَ ذَوْقَ الْمُنَاجَاةِ وَحَلَاوَةَ الطَّاعَاتِ وَفَضِيْلَةَ الْاَوْقَاتِ ـ تفسيرروح البيان سورة القدر صفحه١٨٣، ج١٠

উপসংহারে বলতে হয়– শরীয়তের উপরুক্ত দলীলাদি দ্বারা নফল নামায জমাত সহকারে আদায় করাটা জায়েজ প্রমাণিত হয়।

তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, যেখানকার অধিকাংশ মুছাল্লীবৃন্দ জমাত সহকারে নফল নামায আদায়ে আগ্রহী সেখানে জমাত সহকারে নফল নামায আদায়ের ব্যাপারে কারো বাঁধা দেওয়া উচিৎ নয়।

আর যেখানকার অধিকাংশ মুছাল্লী জমাত সহকারে নফল নামায আদায়ে আগ্রহী নয় সেস্থলে জমাত সহকারে না পড়াটাই উত্তম।

কারণ এটা ফরয, ওয়াজিব কিংবা ছুন্নাত পর্যায়ের কোন বিষয় নয় বরং মুস্তাহাব কিংবা জায়েয পর্যায়ের একটা ঐচ্ছিক ব্যাপার, তাই ঐ বিষয়ে অধিক বাড়াবাড়িতে কোন ফায়দা নাই।

তাহিয়্যাতুল ওযুর নামায

যে কোন সময়ে ওযু করার পর (নামাযের মাকরূহ সময় না'হলে) দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব, এতে অপরিসীম ছাওয়াব পাওয়া যায়। ওযুর পানি অঙ্গ হতে শুকানোর আগেই অত্র নামায আদায় করা মুস্তাহাব (শামী) পবিত্র হাদীছে

আল্লাহর প্রিয় নবী (দ) এরশাদ করেন–

مَا مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهٖ وَوَجْهِهٖ اِلَّاوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (مسلم وابو داؤد)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওযু করার পর অন্তর-মুখ এক করত অর্থাৎ পূর্ণ একাগ্রতার সাথে দু'রাকাত নামায আদায় করে থাকে ঐ লোকের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

মে'রাজ শরীফ থেকে আসার কিছুদিন পর একদা ফজরের নামায আদায় শেষে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ) কে তলব করে বললেন– হে বেলাল! আমি যখন মে'রাজের রাতে বেহেস্ত পরিদর্শনে যাই তখন সেখানে তোমার পদধ্বনি শুনতে পাই। তুমি এমন কোন পূণ্য কাজটি করে থাক যার বিনিময়ে মহান আল্লাহর দরবারে তোমার এ-মর্যাদা!

উত্তরে হযরত বেলাল (রাঃ) বললেন– এয়ারাছূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-তেমন উল্লেখ যোগ্য কোন ছাওয়াবের কাজ করার সুযোগ আমার নেই তবে আমি যখনই ওযু করে থাকি তখনই দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে থাকি। (বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজী)

তাহিয়্যাতুল মাছজিদের নামায

মাছজিদে প্রবেশ করার পর আল্লাহর ঘরের তাজিমার্থে তথা আল্লাহর ওয়াস্তে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব, একে তাহিয়্যাতুল মাছজিদের নামায বলা হয়, কেউ কেউ একে "দুখুলুল মাছজিদের" নামায ও বলে থাকে।

নামাযের হারাম ও মাকরূহ সময় ব্যতীত অন্য যে কোন সময়ে মাছজিদে প্রবেশ করলে উক্ত দু'রাকাত নামায আদায় করে যাওয়া মুস্তাহাব।

মাছজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বেই এ নামায আদায় করে নেওয়া উত্তম।

আল্লাহর প্রিয় নবী (দ) এরশাদ করেন -

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ ـ

অর্থাৎ তোমাদের কোন লোক যখন মাছজিদে প্রবেশ করে তখন বসার আগেই দু'রাকাত (নফল) নামায পড়ে নেওয়া তার জন্য উত্তম। (মারাকিউল ফলাহ)

কোন কোন লোককে মাছজিদে প্রবেশ করার পর প্রথমে বসে পড়তে– অতঃপর পুন দাড়িয়ে তাহিয়্যাতুল মাছজিদ বা অন্যান্য নামায পড়তে দেখা যায়– মূলত এ বসাটার শরয়ী কোন ভিত্তি নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে হাঁ যে লোক বহুদুর হতে হেটে আসার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার জন্য একটু বসে বিশ্রাম নেওয়ার পর তাহিয়্যাতুল মাছজিদের বা অন্যান্য ছুন্নাত-নফল নামায আদায় করার মধ্যে কোন দোষ নাই (শামী)।

যদি মাছজিদে ওযু করা হয় তাহলে তাহিয়্যাতুল ওযু কিংবা তাহিয়্যাতুল মাছজিদ" এর যে কোন একটির নিয়্যাতে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে নিলে উভয়ের ছুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। উভয়ের জন্য পৃথক নিয়্যাতে দু'বার নামায পড়া জরুরী নয়। তবে যদি পড়া হয় ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

দিবা রাত্রির মধ্যে যতবারই মাছজিদে প্রবেশ করা হউকনা কেন-যে কোন একবার তাহিয়্যাতুল মাছজিদের নামায আদায় করে নিলে ছুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। প্রত্যেকবার পুনঃ পুনঃ এ নামায পড়া জরুরী নয়। তবে হা প্রত্যেক বার পড়া হলে অবশ্যই ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

ছোব্‌হে ছাদেক হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে মাছজিদে প্রবেশ করলে উল্লেখিত তাহিয়্যাতুল মাছজিদের নামাযের পরিবর্তে তাছবীহ, তাহলিল্ দরূদ শরীফ কিংবা আল্লাহর জিকির ইত্যাদিই করে যেতে হয়, কারণ এ উভয় সময়ে নফল নামায আদায় করা মাকরূহ, তাই ফজরের দু'রাকাত ছুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও দু' রাকাত ফরয ব্যতিত অন্য কোন প্রকারের নফল নামায পড়া যাবেনা।। সুতরাং এ জিকির দরূদ শরীফের দ্বারা নামাযের হক আদায় হয়ে যাবে।

নিয়্যতঃ নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাআতাই ছালাতিত্ তাহিয়্যাতিল ওযুয়ি (তাহিয়্যাতিল মাসজিদি) নফল মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তারাবীহ্‌র নামায

ইহা ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ পর্য্যায়ের নামায। নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম রমজান মাসের প্রথম ২/৪ রাত সাহাবায়ে কেরাম গণের (রাঃ) সঙ্গে জমা'তে তারাবীহ্‌র নামায আদায় করেন অতঃপর উম্মাতের উপর ইহা ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় জমা'তের সাথে উক্ত নামায ৩/৪ রাতের বেশী আদায় করেননি। আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক এর শাসনকাল পর্যন্ত সকল ছাহাবায়ে কেরামগণ পৃথক পৃথক ভাবে তারাবীহ্‌র নামায আদায় করেন,হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খেলাফত কালে জমা'তের সাথে তারাবীহ্‌র নামায আদায় করার বিধান পুনঃ প্রবর্তিত হয়।

অতএব তারাবীহ্‌র নামায আদায় করা ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ (হেদায়া)।

✪ রমজান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার (প্রথম) রাত থেকে রমজান মাসের শেষ তারিখের রাত পর্যন্ত মুসলিম পুরুষ -নারী-সকলের জন্য এশা'র নামাযের পরে বিতিরের নামাযের পূর্বে দু'দু রাকা'ত করে মোট বিশ রাকা'ত তারাবীহ্‌র নামায আদায় করা ছুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্।

✪ উক্ত নামায জমা'তের সাথে আদায় করা এবং অত্র নামায এক বার পূর্ণ কোরআন করিমের খতম সহকারে আদায় করা ও ছুন্নাত (কেফায়া) (শামী, আলমগীরী, বাহ্‌রুর রায়েক, দোররুল হেকম)।

✪ তারাবীহ্‌র নামাযের আরবী নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (اقتديت بهذا الامام) مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই ছালাতিত তারাবীহ্ ছুন্নাতু রাছূলিল্লাহি তাআলা (ইক্‌তেদাইতু বিহাজাল ইমাম) মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কাবাতিশ্ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

✪ প্রতি দু'রাকাত নামায শেষে নিরবে নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করার উত্তম প্রচলন রয়েছে ঃ

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ اَحْسِنْ اِلَيْنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

✪ দু' দু' রাকা'ত করে প্রতি চার রাকা'ত নামাযের ছালাম ফিরানোর পর এরূপ চার রাকা'ত নামায আদায় করার পরিমাণ সময় বসা এবং তা'তে নফল নামায পড়া কিংবা তাছবীহ্ তাহ্‌লীল ও নবীয়ে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করতঃ দোয়া মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

যেমন ফেকাহ্ শাস্ত্রের সর্বজন মান্য তব্‌কাতের কিতাব "বাদায়ে উচ্ছানায়ে" এর ১ম খণ্ড তারাবীহ্‌র নামায অধ্যায়ের "ছুন্নাত অনুচ্ছেদে" বর্ণিত আছে ঃ

وَمِنْهَا اَنَّ الْاِمَامَ كُلَّمَا صَلّٰى تَرْوِيْحَةً قَعَدَ بَيْنَ التَّرْوِ يْحَتَيْنِ قَدْرَ تَرْوِيْحَةٍ يُسَبِّحُ وَ يُهَلِّلُ وَ يُكَبِّرُ وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَ يَدْعُوْ -

অর্থাৎ, তারাবীহ্‌র নামাযের ছুন্নাতের মধ্যে এওযে, ইমাম যখন চার রাকা'ত নামায শেষ করবে, তখন চার রাকা'ত নামায আদায় করার পরিমাণ সময় বসবে তা'তে তাছবীহ্ তাহ্‌লীল তাক্‌বীর এবং নবীয়ে আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং দোয়া-মুনাজাত করবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ তাছ্বীহ পাঠের ক্ষেত্রে নিম্নের তাছ্বীহ খানা তিন বার পাঠ করতে হয় ঃ-

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَ الْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

(তাহ্তাবী, শামী, গায়তুল আওতার, তাকরীরে তিরমীজি)

বাংলা উচ্চারণ ঃ- ছুবহা-নাজিল্ মূলকি ওয়াল্ মালাকৃতি ছুবহা-না জিল ইজ্জাতি ওয়াল আজ্মাতি ওয়াল্ হাইবাতি ওয়াল্ কুদ্রাতি ওয়াল কিব্রিয়ায়ী ওয়াল্ জাবারুতি ছুবহা নাল্ মালিকিল্ হাইয়িল লাজী লা-এয়ানা-মু ওয়ালা এয়ামূতু আবাদান্ আবাদা ছুব্বূহুন্ কুদ্দূছুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়ার'রূহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু নাছ্ তাগফিরুল্লাহা- নাছ্আলুকাল জান্নাতা ওয় নাউজু বিকা মিনান্ না-রি।

✪ দোয়া মুনাজাতের বেলায় আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জমাতের ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গাণে দ্বীন নিম্নের দোয়া খানা দ্বারা মুনাজাত করে থাকেন.ঃ-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ ـ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

✪ এশা'র নামায আদায়ের আগে তারাবীহ্র নামায আদায় করা জায়েজ নহে।

এ হিসাবে কোন লোক যথাক্রমে এশা'র নামায ও তারাবীহ্র নামায আদায় করার পর কোন কারণ বশত ঃ এশা'র নামায শুদ্ধ হয়নি প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে যেমনিভাবে এশা'র নামায পুনরায় পড়ালাগে তদরূপ তারাবীর নামায ও পুনঃ পড়া লাগবে। কেননা তারাবীহ্র নামায এশা'র নামাযেরই অধীন (আলমগীরী)।

✪ সাধারণতঃ এশার নামায একাকী পড়লে তারাবীহ্র নামায ও একাকী পড়তে হয়। তবে কোন লোক এশা'র জমা'তে শামিল হওয়ার নিয়্যতে এসে দেখতে পেল যে, এশা'র জমা'ত শেষ হয়ে গিয়েছে এমতাবস্থায় ঐ লোক একাকী নামায আদায় করত ঃ তারাবীহ্র জমা'তে শামিল হয়ে যাবে, কেননা এ ক্ষেত্রে ঐ লোক কে এশা'র জামা'তে যোগদান কারীদের অন্তর্ভুক্ত রূপে বিবেচনা করা হবে, (দুররে মোখতার)। এ লোক বিতিরের নামায ও জামা'তে পড়ে নিতে পারবে। এরপর তারাবীহ্র

নামাযের কতেক রাকা'ত ছুটে গিয়ে থাকলে তা একাকী আদায় করে নিবে (বাহ্রুর রায়েক)।

✪ ইছলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওছমান জিন্নূরাইন (রাঃ) পবিত্র রমজান মাসের প্রথম রাত থেকে তারাবীহ্র নামাযে খত্মে কোরআন আরম্ভ করত ঃ রমজানের ২৬ তারিখ দিবাগত ২৭ তারিখের লাইলাতুল্ ক্বদরের রাতে শেষ করতেন।

প্রত্যহ বিশ রাকা'ত তারাবীহ্র প্রতি রাকা'তে এক রুকু' করে তেলাওয়াত করতঃ ২০× ২৭ = ৫৪০ রুকু দ্বারা ২৭ দিনে খতমে কোরআন শেষ করতেন (মুফীদুল কারী, উছীতুল কারী)।

সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, রমজান মাসের ১ম রাত হতে শুরু করে ২৭শের রাতে তারাবীহ্র নামাযে কোরআন করীমের খতম আদায় করা ছুন্নাতে ওছমানী।

ফতোওয়ায়ে শামী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। লাইলাতুল ক্বদরের ফাযীলত পাওয়ার আশায় ২৭শের রাতেই তারাবীহ্র নামাযের খতমে কোরআন আদায় করা মুস্তাহাব।

হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রঃ)-এর থেকে হাছন (রঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

তারাবীহ্র প্রত্যেক রাকা'তে দশ আয়াত বা তদপেক্ষা কিছু বেশী পড়বে।[১]

✪ পুরা কোরআন করিম খতম না করে যদি কিছু ছুরা আয়াত দ্বারা তারাবীহ্র নামায আদায় করার ইচ্ছা হয় তাহলে নিম্ন পদ্ধতিতে করাই ভাল, ছুরা ফাতেহার পর ছুরা ফীল তথা আলাম তারা হতে ছুরা নাছ পর্যন্ত কে দু'বার দোহরায়ে ২০ রাকা'ত তারাবীহ্র নামায আদায় করা উত্তম। কেননা এতে রাকা'তের হিসাব ইত্যাদির বেলায় বেশী চিন্তা করা লাগেনা, (শামী, আলমগীরী, বাহরুর রায়েক)।

✪ তারাবীহ্র নামাযে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কে দু'রাকাতের তাক্বীরে তাহরীমা বলার পর তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে "দোয়ায়ে ছানা" বাদ না দিয়ে বরং পাঠ করেই যেতে হবে।

টীকা ঃ

قال الزيلعى و منهم من استحب الختم فى ليلة السابع والعشرين رجاء ان ينالوا ليلة القدر لان الاخبار تظاهرت عليها ـ و قال الحسن عن ابى حنيفة رح يقرء فى كل ركعة عشر ايات و نحوها ـ و هو الصحيح لان السنة الختم فيهامرة و هو يحصل بذلك مع التخفيف ـ (شامى)

অনুরূপ ভাবে ইমামকে ছুরা ফাতেহা শুরুর আগে আউজু বিল্লাহ --- বিছমিল্লাহ --- পড়ে যেতে হয়, এবং ২ রাকা'তের বৈঠকে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের আত্তাহিয়্যাতু এর পর দরূদ এবং দোয়া ও পাঠ করা ভাল কিন্তু যদি মুক্তাদিগণ বিরক্তি বোধকরে তাহলে দরূদ শরীফ পাঠ করত ঃ দোয়ায়ে মাছুরা পাঠকেই শুধু বাদ দিতে পারে। (দোররুল মোখতার, শামী)

✪ ওজর নয় বরং অলসতা বশত ঃ যদি মুক্তদিগণ বসে থেকে ইমাম রুকুতে যাওয়ার পূর্বক্ষণে দাড়িয়ে ইমামের সাথে রুকু ছজদা করত ঃ তারাবীহ্র নামায আদায় করে তাহলে তার নামায মাকরূহ হবে। ফেকাহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব ফতোওয়ায়ে শামীতে একে মাকরূহে তাহরীমা বলা হয়েছে।[১]

✪ এশা ও বিতির এক ইমামের পিছনে আর তারাবীহ অন্য ইমামের সাথে আদায় করা জায়েজ। যেমন ঃ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এশা ও বিতিরের ইমামতি করতেন আর হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তারাবীহ্র নামাযের ইমামতি করতেন।

✪ যদি কোন লোক ইমামের সাথে তারাবীহ্র কতেক রাকা'ত না পেয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মতানুসারে সে লোক জামাতের সাথে বিতিরের নামায আদায় করতে পারবে।

✪ যদি কোন লোক ইমামের সাথে ৪ কি ৮ রাকা'ত তারাবীহর নামায না পেয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে ইমামের বিতির আদায়ের মুহূর্তে ঐ লোক যদি ছুটে যাওয়া

টীকা ঃ

(قوله كما يكره الخ) ظاهره انها تحريمة للعلة المذكورة - و فى البحر عن الخانيه - يكره للمقتدى ان يقعد فى التراويح - فاذا اراد الامام ان يركع يقوم لان فيه اظهار التكاسل فى الصلوة والتشبه بالمنافقين - قال تعالى "واذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالى" -

তারাবীহর রাকা'তসমূহ আদায় করতে যায় তাহলে ইমামের সাথে বিতিরের জামা'ত না পাওয়ার আশংকা হয়, এক্ষেত্রে সে লোক আগে ইমামের সাথে বিতির পড়ে নিবে অতঃপর তারাবীহর বাকী রাকা'তগুলো একা একা আদায় করবে।[১]

✪ যে কোন মছজিদে একবার জামা'ত সহকারে তারাবীহ্র নামায আদায় হয়ে থাকলে সে মছজিদে পুনরায় জামা'ত সহকারে তারাবীহ্র নামায আদায় করা মাকরূহ। (আলমগীরী)।

✪ বিশেষ তাকিদী ছুন্নাত নামায হওয়ার কারণে বিনা ওজরে বসে বসে তারাবীহ্র নামায আদায় করা মাকরূহ। (দুর্‌রে মোখতার)।

✪ নির্ধারিত সময়ে তারাবীহ্র নামায আদায় করতে না পারলে বিশুদ্ধ মতানুসারে এর কাযা আদায় করা লাগেনা। (বাহ্‌রুর রায়েক, আলমগীরী মারাকিউল ফলাহ)

তাহাজ্জুদের নামায

তাহাজ্জুদের নামায "কেয়ামূল লাইল" তথা রাত জাগরনের অন্তর্ভূক্ত এবাদত সমূহের একটি অন্যতম এবাদত।

কোন কোন হাদীছ শরীফে একে "ছালাতুল লাইল" (রাতের নামায) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোরআন করিমে অত্র নামায কে "তাহাজ্জুদ" হিসাবে ও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় هَجَدَ (হাজাদা) يَهْجُدُ (এয়াহজুদু) এর অর্থ রাতে নিদ্রা যাওয়া ও জাগরিত থাকা এই পরস্পর বিপরিত দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মদারেজুন্ নুবুয়্যাত গ্রন্থে বলা হয়েছে تَهَجُّدْ (তাহাজ্জুদ) এর অর্থ নিদ্রা ত্যাগ করা যেমন ভাবে تَأَثَّمْ এর অর্থ গুনাহ পরিত্যাগ করা تَحَنُّثْ এর অর্থ পাপ পরিত্যাগ করা।

তাহাজ্জুদের নামায যেহেতু রাতে নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়েই আদায় করা হয় এ জন্য এ নামাযকে তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়।

✪ ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ পর্যায়ের নামায। কেননা হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইচ্ছাকৃত ভাবে এ নামায কখনো তরক করেননি।

যদি কোন কারণে হুজুরপুরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম রাতে অত্র নামায আদায় করতে না পারতেন তখন তিনি দিনে ঐ পরিমান নামায আদায় করে দিতেন।

টীকা ঃ (১) لَوْصَلَّى الْعِشَاءَ وَحْدَهُ فَلَهُ اَنْ يُّصَلِّىَ التَّرَاوِيْحَ مَعَ الْاِمَامِ وَ هُوَ الصَّحِيْحُ حَتّٰى لَوْ دَخَلَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْاِمَامُ الْفَرْضَ وَ شَرَعَ فِى التَّرَاوِيْحِ فَاِنَّهُ يُصَلِّى الْفَرْضَ اَوَّلًا وَحْدَهُ ثُمَّ يُتَابِعُهُ فِى التَّرَاوِيْحِ (شرح منية)

pdf By Syed Mostafa Sakib

◆ তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত ঃ

এর ফযীলত অপরিসীম, ওয়াক্তিয়া নামাযের পর যে সব ছুন্নাত– নফল নামায রয়েছে তন্মধ্যে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের নিকট তাহাজ্জুদই হল অধিক প্রিয় নামায।

বিশুদ্ধ মতানুসারে মে'রাজ রজনিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগে তাহাজ্জুদের নামায হুজুর আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর ফরয ছিল।

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে কোরআন করিমের অনেক আয়াত এবং নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের অসংখ্য হাদীছ শরীফ সমূহ রয়েছে।

নিম্নে কোরআন করিমের ২/৩ খানা আয়াত ও কয়েকটি মূল্যবান হাদীছ শরীফ পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে–

✪ আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর প্রকৃত প্রেমিক ও আবেদ বান্দাগণের পরিচিতি দিতে গিয়ে কোরআন করিমে এরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ۔ (سورة الفرقان)

অর্থাৎ, যারা মহান আল্লাহ তাআলার সামনে ছজ্দারত ও দন্ডায়মান অবস্থায় রাত যাপন করে অর্থাৎ যারা তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের মাধ্যমে রাত জাগরণ করত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকে তারাই রহমানুর রহিম আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বান্দা।

✪ অপর একখানা আয়াতে আল্লাহ পাক ছুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ঃ-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۔ (سجدة)

অর্থাৎ, মো' মেনদের গুনাগুণের মধ্যে ইহাও একটি যে, "তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে ভয় ও আশায় তারা তাদের প্রভূকে ডাকে।

অধিকাংশ মুফাছছেরীনে কেরামগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহকে ডাকার বাস্তব নমূনা হচ্ছে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে আরাধনা করা– যা নিদ্রাথেকে জাগরিত হওয়ার পর গভীর রাতে আদায় করা হয়ে থাকে।

✪ অপর আয়াতে করিমায় আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۔

অর্থাৎ, যে লোক রাতের কালে দাড়িয়ে বা ছজদা আদায়ের মাধ্যমে আনুগত্যশীল মন অন্তর নিয়ে (আল্লাহর এবাদত করে)।

অর্থাৎ, যারা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে পরকালের ভয় ও স্বীয় প্রভূর অপার রহমত করুনা প্রাপ্তির আশায়– আর যারা তা করেনা তাদের উভয়ের মধ্যে কে উত্তম?

উত্তরে অবশ্যই বলতে হবে যে, তাহাজ্জুদের নামায আদায়কারী মো'মেনই নিঃসন্দেহে উত্তম।

✪ আর একখানা আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ, প্রকৃত ও খাঁটি প্রেমিক মো'মেন বান্দাগণ রাতের শেষাংশে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের মাধ্যমে)

✪ আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۔

অর্থাৎ ওহে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি আপনার প্রভূর বেশী বেশী নৈকট্য ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাতে কোরআন করিম পাঠ করে করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন

এতে আপনার প্রভূ অনতি বিলম্বে (পরকালে) আপনা কে "মকামে মাহমূদ" তথা প্রশংসিত মহান আসনে সমাসীন করবেন।

অত্র আয়াতে করিমা দ্বারা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাঁর উম্মতগণকেই অত্র নামায আদায়ের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

✪ তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ ۔

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, ফরয নামাযের পর শ্রেষ্ঠতর নামায হচ্ছে গভীর রাতের তাহাজ্জুদের নামায।

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ অন্য একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَ قُرْبَةٌ اِلٰى رَبِّكُمْ وَ مَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثَامِ وَ تَكْفِيْرٌ لِلسَّيِّاٰتِ وَ مَطْرُوْدَةُ الدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ .

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমরা (তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ কর, কেননা ইহা পূর্ব যুগের ছালেহীন বান্দাদের তারীকা, মহান আল্লাহ পাকের পরম নৈকট্য লাভের উপায়, পাপ-গুনা থেকে বাধা প্রদান কারী, পাপ মোছনের কাফফারা স্বরূপ এবং শরীরের রোগ-ব্যাধী দুরিভূতকারী

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّ اللّٰهُ لِمَنْ اَلَانَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ تَابَعَ الصِّيَامَ وَ صَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ۔ (البيهقى)

অর্থাৎ, যারা লোকদের সাথে নম্রভাবে কথা বলে, যারা (ক্ষুধার্তকে) পানাহার করায়, যারা লাগাতার রোজা রাখে এবং যারা শেষ রাতে– যে সময় অন্যান্য লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে থাকে এদের সবার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে এমন স্বচ্ছ ও মনোরম প্রাসাদ তৈয়ার করে রেখেছেন যার বাইরের সামগ্রী সমূহ ভিতর থেকে এবং ভিতরের সামগ্রী সমূহ বাহির থেকে দেখা যায়।

✪ অপর একটি হাদীছ শরীফে উল্লেখ রয়েছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ ۔ (ترمذى)

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন, রাতের শেষার্ধের মধ্য ভাগে রাব্বুল আলামীন আপন বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন। অতএব যারা এ মূহুর্তে মহান আল্লাহর জিকির স্মরণে নিমগ্ন থাকে তুমিও যদি পার তাহলে তাদের ন্যায় তোমাকেও আল্লাহর জিকির স্মরণে নিয়োজিত কর।

✪ মুছলিম শরীফ হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত অপর এক হাদীছে হুজুর পুর নূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন , নিশ্চয় প্রতিরাতে এমন এক শুভ মূহুর্ত রয়েছে যদি কোন মুছলিম বান্দা ঐ মূহুর্তে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে (তাহাজ্জুদের নামায আদায়ান্তে) ইহ পরকালীন কোন কিছু চেয়ে প্রার্থনা জানায় মহান আল্লাহ অবশ্যই তাকে উহা দান করে থাকেন। প্রতি রাতেই এ ধরণের একটি মূহুর্ত এসে থাকে।

✪ অন্য একটি হাদীছ শরিফে বর্ণিত আছে ঃ-

আল্লাহর প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেনঃ হযরত ছোলাইমান (আঃ) এর মা তাকে লক্ষ্য করে বলেন হে বৎস! রাতে অধিক ঘুমাইওনা কেননা রাতের অধিক নিদ্রা লোকদের কে কেয়ামতের বিচার দিবসে ফাকীর (দরিদ্র) বানিয়ে ছাড়বে (কাশফুল গুম্মা)

✪ এভাবে আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক ছোবহানাহু ওয়া তাআলা হযরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি ওহি নাজেল করে বলেন যে, হে দাউদ!

ঐ লোক মিথ্যাবাদী যে আমাকে ভালবাসে বলে দাবী করে অথচ সে গভীর রাতে আমাকে পরিত্যাগ করত ঃ নিদ্রা মগ্ন থাকে।

✪ অন্য একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, যে লোক নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে থাকেন– তার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ তাআলা তার কবরকে সত্তর গজ সুপ্রশস্থ করেদেন। (দারমী শরীফ)

✪ পরিশেষে অপর একটি মূল্যবান হাদীছ শরীফের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যাতে আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اِذَا بَقِىَ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ مَنِ الَّذِىْ يَدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبُ لَهٗ وَ مَنِ الَّذِىْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرُلَهٗ وَ مَنِ الَّذِىْ يَسْتَرْزِقُنِىْ فَارْزُقُهٗ وَ مَنِ الَّذِىْ يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ فَاَكْشِفُهٗ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ ۔ (غنية الطالبين) صفحه ٧٥٥ ج ٢

অর্থাৎ রাতের তিনাংশের শেষাংশে পরম করুনাময় আল্লাহ জাল্লা শানুহু বান্দাদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান হয়ে প্রথম আছমান থেকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন(হে আমার প্রেমিক বান্দারা!)

এ মুবারক মূহুর্তে আমার শাহী দরবারে নিজের মাকছুদ নিয়ে প্রার্থনা জানাবার কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছে! আমি প্রভূ তার প্রার্থনা কবুল করে নিতাম! নিজের পাপ -গুনার জন্য ক্ষমা প্রার্থী কে আছে! আমি তার পাপ রাজি মার্জনা করে দিতাম। আমার দরবারে রিজিক প্রার্থনা কারী কে আছে! আমি তাকে রুজি দান করতাম বিপদ মুক্তির প্রার্থনা জানাবার কে আছে! আমি তাকে বিপদ- রোগ থেকে মুক্তি দিতাম। এভাবে আহবান জানোনোর মাধ্যমে ফজর হয়ে পড়ে।

সম্মানিত পাঠক!

উপরে উদ্ধৃত মহা মূল্যবান কোরআন করীমের বানী ও হাদীছ শরীফ সমূহ দ্বারা এ বিষয়টি বুঝে নিতে মোটেই কষ্ট হয়না যে, তাহাজ্জুদের নামায একজন মো'মেন বান্দার জন্য কতইনা গুরুত্ব পূর্ণ এবাদত।

◆ তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাতের সংখ্যা ঃ

দুররোল মোখ্তার, ফাত্হুল কাদীর, শামী ও আলমগীরী ইত্যাদি ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সমূহে বিশুদ্ধ হাদীছ শরীফ সমূহের বরাতে তাহাজ্জুদ নামাযের রাকা'তের সংখ্যা উর্দ্ধে ৮ রাকা'ত, মধ্যম ৪ রাকা'ত এবং কম পক্ষে ২ রাকা'ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর দিকে গুনিয়াতুত্ তালেবীন, ও মালাবুদ্দা মিন্হু' কিতাবদ্বয়ের বর্ণনামতে তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাতের সংখ্যা উর্দ্ধে ১২ রাকা'ত বলে বুঝা যায়,[১] তবে উর্দ্ধ সংখ্যায় ৮ রাকা'তের বর্ণনাটাই অধিক গ্রহণ যোগ্য রূপে সুপ্রমানিত।[২]

টীকা ঃ (১)

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عُنْهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَغَبَهُ نَوْمٌ اَوْ مَرَضٌ فَلَمْ يُقُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ صَلّٰى بِالنَّهَارِ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً ـ (غنية الطالبين)

(২)

وَهٰذَا بِنَاءٌ عَلٰى اَنَّ اَقَلَّ تَهَجُّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَكْعَتَيْنِ وَاَنَّ مُنْتَهَاهُ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ اُخِذَ مِمَّا فِىْ مَبْسُوْطِ السَّرْخَسِىْ ـ فَيَنْبَغِىْ اَلْقَوْلُ بِاَنَّ اَقَلَّ التَّهَجُّدِ رَكْعَتَانِ وَاَوْسَطُهُ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَاَكْثَرُهُ ثَمَانٍ والله اعلم (شامى)

তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের সময় ঃ

✪ দ্বিপ্রহর রাত তথা মধ্যরাতের পর হতে আরম্ভ করে ছোব্হে ছাদেক তথা ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার সময়।

✪ তবে এ ব্যাপারে উত্তম তারীকা হচ্ছে ঃ

যদি কোন লোক রাতের তিন অংশের এক অংশ জাগরণ থাকার ইচ্ছা করে তাহলে রাতকে তিন অংশ করত ঃ প্রথম অংশে এশা'র নামায আদায়ের পর ঘুমাতে হয় অতঃপর ২য় অংশে জাগরিত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায ও তাছবীহ্ তাহলীল আদায় করতঃ তৃতীয় অংশে পুন: ঘুমাতে হয় ছোবহে ছাদেক হলে উঠে ফজরের নামায আদায় করে নিতে হয়।

✪ আর কেউ যদি অর্ধরাত জাগরণের ইচ্ছা করে তাহলে প্রথম অর্ধেকে ঘুমাতে হয় এবং শেষের অর্ধেকে জাগরিত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায ও দোয়া দরূদ ইত্যাদি আদায় করে যেতে হয়।

✪ সব চেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে ঃ রাতকে মোট ছয় অংশে ভাগ করত: এর প্রথম তিন অংশে ঘুমাতে হয়, চতুর্থ অংশে জাগরিত হয়ে এ চতুর্থ এবং পঞ্চম অংশে তাজাজ্জুদের নামায ও তাছবীহ্ তাহ্লিল এবং দরূদ দোয়া মুনাজাত ইত্যাদি করে যেতে হয় অতঃপর রাতের ৬ষ্ঠ অংশে তথা শেষাংশে হালকাভাবে শয়ন করতে হয়। বোখারী-মুসলিম শরীফে বর্ণিত ছহী হাদীছে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নামায হচ্ছে হযরত দাউদ (আঃ) এর নামায,তিনি অর্ধরাত শয়ন করতেন অত:পর তৃতীয় অংশে জাগরিত হয়ে এবাদত করতেন এরপর রাতের ৬ষ্ঠাংশে পুন: নিদ্রা যেতেন।[১]

টীকার বাকি অংশ ঃ

ثم ظاهر كلامه فى المبسوط ان منتهى تهجده عليه السلام ثمان ركعات واقله ركعتان فانه قال روى انه عليه السلام كان يصلى من الليل خمس ركعات/ سبع ركعات/احدى عشرة ركعة/ ثلث عشرة فالذى قال خمس ركعات ركعتان صلوة الليل و ثلث وتر/ والذى قال سبع ركعات اربع صلوة الليل و ثلث وتر/ والذى قال تسعا ست و ثلث/ و قال احدى عشرة ثمان و ثلث والذى قال ثلث عشرة ثمان صلوة الليل و ثلث وتر وركعتان سنة الفجر ـ (شرح منيه)

(١) و ذكر ان الافضل من الثلث الاوسط/ومن السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه احب الصلوة الى الله تعه صلوة داؤد كان ينام نصف الليل و يقوم ثلثة و ينام من سدسه و به جزم فى الحليه (شامى)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে এ ক্ষেত্রে সর্তক থাকতে হবে যে, ৬ষ্ঠাংশ তথা রাতের শেষাংশে ঘুমাতে গিয়ে যেন ফজরের নামায কাযা হয়ে না পড়ে।

তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর রাতের শেষাংশে ঘুমানোর ছুন্নাত আদায় করতে গিয়ে যদি ফজরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে তাহাজ্জুদের পর পুন: নিদ্রামগ্ন না হয়ে ফজরের নামাযের জন্য অপেক্ষা করত: তা আদায় করে নেওয়াটাই উত্তম।

কারণ তাহাজ্জুদের পর ঘুমাতে গিয়ে যদি ফজরের নামায কাযা হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদের ফায়দা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।

✪ আল্লাহর প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য নিদ্রা থেকে উঠার পর নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করতেন ঃ-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ
وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ
حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ
خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ
وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ (مشكوة شريف) بخاری مسلم

অপর একটি হাদীছে উপরুল্লেখিত দোয়ার সাথে নিম্নের দোয়া খানা কে সংযুক্ত করেই বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ .... اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا
اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ
فَاِنَّهٗ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّاٰتِهَا فَاِنَّهٗ لَا يَصْرِفُ
سَيِّاٰتِهَا اِلَّا اَنْتَ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْبَائِسِ الْمِسْكِيْنِ وَاَدْعُوْكَ دُعَاءَ
الْمُفْتَقِرِ الذَّلِيْلِ فَلَا تَجْعَلْنِيْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَكُنْ بِيْ رَؤُوْفًا رَحِيْمًا
يَا خَيْرَ .... الْمَسْئُوْلِيْنَ وَاَكْرَمَ الْمُعْطِيْنَ. (غنية الطالبين)
صفحہ ۷۸۳ ج ۲

✪ অন্য এক হাদীছের বর্ণনায় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে ঃ

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ فَاغْفِرْ لِيْ
وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ
وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ
يَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَيُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ
عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ
اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ جَارٍ
فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَائُكَ هٰذِهٖ يَدَايَ بِمَا كَسَبَتْ وَهٰذِهٖ نَفْسِيْ
بِمَا اجْتَرَحَتْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. عَمِلْتُ
سُوْءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيَ الْعَظِيْمَ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّيْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ. (غنية الطالبين) صفحہ ۷۸۲ ج ۲

অপর এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর প্রিয় রাছূল (দঃ) তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য জাগরিত হলে বলতেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَاَسْئَلُكَ
رَحْمَتَكَ اللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ
لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. (ابو داؤد)

০ অন্য একটি হাদীছ শরীফে আছে আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন তখন তিনি দশবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহাম্‌দু লিল্লাহ্‌) দশবার
(ছোবহানাল্লাহীওয়া বিহাম্‌দিহী) দশবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ (ছুবহা-নাল

মালিকিল কুদ্দুছি), দশবার أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (আছতাগফিরুল্লাহ), দশবার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলতেন, অতপর বলতেন اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিকা মিন দাইকিদ্ দুনইয়া ও দাইক ইয়াউমিল কিয়ামাহ্) বলতেন অত:পর নামায আরম্ভ করতেন (আবুদাউদ)।

০ অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যখন প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ব্যাপারে মনোযোগী হতেন, তখন তিনি বলতেন–

اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

অতপর দশবার سُبْحَانَ اللّٰهِ (ছোবহানাল্লাহ) দশবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) দশবার لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) বলতেন এরপর

اَللّٰهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْقُدْرَةِ ـ

(আল্লাহু আকবর জুলমালাকুতি ওয়াল্ জাবারুতি ওয়াল কিবরিয়ায়ী ওয়াল্ আজমাতি ওয়াল জালালী ওয়াল্ কুদরাতি।) বলতেন।

তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের নিয়ম ঃ

তাহাজ্জুদ নামায এক নিয়্যতে দু'দু'রাকা'ত করেই আদায় করা উত্তম, এক নিয়্যতে চার চার রাকা'ত করে ও পড়া যায়।

এভাবে ইতিপূর্বেকার বর্ণনা অনুযায়ী কমপক্ষে দু'রাকাত, মধ্যমে ৪ রাকা'ত বেশী তে ৮ কিংবা ১২ রাকা'ত নামায আদায় করে যেতে হয়।

নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيِ (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ نَفْلٌ مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ ـ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ـ

✪ প্রত্যেক রাকা'তে যে কোন ছূরা বা আয়াত পাঠ করা যায়।

তবে কোন কোন ফেকাহ্ গ্রন্থে সহজ পদ্ধতিতে ছূরা এখলাছ (কুল্‌হুয়াল্লাহু আহাদ) দ্বারা আদায় করার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক রাকা'তে ছূরা এখলাছ ৩ বার ৫ বার কিংবা ৭ বার পাঠ করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক রাকা'তে সমান সংখ্যায় ও বেজোড় হওয়া ভাল (কবীরী)।

তবে "তাফছীরে আজীজী" এরমধ্যে তাহাজ্জুদ নামাযে ছূরা এখলাছ পাঠ করার ব্যাপারে হযরাত মশায়েখীনে কেরাম থেকে একটা সুন্দর নিয়মের উল্লেখ দেওয়া হয়েছে তাহচ্ছে প্রথম রাকা'তে ছূরা এখলাছ ১২ বার, ২য়, রাকা'তে ১১ বার এভাবে প্রত্যেক আগের রা'কাত থেকে পরের রাকা'তে একবার একবার কম করে পাঠ করে যেতে যেতে নামায যদি ১২ রাকা'ত হয় তাহলে একেবারে শেষের রাকা'তে ১ বার ছূরা এখলাছ দ্বারা নামায শেষ করতে হয়।

এশরাক ও দোহা (চাশত) এর নামায ঃ

বেলা বৃদ্ধি পাওয়াকে আরবীতে ضحوى (দোহ্ওয়া) বলা হয়। সূর্য উদয়ের পর থেকে সূর্য ঠিক মাথার উপর এসে স্থীর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়টাই দোহার অন্তর্ভূক্ত।

প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ নাছায়ী শরীফের একটি হাদীছের মর্মে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম উক্ত সময়ের ভিতর দু'বার করে কিছু কিছু নফল নামায আদায় করতেন এ উভয় নামাযই "ছালাতুদ্ দোহা" এর অন্তর্ভুক্ত, কতেক ফোকাহায়ে কেরামের পরিভাষায়

একটি কে "এশরাক" ও অন্যটিকে "চাশত" এর নামায বলা হয়। তবে সাধারণ লোকের প্রচলিত পরিভাষায় দোহার নামায বলতে চাশ্তের নামায কেই বুঝায়।

এ উভয় নামাযের নিয়ম পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদী নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

এশ্রাক এর নামায ঃ

ভোর বেলায় সূর্য ভালরূপে উদিত হয়ে পড়ার পর যখন সূর্যের কিরণ কিছুটা গরম হয়ে উঠে আনুমানিক ২২/২৫ মিনিট পর থেকে "এশরাক" এর নামায আদায়ের সময় আরম্ভ হয় এবং সূর্য উদয় হতে আরম্ভ করে এক/দেড় / দু-ঘন্টা পর পর্যন্ত এর ওয়াক্ত (সময়) বাকী থাকে।

উক্ত নামাযের ফাযীলত সম্পর্কে আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (ترمذى)

অর্থাৎ যে লোক জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করার পর সূর্য উদয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

হওয়া পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর তাছবীহ-তাহলীল ও দোয়া দরূদ পাঠ করতে থাকে এবং সূর্য পুরা পুরি উদিত হয়ে পড়ার পর দু'রাকাত নামায আদায় করে থাকে ঐ লোক এর বিনিময়ে এক হজ্জ ও এক ওমরার সমান ছাওয়াব পাবে।

এ শরাক এর নামায কমপক্ষে ২ রাকাত পড়া লাগে এবং বেশীতে ৪ রাকাত আদায় করা যায়। কোন কোন কিতাবে ৬ রাকাতেরও বর্ণনা পাওয়া যায়।

নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ نَفْلُ (سنت) رَسُوْلُ اللّٰه تعالى متوجها الى جهة الكعبة الشريفة الله اكبر ـ

নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ছূরা কেরাত পাঠ করা যায়।

চাশ্‌ত এর নামায ঃ

প্রচলিত ভাষায় একেই দোহার নামায বলা হয়। ফারছী ভাষায় একে চাশ্‌ত এর নামায বলা হয়।

সূর্য যখন এক প্রহরের উপরে উঠে অর্থাৎ এশ্‌রাকের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর তথা সূর্যোদয়ের অনুমানিক দুই / আড়াই ঘণ্টা পর থেকে দোহা তথা চাশ্‌তের নামায আদায় করার সময় আরম্ভ হয় এবং সূর্য ঠিক মাথার উপর স্থীর হওয়ার আগ পর্যন্ত এর সময় বাকী থাকে।

দোহা তথা চাশ্‌তের নামাযের ফাযীলত ঃ

চাশতের নামাযের অনেক ফাযীলত রয়েছে, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ "চাশতের নামায আর দারিদ্রতা একত্রে হতে পারে না।"

✪ অপর এক হাদীছ শরীফে বলা হয়েছেঃ কারোগুনাহ যদি সমূদ্রের ফেনা সমতূল্য অর্থাৎ অত্যন্ত বেশী হয়ে থাকে আর সে বান্দা যদি নিয়মিত চাশত এর নামায আদায় করে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে তার ঐ সব গুনাহ মাফ করে দেন।

✪ হাদীছে পাকে আরো বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা অতি কৌশলে মানব জাতির দেহ-শরীরকে ৩৬০ টি জোড়া দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

মানুষকে তাই তার প্রত্যেক জোড়ার শোকরিয়া স্বরূপ দৈনিক কম পক্ষে ৩৬০ বার তাছবীহ পাঠ করে যাওয়া উচিৎ আর এর বিকল্প স্বরূপ দৈনিক কমপক্ষে চার রাকাআত চাশ্‌তের নামায আদায় করলে ৩৬০ জোড়ার ছদ্‌কা হয়ে যায়।

চাশ্‌তের নামায আদায়ের নিয়ম ঃ

হাদীছ শরীফ সমূহের বর্ণনা মতে উক্ত নামায নিম্ন সংখ্যায় ২ রাকাত, মধ্যম সংখ্যায় ৪/৮ রাকাত এবং উর্দ্ধে ১২ রাকাআত পর্যন্ত আদায় করা যায়।

ফোকাহায়ে কেরাম ও মাশায়েখে তারীকতগণ ৪ রাকাত চাশ্‌তের নামায আদায়েই অভ্যস্থ।

একই নিয়্যতে চার রাকাআত করে আদায় করা উত্তম।

নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ (اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ) صَلٰوةِ الضُّحٰى نَفْلُ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

যে কোন ছূরা আয়াত দ্বারা উক্ত নামায আদায় করা যায়। তবে কারো কারো মতে ১ম রাকাতে ছূরা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى (ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আ'লা) একবার, ২য় রাকাতে ছূরা وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا (ওয়াশ্‌ শামছি ওয়দুহা-হা) একবার, তৃতীয় রাকাতে ছূরা وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى (ওয়াল লাইলি) একবার ৪র্থ রাকাতে ছূরা والضحى (ওয়াদ্দোহা) একবার পাঠ করত ঃ উক্ত নামায আদায় করে যাওয়া উত্তম।

কোন কোন বুজুর্গানে দ্বীনের মতে নামাযের ছালাম ফিরানোর পর ১বার আয়াতুল্ কুরছি, "আমানার রাছূলু বিমা উন্‌যিলা" হতে শেষ পর্যন্ত ১বার, "কুলিল্লাহুম্মা মা-লিকাল মুল্‌কি হতে ওয়াতারজুকু মান্ তাশাউ বেগাইরি হিসাব" পর্যন্ত এবং তিনবার আয়াত কুতুব সমূহ পাঠ করত ঃ ১০০ শত বার দরূদ শরীফ পাঠ করে মুনাজাত করা অধিক উত্তম।

ছালাতুল আউওয়াবীন ঃ

اَوَّابِيْنَ (আউওয়াবীন) শব্দটি اَوَّابٌ (আউওয়াবুন্) এর বহু বচন, অর্থ (মহান আল্লাহর দিকে) প্রত্যাবর্তন কারী ও আশ্রয় গ্রহণকারী গণ তথা পাপ-গুনা থেকে তৌবা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কারীগণ।

এ নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দা মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দিকে প্রত্যাবর্তন করত ঃ প্রভূর পরম নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জণ করে বিধায় এ নামাযের নাম করণ করা হয়েছে "ছালাতুল আউওয়াবীন"।

✪ এ নামাযের গুরুত্ব ও ফাযীলত অপরিসীম। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ عَدَلْنَ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً (غنية الطالبين) (ترمذى)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাগরিব নামাযের পর মাঝখানে কোন প্রকারের দুনিয়াবী কথা বার্তা না বলে ছয় রাকা'ত নফল নামায আদায় করবে তা'কে ১২ বৎসরের নফল এবাদতের সমান ছাওয়াব দেওয়া হবে।

✪ অন্য একটি হাদীছ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছের (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন–আমি আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে দেখেছি, তিনি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকা'ত নফল নামায আদায় করতেন এবং সাথে সাথে তিনি এও এরশাদ করেছেন, যে কোন লোক মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকা'ত নফল নামায আদায় করবে, তার পাপ-গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সমতূল্য হলে তাও মাফ হয়ে যাবে। (তাব্‌রানী)

আউওয়াবীন নামাযের ওয়াক্ত ও রাকা'ত সংখ্যা ঃ

অত্র নামাযের ওয়াক্ত মাগরীবের ফরয ও ছুন্নাত নামায আদায়ের পর হতে শুরু হয়ে এশার ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত থাকে।

অধিকাংশ হাদীছের বর্ণনা মতে আউওয়াবীন এর নামায ছয় রাকা'ত মাত্র, কোন কোন হাদীছ শরীফে বিশ রাকা'তের বর্ণনা ও পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ মাশায়েখীনে ইজাম ছয় রাকা'ত করেই আদায় করে আসছেন।

এ নামায দু'দু রাকা'ত করেই আদায় করা ভাল। যে কোন ছুরা আয়াত দ্বারা ইহা আদায় করা যায়। তবে কোন কোন বুজর্গানে দ্বীন ও মাশায়েখে তারীকতগণ সহজ পদ্ধতিতে প্রতি রাকা'তে তিন বার করে ছুরা এখলাছ পাঠ করত ঃ ছয়রাকা'ত নামায আদায় করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এমনিভাবে কোন কোন কিতাবে ১ম রাকা'তে ছুরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরছী একবার ও দ্বিতীয় রাকা'তে ছুরা এখলাছ তিনবার পাঠ করার বর্ণনাও রয়েছে। এভাবে মোট ছয় রাকা'ত নামায তিন নিয়্যাতে আদায় করে যেতে হয়। ছয় রাকা'ত শেষে ছালাম ফিরানোর পর বসে নিম্নের দোয়া খানা একবার পাঠ করা উত্তম।

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

(আল্লাহুম্মা এয়া মুকাল্লেবাল্ কুলূবি ছাব্বিত্ কাল্‌বী আলা দ্বীনিকা।)

অর্থঃ হে অন্তর সমূহের পরিচালক আল্লাহ ! আপনিই অন্তর সমূহের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী। আপনি আমার কলব কে স্বীয় দ্বীন (ইছলাম) এর উপর স্থীর রাখুন।

এরপর নিজের মুরশিদে কিব্‌লা কর্তৃক প্রদত্ত দরূদ শরীফ, ও জিকির আজকার আদায়ে মাশগুল হয়ে পড়বে যাতে মহা প্রভূ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে ঘোষিত إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ জাল্লাশানুহু তার নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী প্রত্যাবর্তনকারী তথা আউওয়াবীনের নামায আদায় কারী বান্দাগণ কে মার্জনা করবেন) এর সুভসংবাদ প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়।

ছালাতুত্ তাছবীহ্ (তাছ্‌বীহ্‌র নামায)

ইহা চারি রাকা'ত বিশিষ্ট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নফল নামায।

এ নামাযের প্রতি রাকা'তে,

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ـ

(ছুবহা-নাল্লাহি ওয়াল্ হামদু লি'ল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর) এ তাছবীহ্ টি ৭৫ বার করে পাঠ করতঃ পুরা নামাযে (৪×৭৫) সর্ব মোট ৩০০ শত বার পড়া হয় বলে এর নাম হয়েছে "ছালাতুত তাছ্‌বীহ" (তাছবীহ্‌র নামায)।

✪ এ নামাযের ফাযীলত বর্ণনাতীত, হুজুর পুরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একদা তার প্রিয় চাচা হযরত আব্বাছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বল্লেন হে চাচাজান ! আমি কি আপনাকে এমন একটি আমল-কাজের কথা বাত্‌লিয়ে দেবনা ? যা পালন করলে আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের জীবনের ও পরের জীবনের নূতন– পুরাতন ইচ্ছাকৃত–অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ্য ও গোপনীয়, ছাগীরা -কবীরা সর্ব প্রকারের পাপ–গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। উত্তরে হযরত আব্বাছ বললেন হ্যাঁ নিশ্চয় বলুন!

তখন আল্লাহর প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আব্বাছ (রাঃ) কে ছালাতুত্ তাছবীহর তালিম দান করলেন, অতঃপর আল্লাহর প্রিয় হাবীব (দঃ) আরো বললেন ! প্রিয় চাচা! আপনি যদি পারেন এ নামায প্রতিদিন একবার করে আদায় করুন, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে প্রত্যেক জুমা তথা সপ্তাহে একবার করে আদায় করুন, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে প্রত্যেক মাসে একবার করে আদায় করুন, তাও যদি সম্ভব পর না হয় তাহলে প্রতিবৎসরে একবার করে আদায় করুন, এও যদি না হয় তাহলে অন্ততঃ জীবনে একবার হলেও আদায় করুন। প্রিয় পাঠকমন্ডলী! অত্র পবিত্র হাদীছের উপর আমল করার জন্য স্বচেষ্ট থাকা আমাদের সকলের জন্য একান্ত উচিৎ।

✪ অত্র নামায আদায়ের জন্য নির্ধারিত কোন ওয়াক্ত নাই। দিবা-রাতের প্রত্যেক সময়েই এ নামায আদায় করা যায়। তবে জোহরের নামাযের আগেই আদায় করাটা উত্তম (আলমগীরী)। হযরত গাউছুল আজম দস্তগীর (রঃ) বলেছেন জুমা বারে এ নামায দিনে একবার, রাতে একবার মোট দু'বারই আদায় করা মুস্তাহাব।

টীকা ঃ

(١) وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا فِي الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لَيْلًا وَمَرَّةً نَهَارًا (غنيه)

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা আলা আরবাআ রাকাআতি ছালাতিছ তাছবীহ ছুন্নাতু রাছুলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারিফাতি আল্লাহু আকবার।

পবিত্র হাদীছ শরীফের বর্ণনা অনুসারে অত্র নামায আদায়ের দু'টো নিয়ম রয়েছে ঃ

১ম নিয়ম ঃ ইহা তিরমিজী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মোবারক (রঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

নিয়্যত করতঃ তাকবীরে তাহরীমা বলে দোয়ায়ে ছানা (ছোব্হানাকা--) পাঠ করার পর এ তাছ্বীহ "ছুব্হানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর" ১৫ (পনর) বার পাঠ করতে হয়, অতঃপর যথা নিয়মে আউজু বিল্লাহ -- বিছমিল্লাহ ছূরা ফাতেহা এবং অন্য যে কোন ছূরা -আয়াত পাঠ করার পর এ দাড়ান অবস্থায় রুকুতে যাওয়ার আগে উক্ত তাছ্বীহ্ পুন ঃ ১০ বার পাঠ করতে হয়। রুকুতে গিয়ে রুকুর তাছ্বীহ আদায় করার পর উক্ত তাছ্বীহ ১০ (দশ) বার!

ছামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্ বলে রুকু থেকে উঠে "রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ বলে নেওয়ার পর ঐ দাড়ান অবস্থায় এ তাছ্বীহ ১০ (দশ) বার বলতে হয়। অতঃপর আল্লাহু আকবর বলে ছজদাতে গিয়ে ছজদার তাছ্বীহ্ আদায় করার পর এ তাছ্বীহ ১০ (দশ) বার, ১ম ছজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় উক্ত তাছ্বীহ্ ১০ (দশ) বার, অতঃপর আল্লাহু আকবর বলে ২য় ছজদাতে গিয়ে সিজ্দার তাছ্বীহ আদায় করার পর উক্ত তাছ্বীহ্ ছজদারত অবস্থায় ১০ (দশ) বার পাঠ করতে হয়।

এ নিয়মে পরের প্রতি রাকা'তে মোট ৭৫ বার করে চার রাকাতে (৪×৭৫) সর্বমোট ৩০০ শতবার উক্ত তাছ্বীহ পাঠ করত অত্র তাছ্বীহ্‌র নামায শেষ করতে হয়।

২য় নিয়ম ঃ ইহা হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

নিয়্যত করতঃ তাকবীরে তাহরীমা বলার পর দোয়ায়ে ছানা, আউজু বিল্লাহ --- বিছমিল্লাহ ---- এবং ছূরায়ে ফাতেহা ও অন্য যে কোন ছূরা পাঠ শেষে এ দাড়ান অবস্থায় উক্ত তাছ্বীহ ১৫ বার পাঠ করতে হয়। অতঃপর রুকুতে গিয়ে পূর্ব নিয়মে ১০ (দশ) বার, রুকু থেকে উঠে যথা নিয়মে সোজা হয়ে দাড়িয়ে ১০(দশ) বার, অতঃপর ১ম ছজ্দায় গিয়ে ১০ (দশ) বার, ছজ্দা থেকে উঠে বসা অবস্থায় ১০ (দশ) বার।

অতঃপর ২য় ছজদায় গিয়ে উহাতে উক্ত তাছ্বীহ্ ১০ (দশ) বার ২য় ছজদা থেকে উঠে বসে উক্ত তাছ্বীহ্ ১০ (দশ) বার পাঠ করতঃ ২য় রাকা'ত আদায়ের জন্য দাড়াতে হয়।

এ নিয়মে প্রতি রাকা'তে উক্ত তাছ্বীহ মোট ৭৫ বার করে পাঠ করত ঃ বাকী তিন রাকা'ত নামায শেষ করতে হয়।

যদিও উপরুল্লেখিত উভয় নিয়ম মাফিক ছালাতুত্ তাছ্বীহ্‌র নামায আদায় করা জায়েজ-তথাপি উভয় নিয়মের মধ্যে ১ম নিয়মটি আমাদের হানাফী মাজহাবের অনুকূলে হওয়ায় ঐ প্রথম নিয়ম মুতাবিকই উক্ত নামায আদায় করা আমাদের জন্য উত্তম।

কারণ আমাদের হানাফী মাজহাব অনুসারে যে কোন নামাযের প্রথম রাকা'তের উভয় ছজদা করে নেওয়ার পর বিলম্ব না করে দ্বিতীয় রা'কাত আদায়ের জন্য দাড়িয়ে যাওয়া এবং তৃতীয় রাকা'তের উভয় ছজদা করে নেওয়ার পর চর্তুথ রাকা'ত আদায়ের জন্য তাড়াতাড়ি দাড়িয়ে যাওয়া জরুরী।

১ম রাকা'তের উভয় ছজদা করে নেওয়ার পর বসে বা অন্য কোন কারণে দ্বিতীয় রাকা'তের জন্য দাড়াতে বিলম্ব করা মাকরূহ।

এ কারণে শর্‌হে মুনিয়া ও কেনিয়া নামক ফেকাহ্ শাস্ত্রের নির্ভর যোগ্য গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে অত্র ছালাতুত্ তাছ্বীহ আদায়ের ১ম নিয়মকেই পছন্দনীয় ও উত্তম বলা হয়েছে।

যেহেতু এ নিয়মে আদায় করলে ১ম রাকা'তের উভয় ছজদা করে নেওয়ার পর উক্ত নামাযের ঐ অতিরিক্ত তাছ্বীহ্ পাঠ করার জন্য বসার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ২য় নিয়মে আদায় করতে গেলে ১ম রাকাতের ২য় ছজদা করে নেওয়ার পর বসে উক্ত তাছ্বীহ পাঠ করত ঃ ২য় রাকাতের জন্য দাড়াতে হয় (গায়াতুল আওতার)

✪ উক্ত নামাযের যে যে স্থানে এ অতিরিক্ত তাছ্বীহ পাঠ করা নির্ধারিত আছে যদি ভুলক্রমে ঐ নির্ধারিত কোন এক জায়গায় এ তাছ্বীহ পাঠ করা না হয় কিংবা নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে কম পাঠ করা হয় তা হলে উক্ত ছূটে যাওয়া তাছ্বীহ পরবর্তী অন্য এক রুকুনের তাছ্বীহ্‌র সাথে মিলিয়ে নিয়ে পাঠ করে নিলে চলবে।

যেমন কেউ যদি রুকুতে উক্ত অতিরিক্ত তাছ্বীহ পাঠ করার কথা ভূলে গিয়ে তাছ্বীহ পাঠ না করে দাড়িয়ে যায়, তাহলে ছজদায় গিয়ে ছজ্দার জন্য নির্ধারিত দশ বারের তাছ্বীহর সাথে উক্ত ছুটে যাওয়া তাছ্বীহ মিলিয়ে ২০ বার তাছ্বীহ পাঠ করে নিলে আদায় হয়ে যাবে। (শামী)

✪ এ ধরণের কোন তাছ্বীহ্‌র গণনা নামাযরত অবস্থায় হাতের আঙ্গুলের কড়ায় করা মাকরুহ, বা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমেও তাছ্বীহির সংখ্যা গণনা করা যায় না। বরং মনে মনেই নিঃশব্দে তাছ্বীহর সংখ্যার হিসাব রাখতে হয়। তবে আঙ্গুলের মাথা দাবিয়ে দাবিয়ে সংখ্যার হিসাব রাখা যায়। (শামী)

pdf By Syed Mostafa Sakib

✪ অত্র তাছবীহ্‌র নামাযে তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর দরূদ দোয়া পড়ে ছালাম ফিরানোর আগে নিম্নের দোয়াখানা পাঠ করা উত্তম।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ الْهُدٰى وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْيَقِيْنِ وَمُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰى اَخَافَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِىْ عَنْ مَعَاصِيْكَ حَتّٰى اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ حَتّٰى اُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ وَحَتّٰى اُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حُبًّا لَّكَ وَحَتّٰى اَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِى الْاُمُوْرِ حُسْنَ ظَنٍّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ ۔ (شامى)

ছালাতুত্ তাওবা (তাওবার নামায)

পরম করুনাময় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, প্রিয় বান্দা, ঈমানদার মানুষ কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান দ্বারা প্ররোচিত হয়ে জীবন পরিচালনার ফাকে ফাঁকে আল্লাহ্-রাছূলের অনভিপ্রেত অপরাধ পাপে জড়িয়ে পড়ে এবং এতে করে সে ক্রম ধংসের দিকে এগুতে থাকে।

কিন্তু দয়াময় প্রভূ আল্লাহ পাকের প্রিয়তম মাখলুখ মুসলিম বান্দা পাপে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাক ইহা মোটেই তার ইচ্ছা নয়।

সে লক্ষ্যে তিনি দয়া করে মো'মেনদের পাপ অপরাধের ক্ষমা প্রাপ্তির নানা প্রকারের পথ ও ব্যবস্থা দিয়েছেন, এর মধ্যে সর্বোত্তম ও মৌলিক ব্যবস্থা হচ্ছে তাওবা করা।

কৃত অপরাধ, অন্যায় আচরণের জন্য মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং মন মুখে আল্লাহর দরবারে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তদুপরি অনুরূপ পাপের পুনরাবৃত্তি করবেনা বলে মহা প্রভূ মালিক আল্লাহ পাকের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার নামই হচ্ছে তাওবা।

✪ যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআন করিমে এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ যে লোক কোন অন্যায় করে বসে কিংবা কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে আত্ম পীড়ন করে অতঃপর (অনুসূচিত হয়ে) সে মহান আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট পাপ ক্ষমার প্রার্থনা জানায় সে ক্ষেত্রে সে বান্দা আল্লাহ তাআলাকে পরম ক্ষমাশীল ও মহা দয়াবান রূপে পাবে।

✪ আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেন, গুনাহ্গার লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম–যে লোক কোন গুনাহের কাজ করে ফেলার সাথে সাথে পরক্ষনেই এরজন্য তৌবা করে নেয়।

✪ হযরত ছিদ্দিক আকবর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় নবী (দঃ) এ প্রসঙ্গে আরও এরশাদ করেছেন ঃ

مَامِنْ عَبْدٍ يُّذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ وَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَيَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ لَهٗ (طحطاوى)

অর্থাৎ কোন বান্দা যখন কোন পাপ গুনাহ করে বসে অতঃপর (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তম রূপে ওযু করতঃ দু'রাকাত নামায আদায় করে নিয়ে নামায শেষে আল্লাহ জাল্লাশানুহুর মহান দরবারে কৃতগুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার পাপ গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

○ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কালামে আরও এরশাদ করেন ঃ

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ

অর্থাৎ, ইহা সুনিশ্চিৎ যে আমি আল্লাহ তৌবাকারী বান্দার জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ ۔

অর্থাৎ, নিশ্চয় পূন্য কাজ সমূহ পাপ–গুণাহ ইত্যাদি দূরিভুত করে দেয় = উহা উপদেশ গ্রহণকারী গণের জন্য বড়ই উপদেশ মূলক বিষয়।

قال اتبع السيات الحسنات

অর্থাৎ আল্লাহ পাক বলেন–পাপ–গুণাহ হয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই তোমাদের এবাদত–নেক কাজ করে যাওয়া উচিৎ।

তাওবার নামাযের নিয়ম :

তাওবার নামায সাধারণতঃ দু'রাকাত। তবে বেশী ও পড়া যায়। পাপ হওয়ার সাথে সাথে তাওবার নামায পড়ে নেওয়া জরুরী। বিলম্ব হয়ে গেলেও স্মরণে আসার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে নেবে। পাপ বর্জনের ইচ্ছা সংকল্পের পর পুর্নবার শয়তানের প্ররোচনায় পাপ হয়ে পড়লে পুন ঃ নামায আদায় করে যেতে হয়।

নিয়্যত ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّوْبَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্‌আতাই ছালাতিত্ তাওবাহ্ মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জি হাতিল কাবাতিশ্ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

অতঃপর নিম্ন বর্ণিত ইস্তেগ্‌ফার সমূহ পাঠ করতঃ মহান প্রভূর দরবারে ক্ষমা চেয়ে তাওবা করে যেতে হয়।

১। ছৈয়িয়েদুল ইস্তেগফার ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা-ওয়া আনা আলা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাছতা তা'তু আউজুবিকা মিন্ শার্‌রি মাছানা'তু আবুউ লাকা বিনি' মাতিকা আলাইয়া ওয়া আবূউ বিজাম্বী ফাগ্‌ফিরলি ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ইফিরুজ জুনুবা ইল্লা আন্তা।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আছতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি জাম্বিয়ো ওয়া আতূবূ ইলাইহি।

اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আছতাগ ফিরুল্লাহাল লাজী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু ওয় আতূবু ইলাইহি।

اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ غَفَّارُ الذُّنُوْبِ سَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

কাযায়ে হাজত (মাকছুদ পূর্ণ) এর নামায

কোন হাজত-মাকছূদ পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন কাজে সাফল্য লাভের আশায় আল্লাহর ওয়াস্তে যে নফল নামায আদায় করা হয় একে কাজায়ে হাজত (মাকছূদ পূর্ণ) হওয়ার নামায বলা হয়।

✪ কাজা হাজতের নামায দু'রাকাত বা চার রাকাত করে আদায় করা যায়। রাত দিনের যে কোন সময়ে (হারাম ও মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত) এবং যে কোন ছূরা দ্বারা উক্ত নামায আদায় করা যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাজা হাজতের নামায আদায়ের নিয়ম ঃ

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রঃ) থেকে বর্ণিত যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مَنْ كَانَتْ لَهٗ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةٌ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّا لِيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِىْ عَلَى اللّٰهِ وَلْيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

(ترمذى ، ابن ماجه)

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় রাছূল (দঃ) এরশাদ করেন–

মহান আল্লাহ তাআলার নিকট অথবা কোন আদম সন্তানের নিকট যখন কোন লোকের হাজত ও প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সে যেন উত্তম রূপে ওযু করতঃ দু'রাকাত নামায আদায় করে নেয় এর পর আল্লাহর হামদ ছানা এবং নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পেশ করতঃ দোয়া খানা পাঠ করে নেয় ঃ

দোয়া ঃ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল্ হালীমূল করীম ছুব্‌হা নাল্লাহি রাব্‌বিল আরশিল আযীম আলহামদু লিল্লাহি রাব্‌বিল আলামীন আল্লাহুম্মা ইন্নি আছ্‌আলুকা মোজিবাতি রাহ্‌মাতিকা ওয়া আজা-য়িমা মাগ্‌ফি রাতিকা ওয়াল্ গনীমাতা মিন কুল্লি বির্‌রিণ্ ওয়াচ্ছালামাতা মিন্‌কুল্লি ইছ্‌মিন্ লা-তাদায়্ লী জাম্‌বান্ ইল্লা গাফার্‌তাহু ওয়লা হাম্‌মান ইল্লা ফাররাজ্‌তাহু ওয়লা হাজাতান্ হিয়া লাকা রিদান্ ইল্লা কাদাইতাহা এয়া আর্‌হামার্ রাহেমীন।

অতঃপর আল্লাহর দরবারে নিজের হাজত প্রয়োজনের বিষয়ে দোয়া মুনাজাত করে যাবে। এতে ইন্‌শাআল্লাহ্ তার মাকছূদ পূর্ণ হবে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ

✪ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত ওছমান বিন্ হানিফ (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক অন্ধ লোক আল্লাহর নবী (দঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে আরজি পেশ করল, এয়া রাছূলাল্লাহ (দঃ)! আমি একজন অন্ধ লোক,

আমার রোগ আরোগের জন্য দোয়া করুন, প্রতি উত্তরে প্রিয় নবী (দঃ) এরশাদ করেন, তুমি যদি বল তাহলে দোয়া করে যাব, তবে তুমি ছবর- ধৈর্য অবলম্বন করতে পারলে তা তোমার জন্য ইত্তম হবে। ঐ লোক আরজ করল, এয়া রাছুলাল্লাহ! দোয়া করুন! তখন নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আদেশ করলেন, যাও ভাল ভাবে ওযু করতঃ দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে নাও অতঃপর নিম্নের দোয়াখানা সহ আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে যাও। (এতে তোমরা মাকছূদ পূর্ণ হবে নিশ্চয়)।

দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ (وَحَبِيْبِكَ) مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ يَاشَفِيْعَنَا وَيَاحَبِيْبَنَا يَاسَيِّدَنَا مُحَمَّدُ (يَارَسُوْلَ اللّٰهِ) اِنِّىْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِىْ (فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيْمِ يَانِعْمَ الرَّسُوْلُ الطَّاهِرُ) اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ (بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ) (ترمذى ـ ابن ماجه ـ دلائل الخيرات)

✪ হযরত আওলিয়ায়ে কেরাম ও মাশায়েখে তরীকতগণ হতে বর্ণিত আছে নিম্ন নিয়মে ৪ রাকাআত কাজায়ে হাজতের নামায আদায় করলে ইন্‌শাআল্লাহু তাআলা হাজত মাকছূদ সহসা পূর্ণ হয়ে থাকে।

এশার নামাযের পর সব প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে পাক পবিত্র জায়গায় ইস্তেগফার ও দরূদ শরীফ পাঠ করে ৪ রাকাত নামাযের নিয়্যত করতে হয়।

নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْحَاجَةِ نَفْلَ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

নিয়্যত বাঁধার পর ১ম রাকাতে দোয়ায়ে ছানা ও আউজুবিল্লাহ-বিছমিল্লাহ সহ ছূরা ফাতেহা পাঠ শেষ করে নিম্নের-

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

-এ আয়তখানা ১০ বার পাঠ করতে হয়।

২য় রাকাতে ছূরা ফাতেহা পাঠ করার পর। নিম্নের

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ

আয়াতখানা দশবার পাঠ করতে হয়।

৩য় রাকাতে ছূরা ফাতেহা পাঠ করার পর নিম্নের

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

-আয়ত খানা দশবার পাঠ করতে হয়।

৪র্থ রাকাতে ছূরা ফাতেহা পাঠের পর নিম্নের

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ....

আয়াত খানা পাঠ করতে হয়। এভাবে যথা নিয়মে নামায আদায়ান্তে ছালাম ফিরানোর পর একশত বার দরূদ শরীফ ও একশত বার এ দোয়া খানা- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ পাঠ করতঃ নিম্নের দোয়াখানা সমেত অতিশয় কাকুতি মিনতি এবং কান্নাকাটি সহকারে রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত ফরিয়াদ করে গেলে ইনশাআল্লাহু তাআলা মাকছূদ পূর্ণ হবে নিশ্চয়।

দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ يَاذَا الْجُوْدِ وَالْاِكْرَامِ وَيَادَافِعَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَيَادَافِعَ الْاَمْرَاضِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَالْاٰلَامِ وَالْاَسْقَامِ اِنِّىْ تَوَسَّلْتُ اِلَيْكَ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ يَاقَاضِىَ الْحَاجَاتِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ اَسْاَلُكَ يَااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَا حَنَّانُ يَامَنَّانُ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ وَاقْضِ حَاجَتِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى اَعْدَائِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَارْزُقْنِىْ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَاٰتِنِىْ حَسَنَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَارَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ :-

আল্লাহুম্মা এয়া জাল্‌জূদি ওয়াল্‌ ইকরামি ওয় এয়া দা-ফিআল্‌ হাম্মি ওয়াল্‌ গাম্মি ওয় এয়া দা-ফেআল্‌ আম্‌রাদি জ্‌জাহেরাতি ওয়াল্‌ বা-তিনা তি ওয়াল্‌ আলা-মি ওয়াল্‌ আছকা-মি ইন্নী তাওয়াছ্‌ছাল্‌তু ইলাইকা বিহা জিহি ছ্বালাতি ফাতাকাব্বাল্‌ মিন্নী এয়া কাদিয়াল হাজাতি ইন্‌নাকা আন্‌তাছ্‌ ছামীউল আলীম। আছআলুকা এয়া আল্লাহু এয়া রাহ্‌মানু এয়া হান্‌নানু এয়া- মান্‌নানু এয়া জাল জালালি ওয়াল্‌ ইকরা-মি-আন্‌তাগ ফেরা লা জুনুবী ওয় আজিব দা'ওয়তী ওয়াক্‌দি হাজাতী ওয়ান্‌ছুরনী আলা আ'দায়ী ওয় ইয়াচ্ছিরলী আম্‌রী ওয়ারজুক্‌নিছ্‌ ছিহ্‌হাতা ওয়াল

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ-ফিয়াতা ওয় আ-তিনী হাছানা-তিদ্ দুনিয়া ওয়াল্ আখিরাতি এয়া রাহমানাদ্দুনিয়া ওয়াল্ আ-খিরাতি ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিন ওয়া আ-লিহি ও আছহা-বিহি আজমাঈন, বিরাহ্ মাতিকা এয়া আরহামার রাহিমীন।

ইস্তেখারার নামায

ইস্তেখারার অর্থ সুপরামর্শ চেয়ে প্রার্থনা করা, কল্যাণ কামনা করা। পরিভাষায় কোন মুবাহ্ কাজ করার পূর্বে এর শুভাশুভ ও কল্যাণ সম্পর্কে নামায দোয়া পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে সুপরামর্শ চাওয়া।

আমরা কোন কাজের শুভাশুভ সম্পর্কে অজ্ঞ, আমরা কোন কাজ ও পদক্ষেপের পরিণতি সর্ম্পকে পূর্বাহ্নেই জানতে পারিনা, তাই কোন মুবাহ কাজ করার পূর্বে ইস্তেখারা করে নেওয়া মুস্তাহাব।

ইস্তেখারার নামায মহান আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সংযোগ সৃষ্টির পদ্ধতি।

✪ কোন ফরয ওয়াজিব কাজ আদায় করবে কি করবে না বা কোন নাজায়েজ কাজের জন্য ইস্তেখারা করা যাবেনা।

সাধারণত : বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি খরিদ, কোন বড় কিছু খরিদ, ছফরে যাওয়া, বাড়ী তৈরী করা এ জাতীয় অন্যান্য মুবাহ কাজের জন্য ইস্তেখারা করতে হয়।

✪ ইস্তেখারা দ্বারা গায়বী ভাবে কোন বিষয়ের শুভাশুভ হওয়াটা জানা যাবে অথবা স্বপ্নে স্পষ্ট করে বলে দেবে এরূপ ধারণা রাখা ভুল! ইস্তেখারার মূল উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করে কোন কাজ করা।

◆ ইস্তেখারার নিয়ম :

ইস্তেখারার সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে এশার নামায আদায় করে নেওয়ার পর খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ সেরে ঘুমাবার পূর্বে নূতন ওযু করত অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে দুরাকাত ইস্তেখারার নামায আদায় করে যেতে হয়। নামায শেষে নিম্ন বর্ণিত নির্ধারিত দোয়া সমূহের যে কোন একটি দোয়া পাঠ করে যেতে হয়, অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোয়া পাঠ করা উত্তম।

✪ দো'য়ার শুরুতে ও শেষে আল্লাহর হামদ ও নবী আকরম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে যাওয়া মুস্তাহাব।

নিয়্যত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِخَارَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাক্আতাই ছালাতিল ইস্তেখারাতে মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

ছূরা-কেরাতের ব্যাপারে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। যে কোন ছূরা দ্বারা আদায় করা যাবে। নামায শেষ করে ১১বার দরূদ শরীফ পাঠ করত : নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করে নিবে।

(১) দোয়া : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ .

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আছতাখীরুকা বি ইলমিকা ওয়াস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আছআলুকা মিন্ ফাদলিকাল্ আজীম। ফা ইন্নাকা তাক্দিরু ওয় লা-আকদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়া লা-আ'লামু ওয়া আন্তা আল্লামূল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাজাল্ আম্রা খাইরুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা আশী ওয়া আ'কিবাতি আমরী ফাকদিরহু লী ওয়া এয়াছ্ ছিরহু লী ছুম্মা বারিক লী ফীহি- ওয়া ইনকুন্তা তা'লামু আন্না হাজাল্ আম্রা শাররুল্ লী ফী দ্বীনী ওয়া মাআশী ওয়া আ-কিবাতি আম্রী। ফাছ্রিফহু আন্নী ওয়া আছরিফ্নী আন্হু ওয়া আকদির লিয়াল খাইরা হাইছু কানা ছুম্মারধিনী বিহী।

অথবা,

اَللّٰهُمَّ يَا حَبِيْبَ كُلِّ حَبِيْبٍ يَا اَنِيْسَ كُلِّ اَنِيْسٍ يَا مُغِيْثَ كُلِّ مُغِيْثٍ يَا كَافِىْ يَا مُكْفِىْ يَا مَنْ هُوَ لِجَمِيْعِ الْخَلْقِ كَافِىْ اَكْشِفْ لِىْ عَمَّا هُوَ فِىْ نَفْسِىْ مُخْفِىْ . تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ بِحَقِّ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِىِّ الْمُعَظَّمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَيَسِّرْهُ لِيْ وَاَرِنِيْ فِيْ مَنَامِيْ هٰذَا بَيَاضًا اَوْخُضْرَةً اَوْ مَاءً جَارِيًا وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا لَا مُرْشَرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَارْضِنِيْ بِهٖ وَاَرِنِيْ فِيْ مَنَامِيْ هٰذَا سَوَادًا اَوْدُخَانًا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

(২) আল্লাহুম্মা এয়া হাবীবা কুল্লি হাবীবিন্ এয়া আ-নীছা কুল্লি আনীচিন এয়া মুগীছা কুল্লি মুগীচিন্ এয়া কা-ফী এয়া মুক্ফী এয়া মান্ হুয়া লি জামীয়িল্ খাল্ কি কাফী ইক্শিফ্ লী আম্মা হুয়া ফী নাফ্ছী মুখফী তায়লামু মা ফী নাফ্ছী ওয়া লা-আ'লামু মা-ফী নাফ্ছিকা ইন্নাকা আন্তা আল্লামূল্ গুয়ূব বি হাক্কীল্ লাওহি ওয়াল্ কালামি ওয়াল আর্শি ওয়াল্ কুরছিয়্যীল্ মুয়াজ্জামি ওয়া বিহাক্কি মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম- আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাজাল আমরা খাইরুল লী ফী দ্বীনী ওয়া দুন্য়ায়ী ওয়া মা'আশী ওয় আকিবাতি আমরী ওয় আ' জিলিহী ওয় আ-জিলিহী ফা আক্দিরহুলী ওয় এয়াছ্ ছিরহু লী ওয় আরিনী ফী মানামী হাজা বা এয়াধান আও হাধিরাতান আও মা-আন্ জারিয়ান্ ওয় ইন্ কুন্তা তা-লামু আন্না হাজাল্ আমরা শার্রুন লী ফী দ্বীনী ওয় দুন্য়ায়ী ওয়া মা আশী ওয় আকিবাতি আমরী ফা আছ্রিফ্হু আন্নী ওয়াছ্রিফ্নী আন্হু ওয়া আক্দিরলিয়াল্ খাইরা হাইছু কানা আর্ধিনী বিহী ওয়া আরিনী ফী মানামী হাজা ছাওয়াদান্ আও দুখানান্ ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর ওয় ছাল্লাল্লাহু আলা ছৈয়্যিদিনা মুহাম্মাদিয়োঁ ওয়া আলা আলিহী ওয়া ছাহ্বিহী ওয়া ছাল্লাম।

অতঃপর ওযু অবস্থায় পাক পরিষ্কার বিছানায় কেবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়তে হয়।

✪ ঘুম থেকে উঠার পর ঘুমে যদি আলামত-চিহ্ন দেখা যায় এর তাবীল ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাজ করে যাবে।.যদি কোন ইঙ্গিত পাওয়া না যায়, তাহলে যেদিকে মনের ঝোক যাবে -সে অনুসারে কাজ করে যাবে। এক দিনে মন স্থির না হলে পর পর সাত দিন (কমপক্ষে তিন দিন) এভাবে ইস্তেখারা করে যেতে হয়।

✪ এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, কোন দিকে মনের ঝোক বুঝা না গেলেও এবং ইঙ্গিত বহ কোন স্বপ্ন না দেখলেও কোন অসুবিধা নাই ; বরং ইস্তেখারা করার পর কাজ করে যাবে আল্লাহর রহমতে ফলাফল শুভ হবে।

আসলে ইস্তেখারার আসল উদ্দেশ্য দু'আ করা এবং পরিকল্পিত কাজের ব্যাপারটি মহান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা।

লাইলাতুল্ বারাআত ও লাইলাতুল্ কদরের ফাজায়েল ও মাছায়েল

সারা জাহানের মালিক-পরওয়ার দিগার আল্লাহ জাল্লা শানুহু আম্মা নাওয়ালুহু বিশেষ করুনা ও দয়া প্রদর্শনে এবং তার মাহবুব নবী রাহ্মাতুল্ লিল্ আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের খাতিরে উম্মাতে মহাম্মদী (দঃ)-কে এমন কতগুলো মোবারক সময় ও উপলক্ষ দান করেছেন, যাতে খালেছ অন্তর-মন নিয়ে রাব্বুল আলামীনের এবাদত-বন্দেগী আদায় করার দ্বারা পঞ্চাশ/ষাট বৎসরের এ সংক্ষিপ্ত জীবনে পূর্বকালের শত-সহস্র বছর দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত আবেদ-বান্দাগণের চেয়ে ও বেশী নেকী ছাওয়াব হাসেল করা যায়।

এ সব বরকতময় সময় সমূহের অন্যতম হচ্ছেঃ

(১) লাইলাতুল বারাআত্ ও (২) লাইলাতুল কদর

এ পবিত্র রাত দু'টোতে নিজের অন্তর-মনকে দুনিয়ার সকল ঝামেলা, মায়া-মোহ ও ভোগ-বিলাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে একনিষ্ঠ দিলে অতীতের কৃত পাপ-গুণা হতে তওবা করতঃ মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালার পাক দরবারে ঐ পাপ-গুণাহের ক্ষমা-প্রাপ্তির জন্য কান্নাকাটির মাধ্যমে প্রার্থনা জানাতে থাকলে এবং নিজের মালিক-মনিব ও মাবুদের দরবারে দুনিয়া-আখেরাতের সার্বিক মঙ্গল কল্যাণ, মুক্তি ও শান্তির জন্য কাকুতি-মিনতি ভরে প্রার্থনা করতে থাকলে- বান্দা যতবড় পাপী-অপরাধীই হোক না কেন তার এ আবেদন- নিবেদন ও কান্নাকাটি মহান আল্লাহর দরবারে কবুল না হয়ে পারেনা। কারণ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীছে পাকে বরকতময় এ দু'রাতে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তার-বানী বর্ণিত হয়েছে।

(১) লাইলাতুল বারাআত ঃ

লাইলাতুন্ অর্থ- রাত, বারাআত্ অর্থ- মুক্তি, নিষ্কৃতি অর্থাৎ মুক্তি-নাজাতের রাত।

এ রাতে গুণাহগার পাপী-তাপী বান্দারা আল্লাহর দরবার হতে ক্ষমালাভ করে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্ত হয় বলে- এ রজনীকে লাইলাতুল বরাআত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

শাহিন্শাহে বাগদাদ হযরত গাউছুল আযম দস্তগীর (রঃ) স্বীয় গুনিয়াতুত্তালেবীন গ্রন্থে বলেন ঃ

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ - حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رض حٰمٓ يَعْنِيْ قَضَى اللّٰهُ مَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

pdf By Syed Mostafa Sakib

والكتاب المبين يعنى القران - انا انزلناه يعنى القران فى ليلة مباركة هى ليلة النصف من شعبان وهى ليلة البراة وقال ذلك اكثر المفسرين - (جـ١، صفحه ٦٨٤)

অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত কোরআনে কারিমের ছূরা দোখানে ইরশাদ করেন ঃ

حم والكتاب المبين انا انزلناه فى ليلة مباركة -

হা-মীম-প্রকাশ্য মহা গ্রন্থ আল কোরআনের শপথ- যে কোরআন কে আমি মোবারক (বরকতময়) রাতে নাযেল করেছি, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্বাছ (রা) এর তাফছীর প্রসঙ্গে বলেন- কিয়ামত পর্যন্ত যা হওয়ার আছে তা তিনি (আল্লাহ) ফয়সালা করে দিয়েছেন- শপথ উজ্জ্বল-প্রকাশ্য গ্রন্থ তথা কোরআনের- যাকে আমি বরকতময় রাত অর্থাৎ শাবান মাসের মধ্যবর্তী রজনীতে নাযেল করেছি। ঐ ১৫ই শাবানের রাতটি হচ্ছে লাইলাতুল বারাআত- এবং অধিকাংশ মুফাচ্ছেরীনে কেরামগণ মোবারক রাত বল্‌তে "শবে বরাআত " বলেই মত ব্যক্ত করেছেন।

উক্ত গ্রন্থে গাউছে আজম (রঃ) আরো বলেন ঃ

منها سمى ليلة البراة مباركة لما فيها من نزول الرحمة والبركة والخير والعفو والغفران لاهل الارض (صحف ١٨٧)

অর্থাৎ লাইলাতুল বারাআতকে একারণে "মুবারক" তথা বরকতময় বলা হয়েছে- যেহেতু এ পবিত্র রাতে পৃথিবী-বাসীদের জন্য অফুরন্ত রহমত বরকত, ও কল্যাণ নাজেল করা হয়ে থাকে, এবং অধিকন্ত পৃথিবী বাসী মুসলিমদেরকে এ রাতে ক্ষমা-মার্জনা করা হয়ে থাকে।

✪ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فان الله تعالى ينزل فيها بغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلى فاعافيه الا كذا كذا حتى يطلع الفجر - (رواه ابن ماجة، مشكوة)

✪ যখন শাবান চাঁদের (চৌদ্দ তারিখ দিবাগত) ১৫ তারিখের রাত আগমন করে তখন তোমরা শব-বেদারী তথা রাত জাগরণ করতঃ মহান আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করবে, আর এর পরবর্তী দিনে অর্থাৎ ১৫ (তারিখ) শাবানে রোজা রাখিও।

কেননা, চৌদ্দ তারিখের সূর্য অস্ত যাওয়া, তথা ১৫ তারিখের রাত শুরু হওয়ার সাথে সাথে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আছমানে নিজ তাজাল্লীর প্রকাশ দেন। অর্থাৎ দুনিয়াবাসীর প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্টি দান করতঃ দয়াপূর্ণ-কুদরতী আওয়াজে আহবান করতে থাকেন! "আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আজকের এ পবিত্র রাতে আমি প্রভু! এর দরবারে নিজের কৃত পাপ-গুণার জন্য মাগফেরাত কামনাকারী আছ কি? আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। (ওহে বান্দা)! আমার নিকট তোমাদের কিছু চাওয়ার আছে কি? তা আমি তোমাদেরকে দান করতাম।

রুজী-রিজিক চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী রিজিক দানের ব্যবস্থা করে দেব। কোন বিপদগ্রস্থ লোক বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা কারী আছ কি ? আমি তোমাদের বিপদ দূর করে দেব। এমনিভাবে আরো আরো বিষয়ে যেমন রোগ আরোগ্য, সার্বিক শান্তি, কল্যাণ ও উন্নতি ইত্যাদি চেয়ে কেউ প্রার্থনাকারী আছ কি? আমি তা-সব তোমাদেরকে দান করব।

মহান রব তাআলার এরূপ করুণাপূর্ণ ঘোষণা ছুব্‌হে ছাদেক পর্যন্ত চলতে থাকে।"

✪ হযরত মা আয়শা ছিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা থেকে বর্ণিত যে, একদা আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম রাতের (অর্ধাংশের পর) উঠে নামায পড়া আরম্ভ করলেন- এর এক পর্যায়ে তিনি ছেজ্‌দাতে গিয়ে এতদীর্ঘক্ষণ পড়ে রইলেন যে, এ অবস্থা দৃষ্টে- প্রিয় নবী (স)-এর নূরানী রূহ মোবারক দেহ শরীর থেকে বের হয়ে গেল নাকি ভেবে আমি শংকিত হয়ে পড়ি- এমনকি আমি বিচলিত হয়ে প্রিয় নবী (স)-এর নিকটে এসে পা মোবারকের পবিত্র বৃদ্ধাঙ্গুলী ধরে নাড়া দিলে তিনি নড়ে উঠেন। এতে আমার মানসিক অবস্থা ফিরে আসে-অতঃপর আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি, নামায শেষে অন্য কয়েকটি বাক্যের পর প্রিয় নবী (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন; আয়শা! আজ কোন তারিখ/কোনরাত তাকি তুমি জান? উত্তরে আমি আরজ করলাম মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাছূল (স) ই ভাল জানেন। তখন আল্লাহর প্রিয় নবী (স) ইরশাদ করলেন ঃ আজ মাহে শাবানের পনর তারিখের রাত, এ রাতে মহান আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসী ঈমানদার বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, যে সমস্ত বান্দা তাঁর মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকে- তিনি তাদের কে ক্ষমা করে দেন, যারা তার দয়া ও করুণা ভিক্ষা করে থাকে, তাদের প্রতি তিনি অফুরন্ত করুনা বর্ষন করেন। পবিত্র হাদীছ শরীফ সমূহে আরো বলা হয়েছে যে,এ পবিত্র রাতে পরবর্তী এক বৎসরের জন্য আদম সন্তানের- হায়াত-মওত, রিজিক, ক্ষমতা-পদমর্যাদা সুখ-শান্তি, মান-সম্মান, ধন-সম্পদ ও উন্নতি-অবনতির সব বিষয়ের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়, রোগ আরোগ্য-এমনকি কাকে পবিত্র হজ্জ কার্য সম্পাদনের তৌফিক দানকরা হবে- এ রাতে এসব কিছু লিখা হয়।

তাই এ পবিত্র রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিশেষ এবাদত-বন্দেগী আদায়ের মাধ্যমে নিজের কৃতপাপ-গুণাহ, নিজ মা-বাবা, নানা-নানী, দাদা-দাদী অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, ওস্তাদ, সাহায্যকারী, কল্যাণকামী তথা সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের গুণা মার্জনার জন্য এবং ইহকালীন-পরকালীন মুক্তি-শান্তি, বিপদ-মুক্তি, রোগ আরোগ্য তথা সার্বিক কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র দরবারে কান্না-কাটি ও কাকুতি-মিনতি ভরে দোয়া ফরিয়াদ করে যাওয়া প্রত্যেক মোমেন বান্দা-বান্দির জন্য একান্ত কর্তব্য।

◆ **লাইলাতুল কদর ঃ**

(কাদার) শব্দের অর্থ– মর্যাদা, ফয়সালা, পরিমাণ, শক্তি ও তাকদীর (ভাগ্য)।

এ হিসাবে "লাইলাতুল কদর" অর্থ মর্যাদাশীল রাত, নির্ণয়ের রাত বা ভাগ্য রজনী।

ইহা অতি মহিমান্বিত একটি রাত, পূণ্য ও রহমতে ভরপুর একটি বরকতময় ও মর্যাদাশীল রজনী।

এ পবিত্র রজনীতে মানব গোষ্ঠির বৎসরের জন্য বরাদ্ধকৃত হায়াত-রিজিকের পরিমাণ, ধন-দৌলত, রোগ-আরোগ্য, মান-সন্মান, পদমর্যাদা, উন্নতি- অবনতি, আল্লাহর রহমত, তথা সমূদয় কল্যাণ-অকল্যানের বন্টন হয়, সর্বোপরী এবাদতে রত প্রার্থনাকারী-ক্ষমাপ্রার্থী বান্দাদের সমূদয় পাপ, ক্ষমা করে দেওয়া হয়। বন্দেগীর বিনিময়ে হাজার মাসের এবাদত-বন্দেগীর ছাওয়াবের চেয়ে অধিক ছাওয়াব-পূণ্য এবং মহান আল্লাহর অপার রহমত করুণা দান করা হয়।

✪ পবিত্র কোরআনে স্বয়ং স্রষ্টার ঘোষনা– لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

অর্থাৎ– এ কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম।

✪ হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ (متفق عليه مشكوة)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে (অর্থাৎ আল্লাহ রাসূলের শরীয়াতকে সত্যরূপে বিশ্বাস করে ও মেনে চলে, তদুপরি রমজানের রোজা রাখা ফরয হওয়া বিষয়টাকে মেনে নিয়ে এবং ছাওয়াব পূর্ণ্য প্রাপ্তির আশায়-ও একমাত্র আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি-সন্তুষ্টি পাওয়ার নিয়্যতে রমজানের রোজাসমূহ আদায় করে যায়, এতে তার অতীতের পাপ-গুণা সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

এমনিভাবে যে বান্দা ঈমান সহকারে ও ছাওয়াবের আশায় মাহে রমজান মুবারকের তারাবীহ ও অন্যান্য নফল এবাদত সমূহ আদায়ের দ্বারা রাত জাগরণ করে থাকে এতে তার অতীতের গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়।

এভাবে যে বান্দা কদরের রাতে ঈমান সহকারে অর্থাৎ কদর রাতে আল্লাহ প্রদত্ত ফযীলত-মাহাত্মের প্রতি বিশ্বাস আস্থা স্থাপন করতঃ এবাদত-বন্দেগী করে যাবে– তার অতীতের সমূদয় পাপ-গুণাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

✪ পবিত্র হাদীছ শরীফে আরো বর্ণিত আছে ঃ-

وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ (كشف الغمه ج)

✪ হাদীছে পাকে আরো বলা হয়েছে ঃ

যদি তোমরা তোমাদের কবরকে আলোকময় পেতে চাও তাহলে কদর শরীফের রাত জাগরনের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এবাদত-বন্দেগী করবে।

✪ অপর একটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ-

যারা লাইলাতুল কদরে এবাদত-বন্দেগী করে থাকে তাদের উপর দোজখের আগুন হারাম করে দেয়া হবে।

✪ হাদীছ শরীফে আরো বর্ণিত আছে ঃ

পবিত্র রমজান মাসে এরূপ একটি ফযীলত ওয়ালা রাত রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেয়, যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ (তথা রাত জাগরণের মধ্য দিয়ে এবাদত বন্দেগী করল না সে) বরকত থেকে মাহরূম হয়ে পড়লঃ সে মূলতঃ সমূদয় কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হল, নিতান্ত হতভাগ্য ছাড়া অন্য কেউ এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকেনা (ইব্নে মাজা)।

হযরত গউছুল আজম দস্তগীর শাহেন শাহে বাগদাদ (র) বলেনঃ হযরত ইব্নে আব্বাছ (রা) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন ঃ (فى غنية الطالبين)

اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَاْمُرُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يَنْزِلَ اِلَى الْاَرْضِ وَمَعَهٗ سُكَّانُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ وَمَعَهُمْ اَلْوِيَةٌ مِنْ نُوْرٍ فَاِذَا هَبَطُوْا اِلَى الْاَرْضِ رَكَزَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِوَاءَهٗ وَالْمَلَائِكَةُ اَلْوِيَتَهُمْ فِىْ اَرْبَعِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَعِنْدَ قَبْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَعِنْدَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَسْجِدِ طُوْرِ سِيْنَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمَلَائِكَةِ تَفَرَّقُوْا فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَلَا يَبْقٰى دَارٌ وَلَا حُجْرَةٌ وَلَا بَيْتٌ وَلَا سَفِيْنَةٌ فِيْهَا مُؤْمِنٌ اَوْمُؤْمِنَةٌ اِلَّا دَخَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فِيْهَا اِلَّا بَيْتٌ فِيْهِ كَلْبٌ اَوْ خِنْزِيْرٌ اَوْ خَمْرٌ اَوْ جُنُبٌ مِنْ حَرَامٍ اَوْ صُوْرَةٌ فَيُسَبِّحُوْنَ وَيُقَدِّسُوْنَ وَيُهَلِّلُوْنَ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ وَقْتُ الْفَجْرِ يَصْعَدُوْنَ اِلَى السَّمَاءِ. (ا-مغنى)

অর্থাৎ কদরের রাতে ফেরেশতা সম্রাট হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আদেশ করেন- হে জিব্রাঈল! তুমি ছিদ্‌রাতুল মুনতাহাতে অবস্থানকারী সত্তর (৭০,০০০) হাজার ফেরেশতা বাহিনী নিয়ে পৃথিবীতে যাও, এসকল ফেরেস্তাদের হাতে নূরের পতাকা-ঝান্ডা থাকে।

যখন হযরত জিব্রাঈল সত্তর হাজারের বাহিনী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন- তারা (সর্বপ্রথমে) চারটি বরকতময় স্থান তথা- (১) আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বাতুল মুয়াজ্জামায় (২) নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের রাওজা মুনাওয়ারাতে (৩) বায়তুল মুকাদ্দাছ শরীফে এবং সিনাই এলাকার তূর পাহাড়ে তাদের চারটি ঝান্ডা গেড়ে দেন, অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) সকল ফেরেশতাদের কে আদেশ করেন- তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়, এতে ফেরেস্তারা মো'মেনদের প্রতিটি ঘরে, মাসজিদে, যেখানে মো'মেনগণ এবাদতে রত থাকেন তথায় পৌছে যান-

হাঁ- এ সকল রহমতের ফেরেস্তামন্ডলী- যে সকল ঘরে কুকুর, শুকুর, মদ এবং জেনাকারী ও প্রাণীর ছবি থাকে ঐ সব ঘরে প্রবেশ করেন না।

মো'মেনগণের ঘরে ফেরেস্তামন্ডলী প্রবেশ করতঃ এবাদতে রত বান্দাগণের সাথে এরাও মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর তাছবীহ, পবিত্রতা ও তাকবীর এবং প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের (এবাদতরত) উম্মাৎগণের জন্য ফজর হওয়া পর্যন্ত পাপ-গুণাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা জানাতে থাকেন।

যখন ছোবহে ছাদেক তথা ফজর হয়ে পড়ে তখন ফেরেস্তামন্ডলী আছমানে চলে যান, অতঃপর হযরত ইব্‌নে আব্বাছ (রা) আরো বর্ণনা করেন যে;

উর্দ্ধ জগতের ঐ সকল ফেরেশতাদের কাছে প্রথম আছমানবাসী ফেরেস্তারা জানতে চান- আপনারা কোথা হতে আসছেন? উত্তরে তারা বলেন- আমরা পৃথিবী থেকে আসছি, তখন প্রথম আছমানের ফেরেস্তারা পূর্ণবার জানতে চান- উম্মাতে মুহাম্মাদী (স) এর ব্যাপারে মহান আল্লাহর কি সিদ্ধান্ত?

প্রতিউত্তরে ফেরেশতা সম্রাট জিব্রাঈল (আঃ) বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ غَفَرَ بِصَالِحِيْهِمْ وَشَفَّعَهُمْ فِىْ طَالِحِيْهِمْ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ নেককারদের কে মাফ করে দিয়েছেন আর নেককারদের খাতিরে বদকারদের কেও ক্ষমা করে দেয়ার ওয়াদা দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উম্মাৎগণের প্রতি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রদান ও সন্তুষ্টির এ শুভ সংবাদ শুনে প্রথম আছমানের ফেরেশতামন্ডলী অত্যন্ত আনন্দ-উদ্দীপনা সহকারে উচ্চরবে মহান আল্লাহর তাছ্‌বীহ-তাক্‌দীছ হামদ-ছানা আরম্ভ করে দেন- মহান আল্লাহ তাআলা লাইলাতুল কদরের এবাদত বন্দেগীর বদৌলতে উম্মতে মুহাম্মাদী (স)-কে, যে নেয়ামত ও মাগফিরাত দান করেছেন এ শুভ সংবাদ শুনে একাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আছমান এবং ছিদ্‌রাতুল মুনতাহায় অবস্থানকারী ফেরেস্তামন্ডলী খুশীতে মহান আল্লাহর তাছবীহ ও গুণগানে উর্দ্ধ জগত কে মুখরিত করে তোলেন।

সপ্ত আকাশে পৌছার পর হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গীয় ফেরেস্তাদেরকে স্ব-স্ব অবস্থান স্থলে চলে যাওয়ার আদেশ করলে সবাই স্ব -স্ব স্থানে চলে যান।

এভাবে প্রিয় নবী (স)-এর উম্মাৎদের প্রতি মহান আল্লাহর অপরিসীম করুণাপুর্ণ মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনে জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুন নাঈম, জান্নাতুল আদন্ ও জান্নাতুল ফেরদাউস এবং মহান আরশস্থ ফেরেস্তামন্ডলীও এর শুকরিয়া স্বরূপ মহান আল্লাহর তাছবীহ-তাহ্‌লীল ও হাম্‌দ-ছানায় উর্দ্ধ জগতকে মুখরিত করে তোলেন। এতে মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু আর্‌শবাহী ফেরেস্তাদের কে জিজ্ঞাসা করেন-.

এত উদ্দিপনা-উৎসাহ সহকারে তোমরা কি কারণে আমার তাছ্‌বীহ-তাহলীল ও হামদ-ছানা করে যাচ্ছ?

উত্তরে তারা আরজ করেন, হে মহা প্রভূ আল্লাহ!

আপনি যে নিখিলের করুনার নবী মুহাম্মাদুর রাছূলুল্লাহ (স)-এর উম্মাৎদের নেককারদের কে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং বদকারদেরকে নেককারদের অছিলায় প্রভূ! ক্ষমা করে দেয়ার ওয়াদা ঘোষণা করেছেন, এ মহা শুভ সংবাদে আমাদের এ আনন্দের তাছবীহ ও হামদ-ছানা।

অতঃপর মহান রাব্বুল ইজ্জত আরশে আযীমকে লক্ষ্য করে বলেন- হে আরশ! তুমি সত্যই বলেছ, আমার কুদরতী ভান্ডারে আমার পেয়ারা নবী মুহাম্মদ (স)-এর উম্মাতের জন্য এত অধিক মান-সম্মান ও বখ্‌শিশের ব্যবস্থা রয়েছে যে, যা কোন চোখে এ পর্যন্ত দেখেনি এবং কোন কানে শুনেনি সর্বোপরি কারো অন্তরের কল্পনায় এর কোন চিত্রও আসেনি।

✪ এভাবে আরো বর্ণিত আছে যে,

اِنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَايَدَعُ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ اِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَصَافَحَهُ وَعَلَامَةُ ذٰلِكَ اِقْشِعْرَارُ جِلْدِهٖ وَتَرْقِيْقُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

قَلْبِهِ وَتَدْمَعُ عَيْنِهِ (غنية الطالبين لغوثنا الاعظم شيخ محى الدين عبد القادر جيلانى رح .) ٢/ صفحه٢٠١

অর্থাৎ কদরের রাতে যখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেস্তা বাহিনীসহ পৃথিবীতে অবতরন করেন- তখন (এবাদতে রত) প্রত্যেক মুছলমান বান্দাকে ছালাম দেন এবং প্রত্যেকের সাথে মূলাকাত করেন-

ফেরেস্তার মূলাকাত করাটা অনুভূত হওয়ার আলামত হচ্ছে ঃ-

ঐ কদরের রাতে আল্লাহর বান্দাদের এবাদত করে যাওয়ার এক পর্যায়ে- শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। দিল-অন্তর নরম-কোমল হয়ে আপনা-আপনি চোখ দিয়ে পানি ঝরে। (যখন কোন বান্দার এরূপ অবস্থা হয় তখন বুঝে নিতে হবে যে, তার সাথে আল্লাহর আগত ঐ রহমতের ফেরেস্তার মুলাকাত হয়েছে, (গাউছুল আজম (রঃ) কর্তৃক লিখিত "গুনিয়াতুত্ তালেবীন" গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

লাইলাতুল বরাআত এবং লাইলাতুল কদরে করণীয় ও পালনীয় আমলসমূহ

(১) অতীব পাক্-পরিচ্ছন্নতার সাথে-মহান আল্লাহর এবাদত সমূহ আদায় করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে (ওজর না থাকলে) সন্ধ্যা কিংবা রাতে গোছল করে নেওয়া মুস্তাহাব।

(২) রাত আগমনের পূর্বেই কিংবা রাতের শুরুতে অতীতে কৃত পাপ সমূহ থেকে তওবা-ইস্তেগফার করে নেওয়া জরুরী, নতুবা দোয়া-এবাদত সমূহ কবুল না হওয়ার ও আশংকা রয়েছে।

(৩) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ৪০ বার-

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(লা-হাওলা ওয়লা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যীল আযীম)

-পাঠ করা মুস্তাহাব, কেননা পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, শা'বানের চৌদ্দ তারিখ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় যে লোক উক্ত দোয়াখানা চল্লিশবার পাঠ করবে তার চল্লিশ বৎসরের ছাগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(৪) উভয় রাতে গরীব-মিছকিন ও আল্লাহ-রাসূল ওয়ালা লোকদের কে আল্লাহর ওয়াস্তে নগদ টাকা-পয়সা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য সামগ্রী দান করলে বিপুল ছওয়াব পাওয়া যায়।

✪ সুষ্ঠুভাবে উৎসাহ-উদ্দিপনা সহকারে আল্লাহ তাআলার এবাদত বন্দেগী

আদায়ের জন্য শক্তি অর্জনের নেক নিয়্যতে নিজের ও পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য ভাল আহারাদির ব্যবস্থা করলে রিজিকে স্বচ্ছলতা আসে।

✪ স্বীয় আম্মা-আব্বা, নানা-নানী, দাদা-দাদী, আত্মীয়-স্বজন, ওস্তাদ বন্ধু-বান্ধব শ্বশুর-শ্বাশুরী, সাহায্যকারী ও কল্যাণকামীদের কবর যেয়ারত করা মুস্তাহাব, এবং সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করতঃ প্রার্থনা করে যাওয়া জরুরী, কেননা আল্লাহর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বরাতের রাতে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে গমন করতঃ কবরবাসী উম্মাতগণের মাগফেরাত কামনা করত ঃ দোয়া করেছেন মর্মে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে-

বিশেষতঃ এ উভয়রাতে স্ব-স্ব এলাকার আউলিয়ায়ে কেরামগণের মাজার যেয়ারত করাটা অধিক উত্তম। সর্ব সাধারণ মুসলমানদের কবর যেয়ারত করাটাও কর্তব্য।

◆ কোরআন তেলাওয়াত ঃ

এ উভয় রাতে বেশী পরিমাণে কোরআন পাকের তেলাওয়াত করে যাওয়াটা অধিক ছাওয়াবের কাজ, কারণ হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে মহান আল্লাহর পবিত্র কালাম তেলাওয়াত করাটাই হচ্ছে সর্বোত্তম জিকির।

বিশেষতঃ এ উভয়রাতে ছুরা ইয়াছীন শরীফ, ছুরা আর-রাহমান ও ছুরা ওয়াকেয়া শরীফ, ছুরা দোখান শরীফ এবং ছুরা মূলুক শরীফ ইত্যাদি তেলাওয়াত করে নিলে অধিক অধিক ফায়দা অর্জিত হয়।

◆ জিকির ও তাছবীহ্-তাহলীল ঃ

এ মোবারক রাতদ্বয়ে মহান আল্লাহর বিভিন্ন প্রকারের তাছবীহ-তাহলীল ও জিকির করে যাওয়া অধিকতর ফায়দার আমল।

◆ দরূদ-ছালাম পাঠ ঃ

যে মহান নবীও হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ওয়াছিলায় আমরা গুণাহগার উম্মাতগন আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রদত্ত্ব এ জাতীয় মূল্যবান সময় ও সুবর্ণ-সুযোগ সমূহ পেয়েছি- এ ক্ষেত্রে ঐ মহান রাসূল (স) কে স্মরণ না করাটা বড়ই অকৃতজ্ঞতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই এ উভয় মোবারক রাতে আল্লাহর হাবীব নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের উপর বিভিন্ন প্রকারের দরূদ শরীফ সমূহ পাঠ করে যাওয়াটা অধিকতর কল্যাণকর রূপে বিবেচিত।

তদুপরি প্রিয় হাবীব (স) এর উপর শ্রদ্ধাভরে কেয়ামকরতঃ দরূদ-ছালাম পেশ করে যাওয়াটা আরো অধিক কল্যাণকর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

◆ **তাওবা-ইছতেগফার করা ঃ**

মানুষ মহান স্রষ্টা ও প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অতি পেয়ারা মাখলুক, স্রষ্ঠা রাব্বুল আলামীন এ মানব সম্প্রদায়কে সবার উপর শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশীল করেছেন।

মানব জাতি রাব্বুল ইজ্জতের দেওয়া এ মর্যাদা কতটুকু রক্ষা করতে পারে – তা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের ভিতর "নাফছে আম্মারা" বা কুপ্রবৃত্তি তথা একটি প্ররোচক শক্তি স্থাপন করে দিয়েছেন আর বাইরে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে মহা ওয়াছওয়াসাদানকারী শয়তানকে।

এ কারণে মানুষ এ নাফ্ছে আম্মারার প্ররোচনায় এবং শয়তানের ওয়াছ ওয়াছায় প্রভু আল্লাহ তাআলার দেয়া সীমায় সঠিক ভাবে স্থীর থাকতে পারে না। যার ফলে তারা আল্লাহ-রাসূলের নারাজী ও অনাকাঙিকত পথে অগ্রসর হয়ে পাপে ও অন্যায়-অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

দয়াময়-করুণাময় প্রভূ আল্লাহ কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত পাপী-তাপি বান্দাদের পুনঃ তাঁরই পথে আহবান করত ঃ ঘোষনা দিয়ে থাকেন– হে আমার বান্দারা ! তোমাদের যারা অধিক অধিক পাপ-অপরাধে জড়িত হয়ে নিজেদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছ! তোমরা, আমি রহমান-রহিম প্রভূ আল্লাহর করুণাপূর্ণ ক্ষমা প্রাপ্তি থেকে নৈরাশ হয়োনা, বরং অনুসুচিত-অনুতপ্তহয়ে সঠিক পথে, পুণ্যের পথে, মুক্তির পথে ও জান্নাতের পথে ফিরে আস।

এই পবিত্র আহবানে সাড়া দিয়ে যারা দয়াময় প্রভূ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তাদের সমূদয় অপরাধ ও দোষ-ক্রটি ক্ষমা করে দেয়া হয়।

✪ পবিত্র হাদীছ বানীতে আছে– اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

অর্থাৎ যে লোক নফছের প্ররোচনায় ও শয়তানের ধোকায় ফেরেবে পড়ে অন্যায় কর্ম করে ফেলার পর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে দয়ালু আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করতে থাকে–তাতে করুণাময় অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেন– ফলে সে লোক এরূপ নিষ্পাপ হয়ে পড়ে-যেন সে আদৌ কোন পাপ-গুনাহই করেনি।

✪ এ উভয় পবিত্র রাতই হচ্ছে করুণাময় মহা প্রভূ আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে ফিরে আসার সঠিক এবং উপযুগী সময় ও সূযোগ।

এ মোবারক রাতদ্বয়ে পাপী অপরাধীরা নিজেদের কৃত পাপ-গুনাহ ক্ষমা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বুক ফাটা কান্নায় ও চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে করুনাময়ের দরবারে সত্যিকার ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে অবশ্যই ক্ষমা-মার্জনা পেয়ে থাকবে।

নফল নামায আদায় ঃ

অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায় করে যাওয়াটাই হচ্ছে এ উভয় মোবারক রাতের সর্বোত্তম আমল, কারণ আল্লাহকে রাজী করার ব্যাপারে নামাযই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। এ হিসাবে এরাতদ্বয়ে বেশী নফল নামায আদায় করে যাওয়াটা অত্যাধিক কল্যাণকর।

✪ নফল নামাযের বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই। যত রাকাআত ইচ্ছা এবং যে কোন সুরা দ্বারা পড়া যায়।

✪ এক বর্ণনামতে চার রাকাআত, কোন কোন বর্ণনানুসারে আট রাকাত, কারো কারো বর্ণনামতে বার রাকাআত, কোন বর্ণনানুযায়ী চৌদ্দ রাকাআত অপর এক বর্ণনা মতে বিশ রাকাআত নফল নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে।

✪ বুজূর্গানে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরামগণ থেকে এ উভয়রাতে দু'দুরাকাত করে ছয় নিয়্যতে মোট বার রাকাত নামায আদায়ের কথা বর্ণিত আছে।

প্রতি চার রাকাতের পর বসে একশত বার আস্তাগফিরুল্লাহা .... (পূর্ণ), একশত বার কালেমায়ে তাম্‌জিদ– ছুব্‌হা-নাল্লাহি ওয়াল্ হাম্‌দুলিল্লাহি .... (পূর্ণ) ও একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করত ঃ মুনাজাত করা বেশী উপকারী।

✪ সম্ভব হলে এ উভয়রাতে "ছালাতুত্ তাছ্‌বীহ্" এর নামায আদায় করে যাওয়া বেশী উপকারী।

✪ হাদীছ শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এ উভয়রাতে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিম্নের দোয়া দু'খানা বেশী বেশী পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ (كَرِيْمٌ) تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (يَاكَرِيْمُ) يَاغَفُوْرُ يَاغَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুয়্উন (কারীমুন্) তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফা'ফু আন্নী (এয়াকরীমু) ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফূরু– ইয়া গাফূরু

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

বাংল উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্আলুকাল্ আফ্ওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ওয়াল্ মুআ-ফাতাদ্‌দায়েমাতা ফিদ্‌দ্বীনি ওয়াদ্‌দুনিয়া ওয়াল্ আ-খিরা।

তাই এ দোয়াগুলো আমাদেরও পাঠ করে যাওয়া উচিৎ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লাইলাতুল বরাতের বিশেষ আমল

প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম লাইলাতুল বারাতে ছাজদায় গিয়ে নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ سَجَدَ لَكَ سُوَادِىْ وَجَنَانِىْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِىْ اَبُوْءُ لَكَ بِالنِّعَمِ وَاَعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْبِ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

বাংলা উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাজাদা লাকা ছাওয়াদী ওয়া জানানী ওয়া আ-মানা বিকা ফুআদী-আবূউ লাকা বিন্ নেআমি ওয়া'তারিফু লাকা বিজ্জান্‌বি জালামতু নাফছী ফাগফিরলী ইন্নাহু লা-ইয়াগ্‌ফিরুজ্জুনূবা ইল্লা আন্‌তা আউজু বিআফ্‌বিকা মিন্ উকূবাতিকা ওয় আউজু বিরাহমাতিকা মিন নিক্‌মাতিকা ওয়া আউজু বিরিধাকা মিন ছাখাতিকা ওয়া আউজু বিকা মিন্‌কা লা-উহ্‌ছী ছানা-আন্ আলাইকা আন্‌তা কামা আছ্‌নাইতা আলা নাফছিকা।

✪ "মুজাররবাতে দাইরবী" নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে বরাতের রাতে নিম্নের তিনটি বিষয়ে নিয়্যত করতঃ তিনবার ছূরা ইয়াছীন শরীফ তেলাওয়াতের পর নিম্নের দোয়াখানা ১০বার (কমপক্ষে ৩বার) পাঠ করতঃ মুনাজাত করলে মহান আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তেলাওয়াতকারী বান্দার মনেরমাকছুদ পূর্ণ করে দেবেনঃ

১ম বার হায়াত দারাজীর উদ্দেশ্যে ছূরা ইয়াছীন শরীফ পাঠ করা, ২য়বার বালা-মছিবত হতে রক্ষা পাওয়ার নিয়্যতে ছূরা ইয়াছীন শরীফ তেলাওয়াত করা।

৩য় বার আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যকোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষি না হওয়া অর্থাৎ রুজী-রোজগার বৃদ্ধির জন্য ছূরা ইয়াছীন শরীক তেলাওয়াত করা।

এভাবে তিনবার তেলাওয়াত করা শেষ হলে কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ নিম্নের দোয়া খানা পাঠ করে মূনাজাত করতে হয় ঃ-

اِلٰهِىْ جُوْدُكَ دَلَّنِىْ اِلَيْكَ وَاِحْسَانُكَ اَوْصَلَنِىْ اِلَيْكَ وَكَرَمُكَ قَرَّبَنِىْ لَدَيْكَ اَشْكُوْ اِلَيْكَ مَالَا يَخْفٰى عَلَيْكَ وَاَسْئَلُكَ مَالَا يَعْسُرُ عَلَيْكَ اِذْ عِلْمُكَ

بِحَالِىْ يَكْفِىْ عَنْ سُوَالِىْ يَامُفَرِّجُ كُرَبَ الْمَكْرُوْبِيْنَ فَرِّجْ عَنِّىْ مَا اَنَا فِيْهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ يَاذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَيَاذَا الطَّوْلِ وَالْاِنْعَامِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَهْرُ الْمُلْجِئِيْنَ وَجَارُ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَاَمَانُ الْخَائِفِيْنَ وَكَنْزُ الطَّالِبِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِىْ عِنْدَكَ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْ مُقْتَرًا عَلَىَّ فِى الرِّزْقِ فَامْحُ اللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِىْ وَحِرْمَانِىْ وَطَرْدِىْ وَاقْتَادِ رِزْقِىْ وَاكْتُبْنِىْ عِنْدَكَ فِىْ اُمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَاِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِىْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ اَسْئَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ التَّجَلِّىِّ الْاَعْظَمِ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِىْ يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ وَيُبْرَمُ اَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا تَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ اَنْتَ بِهٖ اَعْلَمُ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ـ

বাংলা উচ্চারণঃ ইলাহী জূদুকা দাল্লানী ইলাইকা ওয় ইহ্‌ছা-নুকা আউছালানী ইলাইকা ওয় কারামুকা কার্‌রাবানী লাদাইকা-আশ্‌কূ ইলাইকা মা-লা এয়াখ্‌ফা আলাইকা ওয় আছ্‌আলুকা মা-লা এয়' ছুরু আলাইকা ইজ্ এলমুকা বিহা-লী এয়াক্ ফী আন্ ছুআ লী এয়া মুফার্‌রিজু কুরবাল মাকরুবীনা ফার্‌রিজ্ আন্নী মা-আনা ফীহি লা-ই লা-হা ইল্লা আন্‌তা ছুবহা-নাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্ জালিমীন ফাছ্ তাজাব্‌না লাহু ওয়ানাজ্‌জাইনা-হু মিনাল্ গাম্‌মি ওয়া কাজা-লিকা নূন্‌জিল মো'মিনীন্ আল্লাহুম্মা এয়াজাল্‌মান্নি ওয় লা-ইউমান্‌নু আলাইকা এয়া জাল্‌জালা-লি ওয়াল্ ইক্‌রামী ওয় এয়া জাত্ তাউলি ওয়াল ইন্ আ-মি লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা জাহরুল মাল্ জায়ীনা ওয়া জা-রুল্ মুছ তাজিরীনা ওয়া আমানুল্ খা-য়িফীনা ওয়া কান্‌জুত্‌তালিবীনা-

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহুম্মা ইন্‌কুন্‌তা কাতাব তানী ইন্‌দাকা ফী উম্মিল্ কিতাবী শাকিয়ান্ আও মাহ্‌রুমান্ আও মাতরুদান্ আও মু'তাররান আলাইয়া ফির্ রিজ্‌কি ফাম্ হাল্লাহুম্মা বি ফাধ্‌লিকা শাকাওয়াতী ওয় হির্‌মানী ও তারদী ওয়াক্‌তাদা রিজ্‌কী ওয়াক্‌তুব্‌নী ইন্‌দাকা ফী উম্মিল কিতাবি ছায়ীদান্ মারজুকান্ মাও ফকাল্ লিল্ খাইরাতি ফাইন্নাকা কুল্‌তা ওয়া কাউলুকাল হাক্কু ফী কিতাবি কাল মুন্‌জালি

আলা লিছানি নাবীয়্যিকাল্ মুরছালি এয়াম্‌হুল্লাহু মা-এয়াশা-উ ওয় ইউছাব্‌বিতু ওয় ইন্‌দাহু উম্মুল কিতাবি, আছ্‌আলুকাল্লাহুম্মা বিহাক্কিত্ তাজাল্লিয়িল্ আ'জামি ফী লাইলা তিন্ নিছ্‌ফি মিন্ শাহ্‌রি শাবানিল্ মুকার্‌রামি আল্‌লাতি ইউফ্‌রাকু ফীহা কুল্লু আম্‌রিন্ হাকীমিন্ ওয় ইউব্‌রামু আন্ তাক্‌শিফা আন্না মিনাল্ বালা-য়ি মা তা'লামু ওয় মা-লা না'লামু আন্‌তা বিহী আ'লামু আন্‌তাল্ আআজ্‌জুল্ আক্‌রামু ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয় আলা আ-লিহি ওয় ছাহ্‌বিহী ওয়া ছাল্লাম।

تمت بالخير

পরিশিষ্ট

উপসংহারে বলতে হয় সর্বান্তঃকরণে আমাদের সকলকে এ বিষয়টি স্বীকার করে নিতে হবে যে, মহামহিম প্রভূ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অনুপম এবাদত-নামায বিষয়টি সত্যই এক মহা সমুদ্র তুল্য।

তাই এ বিষয়ে যত বলা হউক যতই লিখা হউক, তা মহা সমুদ্রের ছিটেফোঁটা ছাড়া অধিক কিছুই নয়।

সার সংক্ষেপে কথা হচ্ছে— এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, যেমনিভাবে মানব সত্তার দু'টো দিক রয়েছে— একটি হচ্ছে বাহ্যিক দিক তথা দেহ, অপরটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ দিক তথা প্রাণ।

অনুরূপ ছালাত-নামাযেরও দুটো দিক রয়েছে। একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালনের দিক, অপরটি হচ্ছে হৃদয়-মনের ভাবগত দিক।

সুনির্ধারিত নিয়মে মহামহিম প্রভূ আল্লাহ তাআলার তা'জীম উদ্দেশ্যে নামাযের মধ্যে হাত বেঁধে দাড়ান, রুকু' (চরম সীমায় প্রভূর তা'জীম-সম্মানে সম্মুখ পানে ঝুঁকে পড়া), ছিজদা (চরম সীমায় প্রভূর প্রতি সর্বাধিক তা'জীম প্রদর্শন উদ্দেশ্যে ভূলুণ্ঠিত হওয়া) এবং বৈঠক ইত্যাদি অঙ্গ-ভঙ্গিমূলক কাজ সমূহ, কোরআন তেলাওয়াত, বিভিন্ন তাছবীহ, দোয়া ও দরূদ পাঠ করন ইত্যাদি হচ্ছে নামাযের দেহতূল্য। আর এসব বাহ্যিক বিধি-নিয়ম পালনের সময় মহান আল্লাহ তা'আলাই যে সমুদয় জগতের একক স্রষ্ঠা, একক নিরঙ্কুশ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, নিখিল বিশ্বের সবকিছুর একক প্রতিপালন, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণকারী স্বয়ম্ভু মালিক অদ্বিতীয় উপাস্য-প্রভূ —এ হিসাবে ঐ মহান আল্লাহ পাকই যে এককভাবে আমাদের চরম সীমার সর্বাধিক তা'জীম ও ভক্তি-শ্রদ্ধা তথা এবাদত-উপাসনা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তা— নামায আদায়ের সময় —এ কথাগুলো মন-অন্তরে বিদ্যমান রেখে মহা রাজাধিরাজ প্রভূ আল্লাহ জাল্লাশানুহু সমীপে হৃদয়-মনের পরিপূর্ণ একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা সহকারে নিজের আত্মমর্যাদা ও আত্মগরিমা বিসর্জন দিয়ে শেষ সীমার কাকুতি-মিনতি ও চরম সীমার দীনতা-হীনতা মূলক মনোভাব নিয়ে নিজের পরিপূর্ণ অক্ষমতা এবং প্রভূ আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-সক্ষমতা ও প্রভূত্বের স্বীকৃতি জ্ঞাপন পূর্বক চরম সীমার সর্বাধিক তা'জীম ও ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ভাব প্রকাশ করতঃ আপন অস্তিত্ব বিলিনের ভাব-ভঙ্গিমা অবলম্বনে মহামহিম প্রভূ আল্লাহ তা'আলা সমীপে নিজেকে উৎসর্গ ও লীন করণ মূলক মনোভাব প্রকাশ দেওয়াটাই হচ্ছে নামাযের প্রাণ।

উপরে আলোচিত এতুদভয়ের সমন্বিত রূপই হচ্ছে পরিপূর্ণ ছালাত (নামায)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহাগ্রন্থ আল্ কোরআনুল করিমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

অর্থ ঃ তোমরা বল, আমার নামায-উপাসনা আমার আত্মোৎসর্গীকরণ, আমার জীবন, আমার মারন তথা সবকিছুই নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ জাল্লা-শানুহুর জন্যই নিবেদিত।

যেরূপ প্রাণ ব্যতীত শরীর মূল্যহীন, তদ্রূপ অন্তর-মনের একাগ্র-একনিষ্ঠ আত্মোৎসর্গীকরণের ভাব-ধ্যানপূর্ণ নামায ছাড়া নিরেট দেহের নামাযও মূল্যহীন।

সাথে সাথে এও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ পার্থিব জগতে যেমনিভাবে শরীর দেহ ব্যতীত প্রাণের অস্তিত্ব বুঝা যায় না– প্রাণ রক্ষাই করা যায় না।

অনুরূপ নামায আদায়ের বাহ্যিক নিয়ম-কানুন পালন ব্যতীত শুধু মন-অন্তরের ধ্যান-মনোযোগের দ্বারা নামায রূপ এবাদতের অস্তিত্বের প্রকাশ দেওয়া যায় না নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি নিরেট ধ্যানী-মনোযোগী হওয়ার দ্বারা নামায আদায় হয়েছে মনে করলেও তা আল্লাহ-রাছূল অভিপ্রেত প্রকৃত ছালাত (নামায)রূপে গন্য হবে না।

মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য পরিপূর্ণ নামায আদায় করা তখনই প্রমানিত হবে– যখন হৃদয়-অন্তরের বিনম্র-বিনীত আত্মোৎসর্গ ও আত্মসমর্পণমূলক ধ্যান-মনোযোগের সাথে সাথে মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও রাছূল করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম প্রদর্শিত শুদ্ধ-সঠিক নিয়মে নামাযের বাহ্যিক পাঠ-পঠন ও হাতবদ্ধ দাঁড়ান, উপবেশন, রুকু ও ছিজদা ইত্যাদি সহ দেহ-শরীরের বশ্যতা স্বীকারের চরম রূপটিও ধারণ করা হবে।

মোটকথা, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এবং তাঁর প্রিয় রাছূল (দঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত দেহ-মন উভয় অঙ্গ দ্বারা আদায়কৃত সমন্বিত রূপই হচ্ছে মহান আল্লাহ অভিপ্রেত পরিপূর্ণ ছালাত (নামায)।

মনের একাগ্রতা ও উল্লেখিত ধ্যাণ-ভাব এবং বাহ্যিক নিয়ম পদ্ধতির সমন্বিত পন্থায় নামায আদায় করে যেতে পারলেই ইহ-পরকালে মহান আল্লাহ কর্তৃক ওয়াদাকৃত নামাযের উপকারিতা ও প্রতিদান-ফলাফল পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

নামায সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের ইহাই মূল আলোচ্য বিষয়।

মহান আল্লাহ স্বীয় করুণা গুণে তাঁরও প্রিয় রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের পছন্দনীয় পন্থায় আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নামায আদায় করার তৌফিক দান করুণ।

আমীন